ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -6

National Movement in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

COR-206

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখার্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,

শ্রী সুকৃত মুখার্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২২ ।
- গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ লেখকদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে, আবার কিছু অংশ বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকেও সংগৃহীত হয়েছে।
- সংগৃহীত অংশের মৌলিকত্ব নেই।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-206: Colonial India- 19th and 20th century- (Credit-4)

BLOCK 1: Indian experience of colonialism, an overview

Unit-1: Strategies of Colonial rule- growth of a new geo-political and administrative structure.

Unit-2: From company's management to the neo darbari mechanism of control.

BLOCK 2: Rural economy and society

Unit-3: Regional variation of agrarian relations, Debate on change and continuity.

Unit-4: Subinfeudation, commercialisation of agriculture and de-industrialization.

Unit-5: Trend in agricultural ecology and output, the stagnation debate and famines.

BLOCK 3: Urban Economy and Society: Expansion and Compression

Unit-6: Urban flow of capital and labour.

Unit-7: Features of new urbanisation- local and regional variations.

BLOCK 4: Trade and Industry

Unit-8: Changes in the commodity composition of trade-increasing monetisation.

Unit-9: The Railways-Rise of modern industry-Structural changes.

Unit-10: New industrial relations- Debate on the comprador status of Indian Capitalists.

BLOCK 5: Protestant India

Unit-11: Tribal and Peasant movements

Unit-12: Colonial policy of pacification and suppression, administrative categorisation of 'criminal tribes and castes'.

Unit-13: Demographic trends.

BLOCK 6: Colonial intervention and social change

Unit-14: 'Renaissance' beyond Bengal and Socio-religious reforms.

Unit-15: Indigenous and Western education.

Unit-16: Rise of the middle class with their press and Literature-tension between tradition and modernity,

ACKNOWLEDGEMENT

Unit-1: Strategies of Colonial rule-growth of a new geo-political and administrative structure.		
Unit-2: From company's management to the neo darbari mechanism of control.		
Unit-3: Regional variation of agrarian relations, Debate on change and continuity.		
Unit-4: Subinfeudation, commercialisation of agriculture and de-industrialization.		

Unit-5: Trend in agricultural ecology and output, the stagnation debate and famine		
Unit-6: Urban flow of capital and labour.		
Unit-7: Features of new urbanisation- local and regional variations.		
Unit-8: Changes in the commodity composition of trade-increasing monetisation.		
Unit-9: The Railways-Rise of modern industry-Structural changes.		
Unit-10: New industrial relations-Debate on the comprador status of Indian Capitalists.		
Unit-11: Tribal and Peasant movements		
Unit-12: Colonial policy of pacification and suppression, administrative categorisation of ‘criminal tribes and castes’.		
Unit-13: Demographic trends.		
Unit-14: ‘Renaissance’ beyond Bengal and Socio-religious reforms.		
Unit-15: Indigenous and Western education.		
Unit-16: Rise of the middle class with their press and Literature-tension between tradition and modernity		

পর্যায় গ্রন্থ - ১

সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের নানা কৌশল

একক - ১

The Aftermath of Revolt : British Government's control over Indian Administration

গঠন (Structure) ঃ

৪.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.১.১.১ ঃ ভূমিকা — মহাবিদ্রোহের পরিণতি

৪.১.১.২ ঃ ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

৪.১.১.৩ ঃ ১৮৬১'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪.১.১.৪ ঃ ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪.১.১.৫ ঃ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

৪.১.১.৬ ঃ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও নিয়ন্ত্রণনীতি

৪.১.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.১.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। মহাবিদ্রোহের পরিণতি বা ভবিষ্যৎ ফল

২। ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

৩। ১৮৬১ এবং ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

৫। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের কৌশল

৪.১.১.১ ঃ ভূমিকা — মহাবিদ্রোহের পরিণতি

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। অর্থের বিনিময়ে পাওয়া ব্রিটিশ নৃপতির সনদবলে এই কোম্পানী ভারতে ও এশিয়ায় অন্যত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। এই বাণিজ্যের খাতিরেই কোম্পানী উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে জড়িয়ে পড়ে এবং তা এতই লাভজনক হয় যে অধিগ্রহণ উত্তরোত্তর একটি বলিষ্ঠ নীতিতে পরিণত হয়। অথচ এর দ্বারা কোম্পানীর যে কেবল আর্থিক লাভই হয়েছিল তা নয়। ক্রমশঃ কোম্পানী নিজেই একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় যার অপ্রীতিকর প্রভাব কেবল ভারতের মানুষের ওপরেই নয় ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরেও পড়তে থাকে। সার্বভৌমত্বের অধিকারী ব্রিটিশ রাষ্ট্র অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয় কোম্পানীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে। ১৭৭৩এ আরম্ভ হয় কোম্পানীকে বশে আনার একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৫৮য়।

১৭৭৩র রেগুলেটিং এ্যাক্ট ছিল কোম্পানীকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে আনার প্রথম ও দুর্বল এক প্রয়াশ সন্দেহ নেই, তবে ভবিষ্যতের জন্য তা দিক-নির্দেশকারীও হয়েছিল। ঐ বছর কোলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা ভারতে নতুন এক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপও বটে। ১৭৮৪র পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট একদিকে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের এক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে পার্লামেন্টের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা কোম্পানীর ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণেরও এক প্রচেষ্টা। ১৬০০য় আরম্ভ হওয়া ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয় ১৮১৩র চার্টার এ্যাক্টের দ্বারা। ১৮৩৩এ চীনে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারও চলে যায় কোম্পানীর হাত থেকে। ১৮৫৩র চার্টার এ্যাক্ট ছিল একটি তাৎক্ষণিক ও অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ। ১৮৫৭র বিদ্রোহ কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসানকে ত্বরান্বিত করে। কোম্পানীর অপশাসনই বিদ্রোহের কারণ এমন প্রবল জনমত এই সময়ে ইংল্যান্ডে তৈরী হলে ক্ষমতার হস্তান্তর অতি সহজেই ঘটে যায়। ১৮৫৮র গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশ নৃপতির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও শাসন।

৪.১.১.২ ঃ ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

১৮৫৮'র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষমতা বর্তায় পার্লামেন্টের ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ অবলুপ্তি ঘটে এতকাল যে দুটি সভা এই ক্ষমতা ভোগ করত, অর্থাৎ কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ও পার্লামেন্টের বোর্ড অফ কন্ট্রোলের পরিবর্তে ব্রিটিশ নৃপতির নামে শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের ওপর। কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীও এরপর থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হল। সেক্রেটারী অফ স্টেট হলেন পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য গঠিত হল ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইন্ডিয়া কাউন্সিল নামে একটি পরামর্শদাতাদের পরিষদ। অবশ্য এই পরিষদের সুপারিশ অবজ্ঞা করে পৃথক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। তবে অর্থবিষয়ক তাঁর কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাদের অনুমোদনকে একটি অবশ্য শর্ত হিসাবে রাখা হল। সাধারণত ভারতে শাসনকাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরই পরিষদে স্থান হত। এঁদের না জানিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সাথে যে কোন গোপন তথ্যের আদানপ্রদানের ক্ষমতা থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। ভারত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়-আইন, রেল, রাজস্ব, আয়ব্যয় ইত্যাদি-তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পরই অনুমোদন দিতেন। ভারতে রচিত বিভিন্ন আইনবিধি পার্লামেন্টে দাখিল করার দায়িত্ব ছিল তাঁর, এবং নিয়মিত কিছুকাল অন্তর পার্লামেন্টকে ভারতের খবরাখবর জানানোরও।

এরপর থেকে কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল হলেন গভর্ণর জেনারেল এ্যান্ড ভাইসরয়, অর্থাৎ এর দ্বারা স্পষ্ট করা হল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ নৃপতির প্রতিনিধি। ভারতে প্রত্যক্ষ শাসনভার বর্তালো তাঁর ওপর। অবশ্য যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদনসাপেক্ষ, সেহেতু নীতি অবলম্বন ও সম্পাদনে ভাইসরয় হয়ে পড়লেন পার্লামেন্টের অধীনস্ত। তাঁর সহায়তার জন্য গঠিত হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নামে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই পরামর্শদাতাদের পরিষদের সদস্যরা সাধারণত ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরাই হতেন।

১৮৫৮'র এই আইনের সাথে সাথে জারী হল কুইন্স প্রোকলামেশন বা মহারাণীর ঘোষণাপত্র। এর দ্বারা দেশীয় শাসকদের আশ্বাস দেওয়া হল যে কোম্পানীর সাথে তাঁদের যাবতীয় চুক্তি-সন্ধি মহারাণী সম্মানের সাথে পালন করবেন এবং তাঁদের যাবতীয় অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মহারাণী হস্তক্ষেপ করবেন না এমন আশ্বাসও দেওয়া হল। ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না, কেবল উপযুক্ত শিক্ষাগত ও অনুরূপ যোগ্যতাই ভারত সরকারের কাছে আমল পাবে, এই ঘোষনাপত্রের দ্বারা তা ভারতীয় প্রজাদের জানানো হল।

যদিও এটাই স্বাভাবিক, তবুও উল্লেখ করতেই হয় যে ১৮৫৮'র আইন ও মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতীয়দের জীবনে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, ইংরেজদের তেমন কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। অতএব বজায় থাকল স্থিতাবস্থা মাত্র। মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সমাজের একাংশ বহুদিন যাবৎ নানা অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসছিল পার্লামেন্টের কাছে, যেগুলি আগের মত এখনও উপেক্ষিত হল। প্রতিনিধিত্বমূলক কোন শাসনব্যবস্থার জন্ম তো হলই না, বরং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সেক্রেটারী অফ স্টেটের হাতে চলে যাওয়ায় প্রশাসনের

সংবেদনশীলতা আরও দুর-অস্ত হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, তাঁর কার্যালয়ের ব্যয়ভার যথারীতি বর্তালো ভারতীয় প্রজার ওপর। বিলিতি সমাজের যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বহুদিন যাবৎ কোম্পানীর বিশেষ অধিকারের অবলুপ্তির জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল, কেবল তাদেরই প্রত্যাশা পূরণ হল ১৮৫৮ য়।

৪.১.১.৩ ঃ ১৮৬১'র ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৬১র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টের দ্বারা একদিকে যেমন গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করা হল তেমনই অন্যদিকে ১৮৩৩ ও ১৮৫৩র চার্টার এ্যাক্ট দুটিতে শাসনতন্ত্রে যে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক দেখা গেছিল তা কিছুদূর কমানোর চেষ্টা হল। এই আইনের দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠনে পরিবর্তন আসে। তৈরী হল শাসনকাজের তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিভাগ। সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টনের দায়িত্ব থাকল গভর্ণর-জেনারেলের। সদস্যরা সাধারণ বিষয়গুলি নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে চালাবার অধিকারী হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশ-অনুমোদনকে অপরিহার্য মানা হল।

এই আইনসংস্কারের প্রণেতা স্যার চার্লস উড পার্লামেন্টের ধাঁচে সম্পূর্ণ পৃথক একটি আইন পরিষদ পছন্দ না করায় গভর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদেই আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিতীয় একটি বিভাগ তৈরী হল। নির্দিষ্ট করা হল তিন ধরণের সদস্যঃ 'সাধারণ সদস্য' (বাংলার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরদের মত 'অ-সাধারণ' সদস্য সহ), পাঞ্জাব ও বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণরেরা এবং 'অতিরিক্ত' সদস্য, (গভর্ণর-জেনারেল দ্বারা মনোনীত)। এই বিভাগের আইন রচনার ক্ষমতা হল ব্যাপক। ইংরেজ-শাসিত ভারতের সকল মানুষের জন্য তো বটেই, এমনকি দেশীয় রাজ্যে বসবাসকারী ভারত সরকারের কর্মচারীদের জন্যও আইন তৈরী করার ক্ষমতা হল এই বিভাগের। অথচ এরই সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপিত হল। যেমন, পার্লামেন্ট দ্বারা ভারতের জন্য রচিত কোন আইন পরিমার্জনাকারী অথবা ইংল্যান্ডের সংবিধান সংশোধনকারী কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এই বিভাগের থাকল না। অর্থাৎ, এই পরিষদকে স্পষ্টভাবে পার্লামেন্টের অধীনস্ত একটি সভায় পরিণত করা হল। এই ব্যবস্থাও জারী হল যে গভর্ণর-জেনারেলের, এবং সেক্রেটারী অফ স্টেটেরও, অনুমোদন ছাড়া আইন পরিষদের কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে পারবে না। তাছাড়া গভর্ণর-জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হল প্রয়োজনে, পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে, ছয় মাসের জন্য বিশেষ আইন জারী করার।

অন্যদিকে, নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা সহ বোম্বাই ও মাদ্রাজে এবং লেফটেনেন্ট-গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলিতেও আইন পরিষদের ব্যবস্থা হয় এই বছর। সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ও 'অতিরিক্ত' এই তিন ধরণের সদস্য নিয়ে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির আইন রচনা বিভাগ তৈরী হল। তবে ফৌজদারী আইন, মুদ্রাব্যবস্থা, বিদেশনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রস্তাবের ক্ষমতা দেওয়া হল না এই বিভাগকে। পার্লামেন্টের অনুমোদন অবশ্য শর্ত থাকল, যেমন থাকল এই শর্তও যে এই বিভাগের রচিত যে কোন আইন গভর্ণর-জেনারেল নাকচ করে দিতে পারেন।

যথারীতি নতুন এই আইনে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থাই থাকল না। কেবল এই সিদ্ধান্তই থাকল যে গভর্ণর-জেনারেল তাঁর ইচ্ছামত দেশীয় শাসকদের তাঁর আইন বিভাগে অতিরিক্ত সদস্যপদে মনোনীত করতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে, নতুন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে পার্লামেন্টের আজ্ঞানির্বাহী সভায় পরিণত করাই ছিল একমাত্র অভিপ্রায়। এই কারণেই বেসরকারী অপেক্ষা সরকারী সদস্য সংখ্যা বেশী রাখা হয়, অর্থাৎ যাতে এইসব সভায় সরকারের মতেরই প্রতিফলন হয়। আবার এই কারণেই গভর্ণর-জেনারেল, সেক্রেটারী অফ স্টেট ও পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করার অধিকার দেওয়া হল আইন পরিষদের সদস্যদের। অর্থাৎ ১৮৬১র সংস্কারের দ্বারা বিকেন্দ্রীকরণও সামান্যই হয়েছিল।

৪.১.১.৪ ঃ ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৯২র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টের দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির আইনরচনা বিভাগের সদস্যসংখ্যা আরেক দফা বাড়ানো হয় এবং সদস্যদের ক্ষমতাতেও পরিবর্তন আনা হয়। গভর্ণর-জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা হয় সর্বনিম্ন দশ থেকে সর্বোচ্চ ষোল, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন পরিষদ দুটির ক্ষেত্রে আট-কুড়ি। সমান অনুপাতে বাড়ল বেসরকারী সদস্যপদও। সদস্যদের নতুন অধিকার দেওয়া হল সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা করার ও প্রশ্ন তোলার। তবে এ নিয়ে কোন সংশোধনের ক্ষমতা তাদের থাকল না। জনস্বার্থ বিষয়ক প্রশ্ন তোলার ও উত্তর পাওয়ার অধিকারও সদস্যরা পেলেন, তবে তাঁদের তোলা প্রশ্ন বাতিল করার ক্ষমতা থাকল আইন পরিষদের প্রধানের। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির ক্ষেত্রে একই নিয়ম বলবৎ হল।

এই আইনে প্রথম সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম রচিত হয়। ব্যবস্থা হল এই যে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির বেসরকারী সদস্যরা এবং কোলকাতার বণিকসভা, আইনজীবি পরিষদ প্রভৃতি সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের জন্য পাঁচজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন। তেমনই স্নাতকগোষ্ঠী, পুরসভা, বৃহৎ জমিদার-বণিকেরা প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির জন্য মোট চারজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন, এই নিয়ম হল।

বস্তুতপক্ষে, এই 'নির্বাচন' সুপারিশ মাত্র। কারণ প্রেরিত তালিকা থেকে বেছে নিয়ে মনোনয়নের ক্ষমতাটা গভর্ণর-জেনারেলেরই হাতে রেখে দেওয়া হল। অতএব এটা স্বাভাবিক যে আইন পরিষদগুলির 'নির্বাচিত' সদস্যরা অন্যদের মত সরকারী নীতিই অনুসরণ করে চলবে। এই সংস্কারের দ্বারা ভারতীয়রা তাই প্রকৃত কোন অধিকার পেল না। কারণ যে ভারতীয়রা নতুন নিয়মে আইন পরিষদে স্থান পেলেন তাদেরকে কোন অর্থেই দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি বলা চলে না। সরকারের ব্যাখ্যা ছিল ভারতের মত বৃহৎ ও অনুন্নত দেশে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালানো বাতুলতা মাত্র। নতুন বিধির দ্বারা আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন ধরণের অগ্রনী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট, এই ছিল সরকারের মত। অন্যদিকে, আইন পরিষদের সদস্যদের নতুন অধিকার প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকারই নয়। কারণ সরকারের নীতি নির্দ্ধারণ অথবা নীতি পরিমার্জনার কোন ক্ষমতা তাঁরা পেলেন না। আসলে তাঁদের আলোচনা প্রশ্ন তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল নিতান্তই এই কারণে যাতে পরবর্তীকালে সরকার পক্ষকে আয়ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন না হতে হয়।

বলা যেতে পারে যে নীতিগ্রহণ ও নীতিসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার এযাবৎকাল যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল, তাতে কিছুদূর ভাটা পড়ল। কারণ এরপর থেকে সরকারকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হত। বস্তুতপক্ষে, দাদাভাই নৌরজীর মত ভারতীয় সদস্যরা নতুন এই যে অধিকার পেলেন, তার যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগটা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এটুকুর দ্বারা ভারতীয়দের প্রত্যাশা কোনভাবেই পূরণ হয়নি। ১৮৮৫

থেকে প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেস, এমনকি তার আগেও বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক সংগঠন, ইংরেজ সরকারের কাছে সীমিতভাবে হলেও স্বাধিকার দাবী করে আসছিল। ১৮৯২র সংস্কার তাই ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসকের মনোভাব স্পষ্ট করে দিল। এর প্রভাব পড়ে তাদের রাজনীতির ওপর; জাতীয় সংগ্রামকে আবেদন-নিবেদনের পথ থেকে বিক্ষোভমূলক পথে চালনা করার কারণটা ভারতীয়দের জুগিয়ে দেয় ইংরেজরাই।

৪.১.১.৫ ঃ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল, তার অন্যতম প্রধান ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন। এই কাজটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে করেছিল ইংরেজরা। এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সৈন্যদের ভবিষ্যত বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা, তবে এছাড়াও অন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করেছিল।

প্রথমত, সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় ইউরোপীয়দের আধিপত্য সুনিশ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ অবধি কোম্পানীর বাহিনীতে ছিল প্রায় দুই লক্ষ পনেরো হাজার ভারতীয় সৈন্য অথচ মাত্র চল্লিশ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য। তাই এরপর ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যদের আনুপাতিক হার বাংলায় ১ ঃ ২ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে ২ ঃ ৫ স্থির করা হল। তাছাড়া, সাম্রাজ্যের সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে উপমহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কেবল ইউরোপীয়দেরই মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই সময়। একই কারণে সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজ শাখাটিকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলা হল। এই কারণেই, ২০ শতকের নতুন শাখাগুলি, যেমন ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রাগার ডিভিসনগুলি, প্রথম থেকেই ইউরোপীয়দের কুক্ষিগত হল। আবার, আগের মত এখনও ভারতীয়দের উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত রাখা হল; যেমন, ১৯১৪তেও একজন ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে সুবাহদারের ওপরে ওঠা সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে ইংরেজরা বিভেদনীতি অবলম্বন করে। সৈন্যদের জাতি-ধর্ম-বাসস্থান ইত্যাদি পার্থক্যগুলিকে মাথায় রেখে এমনটা করা হয়। যেমন, একেকটি রেজিমেন্টে বিভিন্ন ধরণের সৈন্যকে প্রায় সমান সমান সংখ্যায় রাখা হয় এবং তাদের আপনাপন জাতি-ধর্ম-অঞ্চলের প্রতি সহজাত আনুগত্যকে এমনভাবে সমর্থন ও গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ হল যাতে তাদের পক্ষে একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিল ইংরেজরা ভারতীয়দের ‘সামরিক’/‘অসামরিক’ দুটি ভাগে ভাগ করে। অযোধ্যা, বিহার, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সৈন্যরা, যারা ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল অথচ যারা ১৮৫৭র বিদ্রোহে প্রধান অংশ নিয়েছিল, তাদের ‘অসামরিক’ বলে চিহ্নিত করে সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে রাখা হল। অন্যদিকে যে শিখ, পাঠান, গুর্খারা বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল, তাদের আনুগত্যকে নিশ্চিত করতে ও অন্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক রাখতে, তাদের ‘সামরিক’ আখ্যায় ভূষিত করা হল।

কালক্রমে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল বাহিনীতে পরিণত হয়। যেমন, ১৯০৪এ সরকারের আয়ের প্রায় ৫২% এর ওপরেই ব্যয় হয়েছিল। এর কারণ, এর দ্বারা ইংরেজদের নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হত। আসলে, ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ভারত তার মধ্যমণি ছিল এমন বলা অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে রুশ, ফরাসী ও জার্মান আক্রমণ থেকে এই উপনিবেশটিকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। আবার এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের বাণিজ্যিক বন্দোবস্তগুলিকে সচল রাখারও প্রয়োজন ছিল। তেমনই, এই দুটি

মহাদেশে নতুন নতুন অঞ্চল অধিগ্রহণেরও প্রয়োজন হত মাঝে মাঝে। প্রধানত এই কয়েকটি কারণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীটি ইংরেজদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ, সম্পূর্ণভাবে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত এমন এক বাহিনীর প্রতিপালনের ব্যয়ভারটি বহন করতে হত ভারতবাসীকেই। তবে উল্লেখ্য যে সৈন্যদের ভারতীয় জীবন থেকে পৃথক রাখার ইংরেজদের উদ্যোগটি ব্যর্থই হয়। কারণ, বিভিন্ন সময় সৈন্যরা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

৪.১.১.৬ ঃ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও নিয়ন্ত্রণ নীতি

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসনের দরুন অতি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সাম্রাজ্যটি চলে যেতে বসেছিল বলে পার্লামেন্ট এখানে ব্রিটিশ নৃপতির প্রত্যক্ষ ও নিরঙ্কুশ শাসনের প্রবর্তন করে। উদ্দেশ্য ছিল, কার্যকরী বিভিন্ন নীতি-পদক্ষেপের দ্বারা এ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করা। এটা করতেই পার্লামেন্ট ভারতের শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলে। উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারত ছিল ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে সাম্রাজ্যর যে বিশাল অংশটি ছিল, তা ভারত থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। শক্তিশালী এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার পেছনে এটা ছিল অন্যতম এক যুক্তি। অথচ সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক স্বার্থ। ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্প-অর্থনীতির সহায়ক হিসাবে ভাবতেই পছন্দ করে ইংরেজরা। প্রয়োজন ছিল ভারতকে খাদ্যশস্য-কাঁচামাল যোগানকারী এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়কারী একটি অঞ্চল হিসাবে ধরে রাখা। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবী জুড়ে ইংরেজদের যে বাণিজ্য চলত ভারত ছাড়া তার ভারসাম্য নিজেদের অনুকূলে রাখাই অসম্ভব ছিল। তাই একদিকে যেমন গড়ে তোলা হল পূর্ণনিয়ন্ত্রিত এক সৈন্যবাহিনী অন্যদিকে তেমনই নজর দেওয়া হল আমলা-নিয়ন্ত্রিত এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে যাতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

অথচ প্রয়োজন ছিল অন্যায্য এই উপনিবেশিক ব্যবস্থাকেই ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয় করা। অতএব প্রথমেই এই প্রচার করা যে যেহেতু বহুবিভক্ত ভারতীয়রা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুপযোগী এবং যেহেতু তারা নিতান্তই অনগ্রসর, সেহেতু তাদের প্রতাপশালী, শান্তিপ্রদানকারী, উন্নয়নকামী, আলোকপ্রাপ্ত ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। একই কারণবশত ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখা হল নাগরিকত্বের অধিকার থেকে এবং তাদের পরিণত করা হল নিছক এক প্রজাবর্গে। প্রয়োজন ছিল এমন ব্যবস্থার সমর্থনকারী কিছু গোষ্ঠীর লালন-পালনও। এমন এক গোষ্ঠী ইংরেজরা খুঁজে পেল ১৮৫৭র বিদ্রোহে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারী, জনসমর্থনপুষ্ট সাবেকী অভিজাতদের মধ্যে। নতুন আমলে তাই নানাভাবে তাদের তুষ্ট রাখাটা একটা প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায় ইংরেজদের। অন্যদিকে, সংখ্যায় ও শিক্ষা-সচেতনায় দ্রুত বাড়তে থাকা মধ্যবিত্তদেরও অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। তাই নতুন আমলে শাসনব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের অধিকারকেও উত্তরোত্তর মেনে নিতে হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য বড়লাট রিপনের উদ্যোগে গৃহীত ১৮৮২র স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন (লোকাল সেল্ফ-গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট) যার দ্বারা ভারতবাসী স্থানীয় প্রশাসনে অন্তত কিছুদূর অংশ নেওয়ার অধিকার পেয়েছিল।

৪.১.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(ক) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পলাশী থেকে পার্টিশান (২০০৪)।

(খ) সুগত বসু ও আয়েষা জালাল ঃ মর্ডার্ন সাউথ এশিয়া (১৯৯৯)।

(গ) সুমিত সরকার ঃ আধুনিক ভারত (১৯৯৬)।

(ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ১ম ভাগ (১৯৭০)।

(ঙ) এস. গোপাল ঃ ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া (১৯৬৫)।

(চ) টি. আর. মেটকাফ ঃ দ্য আফটারম্যাথ অফ দ্য রিভোল্ট (১৯৬৫)।

(ছ) অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এ কন্সটিট্যুশনাল হিস্টরী অফ ইন্ডিয়া (১৯৭১)।

৪.১.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(ক) ১৮৫৮র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এবং কুইন্স প্রোক্লামেশনের (মহারাণীর ঘোষণাপত্রের) দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্রে কি পরিবর্তন এসেছিল? ১৮৬১ ও ১৮৯২র কাউন্সিল এ্যাক্ট দুটির দ্বারা ইংরেজরা কি অর্জন করে?

(খ) ১৮৫৭-পরবর্তী আমলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কি পরিবর্তন এসেছিল? এর পেছনে ইংরেজদের কি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল?

_পর্যায়- ১

একক-২

From companie's management to the Neo Darbari mechanism of Control

১) উদ্দেশ্য
২) আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানির পদক্ষেপ
৩) ১৮৫৮ এর পরে নব দরবারি রাষ্ট্র গঠনের বিষয়

৪) সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫) নমুনা প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য :- বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় কালের পরিস্থিতি আলোচনা করা হবে।

আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানির পদক্ষেপ

ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই ভারত অর্থনৈতিক বিকাশের নিজস্ব ধারণাটি তথা উন্নত শিল্প তান্ত্রিক প্রেক্ষাপট হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "*দা কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া*" দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যক্ত করা হয়েছে ভারতের অনগ্রসরতা ঔপনিবেশিক শোষণের জন্য নয় এর মূল কারণ হিসেবে তারা বলতে চেয়েছেন ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই দেশ ছিল অনগ্রসর দেশ তাদের কল্যাণময় শাসনের দৌলতেই অনগ্রসরতা দূর করার চেষ্টা হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের জন্যই মানুষের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছিল কিন্তু এখানকার জনগণের মাথাপিছু আয় এতই কম ছিল এবং মূল্যবোধ এত সেকেলে ছিল যে তার মধ্যে থেকে আধুনিক শিল্প সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিলনা। টমলিনসনের কণ্ঠেও একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তার মতে ভারতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ইংরেজদের আগমনের আগেও ছিল ব্রিটিশ আমলে তা দূর করা সম্ভব হয়নি, এমনকি ব্রিটিশদের প্রস্থানের পরেও তা বহাল ছিল। কাল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন ধণতন্ত্র এক বিশ্বব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহণ করেছে, বিশ্ববাজারের অনুসন্ধান করেই চলেছে এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অর্থাৎ ইংরেজশক্তি তথা কোম্পানির শিল্প সভ্যতার উপকরণগুলি ভারতে বিস্তারলাভ করেছিল ভারতের জনকল্যানের স্বার্থকে চরিতার্থ করবার জন্য নয়। প্রকৃতঅর্থে তার নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েই এই কার্যসাধন করেছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের বিজয়ের পর কোম্পানির শাসন পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে প্রথমত বাংলা লুণ্ঠন ছিল তাদের প্রাথমিক পুঁজি তথা সঞ্চয়ের অন্যতম উৎস 1764 খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজরা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, ফলে কোম্পানির উপর প্রশাসনিক দায়িত্বভার এসে পড়েছিল। এজন্যই শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে থাকে। কোম্পানি আইন ও ন্যায় বিচার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এবং লর্ড ডালহৌসি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পরোক্ষ হস্তক্ষেপের জন্যই কোম্পানি শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতে শাসনতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের উন্নততর শাসনের জন্য আইন ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের

উপর জ্ঞান আরোহনের ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট দেশের শাসনব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পণ করা কতটা যৌক্তিকতা আছে সে সম্পর্কে বড়সড় এক প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছিল। এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে তর্ক বিতর্কও কম হয়নি। শেষ পর্যন্ত রেগুলেটিংএক্ট 1773 খ্রিস্টাব্দে পাস করার মধ্যদিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ভারত অধিকৃত অঞ্চল সমূহের নিকট সুনির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিতকে মজবুত করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আইনের মূল তাৎপর্য ছিল ভারতে কোম্পানির শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠন করার পথকে সুগম করা।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট কার্যকর ছিল দীর্ঘ এগারো বছর এই আইনের প্রধানত দুটি দিক বেশ প্রণিধানযোগ্য ছিল প্রথমত কোম্পানির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে দ্বিতীয়ত ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে। ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল এবং তাকে সহযোগীতা করবার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই চারজন নবনিযুক্ত সদস্য হলেন ক্ল্যাভেরিং, মনসন, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বাইশে অক্টোবর 1774 খ্রিস্টাব্দে এবং এর কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল 1775 খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাস থেকে। স্যার এলিজা ইম্পে ছিলেন প্রধান বিচারপতি এছাড়া আরো তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের কাজ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে কারণে কোম্পানির কোর্টের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল অভিযোগ করেছিলেন “By the several acts and declarations of the Judges, it is plain that the company’s office of Diwan is annihilated” সিলেক্ট কমিটি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন “The court has been generally terrible to the natives and has distracted the government of the company.” 1781 খ্রিস্টাব্দের আইন অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ও কাউন্সিলরদের বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এমনকি সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্য একজন গভর্নর ও কউন্সিলরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাধারণত প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই দুই প্রেসিডেন্সিকে গভর্নর জেনারেলের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। যে কারণে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে ডিরেক্টর সভাকে নানান সংকটের সম্মুখীন হতে হতো। তবুও বলা যায় এই আইন দ্বারা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্রের যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তা অনেকাংশে দূর করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই আইন দ্বারা কোম্পানির নিকট থেকে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এই আইন প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় প্রশাসনের ভিত্তি প্রস্তূত করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতের জন্য এই প্রথম একটি লিখিত সংবিধান প্রস্তুত করেছিল। এই এক্ট দ্বারা রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও কার্যনির্বাহক ক্ষমতাগুলি সুনির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ও নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিল। কিন্তু এই আইনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কোম্পানির ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যর্থতার জেরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বিব্রত করে তুলেছিল। 1776 খ্রিস্টাব্দে পর থেকে যখন ব্রিটেন আমেরিকার উপনিবেশ হারিয়েছিল তারপর থেকেই ব্রিটিশ সরকার ঘোরতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, ফলে এই বিপুল আর্থিক ঘাটতি নিরসনের জন্য ভারতবর্ষে অভিনব রাজস্ব আদায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল।

পিটের ভারত শাসন আইন আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক্ট নামেও সুপরিচিত। এই অ্যাক্টের আনুষ্ঠানিক শিরোনাম ছিল “An act for the better regulation and management of the affairs of the East India Company and of the British possessions in India and for establishing a court of Judicature for the more speedy and effectual Trial of persons accused of offences committee in the East India.” 1784 খ্রিস্টাব্দে ফক্স এর প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়াম পিট প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারত শাসন বিষয়ে এক প্রস্তাবনা পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বৃটিশ

পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পর আইনে রূপান্তরিত হয়। এই নতুন আইন রেগুলেটিং অ্যাক্ট এর বিভিন্ন রকম ত্রুটি গুলি পরিমার্জিত হয়েছিল এবং কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব অধিকতর ও সুস্পষ্টভাবে স্থাপিত হয়েছিল। এই আইন অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের অর্থ সচিব একজন রাষ্ট্রপতি এবং ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক মনোনীত চারজন প্রিভি কাউন্সিলকে নিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠন করা হয়েছিল। এই সংস্থাই ভারত শাসন বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বভার লাভ করেছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রীকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কোম্পানির তিনজন ডিরেক্টর কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও গোপন কমিটির যুগ্ম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা থেকে মালিক সভাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলকে প্রধান সেনাপতি ও দু'জন কাউন্সিলরের সদস্যকে শাসনকার্যে সাহায্য করবে বলে স্থির করা হয়েছিল। যুদ্ধ, শান্তি, রাজস্ব ও দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের ওপর গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার ঘোষণাও পিটের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল পিটের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। পিটের ভারত শাসন আইন ১৮৫৮খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল. এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোম্পানির সার্বভৌম ক্ষমতা বিলুপ্ত করার এক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং বৃটিশ পার্লামেন্টে হাতে নিবন্ধ করা হয়েছিল। তবে পিট্ কোম্পানির স্বার্থের দিকেও নজর দিয়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনো আইন বলবৎ করা হয়নি। অথচ কোম্পানির কাজে লাগাম টানার জন্য বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছিল।

পিটের ভারত শাসন আইন সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না কারণ বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও পরিচালক সভার দ্বৈত শাসনের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই ভারত সম্পর্কে সেইভাবে সঠিক ধারণা বা জ্ঞান না থাকার দরুন বিভিন্ন রকম সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল। আবার এই আইনকে সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাও হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 1792 খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস এই আইনকে অমান্য করেই টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। ইলবার্টের মতে, ভারত শাসন আইন ছিল অত্যন্ত জটিল। তবে এডমন্ড বার্ক মন্তব্য করেছিলেন এই আইন ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবোচিত। এই আইন সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

রেগুলেটিং এক্ট দ্বারা কোম্পানি কুড়ি বছরের জন্য একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করেছিল। ১৭৯৩ সালে এই আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক কারবার তুলে দিলে লোভী ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা করে ভারতের ব্যবসা নষ্ট করে দিতে পারে। সেই জন্যই 1793 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের শর্ত অনুসারে ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার মেয়াদ কুড়ি বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই আইন অনুসারে কোম্পানির গঠনতন্ত্র ও ভারত শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সদস্যদের কোন বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু নতুন সনদে তাদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল তার পরিষদের যে কোন সদস্যকে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি নিযুক্ত করার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলের অবর্তমানে তিনি তার সমস্ত পদ সামলানোর অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া কমিশনারদের সদস্য সংখ্যা ছয় জন থেকে কমিয়ে পাঁচ জন করা হয়েছিল। এককথায় 1770 খ্রিস্টাব্দের আইনের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সনদ আইনের মাধ্যমে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা বজায় রেখে কোম্পানির শাসন কার্য পরিচালনার অধিকার প্রদান করেছিলেন। কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আইনের ফলেই

ভারতীয়দের শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান -বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। বেশ কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও অন্যান্য বণিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভারতবর্ষকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন দ্বারা পুনরায় কুড়ি বছরের জন্য কোম্পানিকে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই সনদ আইন পূর্ববর্তী সনদ আইনের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে কারণে বলা হয়ে থাকে "The act might have been passed before empty benches and in uninterested audience of the House of Commons, but that does not minimize the importance of the said act." এই আইন দ্বারা কোম্পানির উপর একচেটিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার ও চীনের ওপর কারবার পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই আইন উদারনীতিবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস গ্রান্ট হাউস অব কমন্সের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে ভারত সরকারের দক্ষতা হ্রাসের মূল কারন হচ্ছে ব্যবসার সঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতার সংমিশ্রণ তিনি আরো বলেছিলেন যে ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হোক, সেই সঙ্গে কোম্পানির ব্যবসায়িক কাজকর্ম বন্ধ করা হোক। ইহা ভিন্ন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ভারতীয়দের শাসন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কিছু অধিকার প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের মেয়াদ শেষ হবার পর সর্বশেষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা যেমন আইন প্রণয়নের জন্য একটি আইন পরিষদ গঠন, ডাইরেক্টর সভার সদস্য সংখ্যা আঠারো জন করা তার মধ্যে ছয় জন ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী দ্বারা মনোনীত। গভর্নর জেনারেল বাংলার প্রেসিডেন্সির শাসনভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল প্রভৃতি। লর্ড ডার্বি ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্যাক্ত করেছিলেন, "It is our bounded duty in the interest of humanity of benevolence and of morality and religion, that and as far as you can do it safety wisely and prudently the inhabitants of India should be gradually entrusted with more and more of superintendence of their own internal affairs."

1773 খ্রিস্টাব্দে থেকে 1853 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আইন দ্বারা ভারত ভূখণ্ড ব্রিটিশ কোম্পানি ও পার্লামেন্টের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছিল। ফলে কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে এবং মহাবিদ্রোহের প্রভাবে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা গিয়েছে যে আইনে ক্ষেত্রে যা বলা হতো কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোটাই ঘটতো। আসলে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ একে অপরের পরিপূরক সেখানে উদারনৈতিক বা আদর্শের কোন স্থান নেই। মেকলে তাই স্পষ্ট ভাষায় ব্যাক্ত করেছিলেন, "We are trying to give a good government to a people to whom we cannot give a free government."

---------Justice

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের কিছু বছরের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সেখানে নবাবী প্রশাসন ও মুঘল ব্যবস্থা থেকেই গিয়েছিল। 1772 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সুবা বাংলার বিচারব্যবস্থার দায়িত্বভার প্রাথমিকভাবে ভারতীয়দের হাতে ন্যাস্ত ছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারির মামলার প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব ভারতীয় আধিকারিকদের হাতেই থাকতো। ক্লাইভ রেজাখান কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মূলত নাজিম হিসেবে নবাবের প্রশাসনের ফৌজদারি দিকটা তদারকি করতেন। 1772 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস শাসনকর্তা হিসেবে কার্যভার গ্রহণের পর থেকেই তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিচার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তার যুক্তি ছিল এই দেশের জনগণ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির সার্বভৌমত্বে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। তিনি সর্বপ্রথম বানিজ্য বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তার সুপারিশ অনুসারে হিন্দু পণ্ডিতদের সহযোগিতায় হিন্দু আইন বিধি সংকলন করা হয়েছিল। একজন কাজী ও একজন মুফতির তত্ত্বাবধানে থাকতো ফৌজদারি আদালত। তবে এই সমস্ত আদালতের চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকতো ইউরোপীয় কালেক্টররা। এর প্রস্তাব ক্রমে প্রত্তেক জেলায় কালেক্টর ও কাজীর অধীনে মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারি আদালত স্থাপন করার মাধ্যমে প্রেরিত আপিল সমূহ মীমাংসা করার জন্য তিনি কলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজাম আদালত নামে দুটি বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন।

1774 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে ছটি বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন, প্রত্যেক জেলার বিচার বিভাগের দায়িত্বভার একজন দেওয়ান অথবা আমিনের হাতে অর্পণ করেছিলেন। এই সময় আপিলের জন্য বিভাগীয় আপিল আদালত স্থাপন করা হয়েছিল ও প্রত্যেক বিভাগে একটি করে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। 1773 খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং আইনের প্রস্তাব ক্রমে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট নির্মিত হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচারবিভাগীয় সংস্কারের আসল প্রবণতা ছিল বিচারবিভাগীয় কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রশাসন কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমত এই কোট প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির ব্যাপারে নাক গলাত এবং আদালত গুলির কর্তৃত্ব মানতো না। দ্বিতীয়ত কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা এই সময়ের পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। বিশেষ করে কোম্পানি ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ। পাটনার শাহবাজ বেগের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তার বিধবা পত্নী নাদিরা বেগম ও ভাতুষ্পুত্র বাহাদুর বেগের মধ্যে জটিলতা। আরেকটি ঘটনা হল বিখ্যাত কাশীজোড়া মামলাকে কেন্দ্র করে।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য 1780 খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংবদ্ধ করা কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবুও বলতেই হয় যে তার রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারকার্য দ্বারা তিনি যথার্থই দাবি করতেই পারেন যে, রাজ্যের প্রত্যেক শাখায় কোম্পানির সার্বভৌম অধিকার সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (The sovereign authority of the company is firmly rooted in every branch of the state.) ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং ঘৃণ্য ঐতিহাসিক আইনি হত্যা হিসাবে কলঙ্কিত হয়েছিল মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি। নন্দকুমার ছিলেন নবাবের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারী মীরজাফরের বিশ্বস্ত বন্ধু। 1775 খ্রিস্টাব্দে নন্দকুমারকে দলিল জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আদেশে চক্রান্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক বেভারেজ, আলফ্রেড লায়াল প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে হেস্টিংস নিজের আত্মরক্ষার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ উপস্থাপিত করতে না পারে তার জন্যই চক্রান্ত করে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের সঙ্গেও অবিচার করেছিলেন। বিভিন্ন অছিলায় অন্যায় ভাবে প্রচুর অর্থ আদায় করেছিলেন। অবশেষে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস পদত্যাগ করেন অর্থাৎ তার আমলে ভারতে সাধারণত প্রায় সর্বত্রই সরকারের আদর্শ হিসেবে রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র তথা দণ্ড নীতি ব্যাপকভাবে কুলুষিত হয়েছিল। শাস্ত্রমতে প্রকৃত নৃপতি, প্রকৃত নেতা এবং প্রকৃত রক্ষাকর্তাই হল দণ্ড। দণ্ডের প্রয়োগ ব্যতিরেকে রাজ্যে অরাজগতা সৃষ্টি হয় কিন্তু ব্রিটিশ আমলে দণ্ডনীতিই ছিল পক্ষপাতদুষ্ট দুর্নীতিপরায়ন বা মাৎস্যন্যায়ের সমতুল্য।

The famous Cornwallis Code formed the steel frame of British Indian administration. ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকাল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ কর্মচারীদের লাগামছাড়া দুর্নীতি ও কার্যকলাপকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কঠোর বিধানের প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিধিকে বলা হয়ে থাকে কর্নওয়ালিস কোড। এই বিধানের সৌজন্যেই ভারতে আমলাতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। তার হাত ধরেই বিচারবিভাগেও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়েছিল। 1787 খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার আদালত গুলোকে পুনরায় কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। এখন থেকে কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান ও সীমিতভাবে ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলার বিচারের দায়িত্বভার ফৌজদারি ও সদর নিজামাত আদালতের হাতেই ন্যাস্ত থাকতো। আবার রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্বভার অর্পিত থাকতো রাজস্ব পরিষদের হাতে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে আনয়নের জন্য আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং প্রতিটি জেলায় ঘুরে বিচার করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। কর্নওয়ালিস বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করেছিলেন। কালেক্টরদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল; ভারতীয়দের কাছ থেকে সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ইউরোপিয়ানদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। ফলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জাতিগত ও কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য প্রকাশে আর কোন অস্পষ্টতা ছিলনা। দেওয়ানী আদালতের বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল জর্জ বা বিচারক নামক কর্মচারীদের হাতে। জেলা আদালতের নিচে কয়েকটি অধঃস্তন আদালত ছিল। সর্বনিম্ন আদালত ছিল মুনসেফ কোর্ট। একসময় কর্নওয়ালিস ঘোষণা করেছিলেন “I conceive that all regulations for the reform of that department (i.e. criminal justice) would be useless and negatory whilst the execution of them depends on any native whatever.”

তিনি বিচার ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে ও বিচারপ্রার্থীদের পরিষেবা প্রদান কল্পে হিন্দু-মুসলিম উকিল নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। মামলার মূল্য অনুযায়ী পারিশ্রমিক স্থির করা হয়েছিল। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মহিলাদের সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। ইউরোপীয় কর্মচারীদের হাত থেকে ভারতীয় প্রজাদের কিছু কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ বহুলাংশে হ্রাস করেছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয়দের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে তার খুব বাজে ধারণা ছিল। সেজন্যই শাসন ও বিচার বিভাগে উচ্চ পদস্থ ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয়দের জন্য স্থির করা হয়েছিল যে 500 পাউন্ড ও তার উর্ধে বেতনের চাকরিতে তাদের নিযুক্ত করা যাবে না। ফলে ভারতীয়দের কাছে উচ্চ পদে চাকরির দরজা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। স্যার জন শোর এই নীতির কঠোর সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন “The Indians have been excluded from every honour, dignity or office which the lowest Englishman could be prevailed to accept.” লর্ড কর্নওয়ালিস শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য জেলাগুলোকে এগারোটি থানার অধীনে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক থানার দায়িত্ব ভার অর্পিত থাকতো একজন দারোগা নামক অধিকারিকের হাতে তার নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী দেখাশুনা করতেন ম্যাজিস্ট্রেট। টমাস মনরো এই পুলিশি ব্যবস্থার দিকগুলো তুলেধরে বলেছিলেন এই ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত দেশাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের আরাধ্য ধর্মকে পরিপূর্ণতা প্রদানের যত্নবান ছিলেন কর্নওয়ালিস। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে “In the foundation of the civil administration had been laid by Warren Hastings the structure was laid by Cornwallis.” ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে দারোগা ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রামের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা দায়িত্বভার এসে পড়েছিল কালেক্টরদের হাতে। বিচার বিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার তিনি প্রবর্তনে যত্নবান হয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল

ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কর্নওয়ালিস পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফলে বিচার ব্যবস্থা ও আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল সেই সঙ্গে অসন্তোষও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। "Few were destined to do more permanent work than Lord Cornwallis."

পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ডবেন্টিঙ্ক একজন প্রগতিশীল ও সংস্কারকামী শাসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। প্রথমেই তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও প্রাদেশিক আপিল আদালতের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন তিনি ফৌজদারির মামলার দায়িত্ব জেলা বিচারকদের ওপর অর্পন করেছিলেন।কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রদান করেন তিনি। কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি ডিভিশন তৈরি করেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও জেরেমি বেন্থাম দ্বারা প্রচারিত উপযোগিতাবাদ বা হিতবাদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ভারতবাসীর স্বার্থে ঝাপিয়েছিলেন। তাই বলতেই হয় যে "… a benevolent ruler who in fused into oriental despotism the spirit of British freedom; who never forgot that the end of government is the welfare of the governed." সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা করেছেন ভারতীয়দের যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ পদে নিয়োগ করা হবে এবং কোন বৈষম্য করা হবে না। আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। তার শাসনকালে লর্ড মেকলে "ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ড" রচনা করেন 1856 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় হাইকোর্ট আইন রচনা করেছিল। পরিশেষে বলতেই হয় যে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা বিচারবিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। বিচারবিভাগীয় এই রূপরেখাটি স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

Establishment of the so-called legitimate Neo- Darbari State in India after 1858

মহাবিদ্রোহের পূর্বে দরবারী বা দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই বিশেষ করে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রতক্ষ শাসনব্যবস্থার যাবতীয় দ্বায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো। উক্ত সময়ের ভারতবর্ষের প্রায় ৬০ শতাংশ ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষ্য ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাকি অংশের বিভিন্ন স্বায়ত্ব শাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ দরবারী শাসনব্যবস্তা কায়েম ছিল এবং দেশীয় রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। পূরণ চাঁদ যোশী তাঁর লেখা প্রবন্ধে ব্যাক্ত করেছেন, কিভাবে কিছু দেশীয় রাজ্যের রাজারা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের পশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জন ব্রস নটন তাঁর লেখা *'Topic for Indian Statesmen'* গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন, যদি হায়দ্রাবাদের অভ্যুত্থান ঘটতো তাহলে আমাদের দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরতো। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের প্রতি তাদের আস্থা ও অনুগত্য অবিচল রেখেছিলেন। রাজস্থানের দেশীয় রাজা নিজের সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য দানে সানন্দে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। মধ্য ভারতের প্রতাপশালী রাজা সিন্ধিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয় মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। আবার পাঞ্জাবের ঝিন্দ ও পাতিয়ালার রাজারা এবং কর্নালের নবাবও ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন। যেজন্য বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যগুলোকে সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল যে, এই দরবারী রাজ্যগুলোকে এখন থেকে আর জয় করা হবে না। অন্যদিকে রাজ্যগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্ত করা হবে। ১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং

ঘোষণা করেছিলেন যে, মহারানী ভিক্টোরিয়াই সমগ্র ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি এবং এই সম্পর্কে কোনো বিরূপ প্রশ্নের অবকাশ নেই। ১৮৭৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের উপর তাঁর ক্ষমতা আরোপিত হয়েছিল।

এই ঘোষণার দরুন দরবারী তথা দেশীয় রাজ্যগুলো সম্রাজ্ঞীর অধীনস্ত সামন্ত রাজ্যে বা করদ রাজ্যে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলো। মূলত প্রজাবিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই ব্রিটিশরা বন্ধুত্ব পূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদের এই কূটনৈতিক নীতির মাধ্যমেই দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল। ভারতের দেশীয় বা দরবারী রাজ্যগুলোকে মূলত দুটো ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে। উক্ত সময়ে ছোট বড় রাজ্য মিলিয়ে পাঁচশো টির অধিক দরবারী বা দেশীয় রাজ্য ছিল। প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল একশো আঠারো টির মতো। বাকি রাজ্যগুলো ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য। রাজ্যের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও একাধিপত্য কেন্দ্রীভূত হতো রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক ও তাঁর নিকট আত্মীয়দের হাতে। এই সমস্ত রাজ্যগুলোর বিভিন্ন ধরণের আয়তনে পরিব্যাপ্ত ছিল। বৃহদায়তনের দরবারী রাজ্য ছিল হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশুর, বরোদা প্রভৃতি। দেশীয় রাজ্যের রাজারা ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। প্রথম শ্রেণীর রাজ্যের রাজা ভারতের রাজধানিতে এলে ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ বন্দুক স্যালুটের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করতেন। গান স্যালুট বা তোপধ্বনির সংখ্যা নির্ভর করতো দেশীয় রাজাদের রাজকোষের আর্থিক সচ্ছলতার উপর, বংশ কৌলিন্যের উপর কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের উপর নির্ভর করে। তবে সিংহাসনের উত্তরাধিকার, সামরিক ও বেসামরিক পদে নিয়োগ সহ শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরেই ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ আইনসিদ্ধ ছিল। এর বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের বৈদেশিক আক্রমণ তথা অভ্যন্তরীন গোলযোগের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রায় সমস্ত রকমের ক্ষমতা হারিয়ে ব্রিটিশ শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আর্থিক দুরাবস্থা ছিল মারাত্মক। প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসিত রাজ্যের প্রজাদের চাইতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আর্থিক ভাবে করের বোঝা বেশি ছিল। প্রজাদের থেকে আদায়কৃত অর্থ দিয়ে শাসকগণ নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। হায়দ্রাবাদের পূর্ণাঙ্গ শাসক থেকে শুরু করে কাথিয়াওয়ারের একটি ক্ষুদ্র রাজত্বের প্রধান পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন মুদ্রা ব্যবস্থা থাকতো। কিছু রাজ্যের নিজস্ব আইন প্রণয়নের অধিকার থাকতো এবং তাদের প্রজাদের উপরও জীবন ও মৃত্যুর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়োজিত থাকতো। কিছু রাজ্যের সীমাহীন ক্ষমতা আবার কিছু রাজ্যের ক্ষমতার লেশমাত্র থাকতো যে কারণে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট লেখেন "... therefore originated the idea that rulers who enjoy full powers of internal administration should be separated from those rulers whose power are limited or in some cases next to nothing".

কিছু দেশীয় রাজাদের ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তি এত অফুরন্ত ছিল তাতে করে যে কোনো রূপকথার গল্পকেও হার মানিয়ে দেবে। ধনসম্পত্তির দিক থেকে সবথেকে ধনবান ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর স্যার মীর উসমান আলি খান সিদ্দিকি। কথিত আছে তিরিশের দশকে তার মোট সম্পত্তির পরিমান ছিল দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের তিনি ২৫ লক্ষ পাউন্ড অর্থ মূল্য দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়া ১৮৫ ক্যারেট প্রকান্ড এক হিরে পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করতেন। প্রিন্সেস এলিজাবেথকে তার বিয়ে উপলক্ষে হীরা, টায়রা খচিত একটি হার উপহার দেন এটি হায়দ্রাবাদের নিজামের হার নামে পরিচিত। মহীশুরের রাজা পাক্কা এক টন সোনা দিয়ে বানানো এক রাজাসন ব্যবহার করতেন। পাতিয়ালার মহারাজার ছিল হিরে মুক্তা বসানো এক বর্ম। তিন হাজারের রত্ন বসানো ভারতপুরের রাজার পাগড়ী দেখলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম হিরে "ষ্টার অফ দি সাউথ" ছিল বারোদার মহারাজের অধীনে।

উত্তর পূর্ব ভারতের ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকা করেছিল কোচবিহার রাজ্যটি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পূর্ব ভারতের সব থেকে জমকালো রাজপ্রাসাদ হিসেবে এই রাজ্যের গরিমা ছিল দিগন্ত বিসতৃত। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে এই রাজ্যটির পত্তন হয়েছিল ব্রিটিশ সংশ্রবের প্রভাবেই। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের শাসনকালে তার আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই ব্রিটিশ সংশ্রবের ফল। নৃপেন্দ্র নারায়ণ কে আধুনিক পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। ফলে এই সুমহান কর্মের প্রভাবেই কুসংস্কারাছন্ন কোচ রাজ্যকে নতুন আলোয় আলোকিত করবার দিশা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। সেজন্য আধুনিক কোচবিহারের জনক হিসেবে নৃপেন্দ্র নারায়ণকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাকে উত্তর পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ট নৃপতির আক্ষায় অভিষিক্ত করা হয়ে থাকে।

সাধারণত বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশদের মনে এই বিশ্বাস উদয় হয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে গণবিদ্রোহ সংঘটিত হলে বন্ধু হিসেবে দেশীয় রাজারাই সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসবে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব ভারও ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল। এমনকি ভারতবর্ষ ব্যাপী যখন তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলো ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে পশে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের রাজ্যে যে কোন ধরণের গণ অভ্যুত্থান দমনের ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। পি. ই. রবার্টস এর মতে, দেশীয় রাজ্যগুলো ছিল "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা প্রাচীর" জওহরলাল নেহেরুর মতে "দেশীয় রাজ্যের রাজারা হচ্ছেন ঘরের শত্রু বিভীষণ" মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন "ভারতীয় পোশাক পরিহিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী".

কিছু প্রতাপশালী দেশীয় রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীন স্বশাসন বা নিজস্ব দেশীয় শাসন বজায় ছিল তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল, নিজস্ব টাঁকশাল ছিল যেখান থেকে মুদ্রা ছাপানোর ব্যবস্থা থাকতো এবং অভ্যন্তরীন বিষয়ে বেশ ভালো রকমের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল। বিংশ শতকে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করবার বহুরকমের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এরই পেক্ষাপটে ১৯২১ সালে তারা চেম্বার অফ প্রিন্সেস নামের একটি পরামর্শমূলক উপদেষ্টার পদ তৈরী করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে নিয়ে এসে ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা

করা হয়েছিল কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পায় নি। দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। তাদের ধারণা ছিল, ক্রিপ্স মিশনের প্রস্তাব ভারতের ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতিকে অস্বীকার করেছে। দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা ভারতের বল্কানিকরণের পথ সুগম করবে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাদের ধারণা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর মত দেশীয় রাজ্যসমূহকে একই শর্তে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যোগদান করতে হবে।

উক্ত সময়ে দেশীয় রাজ্যের রাজারা ছিলেন বিভ্রান্ত এবং কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করাও ছিল কষ্টসাধ্য। কোন কোন রাজ্য যেমন বিকানির ও জওহর আদর্শগত ও দেশপ্রেমের কারণে স্বাধীন ভারতে যোগদান করতে ইচ্ছ প্রকাশ করেন। বহু দেশীয় রাজ্যের ধারণা ছিল যে তারা তাদের ইচ্ছামত ভারত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারবে, অথবা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে অথবা অন্যান্ন দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে একযোগে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্গত হতে পারে। ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদ ঘোষণা করে তারা ভারত বা পাকিস্তান কোন পক্ষই অবলম্বন করবেন না । হায়দ্রাবাদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে নিজের বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং সমুদ্রপথে

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পর্তুগালের কাছ থেকে গোয়া কেনা বা ভাড়া নেওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করে। থোরিয়াম সম্ভারের জন্য ত্রিবাঙ্কুর তার কৌশলগত গুরুত্বের উল্লেখ করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দাবি করতে থাকে। কিছু কিছু রাজ্য সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে উপমহাদেশে ভারত বা পাকিস্তানের বিকল্প একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। ভূপাল অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম লিগের সাথে সমঝোতা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভারতে যোগদানের চাপকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সিংহভাগ রাজ্যের রাজারা ছিলেন চরম সুবিধাবাদী এবং তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে বড় রাজ্যগুলো রক্ষা করবে এই বিশ্বাস কারুর ছিল না। হিন্দু রাজারা মুসলিম শাসকদের বিশ্বাস করতেন না। বিশেষ করে ভূপালের নবাব হামিদুল্লাহ্ খানকে পাকিস্তানের গুপ্তচর ভাবা হতো। অনেক রাজ্য আবার ভারতে অন্তর্ভুক্তিকে ভবিতব্য মনে করে কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে এই আশায় যদি কোনো উপায়ে বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায়। যে রাজ্যগুলো ভেবেছিল জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিম লিগের সাহায্যে কংগ্রেসের ভারতে অন্তর্ভুক্তির চাপকে প্রতিহত করতে পারবে, মুসলিম লিগ গণপরিষদে যোগ না দেওয়ায় সে আশা ভেঙে যায়। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ গণপরিষদে বরোদা, বিকানির, কোচিন, গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর, পাটিয়ালা ও রেওয়া যোগ দিলে একযোগে গণপরিষদ বয়কটের পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। বহু দেশীয় রাজ্যেই রাজা স্বাধীনতার পক্ষে হলেও প্রজারা তাদের রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিল। ত্রিবাঙ্কুরে দেওয়ান সি. পি রামস্বামীকে খুনের চেষ্টা হলে ত্রিনাঙ্কুরের রাজা স্বাধীনতার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কিছু কিছু রাজ্যের দেওয়ান অথবা মুখ্যমন্ত্রী রাজাকে বুঝিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে রাজি করান। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুত লর্ড মাউন্টব্যাটেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভি.পি. মেনন - প্রমুখেরাই মুখ্য ভূমিকা রাখেন। পরবর্তী দুইজন রাজ্যবিভাগের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন, যা দেশীয় রাজ্যসমূহের সাথে সম্পর্কে ভূমিকা রাখে।

বহদূর বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসন, দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর নিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য শর্ত দেশীয় রাজ্যের অধিপতিদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে সমর্থনের অভাববোধ অনুভব করা এই অধিপতিরা এইসকল কারণে ও অভ্যন্তরীণ চাপে একীভূত হওয়ার প্রতি এগিয়ে আসেন। মে, ১৯৪৭ থেকে ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক রাজ্য একীভূতকরণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিছু রাজ্য তখনও স্বাক্ষর করেনি। কিছু রাজ্য এমনিতেই স্বাক্ষরে দেরি করে। পিপলোদা, কেন্দ্রীয় ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্যন্ত একীভূত হয়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যোধপুর, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর। যোধপুর পাকিস্তানের সাথে একীভূত হতেই আগ্রহী ছিল; জুনাগড় বস্তুত পাকিস্তানের সাথে একীভূত হতে সম্মত হয়নি। এছাড়া হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর স্বাধীন থাকতেই চেয়েছিল।

একত্রীকরণের দলিল অনুযায়ী কেবলমাত্র তিনটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকারের হাতে সমর্পণের মাধ্যমেই তারা ভিন্ন ধরণের প্রশাসন ও শাসনাধীন একটি অপেক্ষাকৃত দূর্বল রাজ্যে, তথা একত্রীত ভারতের অংশে পরিণত হয়। রাজনৈতিক একত্রীকরণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদেরকে, ভারতের প্রতি তাদের আনুগত্য, প্রত্যাশা, এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাধ্য করবার প্রয়োজন ছিল। এই কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। যেমন মাইশোরের বিধানিক শাসন ব্যবস্থা একটি বিস্তৃত ভোটাধিকারের ভিত্তিশীল ছিল, যা ব্রিটিশ ভারতের ব্যবস্থার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন ছিল না। অন্যান্য স্থানে, রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণের ঘটনাগুলো ক্ষুদ্র ও অভিজাত চক্রের মধ্যেই সীমিত ছিল। সেইসাথে এর শাসন ব্যবস্থাও ক্ষণজীবী ও তোষামুদি ঘরানার ছিল। দেশীয় রাজ্যের একত্রীকরণের এইসব নানাবিধ ঝামেলা এড়ানোর জন্য ভারত সরকার

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ কলোনীভুক্ত প্রদেশগুলোতে একটিমাত্র প্রজাতন্ত্রী সংবিধান প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫) সহায়ক গ্রন্থ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. রাধারমন চক্রবর্তী - *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন*

2. ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ের - *ফ্রিডম এট মিডনাইট*

3. Judith M. Brown -*Gandhi's Rise to Power: Indian Politics 1915-1922.*

4. Romesh Chunder Dutta - *The economic history of India, Vols-II*

5. Amales Tripathi -*Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833.*

6. Anil Kumar Sarkar -*British Paramountcy and The Coach Behar State*

7. সমর কুমার মল্লিক - *আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর*

8. অনাদি কুমার মহাপাত্র- *ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন*

9. সুমিত সরকার- *আধুনিক ভারত -১৮৮৫-১৯৪৭*

10. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস*

11. Bipin Chandra- *Rise and Growth of Economic Nationalism in India*

12. Smt. N. K. Majumdar- *Justice and Politics in Bengal*

13. K N Raj- *Indian Economic Growth: Performance and Prospect.*

14. V. P. Varma, *Modern India Political Thought*

15. Jawaharlal Nehru- *The Discovery of India*

16. Luigi Sturzo-*Nationalism and Internationalism*

17. Ivan Timofeevich Frolov- *Dictionary of Philosophy,*

৬) নমুনা প্রশ্নাবলী

১) Describe the rise of Neo Darbari State in Company rule.

২) Discuss the Legal reformation by the East India Company.

৩) What was the concept of State by Gandhi, Tagore or Nehru?

৫.৩.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss the consequences of the periodic settlements.
2. How do you explain increase in the cultivation of export crops during the colonial period?
3. Analyse different aspects in the organization of production of export commodities.

হাতে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা কৃষিতে গতি আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া ফসল ফলার সাথে সাথে তারা পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী কম দামে ব্যবসায়ী বা মহাজনের কাছে ফসল, বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। ভারতের কৃষিতে ফসলের বাজার, ঋণের বাজার ও জমির বাজারের, মধ্যে একটা সংযুক্তির সৃষ্টি হয়। খাজনা, সুদ ও দামের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের হার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় বাণিজ্যিকীকরণ কৃষিতে গতিশীলতা এনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে সমৃদ্ধ করবে তা সম্ভব ছিল না। তবে অবশ্যই ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিকীকরণ সুফল দিতে কার্পণ্য করেনি। কৃষির বাণিজ্যিকীকরনের ফলে ও জমির বাজার তৈরি হওয়ায় জমির হস্তান্তর দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। ঋণগ্রস্ত কৃষককুল বহু জায়গায় মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়। শেষে বন্ধকী জমি হারিয়ে খাজনায় বা ভাগে জমি নেয়। ডেভিড ওয়াশব্রুক, নীল চালর্সওয়ার্থ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই ছিল মহাজন, কোন বাইরের লোক নয়। এরা শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। তবে এ ব্যাপারে অঞ্চল ভেদে পার্থক্য দেখা যায়। বহিরাগত (‘দিকু’) মহাজন, বানিয়া ও নানা ধরনের ঠিকাদারও গ্রামীণ কৃষি সম্পর্ককে জটিল করে।

উপরের আলোচনা থেকে যে ব্যাপারগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলি হল ঔপনিবেশিক ভারতে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যে বিকাশ ঘটেছিল, তা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রেখেই হয়েছিল। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাড়িয়ে সম্পদের নির্গমনের তাগিদ প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় থেকেছে ভারতে বেনিয়া ও মহাজনী পুঁজির প্রাধান্য বজায় রেখে। বড় ও মধ্যচাষীরা বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়। কিন্তু সাধারণ ও প্রান্তিক চাষীরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাপে পড়ে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। রপ্তানি পণ্য বা বাণিজ্যিক পণ্যের দামবৃদ্ধির সুযোগ অনেক ক্ষেত্রেই তারা পেত না। যাইহোক, রপ্তানির জন্য কৃষিপণ্যের ব্যাপক উৎপাদন কৃষিকে বাজারের উপর অধিক নির্ভরশীল করে তোলে ও বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তন আসে, যা কৃষি সম্পর্কগুলিকে প্রভাবিত করে।

৫.৩.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Kumar, Dharma ঃ The Cambridge Economic History of India, Vol. II (Delhi-1982)
2. Blyn, George ঃ Agricultural trends in India, 1891-1946
3. ভট্টাচার্য সব্যসাবী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৯৮৭)

দেখা যায় এরাই চাষীকে তুলা চাষ করতে আগাম দেয়, উৎপাদিত তুলো বাজার জাত করে, পণ্যের দাম নির্ধারণ করে, চাষীকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ দেয়। এই উদাহরণ থেকে এটা দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক কৃষি পণ্যের বাণিজ্যের প্রক্রিয়ায় কৃষকের পরাধীনতা বিভিন্নভাবে বাড়ে। উৎপাদনের বিনিয়োগের জন্য অগ্রিম, রাজস্ব বা জীবনধারনের জন্য ঋণ, পণ্য বাজারজাত করার জন্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর নির্ভরতা—এই রকম বিভিন্নভাবে কৃষকরা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে ধনী চাষীরাও মহাজনের ভূমিকায় নেমে পড়ে। অন্যদিকে সাধারণ কৃষকরা রাজস্বের চাপে, বা ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে বাণিজ্যিক ফসলের চাষে বাধ্য হয়। অনেকের মতে সাধারণ বা গরীব চাষীদের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কোন স্বেচ্ছা প্রণোদিত, স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয় বরং বাধ্যবাধকতার ফসল (forced commercialisation)।

যাইহোক বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের আরও দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে — আঞ্চলিক বিশেষীকরণ এবং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার। রেলপথ সম্প্রসারণের সাথে সাথে সীমিতমাত্রায় হলেও ভারতের কৃষিতে আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ঘটে। এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণ আবার কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ভারতের এক একটা অঞ্চলে জলবায়ু অনুযায়ী কৃষকরা এক এক ধরনের শস্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। যেমন দক্ষিণ ভারতে আগ্নেয়শিলাজাত কালোমাটির অঞ্চল লম্বা আঁশযুক্ত তুলো চাষের উপযোগী। ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পে এই ধরনের তুলো থেকে তৈরি সুতোর চাহিদাই বেশি ছিল। দক্ষিণ ভারতে চাষীরা আগে গম, বাজরার সাথে কিছুটা তুলোও উৎপাদন করত। রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় ও ইংল্যাণ্ডের তুলোর চাহিদা মেটাতে এখানকার কৃষকরা তুলো উৎপাদনে বিশেষীকরণ করে বা করতে বাধ্য হয়। তুলো বিক্রির টাকায় তারা খাদ্যশস্য কিনত। এর ফলে খাদ্যশস্যেরও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়। খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রি করার তাগিদ বাড়ে। আঞ্চলিক বিশেষীকরণ বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এটি আবার কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের পথ সুগম করে। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি উৎপাদনের উন্নতির জন্য কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়া হয় — এগুলির মধ্যে ছিল কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি বিভাগ স্থাপন প্রভৃতি। আলোচ্য সময়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় কৃষি বিভাগ গঠিত হয় (১৯০৬)। কৃষি বিভাগ, তুলা, আখ, গম প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উচ্চফলনশীল বীজ প্রবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

শস্য রপ্তানি ভারতের কৃষককে বাজারমুখী করেছিল। বিভিন্ন ফসলের দাম বাড়া কমার সাথে আবাদী জমির ব্যবহারের (land utilisation) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এটা কৃষি উৎপাদনে বাজারের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দিকটি স্পষ্ট করে। তবে এই ব্যাপারটি সমগ্র কৃষককুলকে-সমৃদ্ধ করেনি। ভারতের রপ্তানিজাত শস্য উৎপাদক চাষীরা ছিল প্রধানত ক্ষুদ্র কৃষক বা প্রান্তিক চাষী, যারা প্রায়ই মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সুদ ও দাদন ব্যবস্থার জালে জড়িয়ে থাকত। খাজনা ও সুদ মিটিয়ে তাদের

১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সময়কালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তুলো, বাংলায় পাট, উত্তর প্রদেশে চিনির জন্য আখ, মাদ্রাজে চিনা বাদামের উৎপাদন বিস্তারলাভ করে। এগুলি মূলতঃ বাজারজাত করার জন্যই চাষ করা হয় বলে, এগুলিকে অনেক সময় নগদী ফসল বা Cash crop বলা হয়। তবে কৃষিপণ্যের বাজার এই Cash crop মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না — খাদ্যশস্যও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। অকৃষি সম্প্রদায় থেকে শুরু করে নগদা ফসলের উৎপাদনকারীরাও খাদ্যশস্যের জন্য বাজারের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হতো। ১৮৬০-র দশকে চাল ও গম রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭০-র দশকের মধ্যবর্তী সময়কালে প্রতি বছর প্রায় ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের খাদ্য সরবরাহ সুরক্ষিত করতে খাদ্যশস্যের রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছিল। যাইহোক রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপেক্ষা নগদা ফসলের উৎপাদনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সরকারি হিসাবে মোটামুটি দেখা যায় যে, বর্মাসহ ব্রিটিশ ভারতে ১৯০১-৩৭ সময়কালে খাদ্যশস্যের আবাদ করা জমির এলাকা বেড়েছে মাত্র ১৬%, অন্যদিকে নগদা ফসলের আবাদী এলাকা বেড়েছে অনেক বেশি হারে — যেমন আখ চাষে ৬৯%, তুলা চাষে ৫৯% তৈলবীজ চাষে ৩৬%। পাট চাষের আবাদী জমি ১৪% হারে বৃদ্ধি পায় — এর কারণ ছিল পাট সর্বভারতীয় ফসল ছিল না। এর উৎপাদন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধ্যাপক George Blyn তাঁর Agricultural trends in India, 1891-1946 গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৮৯১-১৯৪৬ সময়কালে নগদা ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি দশকে ১৩% মতন, যেখানে মোট খাদ্যশস্যে বৃদ্ধির হার দশকে মাত্র ১%। তাছাড়া একর প্রতি উৎপাদনের হারও খাদ্যশস্য অপেক্ষা নগদা শস্যে বেশি ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে অধিক বিনিয়োগ নগদা শস্যেই বেশি হয়েছিল।

এবারে আমরা রপ্তানির জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার কয়েকটি দিকের উপর আলোচনা করতে পারি। নগদ টাকায় রাজস্ব দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে জমি থেকে অধিক আয়ের জন্য, বাণিজ্যিক শস্য চাষে কৃষকরা উদ্যোগী হতে থাকে। কিন্তু এরজন্য বেশি অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল — যা অনেক সময়ই কৃষকদের হাতে থাকত না। ফলে তারা মহাজনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হতো। আবাদের জন্য ঋণ (production loan) ছাড়াও মহাজনরা কৃষকদের জীবন ধারনের জন্য ঋণ (Consumption loan) দিত। এই ধরনের ঋণের সুদ ২০০ থেকে ৩০০% পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় মহাজনরা ঋণ দানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের উপর দাবিও করতে পারত। রপ্তানির পণ্য উৎপাদন করলেও চাষীর পক্ষে সরাসরি পণ্য নিয়ে বাজারে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে তাকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হতো। অর্থাৎ রপ্তানির জন্য কৃষক উৎপাদন করলেও তার লাভ সে খুব একটা পেত না — সচ্ছল চাষী, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীই লাভের বেশির ভাগ অংশ গ্রহণ করতো।

বস্তুত দেখা গেছে রপ্তানি উপযোগী কৃষি পণ্যের বাজার বাড়ার সাথে সাথে এই ধরনের কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী ও মহাজনি পুঁজির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে এবং সেখানে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণ বিধির চাপে ব্রিটিশ কোম্পানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য কৃষিজ পণ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। রপ্তানির জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৮৩০ সালের পর বাংলায় পাট চাষ বৃদ্ধি পায়। একই কারণে দাক্ষিণাত্যে তুলাচাষেরও বিস্তার লাভ ঘটে। ১৮৪০-র পরবর্তী সময়ে ভারতে কিছু বিদেশি জাতের তুলার উৎপাদনে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৮৫০-র পরবর্তী সময়কালে ভারতে রেলপথের সম্প্রসারণ হলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। রেলপথের মাধ্যমে ভারতের গ্রামীণ এলাকাগুলি বন্দরগুলির সাথে যুক্ত হয়। এর পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবহণের উন্নতি ও পরিবহণ ব্যয় কমে গেলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বহির্মুখী প্রবাহ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৪) ভারত থেকে কাঁচা তুলার রপ্তানির আয়তন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ বস্ত্র উৎপাদন কারীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা তুলার বড় অংশ আমেরিকার কাছ থেকে পেত। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের কারণে, সেখান থেকে তুলা রপ্তানি কমে গেলে, ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতীয় তুলার উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। D.R. Gadgil, তাঁর Industrial Evolution of India গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ব্রিটেনে ভারতীয় তুলার রপ্তানি আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে তুলার মূল্যও প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তুলা রপ্তানি আবার পূর্বের স্বাভাবিক স্তরে নেমে আসে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে তুলার মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি পায় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুলার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। এর পরের বছরগুলিতে তুলা ভারত থেকে রপ্তানিকৃত কৃষিপণ্যগুলির মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করে থাকে। ১৯২৯-র মহামন্দার সময় তুলার রপ্তানির পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। রপ্তানি মূল্যও হ্রাস পাওয়ায় ১৯২৫-২৬ সাল থেকে ১৯৩৩-৩৪ সালের মধ্যে কাঁচা তুলা রপ্তানি থেকে আয় ৭৫% হ্রাস পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শস্য উৎপাদনের জন্য অধিক জমি ব্যবহার করার জন্য তুলার উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ কাঁচা তুলার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১.৬ লক্ষ টন, যার মূল্য ছিল ২২.৬ কোটি টাকা। তুলার ব্যাপারটি থেকেই বোঝা যায় যে, ভারত বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে ঔপনিবেশিক সরকার যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সরকারি করনীতির দ্বারা কৃষিপণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হয়। কৃষিদ্রব্যের রপ্তানিশুল্ক খুব কম রাখা হয় ও ঊনবিংশ শতকের শেষে চাল ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রধান কৃষিপণ্য বিনাশুল্কে রপ্তানি হতো। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আবার বিভিন্ন সময়ে কাঁচা চামড়া, পাট ও চা, তুলো ইত্যাদির উপর রপ্তানি শুল্ক বসানো হয়। করনীতি ছাড়াও ঔপনিবেশিক আমলে রেলপথের বিন্যাস কৃষিপণ্যের রপ্তানিকে সুগম করে। রেলভাড়া এমনভাবে নির্ধারিত হয়, যাতে কাঁচামাল সস্তায় শহরে বা বন্দরে পৌঁছাতে পারে। এই সব ব্যাপারগুলি কৃষি পণ্যের রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করে।

গড়ে একর প্রতি ছিল ২.৬২ টাকা। কিন্তু এতে লাভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন সাধারণ কৃষকদের হয়নি- লাভবান হয়েছিল ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্ব ভোগী সম্প্রদায়। আর তাদের লাভের সাথে কৃষির উন্নয়ন বা কৃষিতে বিনিয়োগের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না। যাইহোক, অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলি কৃষির প্রসার, উৎপাদন ও রায়তদের জীবন যাত্রার মানকে ব্যাহত করেছিল, যার প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে।

৫.৩.২.২ : কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ

রপ্তানিকৃত কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নূতন উপাদান সমূহের আবির্ভাব :

রপ্তানিকৃত কৃষি পণ্যের (export crops) উৎপাদন বৃদ্ধি ও এগুলির উৎপাদন প্রক্রিয়ার (organization & production) ক্ষেত্রে নূতন উপাদানসমূহের উপস্থিতির ব্যাপারগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি দ্রব্য বাজারে আসত, যা অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। সপ্তদশ শতক থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ইউরোপের সাথে যে বাণিজ্য হতো, তাতে মূলতঃ কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হতো। তবে রঞ্জক নীলের মতো কয়েকটি কৃষিপণ্যও রপ্তানি হতো। সুতরাং প্রাক-ব্রিটিশ যুগে রপ্তানির জন্য কৃষি পণ্য যে উৎপাদিত হতো না তা নয়। কিন্তু উনিশ শতক থেকে বিপুল পরিমাণে কৃষিপণ্য রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য উৎপাদিত হতে থাকে, ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। আগের যুগের তুলনায় শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য নয়, রপ্তানিকৃত কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও কিন্তু নূতন উপাদানের সংযোজন ঘটে। আর সামগ্রিক ব্যাপারটিই ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকার্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটায় ঔপনিবেশিক ভারত থেকে কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে হয়— এটা ছিল ভারতের ঔপনিবেশিক বাধ্যবাধকতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতকে কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটাতে হয়। কৃষিপণ্য রপ্তানির বাজার যত বাড়তে থাকে, বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া তত ত্বরান্বিত হয়। কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পদ বহির্গমনের ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি করে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা হতো, যার মাধ্যমে ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদ নির্গমনের পথ প্রশস্ত করা হতো। সুতরাং সম্পদ নির্গমনের স্বার্থে কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

ঔপনিবেশিক যুগের বহু আগে থেকেই ভারতে নানা ধরনের উন্নত মানের তৈলবীজ, তুলা, পাট, মশলা, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় কৃষিজ পণ্যাদির রপ্তানির যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এই সময়

কৃষকরা শোষিত হবে-এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। তৎকালীন ভারতে ভূমি রাজস্ব ছিল রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস-ফলে ভারত থেকে ব্রিটেনে যে সম্পদ বহির্গমন হয়, তার বেশির ভাগটাই এসেছে-ভূমিরাজস্ব থেকে। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে রাজস্বের হার ছিল খুবই বেশি এবং প্রয়োজনে তা বাড়ানো যেত। এইসব অঞ্চলের কৃষকরা তাদের শস্য বেচার পাশাপাশি মহাজনের কাছে ঋণ নিয়েও সরকারের রাজস্ব মেটাতে বাধ্য হ'ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষিতে ঋণের বাজার ও কৃষি পণ্যের বাজারের মধ্যে এক ধরনের সংযুক্তি ঘটেছিল, ঋণের বাজারেও দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীরা ঋণদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ঋণদাতাদের কাছেই অনেক সময় কৃষকরা স্বল্প দামে কৃষি পণ্য বেচতে বাধ্য হ'ত। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপেরও একটা ভূমিকা ছিল। তুলো, নীল প্রভৃতি নগদ শস্যের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকরা প্ররোচিত হয়, এমনকি কোথাও বাধ্য হয়।

রায়তদের দুরবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়ার মধ্যে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন এলাকাগুলি অপেক্ষা অস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন এলাকাগুলিতে দুর্ভিক্ষের আধিক্য দেখা যায়। ১৮০২-৪, ১৮০৬-৭, ১৮১২-১৫, ১৮১৮-২০, ১৮২৩-২৬, ১৮৩০-৩২, ১৮৩৭, ১৮৫৪, ১৮৬০ - এই সব বছরগুলিতে রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মহারাণীর প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হবার প্রায় সাথে সাথেই উত্তর ভারতে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা যায় — ১৮৬০ সালে এই দুর্ভিক্ষের পর প্রথম দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত সরকারি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বেয়ার্ড স্মিথ দেখান যে অস্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব বেশি। তিনি এক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন, যাতে কৃষির আয়ের কিছুটা কৃষির উন্নতিতে নিয়োজিত হবে। নতুবা পরবর্তী বন্দোবস্তের সময় বর্ধিত রাজস্বের কারণে কেউ বিনিয়োগ করবে না। ভারত সচিব চার্লস উড নীতিগতভাবে স্মিথের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু স্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতির প্রবক্তারা সমালোচনা শুরু করেন। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে সরকারের আর্থিক অনটন দেখা যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ ছেড়ে দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষপর্যন্ত ভারত সচিব ঘোষণা করেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তই চালু থাকবে (১৮৮২)।

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রমেশচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা বাংলার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার দাবি করেন। এ ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের সাথে বড়লাট লর্ড কার্জনের বিতর্কও হয়। রমেশচন্দ্র দেখান যে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে কৃষির আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্বও বৃদ্ধি পেয়েছে— ফলে চাষির যতটা সুবিধা বেড়েছে তার থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে রাজস্বের চাপ। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষির কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এটা ঠিকই যে স্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে সরকারের কাছে, কৃষিজ আয় কম পরিমাণে যায়। ১৯৩৩-৩৪ সালের একটা হিসাব অনুযায়ী বাংলা প্রদেশে প্রতি একর আবাদী জমির উপর রাজস্ব ছিল ০.৯২ টাকা, যখন মাদ্রাজে রাজস্ব

পর্যায়ে খুব উঁচুহারে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া রাজস্ব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে বেশ ব্যবধান ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে প্রশাসনিক চাপ। রায়তওয়ারি ব্যবস্থার অন্যতম প্রবর্তক মুনরো চেয়েছিলেন রাজস্ব যেন অপরিবর্তনীয় থাকে — কারণ তা কৃষকের পক্ষে অনুকূল হবে। কৃষক চাষ করে যে লাভ অর্জন করবে, তা যাতে-নিষ্কাশিত না হয়ে যায় সেটাই মুনরোর কাম্য ছিল। কিন্তু মুনরোর বক্তব্য, অর্থাৎ রাজস্ব অপরিবর্তনীয় করে রাখার ব্যাপারটি কার্যকর করা হয়নি। ২০ বা ৩০ বছরের চুক্তি শেষে সরকার নূতন চুক্তি করার সময় রাজস্বের হারের পরিবর্তন করত। ফলে বেশির ভাগ সময়ে দেখা যেত যে, রাজস্ব পরিশোধের পর উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে কৃষকের হাতে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না, যা কৃষিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, ফসলের ক্ষতি হলেও রায়ত নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য থাকত। ১৮৭৮ সালে প্রচণ্ড খরা হওয়া সত্ত্বেও রায়তরা খাজনা প্রদানের হাত থেকে রেহাই পায়নি। রায়তের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার মতো বহু বৈশিষ্ট্য এই ভূমি ব্যবস্থায় ছিল। যেমন, সরকার ভূমি রাজস্বকে 'খাজনা' বলার পরিবর্তে এক ধরনের 'ভাড়া' বলে উল্লেখ করেন। ফলে জমির উপর রায়তের চিরাচরিত 'ভূমি-স্বত্ব'-র দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় মাদ্রাজে চাষের উন্নতি হয়নি, কৃষক-এরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি এবং রাজস্বের চাপও কমেনি, বরং বেড়েছে।

শেষোক্ত ব্যাপারটি সরকারের কাছে শুভ হয়েছিল। প্রয়োজনমত এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজস্বের হার পর্যালোচনা ও বৃদ্ধির সুযোগ থাকার ফলে সরকার জমি থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাছাড়া সরকারের সাথে রায়তদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে, প্রশাসনিক জটিলতা ও ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছিল। সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দুটি ক্ষেত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অপেক্ষা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এগিয়ে ছিল।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় আরেকটি দিক ছিল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অবসান। সরকার সরাসরি রায়তদের সাথে বন্দোবস্ত করায় মধ্যবর্তী শোষক জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। তবে রাজস্বের হার অধিক থাকার ফলে কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের মতে, রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে "চাষীই জমির মালিক" এই নীতি কার্যকর হয়নি। রায়তরা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিল যে, অনেকগুলি জমিদারের পরিবর্তে এক বৃহৎ জমিদার হিসাবে স্বয়ং সরকার আবির্ভূত হয়েছে। বোম্বাই-র বিভিন্ন প্রশাসনিক রিপোর্ট থেকে কৃষকদের উপর সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য যে অত্যাচার করা হত, তার বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষিতে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি, রাজস্বের হারও বাড়তে থাকায়, কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিরুৎসাহিত হয়। দেখা যায়, মোট জমির এক-তৃতীয়াংশের বেশি জমিতে চাষবাস হয় না। অস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের এই ত্রুটিগুলি মহলওয়ারি বন্দোবস্তেও ছিল।

বস্তুতঃ সব কটি ভূমিব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সাথে অস্থায়ীভাবে যুক্ত ছিল—সব কটি ব্যবস্থাই ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। প্রাক্-পুঁজিবাদী কৃষিকে ব্রিটিশদের স্বার্থে রাজস্বের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদায়

৫.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ফলাফল।

(২) কৃষির বাণিজ্যিকিকরণ।

(৩) রপ্তানীকৃত কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৪) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নূতন উপাদানসমূহের আবির্ভাব।

৫.৩.২.১ : অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ফলাফল

ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামীণ শ্রেণী সমাবেশ ও কৃষির অবস্থা বিচার করে, সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টায়, নানা জাতীয় ভূমিব্যবস্থার সূত্রপাত করে। এই সময়ে মোটামুটি তিনটি মূল ভূমি ব্যবস্থার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, - বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত ; মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ অস্থায়ী ৩০ বছরের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত, উত্তর ভারতে অস্থায়ী ৩০ বছরের মহলওয়ারি বন্দোবস্ত। অস্থায়ী মহলওয়ারি ব্যবস্থাকেই প্রয়োজনমত অদল বদল করে পাঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে প্রবর্তন করা হয়। বাংলার জমিদারদের মতোই, অযোধ্যার তালুকদারদের সাথে চুক্তি করা হয়, তবে এই চুক্তি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নয়, ৩০ বছরের জন্য করা হয়। বাংলার চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, ও উড়িষ্যায় প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশগুলিতে-সিন্ধু প্রদেশ, আসাম ইত্যাদি-রায়তওয়ারি বন্দোবস্তই অদল বদল করে প্রবর্তন করা হয়। সাধারণত অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি ৩০ বছরের হতো, কিন্তু অনগ্রসর প্রদেশে শীঘ্র আবাদ ও খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় ভূমিবন্দোবস্ত ২০ বছর অন্তর করা হতো। এর উদাহরণ হল পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে সারা ভারতের বৃহদাংশে অস্থায়ী বন্দোবস্তই চালু করা হয়। ১৯২৮-২৯ সালের একটি হিসাব আনুযায়ী দেখতে পাওয়া যায় যে মোট আবাদী জমির ১৯ শতাংশে জমিদারি, ২৯ শতাংশে মহলওয়ারী ও ৫২ শতাংশে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। এখন আমরা এই বিভিন্ন অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের ফলাফল নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে, সরকারি আমলাদের মধ্যে ও জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় প্রথম

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

Agrarian Settlements and Agrarian Production

একক - ২

(a) Consequences of periodic settlements

(b) Increase in the cultivation of export crops.
New elements in the organization of production of export commodities

---

বিন্যাস ক্রম :

৫.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

৫.৩.২.১ : অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ফলাফল

৫.৩.২.২ : কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

৫.৩.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.৩.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss the background of the introduction of the Permanent Settlement in Bengal.
2. Why did Lord Cornwallis introduce the Permanent Settlement? How far were his expectations fulfilled ?
3. Discuss the effects of the Permanent Settlement on different social classes of agrarian Bengal.
4. Analyse the circumstances leading to the introduction of the Ryotwari settlements.
5. What are the specific features of the Ryotwari and Mahalwari Settlements ?

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সমালোচিত হতে শুরু করলে, সরকার সনাতনী গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবনের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে। অযোধ্যার কিছু অংশ, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা এবং পাঞ্জাবে গ্রামীণ সমাজ সংহতি ও প্রশাসনিক ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে সরকার মনে করে। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ছোট বড় বিভিন্ন মহলে বিভক্ত ছিল। এখানে সরকার সরাসরি রায়তের সাথে চুক্তি না করে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে মহলের বা গ্রামের কর্তৃপক্ষের সাথে অস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করতে মনস্থ করে। অর্থাৎ গ্রাম বা মহালভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থার সাথে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের কিছু নীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মহলওয়ারি ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়, সেখানে রায়তের পরিবর্তে মহল বা গ্রাম বা গ্রাম সমষ্টিকে রাজস্বের জন্য দায়ী ধরে নিয়ে, তার সাথে ভূমিবন্দোবস্ত করা হবে।

মহলওয়ারি ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করেন হোলট্ ম্যাকেনজী, ১৮১৯ সালে তিনি একটি প্রতিবেদনে এই নূতন ধরনের মহলওয়ারি ভূমি ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। ১৮২২ সালে এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় ও পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল বেন্টিংকের সমর্থন ও রবার্ট বার্ড এবং জেমস টমসনের ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই বন্দোবস্ত চূড়ান্তরূপ পায়। উত্তর ভারতে ভূমিবন্দোবস্ত বোম্বাই-র তুলনায় অনেক বেশি জমি জরিপ, পরিসংখ্যান ও হিসাবের ভিত্তিতে রূপায়িত হয়েছিল। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট রাজস্ব মহলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ করে আদায় করা হত। Holt Mackenzie-র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৮২২ সালের যে রেগুলেশন (Regulation VII) জারী করে ‘মহলওয়ারি’ বন্দোবস্তকে বাস্তবায়িত করা হয়, তাতে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের সুপারিশ ছিল। স্থির হয়, ২০/৩০ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। এই সময়সীমার পরে আবার পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করা হবে। রাজস্ব হিসাবে নিট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ নেবার কথা বলা হয়। কিন্তু এটা খুব বেশি মনে হওয়ায় ১৮৫৫ সালে ঠিক করা হয় যে যেখানে ভূস্বামী খাজনা পায়, সেখানে খাজনার অর্ধেক এবং অন্যত্র নিট উৎপাদন মূল্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো, এখানেও নিট উৎপাদন মূল্য হিসাব করা সহজ ছিল না। ফলে পূর্বতন রাজস্বের হার, উৎপন্নের দাম, পার্শ্ববর্তী এলাকায় খাজনার হার ইত্যাদির সমন্বয়ে রাজস্ব নির্ধারিত হতে থাকে।

৫.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Kumar, Dharma ঃ The Cambridge Economic History of India, Vol II (Delhi, 1982)
2. Sinha, N. K.ঃ Economic History of Bengal Vol-II (Calcutta, 1965)
3. Mukherjee, Nilmoni ঃ The Ryotwari System in Madras, 1792-1827 (Calcutta, 1962)
4. ভট্টাচার্য সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৯৮৭)

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারলাভ করলে, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনার কথা ভাবা হয়। ১৭৯২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজের বড়ামহল অধিগ্রহণ করে। নব অধিকৃত অঞ্চলের শাসনদায়িত্ব গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্মচারী আলেকজাণ্ডার রীড, টমাস মুনরো প্রমুখ বড়মহল অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। এখানে সরাসরি রায়তদের সাথে বন্দোবস্ত প্রথা চালু ছিল। ক্যাপ্টেন রাও এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে বড়ামহল অঞ্চলে, ১৭৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে রায়তওয়ারি প্রথা চালু করেন। এরপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এই ব্যবস্থা কিছুটা পরিপূর্ণতা পায়। ১৮২০-২৭ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজের গভর্নর থাকাকালীন মুনরো ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল না, সেখানে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু করেন। দক্ষিণী ভূস্বামীশ্রেণী পলিগারদের ক্ষমতাচ্যুত করে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরাসরি কৃষকদের সাথে বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় রায়তগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে জমির উপর মালিকানা স্বত্ব পায়। সাধারণত ২০ বা ৩০ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হত। নির্দিষ্ট সময়ের পরে সরকার নূতন করে বন্দোবস্ত দিতে পারত। নূতন বন্দোবস্তের সময় সরকার রাজস্বের হারও বৃদ্ধি করতে পারত। রীডের ঘোষণাপত্রে নীট আয়ের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে ধরা হয়। তবে নীট আয়ের পরিমাণ জানা সহজ ছিল না। মুনরোর মতে, প্রথম দিকে রাজস্ব বড় উঁচু হারে ধরা হয়েছিল, বিশেষত, যেহেতু ফসল ও তার দামের বাড়া-কমার সাথে রাজস্বের তারতম্য হতো না। মুনরোর নিজের সুপারিশ ছিল রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। ১৮৬১ সালে ৩০ বছরের জন্য নয়া বন্দোবস্ত শুরু হয়। এখানে মোট কৃষিজ আয় থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে, যা থাকে তার অর্ধাংশকে রাজস্ব হিসাবে ধরা হয়।

মাদ্রাজের মতো বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথমে আর. কে. প্রিংগল ও পরে গোল্ড স্মিথ, জর্জ উহনগেট প্রমুখ বোম্বাইয়ে এই ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এখানে একই রাজস্ব তত্ত্ব গৃহীত হলেও প্রয়োগের সময় একটু অন্যভাবে হিসাবটা করা হয়। ১৮২৪-২৮ ও ১৮৩৫-৭২ সালে বিভিন্ন পর্যায়ে যে বন্দোবস্ত করা হয় তার মূল সূত্র উৎপাদন ও খরচের হিসাব নয়,— বিভিন্ন জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও পূর্বতন বন্দোবস্তে রাজস্ব হারকে ভিত্তি করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়। মাদ্রাজের মতো বোম্বাই-তেও বন্দোবস্ত ছিল অস্থায়ী—সাধারণত ৩০ বছরের জন্য।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের মতন অঞ্চলগুলিতে গ্রাম সংগঠনের অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মাদ্রাজে মুনরো কিংবা বোম্বাই-এ এলফিনস্টোন তৎকালীন গ্রাম সমাজের প্রশাসনিক কার্যকারিতার উপর জোর দিলেও, এগুলিকে এড়িয়ে রায়তের সাথে সরাসরি চুক্তির কথা বলেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনে গ্রাম সমাজের কোন জায়গাই থাকেনি। কিন্তু

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছাড়াও ছিল ইংল্যাণ্ডের উপযোগবাদী (utilitarian) অর্থনীতি ও শাসননীতির প্রভাব— অন্যভাবে বলতে গেলে ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) ও জন বেন্থাম (John Bentham)-র চিন্তাধারার প্রভাব। Eric Stokes তাঁর 'The English Utilitarians and India' গ্রন্থে এই দুই মনীষীর ভারতের সরকারি নীতির উপর প্রভাব আলোচনা করেছেন। বেন্থামের প্রভাব পড়েছিল মূলতঃ আইন ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণে, আর রিকার্ডোর প্রভাব ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ে। ১৮২১ প্রকাশিত Principles of Political Economy গ্রন্থে রিকার্ডো বলেন যে জমিদাররা খাজনা পায় জমির উপর মালিকানা স্বত্বের কারণে। জমিদাররা খাজনা সংগ্রহ করে, কিন্তু কৃষি উৎপাদনে তাদের ভূমিকা নগণ্য। রিকার্ডোর মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, পুঁজিপতি পুঁজি দেয়, উদ্যোগী ব্যবসাদার বা শিল্পপতি দেয় উদ্যোগ, শ্রমিক দেয় শ্রম। সুতরাং এইসব উৎপাদক শ্রেণীর উপর কর বসালে তাদের বিকাশ ব্যাহত হয় বা উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যেহেতু জমিদার উৎপাদনের জন্য কিছু করে না, জমির উপর মালিকানা স্বত্বের কারণে অনার্জিত আয় (Unearned income) গ্রহণ করে, তাই জমিদারের আয়ের উপর কর স্থাপন ভাল—কারণ এতে সরকারের আয় হয় ও অন্যদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরও চাপ পড়ে না। সুতরাং জমিদারের আয়ের উপর যতটা সম্ভব কর চাপানো ভাল-জমিদারি ব্যাপারটাই পুরো তুলে দেওয়াও যেতে পারে, কেননা এতে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় না। এই রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতি ভারতে ইংরেজ প্রশাসকদের প্রভাবিত করেছিল, যারা জমিদারদের বাদ দিয়ে ভূমি বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন।

ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের অনুগামীদের মতে, ভারতে রায়তদের উপর জমির স্বত্বাধিকার দিলে, রায়তরা নিজ স্বার্থেই উৎপাদন প্রসারে উদ্যোগী হবে — জমিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হলে ব্রিটেনে এর রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এ সবের ফলে একদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, ভারত থেকে শিল্প সমৃদ্ধ ব্রিটেনে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত হবে ও অন্যদিকে কৃষকদেরও ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, যা ব্রিটিশদের বাজার দখলের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবে। সুতরাং রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে জমিদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের সরিয়ে দিয়ে রায়তদের সাথেই সরাসরি চুক্তি তথা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত-র ধারণা সরকারি মহলে গুরুত্ব লাভ করে।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার জনক ছিলেন Thomas Munro. তিনি ও জেমস মিল, দুজনেই ছিলেন রিকার্ডো পন্থী। এরা ভারতের ভূমিব্যবস্থা থেকে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অপসারণ চেয়েছিলেন। কিন্তু, জমির মালিকানা রায়তদের হাতে থাকা উচিত না রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত। তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মুনরো রায়তদের স্বত্বাধিকার স্বীকার করতেন; কিন্তু জেমস মিল রাষ্ট্রের হাতে জমির মালিকানা রাখার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৮২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে মুনরো রায়তকেই প্রকৃত জমির মালিক বলে মনে করেন। জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রতি আস্থাই মুনরোকে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার প্রতি অনুগত করে তুলেছিল।

প্রথমেই বোঝা গিয়েছিল। ফলে জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে কোম্পানি অন্য ভূমিব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকার ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ গ্রহণ করেছিল, উনিশ শতকে আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের মাত্র ২৮ শতাংশ সরকার পেত। ১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারের প্রাপ্য ১৮.৫ শতাংশে নেমে যায়। ভূমি থেকে আয় সরকারি কোষাগারকে নয়, জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সমৃদ্ধ করেছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, সরকারের রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আর্থিক প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। ভূমি থেকে বর্ধিত আয়ের ভাগ সরকার পায়নি, সেজন্য সরকার এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ভারতে অন্যত্র করতে চায়নি।

তবে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করতে, সরকার জমিদারদের এ ব্যাপারে অবাধ কর্তৃত্ব দিতে দ্বিধা করেনি। ১৭৯৩ সালে ১৭ নং রেগুলেশন এবং ১৭৯৫ সালে ৩৫ নং রেগুলেশন জারী করে সরকার অনাদায়ী রায়তের সম্পত্তি দখল করার অধিকার জমিদারের হাতে তুলে দেয়। ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন (Regulation VII) দ্বারা জমিদারদের হাতে অনাদায়ী রায়তের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ এই আইনকে 'a blank cheque to the Zemindar' বলে বর্ণনা করেছেন। অনেক পরে ১৮৫৯ সালের দশম রেগুলেশন ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন জারী করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যাইহোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক নূতন জমিদারি ও জমিদারের আবির্ভাব হয়। এই নূতন জমিদারদের অনেকে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারি ও জমিদারি আমলা। আর্থিক লাভ ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য এরা ভূমিব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন—কৃষিতে বিনিয়োগ বা পুঁজিবাদী পরিবর্তন ঘটানো এদের উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও এদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালের বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, গ্রামীণ বাংলার আর্থিক পুনরুজ্জীবনে এরা উৎসাহী ছিলেন না। বাংলার কৃষকরা ক্রমবর্ধমান মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের শোষণের শিকার হয়েছিলেন।

৫.৩.১.৩ : রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থা

পটভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ :

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমন কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল, যা এই ব্যবস্থার প্রবক্তাদের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারেনি, তবে এই বন্দোবস্তের রূপায়ণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোম্পানি ভারতের অন্যান্য অংশের ভূমি বন্দোবস্তে স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবর্তী শ্রেণী বাদ দিয়ে সরাসরি রায়তের সাথে রাজস্ব চুক্তি ও স্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে ২০ বা ৩০ বছর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ, যাতে কৃষির প্রসার ও বাজার বৃদ্ধি পেলে সরকার বর্ধিত আয়ের একটা অংশ পেতে পারে। তবে এই নতুন চিন্তার পেছনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলির

বেশি পরিমাণে অর্থ আদায় করতে থাকেন। তাছাড়া জমি থেকে রাষ্ট্রের আয় নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, পরবর্তীকালে জমির উৎপাদন ও দাম কয়েকগুণ বাড়া সত্ত্বেও সরকার এই বর্ধিত আয়ের ভাগ পায়নি। জমিদাররা এই বর্ধিত, অনার্জিত আয় বৃদ্ধির (unearned increment of income) সুবিধা লাভ করেছিল। কর্ণওয়ালিস ধরে নিয়েছিলেন যে জমিদার স্থায়ী স্বত্ব পেলে, তারাও রায়তদের স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করবে। কিন্তু তা হয়নি। ১৭৯৩-র অষ্টম রেগুলেশনে কৃষকদের পাট্টা প্রদানের নির্দেশ থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। জমিদাররা পাট্টা প্রদান করে রায়তদের স্বত্বদানে ইচ্ছুক ছিলেন না। আবার রায়তরাও পাট্টা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না কারণ পাট্টা নিলে জমি জরিপ করতে হবে — সেক্ষেত্রে তাদের যে কিছু অতিরিক্ত জমি দখলে আছে তা ধরা পড়ে যাবে এবং হস্তচ্যুত হবে। এতে কৃষকরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Peter J. Marshall রায়তদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতাকে সমালোচনা করেছেন।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথম দিকের জমিদারদের পক্ষে শুভ হয়নি। কঠোর সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিদার ঠিক সময়ে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত। ফলে ১৭৯৩-১৮১৫ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশ জমিদারি হাত বদল হয়। পরবর্তীকালে জমির উৎপাদন ও দাম বৃদ্ধির ফলে জমিদারি অধিক লাভজনক হয়ে ওঠে এবং জমিদারির হাত বদলের হার কমে যায়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, জমিদারির আয় বাড়ার সাথে কৃষিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের হারের উন্নতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে দক্ষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কৃষির উন্নতিতে কমই মনোযোগ দিতেন বা বিনিয়োগ করতেন। অনেক সময় জমিদাররা নিজের জমিদারিতে উপস্থিতও থাকতেন না (absentee landlord), এই অবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হলে, কৃষকদের দুর্গতি আরও বাড়তে থাকে। Floud Commission-র মতে, চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় খাজনার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে যে ব্যবধান, এই দুই-র মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে- তারই ফলস্বরূপ জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হয়। অনেক সময় জমিদাররা নিজে দায়িত্ব না নিয়ে, খাজনা আদায়ের জন্য নিজ জমিদারিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একজন ব্যক্তির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছেড়ে দিতেন। এই খণ্ডিত অংশকে বলা হত 'পত্তনি' ও 'পত্তনি'-র অধিকারীকে 'পত্তনিদার'। জমিদারদের মতো এরাও বংশানুক্রমিকভাবে পত্তনি থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। পত্তনিগুলি আবার আরও খণ্ডিত হয়ে 'দর-পত্তনি', যেগুলি পুনরায় খণ্ডিত হয়ে 'দর-দর-পত্তনি' - তে পরিণত হতো। ১৮১৯ সালে সরকার আইন পাশ করে পত্তনি ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। পত্তনি ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়ে উনিশ শতকে চরম আকার নিয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে উত্তরোত্তর বিভিন্ন স্তরে, উপস্তরে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়, যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কৃষক-শোষণ করে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করা। আর যেহেতু সরকারকে দেয় রাজস্ব স্থির হয়ে গিয়েছিল, বর্ধিত খাজনার অংশ সরকার পেত না, যা বণ্টিত হতো বিভিন্ন স্তর, উপস্তরে অবস্থিত মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে। বস্তুত চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের এই পরিণতি ঊনবিংশ শতকের

প্রভাবশালী এই জমিদাররা তাদের আর্থিক লাভের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল থাকবেন, কোম্পানি আশা করেছিল যে, জমিদাররা অন্তত শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ রাজের সমর্থকে পরিণত হবে। পঞ্চমত, কোন সামাজিক শ্রেণী বা গোষ্ঠী জমিদারি পেলে তা নিয়ে কর্ণওয়ালিসের কোন মাথাব্যথা ছিল না। সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমিদার কোম্পানির নির্ধারিত রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলামের মাধ্যমে হাত বদল হয়ে যেত। এর ফলে আরও উদ্যোগী ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ জমিদারি ভোগ করবে, যারা রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হয়েছিল। সর্বোপরি, ১৭৭০-র কুখ্যাত মন্বন্তরে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে। আশা ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষবাসের প্রসার ঘটবে - ফলে রাজস্বও বাড়বে।

কর্ণওয়ালিসের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার সাথে পিটের ভারত-আইন ও পরিচালক সভার নির্দেশনামার (১৭৮৬) সাদৃশ্য থাকায়, এ ব্যাপারে সত্বর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৭৮৯ সালে বাংলা ও বিহারে এবং ১৭৯০ সালে উড়িষ্যায় দশ বছরের জন্য জমিদারদের জমি বন্দোবস্ত দেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ডিরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে এই 'দশসালা' বন্দোবস্তই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে বিবেচিত হবে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরী ডাণ্ডাস ও প্রধানমন্ত্রী পিটের অনুমোদনক্রমে পরিচালক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন। এরপর ১৯৯৩-র ২২ শে মার্চ কর্ণওয়ালিস এক 'রেগুলেশন' জারী করে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করেন। এই নির্দেশনামায় বলা হয় যে জমিদারগণ বংশানুক্রমিকভাবে জমির স্বত্ব ভোগদখল, দান বন্ধক বা বিক্রী করতে পারবেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি করে সরকারি প্রাপ্য আদায় করা হবে। মোট ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ পাবেন সরকার ও ১০ শতাংশ পাবেন জমিদারবর্গ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ও মূল্যায়ন ঃ

ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এর প্রভাবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, যেসব আশা করে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধারণভাবে পরিপূরিত হয় — জমিদারদের আনুগত্য, রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি উৎপাদনের প্রসার। কিন্তু অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হয়। Baden Powell-র মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের বহু প্রত্যাশাকে মিথ্যা করে এমন কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, যা অকল্পনীয়।

আপাতদৃষ্টিতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার ও সরকার উভয়ের কাছেই শুভ হয়েছিল। সরকার বার্ষিক ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হওয়ায় বার্ষিক বাজেট করা সম্ভব হয় ও তার অন্যান্য কার্যাবলীতে মনোনিবেশ করতে পারে। অন্যদিকে জমিদাররা দুভাবে লাভবান হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস জমিদারদের সাথে নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তি করে জমিদাররা কতটা রাজস্ব দেবেন তা স্থির করলেও রায়তরা কতটা পরিমাণ রাজস্ব জমিদারদের দেবেন, তা স্থির করেননি। ফলে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে

জমিদার একজন রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র। এই বিতর্কে শোরকে সমর্থন করেন কর্ণওয়ালিস। ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের ভিত্তি বছর ও রাজস্বের পরিমাণ নিয়েও শোর ও গ্রান্টের মধ্যে বিতর্ক চলে। এখানেও শোরের বক্তব্যকে কর্ণওয়ালিস সমর্থন করেন ও ১৭৮৮-৮৯ এবং ১৭৮৯-৯০ সালের রাজস্বের ভিত্তিতে নূতন বন্দোবস্তের কথা বলেন। তবে কর্ণওয়ালিস বন্দোবস্তের মেয়াদ সম্পর্কে শোরের সাথে একমত ছিলেন না। শোর আপাতত জমিদারদের সাথে কোন দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন — কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। শোরের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে লোকালয় ও চাষ বাড়লেও সরকার তা থেকে আয়বৃদ্ধি করতে পারবে না। তাছাড়া ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য নেই — এ অবস্থায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। কর্ণওয়ালিস অন্যদিকে মনে করতেন কোম্পানির হাতে যথেষ্ট তথ্য আছে এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলার কৃষিব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছিল, তা সামাল দিতে একটি স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে জমিদাররা জমিতে স্থায়ী স্বত্ব পেলে কৃষির পুনর্গঠনে যত্নবান হবেন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটবে, যাতে সামগ্রিকভাবে কোম্পানির লাভ হবে।

বস্তুত একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই ধরনের বন্দোবস্তই কর্ণওয়ালিস ও কোম্পানির কর্তাদের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল। প্রথমত, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করতে কোম্পানি ১৭৬৫ সাল থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু এতে সাফল্য না আসায় একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের কথা ভাবা হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করে জমিদার নিজ এলাকায় কৃষি উৎপাদন প্রসারে উদ্যোগী হবেন বলে আশা করা হয়েছিল। সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডে এমন অনেক জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষী 'কৃষি বিপ্লব'-র দ্বারা শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। কর্ণওয়ালিস মনে করেছিলেন জমিদারদের জমিতে স্থায়ী স্বার্থ তৈরি হলে, কৃষির উন্নতি হবে এবং যেহেতু বাংলায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কৃষির উন্নতি হলে শিল্পের উন্নতি হবে— সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। আর এর পরোক্ষ ফল হবে কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার কথা কর্ণওয়ালিস অবশ্যই ভেবেছিলেন। ডিরেক্টর সভাকে তিনি জানিয়েছিলেন যে জমিতে লাভের সুযোগ থাকলে কলকাতার ধনী বণিক ও মহাজনরা নিশ্চিতভাবে জমিতে বিনিয়োগ করবেন। তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্বের পরিমাণ বেঁধে রাখলে, ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়াবার ক্ষমতা কোম্পানি হারাবে ঠিকই, কিন্তু আপাতত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এটা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ ঐ রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকেই কোম্পানি এদেশের দ্রব্যাদি কিনে ইংলণ্ডে বেচে লাভ করতো। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয়, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির ঘাটতি মেটানো এবং চীনের বাণিজ্য বাবদও কোম্পানির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। কিন্তু প্রাক ১৭৯৩ সময়ে বাংলার রাজস্ব থেকে আয় ছিল অনিশ্চিত। ফলে বাজেট তৈরি করতে অসুবিধা হতো। কোম্পানির আয়কে সুনিশ্চিত করাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্থত, কোম্পানি একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত জমিদারদের রাজনৈতিক বন্ধু হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। যেহেতু সামাজিকভাবে

রাখা হয়। পাঁচ-সালা বন্দোবস্ত শেষ হলে (১৭৭৭), বাৎসরিক বন্দোবস্ত শুরু হয়; অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের সাথে চুক্তি করে, বিগত তিন বছরের রাজস্বের ভিত্তিতে। ১৭৮৯ পর্যন্ত এই এক-সালা বন্দোবস্ত চালু থাকে। কিন্তু এ সব কোন বন্দোবস্তই ত্রুটিমুক্ত ছিল না। বিলাতের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিল। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হলে ভূমি রাজস্বের আদায়ের ক্ষেত্রে নূতন পর্যায় শুরু হয়। এতদিন ধরে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তার অবসান ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (১৭৯৩) করে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন, লর্ড কর্ণওয়ালিস।

তবে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উদ্ভাবক ছিলেন না। ১৭৭০ সালে Alexander Dow চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাসী Dow মনে করেন রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কৃষির উন্নতি হবে, যার ফলে বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাবে। ফিজিওক্রাটিক মতবাদের অনুরাগী Henry Pattullo, (হেনরি পাতুল্ল) ১৭৭২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন। তাঁর মতে, এতে বাংলার কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে, কৃষির সাথে শিল্পের প্রসার ঘটবে। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সবথেকে বেশি সোচ্চার হন ফিজিওক্রাটিক মতবাদের অনুরাগী ফিলিপ ফ্রান্সিস, যাকে জেমস মিল এই বন্দোবস্তের প্রকৃত সংগঠক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে এই বন্দোবস্তের অনুকূলে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী পিট ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরি ডাণ্ডাস তাঁর প্রস্তাব (Philip Francis's Minute, 1776) দ্বারা প্রভাবিত হন। Pitt's India Act (1784) -এ অস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করা হয়। ১৭৮৬ সালে কোম্পানির পরিচালক সভা একটি ডেসপ্যাচ দ্বারা জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সুপরিশ করেন। ফলে কর্ণওয়ালিস যখন ভারতে আসেন (১৭৮৬) তখন নানা মহলে স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে যে ভাবে ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে কর্ণওয়ালিসের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যে কার্যকারি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কর্ণওয়ালিস নিজে ছিলেন ইংলণ্ডের বনেদী জমিদার বংশের সন্তান। প্রশাসন ও অর্থনীতিতে জমিদার শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জেমস মিলের মতে কর্ণওয়ালিসের 'অভিজাততান্ত্রিক সংস্কার' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য দায়ী ছিল।

১৭৮৬-১৭৮৯ সময়কালে সম্ভাব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন দিক-নিয়ে কোম্পানির উপর মহলে বিতর্ক চলেছিল। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস; বোর্ড অব রেভেন্যুর সভাপতি জন শোর ও কোম্পানির প্রধান সেরিস্তাদার জেমস গ্রান্ট। এই বিতর্কের বিষয়গুলি ছিল, জমির মালিকানা, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি বছর ও পরিমাণ বন্দোবস্তের মেয়াদ এবং রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে জমিদারদের প্রয়োজনীয়তা। জমির মালিকানা বিষয়ে শোরের বক্তব্য ছিল জমিদাররাই জমির মালিক, যা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করেন। মালিক হিসাবে তাদের জমি বিক্রি, দান ও বন্ধক রাখার অধিকার আছে। অন্যদিকে গ্রান্ট সরকারকে জমির মালিক মনে করেন—

মতে, এই জটিলতা ইংরেজরা স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেনি। প্রায় একশ বছর ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভুল ও তা সংশোধন করতে করতে, প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামীণ শ্রেণী সমাবেশ ও কৃষির অগ্রগতি বিচার করে, সবচেয়ে কম সমস্যায় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব কিভাবে আহরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজরা নানা ধরনের ভূমি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। প্রথমে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করব।

৫.৩.১.২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ :

১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু এদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল নগণ্য। ফলে কোম্পানি আপাতত প্রচলিত রীতি অনুসারে পরোক্ষভাবে রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে মনস্থ করে। ১৭৬৫-১৭৭২ সময়কালে নায়েব-নাজিম (দেওয়ান) রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়কে ২৪টি জেলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। এদেরকে সামনে রেখে কোম্পানি রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের জন্য 'আমিলদার' নিযুক্ত করেন। সাধারণত সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত ব্যক্তিকেই আমিলদারী দেওয়া হতো। কিন্তু এতে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের পরিমান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন যে, আলিবর্দী খাঁ-র সময়ে পূর্ণিয়া থেকে চার লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতো। রেজা খাঁ-র আমলে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫ লক্ষ টাকা। এর পরেও কোম্পানি আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য রেজা খাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায়, জেলায় রাজস্ব পরিদর্শক নিয়োগ (১৭৭০), মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় রেভিনিউ কাউন্সিল আর কলকাতায় কন্ট্রোলিং কমিটি নিয়োগ (১৭৭১) ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু সুপারভাইজররা রাজস্ব ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন। আর রেজা খাঁ রাজস্ব প্রশাসনে কোম্পানির অধিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে নানাভাবে অসহযোগিতা শুরু করেন। এসবের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে অরাজকতা দেখা দেয়। ১৭৭০-র দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তোলে। ঐ দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেলেও কিন্তু রাজস্ব আদায় কমেনি।

যাইহোক, কোম্পানি এরপর ঠিক করে যে রাজস্ব আদায়ের ভার সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নেবে। ১৭৭২ সালে গভর্নর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেই ওয়ারেন হেস্টিংস রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করেন এবং নায়েব নাজিম পদ বিলোপ করেন। গভর্নর ও তার কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে 'Board of Revenue' গঠন করে তার উপর রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দু-এক বছরের ইজারাদারির জায়গায় পাঁচশালা ব্যবস্থা চালু হয়। পুরাতন জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে গুরুত্ব পেতে থাকেন। তবে নিলামী ব্যবস্থা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে, তা বজায়

৫.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকার ভেদ

(২) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

(৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত -- উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

(৪) রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫.৩.১.১ : কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকারভেদ

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। জমির ক্ষেত্রে মালিকানা সম্পর্ক, ভূমি রাজস্বের প্রথাগত ধরন, রাজস্বনীতি, রাজস্ব সংগ্রাহকদের প্রকারভেদ, কৃষকদের স্তর বিন্যাস, উৎপাদনের ধরন ইত্যাদির কোনটিই অনড় ছিল না এবং অঞ্চলভেদে এগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন ছিল। মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন বিবর্তিত হয় তেমনি আবার এই বিবর্তন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। মুঘল ভারতে কৃষকরা ছিল মূলতঃ উৎপাদক সম্প্রদায় ও মোঘল শাসকদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল কৃষি থেকে আহরিত উদ্বৃত্ত সম্পদ। স্বভাবতই কৃষির অবস্থার ওপরই নির্ভর করত সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান, কৃষির অবস্থার উন্নতি হলে উদ্বৃত্ত আহরণের পরিমাণ বাড়ত। মুঘল আমলে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, যা কৃষি সমাজ ও উৎপাদনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসনভার গ্রহণ করার পর কৃষির যে দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা হল ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা তথা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। জমি কার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বা জমির মালিক কে, প্রকৃত উৎপাদক কারা এবং উৎপাদিত ফসলের কে কতটা কিভাবে পায় এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে ভূমিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক ভারতে, বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশরা তিন ধরনের ভূমি ব্যবস্থা চালু করেছিল - জমিদারি ব্যবস্থা, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা এবং মহলওয়ারি ব্যবস্থা। এই প্রত্যেক ধরনের মধ্যে আবার প্রভেদ ছিল। যেমন জমিদারি ব্যবস্থায় কোথাও রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হতো, আবার কোথাও অস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব কিছুদিন পর পর নূতন করে নির্ধারিত হতো। মহলওয়ারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থাতেও বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তিতে বিভিন্নতা ছিল। এক কথায় আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংরেজ সরকার যে ভূমিব্যবস্থা সৃষ্টি করে তা যথেষ্ট জটিল ছিল, যা বিভিন্ন প্রদেশের ভূমি ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

Agrarian Settlements and Agrarian Production

একক - ১

(a) Agrarian Conditions - Regional Variations

(b) The Permanent Settlement - objectives, operations, effects and official critiques

(c) Ryotwari Settlements and Mahalwari System

বিন্যাসক্রম :

৫.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

৫.৩.১.১ : কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকারভেদ

৫.৩.১.২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

৫.৩.১.৩ : রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থা

৫.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

Rural Economy : Changes and Continuity

একক - ১

গ্রামীণ অর্থনীতি

Rural Economy

বিন্যাসক্রম ঃ

৩.৬.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৩.৬.১.১ ঃ সুচনা (Introduction)

৩.৬.১.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

৩.৬.১.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

৩.৬.১.২ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

৩.৬.১.২.১ ঃ পূর্ব ভারতবর্ষ

৩.৬.১.২.২ ঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ

৩.৬.১.২.৩ ঃ পশ্চিম ভারতবর্ষ

৩.৬.১.২.৪ ঃ উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ

৩.৬.১.২.৫ ঃ দেশীয় রাজ্য

৩.৬.১.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

৩.৬.১.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

৩.৬.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

(১) প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(২) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

(৩) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে কি ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পত্তন করা হয়েছিল তা জানা যাবে।

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি ও পূর্ব ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজকে এই ব্যবস্থা কতটা পরিবর্তিত করেছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(৫) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত কি ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজকে এই ব্যবস্থা কতটা পরিবর্তিত করেছিল সে বিষয়ে জানা যাবে।

(৬) পশ্চিম ভারতবর্ষে কি ধরনের বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল এবং সেখানকার গ্রাম সমাজকে তা কতটা পরিবর্তিত করেছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(৭) মধ্য ভারতবর্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ওপর ব্রিটিশ ভূমি বন্দোবস্তের প্রভাব কি ছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(৮) আলোচ্য সময়কালে (১৭৫৭-১৮৫৭) দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল সে কথাও জানতে পারা যাবে।

৩.৬.১.১ ঃ সূচনা

৩.৬.১.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে সাধারণভাবে অর্থনীতির কাঠামোগত দিকটিকে বোঝায়। কৃষি, ব্যবসা- বাণিজ্য, দোকান বাজার, ঋণব্যবস্থা সবকিছুই অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একেবারে নীচুতলা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে কাঠামোগত পার্থক্য থাকে। এগুলি কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাজার এবং অর্থনীতির নানা সূত্র ধরে বিভিন্ন সংগঠন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা ধরনের টানাপোড়েনের মতো বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক সংগঠনেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক সংগঠনের এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ ও তার পরিবর্তনের ধারাকে না বুঝতে পারলে কোন দেশের বা কোন কালের ইতিহাসকে ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। কিছুকাল অগে পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা খুব একটা প্রাধান্য পেত না। অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা সেই দিক থেকে ইতিহাস চর্চায় নতুনত্বের দাবী রাখে।

অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে সাধারণভাবে অর্থনীতির কাঠামোগত দিকটি বোঝায়। কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান বাজার, ঋণ ব্যবস্থা সব কিছুই অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে কি বোঝ ?

৩.৬.১.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনটি সমকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা সনাতন অর্থনীতির মতোই ছিল কতকটা ঢিলে ঢালা। স্বাভাবিক কারণেই কৃষিই ছিল সেই অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। দেশের এক অংশের কৃষিজ উৎপন্নের বাজার গড়ে উঠেছিল দূরবর্তী অংশে। নিকট ও দূরবর্তী উভয় প্রকার বাণিজ্যের অংশীদার ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছোট বড় নানা মাপের ব্যবসায়ীরা। জল এবং স্থল উভয় পথেই এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বলতে উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পও যেমন ছিল তেমনি ছিল বহু বিস্তৃত গ্রামীণ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর বিশেষ কদর ছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়াও ভারতীয় ইস্পাত ও তৈজসপত্র নিয়মিত রপ্তানি হতো। গ্রামীণ শিল্প বিশেষত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত ছিল। গুজরাট, করমণ্ডল, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলায় বস্ত্র শিল্প ছিল কৃষির পরই গ্রামীণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা।

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন

১। প্রাক ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কি ছিল ?

এ সমস্ত সত্ত্বেও, প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব যে একটা উন্নত ছিল এরকম মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। তাই গ্রামবাসী অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পারিবারিক ভিত্তিতে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই এই কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতো। অবশ্য, ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চল বাণিজ্যিক শস্য চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল — যেমন তুলো, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি। এই সমস্ত কৃষিপণ্যের বিস্তৃত বাজারও গড়ে উঠেছিল, তবুও প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থা সাধারণভাবে ভালো ছিল না। উৎপন্ন ফসলের বেশিরভাগটাই রাজস্বদায় মেটাতে চলে যেত। মুঘল সম্রাটের হয়ে রাজস্ব আদায়ের কাজে সহযোগিতার জন্য ছিল বিপুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রামীণ এক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী।

কৃষকের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব আদায়ের সহযোগিতার মূল্য হিসাবে তারা নিয়ে নিত। ফলে, কৃষকের হাতে উদবৃত্ত বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং, গ্রামের বাইরে উৎপন্ন কোন জিনিষ কৃষকের পক্ষে কেনা প্রায়শই সম্ভব হতো না। কৃষি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অল্পবিস্তর শিল্পের কাজও হতো। গ্রাম বিশেষে এই শিল্পকর্মের চরিত্র এক এক রকম হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপন্নের একটা অংশ বাজারেও যেত। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ছোটখাটো বাইরের পাইকার বা ব্যবসায়ির আনাগোনাও ছিল। কিন্তু, প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রই ঠিক সেই অর্থে মুদ্রায়িত ছিল না।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে প্রায়ক্ষেত্রেই অধিকৃত অঞ্চলগুলির প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় এই পরিবর্তনের স্বরূপকে খুব একটা বোঝাবার চেষ্টা হয়নি। তার কারণ, ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা শুরু থেকেই আমাদের বুঝিয়ে এসেছিলেন যে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাই নতুন এই শাসনের নিয়মনীতি অথবা ব্যবস্থাপত্র কোনভাবেই ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠিত কাঠামোয়

বড়সড় কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি। সুতরাং, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে কি গ্রামাঞ্চল বা কি শহরাঞ্চলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রচলিত জীবনযাত্রা খুব একটা প্রভাবিত হয়নি। ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদরা অবশ্য গোড়া থেকেই এই ধরনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। কিন্তু, সে সময় তাঁদের সেই ভাবনাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই অধিকৃত অঞ্চলগুলির প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এ সম্পর্কে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদরা ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের বিরোধীতা করে এসেছিলেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় এই ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণায় ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদিস্তরে পরিবর্তনহীনতার প্রচলিত এই ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই, ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহ এ দেশের প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল সেগুলি আজ আর কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। সহজ কথায় পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া ছিল সাধারণভাবে বহুমুখী। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব ছিল সামান্য, আবার কোথাও কোথাও তা ছিল ব্যাপক এবং সামগ্রিক। ভারতীয় গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির উপর সংঘটিত ব্রিটিশ শাসনের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে আমরা স্বতন্ত্র দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো।

৩.৬.১.২ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের আলোচ্য প্রতিক্রিয়ার সুত্র ছিল প্রধানত দুটি : ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে বর্হিবাজারের সংযোগসাধন। প্রথমটিকে যদি আমরা ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে অভিহিত করি তবে দ্বিতীয়টি ছিল তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া; এবং অর্থনীতির নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের সামগ্রিক ফল। ঔপনিবেশিক শাসনের একেবারে শুরু থেকেই ভারতবর্ষের ক্রমবিজিত অংশে এই উভয় ধরনের প্রতিক্রিয়াই ক্রিয়াশীল ছিল। সেই দিক থেকে দেখলে ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ছিল গভীর ও সর্বব্যাপী। প্রত্যক্ষভাবে শাসিত নয় এমন অঞ্চলগুলির অর্থনীতিও এই ধরনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিল না। ছোট বড় স্বশাসিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণায় সেকথাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতীয় গ্রামীন অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের আলোচ্য প্রতিক্রিয়ার সূত্র ছিল প্রধানত দুটি — ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও গ্রামীন অর্থনীতির সঙ্গে বর্হির্বাজারের সংযোগসাধন।

ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থেই ভারতবর্ষের ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। প্রথমদিকে কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্য ও ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভার মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য একমাত্র উৎস ছিল এই ভূমিরাজস্ব। সুতরাং, ভূমিরাজস্ব নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল প্রথমযুগের ইংরেজ শাসকদের সমস্ত তৎপরতার মূল লক্ষ্য। এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণেই ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও তার প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টির এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে পূর্ব-ভারতবর্ষে। কারণ, বাংলা তথা পূর্ব-ভারতবর্ষেই ইংরেজ শাসনের শুরু।

প্রশ্ন

১। ব্রিটিশ শাসকের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?

৩.৬.১.২.১ ঃ পূর্ব ভারতবর্ষ

বাংলাদেশে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনের শুরু থেকে রাজস্ব-সংক্রান্ত নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। কেননা, এইসময়ে বাংলাদেশের ভূমিরাজস্বই ছিল ভারতবর্ষে কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস। এদেশে কোম্পানির যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচা চালাবার জন্য কোম্পানি পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের রাজস্ব-আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই রাজস্ব-আয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে নেওয়া এবং স্থিতিশীল ও নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে কলকাতার স্থিত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ইংল্যাণ্ডের কোম্পানির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল কতকটা সেইরকম। স্থিতিশীল রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক খবরাখবর সংগ্রহের পরই নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়। যার মধ্যে জমির মালিকানা-সংক্রান্ত বিতর্ক ছিল অন্যতম। খুঁটিনাটি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থাই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে বাংলা ও বিহারে প্রবর্তন করা হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার ফলে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রে সংঘটিত মৌলিক পরিবর্তনগুলি বাংলা ও বিহারের গ্রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তোলে। গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝাবার জন্য প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যেহেতু ভূমিরাজস্বই ছিল ভারতবর্ষে কোম্পানীর আয়ের প্রধান উৎস তাই কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসনের শুরু থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে বাংলা ও বিহারে।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে কবে প্রবর্তন করেন ?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিভিন্ন ধরনের জমি থেকে সরকারকে দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল জমির ওপর জমিদারদের চূড়ান্ত মালিকানা প্রদান। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের এই আদেশনামার ফলে এতদিন যাদের কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ছিল বাংলা ও বিহারের সেই জমিদারবর্গ রাতারাতি জমির মালিক বনে গেলেন। জমির মালিক অর্থাৎ তাদেরকে বংশ পরম্পরায় জমি ভোগদখল ও বিক্রী করবার অধিকার দেওয়া হল। আর এতকাল যারা ছিল জমির প্রকৃত মালিক এতদঞ্চলের সেই কৃষককুল সরকারি এই আদেশনামার ফলে জমির ওপর সবরকম মালিকানাস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে জমিদারের ইচ্ছাধীন খাজনা প্রদানের শর্তে তাদেরই বাপ-ঠাকুরদার জমির ভাড়াটে কৃষকে পরিণত হল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সংঘটিত মৌলিক পরিবর্তনের কথা এখানেই শেষ করা উচিত নয়। কিন্তু, প্রাসঙ্গিক পাঠ্যসূচীর অনুমোদিত পরিধির কথা বিবেচনা করে বিস্তৃত সেই সব আলোচনায় এখন আর যাচ্ছি না। লর্ড কর্নওয়ালিস বা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কেন এই ধরনের উলটপুরাণের ব্যবস্থা পত্তন করেছিলেন, তার ভাবগত প্রেরণা সম্পর্কিত নানা বিতর্ক, অথবা ১৭৯০ এর দশকে এই ব্যবস্থা পত্তনের আশু প্রয়োজনই বা কি ছিল সেইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করাও এখানে

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিল?

সম্ভব নয়। শুধু ছোটখাটো দু-একটি কথা সেরে নিয়ে পূর্ব-ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজ ও অর্থনীতির ওপর এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কঠোর আদায় ব্যবস্থা ও পূর্ব-নির্ধারিত দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব নগদ অর্থের মাধ্যমে জমা করা। অন্যথায়, রাজস্ব বাকি পড়ায় দায়ে সংশ্লিষ্ট জমিদারের জমিদারি সরকারিভাবে নিলাম করে দেওয়া হতো। সেরকম ক্ষেত্রে, সমপরিমাণ রাজস্ব প্রদানে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি নিলামের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে ঐ জমিদারির মালিকানা কিনে নিতে পারতো। প্রাক-ঔপনিবেশিক রাজস্ব শাসনের তুলনায় এই ব্যবস্থা ছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদুরপ্রসারী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান শর্ত ছিল নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমান রাজস্ব নগদ অর্থে জমা দেওয়া।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান শর্ত কি ছিল ?

বাংলা ও বিহারের প্রতিষ্ঠিত জমিদারবর্গ এই ধরনের অনমনীয় আদায় ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেও পরিচিত ছিল না। ফলে, তাদের ওপর কোম্পানির সরকারের কঠোরতার কারণে জমিদারেরাও তাদের অধীনস্থ কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু, কৃষকদের কাছে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার সবচাইতে ক্ষতিকর দিকটি ছিল কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ ও তার আদায় ব্যাপারে ইংরেজ সরকার কর্তৃক জমিদারদের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান। গোড়ার দিকে খাজনা সম্পর্কিত বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষমতাও ছিল তাদেরই। এসবের পিছনে ইংরেজ সরকারের যে কোন হিসেব নিকেশ ছিল না এমন নয় — তবে তার কোনটাই ফলপ্রসূ হয়নি। অথচ, কৃষি ও কৃষকের ওপর এসবের সামগ্রিক ফল ছিল ভয়াবহ।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতির দিক ছিল কৃষকদের দেয় খাজনার পরিমান ও তার আদায় ব্যাপারে ইংরাজ সরকার কর্তৃক জমিদারদের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকটি আলোচনা কর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় সমস্তরকম জমির ওপর রাজস্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়; সংশ্লিষ্ট জমির কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বভাবতই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্ধিত হারে রাজস্ব দেবার জন্য জমিদারেরাও তাদের অধীনস্থ কৃষকদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে শুরু করে। গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে পুরোনো অধিকাংশ জমিদারদের পক্ষেই এ ধরনের আচরণ অসম্ভব ছিল। তাই, গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বহু প্রতিষ্ঠিত জমিদার পরিবার তাদের জমিদারি অধিকার ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় ;এবং নিলামের মাধ্যমে এইসব জমিদারিগুলি একশ্রেণীর শহুরে ধনী মানুষের হাতে চলে যেতে থাকে, জমির সঙ্গে এতকাল যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। অনেক সময় পুরোনো জমিদার পরিবারের কর্মচারীরা নামে-বেনামে এইসব জমিদারিগুলি কিনে নেয়। যেভাবেই হোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ব-ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত জমিদারিস্বত্বের হস্তান্তর ঘটে। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় গ্রামসমাজের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলি অত্যন্ত দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে এবং কৃষকেরা নব্য-জমিদারবর্গের লাগামহীন শোষণের শিকার হয়।

ফলতঃ, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার অধীনস্থ পূর্ব-ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিব্যবস্থায় এক ধরনের নিরুৎসাহের ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভয়াবহ মন্দার অবস্থা সৃষ্টি হয়। কৃষি অর্থনীতির এই নিম্নমুখী প্রবণতা আঞ্চলিক ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব সংকট ডেকে আনে। এর সঙ্গে অনেক অঞ্চলে নীল চাষের পীড়ন এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক সংকটকে কাটিয়ে জমিদারশ্রেণী লাভবান হতে শুরু করলেও এই লাভের কোন অংশই তারা কৃষিব্যবস্থার উন্নতিতে নিয়োগ করেনি। কৃষিক্ষেত্র থেকে সৃষ্টি এই আয়ের অধিকাংশই জমিদারবর্গ তাদের বিলাসব্যসনের মতো অনুৎপাদক ক্ষেত্রে ব্যয় করতে শুরু করে। এসবের সামগ্রিক ফলে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের সংকট দেখা দেয় এবং কৃষি অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান সহনশীলতা দুর্ভিক্ষের প্রবণতাবৃদ্ধি ও লোকক্ষয়ের মতো দীর্ঘমেয়াদি গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। মজার কথা হলো, সার্বিক কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির যে আশু উদ্দেশ্য নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল তা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, এই ব্যবস্থার ফলে পূর্ব-ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি তার নিজস্ব গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রভাবে কৃষি ব্যবস্থায় নিরুৎসাহের ফলে কৃষি উৎপাদনে ভয়াবহ মন্দার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সংকট ডেকে আনে। ফলে পূর্ব ভারতে কৃষি অর্থনীতি তার নিজস্ব গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষি অর্থনীতিকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল কিভাবে ?

পূর্ব-ভারতবর্ষের আসাম ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। প্রাক ঔপনিবেশিক সময়ে এই অঞ্চলগুলিতে মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব ছিল খুবই কম। রাজস্ব ব্যবস্থার সংগঠনও ছিল অনেকটাই অনির্দিষ্ট এবং অনিয়মিত। এ অবস্থায়, হঠাৎ করে নগদ অর্থের মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোর রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা চালু হবার ফলে আসাম ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে গভীর মুদ্রা সংকটের সৃষ্টি হয়, আঞ্চলিকভাবে যার মোকাবিলা করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্ধিত হারে খাজনা প্রদানের দায়বদ্ধতা পূরণ করা প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় খাজনা মেটাতে না পারলে কৃষকের পক্ষে জমির উপর অধিকার কায়েম রাখাও কঠিন ছিল। বিশেষত, এতদঞ্চলের মানুষের জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে কোন পূর্ব-ধারণা না থাকার ফলে তাদের এই সংকট বৃদ্ধি পায়। বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির সংযুক্তির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রা অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও তার দ্বারা প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং, গ্রাম থেকে খাদ্যশস্যের দ্রুত বর্হির্গমণের ফলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের কাছে খাদ্যের যোগান কমে গিয়ে অজন্মা বা আকস্মিক শস্যহানির বছরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে।

৩.৬.১.২.২ ঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ

পূর্ব-ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়নি। বাংলা বা বিহার মুলুকের জমিদারদের মতো দক্ষিণ ভারতে সাধারণভাবে কোম্পানির সরকার কোন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেনি। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পত্তন করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকেরা এখানে কৃষকদের সঙ্গে রায়তওয়ারি নামে এক প্রত্যক্ষ বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিল। স্বল্পকালের মধ্যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এধরণের একেবারে বিপরীত এই অবস্থানের কারণকে

ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সে আলোচনার মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে আমরা কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ওপর রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অঞ্চলে প্রভাবশালী ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার রীড এবং টমাস মুনরো কিছুটা ভিন্ন ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলগত ভাবনার তারা ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনে রীড ও মুনরোর তৎপরতা ও মতামতই প্রাধান্য পেয়েছিল। অন্যদিক থেকে এই ব্যবস্থা ছিল এতদঞ্চলের প্রচলিত প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার অনুসারী। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে টিপু সুলতানের কাছ থেকে বড়ামহল অঞ্চলটি ইংরেজ কোম্পানি অধিকার করে নেয়। মুনরো এবং রীড এই অঞ্চলে রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করেন। দেখা যায়, এখানে গ্রাম-প্রধানেরা কৃষকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব সংগ্রহ করে নিজেরাই সরকারি কোষাগারে জমা দিত। ফলে রাজস্ব-আদায় সংক্রান্ত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের আয়তন ও দায়দায়িত্ব ছিল অনেক কম।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে রীড ও মুনরোর তৎপরতা ও মতামতই প্রাধান্য পেয়েছিল।

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ভারতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কারা প্রচলিত করেন ?

প্রাক্-ঔপনিবেশিক এই ব্যবস্থা মুনরো এবং রীড উভয়কেই আকৃষ্ট করে। মূলতঃ তাঁদের প্রচেষ্টায় বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই ব্যবস্থাই ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা নামে চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণভাবে তিরিশ অথবা ঐরকম সময়কালের জন্য নবীকরণযোগ্য এই ব্যবস্থায় কৃষক এবং কোম্পানির সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থির হয়, নির্দিষ্ট হারে এবং নিয়মিত রাজস্বপ্রদানের শর্তে রায়তওয়ারি ব্যবস্থাভুক্ত কৃষক জমির ওপর সকলপ্রকার অধিকার ভোগদখলের সুযোগ পায়। রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাকালীন নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদানকারী কোনো কৃষককে তাঁর জমি থেকে আইনসিদ্ধভাবে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা যেত না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত কৃষকের স্বার্থরক্ষার অনুকূল ছিল। অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকার এবং কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীকে প্রদত্ত রাজস্ব অংশ সরকারি কোষাগারে জমা পড়তে থাকে। সুতরাং, সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ছিল অনেক লাভজনক।

প্রবর্তন উত্তর সরকার অঞ্চলে মালগুজারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। মালগুজারেরা তাদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য খাজনার হার ও খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারনের ক্ষমতা লাভ করে।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ছাড়াও দক্ষিণ ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে অন্য ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। পূর্বতন উত্তর সরকার অঞ্চলে মালগুজারি ব্যবস্থা নামে একপ্রকার বন্দোবস্ত চালু করা হয়। কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় এই অঞ্চলে মালগুজাররা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তার অনেকটাই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয়। এই অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থায় মালগুজারদের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মালগুজারেরা তাদের নিয়ন্ত্রিত গ্রামাঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে সংগৃহীত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে পাঠিয়ে দিত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এই ব্যবস্থাকেই প্রায় অবিকৃতভাবে স্বীকার করে নেয়। বিনিময়ে মালগুজারেরা মোটামুটি একটা হারে রাজস্ব দিতে সম্মত হয়। মালগুজারেরা তাদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য খাজনার হার ও খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করে। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থা কোম্পানির সরকারের কাছে মোটেও অভিপ্রেত ছিল না। কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেই

তারা এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই মালগুজারি ব্যবস্থাধীন অঞ্চলকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস করে দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রায়তওয়ারি ব্যবস্থাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্ন

১। মালগুজারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখ।

বাস্তবে, কৃষকের সঙ্গে রাজস্ব সম্পর্কিত সরাসরি বন্দোবস্ত দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ঐতিহ্যের অনুকূল ছিল। তাই, পূর্ব-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের গ্রামসমাজ ও তার আর্থিক সংগঠন ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা বড় একটা পরিবর্তিত হয়নি। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিভুক্ত অঞ্চলে গ্রামসমাজের প্রতিষ্ঠিত আভ্যন্তরীণ সংগঠনের ক্ষেত্রেও সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল ন্যূনতম। একমাত্র উপকূল অঞ্চলগুলি ছাড়া পূর্ব ও উত্তর ভারতের তুলনায় বাইরের বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে এতদঞ্চলের গ্রামসমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ছিল অনেক কম। সেইদিক থেকে দেখলে, এখানকার গ্রামজীবন ও সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার ওপর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাব ছিল তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সীমিত।

তাই, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে বাংলার তাঁতিরা যখন কর্মচ্যুত হতে থাকে, তখন মাদ্রাজ অঞ্চলের তাঁতশিল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ও জনসংখ্যার লঘু-ঘনত্বের কারণে রেলপথ সম্প্রসারণের আগে এখানকার গ্রামাঞ্চল বাইরের বাজারের প্রভাবগুলি থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল। এসমস্ত সত্বেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে কৃষকের রাজস্ব দায় আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। অথচ, এই বন্দোবস্তের অধীন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার সনাতন কাঠামোর খুব একটা পরিবর্তন হয় না। এর সঙ্গে বৃটিশ রাজস্বব্যবস্থার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত হওয়ায় কৃষকের অবস্থা আগের থেকে খারাপ হতে থাকে। এসবের সামগ্রিক ফলে গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থার উপর মহাজন শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ঋণগ্রস্ত কৃষক ও ভূমিহীনতার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

> *মাদ্রাজ অঞ্চলে সরকারি হস্তক্ষেপ ন্যূনতম থাকায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও এখানকার তাঁত শিল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যহত ছিল। তাসত্ত্বেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে কৃষি ব্যবস্থায় মহাজন শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।*

প্রশ্ন

১। মাদ্রাজের কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রভাব কি ছিল ?

৩.৬.১.২.৩ ঃ পশ্চিম ভারতবর্ষ

পশ্চিম ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল আবার অন্যরকম। ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের শুরুতে এখানে নানা ধরণের ভূম্যধিকারীদের অস্তিত্ব ছিল; যেমন জমিদার, জিরাসিয়া, পাতিদার, তালুকদার ইত্যাদি। গুজরাট অঞ্চলের জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের বাংলাদেশের জমিদারদের মতো কেবল রাজস্ব সংগ্রাহক ছিল না। তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে তারাই ছিল দন্ডমুণ্ডের কর্তা। অনেক সময় তারা নিজ নিজ অঞ্চলের বাইরেও সুযোগ মতো তাদের হুকুম জারি করবার চেষ্টা করতো। এইসব জমিদার ও জিরাসিয়াদের নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আক্ষরিক অর্থেই ছিল কঠিন কাজ। সাধারণতঃ, এইসব তালুকদারি

> *ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের শুরুতে পশ্চিম ভারতবর্ষে নানা ধরনের ভূমধ্যকারীদের অস্তিত্ব ছিল। জমিদাররা নিজ নিজ অঞ্চলে ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই ভূমধ্যকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আক্ষরিক অর্থেই কঠিন ছিল।*

মহল্লাগুলি দুই বা ততোধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। উনিশ শতকের গোড়াতে সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা আশিভাগ সরকারকে দিতে বাধ্য করে বোম্বাই সরকার তালুকদারদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার এইসব তালুকদারদের অংশ শতকরা কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগে উন্নীত করে।

প্রশ্ন

১। পশ্চিম ভারতবর্ষের ভূমধ্যকারীদের ভূমিকা কি ছিল?

১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের পতনের পর অধিকৃত অঞ্চলের একটা বড় অংশ নিয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী গঠিত হয়। এখানে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোটি বা মডেলটি পরিত্যক্ত হয়। কারণ, চিরস্থায়ী অথবা রায়তওয়ারি — এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পূর্বতন রাজস্ব ইজারা ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং কৃষকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান ব্যবস্থার পরিবর্তে নগদ অর্থে খাজনা আদায়ের নীতি গৃহীত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন এবং উইলিয়াম চ্যাপলিনের মনোগত ইচ্ছা ছিল পেশোয়ার আমলে ক্ষমতাভোগী গ্রামপ্রধান এবং মিরাসিদারদের ক্ষমতা অবিকৃত রাখা।

কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত কালেক্টর ও জেলাভিত্তিক ইংরেজ কর্মচারীরা এলফিনস্টোন এবং চ্যাপলিনের এই নীতিকে কার্যকরী হতে দেয়নি। নিচুতলার কর্মচারীরা গ্রামসমাজে স্বায়ত্ত শাসনের ধারণার বিরোধী ছিল। তাঁরা মনে করতেন গ্রামসমাজের স্বায়ত্তশাসন প্রকৃত অর্থে পাতিল বা গ্রামপ্রধানের ক্ষমতাবৃদ্ধির নামান্তর। সুতরাং প্রায়ক্ষেত্রেই এইসমস্ত রাজকর্মচারীরা কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে এইসব অঞ্চলেও প্রকৃত অর্থে একধরনের রায়তওয়ারি ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে গ্রামসমাজের সামগ্রিক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং কৃষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ উৎসাহিত হয়। ফলে দৃশ্যত গ্রামসমাজের ওপর গ্রামপ্রধানেরা অথবা গ্রামের সম্পন্ন কৃষক এতকাল যে অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল তা অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে।

নীচু তলার কর্মচারীরা গ্রাম সমাজে সায়ত্তশাসনের ধারনার বিরোধী ছিল। এরা কৃষকদের সাথে সরাসরি বন্দোবস্তের পক্ষপাতি ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে এই সব অঞ্চলেও প্রকৃত অর্থে একধরনের রায়তওয়ারি ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে।

প্রশ্ন

১। নীচুতলার কর্মচারীরা সায়ত্তশাসনের বিরোধী কেন ছিলেন ?

বাস্তবে, পূর্ব-ভারতবর্ষের মতো এখানেও নির্ধারিত রাজস্ব প্রচলিত হারের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তালুকদারদের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কৃষিপণ্য মূল্যের দীর্ঘমেয়াদি মন্দা। সব মিলে তালুকদারদের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তারা মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়তে থাকে। অনেকক্ষেত্রে তালুকদারেরা গ্রামের উপর তাদের পুরোনো অধিকার ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এসবের ফলে তালুকদার প্রভাবিত অঞ্চলগুলির গ্রামীণ সমাজ ও আর্থিক সংগঠনে এমন এক ধরণের অস্থিরতার সৃষ্টি হয় যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সরকার আমেদাবাদ অঞ্চলের তালুকদারদের কিছু সুবিধা দেবার জন্য আইন প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে, গুজরাটের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের জমিদারদেরও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী এই ব্যবস্থা গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজস্বভার লাঘব করে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম ভারতের একটা বড় অংশ জুড়ে গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি ব্যবস্থায় গভীর এক সংকটের সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের কারণে আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে তুলোর যোগান হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ তুলো রপ্তানি শুরু হয়। ফলে, তুলোচাষকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় তেজীভাব লক্ষ্য করা যায় এবং তার ফলে এখানকার গ্রামাঞ্চলে মহাজনী তৎপরতাও ভীষণভাবে বেড়ে যায়। এইভাবে কয়েক বছর চলার পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারত থেকে তুলো রপ্তানি স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। তুলোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গ্রামীণ অর্থনীতির তেজিভাবও সঙ্গে সঙ্গেই মিইয়ে যায়। এতদঞ্চলের গ্রামসমাজের ওপর এসবের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। ঐতিহাসিক রবিন্দরকুমার তাঁর গবেষণায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম ভারতের একটা বড় অংশ জুড়ে গ্রামীন সমাজ ও কৃষি ব্যবস্থায় গভীর এক সংকটের সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের সময় তুলোর জোগানকে কেন্দ্র করে যে তেজীভাব দেখা দেয় তা যুদ্ধ শেষে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন

১। কি কারণে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে পশ্চিম ভারতে গ্রামীন সমাজ ও কৃষিতে সংকট দেখা দেয় ?

৩.৬.১.২.৪ ঃ উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ

মধ্য ও উত্তর ভারতবর্ষের অবস্থার মধ্যে কিছু গুণগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইংরেজ অধিকারে আসার আগে উভয় অঞ্চলই ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। মধ্য ভারতে পেশোয়াদের এবং উত্তরে নবাব ও অন্যান্য দেশীয় রাজাদের শাসনের অবসান ঘটলে এখানকার গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় এক মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এতকাল, গ্রামীণ উৎপাদকেরা এই সমস্ত শাসক ও অভিজাতদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে যে সমস্ত জিনিস তৈরী করছিল, হঠাৎ করেই সে সবের চাহিদা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে বহু মানুষ তাদের সনাতন পেশা ও উপজীবিকা থেকে আর জীবনধারণ করতে পারে না। এসবের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থাতেও দীর্ঘমেয়াদি মন্দা দেখা দেয়।

মধ্য ও উত্তর ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাত শ্রেণীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীন উৎপাদকরা জিনিস তৈরী করত। ইংরাজদের আগ্রাসনের ফলে তাদের অবসান ঘটলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রতক্ষ্যভাবে বহু মানুষ তাদের পেশা হারায়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট হারে নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কুড়ি অথবা তিরিশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট এই রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক

প্রশ্ন

১। উত্তর ও মধ্য ভারতের গ্রামীন উৎপাদকদের হঠাৎ বেকারত্বের কারণ কি ছিল ?

সময়ে এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্বদায় পূরণের প্রবণতা ছিল কম। ইংরেজ আমলের তুলনায় আদায়ব্যবস্থার কঠোরতাও ছিল অনেকাংশে শিথিল। তাই পরিবর্তিত এই ব্যবস্থা উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে একধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি করে। নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতা কৃষকদেরকে অর্থকরী ফসল যেমন নীল, আখ এবং গম চাষে বাধ্য করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে খাদ্যশস্যের চাষ হ্রাস পায়। নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতার কারণে গ্রামাঞ্চল থেকে শস্য নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে শস্যের মূল্যহ্রাস এবং কৃষকের জীবনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ মহাজন, গ্রামীণ হিসাবরক্ষক অথবা পাটোয়ারি এবং গ্রামপ্রধানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর শস্যব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্থিরতা ও স্থানচ্যুতি মধ্য ভারতের গ্রামজীবনের ক্ষেত্রে এক ভিন্নতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। পেশোয়া শাসনের অবসানের পর এই অঞ্চলে ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই ছিল এসবের জন্য মূলত দায়ী। এ বিষয়ে পেশোয়া আমলের প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার গুণগত ব্যবধানের কারণে জমির উপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির পুরোনো অধিকার ক্রমেই অস্বীকৃত হতে থাকে । মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের অধীনে মধ্য ভারতবর্ষের যে বিশাল অরণ্য এবং মালভূমি অঞ্চল ছিল, ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে সেইসব অঞ্চলে বসবাসকারী আরণ্যক জনগোষ্ঠীর জীবনে এক অস্থিরতা দেখা দেয়। প্রথমত, দেশীয় শাসনে এইসমস্ত অঞ্চলে মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত শিথিল। ইংরেজ শাসন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চলে জরিপের কাজ শুরু হয়। সরাসরি রাজস্বসংগ্রহ করবার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ইংরেজ সরকার এইসমস্ত অঞ্চলে রেভিনিউ ফার্মিং বা রাজস্ব ইজারাদারি ব্যবস্থা পত্তন করে। বিশাল বিশাল অঞ্চল থেকে ইজারাদারেরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে পাওয়া এইসব অঞ্চলগুলি থেকে ইজারাদারেরা তাদের ইচ্ছেমতন হারে ও শর্তে খাজনা আদায় শুরু করে। প্রান্তিক কৃষিব্যস্থার সঙ্গে যুক্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি এই ধরনের বলপূর্বক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায়ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রিত কৃষিজমি ঋণের দায় মেটাতে মহাজন বা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের নামে হস্তান্তরিত হয়।

> *আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্থিরতা ও স্থানচ্যুতি মধ্য ভারতের গ্রামজীবনের ক্ষেত্রে এক ভিন্নতর সমস্যা সৃষ্টি করে ছিল। ইংরাজ সরকার এখানে ইজারাদারি ব্যবস্থা পত্তন করে। প্রায় ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রিত কৃষিজমি ঋণের দায় মেটাতে মহাজন বা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের নামে হস্তান্তরিত হয়।*

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বনাঞ্চল সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক আইনকানুন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হতে শুরু হলে এই ধরনের সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি তাদের পুরোনো বসবাসের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। অধ্যাপক ক্রিসপিন বেটস মধ্য ভারত নিয়ে তাঁর নানা লেখায় ঔপনিবেশিক শাসনকালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রায় সংঘটিত পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন

১। ইজারাদারি ব্যবস্থার ফল কি ছিল ?

৩.৬.১.২.৫ ঃ দেশীয় রাজ্য

প্রথমেই বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসিত না হলেও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামাঞ্চলও ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাবমুক্ত ছিল না। দেশীয় রাজাদের শাসনদক্ষতা ও আঞ্চলিক অবস্থাভেদে তার কিছু তারতম্য ছিল মাত্র। এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল মোটামুটিভাবে এক। রাজ্যের কৃষিজমির একটা বড় অংশ খালসা নামে রাজ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। বাকি জমির একটা অংশ শাসকেরা রাজস্বমুক্ত অনুদান হিসাবে মন্দির, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গুণী মানুষদের মধ্যে বিলি করে দিত। অবশিষ্ট জমির বেশিরভাগই থাকতো সরাসরি কৃষকদের হাতে। কৃষকেরা নির্দিষ্ট হারে বিঘা হিসাবে নগদ অথবা উৎপন্ন শস্যের মাধ্যমে খাজনা দিত। পশ্চিম ভারতে এই ব্যবস্থা যথাক্রমে বিঘোতি বা ভাগবাতাই নামে পরিচিত ছিল।

> *দেশীয় রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রনাধীন গ্রামাঞ্চলও ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাবমুক্ত ছিল না। রাজ্যের কৃষি জমির যেটুকু কৃষকদের হাতে ছিল, নির্দিষ্ট হারে বিঘা হিসাবে নগদ অথবা উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে তার খাজনা দিত। এই ব্যবস্থার নাম ছিল বিঘোতি বা ভাগবাতাই।*

প্রশ্ন

১। ‘বিঘোতি’ বা ‘ভাগবাতাই’ কি ?

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে রাজারা নান ধরনের অতিরিক্ত অর্থ (বেট) বা শ্রম (বেগার) আদায় করতেন। সাধারণভাবে, এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শিথিল এবং অসংগঠিত। তাই, কৃষিসমাজ এই ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের দাবি পূরণ করতে গিয়ে প্রায়ক্ষেত্রেই শাসকেরা কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ অর্থব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে কৃষকদের খাজনা প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বৃহত্তর বাজারের প্রভাবে রাজ্যগুলির আভ্যন্তরিক বাজারে মুদ্রায়ণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের দাম নিম্নমুখী হতে থাকে। এ সবের কারণে, সামগ্রিকভাবে গ্রামজীবনে নান ধরনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩.৬.১.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনীতি

২। Dharma Kumar, (Ed.), The Cambridge Economic History of India, Vol. II, c.1757-c.1970

৩। ইরফান হাবিব, মুঘল ভারতের কৃষি অর্থনীতি

৪। Eric Stokes, The English Utilitarians and India

৩.৬.১.৪ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে কি বোঝ? প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপটি বিশ্লেষণ কর।

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন কি ছিল?

৩। পূর্ব ভারতবর্ষের গ্রামসমাজের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৪। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা সামগ্রিকভাবে পূর্ব ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৫। দক্ষিণ ভারতবর্ষে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কারণ কি?

৬। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের গ্রামসমাজ কতটা পরিবর্তিত হয়েছিল?

৭। মধ্য ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ওপর ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৮। পশ্চিম ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্যগুলির গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৯। সমস্ত ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয় গ্রামসমাজকে কতটা পরিবর্তন করতে পেরেছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ২

ECONOMY AND AGRICULTURE

একক - ২

ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি অর্থনীতি

গঠন (Structure) ঃ

৪.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.২.২.১ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন

৪০২.২.২ ঃ বাজারমুখিতা ও কৃষি

৪.২.২.৩ ঃ রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

৪.২.২.৪ ঃ উৎপাদন বৃদ্ধির ধরন

৪.২.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ও ধরন ;

২। বাজারমুখিতা ও কৃষি

৩। বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

৪.২.২.১ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন

আমরা জানি যে কৃষি জমিতে দুধরনের ফসল উৎপাদিত হয় —খাদ্যশস্য ও নগদ শস্য বা বাণিজ্য শস্য। ধান, গম, বাজরা প্রভৃতি হল খাদ্য শস্য। আর পাট, তুলো, তৈলবীজ, নীল, পাট প্রভৃতি হল নগদ শস্য। প্রধানত খাদ্যশস্য প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য উৎপাদিত হয় আর নগদ শস্য বা বাণিজ্য শস্য কাঁচামাল হিসাবে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে একটা পশ্চাদপদ দেশে এই ধরনের সরলীকরণ সম্ভব। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি প্রভৃতি নির্ভরতা ত্যাগ করে জ্ঞাননির্ভব হয়। বাজার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সব শস্যই বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত বিভাজীকরণ তখন আর প্রযোজ্য হয় না। তবে ভারতের কৃষিতে আধুনিকীকরণ না ঘটায় আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদন এবং তার ধরন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার আলোচনা উপরোক্ত বিভাজন দিয়ে শুরু করতে পারি। বৃটিশ ভারতে কৃষক উৎপাদন করত প্রধানত নিজের পরিবারের ভরণপোষণের তাগিদে। বাজারের জন্য সামান্য যা উৎপাদন করত তা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে কাঁচামাল হিসাবে কাজে লাগত। খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্তের একটা অংশের রাজস্ব হিসাবে নিষ্কাশন ঘটত যার সাহায্যে অকৃষি সম্প্রদায়ের ভরণপোষণ চলত। ইরফান হাবিবের মত অর্থনীতিবিদ্রা মনে করেন যে মোঘল আমলেই ভারতের অচলায়তন অবস্থা ভাঙ্গতে শুরু করেছিল। বাজার অভিমুখে উৎপাদন শহরের সঙ্গে গ্রামের সংযোগ ঘটায়। ভারতে পুঁজিবাদ বিকাশের একটা শর্ত তৈরি হতে থাকে। মোঘল আমল থেকেই ইউরোপিয় বেনিয়াদের সংস্পর্শে এসে ভারতের কৃষি উৎপাদন এবং তাকে ঘিরে ব্যবসায় যে পরিবর্তন আসতে থাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে তা ত্বরান্বিত হয়। ভারত বিশ্বপুঁজিবাদের অংশ হয়। কিন্তু একই সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না। নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের মুখে ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটায়। একই সঙ্গে দেশের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিদেশের পণ্যের বাজার হিসাবে গড়ে ওঠে ভারতের অর্থনীতি। ভারত কৃষি থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করতে থাকে। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজার নয়, বিশ্ববাজারে ভারত হয়ে দাঁড়ায় কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী।

৪.২.২.২ ঃ বাজারমুখিতা ও কৃষি

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে আমরা শুধু কৃষি দ্রব্যের পণ্যরূপ ধারণ বা নগদ লাভের আশায় বাজার বিক্রয় বুঝি না। কৃষকের স্বেচ্ছায় বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি, কৃষিপণ্যের সঙ্গে জমির বাজারের সম্প্রসারণ এবং এদের সঙ্গে সংগতি রেখে কৃষি সমাজের স্তরবিন্যাসে পরিবর্তনকে বুঝি। এই সবকিছুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কে এক গুণগত পরিবর্তন আসে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের দুয়ার খুলে যায়। বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ধরনে পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ কৃষি সমাজে এক কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায়।

কোন অর্থনীতিতে বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করে বাণিজ্যিকীকরণ আত্মপ্রকাশ করতে পারে যেখানে বাজারে সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি কৃষকের স্বেচ্ছাধীন। এই প্রক্রিয়ায় রাজস্ব আদায় বা মহাজনের ঋণের দায়ে কৃষক শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয় না। বাজার দামের সুযোগ এবং তার ফলে বাড়তি আয় কৃষক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। কৃষকের দরকষাকষির ক্ষমতা থাকে। এর ফলে পুঁজিগঠনের হার বাড়ে। লাভের পুনর্বিনিয়োগ কৃষি উন্নয়নে সহায়ক হয়।

অপর দিকে রাজস্ব দেওয়ার দায়ে বা ঋণ মেটাবার বাধ্যবাধকতার জন্য কৃষক বাজারে শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হতে পারে। অভাবের তাড়নায় তাকে ভোগের অংশও বিক্রি করে দিতে হয় যাকে অভাবি বিক্রয় বলে। পরে ঋণ করে হলেও তাকে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বেশি দামে শস্য কিনতে হয়। বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে বাহ্যিক চাপে, কৃষকের ইচ্ছেয় নয়। একে বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণ বলে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের সুবিধা কৃষক পায় না। ব্যবসায়ী ও মহাজন এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব করে। একটা উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদীশক্তি এবং দেশের ব্যবসায়ী ও মহাজনের মধ্যে একটা অশুভ জোটবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এরাই বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেয়। অমিত ভাদুড়ী দেখান যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ও বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণের বিভিন্ন মাত্রায় সংযুক্তি ঘটে। উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের এই দুটি পদ্ধতিকে বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রিত হতে দেখা যায়। উভয়ের আপেক্ষিক শক্তির ওপর নির্ভর করে উদ্বৃত্ত হরণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক বলে। ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে দেখা যায় বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে প্রধানত বাহ্যিক শক্তি বলে। তাই একে মূলতঃ বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণ বলা চলে।

৪.২.২.৩ ঃ রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির পক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে ডেভিড রিকার্ডোর আপেক্ষিক সুবিধা এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে। এর পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছিল সেটা ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা বলেন না। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দিয়ে উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজ শিল্পপতিদের বিদেশ থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল অবাধে আমদানি করা যেমন দরকার ছিল তেমনি দরকার ছিল ভারতের বাজারকে তাদের শিল্পপণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা। এর জন্য ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি অপরিহার্য ছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ভারতে রেলশিল্প পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

শুধু আন্তর্জাতিক স্তরে কৃষির বিশেষীকরণ ঘটে তা নয়। দেশের অভ্যন্তরেও যে অঞ্চল যে শস্য উৎপাদনে বেশি নিপুণ সেই অঞ্চল সেই পণ্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। দেশের পক্ষে আঞ্চলিক এই বিশেষীকরণ কাম্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকা একটা দেশ নিজের উন্নয়নের কাজে এই বিশেষীকরণকে কাজে লাগাতে পারে না। আঞ্চলিক এই বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে সাহায্য করে। ভারতে এক একটা অঞ্চল তাদের সুবিধামত কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করে। যেমন দক্ষিণ ভারতে আগ্নেয় শিলাজাত কালোমাটির অঞ্চল লম্বাআঁশযুক্ত তুলোচাষের উপযোগী। ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের জন্য এই ধরনের তুলো আসত দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। ১৮৬০ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বাঁধায় ইংরেজরা বাধ্য হয় ভারত থেকে তুলো আমদানি করতে। ভারতে তুলোর চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। দক্ষিণে কৃষকরা এতদিন অল্প পরিমাণ তুলো উৎপাদন করত। তার সঙ্গে খাদ্যশস্যও কিছু উৎপাদন করত। তুলোর চাহিদা এবং তার সঙ্গে দাম বাড়ায় তারা তুলো উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। এর ফলে তারা খাদ্য শস্য বাজার থেকে কেনে। অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ে। বাজারের সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষকরা বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন শুরু করে। বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। রপ্তানি ও বাণিজ্যিকীকরণ এই ভাবে কৃষি উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটিয়ে অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা পরাধীন দেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত বজায় রেখে সম্পদের নির্গমন ঘটানো হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত সুবিধা বিদেশে চালান হয়। ধনী কৃষকরা না সুবিধা পেলেও আমরা দেখব যে গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরা এতে সুবিধা পায় না।

৪.২.২.৪ ঃ উৎপাদন বৃদ্ধির ধরন

আমরা বিভিন্ন শস্য ধরে উৎপাদন, চাষের এলাকাও একর প্রতি উৎপাদনের গতিপথ আলোচনা করতে পারি। দেখা যায় যে খাদ্যশস্যের তুলনায় নগদ শস্যের আওতায় চাষের এলাকা আপেক্ষিকভাবে বেড়েছে। নীল, আফিম, তৈলবীজ, পাট প্রভৃতি ছাড়াও গমের ক্ষেত্রেও চাষ এলাকা বেড়েছে। লক্ষ্যনীয় যে দক্ষিণভারতে ১৮৬০ সালের পর তুলাচাষের ক্ষেত্রে যে স্ফীতি দেখা যায় তার ফলে ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তুলা চাষের এলাকা বৃদ্ধির শতকরা হার সবচেয়ে বেশি। এই এলাকা ১৮৯১-১৯০১ সালের থেকে ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ে। একই সময়ে ধান উৎপাদনের এলাকা কমেছে। এছাড়া গম উৎপাদনের এলাকাও যথেষ্ট বেড়েছে। পাট চাষের এলাকাতেও উর্দ্ধগতি দেখা যায়। তবে জোয়ারের মত নিকৃষ্ট শস্যের উৎপাদন এলাকা কমেছে। এর সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে উৎপাদনও কমেছে। বাজরা ও জোয়ারের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে। জোয়ারের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক। লক্ষ্যণীয় যে তুলোর ক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন কমেছে। ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তুলোর উৎপাদন বেড়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়েছে সেসব ক্ষেত্রে তা ঘটেছে চাষের এলাকা বৃদ্ধির দরুন। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তা ঘটেনি। অর্থাৎ প্রযুক্তির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক পাওয়া যায় না। চাষ এলাকা বাড়ায় উৎপাদনের হার বেড়েছে।

নিচের সারণিতে আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরা হল ঃ

কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হারের প্রবণতা ঃ

উৎপাদন, চাষের এলাকা, একর প্রতি উৎপাদন (শতকরা বার্ষিক হার)

	১৮৯১-১৯০১	১৮৯৬-১৯০৬	১৯০১-১৯১১	১৯০৬-১৯১৬
উৎপাদন				
চাল	০.৩৭	-০.৩৭	০.৪৯	১.১২
গম	১.৬৩	২.৩৫	২.০৩	১.৫৬
জোয়ার*	১.৪৮	-০.১৭	-০.৪২	১.০৯
বাজরা*	২.৪৭	১.৯৬	১.৭৪	০.৪৬
ভুট্টা	২.২০	১.৩১	১.০৫	১.৬৩
তুলা	২.১৭	৪.৮৫	২.৯০	১.৪৩
পাট	২.৬১	৪.০৩	১.০৭	০.৮১

	১৮৯১-১৯০১	১৮৯৬-১৯০৬	১৯০১-১৯১১	১৯০৬-১৯১৬
চাষের এলাকা				
চাল	-০.২১	-০.৩৬	০.৩১	০.৩৮
গম	-০.২৬	২.২৯	০.৬০	০.৮৮
জোয়ার*	০.৭০	-০.১৭	-০.৭৬	-০.১৭
বাজরা*	১.৮২	১.৯৪	১.৫২	-০.১৮
ভুট্টা	১.৭২	০.৭৩	০.১৩	০.১০
তুলা	-০.৩৩	৪.২৫	৩.১১	০.৫৭
পাট	-০.৫৫	৫.৪৯	২.১৬	-১.৮৫
একর প্রতি উৎপাদন				
চাল	০.৫২	০.০৭	০.২১	০.৭৪
গম	২.৫৩	০.৩৪	১.৩৫	০.৭৬
জোয়ার*	০.৮০	০.১৬	০.৪১	১.১৭
বাজরা*	০.৭৮	-০.২৬	০.২২	০.৬৪
ভুট্টা	০.৪৬	০.৬৩	০.৯১	-১.৫২
তুলা	২.৪৪	০.৮৭	-০.৩৫	০.৯৫
পাট	৩.২২	-১.০৫	-১.৪০	২.৬১

* ভোগের দিক থেকে নিকৃষ্ট দানাশস্য

দ্রষ্টব্য ঃ G. Blyn, Agricultural Trends, pp. 327-29.

৪.২.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি -- রণেশ রায়

২। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি -- সব্যসাচী ভট্টাচার্য

৩। Essays on Commercialization of Indian Agriculture – K. N. Raj (Ed.)

৪। Cambridge Economic History – Vol. II

৫। George Blyn – 1891-1946 Agricultural Trend in India

৬। Amit Bhaduri – A study in Agriculture at backwardness under semi-feudalism (1973) Economic Journal, Vol. 83.

৪.২.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের স্বরূপটি ব্যাখ্যা কর।

২। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন আলোচনা কর।

৩। রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে কৃষির সংযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

TRADITIONAL HANDICRAFT INDUSTRY AND THE QUESTION OF DE-INDUSTRIALIZATION

একক - ১

Ecological Changes and Rural Society
বাস্তুপরিবেশের পরিবর্তন ও ভারতের গ্রামসমাজ (ঔপনিবেশিক আমল)

বিন্যাসক্রম

৫.৪.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৫.৪.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

৫.৪.১.২ ঃ বাস্তুপরিবেশ বা ইকলজি

৫.৪.১.৩ ঃ বাস্তুপরিবেশ ও অর্থনীতি

৫.৪.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক অভিঘাত ঃ গ্রামসমাজ ও বাস্তুপরিবেশের অবক্ষয়

৫.৪.১.৫ ঃ কৃষিপরিবেশ ও কৃষিনীতির সম্পর্ক ঃ ইতিহাসচর্চার নতুন ধরন

৫.৪.১.৬ ঃ ভারতের কৃষি অর্থনীতি ঃ প্রধান লক্ষণ

৫.৪.১.৭ ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবক্ষয়

৫.৪.১.৮ ঃ নদীসংকটের কারণ

৫.৪.১.৯ ঃ প্রাকৃতিক বিরূপতা ও উৎপাদকগোষ্ঠী

৫.৪.১.১০ ঃ ভারতের বনাঞ্চল ঃ ঔপনিবেশিক চাপ

৫.৪.১.১১ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.১.১২ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক ইতিহাসে উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে ইকলজি বা বাস্তুপরিবেশের সম্পর্ক কি এবং গ্রামীণ সমাজের সংগঠনে এর গুরুত্ব কতটা, তা এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে।

৫.৪.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

ভারতে ইংরেজদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের পথে যে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা সরানোর কাজ শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে; প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হয় ১৭৬৫-তে দেওয়ানি প্রাপ্তির মাধ্যমে; দৃঢ়তর হয় ১৭৯৩ ও ১৮২০-র চিরস্থায়ী এবং রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের পর; আর পরিণতি পায় সিপাহি বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে। ১৮৫৭-র পর ইংরেজদের আমলাতান্ত্রিক সরকারি প্রশাসন কঠোরভাবে ভারতের ওপর চেপে বসে। সেই সূত্রে শুধু উৎপাদক সমাজ নয়, উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপরেও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করতে চায় ইংরেজরা। এর প্রভাব যেমন সাধারণভাবে অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির ওপর পড়ে, তেমনি উৎপাদক সমাজের ইকলজি বা প্রাকৃতিক অবস্থার ওপরেও পড়ে। কেননা কৃষি উৎপাদনের উপকরণগুলোর সঙ্গে প্রাকৃতিক অবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই বিষয়টিই ভারতের ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হবে এই এককে। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া হবে, ইকলজি বলতে ঠিক কি বোঝায়।

৫.৪.১.২ ঃ বাস্তুপরিবেশ বা ইকলজি

ইকলজি কথাটি দুটো গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। ওইকোস (Oikos) অর্থাৎ বাসের জায়গা এবং লোগোস (Logos) অর্থাৎ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী আর্নস্ট হিকেল (Ernst H. Haekel) ১৮৬৯ সালে জীববিদ্যার একটি বিশেষ শাখাকে চিহ্নিত করতে ইকলজি (Ecology) কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। জীবজগতে সবচাইতে প্রভাবশালী প্রাণী হল মানুষ। আর সব প্রাণী প্রকৃতিকে যেভাবে পায়, সেইভাবে ভোগ করে। মানুষই একমাত্র তাকে ব্যবহার করে উৎপাদনের সূত্রে। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে 'ইকলজি' বিষয়টি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। সহজ করে বলতে গেলে, উৎপাদক যেখানে বাস করে এবং যেখানে উৎপাদন করে, সেখানে জমি, জল, বায়ু এবং অন্যান্য প্রাণীর সমষ্টিগত ব্যবহার তাকে করতে হয়, এবং সেই ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সে তৈরি করে তার নির্দিষ্ট ইকলজি বা বাস্তু পরিবেশ।

৫.৪.১.৩ ঃ বাস্তুপরিবেশ ও অর্থনীতি

ইকলজি ও অর্থনীতির সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ডেভিড হারলিহ্ বলেছিলেন, বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্যের দরকার, তার উৎপাদনের ইতিহাসকে যদি অর্থনৈতিক ইতিহাস বলে গণ্য করা হয়, তাহলে অবশ্যই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ইতিহাসকে জড়িয়ে দেখিতে হবে। 'ইকলজির' এবং 'ইকনমি'র মূল উপাদান তো একই — জমি, জল, বায়ু, প্রাণসম্পদ ইত্যাদি। উৎপাদনের এইসব উপকরণের ওপর যদি উৎপাদকের নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে সে নিজের স্বার্থেই বাস্তুপরিবেশ ঠিকঠাক রক্ষা করবে। কিন্তু যদি শুধু উৎপাদনের দায়িত্ব তার ওপর থাকে, আর উৎপাদনের প্রাকৃতিক উপকরণের নিয়ন্ত্রণ, চলে যায় অন্য কোন হাতে, তাহলে মুশকিল হয়। তখন কর্তৃত্ব যে করে, উৎপাদনের কথা সে ভাবে না, বাস্তুপরিবেশের কথাও তার মাথায় থাকে না, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবসায়িক ব্যবহার বাড়াতে বাড়াতে পরিবেশের অবনমন ঘটায়, আর তার ফলে উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে পড়ে; অথচ সেটা ঠেকানোর কোন উপায় উৎপাদক বা কৃষকের হাতে থাকে না, কেননা উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর তার সব নিয়ন্ত্রণই ততদিনে নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এই জিনিসটিই ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে গ্রাম-ভারতে ঘটেছিল। বর্তমান এককে এই পরিণতিটাই ব্যাখ্যা করা হবে।

৫.৪.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক অভিঘাত ঃ গ্রামসমাজ ও বাস্তুপরিবেশের অবক্ষয়

রাষ্ট্রের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ যে একটি গ্রামসমাজের উৎপাদনব্যবস্থা ও বাস্তুপরিবেশের কী ক্ষতি করতে পারে, ঔপনিবেশিক আমলের ভারত তার অন্যতম উদাহরণ। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের 'ইকলজি' বা 'বাস্তুপরিবেশ' সর্বোত্তম ছিল, এমন দাবি করা যাবে না। কিন্তু রিচার্ড গ্রোভ যেমন 'গ্রিন ইম্পেরিয়ালিজম' বইতে দেখাতে চেয়েছেন যে, বাস্তুপরিবেশ রক্ষা করতে ভারতীয়রা জানতই না, তা একেবারেই ভুল। "Rapid and extensive ecological transition was frequently a feature of pre-colonial landscapes and states" — গ্রোভের এই মন্তব্যটিও মেনে নেওয়া যায় না। ঐতিহাসিক পরম্পরায় ভারতে বরাবর মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও সমতা স্বীকৃত হয়েছে। 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' ও 'বৃক্ষচৈতন্যে'র তত্ত্বই তার প্রমাণ। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা মঙ্গলকাব্যে বারবার বলা হয়েছে যে, উৎপাদন ও সামাজিক ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের একটি সম্পর্ক ভারতে ছিল, আর সেই সম্পর্কের কেন্দ্রীয় আদর্শ ছিল বাস্তুপরিবেশ রক্ষা। ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এই সম্পর্কটিকে নষ্ট করে দিয়েছিল, তাই একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাস্তুপরিবেশ ও গ্রাম সমাজ।

তিনটি প্রধান পর্বের মধ্য দিয়ে ভারতের গ্রামীণ সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধারণা গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্বটি ছিল ১৭৬৫ থেকে ১৮০০, এই পঁয়ত্রিশ বছরের। এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল কৃষির বাণিজ্যায়ন (Commmercialisation)। ক্রমবর্ধমান কৃষিজ উদ্বৃত্তের ঝোঁকে অবহেলিত হয়েছিল স্বাভাবিক সবুজায়ন। পরের পঁচাত্তর বছরে ভারত ইংলণ্ডীয় শিল্পের কাঁচামালের আড়তে পরিণত হয়েছিল। এই সময়েই সূচিত হয় বনাঞ্চল ধ্বংস প্রক্রিয়া এবং চলতে থাকে প্রাকৃতিক সম্পদব্যবস্থার বিকৃতি। সব শেষ পর্বে জোর দেওয়া হয় ঔপনিবেশিক বিনিয়োগের ওপর। ভারতের বাস্তু পরিবেশের ওপর ভারতীয় গ্রামসমাজের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই পর্বে, কেননা ভারতের জমি, জল, বায়ু এবং প্রাণীসম্পদ, এই সবই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে বিদেশি পুঁজি বৃদ্ধির স্বার্থে। ডঃ পাণ্ডিয়ানের ভাষায় —

The mode, time and extent of land revenue payment were altered, forests were enclosed, irrigation works and organisations were disrupted and codified laws restricted the freedom of village communities (MSS Pandian : The Political Economy of Agrarian change, Nanchiland 1880-1939, New Delhi, 1990).

৫.৪.১.৫ ঃ কৃষিপরিবেশ ও কৃষিনীতির সম্পর্ক ঃ ইতিহাসচর্চার নতুন ধরন

আলোচ্য বিষয়টির গভীরে যাওয়ার আগে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়েছে তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখা ভাল। ভারতের যে কোনো অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতিতে গত দেড়শো, দুশো বছরে যে মন্দ লক্ষণগুলো দেখা গেছে তার সবগুলোকেই সাধারণত ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাজস্ব ও ভূমিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক চাপ ও বাণিজ্যিক শোষণের ফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশপরবর্তী কালে কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নের পরিকল্পনায় জমির মালিকানার সংস্কার, রাজস্বনীতির জনমুখীনতা বা উপযোগী বাণিজ্যিক কাঠামোর কথাই মুখ্য স্থান অধিকার করে। প্রাকৃতিক প্রভাবের সমস্যা সেখানে ততটা স্থান পায় না। সম্প্রতি প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হয়েছে এবং তা সম্ভবত য়োরোপীয় প্রভাবের ফল। য়োরোপে বেশ কিছুদিন ধরেই—প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে কৃষি-উৎপাদনকাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে — এ ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে। এখন যারা কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাদের অনেকের কাছেই মানুষের তৈরী ভূমি-সম্পর্ক বা ভূমিব্যবস্থা যেমন গুরুত্ব পায়, প্রকৃতির দেওয়া উৎপাদন পরিবেশও তেমনি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আর সেখানেই অর্থবহ হয় কৃষিপরিবেশ বা ইকলজি, কৃষি-অর্থনীতি ও গ্রাম-সমাজের সম্পর্ক সংক্রান্ত গবেষণা।

৫.৪.১.৬ ঃ ভারতের কৃষি অর্থনীতি ঃ প্রধান লক্ষণ

এই আলোচনায় যে-সময়টিকে ধরা হয়েছে, তার শুরু থেকেই ভারতের কৃষি উৎপাদনে কখনো দ্রুত অবনতি, কখনো বা মন্দা চলছিলো। গোটা ভারতেই তখন কৃষি-মন্দার যুগ। কিন্তু ভারতের সব অঞ্চলে কার্যকারণপরম্পরা একইরকম ছিলো কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আঞ্চলিক বিভিন্নতার কথা মনে রেখে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে, কোথাও ঔপনিবেশিক ভূমিসম্পর্ক, কোথাও জনসমস্যা, কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশ আবার কোথাও বা কমবেশী হারে, সবগুলো কারণই কার্যকর ছিলো। তবে প্রাকৃতিক প্রভাব যে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে অবনতি বা মন্দা কতটা ছিলো, তার একটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। আর এইখানেই রয়েছে সবচাইতে বড়ো অসুবিধে, তথ্যসংক্রান্ত অসুবিধে। প্রবণতা লক্ষ্য করা যতো সহজ, পরিষ্কার তথ্য যোগানো ততো সহজ নয়। সারা ভারতের পটভূমিতে মন্দার কথা বলতে গিয়ে ড্যানিয়েল ও অ্যালিস থর্নার সমর্থন খুঁজেছেন জর্জ ব্লিনের দেওয়া তথ্যের মধ্যে। কিন্তু ব্লিনের দেওয়া তথ্যই যে সঠিক, এমন কথা আজো ঠিক জোর দিয়ে বলা যায়নি। তর্ক এখনো চলছে। এই অবস্থায় বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক তথ্য দিয়ে উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি বোঝানো প্রায় দুঃসাধ্য। সুতরাং কিছু পরোক্ষ উপায়েই বিষয়টি বুঝতে হবে। উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে কুড়ি শতকের দুই বা তিনের দশক পর্যন্ত সময়ের কৃষি-সম্পর্কিত যেসব তথ্য বিভিন্ন নথিপত্রে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জেলায় কর্ষিত জমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে এবং পতিত জমির পরিমাণ ততোধিক হারে বাড়ছে। যদি ধরে নেওয়া হয় (ধরে নেওয়া যে অযৌক্তিক হবে না, তা পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে) যে, ঐ সময়ে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হয় কমেছে, নয়তো স্থির থেকেছে, তাহলে কর্ষিত জমির-পরিমাণ কমে যাওয়ায় অর্থ মোট উৎপাদনের পরিমাণও কমে যাওয়া। তথ্যসারণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক একটি জেলায় ১৮৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯০১-০২ সালের মধ্যে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ কমেছে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ একর। পরবর্তী পাঁচ বছরেও উৎপাদনের এই ধারাটিই কমবেশী বজায় থাকে। যেমন ১৯১০ সালে লেখা নদীয়ার জেলা-প্রতিবেদনে বলা হয়, "গত পাঁচবছরে মোট কর্ষণযোগ্য জমির মাত্র একচল্লিশ শতাংশ চাষের আওতায় ছিলো।" এর-কয়েক বছর পরের প্রিঙ্গলের সমীক্ষায় অবশ্য বলা হয়েছে, কুড়ি শতকের শুরুতে প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ জমি চাষ করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রিঙ্গলের হিসেবটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। জেলা-প্রতিবেদক স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রদত্ত তথ্য সমূহের সতর্ক বিশ্লেষণের পরই তাঁর মন্তব্য করেছিলেন এবং তাঁর দেওয়া হিসেবের সঙ্গে ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হিসেবের মিল আছে। সেন্সাস রিপোর্টেও চল্লিশ শতাংশ জমি প্রকৃত অর্থে কর্ষিত বলে দেখানো হয়েছে। আসল পরিমাণ চল্লিশ বা একচল্লিশ শতাংশ যাই হোক না কেন, যে-ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার মতো তা হলো, উৎপাদন কমেছিল।

১৯১১-১২ সাল থেকে চাষের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছিলো এবং ১৯১৩-১৪ সালের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কিছু জমিকে জোর করে কর্ষণযোগ্য করে তোলা হয়েছিলো, কিন্তু এসব নিতান্তই সাময়িক ঘটনা। ১৯১৫-১৬ সাল থেকে আবার অবনতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং ১৯১১-১২ সালের তুলনায় ১৯১৯-২০ সালে কর্ষিত জমির পরিমাণ কমে আসে। কিছুটা উৎপাদন-হ্রাসের কারণেই সেই সময়ে শস্যের দামও চড়তে থাকে। চার্চ মিশনারী সোসাইটির জনৈক ধর্মযাজক ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরকে লেখেন, "কয়েক বছর আগেও তিন চার পয়সায় যতটুকু চাল পাওয়া যেতো, এখন ততটুকু চালের দামই তেরো চোদ্দ পয়সা। চালের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মানুষের বর্তমান দুর্দশার বড়ো কারণ।" ১৮৯১ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত ধানের উৎপাদন ক্রমাগতই কমেছে, এরকম হিসেব সরকারী রিপোর্টে আছে। তবে পরিস্থিতির চাপে অনেক পতিত বা অকর্ষিত জমিতে ধানচাষ বাড়ানোর ফলে ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত ধানের উৎপাদনে কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তারপর ধানের উৎপাদন আবার কমতে থাকে এবং ১৯১৫-১৬ সালের তুলনায় ১৯৯৯-২০ সালে ধান-উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ প্রায় আঠারো হাজার একর কমে যায়। অন্যদিকে গম, রবিশস্য প্রভৃতির উৎপাদনে মাঝে মাঝে দু'এক বছরের বাতিক্রম ছাড়া মোটের ওপর অবনতি বা মন্দার প্রবণতাটিই প্রধান লক্ষণ হয়ে থাকে।

৫.৪.১.৭ ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবক্ষয়

এই অবক্ষয় কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। ভূমিকাঠামোর প্রগতিহীনতা, কৃষকের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও ঋণভার অবশ্যই সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। সমস্যাগুলোকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলো দীর্ঘসময়ের ঔপনিবেশিক শোষণ। কিন্তু শুধুই ভূমিব্যবস্থা বা ঔপনিবেশিক শোষণের কথা বলে কৃষি-অর্থনীতির অবক্ষয়কে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষি-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিলো এবং এরই প্রতিকূলতা অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ।

নদীব্যবস্থা ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত যে জিনিসগুলোকে বোঝায় তার মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসই হলো নদীব্যবস্থা। এশিয়াটিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে নদী ও নদীর জল কৃষির প্রধান শর্ত। কিন্তু উনিশ ও কুড়ি শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে নদীব্যবস্থার সংকট ভারতে কৃষিকাজকে পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সমসাময়িক সরকারী কাগজে বারবার এই নদীসংকটের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, নদীগুলোর মজে যাওয়ার সঙ্গে কৃষির সামগ্রিক দুর্দশা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

৫.৪.১.৮ ঃ নদীসংকটের কারণ

ঔপনিবেশিক রেলব্যবস্থার পরিকল্পনাগত ত্রুটি অবশ্যই নদীসংকটের একটা বড় কারণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভারতে রেলপথ স্থাপন শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বাঁধ ও সংযোগকারী সড়ক-নির্মাণ। রেলপথ উঁচু করতে গিয়ে যে বাঁধ তৈরি করতে হলো তাও যেমন বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিক জলস্রোতে বাধার সৃষ্টি করলো, তেমনি রেলস্টেশনের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগসাধন করবার জন্যে যেসব সড়ক তৈরি করা হলো, সেগুলোও জল প্রবাহের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। রেলপথ বসানোর সময় রেলদপ্তর, নদী-পর্যবেক্ষণ-বিভাগ এবং পূর্তদপ্তরের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সবদিক ঠিক রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেলো রেল চলছে তার নিজের যুক্তিবুদ্ধিমতো, তাতে আর কিছুর ক্ষতিবৃদ্ধি হলো কিনা, তার কিছু এসে যায় না।

কৃষি-উৎপাদনে নদীসংকটের প্রভাব ঃ

কৃষি-সংকট ছিলো নদীসংকটের অনিবার্য পরিণতি। জলস্রোতহ্রাসের ফলে পলিস্তর ফিকে হয়ে আসা এবং জমিতে জল ও আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাওয়া—এই দুই কারণে সাধারণ জমির উর্বরতা কমে গিয়েছিলো। তৎকালীন কৃষিদপ্তরের পদস্থ কর্মচারীরা অনেকবার জমির অনুর্বরতাবৃদ্ধির কথা বলেছেন।

৫.৪.১.৯ ঃ প্রাকৃতিক বিরূপতা ও উৎপাদকগোষ্ঠী

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতা যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রকে আঘাত করেছিলো নানাভাবে, উৎপাদকগোষ্ঠিকেও তেমনি রেহাই দেয়নি। নদীসংকট থেকে উদ্ভূত এবং অন্যভাবে বর্ধিত পারিবেশিক বিরূপতা বিভিন্ন মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে উৎপাদকগোষ্ঠীকে হয় নিঃশেষ করেছিলো, নয় তাদের জীবনীশক্তি নিংড়ে নিয়েছিলো। এর ফলে কৃষিতে একসময় রীতিমতো শ্রমসংকট দেখা দিয়েছিলো। সাধারণত যে রোগগুলো সেই সময় বেশী ছড়িয়ে পড়তো, সেগুলো হলো ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং ডায়েরিয়া। এর ফলে শুধু যে উৎপাদকদের মৃত্যু হল, তা নয়, যারা রোগ মহামারীর হাত এড়িয়ে বেঁচে থাকতে পেরেছিলো তাদেরও আগের মতো খাঁটবার সামর্থ্য রইলো না। কৃষিতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেই পরিশ্রম করবার মতো জীবনীশক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছিলো। এর থেকেই জন্ম নিয়েছিলো তাদের কাজে অনাগ্রহ বা আলস্য। অনাগ্রহ বা আলস্য কৃষকের সংস্কারগত নয়। প্রিঙ্গল বলেছিলেন ঃ "মন্দ আবহাওয়া ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণেই এখানকার কৃষকেরা অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। কোনো তত্ত্বকথা দিয়ে তাদের কর্মঠ করে তোলা যাবে না। তাদের জন্যে দরকার — ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার।"

প্রাকৃতিক বিরূপতা ও গবাদি পশু

প্রাকৃতিক অবক্ষয় শুধু মানুষকেই আঘাত করেছিলো তা নয়, পশুকেও ছেড়ে কথা বলেনি। পশুরোগের প্রাদুর্ভাব ও গো-মরাই একসময় ছিলো প্রতিদিনকার খবর। ১৮৭০ সালে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় ৬.৯ শতাংশ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছিলো। ঐ সময়ে নিশ্চিন্দপুরে মারা যায় ২৪.০ শতাংশ পশু। গবাদি পশুর মৃত্যু ভূমিকর্ষণেই যে শুধু সংকটের সৃষ্টি করেছিলো তা নয়, গোবর সারের সরবরাহও কমিয়ে দিয়েছিলো।

নদী-ব্যবস্থার অবনতি ও জমির উর্বরতা কমে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন প্রচুর আবাদী জমি পতিত রাখা শুরু হয়, অন্যদিকে তেমনি অনেক জঙ্গল এলাকা ও গোচারণ-ভূমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। ফলে পশুপালকদের গোপালন সমস্যা দেখা দেয় এবং পশুর সংখ্যা কমতে থাকে। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে গোচারণভূমি ও কর্ষিত জমির অনুপাতের পরিবর্তন হয় ১০ঃ৬ থেকে ১ঃ১৫-এ। পরবর্তী দশকগুলোতে এই ধারায় খুব একটা হেরফের হয়নি। ১৯১৫-১৬ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে বাচ্চা গরুমোষের সংখ্যা এক জেলাতেই ৩৪১,৪৩০ থেকে কমে হয় ২৬৫,৭৩৮। ১৯১০-১১ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে হালের সংখ্যা ১৩৯,৬৩৬ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৩৩,৫১৪টিতে।

দায়িত্ব কার?

যদিও জমির গুণগত মানের ক্রমাবনতি, উৎপাদকগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসমস্যা বা গবাদিপশুর জীবনসংকট এবং এসবের ফলে সামগ্রিক কৃষিসংকট প্রাকৃতিক দুরবস্থার পটভূমিতে দেখা দিয়েছিলো, তবু তার দায় শুধু প্রকৃতির উপরেই চাপিয়ে দিয়ে বসে থাকা চলে না। অবক্ষয় যখন শুরু হয়েছিলো তখন তাকে রোধ করবার বা পাল্টা ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব কার? সরকার কর্তৃক জেলাবোর্ড, লোকালবোর্ডগঠন, পরিবহনব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পূর্তদপ্তরের কাজকর্ম বা জলকর-আদায়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে নদী-পর্যবেক্ষণ বিভাগের সক্রিয় তৎপরতা—এসবই ছিলো ওপরকার ঘটনা। গ্রামাঞ্চলে কৃষির উন্নতির বিষয়টা কিন্তু ইংরেজকর্তৃপক্ষ প্রধানত ভূস্বামী গোষ্ঠীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলো। যে ফিজিওক্র্যাটিক অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে তারা এটা করেছিলো, সেটা একেবারেই নিরর্থক এমন মনে করবার কোনো কারণ বোধ হয় নেই। তাছাড়া আঠারো শতকে স্থানীয় মালিক ও জমিদাররা এতই প্রভাবশালী ছিলো যে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ছাড়া ইংরেজদের আর কোনো উপায়ও ছিলো না। তবে ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা যখন চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে তখন তারা এমন একটি ভূস্বামী শ্রেণীর ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলো যারা বাংলাদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদী উত্তরণের সম্ভাবনাকে অকেজো করে রাখবে, আবার

সামন্তীকরণের মধ্যেই জমিদারীর উন্নতিসাধনে অনুপ্রাণিত হবে এবং কৃষিসংকটের সমাধান করবে। কিন্তু সূর্যাস্ত আইনের ধাক্কায় বনেদী ভূস্বামীগোষ্ঠীর পতনের পর যে নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিলো, কৃষিসংকটের সমাধানের দিকে তাদের কোনো দৃষ্টি ছিলো না। রাজবংশে'র পতনের পর নতুন উঠে আসা ভূস্বামীরা কৃষির উন্নয়নে মূলধন বিনিয়োগ করেছিলো, এমন খবর পাওয়া যায় না। পূর্বেকার রাজারা যে এ ব্যাপারে কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলো সে খবর পাওয়া গেছে। জমিদারী বা জোত ঘন ঘন নীলামে ওঠার দরুণ ক্ষুদ্রজোতের অধিকারীরা নিরাপত্তাবোধ হারিয়ে ফেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো। অন্যদিকে যারা রাজার কাছ থেকে পাওয়া নিষ্কর জমি ভোগ করতো তারাও বিবাদে নামতে বাধ্য হয় এবং মানসিক উত্তেজনার শিকার হয়ে উৎপাদনের ব্যাপারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যে সেই উৎপাদনব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে, এই বোধ কারো মনেই তখন জাগেনি। রায়তওয়ারি এলাকায় রায়তী পালাবদলের পরিণতিও প্রায় একইরকম।

শুধুই প্রাকৃতিক ?

ইংরেজ বা ভূস্বামী— যার অপদার্থতার ফলেই হোক না কেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষি-অর্থনীতিতে পচন ধরেছিলো, এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বাকী থেকে যায় তা হলো, ইংরেজ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার সম্পর্কে এতদিনকার যে সমালোচনা, কৃষি-উৎপাদনের অবনতির ইতিহাসে তার স্থান কোথায়? প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি ভূমিকাঠামোর শোষণমূলক দিকটি অবশ্যই ছিলো এবং সেটা প্রতিফলিত হয়েছিলো রায়তী স্বত্বের নড়বড়ে প্রকৃতিতে।

জমির ওপর স্বত্বাধিকার সম্পর্কে তীব্র অনিশ্চয়তা রায়তদের কৃষি-উৎপাদনের উন্নতি-সম্পর্কে হতোদ্যম করে তুলেছিলো। মোট জমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ছিলো মুকারারি রায়তদের কাছে, একমাত্র রায়তশ্রেণী, যাদের স্থায়ী দখলী স্বত্বাধিকার ছিলো। দুই-পঞ্চমাংশ ছিলো অন্য এক শ্রেণীর দখলী প্রজাদের হাতে যারা একদিকে জমির ক্রমবর্ধমান অনুর্বরতা আর অন্যদিক ভূস্বামীর অন্যায় দাবি এই দুইয়ের চাপের মধ্যে পড়ে হতাশ হয়ে উৎপাদনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলো। বাকী দুই-পঞ্চমাংশের অর্ধেক ছিলো জমিদারদের খাস মালিকানায়, সে জমি কখনোই ঠিকমতো চাষ করা হতো না। আর অর্ধেক ছিলো উত্বন্দী রায়তদের হাতে। এই উত্বন্দী জোতে চক্রাকারে জমি পতিত রাখবার নিয়ম ছিলো এবং জমি চাষ করা না হলে রায়তের কোনো দখলী স্বত্ব থাকতো না। এই অবস্থায় উৎপাদন-পরিবেশ বজায় রাখার সামাজিক প্রয়াস যে থাকবে না তা সহজেই অনুমেয়। উপনিবেশিক ভূমি-ব্যবস্থায় এটাই ঘটেছিল এবং উৎপাদন ও বাস্তু-পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটেছিল।

৫.৪.১.১০ ঃ ভারতের বনাঞ্চল ঃ ঔপনিবেশিক চাপ

কৃষি-অর্থনীতি ও বাস্তু-পরিবেশে সবচাইতে বড় ধাক্কা দিয়েছিল ইংরেজদের জঙ্গলনীতি। এককথায়, ঔপনিবেশিক সরকারের অরণ্যনীতি আসলে ছিল ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধবংস করার কৌশল। ইংরেজরা আসার আগে ভারতের আরণ্যক মানুষ আর সাধারণ কৃষক খাদ্য, জ্বালানি আর গোচারণের জন্য অরণ্যভূমি ব্যবহার করত। কিন্তু সেটা ছিল ব্যবহার, তাতে অরণ্যধবংসের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভিল্-দের সম্পর্কে যেমন হার্ডিম্যান লিখেছেন, (they) had a strong affinity with these woods and hills — their home as will as place of refuge — and any destruction which they carried out was on so small a scale as to make very little difference to the environment as a whole (David Hardiman, 'Power in the Forest, the Dangs 1820-1940' in David Arnold and David Hardiman eds. Subalterm Studies, vol. VIII, Delhi 1996) কিন্তু শাল-দেওদারের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা ভেবে ইংরেজরা যখন ভারতের জঙ্গলের দখল নিয়েছিল, তখন আর অরণ্যের ক্ষতি কোন স্বল্প-সীমায় আবদ্ধ ছিল না।

বাংলাদেশের জঙ্গলমহলের বন্দোবস্ত ইংরেজরা করতে শুরু করেছিল ১৭৬৭ সাল নাগাদ। খরা বা বন্যায় জমিদারি বন্দোবস্তের কৃষিজমিতে যে রাজস্ব-মকুব করতে হয়, তার কিছুটা জঙ্গলমহল থেকে পুষিয়ে নেওয়ার হিসেব ইংরেজের ছিল। সেই সঙ্গে বনাঞ্চলের বাণিজ্যিক ব্যবহারের কথাও তারা ভেবেছিল। মেদিনীপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, আখ, তুলো ও তুঁত চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা যেতে পারে। আবার ১৭৮২-তে ক্লিভল্যাণ্ডের সঙ্গে রাজমহল পাহাড় ঘুরে এসে উইলিয়ম হজ লিখেছিলেন, বাণিজ্যিক কৃষির চাইতে উঁচুমানের কাঠের জন্য জঙ্গলগুলোকে ব্যবহার করা অনেক বেশি লাভজনক। ইংরেজদের বনসৃজন ও বনরক্ষা প্রকল্প তাই আসলে ছিল মুনাফার লক্ষ্যে কাঠ সংগ্রহের পরিকল্পনা। রামচন্দ্র গুহ লিখছেন, 'At a deeper epistemic level, the language of scientific forestry was purposely used to justify the shift toward commercial working (R. Guha : The Unquiet Woods, Delhi 1991)

যে কারণেই হোক, জঙ্গল দখল করা ইংরেজের পক্ষে খুব জরুরি ছিল। এর জন্য দরকার ছিল জঙ্গল থেকে ভারতীয় কৃষক ও আরণ্যক সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে দেওয়া। এই কাজটা জঙ্গল সংরক্ষণের অছিলায় ইংরেজরা শুরু করেছিল ১৮৬৪ তে। ঐ বছর প্রথম 'কনজার্ভেটর অব্-ফরেস্ট' নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। পরের বছর প্রথম 'জঙ্গল আইন' পাস করা হয় আর ১৮৭৪ সালে শুরু হয় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ঘোষণা, ১৮৭৩-এ ঘোষিত হয় 'Wildlife Preservation Act' এবং ১৮৭৯ তে পাস হয় 'Elephant Preservation Act'. ১৮৮৪ সালের মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গেজেট প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে, ইংরেজ সরকার এইসব

আইনকানুন দিয়ে এদেশের জঙ্গল বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় 'আরণ্যক' ও 'কৃষকদের' পরম্পরাগত অধিকার থেকে জঙ্গলগুলো কেড়ে নেওয়া। গ্রামীণ সমাজ ও দেশজ রাষ্ট্রশক্তির ওপর আধিপত্য কায়েম করাও ছিল একটি অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য। অজয় স্কারিয়া-র কথায়, "(essential forms of state making were) increase in information about forest tribes, demilitarization of forest chiefs, sedentarisation of forest tribes and demarcation of reserved forests." (উদ্ধৃতিসূত্র K. Sivaramakrishnan, 'British Imperium and Forested zones of Anomaly in Bengal, 1767-1833, in Indian Economic and Social History Review, Vol. 33, No. 3, 1996)

কিন্তু দু'দিক দিয়ে এর ধ্বংসাত্মক ফল দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, ভারতীয় আরণ্যকগোষ্ঠী ও কৃষকরা 'মানা-তত্ত্বে'র প্রভাবে যে দেশজ পদ্ধতিতে জঙ্গল বাঁচানোর কাজ করত, সে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ ইংরেজরাও আইনগুলো প্রকৃত অর্থে জঙ্গল রক্ষার জন্য করেনি, জঙ্গল বাড়লে গাছ কেটে বাণিজ্যিক মুনাফা লাভই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাছাড়া ১৮৫০ এর দশকে শুরু হয়েছিল জঙ্গল পরিষ্কার করে চা-বাগান বসানোর নীতি। সুতরাং নিট ফল ছিল অরণ্যসম্পদের সংকোচন। অন্যদিকে এতদিনের অধিকার বিদেশির হাতে হারিয়ে আরণ্যক সম্প্রদায়ও মারমুখী হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিবাদের একটা ধরন ছিল জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া। সব চাইতে বড় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২১ সালে। ঐ এক বছরেই কুমায়ুন ডিভিশনে জঙ্গল পোড়ানো হয়েছিল ১১,৩,৪০০ হেক্টর। ১৮৭২ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের রিপোর্টেও এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে। গ্রামসমাজের জনৈক মুখিয়া জঙ্গল পোড়ানোর কাজকে সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, ইংরেজরা তাদের পূর্বপুরুষের পালন করা বনাঞ্চল যেহেতু তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, তাই ইংরেজদের সেটা ভোগ করতে দেওয়া যাবে না। (A.S. Rawat, 'Deforestation and forest policy in the lesser Himalayan Kumaun' in Mountain Research and Development, Vol. 15, No. 4, 1995).

ফলাফল ঃ

বাস্তু-পরিবেশ, গ্রাম-সমাজ ও বনাঞ্চলের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের এই অভিঘাতের প্রধান ফল ছিল দেশীয় অর্থনীতির অবক্ষয়, কৃষি-উৎপাদন হ্রাস, জমির গুণগত মানের ক্রমাবনতি, উৎপাদকগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা, গবাদিপশুর জীবনসংকট এবং সামগ্রিক কৃষিসংকট। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষি-অর্থনীতিতে পচন ধরেছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভূমিকাঠামোর শোষণমূলক দিকটিও অবশ্যই ছিল, এবং সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল রায়তী স্বত্বের নড়বড়ে প্রকৃতিতে। শেষবিচারে বলা যায়, প্রাকৃতিক অবক্ষয় ভূমিকাঠামোরই একটি বড় দিক, এবং উভয়ের ক্ষতিকর প্রভাব ছিল পরস্পরাভিমুখী।

৫.৪.১.১১ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Chittabrata Palit & Amit Bhattacharyya (eds) : Science Technology, Medicine and Environment in India, Historical Perspectives, Calcutta 1998.
2. Ranjan Chakraborti (ed.) : Situating Environmental History. New Delhi, 2007.
3. Ramachandra Guha : Environmentalism – A Global History, New Delhi 2000.
4. Richard Grove : Green Imperialism, Delhi 1995.
5. Tapan Kumar Chattopadhyay : India and the Ecology Question, Calcutta 1999.
6. Ramachandra Guha : The Unquiet Woods, Delhi 1991.

৫.৪.১.১২ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইকলজির সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক কি? এই বিষয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২। ঔপনিবেশিক চাপে ভারতে কৃষি-উৎপাদনে মন্দা এসেছিল কি? এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। ঔপনিবেশিক আমলে নদী সংকটের কারণ কি ছিল? এর পরিণতি কি হয়েছিল?

৪। ভারতীয় উৎপাদক গোষ্ঠীর ওপর ঔপনিবেশিক বাস্তু-সংকটের কী ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল?

৫। ভারতে ইংরেজদের জঙ্গলনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তার পরিণতি কী হয়েছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

TRADITIONAL HANDICRAFT INDUSTRY AND THE QUESTION OF DE-INDUSTRIALIZATION

একক - ২

হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী - পটভূমিকা
(Artisans and handicraft product-background)

বিন্যাসক্রম

৫.৪.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৫.৪.২.১ ঃ হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী-পটভূমিকা (Artisans and handicraft product - background)

৫.৪.২.২ ঃ শিল্প পুঁজিবাদ (Industrial Capitalism) ও ব্রিটিশ বস্ত্র ও সুতোর আমদানি [Industrial Capitalism and import of English cloth and yarn]

৫.৪.২.৩ ঃ অবশিল্পায়ন - আঞ্চলিক তারতম্য; অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত বিতর্ক (Debate over de-industrialization-regional variations)

৫.৪.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে হস্তশিল্পসামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী।

(২) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্প পুঁজিবাদ এবং ব্রিটিশ বস্ত্র ও সুতোর আমদানি।

(৩) অবশিল্পায়ন, আঞ্চলিক তারতম্য এবং অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিতর্কের নানা দিক।

৫.৪.২.১ ঃ হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী-পটভূমিকা (Artisans and handicraft product background)

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি উৎপাদন। এর পাশাপাশি শিল্প উৎপাদনেও ভারত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠেছিল। শিল্প পণ্যের জন্য চাহিদা, কাঁচামাল, কারিগর, শ্রমিক ও পুঁজির অভাব ছিল না। ফলে এই সময়ে বহু দক্ষ কারিগরের আবির্ভাব ঘটে, যারা হস্তশিল্পে আত্মনিয়োগ করে জীবিকা অর্জন করতে পারতেন। কারিগরী দক্ষতা ও কৃৎকৌশলের সমন্বয়ে হস্তশিল্পীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি বিলাস পণ্য ও উৎপাদন করতেন। বস্তুতঃ মোগলযুগে এই দুই ধরনের শিল্প সামগ্রীরই বিশাল চাহিদা ছিল। এই যুগে নগরায়ণে যে গতি আসে তার ফল হিসাবে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি শহরে অভিজাত, সৈনিক, বণিক, ও মধ্যশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিল্প পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে শহরকেন্দ্রিক শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে নগদ বেতনের বিনিময়ে শিল্প-শ্রমিক নিয়োগের রীতি প্রবর্তিত হয়। দিল্লী, আগ্রা, সুরাট, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি ছিল শিল্পপণ্য উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। পাটনা, বেনারস, আজমীর প্রভৃতি শহরেও শিল্প উৎপাদন হতো। শহরের শিল্প গুলিতে উৎপাদিত হতো, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, গালিচা, লৌহ ও কাঠ নির্মিত দ্রব্য, চর্মজাত দ্রব্য, মৃৎপাত্র, শৌখিন দ্রব্যাদি প্রভৃতি। আভ্যন্তরীণ চাহিদার পাশাপাশি বৈদেশিক চাহিদাও মেটাত এইসব উৎপাদন কেন্দ্রগুলি।

বিভিন্ন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম, বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের জন্য রাজকীয় উদ্যোগেও শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র বা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে সরকারি উদ্যোগে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারখানাকে কেন্দ্র করেও বেশ কিছু শহর গড়ে ওঠে। তবে আবুল ফজল লিখেছেন, রাজ প্রাসাদের যে বিপুল চাহিদা ছিল, সরকারি কারখানাগুলি তার একটি ছোট অংশই পূরণ করতে পারত, বেশির ভাগই সংগ্রহ করা হতো বেসরকারি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে হস্তশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্র বয়ন শিল্প। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা থাকায়, গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র উৎপাদিত হতো। কার্পাস, সিল্ক, পশম বস্ত্র বয়নে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা ছিল, যা সমকালীন দেশি ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। বস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল বাংলা, গুজরাট, করমণ্ডল, পাটনা, বেনারস প্রভৃতি। সুতো তৈরি ও তাঁত বোনা - দুধরনের কাজেই হস্তশিল্পীরা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কাশিমবাজার, বালেশ্বর, ব্রোচ ইত্যাদি জায়গায় উন্নতমানের সুতো উৎপাদিত হতো, যা বিদেশেও রপ্তানি হতো। বস্ত্র বয়ন শিল্পে বাংলার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সমকালীন বিদেশী পর্যটকরা বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি, স্থলপথে খোরাসান, পারস্য প্রভৃতি দেশে এবং জলপথে পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলিতে বাংলার মসলিন রপ্তানি হত।পাটনা ও সুতীবস্ত্র উৎপাদনের অন্যতম ব্যস্ত কেন্দ্র ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে, আকবর রেশম ও রেশম বস্ত্রের উৎপাদনে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর আমলে, গুজরাট উন্নত সুতী ও রেশম বস্ত্রের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। গুজরাটের তাঁত ও রেশমবস্ত্র পারস্য, তুরস্ক, আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো। বস্ত্র ও পোশাক ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিস, যেমন চাদর, কার্পেট, কম্বল, পর্দা ইত্যাদি তাঁত শিল্পীরা তৈরী করতেন। ভারতের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় ১৫০ ধরনের তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত হত বলে মোরল্যাণ্ড উল্লেখ করছেন, যার মধ্যে মসলিন ও ক্যালিকো বস্ত্রই বেশি রপ্তানি হতো।

মুঘল যুগে বহু হস্তশিল্পী ও কারিগর পরিবহণ শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন, যারা গো-শকট, নৌকা, জাহাজ নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন ধরনের ধাতুশিল্পী, স্বর্ণকার, সূচিশিল্পী, চিত্রকর, কাচ শিল্পী, কাগজ শিল্পী প্রমুখ হস্তশিল্পীগণ। শহরগুলিতে বিভিন্ন কারিগর ও শিল্পীদের বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল। শহরগুলিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের যে সৌধগুলি নির্মিত হয়, তাতেও বহু শিল্পী ও কারিগর নিযুক্ত হতেন।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের সংখ্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির অভাব রয়েছে। সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কারিগর ও শিল্পীরা ছিলেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বণিক বারাণসী দাস জানিয়েছেন যে ভারতে কারিগর ও শিল্পীদের ছত্রিশটি জাতি ছিল, অন্যদিকে পণ্ডিত আবদুর রহিমের মতে ছেষট্টি জাতি ছিল। আবার পর্যটক পেলসার্ট-র মতে সংখ্যাটি ছিল একশ। যাইহোক প্রাথমিক পর্বে ভারতের কৃষিজীবী মানুষ কৃষি ও শিল্প-উভয় পেশাতেই থাকতেন।

গ্রামীণ কারিগররা 'যজমানি পদ্ধতি'-র মাধ্যমে গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতেন।

ডঃ জে. এন. সরকারের মতে মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে যজমানি প্রথার সর্বাধিক প্রচলন থাকলেও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্রই এই প্রথা উপস্থিত ছিল। বাজারের প্রসার ও চাহিদা বৃদ্ধি ঘটলে 'দাদনি প্রথা'-র বিকাশ ঘটে। এই ব্যবস্থায় বণিক ও মহাজনরা শিল্পী ও কারিগরদের উৎপাদনের জন্য অগ্রিম অর্থ বা দাদন দিতেন। এতে কারিগরদের কাঁচামাল কেনার বা অন্যান্য ব্যয় করার সুবিধা হত ঠিকই, কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের উপর দাদন প্রদানকারী বণিক বা মহাজনের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হতো। দাদনি ব্যবস্থায় শিল্পী, কারিগরদের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, উৎপন্ন পণ্য নির্দিষ্ট দামে দাদন প্রদানকারীকে, তাদের যোগান দিতে হত।

ভারতীয় হস্তশিল্পে ছিল ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন ব্যবস্থা। কারিগরদের পরিবারের সব সদস্যই উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হতেন। কারিগররা সামান্য মূলধন ও দাদনি নিয়ে, পারিবারিক শ্রমের দ্বারা পণ্য উৎপাদন করে বণিক ও মহাজনদের সরবরাহ করতেন। এই ব্যবস্থায় কারিগররা উৎপাদনের উপকরণের মালিক ছিলেন। তবে রাজকীয় কারখানায় ভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল। এখানে বহু কারিগর এক জায়গায় সমবেত হয়ে সরকারের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে উৎপাদনের কাজ করতেন ও বিনিময়ে মজুরি পেতেন। ধনী বণিক ও অভিজাতরাও এই উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

ভারতীয় হস্তশিল্পী ও কারিগররা নিম্নমানের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করতেন। প্রাক্-আধুনিক চীন ও ইউরোপ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল। নূতন প্রযুক্তি প্রবর্তনের মতো মূলধন কারিগরদের হাতে ছিল না। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে অনেকে কর্মচ্যুত হতে পারেন, এই আশঙ্কাও হয়ত ছিল। তবে সাধারণ মানের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যেই ভারতীয় কারিগররা উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে পারতেন। সাধারণ মানের তাঁত, তকলি ইত্যাদির মাধ্যমেই ভারতে উন্নতমানের মসলিন প্রস্তুত সম্ভব হয়েছিল। যাইহোক শিল্পীদের কারিগরী দক্ষতা থাকলেও প্রযুক্তিবিদ্যার ঘাটতি নিঃসন্দেহে উন্নততর উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

৫.৪.২.২ ঃ **শিল্প পুঁজিবাদ** (Industrial Capitalism) **ও ব্রিটিশ বস্ত্র ও সুতোর আমদানি**
[Industrial Capitalism and import of English cloth and yarn]

উপরের আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতের বিভিন্ন হস্ত শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সুতিবস্ত্র শিল্প। তুলো উৎপাদনকারী কৃষক থেকে শুরু করে সুতোকাটুনি, তাঁতি, সূচশিল্পী প্রভৃতিরা এই শিল্পের উপর নির্ভর করতেন। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে ব্যবসার প্রসার

ঘটেছিল। ভারতে আগত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি ভারত থেকে যে শিল্প পণ্যগুলি রপ্তানি করত, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সুতীবস্ত্র। ইংলণ্ডে ভারতীয় সুতী সামগ্রী এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প মালিকরা, আমদানিকৃত সুতিবস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসানোর জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। উচ্চহারে আমদানি শুল্ক স্থাপন করেও ভারতীয় বস্ত্রের ব্রিটিশ বাজার বন্ধ করা যায়নি। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরো অষ্টাদশ শতক জুড়ে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি অব্যাহত রেখেছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, বেনিয়া পুঁজি বা সওদাগরি পুঁজির প্রাধান্য ছিল। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সওদাগরি পুঁজির লাভ ও বৃদ্ধির রাস্তা হল সস্তায় কেনা ও বেশী দামে বেচা এবং একচেটিয়া ক্রেতা কম দামে কিনতে ও বেশী দামে বিক্রী করতে পারে। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কোম্পানি জন্মলগ্ন থেকেই ভারতসহ সমগ্র প্রাচ্যে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ভারতে অন্য কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় বণিক যাতে তাদের সাথে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না পারে তার জন্য কোম্পানি সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখত ও এরজন্য বিভিন্ন যুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোম্পানি ভারতে তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করতে থাকে ও শেষপর্যন্ত ভারতীয় শিল্প পণ্যের বাজারে বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ভারতীয় তাঁতি ও অন্যান্য কারিগররা নামমাত্র মূল্যে তাদের অন্য কোম্পানিকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বেনিয়া পুঁজি বা সওদাগরির পুঁজির গুরুত্ব কমতে থাকে — ক্রমশ তার স্থান অধিকার করতে এগিয়ে আসে শিল্প পুঁজি। ফলে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে। এর প্রতিফলন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তনের মধ্যে।

বস্তুতঃ এই সময় ছিল ইংলণ্ডে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের উন্মেষ পর্ব — ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছে ও শিল্পপতি শ্রেণী সেখানে উদীয়মান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্প পুঁজির বিকাশের স্বার্থে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতকে আর শুধু ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী ছিল না। শিল্প পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি তাদের কাম্য ছিল। ব্রিটেনে শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য, যাতে ভারত থেকে পাওয়া যায় এবং ভারতকেই আবার ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজার হিসাবে ব্যবহার করা যায় — তার জন্য ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রদ করা যায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে, পুরনো বণিক সম্প্রদায় না নবোদিত পুঁজিপতি সম্প্রদায় — কাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা যায়।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তার বক্তব্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারকে ব্রিটিশ পুঁজির পক্ষে ক্ষতিকারক বলে বর্ণনা করেন। ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণী অ্যাডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্য (Free trade) নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তারা ভারতে অবাধে বাণিজ্য করার দাবি জানাতে থাকে।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে অগ্রগামী ক্ষেত্র বা 'leading sector' ছিল সুতীবস্ত্র শিল্প। ইংরেজরা তাদের উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচা তুলো আমদানি করতে পারত। আর মিলগুলিতে সুতীবস্ত্র বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ায় এটি অনেক সস্তা ছিল। ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের মিলগুলি প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র ও সুতো উৎপাদন করতে থাকে। এই উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্য এখানকার মিল মালিকরা সংঘবদ্ধভাবে পার্লামেন্টের কাছে ভারতীয় বাজার উন্মুক্ত করে দিতে আবেদন জানান, কারণ ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পার্লামেন্টের সনদ দ্বারা স্বীকৃত থাকায়, তাদের পক্ষে সরাসরি ভারতে মাল বিক্রি সম্ভব ছিল না। ক্রমে পার্লামেন্টও এই শিল্পপতিদের দাবী ন্যায্য বলে মনে করতে থাকে। ঔপনিবেশিক মতাদর্শে সওদাগরি পুঁজি বা বেনিয়া স্বার্থসিদ্ধির বদলে শিল্প পুঁজির প্রসার তথা শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা কোম্পানি মারফৎ ভারতে ৩০০০ টন পণ্য পাঠাবার অধিকার পায়। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে চা ছাড়া ভারতে অন্যান্য ব্যবসার উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয়। শুধুমাত্র চিনের সাথে বাণিজ্যে তার একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকে। ১৮১৩ সালে ভারতের দরজা অবাধ বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হলে, ইংলণ্ডের শিল্পপণ্যে বিশেষ করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলে তৈরি সুতিবস্ত্রে ভারতের বাজার পূর্ণ হয়ে যায়। এই পণ্য বিনাশুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ভারতে প্রবেশ করে ও ছোট শহর, এমনকি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৭৯৫ সালে ইংলণ্ড থেকে ভারতে মাত্র ১৫৬ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় রপ্তানি হয়। ১৮১৩ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১০,০০০ পাউণ্ডে। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে ভারতে চা ব্যবসা ও চিনা বাণিজ্যের ওপর থেকেও কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয়। ফলে ১৮৩৩ সালের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক অস্তিত্বের অবসান ঘটে। এতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র শিল্পের মালিকরা। কারণ এতদিন পর্যন্ত কোম্পানি তাদের বস্ত্র ব্যবসা বাঁচানোর জন্য ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করতে, কিছুটা হলেও চেষ্টা করত। কোম্পানির বাণিজ্যের অধিকার লোপ পেলে এই চেষ্টাও কোম্পানি ত্যাগ করে। ব্রিটিশ সুতীবস্ত্র বিপুল ভাবে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে। ১৮১৩ সালে ভারতে ইংলণ্ডের সুতীবস্ত্র আমদানি হয় ১১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের। ১৮৫৩ সালে তা দাঁড়ায় ৬৩,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের।

সুতরাং দেখা যায়, ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য, ভারতীয় পণ্যসামগ্রী দখলের বদলে ভারতীয় বাজার দখলে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তিত উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ। কোম্পানি ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে, ভারতীয় পণ্যাদির, বিশেষ করে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের ব্যবসা করত। ভারতীয় সুতিবস্ত্র যাতে আভ্যন্তরীণ বাজার না হারায় তার জন্য কোম্পানি তার একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের অস্ত্র ব্যবহার করে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্রকে ভারতের বাজারে ঢুকতে দিতে অসম্মত হয়। কিন্তু শিল্প পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক স্বার্থ, কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থকে বিসর্জন দেয় ও অবাধ বাণিজ্যের অজুহাত দেখিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক অস্তিত্বই লোপ করে। ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পপতিরা, ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের বাজার লোপ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনকারীদের তাদের দেশীয় বাজারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে, ঔপনিবেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে। ইংলণ্ড থেকে ভারতে সুতিবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পেল ১৮১৫ সালের ০.৪০ মিলিয়ন গজ থেকে ১৮৩০-এ ৪৫ মিলিয়ন গজে। ১৮৩৫ ও ১৮৩৯ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১.৭৮ মিলিয়ন গজ ও ১০০.৫ মিলিয়ন গজ। বিলাতী বস্ত্রের পাশাপাশি বিলাতী সুতোও এই সময়ে ব্যাপক ভাবে ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলে। সুতি টুইস্ট, ১৮১৪ সালে এসেছিল মাত্র ৮ পাউণ্ড। ১৮২৮-এ এটি বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৫৬ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ১৮৩৯-এ ১০.৮১ মিলিয়ন পাউণ্ড। অর্থের হিসাবে দেখলে, ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র এসেছিল তার মূল্য ছিল ১৮৩৯ সালে ২.২৯ মিলিয়ন পাউণ্ড, সুতি টুইস্টের মূল্য ছিল ০.৬৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৮৫৫ সালে এই দুটি পণ্যের মোট মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ১.২৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। অধ্যাপক ইরফান হাবিব একটি পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদকগণ ১৮৩৯ সাল নাগাদ ভারতের বার্ষিক ব্যবহৃত কাপড়ের খুব বেশী হলে ৯.৪% সরবরাহ করে। ১৮৬০ সাল নাগাদ এই সরবরাহের পরিমাণ তিনগুণ বেড়ে ২৭%-র বেশী হয়েছিল বলে মনে হয়। ভারতীয় হস্তশিল্পের উপর ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের এই বিপুল আমদানি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়টিই এখন আমরা আলোচনা করব।

৫.৪.২.৩ ঃ অবশিল্পায়ন - আঞ্চলিক তারতম্য ; অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত বিতর্ক (Debate over de-industrialization-regional variations)

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম কুফল ছিল ভারতের চিরাচরিত হস্তশিল্পের অবক্ষয়, যা সাধারণ ভাবে অবশিল্পায়ন (De-industrialization) নামে পরিচিত। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য অবশিল্পায়নের

সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, অবশিল্পায়ন হল শিল্পের অধোগতি বা শিল্পায়নের বিপরীত। যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে কৃষিকর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন শুরু করে অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে ও শিল্পজ অংশ কমতে থাকে, তাকে অবশিল্পায়ন বলা চলে। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদগণ অবশিল্পায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, মদন মোহন মালব্য প্রমুখ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বিলাতী পণ্য বর্জন করে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার, কিংবা গ্রামীণ ও হস্তশিল্পের সম্বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ — এ সবের পেছনে এই অবশিল্পায়নের ধারণা কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক, আঞ্চলিক তারতম্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে, এমন অনেক অর্থনীতিবিদ রয়েছেন, যারা অবশিল্পায়নের ব্যাপারটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। এদের মধ্যে একদল বলেন যে, অবশিল্পায়ন ব্যাপারটি ঘটেইনি। অন্যদল বলেন যে, ভারত কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায়, অবশিল্পায়ন হলেও তার ক্ষতি তেমন হয়নি।

ঔপনিবেশিক আমলে জাতীয়তাবাদীগণ, বিদেশীদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, মুঘল আমলের বিভিন্ন রচনা, ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিবেদন, তদন্ত রিপোর্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, শিল্পে ভারত যথেষ্ট উন্নত ছিল কিন্তু এরপর থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সময়ে সম্পদের বহির্গমন ও ঊনবিংশ শতকে শিল্পোন্নত ব্রিটেনের স্বার্থে ভারতকে ব্যবহার করার ফলে ভারতীয় শিল্প ও সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় অর্থনীতি অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত, মদনমোহন মালব্য প্রমুখরা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতীয় শিল্পপণ্যাদির রপ্তানি কমেছে ও অন্যদিকে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানি বেড়েছে। এদের মতে, রপ্তানি কমা মানে ভারতীয় শিল্প তার বৈদেশিক বাজার হারাচ্ছিল এবং আমদানি বাড়ার অর্থ ছিল দেশীয় বাজার থেকেও ভারতীয় শিল্প পিছু হটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের পতন ঘটে। ভারত ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয় ও শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে ইংলণ্ডের শিল্পগুলির কাঁচামাল সরবরাহকারীতে পরিণত হয়।

এই সময়ে শিল্পসংরক্ষণ নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করা যেত। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সরকার নিজেই তাদের বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডে আগত ভারতীয় বস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে। ব্রিটিশ মিলগুলির সস্তা পণ্যসামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় হস্তশিল্পজাত ভারতীয় পণ্য যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন শুল্ক প্রাচীর দিয়ে ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ না করে এবং ব্রিটিশ

পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশের অনুমতি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। প্রথম বড় ধরনের আঘাত আসে মসলিন ও সুতিবস্ত্রের উপর। ১৮১৪-১৫ সাল নাগাদ বাংলার মসলিনের উপর অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা ও শান্তিপুরে কোম্পানির নিজস্ব বিনিয়োগও বন্ধ হয়। ১৮১০-৩০ সময়কালে উৎপাদিত পণ্যের উপর শুল্কও বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩ সালের সনদ আইন অনুসারে ভারতে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্যের উপর ২$\frac{১}{২}$% হারে শুল্ক ধার্য করা হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে আভ্যন্তরীণ শুল্ক কমানো হয়নি। একই সময়ে ভারতীয় বস্ত্রের উপর ব্রিটেনে উচ্চহারে শুল্ক ধার্য হত। ব্রিটেনে ১৮২৪ সালে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের উপর ৬৭$\frac{১}{২}$% শতাংশ ও মসলিনের উপর ৩৭$\frac{১}{২}$% শুল্ক ধার্য হয়। রেশম শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বৈষম্য দেখা যায়। কলকাতায় ব্রিটিশ রেশমবস্ত্রের উপর সেখানে ৩$\frac{১}{২}$% শুল্ক দিতে হতো, ব্রিটেনে ভারতীয় রেশমবস্ত্রের উপর ২০% শুল্ক দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প পণ্য দেশে-বিদেশে তার বাজার হারায় ও শিল্পের সাথে যুক্ত সব শ্রেণীর মানুষই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবশিল্পায়নের এই ধারণার বিরুদ্ধমতগুলি মোটামুটি তিন ধরনের। প্রথমঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হয়তো অবশিল্পায়ন ঘটেছিল। কিন্তু তারপর ভারতে কলকারখানা গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অবশিল্পায়ন আর ছিল না। দ্বিতীয় ঃ অবশিল্পায়ন ব্যাপারটিই ভারতে হয়নি। তৃতীয়ঃ অবশিল্পায়ন হলেও আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ, কৃষি প্রধান ভারত ও শিল্প প্রধান ইংলণ্ডের মধ্যে হওয়ায়, উভয়ের পক্ষেই তা লাভজনক হয়েছিল।

প্রথম মতের প্রবক্তা, ডানিয়েল থর্ণার ১৮৮১, ১৯০১ ও ১৯৩১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ১৮৮১ সালের পর থেকে অবশিল্পায়ন খুব সামান্যই ঘটেছিল। তবে তাঁর পদ্ধতিতে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাছাড়া অবশিল্পায়ন ঘটেছিল মূলতঃ ১৮০০-১৮৬৫ সময়কালে, আর থর্ণারের বক্তব্য ১৮৮০-র পরবর্তীকালের।

দ্বিতীয় মতের অন্যতম প্রবক্তা মরিস ডেভিড মরিস। তাঁর মতে, অবশিল্পায়ন আদৌ ঘটেনি, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নয়। অবশিল্পায়নের পুরো ব্যাপারটিই হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা বহুল প্রচারিত একটি নিছক 'অলীক কল্পনা' বা 'Myth'। মরিসের প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি। প্রথমতঃ শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন - জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই ভেবে ভুল করেছেন। যদি জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহলে বাজারের প্রসারণের কারণে আমদানি বাড়লেও দেশীয় শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা কম হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ শিল্পদ্রব্য আমদানি করা হলে, কোন একটি বিশেষ দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অন্য শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। যেমন, লোহার বাঁট আমদানির ফলে এদেশে বাঁট তৈরির শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, প্রচুর পরিমাণে

সস্তা লোহার বাঁট আসায় দেশীয় কামারদের সুবিধা হতে পারে। অথবা ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সুতো আমদানিতে দেশীয় সুতো প্রস্তুতকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, সস্তা সুতো পেয়ে তাঁতীরা সস্তায় কাপড় বানাতে পারে ও আমদানিকৃত ব্রিটিশ বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

তৃতীয়তঃ ব্রিটিশ মিলের কাপড় ভারতীয় বাজারে এলেও বিশেষ কিছু ধরনের দেশীয় বস্ত্র শিল্পের ক্ষতি হয়নি। যেমন, দামী কাপড়, যা মিলে প্রস্তুত হয় না, বা পুজোর কাজে ব্যবহৃত বস্ত্র, বা মোটা কাপড় — এই সব বস্ত্র শিল্পগুলিকে ব্রিটিশ বস্ত্রের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ডঃ সুমিত সরকার প্রমুখরা মরিসের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন। প্রথমতঃ জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাজারের প্রসারণের যুক্তির সপক্ষে মরিস কোন প্রমাণ দেননি। দ্বিতীয়তঃ আমদানি করা সুতার স্বল্পমূল্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ শিল্পজাত বস্ত্রের সাথে, ভারতীয় তাঁতীরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। কারণ তাদের কাপড়ের মোট উৎপাদন ব্যয় বেশী ছিল। জাপানি গবেষক তোরু মাৎসুই দেখিয়েছেন যে, যে পরিমাণ সুতা ভারতে আমদানি হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশী বস্ত্র ভারতে এসেছিল। ইংলণ্ডে তৈরি কাপড় এ দেশের বাজার দখল করার অনেক পরে ভারতে বিলাতী সুতোর আমদানি শুরু হয়। ততদিনে বস্ত্র শিল্পে অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সস্তায় বিলাতী সুতো কিনে ভারতীয় তাঁতিরা সস্তা দামে বস্ত্র তৈরি করে, বিলাতী বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে মরিসের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। মাৎসুই-র মতে, ঊনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে যায় এবং তাদের অবস্থারও অবনতি ঘটে। অর্থনীতিবিদ ডঃ অমিয় বাগচী পরিসংখ্যান সহ দেখিয়েছেন যে, ১৮০৯-১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এই সময়কালে শিল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যার অনুপাত ১৮.৬% থেকে ৮.৫% এ নেমে আসে। একই সময়কালে মোট শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁতি ও সুতা প্রস্তুত কারকদের সংখ্যা ৬২.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৫.১% দাঁড়ায়।

তবে এটা ঠিক যে কিছু হস্তশিল্প ও হস্তশিল্পী টিকে ছিলেন। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, তারা অনুকুল অবস্থার মধ্যে ছিলেন। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এই টিকে যাবার কারণ ছিল, শিল্পীদের জাত ব্যবসার প্রতি লেগে থাকার ঝোঁক, জীবিকা অর্জনে বিকল্প পথের অভাব ও সর্বোপরি মহাজনের কাছে দেনার দায়ে জড়িত কুটির শিল্পীর পরাধীনতা।

অবশিল্পায়ন ধারণার বিরুদ্ধে তৃতীয় মতটি হল যে ভারতের হস্তশিল্পের অবনতি ঘটলেও তা ভারতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি। এখানে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা হলেন রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট থেকে শুরু করে স্যার

থিয়ডর মরিসন, কেইনস্ প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। এখানে বলা হয় যে, শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে। এই তত্ত্বকে আঞ্চলিক স্তরে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, একটি দেশের যে অঞ্চলে যে স্বাভাবিক সুযোগ আছে তাকে ব্যবহার করে, উৎপাদন করে (কৃষি বা শিল্প উৎপাদন যাই হোক না কেন) সেই অঞ্চলটি লাভবান হতে পারে। এই তত্ত্বটিকে যদি আন্তর্জাতিক স্তরে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ইংলণ্ডের মতো দেশগুলি যদি শিল্প উৎপাদনে পারদর্শী হয়, ও ভারতের মতো দেশগুলি কৃষি উৎপাদনে পারদর্শী হয়, তাহলে উভয় ধরনের দেশেরই লাভ। কারণ শিল্পোন্নত দেশগুলি কৃষি সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকে কৃষিজ দ্রব্য কিনবে ও একইভাবে শেষোক্ত দেশগুলি প্রথমোক্তদের কাছ থেকে শিল্প দ্রব্য কিনবে। এই তত্ত্বের প্রয়োগে বলা হয় যে, অবশিল্পায়ন হয়ে কৃষি সমৃদ্ধ ভারতের কোন লোকসান হয়নি। কিন্তু ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রে, শ্রম বিভাজন বা উৎপাদন বিশেষীকরণ, সেই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শুভ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু পরাধীন ও প্রভুত্বকারী দেশের মধ্যে এই শ্রমবিভাজন শুধুমাত্র শেষোক্ত-র সুবিধায় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের শ্রমবিভাজনে উপনিবেশের মানুষ কোনদিনই শিল্পায়নের সুদূর প্রসারী বিকাশমুখীন প্রভাবগুলি ভোগ করতে পারবে না। এর পাশাপাশি দেশগুলি উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনেও ব্যর্থ হবে।

সুতরাং অবশিল্পায়ন ও তার কারণে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতির ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায় না। তবে অবশিল্পায়নের জন্য বিটিশ নীতি ছাড়াও আরও কিছু কারণও ছিল। ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গ্যাডগিলের মতে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে দরবারে শৌখিন বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়। উনিশ শতকে নবোদিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিলাতী কাপড় ও বিলাস দ্রব্য বেশী ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে উঁচুদরের ও শহুরে শিল্পগুলি বাজার হারায়। বরঞ্চ গ্রামীণ শিল্পী শ্রেণী, তাদের গ্রামীণ ক্রেতাদের কল্যাণে আরও বেশী টিকে ছিল। যাইহোক, অবশিল্পায়নের জন্য কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের নীতিগুলি যে প্রধানত দায়ী তা অনস্বীকার্য। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ দেখিয়েছেন যে, কোম্পানী কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে জোর করে বাংলার তাঁতিদের স্বল্প মূল্যে কাপড় সরববাহ করতে বাধ্য করত। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে সারদা রাজু, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে রমন রাও, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আর. ভি. চোক্সি, বাংলা ও বিহারের ব্যাপারে হরিরঞ্জন ঘোষাল প্রমুখরা ব্রিটিশ নীতির ফলে হস্তশিল্পের দুরবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ধর্মা কুমার দেখিয়েছেন যে, অনেক জেলায় বস্ত্র উৎপাদনের একক মূল্য নিশ্চিত ভাবে দ্রুত কমে গিয়েছিল এবং সম্ভবত কমেছিল তাঁতীদের কয়েকটি শ্রেণীর আয়। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে "There is considerable quantitative data from south India, central India, and

eastern India confirming that employment declined in textiles" (The Economic History of India 1857-1947; Oxford, 2006, P-64)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, অবশ্য এই অবনতির সময় ও পরিমাণে তারতম্য ছিল। যেমন, মধ্য ভারতে (Central India) ১৮৬০-র দশকে রেলপথের বিস্তারের ফলে বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হলে অবনতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিছু সমসাময়িকের মতে, ১৮৩০ ও ৪০-র দশকে পশ্চিম ভারতে মূল্য হ্রাসের (Price depression) ফলে বস্ত্র বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বস্ত্রবয়নের যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তা হল সুতো তৈরি (Spinning)। ভারতের বহু অঞ্চলে মহিলারা একটি part-time activity হিসাবে সুতা তৈরির সাথে যুক্ত ছিলেন। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে "This activity was, more or less, destroyed by English yarn" (ibid p. 65)

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের হস্তশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবনতি যে হয়েছিল, তা স্পষ্ট, যদিও এই অবনতির প্রভাব কতটা গভীরভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পড়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে এই অবশিল্পায়ন ইংরেজ শাসনের শোষণমূলক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছিল। মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চাতেও বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। চিরাচরিত হস্তশিল্পের অবনতি শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সূচনা করেনি, বরং ভারতকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সম্পর্কে আবদ্ধ রেখেছিল।

৫.৪.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Chandra Bipan ঃ The Rise and Growth of Economic Nationalism in India (New Delhi, 1966)

(2) Kumar, Dharma (Ed) ঃ Cambridge Economic History of India (Cambridge, 1983)

(3) Roy, Tirthankar ঃ The Economic History of India 1857-1947 (Oxford.2006)

(4) ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)

৫.৪.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) Discuss various aspects of handicraft production in the Eighteenth Century India.

(2) How do you explain the rapid growth in import of English cloth and yarn to India in the first half of the nineteenth century?

(3) Analyse different aspects of the debate over de-industrialization.

(4) Critically examine the character of de-industrialization. Was there an industrial decline in India in the early nineteenth century?

———

TRADITIONAL HANDICRAFT INDUSTRY AND THE QUESTION OF DE-INDUSTRIALIZATION

একক - ৩

ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর (Handicraft industry in transition under colonialism)

বিন্যাসক্রম

৫.৪.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৫.৪.৩.১ ঃ ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর (Handicraft industry in transition under colonialism)

৫.৪.৩.২ ঃ হস্তশিল্পে নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রম আমদানি (Capital and labour in handicraft industry)

৫.৪.৩.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.৩.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর।

(২) ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের হস্তশিল্পে নিয়োজিত পুঁজির উৎস।

(৩) ভারতের হস্তশিল্পের শ্রমিক।

৫.৪.৩.১ ঃঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর (Handicraft industry in transition under Colonialism)

পূর্ববর্তী এককে, আমরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় হস্তশিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, এই হস্তশিল্পের দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভাল চাহিদা ছিল। তবে গ্রামীণ ও শহুরে কারিগররা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, স্থানীয় ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করত। গ্রামীণ ও শহুরে ক্রেতাদের চাহিদার মধ্যে পার্থক্য ছিল। গ্রামীণ শিল্পগুলিতে উৎপন্ন হত, মোটা ধরণের বস্ত্র, মাটির জিনিসপত্র, কাষ্ঠ ও লৌহ নির্মিত কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। উৎপাদনের প্রধান একক ছিল পরিবার, বা কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী। উৎপাদনের সংগঠনও (organization of production) ছিল সরল, বড় মাপের শ্রমবিভাজন বা শ্রম বিশেষীকরণ সাধারণত ছিল না। কিছু গ্রামীণ উৎপাদনে, যেমন কাঁচা রেশম, লবন, সোরা, নীল, কৃষকরা নিযুক্ত থাকতেন এবং এগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদিত হত না।

শহুরে শিল্পগুলির মধ্যে ছিল সুক্ষ্ম বস্ত্র, কার্পেট, শাল, শৌখিন ধাতব ও মৃৎ শিল্প, কাঠ ও হাতির দাঁতের জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি সম্প্রদায়। এগুলির দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও ব্যবসা একান্তভাবেই নির্ভর করত শাসক শ্রেণীর ও ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীর আর্থিক সমৃদ্ধির উপর। শহুরে হস্তশিল্প, কয়েকটি ক্ষেত্রে শাসকবর্গ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 'কারখানা'-গুলিতে উৎপাদিত হতো। প্রাক্-আধুনিক ইউরোপের শহুরে শিল্পগুলিতে যে গিল্ডগুলিকে দেখা যায়, সেগুলির অস্তিত্ব ভারতে প্রায় ছিল না বললেই চলে। গুজরাটে এধরনের কিছু সংগঠন দেখা যায়, তবে এগুলির কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব ছিল না বা ইউরোপীয় গিল্ডগুলির মতো প্রভাবও ছিল না। ভারতে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় কারিগররা কখনোই একটি প্রভাবশালী শ্রেণী হয়ে উঠতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হলে শহুরে হস্তশিল্পগুলি শুধুমাত্র বৃহৎ মুঘল শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ না থেকে, আরও অন্যান্য ছোট ছোট শহরে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের বেনারস, ফারুকাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, আহম্মদনগর, ঔরঙ্গাবাদ, বরঙ্গল, দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই -- এসব শহরেই দক্ষ হস্তশিল্পীরা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এগুলিতে তারা বাজার ও নিরাপত্তা -- দুইই লাভ করে। পরবর্তীকালের স্থানীয় স্তরে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। গ্রামীণ শিল্পগুলির তুলনায় শহুরে শিল্পগুলির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় -- এই শিল্পগুলিতে শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণেরও বৃদ্ধি ঘটে। এই ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ এবং ঋণদানেরও প্রসার ঘটে।

ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে হস্তশিল্পগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছিল তা ভারতীয় শিল্পগুলিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। উন্নতমানের শিল্প দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও রপ্তানি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সংকটাপন্ন হয়। এই সময়ে ইউরোপে ভারতীয় বস্ত্র সম্ভারের রপ্তানি কমতে থাকে। অন্যদিকে ভারতে ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরী বস্ত্রাদির আমদানি বাড়তে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত ছিল বিশ্বে সুতীবস্ত্রের অন্যতম যোগানদার। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ইংলণ্ডে, অষ্টাদশ শতকের শেষে, শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগামী অংশ বা leading sector হিসাবে আবির্ভূত হয় কার্পাস বস্ত্রশিল্প। কারখানায় উৎপাদিত সুতো ও বস্ত্র, ভারতের হস্তশিল্পের মতো অতটা সূক্ষ্ম না হলেও বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হতো বলে, সস্তা ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ড তার উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় তুলো আমদানি করত। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা, বিশেষ করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল মালিকরা, তাদের বিপুল শিল্প পণ্য বিক্রি করার জন্য ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসাবে দেখতে শুরু করে। তাদের চাপে ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি কমে যায়। ১৮১৩ সালের সনদ আইন দ্বারা ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বানিজ্যাধিকারের অবসান ঘটলে, ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব জাত বিভিন্ন দ্রব্য, বিশেষত সুতিবস্ত্রে, ভারতের বাজার পূর্ণ হয়ে যায়। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতে ঔপনিবেশিক সরকার তার শুল্ক নীতি নির্ধারণ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ব্রিটিশ পণ্য বিনা শুল্কে বা স্বল্প শুল্কে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর ইংলণ্ডে বিরাট শুল্কের বোঝা চাপানো হয়। এর ফলে ভারতীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার ও আভ্যন্তরীণ বাজার দুই-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ফলে ঐসব অঞ্চলের ক্ষমতাচ্যুত শাসক ও অভিজাত শ্রেণী হস্তশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতে অপারগ হন। এর ফলেও এর চাহিদা হ্রাস পায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল কারিগর, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত

কারিগরদের জীবিকাচ্যুতি। "There is considerable quantitative data from South India, Central India and Eastern India confirming that employment declined in textiles" (Tirthankar Roy, The Economic History of India 1857-1947, Oxford, 2006, p.64) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয়কে অবশিল্পায়ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে অবশিল্পায়নের আঞ্চলিক তারতম্য, ভারতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে, যার একটা রূপরেখা পূর্বের এককে দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক ঔপনিবেশিকতার আওতায় উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে অবশিল্পায়ন হলেও, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু বৃহদায়তন শিল্পের (large-scale industry) উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এই শিল্পগুলিতে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও কৃৎকৌশল প্রযুক্ত হতো। শিল্পোৎপাদন হতো বৃহৎ কারখানা বা factory-তে এবং এগুলি সরকারী বিধি নিয়মের অধীন ছিল। এই সবদিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি (small scale industry) ভিন্ন ছিল। এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অধিকাংশই প্রাক্-ঔপনিবেশিক উৎপাদন ও কৃৎকৌশল বজায় রেখেছিল। এগুলিকে 'চিরাচরিত' ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বা হস্তশিল্প বলা যেতে পারে। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে, "Important examples of traditional small-scale industry or handicrafts are handloom weaving, leather manufacture, and a variety of industries using metals, wood, and minerals" (ibid, p-183) এই হস্তশিল্পগুলি বা চিরাচরিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ছাড়াও আরও কিছু ক্ষুদ্রশিল্প ছিল, যেগুলির আধুনিক যুগে উদ্ভব হয়েছিল। এগুলিকে 'modern small-scale industry' বলা যেতে পারে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরনের শিল্পের অগ্রগতি দেখা যায় - এর উদাহরণ ছিল ফাউন্ড্রিসমূহ, যন্ত্রচালিত তাঁত, পাটকল, ধান কল, ময়দা কল প্রভৃতি। এই শিল্পগুলি ক্ষুদ্রায়তন ছিল ও ততটা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। তবে হস্তশিল্পগুলির তুলনায় এগুলিতে বেশী যন্ত্রপাতি, শ্রম বিশেষীকরণ ইত্যাদি করা হত। তবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই দুটি ভাগের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। কখনও হস্তশিল্প থেকে প্রাপ্ত লাভ, আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিনিয়োগ করা হতো কিংবা হস্তচালিত তাঁতের কারিগররা যন্ত্রচালিত তাঁত বসিয়ে উৎপাদন করত। উভয় বিভাগের মধ্যে শ্রমের গতিশীলতাও ছিল। একইভাবে বৃহদায়তন শিল্প ও আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃহদায়তন শিল্পের উন্মেষ ঘটলেও, বিংশ শতকের প্রথম দিকেও দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প থেকে জাতীয় আয়, আধুনিক কলকারখানার থেকে অনেক বেশী। S. Sivasubramonian তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ১৯০০/০১ সালে কারখানা থেকে জাতীয়

আয় ছিল ২৯.৮ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র শিল্প থেকে ১২৫.১ কোটি টাকা, দশ বছর পরে এটি বেড়ে যথাক্রমে হয়, ৫৭.০ কোটি টাকা ও ১৫৬.৫ কোটি টাকা। একমাত্র বিংশ শতাব্দীর চারের দশক থেকে কারখানা শিল্পজনিত আয় ক্ষুদ্রশিল্পকে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে সবটাই প্রাচীন কুটির শিল্প নয়, ছোট মাপের কল (machine) ব্যবহার করে এমন শিল্পও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যাই হোক এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও হস্তশিল্পগুলি বা চিরাচরিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের (handloom weaving) ব্যাপারটি দেখলে এটি স্পষ্ট হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত তাঁতীদের সংখ্যা ছিল ২৪,০৭,৩০০। হাতে বোনা শিল্পের সাথে জড়িত সব শ্রেণীর কর্মীদের ধরলে সংখ্যাটি বোধ হয় ৩০,০০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে, যা ছিল ভারতে নিযুক্ত মোট শিল্প শ্রমিকদের ২০%। অন্যদিকে বস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩,৩২,২০০ যা ছিল মোট শিল্প শ্রমিকদের মাত্র তিন শতাংশ। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে, "Handloom weaving was by far the largest industry in India. ... including cotton, silk and synthetics and excluding wool, in the 1930s, handloom's market share in total cloth consumption (in terms of value) may have been about 50." (ibid, p.193)

সুতরাং দেশীয় তাঁতীদের সামগ্রিক উৎপাদন, বিংশ শতকের প্রথমদিকে কারখানা উৎপাদনের তুলনায়, কম ছিল না। ১৯০১-০৫ সময়ে গড়ে বাৎসরিক উৎপাদন হস্তশিল্পে ৯১ কোটি গজের মতন, কারখানায় ৫৯ কোটি গজ। বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পার্থক্য কমে প্রায় সমান হয়ে যায় ও ১৯২১-২২ সালে কারখানায় কাপড় উৎপাদন ও হস্তশিল্পের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৮০ কোটি গজ ও ১১৪ কোটি গজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে কারখানার উৎপাদন হস্তশিল্পের প্রায় তিনগুণ ছিল। ব্রিটিশ কাপড়ের কলগুলির স্বার্থে, সরকার যে সমতামূলক করনীতি (countervailing excise) ১৮৯৬-১৯২৫ সময়কালে ভারতীয় কারখানাগুলির উপর চালু রেখেছিল, তা পরোক্ষভাবে হস্তশিল্পকে সাহায্য করে, কারণ তাঁতীর কাপড়ের উপর কোন শুল্ক ছিল না। ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও ১৯২১ সাল থেকে হস্তশিল্পের পেছনে জাতীয়তাবাদী সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার মূল লাভটা নিয়েছিলেন দেশীয় কারখানার মালিকরা, কারণ তাঁরা, তাঁতীদের থেকে অনেক সস্তায় দেশীয় কাপড় সরবরাহ করতে পারতেন। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে, শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ শিল্পের পুনর্জীবন, স্বরাজ আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে চরকা ও খাদি কাপড়কে গুরুত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য--এসব কারণে হস্তশিল্প একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দেশীয় কাপড় কারখানাগুলি তাদের কারিগরী সামর্থ্যের কারণে, স্বদেশিয়ানার জোয়ারে অনেক বেশী এগিয়ে যায়। তবে মিলে প্রস্তুত হয় না,

এমন কিছু বস্ত্রের ক্ষেত্রে, যেমন, বিশেষ ধরণের শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি, হস্তশিল্পের বাজার অবশ্য বজায় থাকে।

বস্ত্র ছাড়া আর যেসব দ্রব্যাদি হস্তশিল্প বা ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদিত হতো, সেগুলি হল চর্ম, পশমের কার্পেট, পেতলের দ্রব্যাদি, শাল, লৌহ ও কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি ইত্যাদি। ১৮৭০-র পর থেকে মহামন্দা পর্যন্ত চর্ম ছিল গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি সামগ্রী। বিদেশে উন্নতমানের চর্মের চাহিদা থাকায় কানপুর, মাদ্রাজ, বম্বে ও কলকাতায়, চর্ম ব্যবসায়ীদের অধীনে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। পশমের কার্পেট, পেতলের দ্রব্যাদি, গয়না, কাঠ ও হাতির দাঁতের কাজ প্রভৃতি ছিল শহুরে হস্তশিল্প। এগুলি বাইরে রপ্তানি হতো এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলির বাজার ছিল।

৫.৪.৩.২ ঃহস্তশিল্পে নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রম (Capital and Labour in handicraft industry)

(i) পুঁজি

সাধারণ ভাবে, 'হস্তশিল্পগুলির' ব্যাঙ্ক বা এই ধরনের ঋণদানকারী সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ ছিল না, থাকলেও খুব কম ছিল। অসংগঠিত টাকা ও পুঁজির বাজারের সাথেও এগুলির কম যোগাযোগ ছিল। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে, "The main form of working capital financing seems to have been trade credit... Producers and merchants often devised their own systems of informal finance." (ibid p. 214) উত্তর-ভারতে এমন একটি ব্যবস্থা ছিল, যাকে বলা হতো 'baqi'। এই ব্যবস্থায় কারিগররা নিয়োগকর্তা বা মালিকের কাছে ঋণ বা অগ্রিম পেত। নিয়োগকর্তারা কারিগরদের মজুরি থেকে এ বাবদ পাওনা কেটে নিয়ে, বাকী অংশ কারিগরদের দিতেন। এ ধরনের আর্থিক লেনদেন শহুরে হস্তশিল্পে প্রচুর দেখা যেত। একই ধরনের জিনিস হস্তশিল্পের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যায়।

ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য কুটির শিল্পের ব্যাপারে, মহাজনী পুঁজির আধিপত্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ছত্রছায়ায় মহাজনী পুঁজি গজিয়ে উঠেছিল। এই পুঁজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা হতো না -- সুদে খাটানো হত ও বেচা কেনা ব্যবসায়ে লাগানো হত। এই ঋণদাতারা কুটীর শিল্পীদের দাদন বা আগাম দিয়ে, উচ্চহারে সুদ আদায় করত ও শিল্প দ্রব্যের বিপননে হস্তক্ষেপ করে লাভ করত। "এই জাতীয় অনগ্রসর পুঁজিবাদের জালে আবদ্ধ কুটীর শিল্পী দেনার সুদ মেটাতে

সর্বদা ব্যস্ত, বিপননের ব্যাপারে মহাজনের মুখাপেক্ষী বলে কম দামে উৎপন্ন জিনিষ ছাড়তে বাধ্য, লভ্যাংশ সবই প্রায় মহাজনের হাতে যায় বলে, পুঁজি জমাতে (capital accumulation) অসমর্থ এবং পুঁজির অভাবে চিরস্থায়ীভাবে মহাজনের অধীনতায় থাকতে বাধ্য" (ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃঃ ৮৪-৮৫) হস্তশিল্পে পুঁজির যোগানদার হিসাবে মহাজন, পাইকার ফড়ে ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য সমগ্র ঔপনিবেশিক যুগে বর্তমান ছিল।

(ii) শ্রম

উনবিংশ শতাব্দীতে, হস্তচালিত তাঁত বোনা সাধারণত কারিগরদের গৃহেই সম্পন্ন হত। তাঁতী পরিবারে পুরুষরা তাঁতে বোনার ব্যাপারটি করতেন, পরিবারের মহিলা ও শিশুরা বোনার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি করতেন। তবে এই ব্যাপারে ধীরে ধীরে কিছু পরিবর্তন আসে। বস্ত্র উৎপাদনকারী শহরগুলিতে handloom factory'-র আবির্ভাব হয়, যেখানে দুর-দুরান্ত থেকে আসা শ্রমিকদেরও নিয়োগ করা হত। এগুলির সূচনা করেছিলেন ধনী তাঁতীরা ও বণিকরা, যারা বস্ত্র, সূতা, রেশম ইত্যাদির বাণিজ্যের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন। এই factory গুলিতে উন্নতমানের যন্ত্র (tool) ব্যবহৃত হত। এগুলিকে পশ্চিম ভারতের বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত বিভিন্ন শহরে দেখা যেত, যেমন শোলাপুর, মালেগাঁও, বুরহানপুর, সুরাট ইত্যাদি।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে বিভাজন ছিল। উপরের স্তরে যারা ছিলেন তারা ভালই উপার্জন করতেন -- এদের বসবাস সাধারণত ছিল শহরে, এঁরা সূক্ষ্ম নক্সা সমন্বিত রেশম ও সূতীর কাপড় উৎপাদন করতেন, দুর-দূরান্তের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতেন। এইসব 'weaver elite'দের বিপরীতে ছিলেন গ্রামীণ কারিগররা, যারা স্থানীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগান দিতেন। মোটা ধরনের সূতীবস্ত্র উৎপাদনে, কারিগর ও কৃষি শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য খুব কম ছিল। অর্থাৎ প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে একই ব্যক্তি কখনও কারিগর হিসাবে তাঁত শিল্পে, কখনও কৃষি শ্রমিক হিসাবে কৃষিতে কাজ করতেন। এই গ্রামীণ কারিগরদের উৎপাদিত দ্রব্য সাধারণতঃ স্থানীয় স্তরেই বেচা কেনা হতো। সাধারণতঃ রেশম বা খুব সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র যারা উৎপাদন করতেন, তাদের আয় ছিল, মোটা বা সাধারণ বস্ত্র উৎপাদক তাঁতীদের অপেক্ষা তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশী। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে বিভিন্ন শ্রেণীর তাঁত শিল্পী ছিলেন, যারা যে যার দক্ষতা, মূলধন, চাহিদা মতো শহরে বা গ্রামে উৎপাদন করতেন।

যাই হোক, সামগ্রিক ভাবে হস্তশিল্পে শ্রমের ব্যবহার পর্যালোচনা করলে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। "...one of the fundamental long-term tendencies in traditional

small-scale industry has been the increasing employment of hired labour or the growth of a labour market." (T. Roy, ibid, p.208)। এই ধরনের প্রবণতা বেশী দেখা যায়, যেখানে ফ্যাক্টরীগুলি বেশী করে আবির্ভূত হয়েছিল। এই ফ্যাক্টরীগুলি অবশ্যই বৃহদায়তন শিল্পের কারখানা নয় -- এগুলি ছিল মূলত শেড (shed), যেখানে অনেক শ্রমিক বা কারিগর কাজ করত। এই শেডগুলি সাধারণতঃ রেজিষ্ট্রীকৃত হত না, ফ্যাক্টরী হিসাবে। বিভিন্ন শিল্পে এগুলিকে দেখা যেত। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরে যেখানে 'handloom weaving' গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেখানে দুর-দূরান্ত থেকে আসা শ্রমিকদের (migrant labour), এই ফ্যাক্টরীর মাধ্যমে কাজে লাগানো হতো। যে সব শিল্পে ততটা দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল না, যেমন চামড়া প্রস্তুতকরণ (tanning) শিল্প -- সেখানে ফ্যাক্টরীগুলিকে দেখা যায়। উত্তর ভারতের কিছু জায়গায় বণিকরা শেড স্থাপন করতেন যেখানে মূল কারিগর (master artisan) তাঁর সহযোগীদের (apprentices) নিয়ে এসে কাজ করতেন। অর্থাৎ এখানে দক্ষ কারিগররা এই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েন।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে, বিভিন্ন শহরে বা উৎপাদন কেন্দ্রে এই ধরনের ফ্যাক্টরীগুলি বিকাশ লাভ করলে, কারিগররা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সেখানে ভিড় জমান। তবে যেসব শিল্পে খুব দক্ষতার প্রয়োজন হতো, সেখানে সেভাবে কোন শ্রমের বাজার গড়ে ওঠেনি। এই ধরনের শিল্পের কারিগররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কর্মসংস্থানের জন্য যেতেন কম, আর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও এখানে প্রায় ছিল না। মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ এক্ষেত্রে কম হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক শ্রম কাজে লাগানো হতো, কিংবা মূল কারিগর (master) সহযোগী কারিগরদের (apprentice) মাধ্যমে উৎপাদন করতেন। প্রথমটি, হিন্দু কারিগরদের মধ্যে বেশী দেখা যায় ও দ্বিতীয়টি মুসলিম কারিগরদের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল। কার্পেট শিল্পে apprenticeship ব্যবস্থার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উভয় ধরনের উৎপাদনেই শিশুদের নিয়োগ করা হতো।

বস্তুতঃ হস্তশিল্পে, বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পে নারী ও শিশু শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁতী পরিবারের মহিলারা, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁতী সাধারণতঃ পুরুষরাই হতেন। তবে তাঁতী পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁত বুনতে জানতেন। ১৯৩১-র একটি হিসাবে দেখা যায় যে বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমের ৪০% ছিল মহিলাদের শ্রম। Household industry-র ক্ষেত্রেও অনুপাতটি একই রকম ছিল।

যাই হোক, পরিবার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা বা apprentice-দের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা -- এ দুটি ছিল হস্তশিল্পে চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থা। বিংশ শতকে এ দুটির অবনতি দেখা যায়। এ সময়

শ্রমের বাজার-এর আয়তন বৃদ্ধি পায় পারিবারিক শ্রমের বদলে মজুরির বিনিময়ে শ্রম (wage labour) নিয়োগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিকীকরণ, বাজারের প্রসার, বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিকদের আগমন, শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ, কৃৎকৌশলের পরিবর্তন প্রভৃতি, হস্তশিল্পে শ্রম নিয়োগের চিরাচরিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের সূত্রপাত করে।

৫.৪.৩.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Kumar Dharma (Ed) : Cambridge Economic History of India (Cambridge, 1983)

(2) Roy, Tirthankar : The Economic History of India 1857-1947, Second Edition (Oxford, 2006)

(3) ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)

৫.৪.৩.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) How do you explain the transition in handicraft industry under colonialism ?

(2) Discuss the importance of traditional small-scale industry or handicrafts to Indian economy in the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century.

(3) Discuss various sources of capital in the handicraft industry during colonial rule.

(4) Analyse different aspects of labour in handicraft industry under colonialism.

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

Rural Economy : Changes and Continuity

একক - ২

নগর অর্থনীতি

Rural Economy

বিন্যাসক্রম ঃ

৩.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৩.৬.২.১ ঃ সুচনা (Introduction)

৩.৬.২.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

৩.৬.২.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

৩.৬.২.২ ঃ নগর অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

৩.৬.২.২.১ ঃ কারিগর ও শিল্প উৎপাদন

৩.৬.২.২.২ ঃ অবশিল্পায়ন বিতর্ক ও আঞ্চলিক তারতম্য

৩.৬.২.২.৩ ঃ অভ্যন্তরীণ বাজার ও নগরায়ণ

৩.৬.২.২.৪ ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা — ডাক ও তার এবং রেলওয়ে

৩.৬.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৬.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করলে কি কি জানা যাবে ঃ

(১) সাধারণভাবে ভারতবর্ষের নগর ও নগরায়ণের ইতিহাসকে জানা যাবে।

(২) প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নগর অর্থনীতির আদল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

(৩) ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত নগর অর্থনীতির পরিবর্তনকে এখানে বোঝানো হয়েছে।

(৪) নগর অর্থনীতিতে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকা ও তার পরিবর্তন প্রক্রিয়া এখানে আলোচিত হয়েছে।

(৫) অবশিল্পায়নের স্বরূপ, তার উৎস সর্ম্পকে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

(৬) অবশিল্পায়ন বিতর্কের সনাতন রূপটি সর্ম্পকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশিল্পায়ন বিতর্কের প্রচলিত ধারণাটি কতটা পরিবর্তিত হয়েছে সেকথাও বলা আছে।

(৮) ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া সর্ম্পকে এখানে আলোচনা আছে।

(৯) ডাক, তার ও রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

৩.৬.২.১ ঃ সুচনা (Introduction)

৩.৬.২.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে সাধারণভাবে অর্থনীতির কাঠামোগত দিকটিকে বোঝায়। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান বাজার, ঋণব্যবস্থা সবকিছুই অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একেবারে নিচুতলা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে কাঠামোগত পার্থক্য থাকে। এগুলি কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাজার এবং অর্থনীতির নানা সূত্র ধরে বিভিন্ন সংগঠন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা ধরনের টানা পোড়েনের মতো বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক সংগঠনেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক সংগঠনের এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ ও তার পরিবর্তনের ধারাকে না বুঝতে পারলে কোন দেশের বা কোন কালের ইতিহাসকে ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা খুব একটা প্রাধান্য পেত না। অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা সেই দিক থেকে ইতিহাস চর্চায় নতুনত্বের দাবী রাখে।

প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে কী বোঝ ?

৩.৬.২.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনটি সমকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা সনাতন অর্থনীতির মতোই ছিল কতকটা ঢিলে ঢালা। স্বাভাবিক কারণেই কৃষিই ছিল সেই অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। দেশের এক অংশের কৃষিজ উৎপন্নের

বাজার গড়ে উঠেছিল দূরবর্তী অংশে। নিকট ও দূরবর্তী উভয় প্রকার বাণিজ্যের অংশীদার ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছোট বড় নানা মাপের ব্যবসায়ীরা। জল এবং স্থল উভয় পথেই এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বলতে উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পও যেমন ছিল তেমনি ছিল বহু বিস্তৃত গ্রামীণ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর বিশেষ কদর ছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়াও ভারতীয় ইস্পাত ও তৈজসপত্র নিয়মিত রপ্তানি হতো। গ্রামীণ শিল্প বিশেষত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত ছিল। গুজরাট, করমণ্ডল, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলায় বস্ত্র শিল্প ছিল কৃষির পরই গ্রামীণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা।

স্বাভাবিক কারণেই কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। গ্রামীণ শিল্প বিশেষত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত ছিল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও, প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব যে একটা উন্নত ছিল এরকম মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। তাই গ্রামবাসী অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পারিবারিক ভিত্তিতে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই এই কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতো। অবশ্য, ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চল বাণিজ্যিক শস্য চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল — যেমন তুলো, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি। এই সমস্ত কৃষিপণ্যের বিস্তৃত বাজারও গড়ে উঠেছিল, তবুও প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থা সাধারণভাবে ভালো ছিল না। উৎপন্ন ফসলের বেশিরভাগটাই রাজস্বদায় মেটাতে চলে যেত। মুঘল সম্রাটের হয়ে রাজস্ব আদায়ের কাজে সহযোগিতার জন্য ছিল বিপুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রামীণ এক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী।

পারিবারীক ভিত্তেতে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতো।

কৃষকের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব আদায়ের সহযোগিতার মূল্য হিসাবে তারা নিয়ে নিত। ফলে, কৃষকের হাতে উদবৃত্ত বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং, গ্রামের বাইরে উৎপন্ন কোন জিনিষ কৃষকের পক্ষে কেনা প্রায়শই সম্ভব হতো না। কৃষি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অল্পবিস্তর শিল্পের কাজও হতো। গ্রাম বিশেষে এই শিল্পকর্মের চরিত্র এক এক রকম হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপন্নের একটা অংশ বাজারেও যেত। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ছোটখাটো বাইরের পাইকার বা ব্যবসায়ির আনাগোনাও ছিল। কিন্তু, প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রই ঠিক সেই অর্থে মুদ্রায়িত ছিল না।

রাজস্ব আদায়ের পর কৃষকদের হাতে উদ্বৃত্ত বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। গ্রাম সমাজের বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে নাগরিক সমাজকে গড়ে তুলছে।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নগরের স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। প্রাক্-মুঘল উত্তর ভারতের নগরায়ণ নিয়ে অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবের আলোচনায় গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে নগর-অর্থনীতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। গ্রামসমাজের বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে নাগরিক সমাজকে গড়ে তুলেছে। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া নতুন করে উৎসাহিত হয়। সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকেরা অনেকসময়েই মুঘল নগরগুলিকে সামরিক শিবিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রধান প্রধান মুঘল শহরগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত দুর্গপ্রাকারই তাদের এই ধরনের ভ্রান্তির প্রধান কারণ।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের নগর ও নগরায়ণকে নিয়ে সাম্প্রতিককালে বহু গবেষণা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণার মূল সূত্রটিকে এখানে সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে। নগরায়ণ ও নাগরিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নগরগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তথা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নগরগুলিকে ভাগ করা হয়েছে যা সমসাময়িক ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রাজধানী শহর। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর অথবা অযোধ্যা, পাটনা, ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের মতো অসংখ্য রাজধানী শহর গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিল। রাজধানী অথবা শাসকের আবাসস্থল এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত শহরগুলি সমসাময়িক ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এইসব রাজধানী শহরের পাশাপাশি কতকগুলি শহর ছিল বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো বড়ো নদীপথ, রাজপথ অথবা বাজারকে কেন্দ্র করে এই ধরনের নগরায়ণ সংগঠিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, রাজধানী শহরের তুলনায় এইসব বাণিজ্যিক বা বাজার শহরের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবও ছিল অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এক-এক শহরে একেক ধরনের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণীর বসবাসের ফলে বাণিজ্যিক শহরগুলির চরিত্র ও মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।

রাজধানী এবং বাণিজ্যিক শহরের পাশাপাশি আরও একধরনের শহর সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে দেখতে পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে এগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং স্থিতিশীল। এক অর্থে বাণিজ্যিক শহরের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এই শহরগুলি তীর্থ বা মন্দির শহর নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এই ধরনের মন্দির শহরগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

> *নগরগুলির বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র থাকলেও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল লক্ষ্য করা যায়।*

রাজধানী, বাণিজ্যকেন্দ্র অথবা তীর্থ শহরগুলির বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্য ছিল। কিন্তু এই তিনধরনের শহরের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পোৎপাদনের সূত্রে সম্পূর্ণ মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি শহরের অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিপতি মহাজনশ্রেণী সাধারণ ব্যবসায়ী ও পাইকার এবং নানা ধরনের শিল্পকর্মে নিযুক্ত কারিগর সমাজ ছিল নগরজীবনের প্রধান অঙ্গ। প্রত্যক্ষভাবে শাসিত মুঘল রাজধানী শহরগুলিতে কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রশ্ন

১। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। তা কিভাবে নগরায়ন উদ্ভবে সহায়তা করেছিল।

৩.৬.২.২ ঃ নগর অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

৩.৬.২.২.১ ঃ কারিগর ও শিল্প উৎপাদন

ইংরেজ শাসন পত্তনের ফলে ভারতবর্ষের নগর জীবনের প্রতিষ্ঠিত ধারাটি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের সবথেকে বড় প্রভাব পড়েছিল নগরভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। শহুরে উৎপাদন ব্যবস্থার বেশিরভাগটাই জুড়ে ছিল কারিগর সমাজ। প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। বিস্তৃত সেসব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

মূল কথা হলো, নগর ভিত্তিক এই শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত অভিজাত সমাজ ও দূরবর্তী বাণিজ্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হতো। সংখ্যার দিক থেকে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কারিগরেরা খুব একটা বড় না হলেও বৈচিত্র্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অর্থমূল্যে তাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এইসব কারিগর ও তাদের সহযোগী নানা গোষ্ঠীর মানুষরাই দৈনন্দিন নাগরিক জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকতো। শহরাঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সে কারণে, নাগরিক ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

নগরভিত্তিক এই কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাতশ্রেণীর চাহিদা। ভারতবর্ষের বিস্তৃত অংশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের অপসারণের ফলে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অভিজাত চাহিদার অবসান ঘটে। শহুরে কারিগর সমাজ তাদের পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। ঢাকা অথবা মুর্শিদাবাদ শহরের মসলিন ও রেশম শিল্প মুঘল শাসনের অবলুপ্তি এবং বাংলার নবাবি আমলের অবসানের ফলে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঐতিহাসিক নির্মল কুমার সিংহের আলোচনায় সে বিষয়ে বিস্তৃত পরিসংখ্যান ও তথ্য পাওয়া যায়। অভিজাত চাহিদার এই আকস্মিক অবলুপ্তি শহুরে শিল্পব্যবস্থার পুরোনো সংগঠনটাই নষ্ট করে দেয়। প্রতিক্রিয়ায় পারস্য বা এশিয়ার অন্যান্য দেশ বা ভারতবর্ষের দূরবর্তী অংশের সঙ্গে এইসব শহরের যে দীর্ঘ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তাও দ্রুত ভেঙে পড়ে। সনাতন এইসব শিল্পের উপর নির্ভরশীল এককালের সম্পন্ন কারিগর সমাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শহরে উৎপাদন ব্যবস্থার বেশিরভাগটাই জুড়ে ছিল কারিগর সমাজ। অভিজাত চাহিদার আকস্মিক অবলুপ্তি শহুরে শিল্প ব্যবস্থার পুরানো সংগঠন নষ্ট করে।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হতে শুরু করলে সেই সব অঞ্চলের নগর ভিত্তিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তর ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে শহুরে কারিগর সমাজের ওপর অভিজাত চাহিদার অবলুপ্তির প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঐতিহাসিক বেঈলি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মধ্য ভারতবর্ষে পেশোয়া শাসনের অবসানও ঠিক একই রকম প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের কিছু কিছু অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম ঘটে। বিস্তৃত সেই সব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অভিজাত চাহিদার অবলুপ্তি ছাড়াও আর্থিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথমযুগে ইংরেজ প্রবর্তিত কিছু কিছু নীতিগত কারণেও কারিগর নির্ভর শহুরে উৎপাদন ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরোনো বাজার, মূলধন ও ঋণ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলেও কারিগরদের পক্ষে ঠিক আগের মতন উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কারিগরদের এই ক্ষতি তাদের অন্যান্য সহযোগী সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করে।

আগে মনে করা হতো ইংরেজ শাসন পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। যার ফলে সেখানকার কারিগরেরা নতুন জীবিকার সন্ধানে শহরাঞ্চল ত্যাগ করে গ্রামমুখী হতে থাকে। পরবর্তী কালের গবেষণায় এই ধারণা অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়েছে। ইংরেজ শাসন সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে শহরাঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত চেহারাটা পাল্টে গেলেও কারিগর সমাজ নানা কারণে তাদের সনাতন উপজীবিকাকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে। অবশ্য এতদিন তারা যে ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করতো অথবা যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বাজারকে লক্ষ্য রেখে তাদের জীবন পরিচালিত হতো সে সমস্ত কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটে। তবুও, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা বা মাদ্রাজ মুলুকের শহরাঞ্চলেও শিল্পোৎপাদনের পুরোনো আদলটাই মোটামুটিভাবে বজায় থাকে। মজার কথা হলো, ইংরেজ কোম্পানির শাসন একদিকে যেমন এইসব পরিবর্তনের সূত্রপাত করে তেমনি অন্যদিকে কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থ আবার ভারতবর্ষের কতকগুলি শিল্পকর্মকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

অভিজাত চাহিদার অবলুপ্তি ছাড়াও আর্থিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ প্রর্বতিত কিছু কিছু নীতিগত কারণেও কারিগর নির্ভর শহুরে উৎপাদন ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন

১। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নগর অর্থনীতিতে কারিগরী ও শিল্প উৎপাদন কি পরিবর্তন এনেছিল ?

৩.৬.২.২.২ ঃ অবশিল্পায়ন বিতর্ক ও আঞ্চলিক তারতম্য

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের অবসান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিবর্তন এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। ইতিমধ্যে, ইংল্যান্ড বস্ত্রশিল্প-নির্ভর শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে উন্নীত হওয়ায় সে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রনির্মিত সস্তা সুতো ও কাপড় ভারতের বন্দর শহরগুলিতে আসতে শুরু করে। প্রথম দিকে কাপড়ের তুলনায় সুতোর যোগান ছিল বেশি এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অনিয়ন্ত্রিত। পরবর্তীকালে অবশ্য কাপড়ের যোগানও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় সুতিবস্ত্র শিল্প সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু, শহরাঞ্চলের কারিগরদের ওপর এর প্রভাব ছিল আশু এবং অত্যন্ত ব্যাপক। অনিয়ন্ত্রিতভাবে সুতো আমদানির ফলে কেবলমাত্র সুতো কেটে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের শহরগুলিতে সুতো তৈরি করা ছিল এক শ্রেণীর মানুষের সর্বক্ষণের উপজীবিকা। এ ছাড়াও শহরের তাঁতিদের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ সুতোর যোগান আসতো। সুতো বোনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল অসংখ্য গ্রামীণ পরিবারের মেয়েরা।

ইংল্যান্ড থেকে সস্তা সুতোর অনিয়ন্ত্রিত যোগানের ফলে এই উভয় শ্রেণীর মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই প্রথম দিকে তাঁতিদের থেকে সুতো কাটনিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সংখ্যাগত দিক থেকেও তাঁতিদের তুলনায় তাদের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব মানুষের কর্মহীনতা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর কিছুকাল পর থেকে, সুতো কাটনিদের মতো এক শ্রেণীর তাঁতিরাও এই কর্মহীন মানুষের দলে যোগ দিতে থাকলে গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থাও এসবের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোক্তা হিসাবে বিপুল সংখ্যক কর্মহীন এইসব মানুষের চাহিদা কমে গেলে গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি মন্দার অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার কথা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। নিতান্ত দরিদ্র এইসব শ্রেণীর মানুষ কৃষিকে নির্ভর করে নতুন জীবিকা সন্ধানের চেষ্টা করলে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা ও ব্যবস্থাগত সহনশীলতা হ্রাস পেতে থাকে।

সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় সুতিবস্ত্র শিল্প সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় দেশীয় শিল্পব্যবস্থার ওপর ব্রিটিশ শাসনের এই সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াই অবশিল্পায়নের ধারণা নামে পরিচিত। অবশিল্পায়ন অর্থাৎ দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং ফলতঃ কৃষি ও শিল্পের মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যের বিনাশ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী চিন্তাবিদদের কাছে অবশিল্পায়নের তত্ত্ব ছিল এক মস্ত হাতিয়ার। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বারবার এই তত্ত্বের ব্যবহার করেন। সে কারণে, অবশিল্পায়নের ভাবনা একদিকে যেমন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, তেমনি অন্যদিকে এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় অবশিল্পায়নের তত্ত্বকে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। এই সময় জাতীয়তাবাদী ভাবনার অনুসারী চিন্তাবিদরা সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সংঘটিত অবশিল্পায়নের ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। অপর এক দল এইসব সংখ্যাতত্ত্বের প্রকৃতি ও প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আলোচনা পদ্ধতি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা পদ্ধতিগত বিষয়ের উল্লেখ করে তাদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ড্যানিয়েল থর্নার, অমিয়কুমার বাগচী, তরু মাতসুঈ বা মরিস ডেভিড মরিসের মতো ঐতিহাসিকেরা। এই সময়ে অবশিল্পায়নের পক্ষে বিপক্ষে সন্নিবেশিত নানা যুক্তি, তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রাসঙ্গিক ইতিহাসচর্চার প্রচলিত ধারণার সম্প্রসারণ ঘটায়।

অবশিল্পায়ন বলতে বোঝা যায়, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং ফলতঃ কৃষি ও শিল্পের মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যের বিনাশ।

প্রশ্ন

১। অবশিল্পায়ন বলতে কি বোঝ ?

অধ্যাপক মরিস ডেভিড মরিসের মতে অবশিল্পায়ন সম্পর্কিত ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় প্রচলিত ধারণাটি ভীষণভাবে অতিরঞ্জিত। তিনি মনে করেন ব্রিটিশ আমলে ইংল্যান্ড থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র আমদানি করা হয়েছিল, ভারতবর্ষের মোট বস্ত্র-চাহিদার অনুপাতে তার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট কম। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভারতের বস্ত্র চাহিদাও ইতিমধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমদানিকৃত বস্ত্র ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বস্ত্রোৎপাদনের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছিল এই যুক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য মরিস স্বীকার করেন যে সুতো আমদানির ফলে ভারতবর্ষে সুতো বোনার কাজের সুযোগ অনেকটাই সংকুচিত হয়েছিল।

অবশিল্পায়ন তত্ত্বের সমর্থনকারী ঐতিহাসিকেরা অবশ্য মরিসের তত্ত্বকে নানাভাবে অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুতো বোনার কাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়। সমকালীন সময়ে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা কঠিন। তাই মরিসের যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশেষে গোটা উনিশ শতক ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতীদের জীবনযাত্রার মান দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, যার সঙ্গে মরিসের সিদ্ধান্তকে কোনোভাবেই মেলানো যায় না।

এসমস্ত সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান অপূর্ণ থেকে যায়। ভারতের মতো বিশাল দেশজুড়ে এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সর্বত্র একই সঙ্গে একইভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল কি ? সুতরাং, অবশিল্পায়ন সম্পর্কিত পরবর্তীকালের আলোচনায় আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেতে থাকে। মূলতঃ ১৯৮০ দশক থেকে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের তাঁতশিল্পকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু হয়। এই সমস্ত গবেষণার সামগ্রিক ফলস্বরূপ অবশিল্পায়ন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত ভাবনাটির অনেক পরিবর্তন ঘটে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ব্রিটেন থেকে অবাধে যন্ত্রনির্মিত সুতো ও কাপড় আমদানির ফলে ভারতের তাঁতশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু, এই প্রক্রিয়ার অভিঘাত ছিল একেক জায়গায় এক এক রকম। অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার তারতম্য ও তার স্বরূপ নিয়ে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা নতুন করে বহু তথ্য ও পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে যে সময়ে ও যে ভাবে অবশিল্পায়ন সংঘটিত হয়েছিল সুদূর রাজস্থানে সেই সময়ে তাঁত শিল্পের ওপর তার কোন প্রভাব পড়েনি। আবার, সুতো উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, হস্তচালিত তাঁতশিল্প সেরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অবশিল্পায়নের অভিঘাত প্রক্রিয়ার সময়গত তারতম্যের প্রশ্নটিও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও এতকাল অনালোচিত ছিল। প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিল্প ব্যবস্থায় তাঁতের প্রাধান্য থাকলেও সেটিই কেবল একমাত্র শিল্প ছিল না। তাঁতশিল্পের পাশাপাশি আরো অনেক শিল্প ছিল যেগুলির দিকে অবশিল্পায়ন তত্ত্বের ঐতিহাসিকরা এতকাল ফিরে তাকাননি। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁতশিল্প যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সময় অন্যান্য শিল্পগুলির অবস্থা কি হলো সেই প্রশ্নের মীমাংসা না হলে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অভিঘাতের স্বরূপ সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা করা চলে কি?

অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে আলোচনাকালে মরিস ডেভিড মরিস সর্বপ্রথম প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কিন্তু, এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী আর পাঁচজনের মতো তিনি নিজেও তাঁতশিল্প ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পের দিকে খুব একটা নজর দিতে

পারেননি। তবে তাঁর আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এমন দু-একটি ইঙ্গিত ছিল যেগুলি পরবর্তী গবেষকদের কাজ নিঃসন্দেহে সহজ করেছে। অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালের প্রকাশিত লেখাপত্রে দীর্ঘকাল অবহেলিত এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। মোট কথা হলো, তাঁতশিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পগুলি অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরঞ্চ , নানা কারণে ঔপনিবেশিক শাসনকালে কতকগুলি শিল্প বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন ধাতু ও অন্যান্য কাঁচামাল আসতে শুরু করে। একইভাবে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য এবং ইংরেজ শাসন সীমিতভাবে হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয় কারিগরী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। ঠিক একইভাবে নতুন পরিবহন ব্যবস্থা এবং সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে সহজ সমুদ্রযাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক নিবিড়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে কতকগুলি অর্ধসমাপ্ত কারিগরী দ্রব্যের চাহিদা ইউরোপের বাজারে বাড়তে থাকে। এর ফলে ভারতবর্ষের ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক তীর্থঙ্কর রায় চামড়া তৈরীকে কেন্দ্র করে এবিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। কাঁচা চামড়ার বর্ধিত চাহিদার ফলে কলকাতা, মাদ্রাজ, প্রভৃতি শহরের চামড়া-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। এসমস্ত শিল্পে গ্রামাঞ্চল থেকে বহু মুচি এসে ভিড় জমায়। কাঁসারী বা কামারদের মতো কারিগরদের ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক যুগে এই ধরনের চাহিদা বিস্তারের ঘটনা ঘটে ; যদিও সেখানে বহির্ভারতীয় চাহিদার ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত।

> তাঁতশিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পগুলি অতটা ক্ষতিক্রস্ত হয় নি। নানা কারণে তৎকালীন সময়ে কতগুলি শিল্প বিশেষ লাভবান হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। অবশিল্পায়ন বিতর্কে আঞ্চলিক তারতম্য ব্যাখ্যা করো।

৩.৬.২.২.৩ ঃ অভ্যন্তরীণ বাজার ও নগরায়ণ

ঔপনিবেশিক শাসনের আলোচ্য পর্বে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অপর গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারের সংযুক্তি সাধন। ইংরেজ শাসন শুরু হবার অব্যবহিত আগে ভারতবর্ষের বাজারের অবস্থা ছিল ভীষণভাবে অসংগঠিত এবং বহু বিভক্ত। এক এক অঞ্চলের বাজারের অবস্থা ছিল এক এক রকম। মোটা দাগের এই আঞ্চলিক তারতম্যের কথা ছেড়ে দিলেও এক একটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলির মধ্যেও কোন প্রকার যোগাযোগ বা ব্যবহারিক সমতা ছিল না। একেবারে বুনিয়াদি স্তরে অবস্থিত বাজারগুলির অবস্থা ছিল আরো খারাপ। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বাজারে ক্রেতা ও গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি বিনিময়ই ছিল বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা। এমনকি জেলা স্তরে অবস্থিত প্রধান প্রধান বাজারের অবস্থাও ছিল কতকটা একই রকম। একই দ্রব্যের জন্য কাছাকাছি অবস্থিত বাজারগুলিতেও এক এক ধরনের মূল্যমান ও ব্যবসায়িক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল।

> *ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অবস্থা পরিবর্তনে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে শুরু করে। সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর।*

সমগ্র দেশ জুড়ে এ রকম অসংগঠিত এবং বহু বিভক্ত বাজারের অস্তিত্বের প্রধান কারণ ছিল প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। এ সবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর। বন্দর শহর বা বড় বড় জলপথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অবস্থা কিছুটা অন্যরকম হলেও প্রায়ক্ষেত্রেই দেশের ভেতরকার অংশগুলি ছিল ব্যবসা বাণিজ্য থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা পরিবর্তনে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে শুরু করে। বাংলা বা মাদ্রাজ মুলুকের মতো অঞ্চলগুলিতে কোম্পানি তার বাণিজ্যিক রসদ সংগ্রহের প্রয়োজনে একটু একটু করে দেশের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করতে থাকে। একই সঙ্গে সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বার্থে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ যোগাযোগের উপযোগী পথ তৈরীর চেষ্টাও শুরু করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার চলে যাওয়ার ফলে দেশের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করবার সরকারি এবং বে-সরকারি প্রচেষ্টা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এ সবের সূত্র ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেকার ব্যবসা ও বাণিজ্যিক যোগাযোগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর ভারতবর্ষ জুড়ে একই ধরনের মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার প্রচলন এই প্রবণতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষে একদিকে যেমন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মতো অতিবৃহৎ ঔপনিবেশিক শহরগুলি গড়ে উঠতে থাকে তেমনি অন্যদিকে প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহরগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়। এর একটা বড় কারণ দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাত শ্রেণীর অবলুপ্তি। উত্তর ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে পূর্ব-পশ্চিম ও মধ্য ভারতবর্ষের সর্বত্র এই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পুরনো রাজধানী শহর বা বাণিজ্যিক শহরগুলি থেকে প্রভাবশালী মানুষজন নতুন ঔপনিবেশিক শহরগুলির দিকে পাড়ি জমাতে থাকেন। ফলে পুরনো শহরগুলি জনশূন্য হয়ে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হারায়। একইভাবে এইসমস্ত শহরগুলির ওপর নির্ভরশীল কারিগর সমাজ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক শাসনের নতুন স্থান ও পরিবেশে ব্যবসা পত্তন করতে পারলেও অধিকাংশই তাদের পূর্বতন প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক ভারতে বাজারের সংযোগ সাধনের অর্থনৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

আলোচ্য সময়কালে বড় বড় ঔপনিবেশিক শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৃহৎ বাজারগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাজারের সঙ্গে এক ধরনের ব্যবসায়িক সংযুক্তিসাধন ঘটায়। এদেশে ইংরেজ শাসন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো শহরগুলিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে অতি বৃহৎ বাজার গড়ে উঠতে থাকে। সাধারণভাবে ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে ইংরেজ ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত অঞ্চলে দেশি বিদেশী ব্যবসায়ী ও মহাজন গোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটে। এদের টানে কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো শহরগুলিতে একদিকে যেমন নিকট অথবা দূর পার্শ্ববর্তী সমস্ত জায়গার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী জড়ো হতে থাকে; তেমনি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আনা পণ্যসমূহের বাজারও গড়ে ওঠে। দেশীয় শাসনের অবলুপ্তি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে।

এই সমস্ত শহরে বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়িক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বীমা ও ব্যাংক সংগঠন এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে নানা ধরনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজে অবস্থিত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে লন্ডনের বাজার এবং অন্যদিকে এ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলির মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। এদের মাধ্যমেই দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের তুলো চাষকে কেন্দ্র করে সংঘটিত উন্মাদনা এই ধরনের বাজার-নির্ভর সংযোগসাধনের সবচাইতে বড় উদাহরণ। পূর্ববর্তী অংশে সে কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো প্রধান প্রধান ঔপনিবেশিক শহরগুলি ছাড়াও রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই নতুন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। নতুন এইসব ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্মের মূল লক্ষ্যই ছিল ইংরেজ বাণিজ্যস্বার্থে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরকে আরো বেশি বেশি করে উন্মুক্ত করা ; যাতে করে এ দেশ থেকে কৃষিপণ্যের সহজ রপ্তানি এবং ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়। এই স্বার্থের টানে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ছোট ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায়িক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলের এইসব অঞ্চলের সঙ্গে কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো ভারতের প্রধান প্রধান ঔপনিবেশিক শহরের মধ্যে নিবিড় ব্যবসায়িক সংযোগ গড়ে ওঠে। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের স্বার্থে ঔপনিবেশিক শহরে অবস্থিত ব্যবসা, বাণিজ্য, বীমা, ব্যাংক ও পণ্য পরিবহণ প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট শহরগুলিতে তাদের কাজকর্ম সম্প্রসারণ করতে থাকে।

৩.৬.২.২.৪ ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা — ডাক ও তার এবং রেলওয়ে

এই ব্যবসায়িক স্বার্থেই লন্ডনের সঙ্গে ভারতবর্ষকে আরো নিবিড়ভাবে যুক্ত করবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা শুরু হয়। ব্রিটিশ পুঁজি ও ব্যবসায়িক স্বার্থের কাজে ভারতের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করবার জন্য পথঘাট নির্মাণের কথা আগেই বলা হয়েছে। আলোচ্য সময়কালে, নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বাষ্পীয় জলযান এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন। বাষ্পীয় জলযান প্রথমে ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত শুরু করে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীপথেও এই ধরনের জলযানের ব্যবহার শুরু হলে দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর শহরগুলিতে পণ্য আমদানি আরো সহজ হয় এবং তার যোগানও বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত স্থানগুলি থেকে কৃষিপণ্যের পরিবহণের ক্ষেত্রে এই ধরনের জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা নতুন এক পর্বের সূচনা করে।

> *ব্রিটিশ পুঁজি ও ব্যবসায়িক স্বার্থের কাজে ভারতের অভ্যন্তরে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। ডাক ব্যবস্থাকে নির্ভর করে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠে।*

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন পত্তনের শুরু থেকেই সীমিত দূরত্বের মধ্যে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয়ে ছিল। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইংরেজ সেনা ছাউনির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার স্বার্থে গড়ে তোলা এই ডাক ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সামরিক। পরবর্তীকালে, শাসনতান্ত্রিক স্বার্থেও এর ব্যবহার শুরু হলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ডাক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। দেশব্যাপী বিস্তৃত এই ডাক ব্যবস্থাকে নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

এই ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে প্রবর্তিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করে। এ দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল পুরোপুরি সামরিক। সে কারণে, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নয়নের ধারা এখানে অনুসরণ করা হয়নি। এখানে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারি তৎপরতায় ও সরকারি খরচে। ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের কাজ যে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা হয়েছিল অথবা টেলিগ্রাফের প্রধান প্রধান লাইন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ দেশের যেসব অঞ্চলগুলিকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি রাখলে এই কথার যথার্থতা বোঝা যাবে।

> *সরকারের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পাশাপাশি ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজও ভীষণভাবে লাভবান হয়।*

সে যাই হোক, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের ফলে ভারতবর্ষের দূরবর্তী অঞ্চলেও লন্ডন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। মোট কথা, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ফলে সরকারের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পাশাপাশি

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজও ভীষণভাবে লাভবান হয়। বাজারের সংযুক্তিসাধনের যে প্রক্রিয়ার বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের ফলে সে কাজ যে ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

১৭৫৭-১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পত্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু এ দেশীয় অর্থব্যবস্থার উপর তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তখনো অনুভূত হয়নি। এ দেশে রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে পদ্ধতিগত আলোচনা ও রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ব্যক্তিগত পুঁজিকে আকৃষ্ট করবার কাজে বহু কালক্ষেপ হয়। অবশেষে, আলোচ্য সময়ের একেবারে শেষের দিকে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতবর্ষে স্বল্প দূরত্বের দুটি মাত্র রেলপথ কার্যকরী হয়েছিল। তাই, দেশীয় অর্থব্যবস্থার উপর রেলপথের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াকে লক্ষ্য করবার জন্য আমাদের উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক একটা কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে সিপাহী বিদ্রোহের মত যুগান্তকারী ঘটনায় বিদ্রোহী শক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির চূড়ান্ত সাফল্যে টেলিগ্রাফ এবং রেলপথ — এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন এই উভয় ব্যবস্থারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

প্রশ্ন

১। ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে নতুন যোগাযোগ ব্যবস্তার ফলাফল কী হয়েছিল ?

৩.৬.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

১। Binay Bhushan Chaudhuri (Ed.) Economic History of India from Eighteenth to Twentieth Century, Chapter-IV

২। সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি

৩। Indu Banga (Ed.), The City in Indian History.

৪। Dharma Kumar (Ed.), The Cambridge Economic History of India, Volume II, c.1757 – c.1857

৫। Tirthankar Roy, Traditional Industry in the Economy of Colonial India.

৩.৬.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতীয় নগরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২। প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নগর অর্থনীতিতে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকা আলোচনা কর। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা এই প্রক্রিয়াকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। অবশিল্পায়ন বলতে কি বোঝ? অবশিল্পায়ন বিতর্কের সনাতন ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। অবশিল্পায়ন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি সাম্প্রতিক গবেষণায় কতটা প্রভাবিত হয়েছে?

৫। ঔপনিবেশিক ভারতে বাজারের সংযুক্তি সাধনের অর্থনৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

৬। ঔপনিবেশিক শহর বলতে কি বোঝ? এই ধরনের শহরগুলির সঙ্গে প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতীয় শহরগুলির পার্থক্য কোথায়?

৭। ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে ডাক, তার ও রেলওয়ের মতো নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলাফল কি ছিল?

৮। আলোচ্য সময়কালে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) ভারতবর্ষের নগর অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তনের ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

ECONOMY AND AGRICULTURE

একক - ১

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ভারত

সম্পদের নির্গমন এবং ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

গঠন (Structure) ঃ

৪.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.২.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা বলতে বোঝায়

৪.২.১.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘরানা

৪.২.১.৩ ঃ বৃটিশ সওদাগরদের প্রাধান্য বিস্তার

৪.২.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারত

৪.২.১.৫ ঃ পুঁজির প্রবাহ

৪.২.১.৬ ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন

৪.২.১.৬.১ ঃ লেনদেন হিসাব ও সম্পদ নির্গমন

৪.২.১.৬.২ ঃ সম্পদ নির্গমনের ধারা

৪.২.১.৬.৩ ঃ নির্গমনের হিসাব

৪.২.১.৬.৪ ঃ নির্গমন তত্ত্বের সমালোচনা

৪.২.১.৬.৫ ঃ নির্গমনের ফলাফল

৪.২.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৪.২.১.৭.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রানীতি

৪.২.১.৭.২ ঃ রৌপ্যমানের প্রবর্তন

৪.২.১.৭.৩ ঃ রূপোর দাম হ্রাস ও মুদ্রানীতি নিয়ে বিতর্ক

৪.২.১.৭.৪ ঃ স্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা

৪.২.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে ও বিভিন্ন ঘরানায় সাম্রাজ্যবাদ

২। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় ভারত

৩। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে সম্পদের নির্গমন

৪। ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৪.২.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলতে বোঝায়

যে বিশ্বব্যবস্থায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বলে পশ্চাদপদ অনগ্রসর দেশগুলোকে নিজেদের তাবেদে রেখে তাদের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখে তাকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলে। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে পশ্চাদপদ দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করে শুধু সে দেশগুলোকে শাসন করে না, সে দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা জুড়ে বৃটেনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারত বৃটেনের অধীনে এক উপনিবেশে পরিণত হয়।

পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিশেষ করে ১৮১৩ সালে চার্টার আইনের নবীকরণের পর থেকে পরাজিত ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে একটা উপগ্রহ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা হয়। বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতে এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়। উদ্দেশ্য হোল, যেন সে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে সেবা করতে পারে। ভারত তার নিজের বাজার বৃটিশ পণ্যের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আর সে বৃটেনকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য জোগান দেওয়া শুরু করে। ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটাতে বাধ্য হয়। নিজের দেশের শিল্প ধ্বংস হয়। ভারত থেকে অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি হয়। নীট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় থাকা সত্ত্বেও প্রতিদানে সে তার প্রাপ্য পায় না। একে দাদাভাই নওরোজী নির্গমন বলেন। অর্থাৎ ঔপনিবেশিকরণের মাধ্যমে অবশিল্পায়ন ঘটানো হয়, ভারতে কৃষিতে বিশেষীকরণ করতে বাধ্য করা হয় আর ভারত থেকে সম্পদের নির্গমন ঘটে যাকে দেহের রক্তক্ষরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভারত পুঁজিস্বল্প দেশে পরিণত হয়।

এই অংশে আমাদের পাঠে আমরা বৃটেনের অধীনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকরণের মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতিকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। আরও দেখব যে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটানো হয় কিন্তু শিল্পায়নের কাজ ততদূরই অগ্রসর হতে পারে যতদূর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় থাকে। এই প্রসঙ্গে অস্কার ল্যাংগে বলেন, "অনুন্নত দেশগুলো হয়ে দাঁড়ায় একপেশেভাবে কাঁচামাল এবং খাদ্য রপ্তানিকারির অর্থনীতি। এইসব দেশে বিদেশি পুঁজির দৌলতে যে মুনাফা হত তার সেখানে পুনর্বিনিয়োগ ঘটত না, পাঠিয়ে দেওয়া হত সেই সব দেশে যেখান থেকে পুঁজি আসত।"

৪.২.১.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘরানা

ভারতে দুশো বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যে অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তার সঠিক প্রেক্ষিত তুলে ধরা দরকার। এর জন্য প্রথমেই আমরা যে বিভিন্ন ঘরানায় সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় ত্র সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি।

ইংলন্ডের লেবার পার্টির একজন বুদ্ধিজীবী জন হব্‌সন্ Imperialism নামক বইতে (১৯০২) যে সাম্রাজ্যবাদের ধারণার ব্যাখ্যা দেন তাতে বলা হয় উন্নত পুঁজিবাদি দেশে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বন্টনে বৈষম্য বাড়ে। সংখ্যায় বেশি হলেও শ্রমজীবী মানুষের আয় কম হয় আর উচ্চবিত্তদের আয় বেশি অথচ উচ্চবিত্তরা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে তার ওপর খুব বেশি অনুপাতে ভোগ করে না। উন্নত দেশে ধনী ব্যক্তিদের এই স্বল্পভোগ সমস্যা পণ্য উৎপাদনের সমস্যা তৈরি করে, দেশে পণ্যের বাজার না পাওয়ায় তাদের নজর দিতে হয় অন্যদেশে যেখানে বাজার পায়। অনগ্রসর দেশগুলোতে বাজার দখলের লড়াই শুরু হয়। ভোগস্বল্পতা এবং সঙ্গে সঞ্চয় প্রাচুর্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে উপনিবেশ গড়তে হয় কারণ দেশের বাজার সীমাবদ্ধ থাকায় সেখানে বিনিয়োগের সুযোগও সংকুচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিলফর্ডিং (১৯১০), লুকসেমবুর্গ (১৯১৩) এবং বলশেভিক রাশিয়ার রূপকার লেনিনের (১৯১৬) বই তিনটি প্রকাশিত হয়। এদের নাম যথাক্রমে Finance Imperialism, Accumulation of Capital এবং Imperialism– The Highest Stage of Capitalism. উল্লেখযোগ্য যে এই তিনজনই সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করেন। এঁদের ঘরানা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের উৎস নিহিত থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই। একে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করা হয়। এই ঘরানা অনুযায়ী ইউরোপের অতিরিক্ত পুঁজি উপনিবেশে বিনিয়োগ করার তাগিদ দেখা যায়। তাছাড়া নিজেদের পণ্য বিক্রি করার তাগিদেই উপনিবেশ সৃষ্টি করা দরকার হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পুঁজিকে কেন্দ্র করে স্বার্থের সংঘাত দেখা যায়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার লগ্নী পুঁজির আগ্রাসী চরিত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংযুক্তিকরণ ও সংবন্ধনে সাহায্য করে। দুনিয়া ব্যাপী একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বের তাগিদ প্রতিফলিত হয় এই ঘরানার সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বে।

দাদাভাই নওরোজির মত ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষদের দারিদ্র্য, দেশের শিল্পের ধ্বংসসাধন (অবশিল্পায়ন), সম্পদ নির্গমন প্রভৃতি অর্থনৈতিক দৈন্যদশার প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যায় পশ্চাদপদ দেশের অনগ্রসরতা এবং দেশের মানুষের দারিদ্র্যের মত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরেন। রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কের দিকটায় এঁরা তেমন আগ্রহী ছিলেন না। বরং ইংরেজদের শাসন ভারতের মত দেশে যে অনেক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে সেটাই তাঁরা স্বীকার করেন।

জর্জ চেস্‌লি, রিচার্ড স্ট্রেচি এবং পরবর্তীকালে থিয়ডর মরিসন, ভেরা এনস্টি, পর্সিভল গ্রিভিয়সের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসকরা মনে করেন যে পশ্চাদপদ দেশের স্বার্থেই ঐতিহাসিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর জন্য তারা ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে এক 'জাড্যের' কথা বলেন। স্বনির্ভর বিচ্ছিন্ন ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে উন্নয়নের উদ্দীপনাটি ছিল খুব দুর্বল। উদ্যোক্তা সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতিতে এই ধরনের অর্থনীতি পুঁজিবাদের যাদুর স্পর্শ পায়নি। এদের মতে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় অনন্তকাল ধরে গতিহীনতা বা অচলায়তন সৃষ্টি হয়। সুতরাং উন্নতির তাপ

ভেতর থেকে সৃষ্টি হত না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় এই তাপ সৃষ্টি করে দেশকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে, ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, উন্নত প্রশাসন চালু হয়েছে। সিলির মত ঐতিহাসিকেরা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন যে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন একটা ঘটনাচক্র। বৃটিশরা বাণিজ্য করতে এসে ক্ষমতার বিড়ম্বনায় জড়িয়ে গেছে। কেইন্‌সের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখাবার চেষ্টা করেন যে ভারত থেকে বৃটেনে যত সম্পদ নির্গমিত হয়েছে তার থেকে বিপরীত মুখি নির্গমন ঘটেছে বেশি।

৪.২.১.৩ ঃ বৃটিশ সওদাগরদের প্রাধান্য বিস্তার

ভারতে বৃটিশ শাসনের পত্তন তাদের দীর্ঘদিনের লড়াই-এর ফসল। প্রাক্ শিল্প বিপ্লব কালে প্রথমে বৃটিশ সওদাগররা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই-এ লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে তাদের দেশে শিল্প বিপ্লব আগে ঘটার সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা ভারতে পুঁজিবাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় নৌপথে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। বাণিজ্য প্রাধান্যের কাছে ভারতের শাসকবর্গ নতি স্বীকার করে। চুক্তি অনুযায়ী আকবর বাদশাহেরও পর্তুগীজ বেনিয়াদের অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে বাণিজ্য করার ক্ষমতা ছিল না। ১৫৪৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী সমুদ্রপথে ভারতসহ সব সওদাগরদের পর্তুগীজের রাজার অনুমতি নিয়ে বাণিজ্য করতে হত। এক বছর ধরে পর্তুগীজদের অধীনে ভারতের সওদাগররাও ব্যবসা করে। পর্তুগীজ বেনিয়া ও ভারতের সওদাগরদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধন সৃষ্টি হয়। পর্তুগীজরাই বাণিজ্যে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে থাকে।

পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ইংরেজ ঐতিহাসিক হন্ডেন ফারবার দেখান যে ১৬৪১ সালে পর্তুগীজদের হটিয়ে ওলন্দাজরা নিষ্ঠুর পথ গ্রহণ করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরেজরা গুজরাটসহ সমস্ত ভারতীয় বণিকদের তাদের অনুগত থাকতে বাধ্য করে।

৪.২.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারত

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। এরপর ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী গ্রহণের পর ইংরেজরা ভারতে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা পায়। সেই রাজস্বের সাহায্যেই নিজেদের ব্যবসা চালু রাখে। অর্থাৎ মাছের তেলে মাছ ভাজার নীতি চালু হয়। আর এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ বিদেশে পাচার হত। অর্থাৎ শুরু হয় সম্পদ চালান যাকে দাদাভাই নওরোজি পরবর্তীকালে নির্গমন (drain) বলে উল্লেখ করেন। ভারত দিনে দিনে পুঁজিস্বল্প দেশে পরিণত হয় আর ভারতের পুঁজিতে বৃটেনে পুঁজিগঠনের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ রাজতন্ত্রের শাসন চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতকে কৃষিতে বিশেষায়ন ঘটাতে বাধ্য করা হয়। ভারতের হস্ত ও কুটির শিল্প যা মোঘল আমলের শেষে স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল তার ওপর নেমে আসে অপঘাত। ১৮১৩ সালে চার্টার আইন বলবৎ হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু করে বৃটেন থেকে উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে আসা হয়। ভারতের হস্ত ও কুটির শিল্পের

ওপর নানা ধরনের কর চাপানো হয়। ভারতে বৃটিশ পণ্য খুব সামান্য বা বিনাশুল্কে প্রবেশ করে। ভারত থেকে অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির ব্যবস্থা হয়। রিকার্ডোর আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতির ওপর ভিত্তি করে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু হয়। উল্লেখযোগ্য যে সাম্রাজ্যবাদীদের এই অবাধ নীতি শুধু তাদের স্বার্থেই অবাধ ছিল। ভারত নিজের ইচ্ছেমত অবাধে তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারত না। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে এই অসম নীতি চালু থাকে। ঔপনিবেশিকরনের কাজ সম্পূর্ণ হয় ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে। রেলপথ যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে তা বৃটিশদের একতরফা ব্যবসায় সুবিধা করে দেয়। রেলপথে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচামাল যেমন ইংলন্ডে রপ্তানি হয় তেমনি সেখানকার শিল্পদ্রব্য ভারতে অবাধে আসে রেলপথে। আর দেখা যায় যে রেলের মাশুলে একতরফা ভাবে বৃটিশদের আমদানি করা দ্রব্য এবং রপ্তানি দ্রব্য সুবিধা পায়। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীন লেনদেনে সেই সুযোগ পাওয়া যায় না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের মাধ্যমে যে উপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে তা শিল্পবিপ্লবের পর বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পরিণতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ নীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপযোগিতাবাদী দর্শন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতে ধ্রুপদী অর্থনীতি প্রয়োগের তাগিদ অনুভব করে বৃটিশ প্রশাসন। ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও ধ্রুপদী অর্থনীতির দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। নতুন শতকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে বেনিয়া পুঁজির জায়গা দখল করে শিল্পপুঁজি। ভারতকে শুধু ব্যবসার মৃগয়া ক্ষেত্র হিসাবে পণ্যের উপর দখলদারী নয়, বাজারের ওপর দখলদারীও হয়ে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য। ভারতের ওপর বৃটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ

"সম্প্রতি বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে.....। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন কাণ্ড ঘটিয়াছে। তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব। এত বড় প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। ইউরোপের এই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।"

৪.২.১.৫ ঃ পুঁজির প্রবাহ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের জন্য দরকার পুঁজির। একটা স্বাধীন দেশে এই পুঁজি আসে দেশের অভ্যন্তর থেকে, যাকে দেশীয় পুঁজি বলা হয়। ভারতে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প এবং কৃষি থেকে এই পুঁজি প্রবাহের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনা লোপ পায়। প্রয়োজন হয় বিদেশী পুঁজির। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদেশী পুঁজির প্রবাহ ঘটে।

ভারতে কৃষি ও বাণিজ্য থেকে খুব মন্থর গতিতে হলেও সীমিত পুঁজির বিকাশ ঘটে। বাংলা দেশের গন্ধ বণিক, সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়, দক্ষিণ ভারতের চেট্টী সম্প্রদায়, তামিল-মুসলিম সম্প্রদায়, কেরালায় মোপলা নামে এক বেনিয়া মুসলমান গোষ্ঠী, কোঙ্কোন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, গুজরাটী বেনিয়া ও পার্সী সম্প্রদায় এবং রাজস্থান প্রদেশের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটায়। পরবর্তীকালে এরাই পর্তুগাল, ব্রিটেন, ওলন্দাজদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিভিন্ন শিল্পে পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। চা, পাট, কফি প্রভৃতি শিল্পে এরা ইংরেজদের সঙ্গে আংশিক ভাবে হলেও পুঁজি বিনিয়োগ

করে। ব্রিটিশ আমলে গুজরাটী, পার্সী ও অন্যান্য সম্প্রদায় বস্ত্রশিল্প ও লৌহ ইস্পাত শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশীয় পুঁজির একটা ভূমিকা থাকলেও পরবর্তীকালে বৃহদায়তন শিল্পে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম হয়। কলকাতা কোর্টের একটা হিসেবে দেখা যায় ১৮০৫-১৮২৬ সালের মধ্যে মোট জাহাজের টনেজে ভারতীয় বণিকদের ভাতা ছিল মাত্র ৫%--১০%। ১৯৩০ সালে দেখা যায় যে মাত্র ৬টি ইংরেজ এজেন্সি মোট রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজের টনেজের ৬৫% মালিক হয়ে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলশিল্প সহ, পাট, চা, কফি প্রভৃতি শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে। কিন্তু দেখা যায় ভারতের মত উপনিবেশে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ছিল সীমিত। সারা পৃথিবীতে যত ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে তার মধ্যে এশিয়ায় ছিল ১৪%। এর মধ্যে ব্রিটিশদের উপনিবেশে তার প্রবাহ ছিল ৪০%। লেলাণ্ড জেংকস্ ভারতের ব্রিটিশ পুঁজির যে অনুপ্রবেশ ঘটে তার একটা হিসাব দেন। তাঁর হিসাবে দেখা যায় ১৮৫৪-১৮৫৯ সালের মধ্যে যখন ভারতে রেল লাইন পাতার কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে তখন ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড এর বিনিয়োগ ঘটে। এর প্রায় অর্ধেক বিনিয়োজিত হয় রেলে। একটা অপরিচিত সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতে ৪৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের অনুপ্রবেশ ঘটে। জর্জ পাইসের একটা হিসাবে দেখানো হয় যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ১৯১০ সাল পর্যন্ত ৩৬৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। ১৯১১ সালে এম.এফ. হার্ডওয়ার্ডের হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫০ মিলিয়ন পাউন্ড।

পাইস তাঁর গবেষণায় দেখান যে, যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছে সেই সব ক্ষেত্রগুলির সাথে ভারতের অর্থনীতির তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রায় অর্ধেক পুঁজি এসেছিল ভারতে ঋণ হিসাবে। চা-বাগিচা ইত্যাদিতে ৭ শতাংশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে। কয়লা ও পেট্রোলের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মাত্র ২ শতাংশ বিনিয়োগ ঘটে। বয়ন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটেনি।

উপরোক্ত হিসাবে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ গেছে। ভারতে ব্রিটিশদের অর্জিত আয় যা বিদেশীদের মালিকানাধীন কোম্পানীতে বিনিয়োজিত নয় তা ধরা হয়নি। ব্যক্তিগত স্তরে ইংরেজদের কোম্পানীর শেয়ারে যে টাকা খেটেছে তা ধরা হয়নি। সুতরাং ওপরে যে হিসেব দেওয়া হয় তার থেকে বেশি বিদেশী পুঁজির প্রবাহ ঘটে। তাও এই পুঁজি যৎসামান্য, আমেরিকা বা কানাডায় ইংরেজরা যে পুঁজি খাটিয়েছে তার তুলনায় খুবই কম।

৪.২.১.৬ ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন (Balance of Payments and Drain of Wealth)

৪.২.১.৬.১ ঃ লেনদেন হিসাব ও সম্পদ নির্গমন

দুটি দেশের মধ্যে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদ্রব্যের লেনদেন হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে এই লেনদেন থেকে দুটি দেশের মধ্যে দেনা ও পাওনার উদ্ভব ঘটে। দুটি খাতে এই দেনা ও পাওনার হিসাব রাখা হয়— একটা হল চলতি খাতে আরেকটা হল মূলধন খাতে। কোনো দেশে কোন বছরে চলতি খাতে উদ্বৃত্তের বা ঘাটতির উদ্ভব ঘটলে বিদেশী মুদ্রা, সোনা এবং ঋণের মাধ্যমে এই ঘাটতি মেটানো হয়। ফলে সামগ্রিক লেনদেন সব সময় সমতায় বিরাজ করে।

চলতি খাতকে আবার দৃশ্য আমদানি রপ্তানি এবং অদৃশ্য আমদানি রপ্তানি খাতে ভাগ করে দেনা পাওনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া চলতি খাতে থাকে একতরফা হস্তান্তরিত দ্রব্য ও সেবা। যেমন উপহার দ্রব্য।

ভারতে বৃটিশ আমলে যে লেনদেন হত তাতে বাণিজ্য খাতে (ভৌতিক দ্রব্য) উদ্বৃত্ত বজায় থাকত। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত থেকে ভারত কোন প্রতিদান পেত না। বিভিন্ন ভাবে অদৃশ্য খাতে (যেমন বিদেশীদের শাসনখরচ বা তাদের দেশে তাদের খরচ যাকে ঘরোয়া খরচ বা (Home Charge) বলে বিদেশিদের পাওনা দেখিয়ে এবং প্রয়োজনে মূলধন খাতে দায় সৃষ্টি করে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পাওনা অস্বীকার করা হত। একে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন বলেন। বিভিন্ন উৎস ধরে ভারতের বৃটিশদের প্রতি এই দায়ের উদ্ভব ঘটানো হত। এমন কি বৃটিশরা অন্য কোথাও যুদ্ধ করলেও তার খরচকে ভারতের দায় বলে চাপানো হত।

আমরা ভারত থেকে এই সম্পদ নির্গমন ও তার প্রভাবের ওপর আলোচনা করব।

৪.২.১.৬.২ ঃ সম্পদ নির্গমনের পর্যায় ও ধারা

দাদাভাই নওরোজীর মত উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা দুশো বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বে ঔপনিবেশিক ভারত থেকে যে সম্পদের নির্গমন ঘটানো হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। দাদাভাই নওরোজীর Poverty and Un-British Rule in India, ডিগ্‌রির Prosperous British India এবং রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History of India নামক বইগুলো প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলোতে নির্গমন তত্ত্বের ওপর বিশদ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে ভারতে অনুন্নয়ন ও দারিদ্রের জন্য দায়ী ছিল বিবেকহীন এই নিষ্ঠুর অব্যাহত নির্গমন। কর্নওয়ালিশ, শোর প্রমুখ ইংরেজ কর্তাব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীরাও এই নির্গমনের ঘটনার নিন্দা করেন। তবে থিওডোর মরিসনের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা সম্পদ নির্গমনের ঘটনা স্বীকার করলেও এর সবটাই অনুৎপাদনশীল এবং ভারতের স্বার্থ বিরোধী তা মনে করেন না।

পলাশীযুদ্ধের পর এক নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি সমাজের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো তার মোটা অংশ উপঢৌকন হিসাবে বৃটেনে পাঠানো হতো। এই রাজস্ব থেকে প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে ‘মুনাফা’ বলে চিহ্নিত করে একে বৈধতা দান করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই রাজস্বের টাকা থেকে ব্যবসা শুরু করে। তাদের লাভের বড় অংশ বৃটেনে চালান হতো, ভারতে তার পুনর্বিনিয়োগ ঘটত না। ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের টাকায় পণ্য কিনে তা রপ্তানি করত। এর থেকে মুনাফা হত। অর্থাৎ ভারতে আদায়ীকৃত রাজস্বই মুনাফার উৎস ছিল। ব্যবসায়ের জন্য যে দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হত তার প্রতিদান ভারত পেত না। প্রথম পর্যায়ের এই সম্পদ চালানকে নির্গমন বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া ভারতে কর্মরত ইংরেজরা তাদের আয় বিদেশে পাঠাতো। এখানে কর্মরত অবস্থায় যে দক্ষতা তৈরী হত তা ছিল ভারতে সৃষ্ট মূলধন। দেশের লোক প্রশাসনে থাকলে এই সৃষ্ট মানবিক মূলধন পরের প্রজন্মের কাজে লাগত। কিন্তু ইংরেজরাই প্রধানত প্রশাসনের কাজে থাকত এবং তারা অবসরের পর দেশে ফিরে যেত। এক্ষেত্রে যে মানবিক মূলধনের নির্গমন ঘটত তাকে নওরোজি নৈতিক নির্গমন বলেন। নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের অর্থনীতিতে যে দুর্যোগ দেখা যায় তাকে প্রণামী দশা বা ‘করদশা’ বলে।

১৮১৩ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই পর্যায় চলে। পিটের ভারত আইন অনুযায়ী ভারতে বৃটিশ শিল্পগোষ্ঠীর শাসনের সূত্রপাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়া স্বার্থের জায়গা

নিতে শুরু করে শিল্পপুঁজির স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সরে আসে পণ্যের ওপর দখল থেকে বাজার দখলের ওপর।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুষ্ঠানিক পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবাধ বাণিজ্য নীতি বৃটিশ পণ্যের যেমন অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দেয় তেমনি ভারত থেকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রবাহ বাড়ে। একই সঙ্গে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতে সস্তা বৃটিশ পণ্য বিশেষ করে সূতী পণ্যের বিক্রি বাড়ে। তবে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি মার খায়। ফলে সরকারের রাজস্ব কমে। এছাড়া বৃটিশরা ভারতে যে বিশাল বাজারের আশা করেছিল তাও পায় না। কারণ ভারতে ক্রয়ক্ষমতা কম থাকায় পণ্যের চাহিদা ছিল সীমিত। ভারতে আর্থিক মন্দার দরুন কর রাজস্ব ভীষণভাবে কমে যায়। কর রাজস্ব কমে যাওয়ায় আফিম করের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা বাড়ে। আফিম কর বিস্তারের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হয়। দাদনব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে কৃষককে আফিমের চাষে বাধ্য করা হয়। আফিমের বাজার বাড়াবার জন্য চীনের জনগণের ওপর আফিমের নেশা চাপিয়ে দেওয়াই ছিল বৃটিশ নীতি। আর এর থেকে প্রাপ্য বিশাল পরিমাণ করই হল 'প্রণামী'র বড় উৎস যা নির্গমন হিসাবে চালান হত বৃটেনে। ভারতের এই অবস্থাকে 'আফিম দশা' বলা হয়। নির্গমনকে অব্যাহত রাখল এই 'আফিম দশা'।

ভারতের ওপর শিল্প পুঁজির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে অবশিল্পায়ন ঘটে। ভারত যে পর্যায়ে প্রবেশ করে তাকে বাণিজ্য দশা বলা হয়। ভারতের বাজার বিদেশের কবলে চলে যায়। ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটায় বলে মনে করা হয়। ভারত থেকে খাদ্য ও কাঁচামালের রপ্তানি বাড়ে। ভারত বিদেশ থেকে শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। রপ্তানি মূল্য আমদানি মূল্য থেকে বেশি হওয়ায় রপ্তানি উদ্বৃত্ত বাবদ ভারতের পাওনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই পাওনা রয়ে যায় অদেয়। এর বিনিময়ে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বস্তুগত কোন প্রতিদান ভারত পায় না। এই অদেয় প্রাপ্যকেই জাতীয়তাবাদী নেতারা সম্পদ নিঃসরণ বা নির্গমন বলেন। বাণিজ্য উদ্বৃত্তের ফলে ভারতে সোনার আমদানি বাড়ে। দাদাভাই -এর হিসাব ধরলে দেখা যায় ১৮০১-১৮৬৩ সালের মধ্যে ভারতে নিট সোনার আমদানির পরিমাণ ছিল ২৩,৪৩৫ কোটি পাউন্ড। এই সময় আমদানির পরিমাণ খুব কম ছিল। ১৮৬৪ সালের পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ভারতে রপ্তানি উদ্বৃত্ত বাড়িয়ে সোনার আমদানি বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু সোনার এই আমদানিতে ভারতে সোনার (ও রূপার) মজুত বাড়তে পারেনি। একই সঙ্গে ভারতে মুদ্রার প্রচলন বাড়ে ২৮.৬ কোটি পাউন্ড। অর্থাৎ, সোনার আমদানি ভারতে মূলধন সঞ্চয় ঘটিয়েছে তা বলা যায় না। বরং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অদেয় থেকে যাওয়ায় সম্পদ নির্গমন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।

ভারত থেকে যে সম্পদের নির্গমন ঘটতো তার অন্তর্ভুক্ত ছিল এখানে যে ইংরেজ প্রশাসক, কর্মচারী, সামরিক বাহিনী, রেলের কর্মচারীদের বেতন, সঞ্চয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা তাদের দেশে পাঠানো হত। এই প্রেক্ষিতে দাদাভাই -এর মত জাতীয়তাবাদী নেতারা দাবী করতেন যে ভারতে ভারতবাসীদের উপরোক্ত সব ক্ষেত্রে নিয়োগ করা দরকার। তাহলে দেশের টাকা দেশেই থাকে। এখানে যেমন কর্মসংস্থান ঘটে তেমনি সঞ্চিত সম্পদ দেশের পুঁজি হিসাবে কাজ করতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতে সম্পদ নির্গমনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল ঘরোয়া খরচ বা Home Charge. ভারতের সঙ্গে যুক্ত ইংল্যান্ডে বসবাসকারী সামরিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের খরচ, সেখান থেকে যে সব দ্রব্য ভারতে পাঠানো হত তার দাম, ইংল্যান্ডে অবস্থিত সেক্রেটারি অব স্টেট্ এর প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সব কিছুই

ঘরোয়া খরচ বলে বিবেচিত হয়। এগুলো ভারতের লেনদেন হিসাবে দেনার তালিকায় দেখানো হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই খরচ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হত তার সঙ্গে এই দেনা দেখিয়ে ভারতের পাওনা অদেয় রেখে দেওয়া হত। উল্লেখযোগ্য যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত যত বেশি হয় তত ঘরোয়া খরচ বেশি দেখিয়ে অদেয় রেখে দেওয়া হয়। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বেশি হলে সম্পদ নির্গমন বাড়ত। অর্থাৎ ভারতের ন্যায্য পাওনা অস্বীকার করার এ এক যন্ত্র। ঘরোয়া খরচের যাদুমন্ত্রে ভারতের পাওনা হারিয়ে যেত।

৪.২.১.৬.৩ ঃ নির্গমনের হিসাব

আমরা দেখলাম যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সমপরিমাণ প্রতিদান না থাকায় ভারতের প্রাপ্য যা অদেয় থেকে যায় তাকে নির্গমন বলা হয়। বাণিজ্য লেনদেনের হিসাব থেকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নির্ধারণ করতে পারলে নির্গমনের হিসাব পাওয়া যায়। অনেকে একে এক সরলিকৃত হিসাব বলে মনে করেন যা বাণিজ্য লেনদেনের বিভিন্ন হিসাবের জটিলতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। দাদাভাই নওরোজি আবার এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সঙ্গে রপ্তানি থেকে প্রাপ্য মুনাফাকে সম্পদ নির্গমন বলে বিবেচনা করেন। সমালোচনার উত্তরে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ইংরেজদের আমদানি ও রপ্তানি মূল্যের মধ্যে একটা গরমিল আছে। সেটা ধরলে নির্গমনের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এই গরমিলটা হল এই যে ভারতের রপ্তানি পণ্যের দাম রপ্তানিকারক দেশের বন্দর দামে ধরা হয়। ফলে আমদানি করা দ্রব্যের দাম বেশি করে দেখানো হয় আর রপ্তানি করা দ্রব্যের দাম বেশি করে দেখানো হয়। দাদাভাই নির্গমনের যে হিসাব দেন তা নিচের সারণীতে দেখানো হল ঃ

ভারত থেকে নির্গমনের হিসাব

সময়কাল	বাৎসরিক গড় (পাউন্ড)
১৮৩৫-'৩৯	৫,৩৪৭,০০০
১৮৪০-'৪৪	৫,৯৩০,০০০
১৮৪৫-'৪৯	৭,৭৫০,০০০
১৮৫০-'৫৪	৭,৪৫৮,০০০
১৮৬০-'৬৪	১৭,৩০০,০০০
১৮৬৫-'৬৯	২৪,৬০০,০০০
১৮৭০-'৭২	২৭,৪০০,০০০

ওপরের হিসাবের মধ্যে রেল কোম্পানীকে দেওয়া গ্যারেন্টি বাবদ সুদও ধরা হয়েছে। অনেকে রেলের জন্য দেয় সুদকে নির্গমন বলে মানতে চান না কারণ রেল ভারতে সম্পদ সৃষ্টি করে। এর জন্য খুব কম হারে সুদ ধার্য হয় যা যে কোন দেশকে বিনিয়োগের স্বার্থে দিতে হয়। ১৮৮৩-৯৩-এর মধ্যে দশ বছরে নির্গমন ছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। এর থেকে রেলের জন্য ঋণের ওপর সুদের অংশ বাদ দিলে তা দাঁড়ায় ২৮৮ কোটি টাকা বলে দাদাভাই দেখান। ওপরের আলোচনায় দেখা যায় যে পরিমাপের পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলেও ভারত থেকে সম্পদের যে নির্গমন ঘটত তা সত্যি। পরের দিকে ঘরোয়া খরচ বা হোমচার্জের খুব বৃদ্ধি ঘটে। ১৮৬১-৬২ সাল থেকে ১৮৭৪-৭৫ সালের মধ্যে ঘরোয়া খরচ ছিল ১০.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

৪.২.১.৬.৪ ঃ নির্গমন তত্ত্বের সমালোচনা

দেখা যায় যে ইংরেজ সমালোচকরাও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমনের ঘটনা স্বীকার করেন। তবে এই নির্গমন অনৈতিক এবং সবটাই বৃটিশ স্বার্থ সিদ্ধি করেছে তা মনে করেন না থিওডোর মরিসনের মত ইংরেজ সমালোচকরা। এল.সি.এ. নোল্স্ বা ভেরা এন্স্টে-ও মরিসনকে সমর্থন করেন। মরিসন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঋণের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে ভারতের মত পশ্চাদপদ দেশকে আধুনিক করতে বিনিয়োগের দরকার হয়। এই বিনিয়োগ আসে ঋণ থেকে। একে অনুৎপাদনশীল ঋণ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে উন্নত করতে, ভারতকে একটা 'উন্নত সরকার' উপহার দিতে ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এটা রাজনৈতিক অর্থে খরচ হলেও ভারতের স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং, একে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে বাতিল করা যায় না। তবে ভেরা এন্স্টে এই রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ আরও কমানো দরকার ছিল বলে মনে করেন। মরিসন মনে করেন যে ভারত বৃটেন থেকে কম সুদে ঋণ পেয়েছে। এটা বরং বৃটেনের দিক থেকে ভারতের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। জে. এম. কেইন্স আরও একধাপ এগিয়ে বলেন যে ভারত থেকে সম্পদের নির্গমনতো ঘটেইনি বরং বৃটেন থেকে ভারতে নির্গমন ঘটেছে যাকে তিনি বিপরীতমুখী নির্গমন বলেন।

সমালোচকদের মতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা আবেগের তাড়নায় নির্গমন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। একে অনেকটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে।

৪.২.১.৬.৫ ঃ নির্গমনের ফলাফল

ভারতের অর্থনীতির ওপর সম্পদ নির্গমনের এক বিরূপ প্রক্রিয়া কাজ করত যা অর্থনীতির উদ্দীপককে কাজ করতে দিত না। এই সম্পদ নির্গমন একদিকে দেশের পুঁজিগঠনের কাজকে প্রতিহত করে অনুন্নোয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখত অন্যদিকে নির্গমন ভারতের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য তীব্রতর করে চাহিদার অভাব ঘটাতো। চাহিদার অভাবে অর্থনীতির উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যেত। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারতের অর্থনীতির ওপর সম্পদের এই বিরূপ প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেন। দাদাভাই নওরোজি ও রমেশ দত্তের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করতেন যে ভারতের দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের কারণ ছিল সম্পদ নির্গমন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইংল্যান্ড থেকে বিদেশে যদি এই নির্গমন ঘটত তবে ইংল্যান্ড ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হত যা ইংল্যান্ডবাসীকে ত্রাস করত। তিনি তাঁর বই-এর মুখবন্ধে বলেন যে নির্গমিত এই সম্পদ ইংল্যান্ডের মাটিতে যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিল তাতে ইংল্যান্ডের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছিল। আর শুষে নিয়েছিল ভারতের মাটির আর্দ্রতা। ভারতকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। প্রকৃত সম্পদের নির্গমন তিনভাবে ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করত।

প্রথমতঃ রপ্তানির উচ্চ হার বজায় রাখার জন্য জোর করে বাণিজ্যিকীকরণ ঘটানো হয়। কৃষককে বাণিজ্য শস্য উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। এর সুফল পেত বিদেশী ব্যবসায়ী ও দেশি দালালরা। কৃষকরা দাম পেত না। তাছাড়া নগদ শস্য বাড়াবার তাগিদে জোয়ার ও বাজরার মত নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। এই শস্য ভোগ করত গরিব মানুষরা। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত।

দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি বৃদ্ধির চাপে দেশের অভ্যন্তরে ফসলের দাম খুব বেড়ে যায়। অকৃষি পণ্যের তুলনায় কৃষি পণ্যের দাম বেশি হারে বাড়ে।

তৃতীয়তঃ নির্গমনের তাগিদে রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে দেশীয় অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত বন্টনের ধরন এবং উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর ধরনে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনগুলি ঘটে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রপ্তানিজাত শস্য উৎপাদন করা বা জোর করে উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার ফলে। শুধু উৎপাদন নয় বিপনীকরনের ধাঁচেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশি ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায় বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব। দেশীয় ব্যবসায়ীরা কোনরকমে বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে টিকে থাকে। দাদন ব্যবস্থা আগেই চালু ছিল। তা আরও ব্যাপকতা ধারণ করে। গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরা আরও ঋণপুঁজির জালে জড়িয়ে যায়। তারা ফসলের দাম পায় না। দেশে ফসলের ধরনে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি আয় বন্টনে পরিবর্তন আসে। কৃষিতে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে যে আয় বৃদ্ধি ঘটে তা বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে বেশী আসে। নির্গমনের তাগিদে যা ঘটে তা আবার নির্গমনকে সাহায্য করে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে স্থায়িত্ব দিতে নির্গমন বিশেষ ভুমিকা পালন করে।

নির্গমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির ওপর যে ভয়াবহ প্রভাব দেখা যায় তার চিত্র ফুটে ওঠে ইংরেজ বুদ্ধিজীবী মন্টগোমারি মার্টিনের ১৮৩৮ সালের লেখায় যেখানে তিনি বলেনঃ

"অর্ধেক শতাব্দী ধরে আমরা বছরে বিশ থেকে ত্রিশ, কখনো বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ভারতবর্ষ থেকে নিকাশ করে নিয়ে চলেছি। অর্থ গ্রেট বৃটেনে পাঠানো হয়েছে ব্যবসায়িক ফাটকাবাজির ঘাটতি মেটাবার জন্য, ঋণ-সুদ দেবার জন্য, 'হোম এস্টাব্লিশমেন্ট' রাখার জন্য এবং যাঁরা হিন্দুস্থানে কাটিয়েছে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ ইংল্যান্ডের মাটিতে লগ্নীর জন্য। ভারতবর্ষের মত একটি সুদৃঢ় দেশ থেকে বছরে ত্রিশ বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ডের নিরন্তর নিকাশ যা কোনদিনই ফেরৎ যায়না— তার কুফল পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিতে সম্ভব বলে মনে করি না।"

৪.২.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৪.২.১.৭.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রানীতি

মোঘল আমলে দ্বি-ধাতু মুদ্রানীতি চালু ছিল। স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রার একই সঙ্গে প্রচলন ছিল। এছাড়া স্বাধীন রাজা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যার যার শীলমোহর ব্যবহার করে নিজেদের মুদ্রা চালু রাখত। দেখা যায় যে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন তাদের মধ্যেকার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে পারতো না। এর ফলে মুদ্রার কেনাবেচা ঘটতো। তৈরি হয়েছিল মুদ্রার এক ফাটকা বাজার। বিনিময় হারের ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন হারে মুদ্রা কেনাবেচা হত। ফাটকা কারবারিরা বিনিময় হারকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করে কেনাবেচা থেকে লাভ করতো। একে টাকা ব্যবহারের জুয়াখেলা বলা হয়।

৪.২.১.৭.২ ঃ রৌপ্যমানের প্রবর্তন

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮০৬ সালে দ্বি-ধাতু নীতি বর্জন করে রৌপ্য মুদ্রাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে ঘোষণা করে। বিভিন্ন মানের ও ওজনের রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকায় বিনিময় হার ওঠানামার সমস্যা মেটেনা এবং তা দূর করার জন্য ১৮৩৫ সালে একই গুণমানের মুদ্রা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। টাঁকশালে ১৮০ গ্রেন অর্থাৎ বারোভাগের এগারো ভাগ রুপো থাকবে বলে স্থির হয়। স্বর্ণমুদ্রা তৈরি বন্ধ করা হয় তবে সরকারি কোষাগারে বেশ কিছুদিন স্বর্ণমুদ্রা চালু রাখা হয়। কেউ স্বর্ণমুদ্রা জমা দিলে তাকে রৌপ্যমুদ্রায় দাম মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নতুন স্বর্ণমুদ্রা তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আইনত সঙ্গত মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণমুদ্রা আর চালু থাকে না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে সোনার দাম কমে। ভারতের রপ্তানি ও আমদানি ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রার প্রচলন বাড়াতে হয়। বহির্বাণিজ্যে যুক্ত ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়ে। এই অবস্থায় তিনটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আসে। প্রথমত, আবার দ্বি-ধাতু ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। রৌপ্যমুদ্রা চালু করে পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে স্বর্ণমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব আসে। দ্বিতীয়ত, কাগজি মুদ্রার প্রচলন করে তার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের হাতে রাখার কথা বলা হয়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটিয়ে ধাতুমুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার অভাব দূর করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বড়লাটের কার্যনির্বাহক পর্ষদের সদস্য মি. চালর্স উইলসন আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিতে কাগজি মুদ্রা পদ্ধতি চালু করার অনুমোদন দেন। তাঁর মৃত্যু ঘটায় স্যামুয়েল ইয়ং এই অনুমোদন কার্যকরী করেন। ইংল্যান্ডে তৎকালীন চলতি ব্যবস্থার অনুকরণে ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত মজুতবিহীন নোট প্রচলন ব্যবস্থা চালু হয়। সমমাত্রার রূপো বা সোনা মজুত রেখে এর বেশি নোট ছাপানো অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনমনীয় ব্যবস্থা হওয়ায় প্রয়োজনে মুদ্রার প্রচলন বাড়ানো যেত না। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য নোইং এর উত্তরাধিকারী চার্লস্ ট্রাভেলিয়ন ইংল্যান্ড ও আস্ট্রেলিয়ায় তৈরি স্বর্ণমুদ্রাকে ভারতে বিহিত মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। এর বিনিময় হার ১পাঃ ১০টাঃ স্থির হয়। তৎকালীন ভারতের সচিব এই সুপারিশ নাকচ করে দেন। অবশ্য সরকারের দায় মেটাতে এই মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করা হয়। যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা মজুত থাকে তার সমমূল্যের কাগজি মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। রুপোর দাম কমে গেলে চলতি বিনিময় হারে সোনার বিনিময় হার কমে।

১৮৬৬ সালে ম্যানসফিল্ড কমিশন স্বর্ণমুদ্রার মান বাড়াতে সুপারিশ করায় তা বাড়িয়ে ১০.৫০ টাকা (১ পাউন্ডের বিনিময়ে) করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর বাজারে রূপোর দাম কম থাকায় এই বিনিময় হার বাস্তবে ধরে রাখা যাবে না এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা বর্জন করা হয়। আবার একধাতু ব্যবস্থা চালু হয়।

৪.২.১.৭.৩ ঃ রূপোর দাম হ্রাস ও মুদ্রানীতি নিয়ে বিতর্ক

আন্তর্জাতিক বাজারে রূপোর দাম হ্রাস পাওয়ায় স্বর্ণমানের স্টার্লিং এর তুলনায় রূপোভিত্তিক টাকার দাম কমতে থাকে। ১৮৭২ সালের রূপোর টাকার দাম ছিল ১ শিলিং ১০.৭ পেন্স। ১৮৯৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ শিলিং ২.৫ পেন্স। ভারতে টাকার অবমূল্যায়ন রোধ করার জন্য ইংরেজরা উদ্যোগী হয়। টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়াবার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা আন্দোলন শুরু করেন। এই বিতর্কটি তুলে ধরতে হলে মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাসের সম্ভাব্য প্রভাবটি আগে আলোচনা করে নিতে হয়।

রূপোর টাকার দাম কমে গেলে ভারতকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘরোয়া খরচের দায় মেটাতে বেশি পরিমাণ স্টার্লিং পাঠাতে হত কারণ স্বর্ণমূল্যের স্টারলিং পেতে ভারতকে বেশি রূপোর টাকা দিতে হত। ১৮৯৪-৯৫ সালে ভারতকে ঘরোয়া খরচ বাবদ দিতে হয়েছিল ২৮.৯ কোটি টাকা। ১৮৭২-৭৩ সালের বিনিময় হারে সমপরিমাণ ঘরোয়া খরচের দাম ছিল ১৬.৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতকে বেশি স্টারলিং পাঠাতে হয় সমপরিমাণ দায় মেটাতে। এর ফলে ভারতের রাজকোষ শূন্য হতে থাকে। এর থেকে রেহাই পাবার জন্য ভারত সরকারকে কর বাড়াতে হত। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর জনরোষের ভয়ে সরকার তা করতে পারেনি। সে টাকার দাম বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতারা খরচ কমিয়ে ঘরোয়া খরচের দায় মেটাবার জন্য চাপ দেয়। তাঁরা দেখান যে

টাকার দাম বাড়িয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা মানে চোরাপথে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা। কারণ টাকার দাম বাড়লে সাধারণ মানুষকে একই পরিমাণ কর দিতে বলা মানে তাকে বেশি কর দিতে বাধ্য করা। কারণ যে ১০০ টাকা সে কর দিত এখন তার দাম বেশি, সে সেই টাকায় বেশি দ্রব্য পায়। দাদাভাই নওরোজি দেখান যে টাঁকশাল বন্ধ করে দিয়ে তখনকার সোনার মূল্যে ১১ পেঃ টাকাকে ১৬ পেন্সে নিয়ে যাওয়া মানে গোপনে ভারতীয় করদাতাকে আরও প্রায় ৪৫ শতাংশ নতুন কর দিতে বাধ্য করা যদিও আপাতদৃষ্টিতে করের হার বাড়ে না। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা দেখানোর চেষ্টা করেন কিভাবে বৃটিশ শাসকদের এই অপচেষ্টা তাদের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতঃ

(ক) ইংরেজরা কোন অবস্থাতেই এমন নীতির সুপারিশ করত না যাতে নির্গমনের পরিমাণ কমে। সেই জন্য তারা ঘরোয়া খরচ কমানোর পথে যেতে রাজি ছিল না।

(খ) সরকারি কর্মচারীরা ছিল ইংরেজ। তাদের মাইনের টাকা তারা সোনায় দেশে পাঠাত্রে। রূপোর দাম কমে যাওয়া সমপরিমাণ রূপোর টাকায় কম পরিমাণ সোনা পাওয়া। তারা কম সোনা পাঠাতে পারত। এটা ইংরেজ সরকার মেনে নিত না। টাকার দাম বাড়িয়ে তারা ইংরেজদের এই লোকসান পূরণের চেষ্টা করে। তাতে ভারতীয়দের ক্ষতি হলেও তাদের কিছু এসে যেত না।

(গ) দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে ইংরেজরা লাভবান হত। টাকার দাম বাড়লে আমদানিজাত দ্রব্যের দাম কমে। ভারতীয় দ্রব্যের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে সুবিধা হত।

(ঘ) টাকার দাম কমলে আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে। ফলে দেশিয় পণ্য সুবিধা পায়। এটা ইংরেজদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অনেকে মনে করেন যে টাকার বিনিময় মূল্য কমলে বিদেশের বাজারে ভারতের রপ্তানিদ্রব্যের দাম কমে। ফলে ভারত লাভবান হত। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্রা উদাসীন ছিলেন বলে সমালোচনা করা হয়। বাস্তবে তা নয়। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্রা সবসময়ই বলেছেন যে রপ্তানি ভারতে ব্যবসায় কর্তৃত্ব করত ইংরেজরা। তাতে সেটা বিদেশে চালান হত। তাছাড়া ভারতে রপ্তানিদ্রব্যের চাহিদা ছিল অস্থিতিস্থাপক। তাই দাম কমলেও চাহিদা তেমন বাড়ত না। এই দুটি কারণে জাতীয়তাবাদী নেতারা টাকার দাম হ্রাসের অসুবিধার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেননি।

১৯১৩ সালে চেম্বারলিন কমিটি গঠিত হয় যার সদস্য ছিলেন জে. এম. কেইন্স্। ভারতের স্বর্ণবিনিময় ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয় না কারণ এর ফলে রূপোর টাকা তৈরি করতে গেলে ভারত সরকারের লোকসান হত। ১৯১৯ সালে টাকার বিনিময়মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ২ শিলিং ৪ পেন্স।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ভারতের মুদ্রার বাজারে এক সংকট দেখা যায়। ভারতে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা কমে। এছাড়া যুদ্ধের খরচ মেটাতে ইংল্যান্ড থেকে টাকা পাঠানোর দরকার হয়। ইংল্যান্ডে স্বর্ণ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইংল্যান্ড ভারতের প্রাপ্য সোনা পাঠায়। ভারতে স্বল্প রূপোর যোগানের মুখে টাকা তৈরির জন্য রূপোর চাহিদা বাড়ে। যুদ্ধের বাজারে ভারতে টাকার বিনিময় মূল্য কমে। কাউন্সির বিলের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলে।

যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে মে মাসে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে রূপোর দাম চড়ে দাঁড়ায় পাউন্ড প্রতি ৫৮ পেন্স। ডলারের তুলনায় স্টার্লিং এর দাম কমায় তা রূপোর দাম বৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। রূপোর এই দাম বৃদ্ধির ফলে টাকার বাহ্যিক মূল্য (face value) তার ধাতু মূল্যে নীচে নেমে যায়। হিল্টন কমিশন মনে করে যে ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার ১ টাকা =১ শিলিং ৬ পেন্সে স্থির থাকা উচিত। স্বর্ণপিণ্ড মান সম্পর্কে নীতিগত বিরোধিতা না থাকলেও ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একে ১ টাকা =১ শিলিং ৪ পেন্সে স্থির রাখার পক্ষে মত দেন। শিল্পপতি পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের মতে প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই বিনিময় হার একটা প্রবণতা হিসাবে দেখা যায়।

১ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেন্সে বিনিয়োগ হার নির্ধারিত হওয়ায় বৃটেনের তুলনায় ভারতে সোনার দাম কম থাকে। এর ফলে সোনা দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা দেখা যাবে বলে মনে করা হয়। সোনার এই চালান ভারতবাসীর পক্ষে শুভ নয় বলে জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন। সাধারণ মানুষ অভাবে পড়ে সোনা বিক্রি করে কম দামে। এই সোনা বিক্রি হয়ে বিদেশে চলে গেলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংকোচন ঘটে। আর এর সুবিধা চালান হয় বিদেশে।

৪.২.১.৭.৪ ঃ স্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা

১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান বর্জন করলে ভারতেও নতুন নীতি অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া মন্দাকালীন অর্থনীতিতে স্বর্ণমুদ্রামান কার্যকরী নয় বলে প্রমাণ হয়। সরকার সরাসরি টাকার সঙ্গে স্টার্লিং এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। বিনিময় হার ১ টাকায় ১ শিঃ ৬ পেঃ স্থির রাখা হয়। ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা আবার পুনরায় বিশুদ্ধ স্টার্লিং বিনিময়ের রূপ পায়। এই ব্যবস্থাতেও বিনিময় হার বেশি থাকায় ভারতের বাজারে সোনার দাম বৃটিশ বাজারের তুলনায় কমে যায়। ফলে সোনার নির্গমন ঘটে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে দেশের মজুত সোনার থেকে প্রায় ৩০৬ কোটি আউন্স পর্যন্ত স্বর্ণ নিঃশেষিত হয়। স্বর্ণ-রপ্তানির মূল্য ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ভারত থেকে সোনার এই বাণিজ্যিক প্রবাহ ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার পতন ঘটায় বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে স্টার্লিং মজুতের ভিত্তিতে প্রচলিত টাকার যোগান বাড়ে ১৯৩৮-৩৯ সালে টাকার যোগান ২১০.৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৪৮-৪৯ সালে হয় ১২৫৩.৮৬ কোটি টাকা। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। ১৯৩৯ সালের ভিত্তিতে ১৯৪৩ সালে দাম সূচক দাঁড়ায় ২২০.১। ১৯৫০ সালে তা বেড়ে হয় ৩৯৫.৬।

৪.২.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রনেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agriculture at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.২.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ইংরেজ আমলে ভারতের অর্থনীতি কিভাবে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীভূত হয় তা আলোচনা কর।

(২) ভারতের শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা আলোচনা কর ।

(৩) সম্পদের নির্গমন বলতে কি বোঝায়? সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও ধারাটি আলোচনা কর।

(৪) সম্পদ নির্গমনের প্রভাব আলোচনা কর।

(৫) উপনিবেশিক ভারতে মুদ্রাসমস্যার প্রকৃতি আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

Railways and Indian Economy

একক - ১

(a) **Economic and Political Compulsions**

(b) **Unification and subjugation of Indian market**

(c) **Effects on agrarian production and export of raw material — commercialization of agriculture**

গঠন (Structure) ঃ

৫.৫.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৫.৫.১.১ ঃ ভূমিকা

৫.৫.১.২ ঃ ভারতে রেলপথের প্রবর্তন, বিস্তার এবং প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

৫.৫.১.৩ ঃ রেলপথ নির্মাণে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগে

৫.৫.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.৫.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৫.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি দুটি এককে বিভক্ত। প্রথম এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার প্রবর্তন, এর উদ্দেশ্য এবং রেলপথের প্রসার।

(২) রেলপথ নির্মাণে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের কথা।

৫.৫.১.১ ঃ ভূমিকা

রজনীপাম দত্ত তাঁর ইণ্ডিয়া টুডে (India Today) গ্রন্থে উনবিংশ শতককে লগ্নী পুঁজির যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (১৯১৪-১৮) এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসক শ্রেণীর বৈষম্যমূলক নীতি, নানা ধরনের অসহযোগিতা এবং প্রযুক্তি ও পুঁজির অভাব হেতু তখন ভারতীয় শিল্পোদ্যোগী শ্রেণী অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট প্রণীত হলে ব্রিটিশ নাগরিকরা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অধিকার পায়। উদ্যোগী ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সুফলভোগী এই শ্রেণীর হাতে ছিল প্রচুর পুঁজি ; যা বিনিয়োগের জন্য তারা লাভজনক ক্ষেত্র সন্ধান করছিলেন। ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, সস্তা কাঁচামাল এবং সুলভ শ্রম এদের আকৃষ্ট করেছিল। এহেন অবস্থায় যে সব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা অর্থ বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে রেলপথ অন্যতম প্রধান। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সরদেশাই মনে করেন যে, "উনিশ শতকের মধ্যভাগে রেলপথ চালু হওয়ায় ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়েছিল।"

৫.৫.১.২ ঃ ভারতে রেলপথের প্রবর্তন, বিস্তার ও প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ভারতে রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসি-র শাসনকালে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। তাই ডালহৌসিকে 'ভারতীয় রেলপথের

জনক’ বলা হয়। তিনিই প্রথম সমগ্র ভারতব্যাপী রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই Dalhousic Minute April, ১৮৫৩ বলা হয় “text book for all future railway Projects in India”. তার শাসনকালে ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল কোম্পানী” সর্বপ্রথম বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত একুশ মাইল রেলপথ যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তার সমগ্র শাসনকালে ভারতে মোট ২০০ মাইল রেলপথের বিস্তার ঘটে। যেমন, রেল কোম্পানীকে তাঁর পুঁজি East India Company-র ট্রেজারীতে রাখতে হবে এবং তার অনুমোদন প্রয়োজন হবে ঐ পুঁজি কোথায় কিভাবে খরচ হবে তার সম্পর্কে। কোন পথ ধরে লাইন বসবে, অথবা যাত্রীভাড়া বা মালভাড়া কি হবে সবকিছুর অনুমোদন দেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। প্রত্যেক রেল বোর্ডে একজন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকবে যার কোম্পানীর কোন সিদ্ধান্তে veto দানের অধিকার থাকবে। সাধারণভাবে ২৫ বা ৫০ বছর পরে রেলের মালিকানা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিয়ে নিতে পারবে, এমনকি বিশেষ অবস্থায় রেল কোম্পানী নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ না করলে যে কোন সময় শুধু তিন মাসের নোটিশ দিয়ে তার মালিকানা নেবার অধিকার থাকবে। ৯৯ বছর পরে স্বাভাবিক নিয়মেই সকল রেল সম্পদ কোন রকমের ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে ভারত সরকারের অধীনে চলে আসবে। বস্তুত ভারত সরকারের রেল-কোম্পানীগুলির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের এই প্রচেষ্টা ছিল বৃথা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — বলা হয়েছিল বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে রেলকোম্পানী অসুবিধা বোধ করলে তার উদ্যোগ গুটিয়ে নিতে পারবে এবং সে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবারও অধিকারী হবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রেলপথ অধিগ্রহণের বিষয়টি মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

ভারতে রেলপথের প্রবর্তন কার্ল মার্কসের মত অনেকের দৃষ্টিতে আধুনিকতার বার্তা বহন করে নিয়ে এলেও এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পথকে প্রশস্ত করলেও সমকালীন অনেক বুদ্ধিজীবিই রেলপথের প্রসারকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। দাদাভাই নরৌজী, দিনশাহ ওয়াচা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি. ভি. যোশী-র মত অনেকেই রেলপথ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির মিনিট থেকেই তা’ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, “England is calling aloud for the Cotton which India does already produce in some degree, and would produce sufficient in quality and plentiful in quantity, if only there were provided the fitting means of conveyance for it for distant plains to the several ports adopted for its shipment.” ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ থেকে কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করা এবং শিল্পজাত সামগ্রী উপনিবেশের বাজারে বিক্রী করা। সুতরাং অল্প খরচে ও সময়ে যাতে

ভারতের কাঁচামাল ও খাদ্য সামগ্রী কোলকাতা, বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজ বন্দর মারফত ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী করা যায়, তার জন্য এই বন্দরগুলিকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী এলাকার সঙ্গে রেলপথে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আবার ঐ সব বন্দরের মাধ্যমেই রেলপথের সাহায্যে ব্রিটিশ পণ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যে ভারতে রেল পরিবহন চেয়েছিলেন এবং তার জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

ইংল্যাণ্ডে বেসরকারী রেলপথ নির্মাণে বিভিন্ন বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা ছিল বলেই লর্ড ডালহৌসি গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলেন যাতে বেসরকারী রেলপথ নির্মাণে এদেশে অনুরূপ কোন ব্যত্যয় না ঘটায়। সেই জন্যই সর্বক্ষেত্রে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট হাওড়া ও হুগলীর পাণ্ডুয়ার মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে কোম্পানীর দ্বারা রেলপথ চালু হয়। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ১২১ মাইল তা বিস্তৃত হয়েছিল। এইভাবে ১৯০৫ সালের মধ্যে ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী হয় প্রায় ২৮,০৫৪ মাইল রেলপথ।

রেলপথ তৈরীর উদ্দেশ্য ঃ ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি তাঁর প্রতিবেদনে ঘোষণা করেছিলেন যে, রেলপথ হলে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটবে। তবে রেলপথ তৈরীর পেছনে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিই ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল একথা ভাবা ভুল। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের রেলমালিক, মূলধন লগ্নীকারী, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যরত বণিক সংস্থা এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদকদের প্রবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ কোম্পানীর পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব হয় নি। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলিতে প্রচুর পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ পণ্যের খোলাবাজার ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য রেলপথ ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত পুঁজি জমে এবং তারা সেই পুঁজি কোন লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল। রেলপথ ছিল একটি ভালো সুবিধাজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগ ক্ষেত্র। ব্রিটিশ ইস্পাত ব্যবহারীরা মনে করেছিল যে, ভারতে রেলব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে রেল-ইঞ্জিন, রেল লাইন, মালগাড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করবে। এছাড়া মনে করা হত যে, রেলপথের বিস্তার ঘটলে সেখানে বহু ইংরেজের কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, "এই সব লাভের লোভই ছিল আসল কথা। এদেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ মোটেই নয়।"

রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনেও রেলপথ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশাল ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান ও যোগাযোগ অতি প্রয়োজনীয় ছিল। এছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিদ্রোহের মোকাবিলা করা, সেনাবাহিনীকে খাদ্য ও রসদ দ্রুত পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি কাজেও রেলপথ অপরিহার্য ছিল। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি তাদের প্রতিবেদনে সামরিক প্রয়োজনে রেলপথ নির্মাণের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার সামরিক প্রয়োজনে রেলপথের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। এই কারণে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সময়েও বহু রেলপথ নির্মিত হয়। এ সময়ে এমন অনেক স্থানে রেলপথ নির্মিত হয়েছিল, সে সব স্থানের কোন বাণিজ্যিক গুরুত্বই ছিল না — বরং সামরিক দিক থেকে স্থানগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরও একটি কারণে রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তা' হল ভারতে বারংবার আবির্ভূত দুর্ভিক্ষ। ১৮৮৪ সালে গঠিত পার্লামেন্ট সিলেক্ট কমিটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পাঠাবার উদ্দেশ্যে রেলপথ নির্মাণের কথা বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রেলপথ স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মেকী ছিল, সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. এম. হার্ডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি বলেছেন, রেলপথ স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এখনও সম্ভব না হলেও, এর পেছনে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত হবার পর ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে আর্কট পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। বস্তুতঃ ১৮৫৬ সালের মধ্যেই বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ বন্দর রেলপথের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে রেলপথের ইতিহাস দ্রুত সম্প্রসারণের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৩৯ কিলোমিটার। ১৮৬০ সালের মধ্যে ১৩৪৯ কি.মি., ১৮৭০ সালের মধ্যে ৭,৬৭৮ কি.মি., ১৮৯০ সালের মধ্যে ২৫,৪৯৫ কি.মি., ১৯২০-২১ সালের মধ্যে ৫৬,৯৮০ কি.মি., এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে ৬৫,২১৭ কি.মি. এ দাঁড়ায়। ১৮৬৭ সালের মধ্যেই ভারতের ২০টি সর্ববৃহৎ শহরের মধ্যে ১৯টিই রেল পরিবহনের আওতায় আসে। ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডের ৭৮% এলাকা রেলপথের অধীনে আসে।

৫.৫.১.৩ ঃ রেলপথ নির্মাণে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগ

ভারতে রেলপথ নির্মাণে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলি আগ্রহী হলেও তা' লাভজনক হবে কিনা, সে ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই তাদের কোম্পানীর তরফ থেকে ৫% লাভের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ঠিক হয় যদি আয়ের পরিমাণ লগ্নীকৃত অর্থের ৫% এর কম হয়, তবে সরকার তার রাজস্ব থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ঐ অর্থ দেবে। ইহা "গ্যারান্টি সিস্টেম" নামে পরিচিত হয়। ঠিক হয় সরকার কোম্পানীগুলিকে বিনা মূল্যে জমি দেবে। বিনিময়ে রেল কোম্পানীগুলি স্বল্প মূল্যে সৈন্য চলাচলে রাজী হয়। ৯৯ বছরের মেয়াদে এই চুক্তি হয়। ঠিক হয় ৯৯ বছর পর এই সব রেলপথ বিনা ক্ষতিপূরণে সরকারের বলে স্বীকৃত হবে। তবে তার আগেই সরকার ইচ্ছা করলে ২৫ বছর বা ৫০ বছর পর ঐ রেলপথ কিনে নিতে পারবে। ১৮৪৯ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় রেলপথের প্রসার ঘটে। এবং ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত ভারতে ৪,২৫৫ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। লভ্যাংশের গ্যারান্টি থাকায় কোম্পানীগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বার্ষিক হিসাবে প্রচুর ঘাটতি দেখায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর খরচ করতে থাকে। লর্ড ডালহৌসির আমলে প্রতি মাইল রেলপথ নির্মাণে খরচ হয় ৪০০০ পাউণ্ড। ১৮৬৮ সালে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১৮,০০০ পাউণ্ড। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত গ্যারান্টি বাবদ ভারত সরকারকে দিতে হয়েছিল ২৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই ঘাটতি মেটাতে হতো ভারতীয় রাজস্ব থেকে। এর ফলে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

এই অবস্থায় সরকার গ্যারান্টি ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে নিজেই রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এবং ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু রেলপথ নির্মিত হয়। ১৮৭৯ সালে সরকার দেশের বৃহত্তম রেলপথ ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ কিনে নেন। এই পর্যায়ে সরকারী উদ্যোগে রেলপথের পাশাপাশি অবশ্য বেসরকারী সংস্থার দ্বারাও কিছু কিছু রেলপথ নির্মিত হয়। অপরদিকে সরকারী মালিকানায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ হলে কোম্পানীগুলির মুনাফা লাভের পথ স্তব্ধ হয়। তারা সরকারি মালিকানায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ করার জন্য পার্লামেন্টের ওপর চাপ দিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের ফলে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি হ্রাস পায়। বেসরকারী রেলপথ প্রমোটারগণ এই বিপর্যয়ের সুযোগে Secretary of State-এর ওপর চাপ দিয়ে এই সিদ্ধান্ত আদায় করে যে সরকার শুধুমাত্র সামরিক রেলপথ-ই নির্মাণ করতে পারবে। অর্থাৎ লাভজনক রেলপথ নির্মাণ করবে একমাত্র বেসরকারী উদ্যোগ। ফলে পুনরায় গ্যারান্টি প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। নতুন ব্যবস্থায় অবশ্য রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনার ভার থাকে সরকারের হাতে। কোম্পানীগুলিকে রেলপথ নির্মাণের ও পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। অবশ্য পূর্ববর্তী গ্যারান্টি ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান গ্যারান্টি ব্যবস্থায় পার্থক্য ছিল। এই সময় ৫% এর বদলে ৩.৫% সুদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় নবনির্মিত রেলপথগুলি ভারত সচিবের সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়।

২৫ বছর পরে লগ্নীকৃত মূলধন ফেরত দিয়ে ভারত সচিব চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ করতেন। এই ব্যবস্থা ১৯০০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। রেলপথের যাবতীয় খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত লাভ সরকার এবং প্রোমোটারদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ায় রেল-প্রশাসন সর্বত্র এক ধরণের ছিল না। কিছু কিছু রেলপথ ছিল সম্পূর্ণ সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। কিছু ছিল বিভিন্ন কোম্পানী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং কিছু ছিল গ্যারান্টি প্রথাভুক্ত বেসরকারী মালিকানাধীন ও পরিচালিত। এছাড়াও আরও কিছু ছোট ছোট রেলপথ ছিল। বিভিন্ন ধরণের এই রেলপথের উপস্থিতি পরিচালন ব্যবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে টমাস রবার্টসনের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। রবার্টসনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৫ সালে তিনজন সদস্য নিয়ে একটি রেলওয়ে বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রেলপথ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে এবং সঠিক পথে খরচ করা। এদিকে রেল প্রশাসনে জটিলতা হ্রাস করার জন্য বেসরকারী রেলপথগুলির চুক্তির মেয়াদের শেষে সেগুলি সরাসরি অধিগ্রহণের দাবী তোলা হয়। এই অবস্থায় ১৯২০ সালে স্যার উইলিয়াম অ্যাকওয়ার্থের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯২৫ সালে স্বতন্ত্র রেল বাজেট প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া রেল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ৫ করা হয় এবং বোর্ডকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রেল ব্যবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, কারণ এতে ভারতীয় অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছিল। এছাড়া ভারতীয় যাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার। ভারতীয় পণ্যের ওপর বাড়তি মাশুল প্রভৃতি সম্পর্কেও ভারতীয়রা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় সরকার ১৯২৫ সালে থেকে তার নীতির পরিবর্তন ঘটায় এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে অধিগ্রহণ করতে থাকে। রেলবোর্ডকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং রেলবাজেট সাধারণ বাজেট থেকে পৃথক করা হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল।

৫.৫.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। Dharma Kumar ed. — *Cambridge Economic History of India, Vol.2*

২। Vera Anstey — *Economic Development of India.*

৩। Dhires Bhattacharyya — *A Concise History of the Indian Economy.*

৫.৫.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতে কোথায় এবং কবে রেলপথ প্রথম চালু হয় ? এদেশে রেলপথের বিস্তার কিভাবে ?

২। ভারতীয় অর্থনীতির উপর রেলপথের প্রভাব বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখ।

৩। ভারতে রেলপথের ইতিহাসে গ্যারান্টি ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? কি কারণে তা বাতিল হয়েছিল ?

—————

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

INDUSTRY AND POPULATION

একক - ১

ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্প অর্থনীতি

গঠন (Structure) ঃ

৪.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৩.১.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতির বুনিয়াদ—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্পের উদ্ভব

৪.৩.১.২ ঃ কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংস-সাধন

৪.৩.১.৩ ঃ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

৪.৩.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

- ৪.৩.১.৪.১ ঃ পাটশিল্প
- ৪.৩.১.৪.২ ঃ রেল শিল্প
- ৪.৩.১.৪.৩ ঃ বস্ত্র শিল্প
- ৪.৩.১.৪.৪ ঃ চা শিল্প
- ৪.৩.১.৪.৫ ঃ চিনি শিল্প
- ৪.৩.১.৪.৬ ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

৪.৩.১.৫ ঃ পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

৪.৩.১.৬ ঃ ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর অবির্ভাব

৪.৩.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র

৪.৩.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতি—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্প

(২) ভারতে কুটিরও হস্তশিল্পের ধ্বংসসাধন

(৩) অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

(৫) পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

(৬) ভারতে শিল্পায়নের সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

৪.৩.১.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতির বুনিয়াদ—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্পের উদ্ভব

মোঘল ভারতে কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ কুটির ও হস্ত শিল্পের উদ্ভব ঘটে। কৃষকরা যা উৎপাদন করতো তার একটা অংশ তাদের জীবিকায় সাহায্য করতো। জমিদারদের দেয় খাজনা ছাড়াও একটা বড় অংশ যেত সরাসরি রাজদরবারে। রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সেবা বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের রক্ষণাবেক্ষণে উদ্বৃত্তের একটা অংশ খরচ হতো, আর একটা অংশ উন্নয়নের কাজে লাগতো। গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে জোগান আসতো কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এছাড়া শহরে যে কারখানা শিল্প গড়ে উঠতো তা শহরের বিত্তশালী মানুষ ও রাজা-বাদশাদের ভোগে কাজে লাগতো। উদ্বৃত্তের একটা অংশ শিল্পে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের কাজে লাগানো হত। এই ধরনের শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা আসতো ভূ-স্বামী ও কেন্দ্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত রাজা-বাদশাদের কাছ থেকে। ভারতে গড়ে উঠেছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কৃষিকর্মীদের পরিপূরক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতো যখন কৃষি কাজ বন্ধ থাকতো। অর্থাৎ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প মৌসুমী বেকারের বিরুদ্ধে কৃষিকর্মীদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতো। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা সমাজকে অনেকে 'এশিয়াটিক' সমাজ বলেন। একে 'প্রাচ্য দেশীয় স্বৈরাচারী' ব্যবস্থাও বলা হয়।

৪.৩.১.২ ঃ কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধন

ভারতে ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে গেলে দেশকে কৃষিতে বিশেষায়ণ ঘটানো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন করা একটা সাম্রাজ্যবাদী বাধ্যবাধকতা বলে বিবেচনা করা হয়। সেই অনুযায়ী দেশের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, শুল্কনীতি পরিবর্তন করা দরকার হয়। আবার একই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দেশ থেকে কৃষিপণ্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া এবং বিদেশ (বৃটেন) থেকে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভারতে নিয়ে আসার পথ সুগম করতে হয়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সঙ্গে কাজ হারিয়ে বিভিন্ন শহরাঞ্চল থেকে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামমুখী হয়। গ্রামে শ্রমজীবী মানুষের এই পশ্চাদ্মুখী স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে বিনগরীকরণ (বা গ্রামিণীকরণ) বলা হয়। অর্থনৈতিক এই কাঠামো পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া ভারতের ইতিহাসে অবশিল্পায়ন নামে পরিচিত। অর্থাৎ

"অবশিল্পায়ন বলতে আমরা প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে নেহাৎ পুরানো ক্ষয়িষ্ণু শিল্পগুলির পতন বুঝি না। অবশিল্পায়ন বলতে বুঝি শিল্পায়নের বিপরীত প্রক্রিয়া যা দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন আনে যে সেই দেশে উন্নয়নের নিজস্ব উপাদানগুলি ক্রিয়া করতে পারে না।"

৪.৩.১.৩ ঃ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে বৃটিশ নীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়া স্বার্থের জায়গায় বৃটিশ শিল্পপুঁজির স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইংল্যান্ডে তখন বেনিয়া পুঁজির জায়গায় দখল নিচ্ছে শিল্পপুঁজি। ভারতে শুধু বেনিয়া স্বার্থ বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদ সন্তুষ্ট থাকে না। নতুন শতকের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নেহাত ভারতে পণ্যের উপর দখলদারি নয় বাজারের ওপর দখলদারিরও দরকার হয় বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর থেকে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের বাজার মন্দীভূত হতে থাকে। ১৭৯৪ সালে কোম্পানি ভারতের ছিট কাপড়ের ওপর ৪.৭৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৮১০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২.৫৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্পবিপ্লব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপণ্য নয়, ব্রিটিশ পণ্যের জন্য ভারতের বাজার দখল প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বাজার দখলের দুটো উদ্দেশ্য ছিল— বৃটেনের পণ্য অবাধে ভারতে বাজার করে নেওয়া এবং তাদের শিল্পের প্রয়োজনে ভারত থেকে কাঁচামাল ও খাদ্য নিয়ে যাওয়া। ১৮১৩ সালে চার্টার আইনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বেনিয়া অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনে শস্য আইন তুলে দেওয়া হয়। রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় নীতির যুক্তি দেখিয়ে ভারতে কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী হিসাবে বিশেষীকরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।

ভারতের সঙ্গে বৃটেনের আমদানি-রপ্তানির ধরনটায় বিপরীতমুখী এক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারত বৃটিশ পণ্যের, বিশেষ করে, সুতি পণ্যের আমদানি শুরু করে। আর ভারত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানিতে বিশেষীকরণ ঘটায়। বিদেশ থেকে পাকানো ও কাটানো সুতোর আমদানি খুব বেড়ে যায়। বৃটেন থেকে ভারতে সুতি বস্ত্রের রপ্তানি ১৮১৫ সালে ছিল ০.৪০ মিলিয়ন গজ। ১৮৩৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০.০৫ মিলিয়ন গজ। পাকানো সুতো ১৮১৪ থেকে ১৮২৮ সালে ৮ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয় ৪.৫৬ মিলিয়ন পাউন্ড। এবং ১৮৩৯ সালে তা আরও বেড়ে হয় ১০.৮১ মিলিয়ন পাউন্ড। অপরদিকে ভারত থেকে কাপড় রপ্তানিতে এক ভয়াবহ মন্দা দেখা য়ায়। ১৮৪৯ সালে ভারত থেকে রপ্তানিকৃত তুলোদ্রব্য, পাকানো ও কাটানো সুতোর মূল্য মাত্র ০.৬৯ মিলিয়ন পাউন্ডে নেমে আসে। ভারতে কাপড় ব্যবহারে বৃটিশ রপ্তানিকৃত অনুপাতের হার ১৮৬০ সালে তিনগুন বেড়ে হয় মোট ব্যবহৃত পরিমাণের ২৭ শতাংশের বেশি।

ভারতের তাঁতিরা টিকে থাকার স্বার্থে আমদানি করা সস্তা পাকানো ও কাটানো সুতো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতে সুতি কাটানো শিল্প মন্দার কবলে পড়ে। এর সর্বপ্রথম আঘাত আসে তাঁতশিল্পের ওপর। মনে করা হয় যে বৃটেনের আধুনিক কারখানায় তৈরি কাপড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত পেরে ওঠে না। এর কারণ বৃহদায়তন উৎপাদনে খরচের সুবিধা। কিন্তু এই যুক্তি অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকও অস্বীকার করেন। বয়নশিল্প ধ্বংসের জন্য এইচ.এইচ. উইলসন সরাসরি ইংরেজ সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন,—

...... "বলা চলে যে ভারতে যে তুলো ও রেশমপণ্য উৎপাদিত হতো তা বৃটেনের বাজারে এতদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে দামে উৎপাদিত হতো তার থেকে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে বিক্রি করা যেত। এর ফলে ইংল্যান্ডের পণ্যকে সংরক্ষিত করতে গিয়ে আমদানিকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শুল্ক বসাতে হয় বা অন্য কোন প্রত্যয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয়। এটা না করলে পেইল্‌সি বা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে যেত। বাষ্প ইঞ্জিনের ব্যবহারও একে বাঁচাতে পারত না। ভারতের উৎপাদককে বলি দিয়েই এটা করা হল। ভারত স্বাধীন থাকলে এর প্রতিশোধ নিতে পারত পাল্টা ভারতে বৃটিশ পণ্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্কনীতি গ্রহণ করে।"[২]

ইংরেজদের ভারতের বাজার জয় করার স্বপ্ন সার্থক হয় রেলপথ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৫০ সালের পর থেকে ভারতে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি বাড়তে থাকে। ১৮৪৬-৫৫ সালের মধ্যে বৃটেনের বহির্বিশ্বে রপ্তানির ৯.১৫ শতাংশ রপ্তানি হত ভারতে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে এই অনুপাত বেড়ে হয় ১২.৬ শতাংশ। ১৮৪৯ সালে ভারতে কাপড় ও সুতো রপ্তানির অংশ ছিল সমজাতিয় সমগ্র বৃটিশ রপ্তানির ১১.৭ শতাংশ। ১৮৭৫ সালে তা বেড়ে হয় ২৭ শতাংশ। রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ দ্রব্যের অবাধ আমদানি সম্পর্কে ইরফান হাবিবের মন্তব্য ঃ

"আমদানির এই নির্বিচার হননে অপরিসীম দুর্দশায় মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া প্রাচীন হস্তশিল্প আর কিছুই করতে পারে না।"[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই ভারতের বেশিরভাগ দেশীয় শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। দেশীয় শিল্পের এই ধ্বংসসাধনকে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারতের অসহনীয় দারিদ্র্যের ও বেকারির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। অবশিল্পায়ন যে হারে বেড়েছে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সেই হারে বেড়েছে। অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরে নিয়োগ হারিয়ে মানুষ গ্রামে ফিরে আসে। একে ভারতের ইতিহাসে 'গ্রামিণীকরণ' বা বিপরীতে "অবনগরীকরণ" বলা হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় কুটির ও হস্তশিল্প মৌসুমী বেকারত্বের মুখে গরিবমানুষের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করতো। অবশিল্পায়ন মানুষের এই ভরসার জায়গাটা ধ্বংস করে।

সমালোচকদের চোখে অবশিল্পায়ন ঃ-

অনেকেই ভারতের অবশিল্পায়ন তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। এঁদের মতে, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের মুখে সনাতনী প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা হস্ত ও কুটির শিল্প ধ্বংস হওয়াটা একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌দের অনেকের মতে ব্রিটিশরা ভারতে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে অবশিল্পায়নের ক্ষতি পুষিয়ে যায় বলে দাবী করা হয়। যেমন মরিস্ ডেভিড মরিস্ বলেন যে, বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় এবং একই সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়লে যে বাড়তি বাজার সৃষ্টি হয় তা বিদেশি এবং দেশি উভয় শিল্পকেই সমর্থন দিতে পারে। তিনি আরও দেখান যে ভারতে সুতো আমদানিতে সুতো কাটার শিল্প মার খায়। কিন্তু সস্তা সুতো ব্যবহার করে দেশি কাপড় শিল্প সমৃদ্ধির সুযোগ পায়। ড্যানিয়েল থর্নার বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে অবশিল্পায়নের কিছু প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে তা আর দেখা যায় না। তৃতীয় এক গোষ্ঠী বলেন যে, ভারতে অবশিল্পায়ন ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ বৃহদায়তন শিল্প যে খরচের সুবিধা ভোগ করতো, কুটির-হস্তশিল্প তা

করতো না। সুতরাং ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ভারতে পড়লে গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। ধ্রুপদী অর্থনীতির অনুগামী রিচার্ড কবডন, জন ব্রাইট প্রমুখ ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা মনে করি যে স্বাধীন দেশে সেটা প্রগতির ফল বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ অবশিল্পায়ন ভারতে বৃটিশ স্বার্থসিদ্ধ করে। ভারতের মানুষের যে শিল্পমানস এবং শ্রমিকের যে দক্ষতা তা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয় অবশিল্পায়ন। ভারতে অবশিল্পায়ন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা ঘটনা।

৪.৩.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলপথ, চট, পাট, চা, কাপড় এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্প আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এর মধ্যে কয়েকটির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা চলে।

৪.৩.১.৪.১ ঃ পাট শিল্প

ভারতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে হস্তচালিত শিল্প হিসাবে পাটশিল্প চালু ছিল। আধুনিক পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে রিষড়ায় ইংরেজ উদ্যোক্তা জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে। ইতিমধ্যে স্কটল্যান্ডের ডান্ডি শহরে ১৮৩৮ সাল নাগাদ পাট শিল্পের অভিষেক ঘটে। ভারতেও পাট শিল্প বিকাশে উদ্যোগ নেয় স্কটল্যান্ডের শিল্পপতিরা।

১৮৫৫ সালে প্রথম চালু হলেও বাষ্পশক্তির সাহায্যে পাটবোনার শিল্প ১৮৫৯ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সালের আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বেড়ে যাওয়ায় ভারতে পাট শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ১৮৭৩ সালে পাটকলে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৫০। ১৯০০ সালে এর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫০০০ এর বেশি। ১৯০০ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে এর সংখ্যা ১৩৫ শতাংশ বাড়ে। ভারতে কাঁচামাল প্রচুর থাকায় এবং শ্রম সস্তা হওয়ায় বিদেশের বাজারে ভারতে পাটশিল্প ডান্ডি থেকে এগিয়ে যায়। ১৮৮০ সালে ভারত ২১.৩১ মিলিয়ন মূল্যের পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে। ১৮৮৯ সালে এই মূল্য বেড়ে হয় ২৫.৭১ মিলিয়ন টাকা। ভারতের পাটশিল্পে ১৮৭৯-৮০ সালে নিয়োজিত ছিল ২৬.৮২৬। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ২,৯৮,৯৬৭। কার্যত ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রথমে রেল, পাট ও চা ও পরে লৌহ-ইস্পাত কারখানায়।

৪.৩.১.৪.২ ঃ রেল শিল্প

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলশিল্পের প্রতিষ্ঠাকে নেহাৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা বলে ভাবলে ভুল হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ইতিহাসে রেলশিল্পের পত্তন হল সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণতা। কার্যত রেল শিল্পের মাধ্যমে একদিকে ভারত্রে বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সাফল্য অর্জন করে, অপরদিকে ভারত থেকে বৃটেনে সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্য রপ্তানির পথ সুগম হয়। ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে নির্গমনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণে রেল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া ভারতে সামরিক বাহিনীর গতিশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থাকে আরও নিপুণ করে তোলে রেল ব্যবস্থা।

রেলশিল্প বিদেশী উদ্যোগে ভারতে স্থাপিত হয়। এর জন্য যে বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হয় তার ওপর ন্যূনতম সুদ ধার্য করা হয়। এটা ভারতবাসিকে শোধ দিতে হত। মনে রাখা দরকার যে ভারতে রেলশিল্প একটা শিল্পহিসাবে সামগ্রিকতায় ভারতে আসেনি। কেবল লাইন পাতার কাজটাই হয়েছে ভারতে। লাইন, ইঞ্জিন, বগি সবই আমদানি হয়েছে ভারতে। তাই এর বিস্তৃত প্রভাব ভারতে দেখা যায়নি, তা চালান হয়েছে বৃটেনে। ১৮৫৩ সাল নাগাদ ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৮৫৪-১৮৬০ সালের মধ্যে ১২টি রেলকোম্পানি গড়ে ওঠে। ভারতে রেল শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে তৎকালীন ভারত সরকারও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪.৩.১.৪.৩ ঃ বস্ত্র শিল্প

ভারতে বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাবকে দেশীয় উদ্যোগে সর্বপ্রথম আধুনিক শিল্পের প্রবর্তন বলে মনে করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও তা সবসময় হয় না। তাছাড়া ঔপনিবেশিক দেশে পুঁজির প্রবাহ অবাধ হয় না। সেখানে দেশি পুঁজি জায়গা খোঁজে। তাছাড়া বিদেশি শিল্পগোষ্ঠীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে। এর সঙ্গে স্থানীয় ও ভৌগোলিক কিছু উপাদান যুক্ত হয়ে কোন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে যা দেশীয় পুঁজি প্রবেশকে সাহায্য করে। এই সব কিছু সুযোগ পেয়ে ভারতে সূতিশিল্প উনবিংশ শতাব্দী শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। ভারত স্বাধীন থাকলে এই শিল্পের সংযোগ প্রভাব আরও তীব্র হতে পারত। রেল ও সূতিশিল্প শিল্পায়নে নেতৃত্ব দিতে পারলে ভারতের শিল্পায়ন সম্পূর্ণতা লাভ করত। ভারতকে আর কৃষিনির্ভর পশ্চাদপদ দেশ হিসাবে থাকতে হত না।

পার্সি ব্যবসায়ী কওয়াসজী নানাভাই দাভার নেতৃত্বে ভারতে ১৮৫১ সালে অধুনা মুম্বাই শহরে সূতিবস্ত্র শিল্পের সার্থক রূপায়ণ ঘটে। অনেকে একে দেশের বাণিজ্য পুঁজি থেকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন। বস্ত্রশিল্পের বিকাশকে ভারতের অর্থনৈতিক জগতে শিল্পপুঁজিতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেকের মতে একে পুরোপুরি দেশীয় পুঁজির সাফল্য বলতে পারি না কারণ শিল্পের বিকাশের জন্য যে প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি দরকার তা আনা হয়েছিল বৃটেন থেকে। বৃটেনের বস্ত্রশিল্পের মালিকরা এই শিল্পের বিকাশে আপত্তি করেনি যদিও কাপড় শিল্পের পক্ষ থেকে একে সুনজরে দেখেনি। তাছাড়া পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত নানাভাই দাভার বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ ঘটে ইংরেজদের প্রভুত্বে ব্যবসা থেকে এবং ম্যানেজিং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থেকে । উল্লেখযোগ্য যে নানাভাই-এর প্রচেষ্টায় দুজন ইংরেজও অংশগ্রহণ করেছিল।

১৮৫৪ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বস্ত্রশিল্প খুব মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। ১৮৭৫ সাল অবধি মাত্র ৪৮টি সূতিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মুম্বাইতে। ১৮৮২ সালে ভারতে সূতিকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২।

৪.৩.১.৪.৪ ঃ চা শিল্প

বৃটিশ উদ্যোগ ও পুঁজির সাহায্যে ভারতে যে কটি শিল্প গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে চা বাগিচা শিল্প অন্যতম। ১৮৩৩ সালে চার্টার আইন বৃটিশ পুঁজিপতিদের জমির মালিকানা অধিকার পেতে সাহায্য করে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটেনে চা-এর চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া বৃটেনের পুঁজিপতিরাও চিনের সঙ্গে ভারতকে চিনি সরবরাহকারী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছিল। বৃটিশ পুঁজিতে এই শিল্প গড়ে উঠলে তার থেকে প্রচুর লাভের সুযোগ থাকায় ভারতে ইংরেজদের উদ্যোগে যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চা বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে। চা উৎপাদনে

সুদক্ষ ইউরোপিয় দক্ষ পরিচালকদের নিয়োগ করা হয়। ভারতে সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে সস্তায় চা শিল্প গড়ে ওঠে। চা প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দক্ষিণে নীলগিরি পাহাড় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং এবং আসামে চা বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে।

১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৮৯১-৯২ সালের মধ্যে ভারত থেকে বৃটেনে চায়ের রপ্তানির পরিমাণ ২৪,২৮৭,৪৮৮ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয় ১১১,১৬৮,৮৯৫ পাউন্ড। ১৮৮৬-৯০ এর মধ্যে বছরে গড়ে ৩২২,৭০০ একর জমিতে চা-এর আবাদ হত। স্বাধীনোত্তর ভারতের চা ছিল এক অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। চা-বাগিচা শিল্প কর্মসংস্থানের একটা অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য যে ৩০ এর দশক থেকেই পাট-এর সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগিচা শিল্পের মালিকানাও ইউরোপিয়দের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

৪.৩.১.৪.৫ ঃ চিনি শিল্প

প্রাচীনকাল থেকেই দেশীয় প্রযুক্তিতে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের রীতি চালু ছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াকরণের এই পদ্ধতির সাহায্যে ততটা বিশুদ্ধ ও মসৃণ চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হত না। আধুনিক কারখানায় চিনি উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠার। ইউরোপের উন্নত প্রযুক্তিতে চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বড় মাপের উদ্যোগ ও বেশি পরিমাণে মূলধনের দরকার হয়। এশিয়া জুড়ে চিনির চাহিদা খুব বেশি থাকায় ভারতে চিনি উৎপাদন লাভজনক বলে বিবেচিত হত। তাছাড়া চিনির কাঁচামাল আখ উৎপাদনে ভারত ছিল অগ্রণী। কিন্তু ভারতে সাবেকি প্রযুক্তিতে চিনি উৎপাদনে খরচ বেশি হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হত না। অথচ উপযুক্ত উদ্যোগ ও বড় মাপের পুঁজির অভাবে ভারত প্রয়োজনীয় সংখ্যায় আধুনিক চিনি কারখানা গড়ে তুলতে পারেনি। সেইজন্যই ভারত ১৮৬৩ সালে চিনির বড় আমদানিকারী দেশ ছিল। মরিসাসে বৃটিশ শিল্পপতিদের মালিকানায় আধুনিক চিনি শিল্প গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকেই ভারতে বিট চিনির যোগান আসত। এই আমদানিতে মরিসাসে বৃটিশ মালিকরা শুল্কের সুবিধা পেত। জার্মান ও অস্ট্রেলিয়া থেকে চিনি রপ্তানি কমাবার জন্য তাদের চিনি ভারতে রপ্তানির ওপর বেশি হারে শুল্ক ধার্য করা হয় ১৯০২ সালে। অর্থাৎ ১৮৭০ দশকে যে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু ছিল তা আর অবাধ থাকে না। সংরক্ষণের দরকার হয় মরিসাসে বৃটিশ প্রভুদের স্বার্থে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রাসেলে ১৯০১-০২ সালে আন্তর্জাতিক চিনি সম্মেলনের চাপে ভারত সরকার চিনির ওপর শুল্ক প্রাচীর তুলে নেয় ১৯০৪ সালে। জাভা ভারতের চিনির বাজার দখল করে। ১৯৩১ সালে আবার প্রায় ২৫ শতাংশ হারে চিনির ওপর সারচার্জ বসালে ভারতে চিনির আমদানি কমে যায়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিবেশে বৃটেন পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সময়কাল থেকে ভারতে চিনি শিল্প বেড়ে ওঠে। চিনি উৎপাদনে ভারত আত্মনির্ভর হয়। ভারত থেকে চিনি রপ্তানি সম্ভব হয়ে ওঠে।

৪.৩.১.৪.৬ ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

অর্থনীতির ইতিহাসে দেখা যায় শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতে যেখানে খুব দ্রুত হারে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ শিল্পায়নে জোয়ার আনতে পারত। কিন্তু ভারতে তা ঘটেনি কারণ সময়মত এই শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ জড়িত না থাকায় তৎকালীন বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

প্রাথমিক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লোহা ঢালাই শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যাহত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী জোসেয়া মার্শাল হিথ্ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও সে প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি।

হিথ্-এর মৃত্যুর পর ইস্ট ইন্ডিয়া আয়রন কোম্পানি মার্শাল হিথের প্রস্তাবিত প্রোটোনভ আয়রন ওয়ার্কস নামে কোম্পানিটি ১৮৫৩ সালে অধিগ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কার্যতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আধুনিক শিল্প হিসাবে আবির্ভূত হয় ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত স্যার জামশেদজী টাটা। দক্ষিণ বিহারে তৎকালীন সাক্‌চি শহরে (অধুনা জামশেদপুর) এর অভিষেক ঘটে ১৯০৮ সালে। জামশেদপুরই আজ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পীঠস্থান বলে পরিচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল কাঁচা লোহা উৎপাদন করলেও ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম হতে বেশি সময় লাগে না। ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে এই কোম্পানি রেললাইন উৎপাদন করলে রেলশিল্প ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। একেই অর্থনীতিতে সংযোগ প্রভাব বা Linkage effect বলা হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তন ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ভবিষ্যত গড়তে সাহায্য করে।

অমিয় বাগচী, তার ‘ভারতে আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন’ নামক গ্রন্থে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির উল্লেখ করেন।

৪.৩.১.৫ ঃ পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

ভারতে বৃটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই বাণিজ্যিক পুঁজির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই দেশীয় বণিকরা পর্তুগীজ বেনিয়াদের অধীনে সমুদ্রপারের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। একশ বছর ধরে ভারতের বাণিজ্যের ওপর কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ বেনিয়া ও ভারতের বণিকদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ডাচ ও ইংরেজদের সঙ্গে এবং তাদের অধীনে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসা করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিপত্য স্থাপিত হলে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশের অভ্যন্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যে সাহায্য করতে আরম্ভ করে। বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে যায়। এই সময়কাল ধরে ভারতে বাণিজ্য পুঁজি গড়ে ওঠে।

বাণিজ্য পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটলেও পুঁজিবাদীদের স্বাধীন উদ্যোগে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। ১৮৫০ সালের পর বৃটিশ পুঁজির উদ্যোগে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজশক্তি কখনও ভারতকে শিল্পোন্নত অর্থনীতি হিসাবে দেখতে চায়নি। ভারতকে নিজেদের স্বার্থেই কৃষি অর্থনীতি হিসাবে রেখে দিতে চায়। এরই মধ্যে তাদের উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত শিল্পোন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেশীয় পুঁজিপতিরা এতে অংশগ্রহণ করলেও তারা কখনও নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে না। সম্পদ নির্গমন, অবাধ অর্থনীতি, সরকারের শিল্পনীতি এবং সর্বোপরি বিনিয়োগের এবং তার সঙ্গে শিল্পায়নের গতি ও অভিমুখ, বিচার করলেই আমরা ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে পারি।

পশ্চিমী দেশের মতো ভারতে অর্থনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটেনি। সাধারণত তিনটি স্তর ধরে শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনের স্তর, পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের স্তর এবং কারখানা ভিত্তিক উৎপাদনের স্তর। অনেকেই মনে করেন যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারত অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনের স্তর থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন স্তরে পৌঁছলেও ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া ভারতকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় আধুনিক কারখানা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। অবশিল্পায়ন ও তার সঙ্গে

সঙ্গে সম্পদের নির্গমন স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিপথগামী করে। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় দেশি স্বাধীনচেতা শিল্পোদ্যোগের বিকাশ বজায় থাকতে পারেনি। অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় শিল্পজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য বিদেশি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। বিদেশি উদ্যোগের সঙ্গে দেশীয় যে নির্ভরশীল পুঁজি যুক্ত তাকে অনেকে পরগাছা পুঁজি বা মুৎসুদ্দি পুঁজি বলেন। শাসকদেশের মহানগরী (Metropolis) থেকে ভারতের শহরে কারখানা শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়া নয়। বুকাননের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা একে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া (impartation rather than evolution) বলেন। বিদেশের কারখানার শিকড় এখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। যেমন রেললাইন পাতা হয় কিন্তু রেললাইন, ইঞ্জিন, রেলবগি, কলকব্জার মত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বৃটেন থেকে আসে। অর্থাৎ শিল্প হিসেবে নয় বরং সেবা বিভাগ হিসাবে রেলশিল্প গড়ে ওঠে। পুঁজির সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকেও বৃটিশ অর্থনীতির উপাঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে কোন শিল্প সম্প্রসারণের বিস্তৃত প্রভাব বিদেশে চালান হয়। রেল শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্প তেমন গড়ে উঠতে পারে না। মনে করা যেতে পারে যে, ভারতে ইতিমধ্যে দীর্ঘ তিনশত বছর ধরে যে মুৎসুদ্দি পুঁজি গড়ে উঠেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যে যারা নিজেদের ভাগ্য তৈরি করেছে তাদের সঙ্গে বৃটিশ পুঁজির সংবন্ধনের সাহায্যেই ভারতের শিল্পায়নের সূত্রপাত হয়। ভারতে স্বাধীন পুঁজিপতি যে ছিল না তা নয়। কিন্তু শিল্পায়নে তারা কোন নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ঘটে যা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছে। আর দেশি পুঁজির একটা অংশ স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিল এরা। এমনকি কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। ফার্মেসিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মেসিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বেঙ্গল ল্যাম্প প্রভৃতি শিল্প দেশীয় পুঁজিপতিদের পুঁজিতে বিকাশলাভ করে। এরা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতো তা দেশীয় প্রযুক্তি ছিল। নিজেদের গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে এরা উৎপাদন করত। এই ধরনের পুঁজি বিদেশি পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাধেনি। তবে এদের তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। ফরাসি অর্থনীতিবিদ্ আঁদ্রে গুন্ডের ফ্রাঙ্ক মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্রাজ্যবাদ যখন সংকটে পড়েছে তখন দেশীয় শিল্প তার সুযোগ নিয়েছে। এটাও সত্য যে বিভিন্ন সময় কোন গাঁটছড়া পুঁজিপতিও এই স্বাধীন পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে লড়াইএ যোগ দিয়েছে। অনেক সময়ই দেশি পুঁজির সঙ্গে সংঘাত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়েছে। দেশি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যে বিভাজন করাটা সম্ভব হলেও স্বাধীন ও পরগাছা পুঁজির মধ্যে বিভাজনটা অনেক সময়ই অস্পষ্ট। স্বাধীন দেশীয় পুঁজি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্বটা প্রধান হলেও বিদেশি ও মুৎসুদ্দি পুঁজির মধ্যে ঐক্যটাই ছিল প্রধান। অনেকে বিদেশি পুঁজি এবং দেশি পুঁজির মধ্যে বিভাজনটাকে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভাজনের কারণ বলে মনে করেন। এদের মতে বিদেশি পুঁজির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সংগঠিত আধুনিক শিল্প আর দেশি পুঁজি গড়ে তোলে অসংগঠিত শিল্প। কিন্তু এই বিভাজন ঠিক নয়। অনেক সময়ই দেশি পুঁজি সংগঠিত শিল্পে বিনিয়োজিত হয়। দেশি পুঁজিপতির নেতৃত্বে সংগঠিত শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন ভারতে বস্ত্র শিল্পে নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশি পুঁজিপতি। বিদেশি উদ্যোগ এই বিভাগে নেয়নি।

রেলপথ, চটশিল্প, পাটশিল্প এবং চা ও বরারের মত বাগিচা শিল্প ভারতে বিদেশি উদ্যোগ ও পুঁজিতে গড়ে ওঠে। তবে পরের দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন দেশীয় পুঁজি এই সব শিল্পে যথেষ্ট বিনিয়োগ করে। বিভিন্ন যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানিতে দেশীয় মালিকানা বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা যায়। বৃটেন অর্থনীতি থেকেই এই মন্দার সূচনা হয়। এই সময়কাল থেকে বিভিন্ন দেশে বৃটিশ কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে চটকল, চা, রবার প্রভৃতি শিল্পের মালিকানা বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে আসার প্রবণতা দেখা যায়। এই সব শিল্প থেকে ইংরেজদের পশ্চাদপসারণের দুটি কারণ আছে বলে অনেকে মনে করেন। একটা ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সময়কালে ভারতে জাতীয়তাবাদের জোয়ার আসে। বিদেশি পুঁজির জায়গায় দেশীয় পুঁজি জায়গা করে নেয়। আরেকটা ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয় যে এই সময়ে বৃটিশরা বুঝতে পারছিল যে সাবেকি শিল্পের তেমন ভবিষ্যত নেই। তাছাড়া তারা ভারতের ওপর বেশিদিন খবরদারি করতে পারবে না। এই অবস্থায় তারা মালিকানা ছেড়ে দিয়ে ভারত থেকে পুঁজি তুলে নিতে শুরু করে। নতুন ধরনের শিল্পের ওপর বিনিয়োগের ঝোঁক বাড়ে। তামাক, বাদামতেল, ঔষধ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি উঠতি শিল্পে পুঁজির স্থানান্তর ঘটে। এছাড়া পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বহুজাতিক সংস্থা গড়ে তুলতে শুরু করে। সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কর্তৃত্ব না করে পরোক্ষভাবে পুঁজি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু হয় যাকে বলে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ। স্বাধীনতার আগে থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। মনে করা হয় যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে বিদেশি শিল্পের বিরুদ্ধে দেশীয় শিল্পের উত্থান বলে মনে করা হয় তা কার্যত এক ধরনের পরোক্ষ কর্তৃত্ব। এটা হয় সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশলে। একে ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জয় বলা যায় না।

কোন দেশে বিদেশি পুঁজির কর্তৃত্ব শুধু বিদেশি পুঁজির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। নেহাৎ পরিমাণগত বিষয় হলে বলা চলে না যে ভারতে বিদেশি পুঁজির কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিল কারণ পরিসংখ্যান বলে যে ভারতে আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ছিল কম। অমিয় বাগচীর মত অর্থনীতিবিদরা দেখান যে অর্থনীতির গঠন ও কাঠামোই ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশি পুঁজির প্রাধান্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ইংরেজ ব্যবসায়ী কম দামে কাঁচামাল কেনে। শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত রাখে। বণিক সমিতিগুলো সামাজিক ভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজনীতিবিদ্, ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করে। বেতন কমিয়ে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, পণ্যের দাম বাড়িয়ে ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণে রেখে চা, কয়লা, পাট প্রভৃতি শিল্পে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন কয়েকটা এজেন্সি বিভিন্ন শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখত। চা শিল্পে ৬১ শতাংশ, কয়লায় ৪৬ শতাংশ এবং পাটশিল্পে ৫৫ শতাংশ কোম্পানিকে এরা নিয়ন্ত্রণ করত। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প সুদে লগ্নির সুবিধা দেওয়া হত। বহির্বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত জাহাজ কোম্পানিগুলোয় একচেটিয়া ইংরেজদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব-ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি বজায় ছিল। পশ্চিম ভারতে বিদেশি পুঁজি এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করত না। তাদের স্বার্থী মুৎসুদ্দি পুঁজিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের এই একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি বজায় ছিল। উল্লেখযোগ্য যে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারতে বিদেশিদের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে বোঝাপড়া এবং অন্যদিকে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সওদাগরশ্রেণী বেড়ে উঠেছে। বিদেশি পুঁজির উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত যে শিল্পায়ন ঘটে তাতে অংশগ্রহণের মধ্যে দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য পুঁজি শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। ভারতে পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের ভূমিকা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের অর্থনীতিতে এঁরাই হয়ে দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৩.১.৬ ঃ ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রেলপথ স্থাপনের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক কারখানা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ইতিমধ্যে ভারতে হস্ত ও কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আধুনিক কারখানা শিল্পে মালিক শ্রমিকের মধ্যে যে পুঁজিবাদী সম্পর্ক দেখা দেয় সেখানে শ্রমিকরা শ্রম সময় বিক্রি করে তাদের জীবিকা অর্জন করে। পুঁজিবাদের নিয়মে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রমিকরা শুধু যে মালিকানাহীন এক সর্বস্বান্ত শ্রেণী তা-ই নয়, তারা তাদেরই উৎপাদিত পণ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই শ্রমিক শ্রেণীকেই কার্ল মার্কস সর্বহারা শ্রেণী বলে আখ্যা দেন। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ জুড়ে শিল্পবিপ্লবের সময়কালে আধুনিক কারখানা শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। এর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। একই সঙ্গে সমাজের সর্বক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জগতে যে মৌলিক পরিবর্তন আসে ত শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবকে এক নতুন মাত্রা দেয়। শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে নয় গুণগত দিক দিয়েও শ্রমিক মালিক সম্পর্কে এক মৌল পরিবর্তন ঘটে। উভয়ের মধ্যে যে বিমূর্ত্ত মালিকানা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা সমাজকে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীতে ভাগ করে দেয়। কিন্তু ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে নিয়ন্ত্রিত যে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে তা শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটালেও সংখ্যা ও গুণগত দিক দিয়ে সমাজকে শ্রমিক শ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত করতে পারেনি। আমরা দেখি যে কৃষি ও শিল্পবিভাগের মধ্যে কৃষির প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সামন্তবাদের পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি শ্রমজীবী মানুষকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থনীতিতে কাঠামোগত এক অচলায়তন অবস্থাকে বৃহদায়তন শিল্পের বিচ্ছিন্ন এবং নিয়ন্ত্রিত বিকাশ অটুট রাখতে সাহায্য করে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তার ওপর আলোকপাত করব।

দ্রুতহারে রেলপথে বিকাশসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। রেলের ওপর বিনিয়োগ সবথেকে বেশি হলেও রেলে সেই অনুপাতে নিয়োগ ঘটতে পারেনি। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ জে. এম. হার্ড The Cambridge Economic History of India, Vol-II গ্রন্থে স্বীকার করেন যে ভারতে রেল শিল্প অর্থনীতিতে সংযোগ প্রভাব বা বিস্তৃতি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি কারণ ইঞ্জিন থেকে আরম্ভ করে যন্ত্রপাতিসহ বগি পর্যন্ত আমদানি করা হত বৃটেন থেকে। শুধু রেললাইন পাতার জন্য অদক্ষ শ্রমিকের ব্যবহার হত। কিছু সারাই করার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সাল নাগাদ ১১ লক্ষ শ্রমিক এই ওয়ার্কশপগুলিতে নিযুক্ত হয়। ড্রাইভার ও গার্ড হিসেবেও কিছু শ্রমিকের নিয়োগ ঘটে। পরবর্তীকালে এই রেলশিল্পে সবচেয়ে সংহত ও শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় এই বিভাগে পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সংহতি লাভ করে।

রেল ছাড়াও বস্ত্রশিল্প, চটকল, কয়লাখনি এবং বাগিচা শিল্পে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। নিচের সারণিতে দেখানো হল বিভিন্ন শিল্পে ১৯০০-১৯০১ সাল থেকে ১৯৪৬-৪৭- এব মধ্যে কিভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে।

ভারতে বিভিন্ন পণ্যশিল্পে নিয়োগের হার (শতকরা)

১৯০০-০১ থেকে ১৯৪৬-৪৭

সময়	সুতিশিল্প (১)	পাট শিল্প (২)	কাগজ (৩)	সিমেন্ট (৪)	পশম (৫)	লৌহ ও স্টীল (৬)	দেশলাই (৭)	মোট (১-৭) (৮)	অন্যান্য পণ্যশিল্প (৯)	মোট পণ্যশিল্প (১০)	মোট পণ্যশিল্প (হাজারে) (১১)
১৯০০-০১	৩২.১	২০.৬	০.৯	—	০.৫	—	—	৫৪.১	৪৫.৯	১০০	৫৩৯
১৯১৩-১৪	২৮.৩	২৩.৫	০.৫	—	০.৪	০.৯	—	৫৩.৬	৪৬.৪	১০০	৯১৮
১৯১৮-১৯	২৬.৬	২৫.১	০.৫	০.২	০.৪	১.৫	—	৫৪.৩	৪৫.৭	১০০	১,১০১
১৯২৩-২৪	২৬.৪	২৪.৪	০.৪	০.৪	০.৭	১.৬	—	৫৩.৯	৪৬.১	১০০	১,৩৫০
১৯২৮-২৯	২৩.৮	২৩.৬	০.৪	০.৫	০.৬	১.৩	১.১	৫১.৩	৪৮.৭	১০০	১,৪৫৭
১৯৩৩-৩৪	২৮.৩	১৮.৯	০.৫	০.৫	০.৬	১.২	১.৩	৫১.৩	৪৮.৭	১০০	১,৩৬০
১৯৩৮-৩৯	২৩.৪	১৫.৯	০.৫	০.৭	০.৬	১.১	০.৯	৪৩.৫	৫৬.৫	১০০	১,৮৫৪
১৯৪৬-৪৭	১৮.৪	১১.৪	০.৪	১.০	০.৭	০.৪	০.৭	৩৪.২	৬৫.৪	১০০	২,৬৫৪

উৎস ঃ কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৪৩

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় যে আলোচিত পঞ্চাশ বছরে বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক সংখ্যার আনুপাতিক হার তেমন বাড়েনি। তবে মোট শ্রমিক সংখ্যা নেহাত কম নয় বলে মরিস্ ডি মরিস্ তাঁর ‘The growth of Large Scale Industry to 1947’ নামক লেখায় মনে করেন। তিনি ইউরোপীয় দেশের সাথে তুলনা করে এই মন্তব্য করেন। তাছাড়া কয়েকটি প্রদেশে কারখানা শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্রীভূত বলে দেখা যায়। ওপরের সারণি ধরে আরও বলা যায় যে বস্ত্র ও পাটশিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ পুরনো শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের হার সাম্রাজ্যবাদ শাসনের শেষের দিকে কমতে থাকে। নতুন শিল্পগুলি এই শিল্পগুলির মতো শ্রমিক নিয়োগে সক্ষম ছিল না। মোট কারখানা শিল্পে নিয়োগের শতাংশ হিসাবে সারণিতে তালিকাভুক্ত সাতটি শিল্পে নিয়োগের অনুপাত শেষের দিকে কমে বলে দেখা যায়।

আমরা এই সময়কালে মোট-শ্রমিকের অংশ হিসাবে মহিলা ও শিশু শ্রমিকের বিষয়টি উত্থাপিত করতে পারি। দেখা যায় যে কারখানা শিল্পে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মহিলা ও শিশু শ্রমের অনুপাত কম। নিচের সারণিতে সেটা দেখা যায়

কারখানা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের দৈনিক শ্রমিকের অনুপাত (১৮৯২-১৯৪৬ সাল)

সময়	পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
১৮৯২	৮০.২	১৩.৮	৬.০	১০০
১৯১৩	৭৮.৭	১৫.৩	৬.০	১০০
১৯২৮	৮০.০	১৬.৬	৩.৪	১০০
১৯৩৯	৮৫.৬	১৩.৯	০.৫	১০০
১৯৪৬	৮৭.৮	১১.৮	০.৪	১০০

উৎস ঃ কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি পৃঃ ৬৪৫

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকের অনুপাত সামান্য হারে হলেও বাড়ে। ১৯২৮ সালের পর তা কমতে থাকে। শিশু শ্রমের নিয়োগের শতকরা হার কমতে থাকে। সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায় যে ছবিটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমন বদলায়নি।

সনাতনি অর্থনীতিতে শিল্পায়নকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সমার্থক বলে বিবেচনা করা হত। পশ্চিমী দেশেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকশোষণের যে নগ্ন চেহারাটা দেখা যেত তা ঔপনিবেশিক ভারতে আরও বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। পুরুষ, মহিলা, শিশু সবধরনের শ্রমজীবী মানুষই অভাবনীয় এক নিষ্ঠুর শোষণের শিকার ছিল। শ্রমিকদের দিনে ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করতে হত। কাজের মধ্যে বিরতি থাকার কোন প্রথা ছিল না। ১৮৮৫ সালের শ্রম কমিশন মন্তব্য করেন যে ভারতের কারখানায় সারাবছরে গড়ে ১৫ দিনের ছুটি পাওয়া যেত। ইংল্যান্ডে সেই সময় শ্রমিকরা শনি রবিবার মিলে সারা বছরে ৮৮ দিন ছুটি পেত। ১৮৯১ সালের কারখানা আইনে ৭-১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯ ঘন্টা শ্রম সময় ঠিক হয়। মহিলাদের জন্য ১১ ঘন্টা বেধে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আইনও কারখানাগুলোতে মানা হত না।

রেল শিল্প, চা বাগিচা বা পাটশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কাজ করত তা পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবীদেরও পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক সংঘ গঠন এবং তাদের আন্দোলন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পেতে থাকে। সারা ভারতে শ্রমিকশ্রেণী একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বর্ণিত বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার সঙ্গে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার মিল তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে ভারতে পশ্চিমী ধরনের শিল্পপুঁজির বিকাশ ঘটলে, "দেশি বা বিদেশি যে পুঁজিপতিশ্রেণীনীতির উদ্ভব ঘটবে যাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধিতে শ্রমজীবী জনসাধারণের সাচ্ছন্দ সম্ভব নয়।" শ্রমজীবী মানুষ এক পশুর জীবন যাপন করবে যারা হয়ে দাঁড়াবে, "আত্মসম্মান খোয়ানো, মালিকদের দ্বারা তাড়িত, অসহায় মানুষ যন্ত্রে।"

আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অসংগঠিত বিভাগে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা বলে নেওয়া দরকার। উল্লেখযোগ্য যে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের নিয়ন্ত্রিত বিকাশ ঘটে। কিন্তু অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন তেমন হয়নি। কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তরের পশ্চিমী ধারণা ভারতে ধরা পড়ে না। এই অবস্থায় কৃষি বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে ব্যাপক শ্রমের স্থানান্তর ঘটে না। বরং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রামীণীকরণ বা অবনগরীকরণ ঘটে তাতে শহরে নিযুক্ত হস্তশিল্পে নিয়োগ হারিয়ে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামমুখী হয়। কৃষিতে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। শহরে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মত কিছু সহশিল্প গড়ে ওঠে। এই সহশিল্পগুলি ছিল অসংগঠিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। যেমন— বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গানদীর পশ্চিম পারে হাওড়া জেলায় বা কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

আমরা অসংগঠিত বিভাগ বলতে কৃষি, সাবেকি হস্ত কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বুঝি। এই ধরনের উৎপাদন সংগঠন ব্যক্তি মালিকানায় সীমিত পুঁজিতে গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্যোগ দেখা যায়। এই বিভাগ আধুনিক যৌথমূলধনী কারবারের মত সংগঠিত নয় বলে এদের অসংগঠিত শিল্প বলা হয়। গ্রামে কুটির শিল্পগুলো ছিল কৃষির পরিপূরক। অনেকক্ষেত্রে পরিবারের শ্রমেই এগুলো পরিচালিত হত। কৃষিতে মৌসুমী রেখাবৃত্তের সময় এই শিল্প মানুষের জীবিকায় সাহায্য করত। বৃটিশ আমলে কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার

ওপর বিশ্বাসযোগ্য তেমন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর মত শহরগুলোতে যেভাবে জনসংখ্যা কমেছে তা ধরে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। শহরে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা যেমন কমেছে গ্রামে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা তেমনই বেড়েছে। একে অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণীকরণ বা অবনগরায়নের ফল বলা যায়। তৎকালীন উত্তর প্রদেশের এগুলো ছিল মৌসুমী বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৮৬৯ সালে লক্ষ্ণৌতে মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৮৪,৭৭৯ জন। ১৯১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২,৫৯,৭৯৮ জন। মনে করা হয় যে, ১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই শহরটি ইংরেজ রাজতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসার পর অবনগরায়ন আরও বেশি হারে শুরু হয়। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামে আশ্রয় পায়। আমরা ধরে নিতে পারি যে শহরে বিকল্প নিয়োগের সুযোগ না থাকায় গ্রামে এই শ্রমজীবী মানুষ ঐ জীবিকার জন্য আশ্রয় খোঁজে। উনা, রায়বেরিলি, শহরগুলোকেও একই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। একই সঙ্গে দেখা যায় কলকাতা ও হাওড়ার জনসংখ্যার স্ফীতি ঘটে। এই সময়কালে রেল ও অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের সুযোগ থাকায় শ্রমজীবী মানুষের স্থানান্তর ঘটে এই সব এলাকায়। একই সঙ্গে আধুনিক শিল্পের সহযোগী ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে থাকায় এই সব অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ে।

আমরা আমাদের আলোচনায় আধুনিক শিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের দিকটা যেমন আলোচনা করলাম তেমনি অসংগঠিত শিল্পে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিভাবে শ্রমজীবী মানুষের গঠনে পরিবর্তন এসেছে তার একটা রূপরেখা তুলে ধরলাম। সাধারণ ধরনটা অনুমান করা গেলেও তার পরিসংখ্যানের অভাবে এই পরিবর্তনের ধরনের খুঁটিনাটির বিষয়টি অনেকটাই অধরা রয়ে গেল।

৪.৩.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র

বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তাত্ত্বিক সমর্থকরা খোলা বাজারের অর্থনীতির দর্শনের ভিত্তিতে অবাধ অর্থনীতি (Laissez Faire) চালু রাখার পক্ষে মত দেন। ঔপনিবেশিক ভারতেও ইংরেজ সরকার অবাধ অর্থনীতির প্রবর্তন করেন যাতে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে পণ্যের লেনদেনে তেমন বাধা না থাকে। বিনা শুল্কে বৃটেনে উৎপাদিত পণ্য ভারতে প্রবেশের পথ এবং ভারত থেকে কৃষিপণ্য সে দেশে প্রবেশের পথ অবাধ করে দেওয়ার নীতিই প্রতিফলিত হয় ঔপনিবেশিক ভারতে গৃহীত শিল্পনীতিতে ঔপনিবেশিক ভারতে বৃটিশ অনুসৃত নীতিকে যতটা অবাধ বলা হয় কার্যত তা ততটা অবাধ ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বার্থ যেখানে বজায় থাকত সেখানে বৃটিশ নীতি অবাধ ছিল। কিন্তু যেখানে দরকার সে সেখানে সংরক্ষণের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। রাজস্বের খাতিরে বৃটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক বসালে ভারতের দ্রব্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসানো হয়েছে।

রেলের মত পরিকাঠামো শিল্পে বেসরকারী পুঁজি যথেষ্ট না হওয়ায় সরকার প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৮৬৭ এবং ১৮৬৯ সালে ভাইসরয় লর্ড লরেন্স সরকারের সচিবকে রেল প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেন। ১৮৭০-৭১ সালে রেল পরিবহন শিল্পে সরকারি ঋণ অর্থ ব্যবহৃত হয়। নতুন গ্যারান্টি ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের এক সমন্বয় ঘটে। ভারতের শুল্কনীতি কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা আমরা আলোচনা করতে পারি। বাজেট ঘাটতি মেটাবার জন্য সরকারকে কিভাবে শুল্কনীতি পরিবর্তন করতে হয় তা দেখা যেতে পারে।

রেলপথ স্থাপনে সঙ্গে সঙ্গে সরকার এক 'বাণিজ্য দশায়' পৌঁছায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়কে বাণিজ্য দশা বলা হয়। অনেকে মনে করেন যে শিল্পায়নের এই পর্যায়ে ভারত আধুনিক যুগে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়।

রেলপথের সাথে পাট, চা, রবার প্রভৃতি শিল্পের বিকাশ ঘটে। পরে বয়ন ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। যদিও ভাবা হয়েছিল যে রেলশিল্প ভারতে শিল্পায়নের অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। বরং একদিকে অবশিল্পায়ন আর অন্যদিকে সমপদ নির্গমনে সাহায্য করেছে রেলপথ, আর সরকার হয়েছে এর সাথী।

চা-শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ে সরকার সরাসরি উৎসাহ দেখায়। পরে সরকার তা বিদেশি বেসরকারি উদ্যোক্তার কাছে বিক্রি করে। অর্থাৎ চা-শিল্প বিকাশেও বাজার অর্থনীতি তথা অবাধ উদ্যোগের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছিল তা বলা যায় না।

দেখা যায় যে পূর্ব ভারতে রেল, চা বা পাট শিল্পে সরকারি সাহায্য দরকার হয়। কিন্তু বয়নশিল্প বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরের দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলালে সরকার কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন সময়ে সরকারের শুল্কনীতি আলোচনা করলে এই সত্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৯৪ সালে সরকারের বাজেটে ৩.৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা যায়। উপায় না থাকায় ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে নতুন শুল্ক আইন চালু হয়। কাপড় ও সূতো ছাড়া সবরকমের আমদানি দ্রব্যের ওপর ৫% হারে শুল্ক বসানো হয়। বৃটেনে কাপড় শিল্পের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। বাধ্য হয়ে সরকার ৫% হারে সূতো বস্ত্র ও সূতোর ওপর আমদানি কর বসায়, কিন্তু বৃটিশ বস্ত্র শিল্প গোষ্ঠীর চাপে ভারতে সূতো ও সূতীবস্ত্রের উপর ৫% হারে শুল্ক বসানো হয়। ইতিহাসে একে সমতুল্য শুল্কনীতি বলে।

বিভিন্ন কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকারকে বৈষম্যমূলক শিল্পনীতির পরিবর্তন করতে হয়। এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যুদ্ধের সময় বৃটিশরা ভারতে পণ্যের যোগান দিতে না পারায় জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাজার দখল করতে চেষ্টা করে। তাদের ঠেকাবার জন্য ভারতের শিল্পপতিদের সুযোগ দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে গণ আন্দোলনের ভয়ে সরকার কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৬ সালে শিল্প কমিশন গঠিত হয়। তারা শিল্প প্রসারের জন্য 'উৎসাহমূলক হস্তক্ষেপ নীতি' গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। এছাড়া ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেমস্ফোর্ড রিপোর্টেও ভারতের জন্য একটা সংগতিপূর্ণ শিল্পনীতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়। সরকার সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না।

ভারতে শিল্পোন্নতির জন্য বৃটিশদের কোনো সুষ্ঠ শিল্পনীতি ছিল না। অবাধ বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাস করলেও তারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে চলত, যা তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের থেকে একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অপরদিকে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তারা কিছুটা হলেও নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম যে নীতিগত ভাবে অবাধ অর্থনীতির সমর্থক হলেও ভারতে রাষ্ট্রের নীতি ততটা অবাধ ছিল না। সেই পর্যন্তই এই নীতি অবাধ ছিল যতক্ষণ তা বৃটিশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা গেছে। ভারতের বস্ত্র বা চিনি শিল্পের প্রয়োজনে সময়মত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হয়নি। রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে বা জার্মানের মত প্রতিযোগী দেশকে আটকাবার জন্য কখনও কখনও শুল্ক প্রাচীর তুলেছে। তখন ভারতের কিছুটা সুবিধা হয়েছে ঠিকই কিন্তু বলা চলে না যে ভারতের শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কোন ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করেছে।

৪.৩.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রণেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোং

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি

অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোং

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agriculture at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.৩.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) অবশিল্পায়ন কাকে বলে? বৃটিশ আমলে অবশিল্পায়নের ফলাফল আলোচনা কর।

(২) বৃটিশ ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

(৩) ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(৪) শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

একক - ১

প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার

প্রাক্ ১৮৫৭ খ্রীঃ কৃষক, উপজাতিয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

বিন্যাস ক্রম ঃ

৩.৭.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৩.৭.১.১ ঃ প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার

৩.৭.১.২ ঃ ১৮৫৭ সালের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

৩.৭.১.৩ ঃ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধ আন্দোলন

৩.৭.১.৪ ঃ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (1763-1800) ঃ উদ্ভব এবং বিকাশ

- ৩.৭.১.৪.১ ঃ তাৎপর্য
- ৩.৭.১.৪.২ ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ
- ৩.৭.১.৪.৩ ঃ রংপুর বিদ্রোহ
- ৩.৭.১.৪.৪ ঃ কোল বিদ্রোহ (1832)
- ৩.৭.১.৪.৫ ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855)

৩.৭.১.৫ ঃ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

- ৩.৭.১.৫.১ ঃ ফরাজী আন্দোলন
- ৩.৭.১.৫.২ ঃ ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ

৩.৭.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৭.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.৭.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার।

(২) প্রাক্ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতিয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।

(৩) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ের আন্দোলন

(৪) সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

(৫) ফরাজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য।

৭.১.১ ঃ প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার

ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণ ও আধিপত্য স্থাপনের চরিত্র ছিল পূর্ববর্তী সকল বৈদেশিক আক্রমণের চরিত্রের থেকে ভিন্ন। পূর্বে বৈদেশিক আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে কেবল সর্বোচ্চ স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হত। কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোন প্রভাব সাধারণ ভারতীয়ের ওপর পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণের চরিত্র গুণগতভাবেও ভিন্ন ছিল। এই অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশশীল, শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতির পতন ঘটে, অন্যদিকে বাণিজ্যের সূত্র ধরে একটি নতুন অর্থনীতির জন্ম হয়। এই নতুন ব্যবস্থার সঠিক ফল হিসাবে ভারত অতি দ্রুত দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যায়। এটি একদিকে যেমন কৃষক এবং কারিগরদের অবস্থার এবং স্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি এর ফলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধ্বংসাবশেষের ওপর ভারতে পশ্চিমী দেশগুলির ন্যায় নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়নি। এইভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব একটি নতুন ধরণের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও কাঠামো গড়ে তুলেছিল যা ছিল সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদগামী। প্রথাগত হস্তশিল্পের অবনমন কৃষিকার্যের ওপর চাপ বৃদ্ধি করেছিল। কৃষকরাই সবচেয়ে বেশী চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের দ্বারা ক্রমাগত প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল ভারতীয়দের বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রেখেছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধগুলিকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। (1) **উপজাতিয় উত্থান** এবং (2) **কৃষক বিদ্রোহ**।

> *ঊনবিংশ শতাব্দিতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশশীল, শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।*

প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধ প্রকৃতি ও আকার পর্যালোচনা করো।

৩.৭.১.২ ঃ 1857 সালের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতিয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনতার অসন্তোষ প্রাথমিকভাবে অসামরিক বিদ্রোহের রূপ নেয় যা পরিচালিত হয়েছিল ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বারা পদচ্যুত প্রাক-ঔপনিবেশিক কালের ভারতীয় রাজকর্মচারী, জমিদার, কর্মবিচ্যুত মুঘল সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা। ভারতীয় কৃষক এবং কারিগরদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজ শাসন সৃষ্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কথা বলা যায়। এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও বাংলার অধিকারচ্যুত জমিদারদের দ্বারা (1763-1800) এবং এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কর্মবিচ্যুত সেনাগণ, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক শ্রেণী এবং সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যারা কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। চুয়াড় বিদ্রোহও (1766-1772) ছিল একটি অভ্যুত্থান যা বাংলা এবং বিহারের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এইরূপ অভ্যুত্থান সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই বিদ্রোহগুলির মুখ্য কারণ ছিল প্রথাগত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিচ্যুতি ও অবনমন। ঔপনিবেশিক সরকারের সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের পন্থা ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি আলগা করে দেয়। ফলে ঐতিহ্যিক অর্থনীতিকে পুনর্বহাল করার তাগিদে জমিদার, কৃষক সকলেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই অসামরিক বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল 1857 সালে মহাবিদ্রোহের সময় যখন প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সামন্ত নেতাদের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও কারিগর এই মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে 1857 র পর কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কারণ 1857-র মহাবিদ্রোহের পর দেশীয় রাজন্যবর্গ হয় পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছিল অথবা ইংরেজরা নানা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে এসেছিল। ফলে পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলির ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি হিসেবে কৃষকরাই সামনে থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে থাকে।

> *১৮৫৭ সালের পূর্বে বিদ্রোহগুলির মুখ্য কারণ ছিল প্রথাগত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিচ্যুতি ও অবনমন।*

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা বা আদিবাসী সমাজগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং কখনো কখনো তারা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। 'Tribe' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় 'caste' বা জাতিপ্রথা থেকে এই জনগোষ্ঠীগুলিকে পৃথকীকরণের জন্য। তবে প্রাক-ঔপনিবেশিক সমাজে উপজাতিগুলি সমাজের মূল প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেটি ইতিহাসে একটি পৃথক আলোচনার বিষয়, বর্তমান আলোচনায় এই বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনার সুযোগ নেই। ঔপনিবেশিক শাসন উপজাতিদের জীবনে এক নতুন ধরনের দুঃখ দুর্দশা বহন করে এনেছিল যা ইতিপূর্বে তারা কখনো লাভ করেনি। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা ও মিশনারীদের কার্যকলাপ আদিবাসী অঞ্চলে চালু হলে সরল প্রাণ, সাদাসিধা আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদারদের শোষণ ও মহাজনদের প্রবঞ্চনার শিকার হয়। 1757 থেকে 1857 খ্রীঃ মধ্যে সংগঠিত অসংখ্য উপজাতি বিদ্রোহের মধ্যে কোল বিদ্রোহ (1820-1837) এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855-56) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রশ্ন

১। ১৯৫৭ সালের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সমন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এদেশীয় কৃষকশ্রেণী। ফলে প্রথম দিকের কৃষক বিদ্রোহগুলির মেরুদণ্ড ছিল এই কৃষক শ্রেণী যা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। বিশেষ সরকারী নথিপত্রের অভাবে সব কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারিনা। অনেক অজানা, ছোট ছোট কৃষক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। কিছু কিছু কৃষক বিদ্রোহ আবার ধর্মীয় রূপও পরিগ্রহ করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ওয়াহাবী আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলন এবং কুকা আন্দোলন।

৩.৭.১.৩ ঃ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধ আন্দোলন

1765 খ্রীঃ বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, যা তৎকালীন সময়ে সুবা বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, তা কিন্তু ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক কার্যকলাপকে একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করেছিল। তখন থেকেই কোম্পানীর শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল যতটা সম্ভব কম বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি করা যা অনিবার্যভাবেই কৃষকদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাছাড়া এইসময় বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের বহু প্রাচীন প্রথা, জীবন ও জীবনের মানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বিকল্প পরিকাঠামো সেখানে গড়ে ওঠেনি। নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কৃষক, পুরানো জমিদার এবং সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্নভাবে ক্ষতি করেছিল যা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়া। এই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনকে অসংখ্য প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সমস্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ এবং চুয়াড়দের অভ্যুত্থান।

প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৩.৭.১.৪ ঃ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (1763-1800) ঃ উদ্ভব এবং বিকাশ

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল W.W. Hunter-এর *Annals of Rural Bengal*, Suprakash Roy-এর "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" A. N. Chandra এর *The Sannyasi and Fakir Rebellion*, Atish Dasgupta-এর *The Fakir and Sannyasi Uprisings*, Ananda Bhattacharya-এর *Sannyasi and Fakir Uprising in Bengal in the Second Half of the Eighteenth Century* (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপ্রকাশিত গবেষণা পুস্তক 1991) এবং Suranjan Chatterjee-এর *New Reflections on the Sannyasi Fakir and Peasant War.* (*EPW*তে প্রকাশিত 1984)।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সামাজিক উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকমহলে দীর্ঘদিন ধরে একটি বির্তক চালু আছে। কোন কোন গবেষক মনে করেন যে সন্ন্যাসীরা ছিলেন বহিরাগত যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলায় এসেছিলেন। অবশ্য কিছু গবেষক সন্ন্যাসীদের বাংলা প্রেসিডেন্সির অধিবাসী হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরা অন্যান্য অধিবাসীদের মতোই

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের উদ্ভব ঘটেছিল অদ্বৈত স্কুলের দশটি শাখা থেকে যা দশনামী নামে পরিচিত।

ব্রিটিশদের অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বলে তারা মনে করেন। এই বিতর্ক থেকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে আমাদের সন্ন্যাসী ও ফকিরদের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট এবং তাদের আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের উদ্ভব ঘটেছিল অদ্বৈত স্কুলের দশটি শাখা থেকে যা দশনামী নামে পরিচিত। এই দশটি শাখা হল — গিরি (*Giri*), পুরি (*Puri*), ভারতী (*Bharati*), বান (*Ban*), অরণ্যা (*Aranya*), প্রভাত (*Prabat*), সাগর (*Sagar*), তীর্থ (*Tirtha*), আশ্রম (*Ashram*), সরস্বতী (*Saraswati*)। অদ্বৈত দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য দেশের চারপ্রান্তে চারটি মঠ বা ধর্মোপাসনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে এই দশটি নাম গ্রহণ করতেন। এইভাবে শঙ্করাচার্যের দশনামী ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শত বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণে বিশ্বাসী ছিলেন যারা নাগা (*Naga*) সন্ন্যাসী নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অপর গোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছিলেন। তারা অবিবাহিত থাকার নীতি পরিত্যাগ করে বিবাহ করেছিলেন এবং একটি স্থিরীকৃত জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছিলেন। স্থায়ী সন্ন্যাসীরা গোঁসাই (Gossains) নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সন্ন্যাসীরা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মঠগুলি ব্যবসা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্রে চলে আসে। বহু সন্ন্যাসী কাঁচা রেশম, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবসায় নিযুক্ত হন। এলাহাবাদ, বান্দা, অযোধ্যা, ঝাঁসী, রাজপুতানা, শাহাবাদ, রামগড়, ঢাকার রমনা প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য মঠের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিম্মত বাহাদুর, মতি গিরি, পুরাণ গিরি, গণেশ গিরি, মোহন গিরি, বেনি গিরি প্রভৃতি সন্ন্যাসী নেতারা উত্তর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে দলাদলি শুরু হয়েছিল, তার ফলে তারা বেতনভোগী সেনা হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। ধনী সন্ন্যাসীরা টাকা ধার দেওয়ার কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে তীর্থযাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করতেন।

প্রশ্ন

১। দশনামী বলতে কি বোঝ?

ফকিররা সুফী ঐতিহ্যের কাছে তাদের উদ্ভবের জন্য ঋণী ছিলেন। সুফী ঐতিহ্যবাহী ফকিরদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ ছিল। যেমন — মাদারিয়া (Madariya), কালানন্দ্রিয়া (Kalandriya) প্রভৃতি। ফকিরদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মাদারিয়া (Madariya) ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। মাদারি ফকিরদের আবির্ভাব ঘটেছিল সুফী সাধক বাদীউদ্দীন শাহ-ই-মাদর বা সৈয়দ বাদীউদ্দীন মাদার এর প্রচারিত শিক্ষার মাধ্যমে। তিনি মাখনপুরে বাস করতেন। 1659 খ্রীঃ বাংলার শাসক শাহ সুজা একটি সনদের মাধ্যমে ফকিরদের কিছু সুবিধা প্রদান করেছিলেন যার মাধ্যমে ফকিরদের যেকোন স্থানে স্বাধীনভাবে ভ্রমণের অধিকার প্রদান করা হয় এবং ফকিরদের শুল্ক থেকে ছাড় দেওয়া হয়। ফকিররা দরগাতে বসবাস করতেন। মাদারি ফকিরদের দরগাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল গোরক্ষপুর, মাখনপুর, পূর্ণিয়া, মহেশথানগর, শেরপুর, মালদা, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি। ফকিররা ব্যবসা বা টাকা ধার দেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তারা বেতনভোগী সেনা হিসাবে কাজ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাদারিয়া ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ যিনি মাখনপুরে বাস করতেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন মুসা শাহ, চিরাগ আলি শাহ, করম শাহ প্রমুখ।

অতীশ দাশগুপ্ত সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মধ্যে সাদৃশ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে এই দুই বিদ্রোহের মধ্যে শুধুমাত্র বাহ্যিক সাদৃশ্যই লক্ষ্য করা যায় তাই নয়, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়াতেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সন্ন্যাসী ও ফকির, উভয়ের মধ্যেই বাৎসরিক তীর্থযাত্রা ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কারণেই তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের শ্রদ্ধা করতেন এবং সন্ন্যাসী ও ফকিররা গ্রামীণ জনসাধারণের সেবার দান গ্রহণ করতেন। এটা প্রমাণ করে যে, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

পলাশী যুদ্ধোত্তর যুগে শোষণকামী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উদয় হয়েছিল। কোম্পানীর ব্যবসা মূলতঃ কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁতীদের নির্মমভাবে শোষণ করতেন। স্বভাবতই এই ইংরেজ কুঠীগুলি সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাড়িয়েছিল। 1763 খ্রীঃ ফকিররা ঢাকা ফ্যাক্টরী আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের কারণে সমস্ত সিপাহীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে এবং কারখানার মালিক মি. লিসেস্টারও পলায়ন করেন। ফকিররা অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য কারখানাগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। পরে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট এই কারখানাগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। একই বছরে সন্ন্যাসীরা রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া ফ্যাক্টরী আক্রমণ করে। ফ্যাক্টরীর প্রধান মি. বেনেটকে সন্ন্যাসীরা ঘেরাও করে ও পরে তাকে হত্যা করে। 1767 খ্রীঃ প্রায় 5000 সন্ন্যাসী সিরকার সরণে প্রবেশ করে এবং কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে কোম্পানীর প্রচুর ক্ষতি হয়। এই সময় থেকে উত্তরবঙ্গ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

1770 খ্রীঃ বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর প্রকৃত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 1770 খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। খাদ্যের অভাবে মানুষ গাছের পাতা, ঘাস খেতে লাগল। শেষপর্যন্ত তারা মানুষের শবদেহ পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। একসময়কার শান্ত সুন্দর পল্লীগ্রামগুলি মৃত্যু এবং জনগণের বর্হিগমনের ফলে গভীর বনাঞ্চলে পরিণত হল। পরিত্যক্ত গ্রাম, মাইলের পর মাইল কৃষিকার্যে অব্যবহৃত জমি, পশুদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত গ্রামীণ গভীর বনাঞ্চল — এটাই হয়ে উঠেছিল দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সময়ে বাংলার গ্রামীণ সমাজ-চিত্র। কিন্তু বহু মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণ 1771 খ্রীঃ যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা প্রমাণ করে যে দুর্ভিক্ষের পর মানুষ যখন ক্ষুধার্ত, দিশাহীন মৃত্যুপথযাত্রী তখনও কিন্তু কোম্পানীর সরকার গ্রামীণ জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি। বরং নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়ে গিয়েছিল যার অনিবার্য ফল ছিল চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি।

> *কোম্পানী সরকার নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়ে গিয়েছিল, অনিবার্য ফলস্বরূপ ছিল চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাজস্বের পরিমাণের উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি।*

1771 খ্রীঃ প্রথম আড়াই দশকে হাজার হাজার সন্ন্যাসী সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিং, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানে একত্রিত হতে শুরু করেন। মজনু শাহ 1771 খ্রীঃ মার্চ মাসে বাংলায় প্রবেশ করেন। 1772 খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে রাজশাহীর সরকারী পরিদর্শক একটি রিপোর্টে বর্ণনা করেছেন ফকিররা কিভাবে কাছারি থেকে 1,000 টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। জয়াসীনের কাছারি থেকেও ফকিররা 1690 টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই সময়ে মজনু শাহ ও তার অনুগামীরা বগুড়া ও দিনাজপুর থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। 1772 খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পূর্ণিয়া জেলাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীরা রংপুরের ভবানীগঞ্জ কাছারিও আক্রমণ করে। 1772 খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে রংপুরে কোম্পানীর বাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে কোম্পানীর বাহিনী পরিচালিত হয়েছিল। এই বাহিনী 1772 খ্রীঃ 30শে

ডিসেম্বর রংপুরের শ্যামগঞ্জে হাজারেরও বেশী সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করে। প্রাথমিকভাবে সিপাহীরা জয় লাভ করে এবং সন্ন্যাসীরা পলায়ন করে। ক্যাপ্টেন টমাস এবং তাঁর সিপাহীরা সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করেন এবং সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে তাদের সব গোলাবারুদ ব্যবহার করে ফেলেন। সন্ন্যাসীরা উপলব্ধি করে যে কোম্পানীর বাহিনীর সব গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে তখন তারা সিপাহীদের ঘিরে ধরে আক্রমণ চালায় এবং ক্যাপ্টেন টমাসকে হত্যা করে। সিপাহীদের গোপন আস্তানা চিনিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীদের সাহায্য করে। গ্রামবাসীরা অনেকে নিজেরা লাঠি হাতে সন্ন্যাসীদের দলে যোগদান করে। সন্ন্যাসীদের এই সাফল্য ঔপনিবেশিক শাসকদের বিচলিত করেছিল।

প্রশ্ন

১। ফকির বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করো।

ঔপনিবেশিক শাসকদের রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসীরা কোন প্রকার শুল্ক ছাড়াই জমি ভোগ করার অধিকার ভোগ করত। এই শুল্কহীন জমি ময়মনসিং, দিনাজপুর, রংপুর, মালদা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান ছিল। কোম্পানীর সরকার এই শুল্কহীন রায়তীস্বত্বকে তাদের আয়ের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করেছিল। আর এই কারণেই কোম্পানী শুল্কহীন রায়তীস্বত্বকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। এই ব্যবস্থা সন্ন্যাসী ও মঠগুলির উপর দারুণ আঘাত এনেছিল কেননা সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত শুল্কহীন রায়তীস্বত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া সন্ন্যাসী ও ফকিররা জনসাধারণের কাছ থেকে যে সেবার দান গ্রহণ করত, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, তাও তাদের রাজস্ব বৃদ্ধির পরিপন্থী। সন্ন্যাসীরা অনেক সময় জমিদারদের টাকা ধার দিতেন। এই টাকা দিয়ে জমিদার তাঁর খাজনা পরিশোধ করত। বিনিময়ে জমিদারদের কাছ থেকে সন্ন্যাসীরা কিছু সুদ পেতেন। কিন্তু কোম্পানীর সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং সুদের হার কমিয়ে দেয়। কোন পীরের মৃত্যুর পর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দিনাজপুরের নেকমার্ডের হাটে বিক্রীত দ্রব্যের উপর সন্ন্যাসীরা যে কর সংগ্রহ করত সেখানেও কোম্পানী হস্তক্ষেপ করে। কোম্পানীর সরকার অস্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ভ্রমণের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল।

সন্ন্যাসী ও ফকিরা কিছুটা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী।

1776 খ্রীঃ পর থেকে একদিকে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহী এবং কোম্পানীর সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিররা সরকারী রাজকোষ, কাছারী লুঠ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এইভাবে মজনু শাহ 1781 খ্রীঃ রাজশাহী জেলা থেকে 5,000 টাকা লাভ করেছিলেন। 1783 খ্রীঃ মালদা ফ্যাক্টরীর এজেন্ট মি. গ্রান্ট এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জনসাধারণের থেকে রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত সরকারী অর্থ ফকিররা লুঠ করেছিলেন। 1786 খ্রীঃ আবার মজনু শাহ দিনাজপুর জেলার গিলবাড়ী পরগণার তহশিলদারকে অপহরণ করে অর্থ দাবী করেন। মজনু শাহ ছাড়া ফকিরদের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন মুসা শাহ, করম শাহ, চিরাগ আলি শাহ, জেহরি শাহ প্রমুখ। 1783 খ্রীঃ থেকে মুসা রংপুর এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে শুরু করেন। 1787 সালের জুলাই-আগস্ট মাসে মুসা শাহ দিনাজপুর জেলায় বেশ কয়েকটি সরকার-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই আক্রমণের সময় তিনি সরকারী রাজকোষ লুণ্ঠন করেন এবং কোম্পানী রাজস্ব হিসাবে যে অর্থ জমা ছিল তা ছিনিয়ে নেন। 1790 সালে ময়মনসিং জেলায় চিরাগ আলির নেতৃত্বে ফকিররা সরকারী রাজস্ব লুণ্ঠন করে।

ফকিরদের পাশাপাশি, সন্ন্যাসীরাও বাংলা প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন প্রদেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। 1770 খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ বাংলার তাঁতীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিল। ফলে বহু কর্মচ্যুত তাঁতী সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। 1774 খ্রীঃ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে প্রদত্ত একটি রিপোর্টে বলেন যে রংপুর জেলায় রাজস্ব আদায় সন্ন্যাসীদের অবিরত আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের ফলে ব্যাহত হচ্ছে। এই সময়ে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীর সংখ্যা 50,000 ছড়িয়ে গিয়েছিল। 1773 খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে প্রায় 5,000 সন্ন্যাসী ময়মনসিং জেলায় জাফরশাহী পরগণা আক্রমণ করে 1,600 টাকা সংগ্রহ করেন। মোতি গিরি, ধর্ম গিরি প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন জমিদারদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। 1780-র দশকে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণী নামে দুজন সন্ন্যাসী নেতার আবির্ভাব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে এই দুই নেতার কার্যকলাপকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলক এবং অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। এই বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিকৃত ছবিকে তুলে ধরে। ভবানী পাঠক রংপুর, ময়মনসিং এবং বগুড়া জেলায় সক্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন বাজপুরের বাসিন্দা এবং তিনি ফকির নেতা মজনু শাহর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। 1787 খ্রীঃ ভবানী পাঠক ও তাঁর অনুগামীরা বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করেন এবং ব্রিটিশ বণিকদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। 1787 খ্রীঃ লেফটেন্যান্ট ব্রেনান (Brennan) এর সঙ্গে সংঘর্ষে পাঠক মারা যান। সরকারী রিপোর্ট এবং রংপুর জেলা অভিধান থেকে জানা যায় যে দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন ছোট জমিদার যিনি ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন। দেবী চৌধুরাণী সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতে না পেরে পলায়ন করেন এবং বিদ্রোহে যোগ দেন। ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পর তিনি আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন।

1800 খ্রীঃ নাগাদ সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ অস্তমিত হয়ে আসে। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে শোভন আলি শাহ একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি দিনাজপুর জেলার শালবাড়ী পরগণা অঞ্চলে সরকারী রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করেন। 1793 খ্রীঃ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একটি যৌথ দল রাজশাহী জেলায় বিদ্রোহ পরিচালনা করে। 1799 সালে সরকার শোভন আলিকে গ্রেপ্তারের জন্য 4,000 টাকা পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করে। 1800 সালের পর এই আন্দোলন পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

যামিনী মোহন ঘোষ এবং আধুনিক গবেষক আনন্দ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সন্ন্যাসী ও ফকিররা ছিল বহিরাগত এবং বাংলায় তাঁদের কোন সামাজিক ভিত্তি ছিল না। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বহু নেতা যেমন মজনু শাহ, উত্তর ভারতের জেলাগুলি থেকে এসেছিলেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ তথ্যগুলি 5,000, 1,000 এমনকি 50,000 সন্ন্যাসী এবং ফকিরের একত্রিতকরণের কথা বলে। সুপ্রকাশ রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন যে 70 এবং 80-র দশকে দুর্ভিক্ষের পর যখন বাংলায় চরম দারিদ্র্য এবং কোনরূপ খাদ্যশস্য, অর্থ কিছুই ছিল না তখন কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বহিরাগতরা বাংলায় প্রবেশ করবে। দ্বিতীয়ত, অসংখ্য বিদ্রোহ, ক্যাপ্টেন টমাসের হত্যা সংক্রান্ত ঘটনা, (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রমাণ করে যে, বৃহৎ নেতা বা নেত্রীদের নেতৃত্বে যে দরিদ্র কৃষক, তাঁতীরা একত্রিত হয়েছিল তারা কিন্তু বাইরের কেউ ছিলেন না বরং তারা ছিলেন বাংলার মাটিতেই বেড়ে ওঠা মানুষ। তাঁরাই ছিলেন এই আন্দোলনের মূল পরিচালিকা শক্তি। সুতরাং সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ বহিরাগতদের কোন আন্দোলন ছিল না, বরং এটা ছিল এদেশীয় জনতার আন্দোলন। উপরোক্ত আলোচনার পর সুপ্রকাশ রায়ের এই বক্তব্য আমাদের যথেষ্ট গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

৩.৭.১.৪.১ ঃ তাৎপর্য

সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রথম প্রতিরোধ অন্দোলন যা প্রায় 40 বছর (1763-1800) ধরে স্থায়ী হয়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডব্লু. ডব্লু. হান্টার 'সন্ন্যাসী', 'ফকির', 'দস্যু' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার

করেছেন। অন্যান্য ব্রিটিশ কাগজপত্র বা তথ্যগুলিতে সন্ন্যাসীদের 'ডাকাত', 'লুণ্ঠনবাজ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নথি অনুযায়ী এরা অশান্তি সৃষ্টি এবং শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করত। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে নানা আদেশ প্রণয়ন করেছিলেন। যামিনী মোহন ঘোষ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মধ্যে হিংসা ও দস্যুতা ব্যতীত আর কিছুই খুঁজে পাননি।

প্রশ্ন

১। সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের তাৎপর্য বর্ণনা করো।

আমরা ইতি পূর্বে বিদ্রোহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে চিহ্নিত করেছি। বিদ্রোহের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহীরা সর্বদাই কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিল। দরিদ্র জনগণকে তারা কখনো আক্রমণ করেনি। তাঁরা কোম্পানীর সেনা অফিসারদের হত্যা করেছিল। সুরঞ্জন চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন যে বিদ্রোহীরা মনে করেছিল যে, যদি কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে তা প্রশাসনের ওপর তীব্র আঘাত হানবে। সুতরাং এই দাবি করা অযৌক্তিক হবে না যে সন্ন্যাসী এবং ফকিররা কিছুটা রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী।

মজনু শাহ 1772 খ্রীঃ নাটোরের মহারাণী ভবানীর কাছে যে পিটিশন দাখিল করেছিলেন সেখানে তিনি ভবানীকে ফকিরদের দিকে যত্ন নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন, কারণ ভবানী ছিলেন দেশের শাসক। সুতরাং ফকির এবং সন্ন্যাসীদের কাছে নবাগত কোম্পানীর প্রশাসন ছিল বিদেশী এবং তারা দেশে কোম্পানীর শাসনকে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। অতীশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে প্রথাগত শাসকদের প্রতি এই বিশ্বস্ততা ছিল বিপ্লবীদের একটি নৈতিক ভাষ্য।

সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন যে, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিকশিত হওয়া কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে সংগঠিত দরিদ্র কৃষক, কর্মচ্যুত সৈনিক, তাঁতী এবং সমাজের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষের স্বপ্নের সমবেত রূপ।

এ. এন. চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, যদিও সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল তথাপি এই বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে ভারতের কৃষক সম্প্রদায় সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণে সহায়তা করেছিল।

৩.৭.১.৪.২ ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ

চুয়াড়রা ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায় যারা জঙ্গল মহলে বসবাস করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্বে জঙ্গল মহল বিস্তৃত ছিল মেদিনীপুর থেকে রাচী, বাকুড়া এবং পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার কিছু অংশে। অষ্টাদশ শতকের 70 এর দশক থেকে চুয়াড়রা ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন কিন্তু চুয়াড়দের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল 1798-99 খ্রিঃ যা ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পর্কে পুরনো রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেদিনীপুরের সেটলমেন্ট অফিসার J. C. Price এর 'দ্য চুয়াড় রিবেলিয়ান' (*The*

Chuar Rebellion)। পরবর্তী কালে তিনজন গবেষক চুয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এস. বি. চৌধুরী (S. B. Chaudhuri) তাঁর 'সিভিল ডিসটারব্যানসেস ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া (*Civil Disturbances During the British Rule in India*), সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' এবং বিনোদ এস. দাস (Binod S. Das) তাঁর 'সিভিল রিবেলিয়ান ইন দ্য ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল (*Civil Rebellion in the Frontier Bengal*) এবং 'চেঞ্জিং প্রোফাইলস অব দ্য ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল' (*Changing Profiles of the Frontier Bengal*) গ্রন্থে চুয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

চুয়াড়দের সর্দাররা পাইক নামে পরিচিত ছিলেন। পাইকরা বহু শতাব্দী ধরে শুল্কহীন জমি ভোগ করে আসছিলেন। বিনিময়ে তারা শাসককে প্রয়োজনের সময়ে সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। কৃষকরা পাইকদের এই শুল্কহীন জমিতে চাষাবাদ করতেন। এই জমিগুলি পাইকান জমি বা পাইকজাগীর নামে পরিচিত ছিল যা জঙ্গল মহলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পাইকান জমিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। যে কোন ধরনের শুল্কহীন জমি মানেই তা আর্থিক ক্ষতির কারণ বলে কোম্পানী মনে করেছিল। সুতরাং কোম্পানী পাইকান জমিগুলি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ব্যবস্থা জঙ্গল মহলের সমগ্র পাইক সম্প্রদায় এবং কৃষককে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফার্মিং সিস্টেমের প্রবর্তন অধিকাংশ জমিদারকে সংশ্লিষ্ট স্থানে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) পর জঙ্গল মহলের জমিদাররা সঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান করতে ব্যর্থ হয় এবং জমিদারী থেকে অধিকারচ্যুত হয়ে আরও বেশী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাছাড়া কোম্পানী নুন উৎপাদনের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ফলে নিমকি মহলও সংকটের সম্মুখীন হয়।

> *চুয়াররা ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায় যারা মূলত জঙ্গল মহলে বসবাস করতেন। এরা সর্দার এবং অধিকারচ্যুত জমিদারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতেন। জে.সি. প্রাইস এর মতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাইকান জমি অধিগ্রহণ ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের মূল কারণ।*

শস্যের ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরে 1770 এর দুর্ভিক্ষ জঙ্গল মহলের আদিবাসী কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢাল ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিতে চাননি। জগন্নাথ ঢাল 1774 খ্রীঃ বিদ্রোহ করেন এবং এই সময়ে চুয়াড়রা কোম্পানীর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 80'-র দশক থেকে জঙ্গল মহলের সংকট একটি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং চুয়াড়রা সর্দার এবং অধিকারচ্যুত জমিদারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করতে থাকেন। 1783, 1789-90 এবং 1792 খ্রীঃ চুয়াড়রা যথাক্রমে কালিয়াপাল, রামগড় এবং পাটক্যুমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাটক্যুম অঞ্চলের বিদ্রোহ ছিল সর্ববৃহৎ যা জলদা, রামগড় এবং তোমার অঞ্চলে 1794 খ্রীঃ মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। 1795 খ্রীঃ সংকট আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে যার শেষ পরিণতি ছিল 1798-99-এর বিধ্বংসী বিদ্রোহ।

1795 খ্রীঃ পাচেট জমিদারী বিক্রীর জন্য ঘোষিত হয়েছিল। 1798 খ্রীঃ দুর্জন সিং, যিনি ছিলেন রায়পুরের জমিদার তাঁর অধিকার থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। 1798 খ্রীঃ ক্ষমতাচ্যুত দুর্জন সিং 1,500 জন চুয়াড়ের সহযোগিতা নিয়ে রায়পুর পরগণা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা বাজার এবং কাছারিতে অগ্নিসংযোগ করে। ক্রমশ অসন্তোষ প্রসারিত হতে থাকে। বছরের শেষে বাসুদেবপুর, তমলুক, কাশিজোড়া, জলেশ্বর, বলরামপুর, রামগড়, শালবনী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ প্রসারিত হয়। 1799 খ্রীঃ বিদ্রোহ আরো সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করে। 1799 খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাস থেকে চুয়াড়দের অত্যাচারের স্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরে মেদিনীপুরের কালেক্টর জে. ইমহফ (J. Imhoff) অসংখ্য চিঠি ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠান। গ্রাম পোড়ানো হয়েছিল, খাদ্যশস্য লুট করা হয়েছিল এবং যারা চুয়াড়দের বিরুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে কথা বলেছিল তাদের তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়েছিল। কর্ণাগর (Karnagar)-এর রাণী সহ অসংখ্য অধিকারচ্যুত জমিদার চুয়াড়দের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। 1799 খ্রীঃ এপ্রিল মাসের

দ্বিতীয় সপ্তাহে মেদিনীপুরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার আনন্দপুর চুয়াড়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এমনকি মেদিনীপুর শহরেও আক্রমণের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছিল। একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং নিষ্ঠুর দমননীতির দ্বারা কোম্পানীর সরকার কোনক্রমে চুয়াড়দের দমন করতে সক্ষম হয়।

চুয়াড় বিদ্রোহের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে জে. সি. প্রাইস (J. C. Price) দেখিয়েছেন যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাইকান জমি অধিগ্রহণ বিদ্রোহের মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মতে চুয়াড় বিদ্রোহ ছিল বন্য প্রতিরোধমূলক এবং এই কারণেই তা, Price এর মতে, চরম নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বিনোদ এস. দাস চুয়াড় বিদ্রোহকে সাধারণ মানুষের আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন কারণ তা সাধারণ জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল। সুতরাং চুয়াড়দের যে নিষ্ঠুরতা তা একেবারে নির্বোধ ছিল না কারণ তা সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছিল। সুপ্রকাশ রায় দেখিয়েছেন যে, যদিও ঔপনিবেশিক শাসকরা চুয়াড়দের অসন্তোষের কারণগুলি অনুধাবন করেছিল তথাপি চুয়াড়দের নিষ্ঠুরতায় তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল। সুপ্রকাশ রায় মনে করেন যে চুয়াড়দের এই নিষ্ঠুরতা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিক্রিয়া। ঔপনিবেশিক শাসকরাই এই নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও চুয়াড়রা ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এস. বি. চৌধুরী যথাযথই বলেছেন যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাই চুয়াড়দের একটি শক্তিশালী বিদ্রোহ গড়ে তোলার মূল উপাদান সরবরাহ করেছিল।

প্রশ্ন

১। চুয়াড় কাদের বলা হত ?
২। চুয়াড়য়া কেন বিদ্রোহ শুরু করেন ?

৩.৭.১.৪.৩ ঃ রংপুর বিদ্রোহ

কোম্পানী নিযুক্ত ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে সংগঠিত রংপুরের কৃষক অভ্যুত্থান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত। ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল অতি অল্প খরচে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়। ওয়ারেন হেস্টিংস এই পথের সূচনা করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব আদায় এবং মূল্যায়নের জন্য একটি 'কমিটি অব সার্কিট' গঠন করেন। সর্বাধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের যিনি প্রতিশ্রুতি দিতেন তার সঙ্গে কোম্পানী জমি বন্দোবস্ত করত। এই ব্যবস্থায় ইজারাদাররা কোম্পানীকে প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করতেন। পাশাপাশি ইজারাদাররা কৃষকের খাজনা সর্বাধিক হারে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতেন এবং এই জন্য কৃষকদের ওপর বলপ্রয়োগও চলত। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষকশ্রেণী। কৃষকদের যখন সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হত তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করত। রংপুর বিদ্রোহ ছিল এই ধরনেরই কৃষক অসন্তোষের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যা ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

দেবী সিংহ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী যিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি পশ্চিম ভারত থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন এবং কোম্পানীর ইজারাদারে পরিণত

প্রশ্ন

১। রংপুর বিদ্রোহ সমন্ধে যা জানো লেখ।
২। রংপুরে কারা কীভাবে বিদ্রোহ করেছিল ? এই বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও তাৎপর্য বর্ণনা করো।

হয়েছিলেন। তিনি পূর্ণিয়া (বিহার) জেলা থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছিলেন এবং এর শাসক হয়েছিলেন। দেবী সিংহ নায়েব নাজিম রেজা খানকে 16 লক্ষ টাকা দিয়ে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। দেবী সিংহের সরকার পূর্ণিয়াতে একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁর প্রতিনিধিদের একটি অংশের উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে সর্বাধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা। নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে জনগণ পূর্ণিয়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে। ফলে ঐ অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়ে যেতে থাকে। দেবী সিংহের অত্যাচারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তিনি হেস্টিংসের দ্বারা বরখাস্ত হন। কিন্তু দেবী সিংহ হেস্টিংসকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করেন এবং প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হন। তিনি ইজারা কিনতে থাকেন এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। 1780 খ্রীঃ তিনি মুর্শিদাবাদের একজন ছোট রাজা রাধানাথ সিংহের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 1781 খ্রীঃ দেবী সিংহ রংপুর এবং দিনাজপুরের প্রতিবেশী পরগণার ইজারা ক্রয় করেন।

ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যছিল অল্প খরচে সর্ব্বোচ্চ রাজস্ব আদায়। রংপুরের কৃষক অসন্তোষ ব্রিটিশ প্রশাসনকে আতঙ্কিত করে তোলে।

পূর্ণিয়ার ন্যায় রংপুর এবং দিনাজপুরেও তিনি যে কোন উপায়ে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই অঞ্চলে রাজস্বের হার অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ রাজস্ব ছাড়াও তার প্রতিনিধিরা নানা প্রকার কর আরোপ করত যা সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও দুর্দশাপূর্ণ করে তুলেছিল। দেবী সিংহের প্রতিনিধিদের হাত থেকে রায়তদের পলায়নের কোন পথ ছিল না। রায়তরা যদি বকেয়া মেটাতে ব্যর্থ হত তাহলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। রায়তরা রাজস্ব কমানোর উপযুক্ত কারণ দর্শালেও তাদের বকেয়া কখনও কমানো হত না। রাজস্বের জন্য নিষ্ঠুর অত্যাচার কৃষকদের শেষপর্যন্ত জমিদারের কাছে যেতে বাধ্য করত। হাজার হাজার কৃষক জমি হারিয়েছিলেন। তাঁরা গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি জমিদাররা যারা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারাদারদের সাথে স্বত্বভোগী হিসাবে কাজ করত তারাও দেবী সিংহর হাত থেকে নিস্তার পায় নি। এই জমিদাররাও অনেক ক্ষেত্রে দেবী সিংহের অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা নানাভাবে অপমানিত হত। জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে পিটিশন পাঠানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে রংপুরের উন্মত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের সামনে প্রতিরোধ ব্যতীত আর কোন পথ খোলা ছিলনা। 1783 খ্রীঃ 18 ই জানুয়ারী বিভিন্ন গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় টেপা (Tepa) গ্রামে সংঘবদ্ধ হন এবং দেবী সিংহের রাজত্বের অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা নিজেদের একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে। বিদ্রোহীদের সরকার পাঁচ সপ্তাহ টিকে ছিল। বিদ্রোহীরা নুরুলউদ্দীনকে তাঁদের নেতা এবং অপর একজন কৃষক দয়ারাম শীলকে তার সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করে।

নুরুলউদ্দীন স্থানীয় কৃষকদের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেবী সিংহকে খাজনা প্রদান করতে নিষেধ করেন। কৃষকরা জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটি তহবিলও গঠন করে। এই বিদ্রোহ কোচবিহার ও দিনাজপুরে প্রসারিত হয়েছিল। রাজকোষ, কাছারি এবং স্থানীয় জেলগুলি আক্রান্ত হয়েছিল এবং দেবী সিংহের প্রতিনিধিদের হত্যা অথবা বিতাড়িত করা হয়েছিল। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ বন্দী কৃষকদেরকেও তারা মুক্ত করেছিল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল। অসংখ্য কৃষক লাঠি, তীর, বর্ষা, বল্লম নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। মণ্ডলঘাটের দুইপ্রান্তে একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে রংপুর বিদ্রোহের নেতা নুরুলউদ্দীন গুরুতরভাবে আহত হন। দয়ারাম শীলকে হত্যা করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিদ্রোহীরা পাটগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হন। কয়েক শত বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কয়েক শত বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পিটারসনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্টে এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দেবী সিংহকে দায়ী করা

হয়েছিল। কিন্তু হেস্টিংস দেবী সিংহের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি অপর একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি খণ্ডন করেছিলেন।

রংপুর বিদ্রোহের তাৎপর্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম থেকেই দেবী সিংহের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁরা শ্রেণী, জাতি এবং ধর্ম প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধী দল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েই তাদের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষক বিদ্রোহ যদিও তার নেতৃত্ব এসেছিল গ্রামপ্রধান বা বসুনিয়াদের (Bosuneahs) কাছ থেকে। এরা সাধারণ জনতার আস্থা অর্জন করেছিলেন। তৃতীয়তঃ রংপুর বিদ্রোহের তাৎপর্যকে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করা হয়ে থাকে। এই বিদ্রোহ ইজারাদারদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে পেরেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনীর দমননীতি সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁরা আমৃত্যু তাদের দাবীগুলির প্রতি অনুগত ছিল। তাৎক্ষণিক অর্থে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু সুদূরপ্রসারীভাবে বিচার করলে বলা যায় এই বিদ্রোহ পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। রংপুর বিদ্রোহ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিল ইজারা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক হতে, আর এটি ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে অনুপ্রাণিত করেছিল রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে। যার প্রকাশ ঘটেছিল 1793 খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে।

৩.৭.১.৪.৪ ঃ কোল বিদ্রোহ (1832)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপজাতিগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশী আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক 'Tribe' এই শব্দটি কিছু জনগোষ্ঠীকে 'Caste' থেকে পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসন আসার পর আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি আর বিচ্ছিন্ন থাকেনি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বলপূর্বকভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে গ্রাস করে নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর মধ্যে আদিবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিগুলি ব্রিটিশদের শোষণের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধানকে জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করে নতুন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন আদিবাসী এলাকাগুলিতে খ্রীস্টান মিশনারীদের আগমনকে সাহায্য করেছিল। সাঁওতাল, কোল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজস্ব আদায়কারী প্রভৃতি শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। শহুরে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান চাবিকাঠি। মধ্যবিত্তরা ছিল মূলতঃ বহিরাগত যারা বলপূর্বকভাবে কৃষকদের জমিগুলিকে ভোগ দখল করছিল। এইভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকারচ্যুত হয়েছিল যা তারা বহুকাল ধরে ভোগ করে আসছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি ভূমিচ্যুত হয়ে কৃষি শ্রমিক, ভাগচাষী এবং ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া

> *শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান চাবিকাঠি। উপজাতিরা ব্রিটিশদের শোষণের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিল।*

প্রশ্ন

১। কোল বিদ্রোহ কীভাবে গড়ে ওঠে ?

২। কোল বিদ্রোহের উদ্ভবের কারণগুলি কি ?

৩। কোল বিদ্রোহ সম্বন্ধে যা জান লেখ ?

আদিবাসীরা শৈশবকাল থেকে যে জঙ্গলের অধিকার ভোগ করে আসছিল তা থেকেও তাঁরা বিতাড়িত হয়। ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের সহযোগীরা বন্য জমিগুলিকে বেআইনীভাবে দখল করেছিল এবং বিভিন্ন বনোৎপাদিত দ্রব্য, বন্য জমি এবং সাধারণ জমির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

ছোটনাগপুর অঞ্চল 1820 খ্রীঃ-এ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় আসে। ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় কোলদের পূর্বের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কোম্পানী সরকার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলের জমিগুলির ইজারা দেয়। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দু, শিখ অথবা মুসলিম মহাজন। কোল সম্প্রদায় এদের বহিরাগত বা ডিকু নামে সম্বোধন করতেন। ভূস্বামী এবং ইজারাদাররা কিভাবে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করা যায় কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সচেষ্ট ছিলেন। ফলে কোলদের উপর রাজস্বের চাপ বাড়তে থাকে। সময়ের সাথে সাথে কোলরা তাদের বহু জমি হারায় কেবল রাজস্ব না দিতে পারার অপরাধে। এই রূপ পরিস্থিতিতে ইজারাদাররা নানারকম আইনী-বেআইনী উপরি কর আদায় করত কোলদের কাছ থেকে। অন্যথায় জমিদার ও তার প্রতিনিধিদের অত্যাচার ছিল অবধারিত। সরলমতি কোলদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হত। পুরুষদের উপর তীব্র অত্যাচার করা হত। মহিলাদের উপর একইভাবে তীব্র অবমাননা এবং শারীরিক নির্যাতন চালানো হত। তাঁদের ঠিকাদার হিসেবে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কোন পারিশ্রমিক পেত না। এই উপজাতি সম্প্রদায় ছিলেন মাদকাসক্ত যা তারা স্বগৃহে উৎপাদন করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার মদের উপর কর আরোপ করে। কোলদের জমিতে ইংরেজ সরকার আফিমের মত লাভজনক পণ্যশস্য উৎপাদন করতে থাকে। আফিম চাষ করতে কোলরা অনিচ্ছুক ছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কোলরা অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। কোল নেতা বুদ্ধভগৎ, জোয়া ভগৎ, ঝিন্দরাই মানাকি এবং সুই মুণ্ডা কোলদের সংগঠিত করে। 1832 খ্রীঃ রাচীর মুণ্ডা ও ওঁরাওরা সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়। কোলরা বহিরাগত ডিকুদের ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেয়। জে. সি. ঝা (J. C. Jha) মন্তব্য করেছেন, কোল বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ কৃষকদের অসন্তোষের ফলশ্রুতি।

এই বিদ্রোহ দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে। যদিও ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে উপজাতিদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না তথাপি এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের উপর আঘাত করতে পেরেছিল। কোলরা ভূস্বামী, ইজারাদার, মহাজন, শস্য ব্যবসায়ী এবং ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের বাড়িগুলিকে লুঠ অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমনের কোন পন্থা খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত কোলদের শক্ত হাতে দমন করার জন্য ক্যাপটেন উইলকিনসনের অধীনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পাঠানো হয়। প্রবল বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে কোলরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ কৌশল ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের কাছে তারা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রায় দুবছরের প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণী এই অঞ্চলের স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। 1833 খ্রীঃ ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয় বহু কোলের প্রাণের বিনিময়ে, এমনকি মহিলা ও শিশুরাও এই অত্যাচার থেকে বাদ যায়নি।

> *কোল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের উপরে আঘাত করতে পেরেছিল। যদিও এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশরা বহু কোলের প্রাণ নিয়েছিল।*

প্রশ্ন

১। সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ?

কোল বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয় আদিবাসী শ্রেণীর প্রতি তাদের প্রশাসনিক নীতিকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করে। ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উপলব্ধি করেন, সাধারণ আইন উপজাতিয় প্রেক্ষিতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলতে পারে না। তারা বুঝতে পারে এই অঞ্চলগুলি ভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাবী করে। মহাজন ও ভূস্বামীর হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষার জন্য কিছু নিশ্চিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়। তবে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসনের অত্যচারমূলক চরিত্র কিন্তু কোল বিদ্রোহের পরেও স্বমহিমায় উপস্থিত ছিল।

৩.৭.১.৪.৫ ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855)

সাঁওতালরা ছিল পরিশ্রমী, সরলমতি এক কৃষিজীবী উপজাতি বা আদিবাসী শ্রেণী। এরা ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যভাগে 'দামিন-ই-কো' নামক অঞ্চলে বাস করত। পরে এরা প্রধানত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, মালভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ব্রিটিশ ক্ষমতার বিস্তৃতির সাথে সাথে সাঁওতালদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। তারা জমি হারিয়ে ক্রমশ পশ্চিমদিকে সরতে থাকে এবং সেখানেই তাদের নতুন বসতি গড়ে তোলে। এই অঞ্চলটিকে তারা 'দামিন-ই-কো' নামে উল্লেখ করত। 1851 সালে এই 'দামিন-ই-কো' অঞ্চলে প্রায় 1,437 টি সাঁওতাল গ্রাম ছিল এবং প্রায় 82,715 জন সাঁওতাল আদিবাসী এখানে বাস করত।

1855 খ্রীঃ সাঁওতালরা ডিকু বা বহিরাগতদের বিতাড়িত করতে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে কারণগুলি শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের বিদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তা ছিল অনেকটা কোল বিদ্রোহের অনুরূপ। সাঁওতাল বিদ্রোহ হল ভারতের আদিবাসী আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনের প্রধান কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতালরা ভূমি উদ্ধার বা সংস্করণের কাজ খুব সাফল্যের সঙ্গে করত। তারা তাদের পরিশ্রমের দ্বারা ছোটনাগপুরের অনুর্বর জমিকে উর্বর করে তুলেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের সহযোগী দেশীয় জমিদাররা বেআইনীভাবে সাঁওতালদের জমি দখল করতে থাকে। এই দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায় কোনক্রমেই ব্রিটিশ শাসনের বজ্র আঁটুনি থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। এমনকি 'দামিন-ই-কো'তে আসার পরও তারা মুক্তি পায়নি।

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের উপর উচ্চ ভূমিকর আরোপ করে যা বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে ইজারাদার, জমিদার এবং মহাজনরা, যাদেরকে সাঁওতালরা 'ডিকু' নামে সম্বোধন করত। ব্রিটিশ সরকারকে উচ্চ রাজস্ব প্রদান করতে গিয়ে সাঁওতালদের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হত। একবার এই ধারের কবলে পড়লে তার থেকে মুক্তির আর কোন উপায় ছিল না। কারণ মহাজনদের সুদের হার ছিল অস্বাভাবিক বেশী, যা সাধারণত 50 শতাংশ থেকে 500 শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডব্লুউ. ডব্লুউ. হান্টার (W.W. Hunter) দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ সাঁওতাল কৃষকেরই ঋণ পরিশোধ করার মত জমি ছিল না। ফলে তাঁরা মহাজনদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হত। এই ঋণের সুযোগ নিয়ে মহাজনরা তাদের জমিতে সাঁওতালদের বেগার খাটিয়ে নিত। সুতরাং তারা মহাজনের অধীনে দাসে পরিণত হত। এইভাবে সাঁওতালদের অবস্থার অবনতি ঘটতে ঘটতে তারা ভাগচাষী বা ভূমিহীন দিন-মজুরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক মুক্তির প্রেরণা সাঁওতালদের সেই আন্দোলনকে আরো বেশী শক্তিশালী করে তুলেছিল।

তৃতীয়তঃ প্রাত্যহিক জীবনেও সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যা আগে কখনও হয়নি। অধিকাংশ দোকানগুলি ডিকু বা বহিরাগতদের অধীন থাকায় তারা নানাভাবে প্রতারিত হত। যেহেতু তারা পরিমাপের নিয়ম-নীতি এবং আধুনিক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল না তাই তাদের বিভিন্নভাবে ঠকতে হত।

প্রশ্ন ১। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল ? এর গতিপ্রকৃতি আলোচনা করো।

চতুর্থতঃ সাঁওতালরা ডিকুদের বর্বরতার শিকার হয়। প্রায়ই তাদের মারধোর করা হত, অপমানের শিকার হতে হত। সাঁওতাল মহিলাদের উপর মহাজনদের প্রতিনিধি, ইজারাদার, ইউরোপীয় রেলকর্মী ও অন্যান্যরা অত্যাচার এবং শোষণ চালাত।

জমিদার ও মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির স্বার্থও এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল।

পঞ্চমতঃ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সাঁওতালদের জীবনযাত্রার গুণগত মানের অবনতি ঘটে। সাঁওতালরা নিজেদের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু নতুন ঔপনিবেশিক যুগের আইন আদালত, পুলিশী ব্যবস্থা তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। অন্যদিকে নীল চাষের জন্যও নীলকর সাহেবরা সাঁওতালদের উপর অত্যাচার চালাত।

ষষ্ঠতঃ সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপকে সাঁওতালরা প্রশ্রয় দিতে পারেনি। সর্বোপরি, সাঁওতালরা ভবিষ্যতে একটি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল, ঈশ্বর সর্বদা তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে এই বিশ্বাসই সাঁওতালদের আন্দোলনমুখী হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগায়। সাঁওতালদের সামাজিক অবস্থাই যে তাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার প্রধান কারণ সে সম্পর্কে Calcutta Review নামে সমসাময়িক একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল —

"*Zamindars*, the police, the revenue and court *amlas* have exercised a combined system of extortions, oppressive exactions, forcible dispossession of property, abuse and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the timid and yielding Santhals. Usurious interest on loans of money ranging from 50 to 500 percent; false measures at the *haat* and the market; wilful and uncharitable trespass by the rich by means of their untethered cattle, tattoos, ponies and even elephants, on the growing crops of the poorer race; and such like illegalities have been prevalent."

প্রথমে সাঁওতালরা তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পন্থাই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তারা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই নীতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় সাঁওতালরা বিদ্রোহের পন্থা গ্রহণ করে। 1850 খ্রীঃ 30শে জুন ভাগনাডিহির সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা সংগঠিত হয় এবং 10,000 সাঁওতালকে নিয়ে তারা একটি স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গড়ে তোলে। তারা বিশ্বাস করত শুভ ও অশুভের যুদ্ধে শুভশক্তির-ই জয় হবে। সাঁওতালরা উপলব্ধি করেছিল যে এই সংঘর্ষে তারা শুভ পক্ষকেই প্রতিনিধিত্ব করছে, অন্যদিকে শাসক ও তার সহযোগীরা আছে অশুভ পক্ষে। অর্থনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মুক্তির প্রেরণা তাদের সেই আন্দোলনকে আরো বেশী শক্তিশালী করেছিল। বিদ্রোহী নেতারা একটি নতুন ধরণের রাজস্ব কাঠামো গড়ে তুলেছিল যা ছিল খুবই কম এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। 1855 খ্রীঃ 7ই জুলাই সাঁওতাল হুল শুরু হয়েছিল। সরকারী ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে বিদ্রোহীরা রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট অফিস, পুলিশী থানাকে এবং জমিদার, মহাজন ও বিভিন্ন ইউরোপীয় অফিসারদের বাসস্থানকেই আক্রমণ করেছিল। যেহেতু হুল প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল সেহেতু বিদ্রোহীর সংখ্যাও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী জনগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চর্মকার, ডোম, তাঁতী প্রভৃতি সমাজের নিম্নশ্রেণীর সমর্থনও

সাঁওতালরা লাভ করেছিল। প্রাথমিক পর্বে ভাগলপুর এবং মুঙ্গের প্রদেশের মধ্যে আন্দোলন সীমিত ছিল। পরে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন স্থানে রেলওয়ে, পোষ্ট অফিসের কাজকে তারা পঙ্গু করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সরকারের প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে পুলিশবাহিনী বিদ্রোহীদের সামনে অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু সাঁওতালরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে প্রাথমিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 1856 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়। প্রায় 23,000 বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। আন্দোলনের দুই নেতা সিধু ও কানু এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। অনেককেই নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং এমনকি সাধারণ গ্রামবাসীদেরও বিভিন্নভাবে নিপীড়িত করা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহ। রণজিৎ গুহ তাঁর 'এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পিজেন্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া' (*Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিরোধ স্বরূপই এই বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল। জমিদার ও মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর সাহসী আন্দোলন। যদিও এটি সাঁওতাল হুল নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, তথাপি অপরাপর দুর্বল শ্রেণীগুলির স্বার্থও এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্থানীয় ডাকাতরা বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র যেমন — বল্লম, তীর-ধনুক দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলি বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে একগুচ্ছ ডাকাতির মাধ্যমে এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। 1854 সালে বিরাট সংখ্যক দেশীয় ডাকাত স্থানীয় মহাজনদের বাসভবন আক্রমণ করতে থাকে। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় চরিত্র দান করতে চেয়েছেন, তথাপি এই বিদ্রোহের মূল চরিত্র ছিল অর্থনৈতিক। যদিও সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে নিষ্পাপী ও পাপীর দ্বন্দ্বরূপে, তথাপি এই বিদ্রোহের মুখ্য কারণ ছিল কৃষি অসন্তোষ। শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহকে চরিত্রের দিক থেকে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের আখ্যা দেওয়া যায়।

তাৎক্ষণিক দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্যর্থ। কারণ এর ফলে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন দূরীভূত হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসকদের 'পাপের রাজত্ব' বাধাহীনভাবে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু সুদূরপ্রসারীভাবে বিচার করলে এই বিদ্রোহ কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। প্রত্যেকটি প্রতিরোধ আন্দোলন কিছু ঐতিহ্য রেখে যায় যা পরবর্তী আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করে। এই আন্দোলন উপজাতিদের জীবনে একটি স্মৃতি হিসাবে থেকে গিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ ভবিষ্যতের বিপ্লবের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কে. কে. দত্ত (K. K. Dutta) মন্তব্য করেছেন — সাঁওতাল বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলা ও বিহারের ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। এটি কিন্তু শুধুমাত্র আঞ্চলিক বিদ্রোহ ছিল না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এই আন্দোলন ছিল একটি গণআন্দোলন যার প্রভাব বহু দূর বিস্তৃত হয়েছিল। এই বিদ্রোহের একটি ইতিবাচক দিক হল -- এই বিদ্রোহ ভারতের আদিবাসী জনগণের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা এবং দুর্ভোগ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার আদিবাসী জেলাগুলিকে সুসংগঠিত করে একটি পৃথক সাঁওতাল পরগণা গঠন করে। সর্বোপরি, সাঁওতালরা একটি পৃথক আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শেতাঙ্গ শাসকরা উপলব্ধি করে যে সাঁওতালদের চাহিদা হল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং তারা একটি পৃথক আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা উপলব্ধি করেছিল যে সরকারের সাধারণ নিয়মকানুনগুলি ঔপনিবেশিক ভারতের এই সম্প্রদায়ের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে

এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি কিন্তু সাঁওতালদের জীবনের গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। সাঁওতালদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ প্রবহমান ছিল। সাঁওতালদের খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। এই অঞ্চলে খ্রীস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত করে তোলা। সাঁওতাল বিদ্রোহ 1857 খ্রীঃ বিদ্রোহের পথকে প্রশস্ত করেছিল। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রশ্ন

১। ফরাসী ও ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আনোচনা করো।

৩.৭.১.৫ ঃ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

প্রাক্-পলাশী পর্বে মুসলমানরা প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত; অন্যদিকে কৃষি ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল হিন্দুদের ওপর। যেহেতু রাজনীতি এবং প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব বহন করত মুসলমানরা, সেহেতু হিন্দুদের হাতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক শান্তি কোনভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু 1757 সালের পর ব্রিটিশদের এদেশে দ্রুত ক্ষমতা বিস্তার — অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। কর্মক্ষেত্রে পার্শীর বদলে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার (1837 সাল থেকে) ক্রমশ হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে। কারণ এই সময় ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। 1793 খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক ধরণের নতুন ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যারা ছিল উচ্চবিত্ত হিন্দু যেখানে কৃষকদের একটি বিরাট অংশ ছিল ভগ্নোদ্যম মুসলমানরা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূস্বামী ও রায়তের দ্বন্দ্ব অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে। তবে কৃষকদের দুর্দশার প্রকৃতি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। মুসলিমরা তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতাকে ধর্মের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তৎপর হয়। অন্যদিকে ইসলামের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনগুলি ছিল কৃষক আন্দোলন যাদেরকে ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলিকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে। সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — (1) বাংলায় ফরাজী আন্দোলন, (2) দিল্লীতে তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া, (3) আরবের ওয়াহাবী আন্দোলন। আরবে ওয়াহাবী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন আব্দুল ওয়াহাব (1703-1787) ভারতে অনুরূপ একটি বিদ্রোহ তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া পরিচালিত হয়েছিল দিল্লীর শাহ-ওয়ালি-আল্লাহর দ্বারা। তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ। 1818 খ্রীঃ দিল্লীতে সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ও শিখদের বিতাড়িত করে এদেশকে দার উল-ইসলামে পরিণত করা। জানা যায় 1820 খ্রীঃ কলকাতায় পরিদর্শনে এসে সৈয়দ আহমেদ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যার ইতিবাচক ফলস্বরূপ 1827 খ্রীঃ বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে।

ফরাজী আন্দোলন ছিল বাংলার সংঘটিত প্রথম ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। ১৮১৮ খ্রী হাজি শরিয়ৎ আল্লার নেতৃত্বে বাংলায় প্রথম প্রবর্তিত হয়। শরিয়তের পরিচালিত ফরাসী আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

৩.৭.১.৫.১ ঃ ফরাজী আন্দোলন

ফরাজী আন্দোলন ছিল বাংলায় সংঘটিত প্রথম ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনটি বাংলায় প্রথম প্রবর্তিত হয় 1818 খ্রীঃ হাজি শরিয়ৎ আল্লার দ্বারা। 1799 সালে শরিয়ৎ মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন এবং সেখানকার ওয়াহাবী আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষকদের কাছে ফরাজী ভ্রাতৃত্ববোধ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ফরাজী মতে সকল ফরাজী ছিল সমান। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা অবশ্য এই আন্দোলনে যোগ দেননি। এর মাধ্যমে যে সত্যটি প্রকাশিত হয় তা হল ফরাজী আন্দোলন কিছু অর্থনৈতিক শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাজীরা ব্রিটিশদের দার-উল-হাবী হিসেবে দেখতেন। সুতরাং প্রথমদিকে এই আন্দোলন একটি রাজনৈতিক রূপরেখাকে অনুধাবন করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটি কৃষি চরিত্র ধারণ করে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। James Wise এবং H. Beveridge শরিয়তকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মানতে অসম্মত হয়েছেন। তারা এটাও মানেন না যে শরিয়তের ফরাজী আন্দোলন ছিল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ। শরিয়তের পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

শরিয়ত উল্লাহের পুত্র দাদু মিঞার (1819-1862) আমলে ফরাজী আন্দোলন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। এটাই ছিল আন্দোলনের একটি যুক্তিগ্রাহ্য প্রকাশ। পূর্ব বাংলায় দাদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যখনই মুসলমান কৃষকরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে তখনই জমিদার ও নীলকর সাহেবরা সচেতন হতে শুরু করে। দাদুর নেতৃত্বে ফরাজী কেন্দ্র থেকে লাঠিয়াল বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য গড়া হয় এবং তাদেরকে সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দাদু সর্বত্র এই মত প্রচার করেন যে, জমি আল্লাহের দান। সুতরাং জমিদারদের কর ধার্য করার অধিকার নেই। তিনি অনুগামীদের বলেন যে, কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ হল অন্যায়। তিনি কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন সরকারের নিয়ন্ত্রিত খাস মহলে বসবাসের জন্য। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দাদু মিঞা একটি সমান্তরাল সরকার স্থাপন করেন। তার অনুগামীদের সুবিচারের তাগিদে দাদু মিঞা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন। এই থাকবন্দী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান ছিলেন দাদু মিঞা।

কানাইপুরের সিকদারদের বিরুদ্ধে এবং ফরিদপুরের ঘোষদের বিরুদ্ধে দাদু মিঞার প্রাথমিক সাফল্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। অবদমিত কৃষকদের কাছে দাদুর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে থাকে যারা দাদুকে রক্ষাকর্তা হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ক্রমশ ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে দাদু মিঞার জনপ্রিয়তার পারদ চড়তে থাকে। জমিদার এবং নীলকররা কৃষকদেরকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইউরোপীয় আবাদকারী মি. ডানলপ ছিলেন জমিদারদের বন্ধু এবং দাদু মিঞার শত্রু। 1846 খ্রীঃ দাদু মেদিনীপুরে ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। 1844 সালে দাদুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং অপরাধের মামলায় জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তথ্যের অভাবে

প্রশ্ন

১। ফরাজী আন্দোলন কি ? এর মূল উদক্তা কে ?

তিনি বেকসুর খালাস পান। দাদুর বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলে কেউ সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়নি। দাদুকে পরে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং আলিপুর জেলে আটকে রাখা হয়। 1857 খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তাকে কারাগারে রাখা হয়। কারাবাসের সময় তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এবং 1862 সালে বাহাদুরপুরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর ফলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই আন্দোলন তার গতি হারায়। বিংশ শতকেও এই আন্দোলন বহাল ছিল তবে ধর্মীয় আন্দোলনরূপে। ফরাজী আন্দোলন কৃষক আন্দোলন হলেও সচেতনভাবে তাকে একটি ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। অধ্যাপক বি. বি. চৌধুরী (B. B. Chaudhuri) এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন। তিনি এই আন্দোলনের অস্পষ্ট চরিত্র এবং বিদ্রোহীদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যর্থতার দিকে আলোকপাত করেছেন। এই আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক যে লক্ষ্য তাই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যা সেই সময়ে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল।

৩.৭.১.৫.২ ঃ ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ

বাংলার ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন তিতুমীর, যার আসল নাম ছিল মীর নিসার আলি (1782-1831)। তিতুমীর 24 পরগণার একটি ছোট্ট গ্রাম বাঁদুড়িয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1822 খ্রীঃ মক্কাতে সৈয়দ আহমেদের আদর্শে দীক্ষিত হন। সৈয়দ কিন্তু একটি শক্তিশালী নীতি বাংলায় গ্রহণ করতে পারেননি এবং মুসলমানরা কিছু সময় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সম্ভবতঃ তিতুমীর উপলব্ধি করেছিলেন যে বাংলার মুসলমানদের পাক্কা মুসলমান তৈরী না করে জেহাদ ঘোষণা সঠিক কাজ হবে না। যাইহোক বাংলা বিভিন্নভাবে সৈয়দকে প্রয়োজনীয় মানুষ ও অন্যান্য রসদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। এটা ইতিহাসের পরিহাস যে তিতুমীর প্রথম জীবনে নদীয়াতে হিন্দু জমিদারদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন যেখানে তিনি দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে বকেয়া আদায় করতেন।

1827 সালে তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে মুসলিম কৃষক এবং কারিগরদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণের জন্য অভিযান শুরু করেন। তিনি ফরাজী আন্দোলনের সমর্থকদের শুক্রবার ও ঈদে নমাজ পড়ার বিরোধী ছিলেন। তবে ফরাজী আন্দোলনের মতই ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল ধর্মীয় সংস্কার, কৃষি অসন্তোষ ও ব্রিটিশ শাসনকে অবমাননার একটি মিশ্রিত রূপ। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। সুতরাং মুসলিমদের উচিত সেই সকল অমুসলিমদের সাহায্য করা যারা দুর্বল, অবদমিত। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং তাঁর বক্তব্য অনেক হিন্দুকেও আকর্ষণ করেছিল। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন — হিন্দু ও মুসলিম, দুই ধর্মেরই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত অত্যাচারী ভূস্বামী সম্প্রদায় ও আবাদকারীদের বিরুদ্ধে। তথাপি তিনি একজন মুসলিম হওয়ায় মুসলিম দমনকারীর সামনে নীরব থেকে ছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্র হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করেছিল। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে, তিতুমীর তার আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে জমিদারদের অত্যাচার তার গৃহীত নীতির পরিপন্থী তখনই তিনি শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তন সাধন করলেন। এই আন্দোলন ক্রমশ হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের কার্যকলাপ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয় এবং একধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, মালদার বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করে।

তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নাগপুরের গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুরাশের কৃষ্ণদেব রায় প্রমুখ জমিদাররা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তিতুমীরের বিদ্রোহকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। হানাফী মতের অনুরাগী মুসলমানরা তিতুর মতের বিরোধী

ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য এই হানাফী মতের অনুরাগীদের সাহায্য নেন। তিনি প্রচার করেন যে, তিতুমীরের অনুরাগীদের দাড়ির ওপর, মসজিদ নির্মাণের ওপর এবং বাংলার নাম আরবীতে পরিবর্তনের ওপর কর আরোপ করা হবে। গোহত্যার শাস্তি স্বরূপ দক্ষিণ হস্ত ছেদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কৃষ্ণদেব রায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিতুমীর ইসলাম ধর্মোপাসনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় কোনরকম প্রত্যুত্তর প্রদান না করে পত্রবাহককে বন্দী করেন এবং পরে জেলেই তার মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনা তিতুমীর এবং তার অনুগামীদের যৎপরোনাস্তি বিদ্রোহী করে তোলে। ফলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। এই আন্দোলন আরো হিংসাত্মক ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণ করে। কলকাতার জমিদাররা সকলেই কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষাবলম্বন করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এস. বি. চৌধুরী (S.B. Chaudhuri) তাঁর সিভিল ডিসটারব্যানসেস ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল-ইন-ইণ্ডিয়া (Civil Disturbances During the British Rule in India) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, যদিও এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল একটি কৃষক অসন্তোষের মধ্য দিয়ে তথাপি পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে।

নারকেলবেড়িয়া এবং তার পাশাপাশি গ্রামগুলি তিতুমীরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তিতুমীরের অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ, যেমন-হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহে আগুন লাগানো, গোহত্যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু সময় ধরে যথেষ্ট আশঙ্কার মধ্যে রেখেছিল। বহু মানুষ নিরাপত্তার অভাবে অঞ্চলছাড়া হতে বাধ্য হয়। তিতুমীর 300 জনের একটি দল নিয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারী আক্রমণ করেন। অভিযান চালানোর সময় তিতুমীরের অনুগামীরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ও হিন্দু পুরোহিতদের হত্যা করে। পুড়ার অভিযানের সাফল্যের পর তিতুমীর ঘোষণা করেন যে, বাংলায় কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং তিনি বাদশা উপাধি ধারণ করেন।

তিনি একটি সমান্তরাল সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা গড়ে তোলেন। যেহেতু নারকেলবেড়িয়ায় বারাসতের প্রশাসনিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই এই আন্দোলন বারাসত আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। জমিদার, নীলকর সাহেব এবং ইংরেজদের অন্যান্য সহযোগীদের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ সাহায্যের অনুরোধ আসতে থাকায় ইংরেজ সরকার সেনাবাহিনী সহযোগে প্রতিরোধে তৎপর হয়। তিতুমীর 1831 খ্রীঃ 19শে নভেম্বর গোলার আঘাতে প্রাণ হারান। ইংরেজ কামানের সামনে বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে তিতুমীরের ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান হয়। তবে তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার অনুপ্রেরণা তখনও তার মহিমা প্রচার করতে সক্ষম ছিল।

তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনকে অনেক সময় ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে কিছু অভিন্নতা থাকলেও এদের যোগসূত্র কোন ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা সমর্থিত হয় না। ওয়াহাবীরা অতীন্দ্রিয়বাদকে অ-ইসলামীয় বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিতুমীর অতীন্দ্রিয়বাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। বারাসত বিদ্রোহের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা উপস্থিত ছিল। বিদ্রোহীদের

প্রশ্ন

১। ফরাজী আন্দোলন কি ? এর মূল উদ্গাতা কে ?

মধ্যে ভারতকে ব্রিটিশদের অধীন থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় থাকলেও তাদের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বরং তারা ভারতে মুসলিম শাসনকেই পুনর্বহাল করতে চেয়েছিলেন। আর.সি. মজুমদার (R.C. Majumder) মনে করেন যে 'It was a movement of the Muslims, by the Muslims and for the Muslims' কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই আন্দোলন কিন্তু সরাসরি সাধারণ হিন্দু জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। বিপরীতভাবে, সাধারণ হিন্দু জনসাধারণ তিতুমীরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসাবে ভেবেছিল। আন্দোলন যদি প্রকৃত অর্থেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করত তাহলে তিতুমীর নারকেলবেড়িয়ায় একটি গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হতেন না। এই বিদ্রোহ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি ঐক্যের বীজ বপন করেছিল যা 1860 সালে নীল বিদ্রোহের সময় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেষ বিচারে একথা বলা যায় যে, ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীগুলি সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সর্বোপরি, এই আন্দোলন মুসলিমদের সচেতন করেছিল কি বিষয়ে তারা অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমঝোতা করবে না। এটা কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করেছিল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল।

৭.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*
2. Suprakash Roy, *Bharater Krishak Bidroha O Ganatantrik Sangram*
3. Girish Chandra Bose, *Sekaler Darogar Kahini*
4. Anand A. Yang (ed.), *Crime and Criminality in British India*
5. J. Hutton, *A Popular Account of Thugs and Dacoits*
6. Radhika Singha, *Despotism of Law*
7. B. S. Haikerwal, *Economic and Social Aspects of Crime in India*
8. C. Palit, *Tensions in Bengal Rural Society*
9. W. W. Hunter, *Annals of Rural Bengal*
10. Ranjan Chakrabarti, *Authority and Violence in Colonial Bengal*
11. David Arnold, *Police Power and Colonial Rule*
12. W. K. Firminger (ed.), *The Fifth Report From the Select Committee on the House Commons on the Affairs of the East India Company*, 2 vols
13. Basudeb Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal*
14. Daniel Rycroft, *Representing the Santal Hool*
15. Rudrangshu Mukherjee, *Awadh in Revolt*
16. William Dalrymple, *The Last Mughal*

৭.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)-এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

২. ওয়াহাবী মুভমেন্টের উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল? এই পরিপ্রেক্ষিতে, তিতুমীরের আন্দোলন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংগঠিত ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহের উপর একটি নিবন্ধ লেখ।

৪. ১৭৮৩ সালের রংপুর বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. ফরাজী আন্দোলনে দাদু মিঞার ভূমিকা আলোচনা কর।

৬. ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

Society In Colonial India

সমাজ ঃ উপজাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়

একক-৭

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.৭.০	:	উদ্দেশ্য
৭.৪.৭.১	:	ভূমিকা
৭.৪.৭.২	:	ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আদিবাসী—উপজাতি জনসমাজ
৭.৪.৭.৩	:	ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন
৭.৪.৭.৪	:	নিম্নবর্ণের নানা আন্দোলন
৭.৪.৭.৫	:	ঔপনিবেশিক ভারতে নানা শ্রেণীর বিকাশ
৭.৪.৭.৬	:	উপসংহার
৭.৪.৭.৭	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৭.৪.৭.৮	:	সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৪.৭.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় আদিবাসী—উপজাতিদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ।

(২) ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন।

(৩) নিম্নবর্ণের আন্দোলনসমূহ এবং ভারতীয় বর্ণ আন্দোলন নানা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিকাশ।

৭.৪.৭.১ : ভূমিকা

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গ ভারতীয় সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল মূলতঃ

দমনমূলক ও নিপীড়িন মূলক। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, ভূমি রাজস্ব ও অরণ্য সম্পদ এবং খনিজ দ্রব্য আত্মসাৎ করা ও ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি সুনিশ্চিত করা। এক কথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক, সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা, ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা ও ভারতে বৃটিশ পণ্য বিক্রি করা। প্রাক বৃটিশ বা মুঘল আমলে ভারতীয় সমাজ এই জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক দমন পীড়নের সাথে পরিচিত ছিল না। বস্তুত ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতীয় সমাজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় সমাজের এক এক অংশের উপর ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত এক এক ভাবে পড়েছিল। এর কারণ ছিল ভারতীয় সমাজ ছিল বহুত্ববাদী সমাজ বা Plural society। অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে আদিবাসী উপজাতি সত্ত্বা, বর্ণ ও শ্রেণীর অবস্থার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে বোঝাই আমাদের এই পাঠের লক্ষ্য।

৭.৪.৭.২ : ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আদিবাসী—উপজাতি জনসমাজ

মুঘল আমলে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসী-উপজাতি জনজাতিদের দূরত্ব ছিল। মুঘল রাষ্ট্র যদিও অরণ্য সম্পদ আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল, তবে তার মাত্রা কখনও বৃটিশদের মতন হয়নি। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ বৃটিশ রাষ্ট্র ছিল ঔপনিবেশিক চরিত্রের বৃটিশ রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ ও নীতি প্রণয়নের পিছনে কাজ করত একধরনের উপযোগবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী, রাষ্ট্র দর্শন। এই দর্শনে মনে করা হত ভারতীয় সমাজ সভ্যতাহীন ও অনুন্নত। এর পরিবর্তন জরুরী। ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপে এই জাতীয় উচ্চবর্গীয় মানসিকতার জন্ম হয়। ভারতে বৃটিশদের বিভিন্ন নীতি গ্রহণের পিছনে এই মানসিকতা ও দর্শন কাজ করেছিল। উপজাতি আদিবাসীদের সামাজিক ও কৌম জীবনে হস্তক্ষেপ করা বৃটিশ সরকার ন্যায্য বলে মনে করতো। যেমন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ময়মনসিংহের পারো উপজাতিদের উপর ইংরাজ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৮২২-১৮৬৯ এর মধ্যে নানান ধরনের আইন প্রণয়ন ও সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই তথাকথিত 'অসভ্য' পারো উপজাতিকে সুসভ্য রাষ্ট্র কাঠামোর অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র উপজাতি জনজাতি ও তাদের বহুবিধ অভ্যাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং স্বতন্ত্রিয়তাকে বৃটিশ রাষ্ট্রকাঠামোর অঙ্গীভূত না করা পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের অস্বস্তি ছিল।

এই 'অস্বস্তি' থেকে জন্ম নেয় 'ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব' ও জনগণনা ব্যবস্থা। জনগণনা বা 'Census' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Bernanrd S. Chon মন্তব্য করেছেন, 'The history of the Indian census must be seen in the total context of the efforts of the British colonial government to collect systematic information about many aspects of Indian society and economy.' Census বা জনগণনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের প্রতিটি অংশকে চিহ্নিত করা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার করে। তথ্য জানা থাকলে শাসন করার সুবিধা হয়।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আর্থিক নীতির ফলেও উপজাতি জনজাতিদের জীবনে পরিবর্তন আসে। অরণ্য আইন বা Forest Acts গুলির মাধ্যমে সরকার উপজাতি আদিবাসী জনজাতিরা

অরণ্যের সম্পদের উপর দীর্ঘদিন ধরে যে অধিকার গুলি ভোগ করে আসছিল এবং অরণ্যের সঙ্গে তাদের যে আত্মিক সম্পর্কে যে (যে আত্বিক সম্পর্ককে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা সম্ভব নয়) তাকে ভেঙে দিতে অগ্রহণী ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে উপজাতি আদিবাসীদের চিরাচরিত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বহিরাগত বর্ণহিন্দুদের আগমন এবং মাড়োয়ারী মহাজনদের উপস্থিতি উপজাতি আদিবাসীদের জীবনের ছন্দকে বিপন্ন করে তোলে। বৃটিশ সরকার সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারে বিশ্বাস করত। সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা উপজাতি জনজাতি সমাজে ছিল না। তারা সম্পত্তির কৌম মালিকানায় বিশ্বাস করত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণা আদিবাসী উপজাতি সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আদিবাসী উপজাতিদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। Sumit Sarkar এর ভাষায়, 'British legal conceptions of absoute private property eroded traditions of joint ownership (like the khuntkatti tenure in Chote Nagpur) and sharpended tensions within tribal society.' মুঘল আমলে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসী উপজাতিদের এই জাতীয় দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপও বহুক্ষেত্রে উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এক কথায় বলতে গেলে নানা ভাবে আদিবাসী উপজাতি সমাজে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব জন্ম নিতে থাকে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও তার সহযোগী ভারতীয় শক্তিসমূহর কার্যকলাপের ফলে উপজাতি আদিবাসী সমাজে যে বিপুল ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল তার প্রকাশ ঘটে একাধিক রক্তাক্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এই বিদ্রোহগুলির পিছনে কাজ করত tribal idenity বা উপজাতি সমাজের নিজস্ব সংহতি বোধ। এই বিদ্রোহগুলি লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদ সাধন করা।

ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে আদিবাসী অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী

ভারতীয় জনসমাজ ও বিশেষত উপজাতিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার একাধিক উপজাতি আদিবাসী গোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ (বা criminal tribe) বলে চিহ্নিত করে। ব্রিটিশ শাসকদের মনে হয়েছিল অপরাধ বা crime কিছু কিছু উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর বংশগত জীবিকা। ব্রিটিশ সরকারী দলিলে লেখা হয়, 'crime is their trade and they are born to it and must commit it.' এই গোষ্ঠীগুলিকে সরকার 'criminal tribe' বলে চিহ্নিত করে। এই তথাকথিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৭১ সালে সরকার 'Criminal Tribes Act of 1871' প্রণয়ন করে। ১৮৩০ এর দশকে W.H. Sleeman যখন ঠগীদের নির্মূল করার অভিযান চালান তখন তিনিও এই অপরাধী উপজাতির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত অপরাধী উপজাতি বা criminal tirbal-এর ধারণা ঔপনিবেশিকতাবাদ সৃষ্ট 'rule of law' এর আইনী কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার নিম্নবর্ণের ভ্রাম্যমান উপজাতিগুলিকে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ১৮৬৭ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ইন্সপেক্টর জেনারেল তার প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন 'It must be remembered, in dealing with the wandering predatory tribes of India, that the fraternities are of such ancient cretion, their numbers so vast, the country over which their depredations spread so vast, their organization so complete, and

their evil of such formidable dimensions, that nothing but special legislation will suffice for their suppression and conversion' অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা বা 'special legislation' ছাড়া এই ভ্রাম্যমান উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে আইনী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এই চিন্তার ফলশ্রুতি ছিল ১৮৭১ সালের 'Crimial Tribes Act' এর প্রণয়ন। ১৮৭১ এর এই আইনে চারটি উপজাতিগোষ্ঠীকে অপরাধী উপজাতি বা 'criminal tribe' বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে যাতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যায় তার ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়। সরকার এই চিহ্নিত করা অপরাধী উপজাতিগুলির সদস্যদের নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করে। তাদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা এলাকার বাইরে গেলে তাদের আটক করার কথাও এই আইনে বলা হয়।

Thomas R. Metcalf এর গবেষণা থেকে দেখা যায় সরকারের এই প্রচেষ্টা কিন্তু সমালোচনার উর্দ্ধে ছিল না। যেমন পাঞ্জাব চিফ কোর্টের বিচারকরা বলেন একমাত্র তখনই কারুর নাম নথিভুক্ত করা যায় যদি সে কোন অপরাধ করে। এই যুক্তিও দেওয়া হয় এর ফলে নির্দোষও অকারণে শাস্তি পাবে। শুধু তাই নয় এর ফলে পুলিশের হাতে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে যার অপব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা তৈরী হবে। কিন্তু সরকার এই সমালোচনায় খুব বেশি কর্ণপাত করেনি। স্বাধীনতার পর এই কুখ্যাত ঔপনিবেশিক আইনের অবসান ঘটান হয়।

৭.৪.৭.৩ : ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় হিন্দু সমাজে পেশাগুলি ছিল মূলতঃ বংশানুক্রমিক। বর্ণব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস বংশগত রূপ ধারণ করেছিল। হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ 'স্বতন্ত্র এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক কতগুলি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সমাজে স্বতঃগুণ ছিল পরিত্রতম এবং যেহেতু ব্রাহ্মণরা ছিল স্বতঃগুণের অধিকারী তাই তারা ছিল সমাজের সবচেয়ে উপরের বর্ণ। ব্রাহ্মণরা ছাড়া কায়স্থ ও বৈদ্যরাও সমাজের উপরতলার বা উচ্চবর্ণ চিহ্নিত ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের কোন গুণ নেই বলে ধরা হত। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের সমাজে social mobitlity বা সামাজিক গতিশীলতা অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয়দিকেই কম বা সীমাবদ্ধ। প্রাক-ঔপনিবেশিক কালপর্বে এই বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের আদৌ কোন পরিবর্তন হয়নি তা কিন্তু নয়। নানান ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সীমাবদ্ধ আকারে হলেও চলছিল। কিন্তু কখনই তা বর্ণব্যবস্থার মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আনেনি। ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার পর বর্ণব্যবস্থায় কতকগুলি পরিবর্তন আগে, আগের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয় কিন্তু বর্ণব্যবস্থার বিলুপ্তি কিন্তু আদৌ হয়নি। বরং বর্ণ ব্যবস্থা নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয় ও নিজের অবস্থাকের যথাসাধ্য সুদৃঢ় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে নানা কারণে চিরাচরিত ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন আসে। গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতির প্রবর্তন ও জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা চিরাচরিত বর্ণ নির্ভর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও দুর্বল করেছিল। ব্রিটিশ আমলে এক নতুন ধরনের নাগরিক অর্থনীতি জন্ম নেয় যার ভিত্তি

কখনই বর্ণ ছিল না। এই নতুন ধরনের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ইংরাজী ভাষা জানার মতন পেশাদারী শিক্ষা তথা দক্ষতা। ইংরাজী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয় colonial clerks বা ঔপনিবেশিক কেরানী কুলের। এটা সত্যি যে ইংরাজী শিক্ষার উপর কায়স্থ বা বৈদ্যদের মতন উঁচু বর্ণগুলির অধিপত্য ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে ইংরাজী শিক্ষা কখনই বর্ণভিত্তিক ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে, একদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে কতকগুলি নতুন ঔপনিবেশিক বৃত্তির জন্ম অষ্টাদশ শতকের বর্ণভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিল এবং social mobility বা সামাজিক গতিশীলতার জন্ম দিয়েছিল। বর্ণভিত্তিক পেশার পরিবর্তে যোগ্যতা ভিত্তিক পেশা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে বর্ণব্যবস্থার রূপান্তর প্রসঙ্গে হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকাকালীন দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংস ও কৃষি ব্যবস্থার অবনতি চিরায়ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল, যা বস্তুত পারস্পরিক নিরাপত্তাবোধের জন্ম দিত এবং বর্ণনির্ভর সমাজ কাঠামোতে প্রত্যেকের অবস্থান নির্দেশ করত। ঔপনিবেশিক আমলে তা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলে কারিগর, তাঁতিরা তাদের চিরাচরিত পেশাগুলি থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ভীড় করতে লাগল। অনেকক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির চাপে কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরের শিল্প অর্থনীতিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। শহরের শ্রমিক মহল্লা বা বস্তিগুলির সঙ্গে গ্রামের জীবনবোধের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ভাঙনে এই গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ জাতিভেদপ্রথা, পবিত্রতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ধারণাগুলি নতুন ধরনের সামাজিক কাঠামোতে অপ্রসাঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। নিম্নবর্ণের মানুষরাও এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য বহুক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হওয়ার ও আন্দোলনমুখী হওয়ার জন্য সংঘটিত হতে লাগল। এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক সুবিধা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মতন উঁচু বর্ণের মানুষরা আত্মসাৎ করেছিল, নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলিও কিন্তু পিছিয়ে থাকতে যে রাজী ছিল না তা উনিশ বা বিশ শতকে সংগঠিত নিম্নবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির আন্দোলন থেকে স্পষ্ট। সামাজিক মর্যাদা ও সরকারী আনুকুল্য লাভের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনগুলি একদিকে পরিবর্তিত বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, অন্যদিকে আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে ‘Divide and Rule Policy’ প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে উচ্চবর্ণগুলির দায়িত্ব কিছু কম ছিল না।

৭.৪.৭.৪ : নিম্নবর্ণের নানা আন্দোলন

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতের সংগঠিত নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮.৭২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সংগঠিত নমঃশূদ্র আন্দোলন। এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও জটিলতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। নমঃশূদ্ররা মূলতঃ পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মন সিংহ, যশোর এবং খুলনা জেলায় থাকত। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের অবস্থান ছিল সমাজের একদম নিচের দিকে, সাধারণভাবে এদের চণ্ডাল বলে অভিহিত করা হত। নানা ধরনের সামাজিক অবিচারের ফলে নমঃশূদ্রদের

সঙ্গে উচ্চবর্ণের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। ১৮৭২.৭৩ সালে ফরিদপুর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম নমঃশূদ্র আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এই আন্দোলন সাফল্য পায়নি। এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় সতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের। এই নতুন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ছিলেন শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর। এই সতুয়া ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১২ সালে গঠিত হয় Bengal Namasudra Association.

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন গড়ে ওঠে। উপরের স্তরটি ছিল সম্ভ্রান্ত অংশের; নিচের স্তরটি ছিল মূলতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের। যাইহোক নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের ফলে সরকার ১৯১১ সালের জনগণনায় চণ্ডাল শব্দটির পরিবর্তে নমশূদ্র শব্দটি ব্যবহার করে। তারা উপরের বর্ণগুলির নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক সাম্মানিক চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীতে পৃথক সুযোগ দাবী করতে থাকে। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে তাদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নমঃশূদ্রদের কোন প্রতিনিধি না থাকায় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্বন্ধে নমঃশূদ্ররা সন্দিহান ছিল ও সবসময়ে দূরত্ব বজায় রাখত। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল নমঃশূদ্ররা যেখানে ব্রিটিশ শাসনকে প্রাক-ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় উন্নততর বলে মনে করত, সেখানে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। এর থেকে বোঝা যায় কেন নমঃশূদ্ররা স্বদেশী আন্দোলন থেকে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়া আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছে।

নমঃশূদ্র আন্দোলনের তলার দিকে ছিল কৃষক। এরা উচ্চবর্ণের জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি চাইত। এর জন্য কখন তারা জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ নিয়েছে, কখনও নমশূদ্র কৃষকরা মুসলিম কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উচ্চবর্ণের জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আবার নিজেদের সম্প্রদায়ের সংহতি বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের সঙ্গে তারা তীব্র সংঘাতে গেছে, যেমন যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে হয়েছিল ১৯১১, ১৯২৩-২৫ এবং ১৯৩৮ সালে।

১৯৩০ এর দশক থেকে নমঃশূদ্র নেতৃত্ব সাংবিধানিক রাজনীতিতে বেশি করে জড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিপরীত প্রক্রিয়া রূপে কৃষকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি এই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও নমশূদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মুলস্রোতের সমান্তরাল ধারা রূপে বহমান ছিল। ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদের মৃত্যুর পর এবং সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসুর প্রচেষ্টায় নমঃশূদ্র নেতৃত্বের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব কমে আসে। অন্যদিকে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় কৃষকদের (যাদের অধিকাংশই নমঃশূদ্র) সংগঠিত করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয় ১৯৪২ সালে জুন মাসে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে এবং জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে। এর ফলে হিসেবে ১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনে ফরিদপুর, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় নমঃশূদ্র কৃষকরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। নমঃশূদ্র আন্দোলনের উপরতলার নেতারা কিন্তু নমঃশূদ্র

কৃষকদের এই 'শ্রেণী' ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্তে এসেছেন নমঃশূদ্র আন্দোলনে একটি বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা উপসংহার টানতে পারি এই বলে যে কর্ণগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় ছাপিয়ে নমঃশূদ্র আন্দোলনে শ্রেণীগত পরিচয় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বর্ণভিত্তিক এই আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণীগতসত্ত্বা নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র কৃষকদের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে উপরতলার নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বৃত্তের থাকতে উৎসাহিত হয়। শ্রেণীগত সত্ত্বার উন্মেষ ও কৃষক আন্দোলনের বিকাশ নিশ্চিতভাবেই সমকালীন যুগ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে। মহারাষ্ট্রের উপর গেইল ওমভেট্ এর গবেষণা থেকে দেখা যায় মহারাষ্ট্রের বর্ণ আন্দোলনেও দুটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল। প্রথম ধারাটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং নিম্নবর্ণের স্বচ্ছল অংশটির দ্বারা পরিচালিত। এই রক্ষণশীল অংশটি ব্রিটিশ সরকারের নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করত এবং ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের পর 'Non-Brahman Association' নামক একটি রক্ষণশীল ও ব্রিটিশ অনুগত রাজনৈতিক দল গঠন করে। অপর অংশটি ছিল অনেক বেশি চরমপন্থী ও আন্দোলনমুখী। এই র‍্যাডিকাল অংশটি 'Satyasodhak Samaj' গঠন করে। এরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত ছিল। এদের দৃষ্টিতে সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত-একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন সমাজ যারা নানাভাবে শোষিত, অন্যদিকে মূলসংখ্যক শেঠজি ভাটজি অর্থাৎ বণিক ও ব্রাহ্মণ যারা শোষণ করে। ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকে মহারাষ্ট্রের বর্ণ আন্দোলন গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পশ্চিম ভারতে কুনবি ও মারাঠী ছিল অব্রাহ্মণ বর্ণ আন্দোলনের ভিত্তি, দক্ষিণ ভারতে এই ভিত্তি ছিল ভেল্লাল ও দ্রাবিড় সত্ত্বা। Bernard Cohn-এর পূর্ব যুক্ত প্রদেশের উপর গবেষণা থেকে দেখা যায় চামরার (মূলতঃ প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুর) শিবনারায়ণ গোষ্ঠীর ধর্মীয় নীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার পালন করতে থাকে। আবার কেরালায় ইজাভা নামক নিম্নবর্ণীয় মানুষরা বিংশশতকের গোড়া থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে থাকে। তাদের অন্যতম দাবী ছিল মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ। সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ তামিলনাডুর নাদার, উত্তর তামিলাডুর পাল্লি, মহারাষ্ট্রের মাহার প্রভৃতি বর্ণগোষ্ঠীগুলির মধ্যে। ১৯৩০ বিশেষত ১৯৪০-এর দশক থেকে দেখা যায় নিম্ন বর্ণের র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনের একটি বড়ো অংশ বামপন্থী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যেমন সহজানন্দ প্রথমে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ও পরে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। সাতরার সত্যশোধক আন্দোলনের অন্যতম নেতা নানা পাতিল মহারাষ্ট্রের অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা হন। প্রথমদিককার তামিল কমিউনিষ্ট যেমন সিঙ্গারাভেলু ও পি. জীবনানধন ১৯৩০-এর দশকে বর্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের বর্ণ ব্যবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্বন্ধে যে আলোচনা এখানে কারা হোল তার থেকে দু একটি সিদ্ধান্ত সাধারণ ভাবে আমরা টানতে পারি। প্রথমতঃ ভারতীয় বর্ণগুলির, বিশেষত নিম্ন বর্ণগুলির, অবস্থা আদৌ অনড়, অচল, পরিবর্তনহীন ছিল না। একদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব, অন্যদিকে নিজেদের প্রতিবাদী স্বত্ত্বার বিকাশ ও চেতনার ক্রমউন্মীলন বর্ণের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গি উভয় অবস্থাকে পাল্টে দিয়েছিল। অন্যভাবে বললে প্রতি মুহূর্তে বর্ণ ভিত্তিক ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছিল, নিম্নবর্ণগুলি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে লড়াই করেছিল তা উঁচু বর্ণ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতা সম্পর্ককে পাল্টে দিচ্ছিল। এই অর্থে অর্থাৎ ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীগুলি

এবং ঔপনিবেশি রাষ্ট্রও নিজেদের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। অর্থাৎ এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী লড়াই যা নানা চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ('জাতি ও নিম্নবর্ণের চেতনা') শ্রমজীবী মানুষরা তাদের 'সাধারণ বোধের' মধ্যে, সাংস্কৃতিক মাধ্যমে, প্রতিনিয়তই এমন এক সম্প্রদায়রে রূপগুলিকে খুঁজে চলেছে। রাজনীতির কাজ হল জনগণের ভিতরের এই কাজগুলিকে, গুণগুলিকে বিকশিত করা। বাইরে থেকে কোন 'বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে' আমদানী করা নয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরের গুণগুলির বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রতিরোধের রাজনীতি তার নিজস্ব ভাষা তৈরী করে নেয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর এই বক্তব্য ও যুক্তি থেকে বোঝা যায় না কেন বিংশ শতাব্দীর ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ভারতে নিম্নবর্ণের আন্দোলনে ধীরে ধীরে শ্রেণী চেতনার বিকাশ ও বামপন্থী মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করলো। বস্তুত এটি শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সাধারণ বোধের বিকাশের প্রশ্ন নয়, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে এই প্রশ্নটি যুক্ত বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মতাদর্শের যথার্থার উপর। বামপন্থী মতাদর্শ ইউরোপের থেকে নেওয়া 'বৈজ্ঞানিক চিন্তা' কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, বরং যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বামপন্থী চিন্তা ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকের ভারতীয় নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা। ভারতীয় নিম্নবর্ণের বিভিন্ন আন্দোলনের তথ্যগত বিশ্লেষণ দেখায় যে বর্ণ আন্দোলনের মধ্য থেকেই শ্রেণীবোধ জেগে উঠেছিল, যার পিছনে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং বামপন্থী মতাদর্শ এখানে বাইরে থেকে নেওয়া কোন বিষয় নয়, বরং তা বর্ণগুলির বস্তুগত অবস্থান ও তাঁর রূপান্তরের প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। আর ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল বলেই বর্ণ আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রেণী চেতনার বিকাশ কিয়দংশে হলেও সফল হয়েছিল।

৭.৪.৭.৫ : ঔপনিবেশিক ভারতে নানা শ্রেণীর বিকাশ

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রেণীর বিকাশও এই প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যেতে পারে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রেণী মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। যেমন দাস সমাজে মুখ্য শ্রেণী দুটি—দাস মালিক ও দাস। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস। ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্প মালিক বা পুঁজিপতি ও শিল্প শ্রমিক।

পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ভাঙনের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হয় এবং রবার্ট ব্রেনারের ভাষ্য অনুযায়ী এই উৎক্রমণ বা transition-এ শ্রেণী সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলেনা। এর পিছনে দুটি মুখ্য কারণ ছিল। প্রথমত ভারতীয় সমাজ বর্ণনির্ভর সমাজকাঠামো, যা পশ্চিম ইউরোপে ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুঘল আমলের ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারা অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিকতার দ্বারা মৌলিকভাবে প্রভাবিত হয়; যা পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে হয়নি। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে মুঘল আমলে বিদ্যমান ভারতীয় কৃষি কাঠামো ও ভূমি সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়, খুব সীমিতভাবে হলেও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয এবং বন্দরকেন্দ্রিক কানবি পাতিদার, মাদ্রাজে রেড্ডি, মহারাষ্ট্রের সামওয়াদ মালি প্রমুখরা এই জাতীয় ধনী কৃষকদের উদাহরণ। আমাদের এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব নীতির কল্যাণে কৃষি সমাজে

নতুন ধরনের শ্রেণী বিকাশ ও শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি সমাজের আভ্যন্তরীণ মেরুকরণ বা polarisation বৃদ্ধি পেয়েছিল অতি দ্রুত হারে যার অর্থ ছিল একাধিক গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে অল্পসংখ্যক কৃষকের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি।

ব্রিটিশ আমলে যে নতুন ধরনের শহর অর্থনীতির বিকাশ ঘটে, সেখানে অন্তত তিনটি নতুন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত। এরা ভারতের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী। বর্ণগত গতিশীলতা কম থাকায় প্রথম দিককার ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা। ঐতিহাসিক বি. বি. মিশ্রর মতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। পক্ষান্তরে ক্রিস্টোফার বেইলির গবেষণা থেকে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকেই উত্তরভারতের শহরগুলিতে আমলা শ্রেণী, বণিক প্রভৃতিরা বসতি স্থাপন করে একটি সুসংবদ্ধ শ্রেণীরূপে বিকাশের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এরাই কালক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে বিকশিত হয়। এই অর্থে অষ্টাদশ শতক ও উনিশ শতকের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরণ একটি নিরন্তর ধারাবাহিকতার ইতিহাস। বেইলি তাঁর এলাহাবাদের উপর গবেষণায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ‘এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উকিল ও অন্য বৃত্তিভোগী স্বদেশী নেতারা আসলে শেঠিয়া শ্রেণীর অনুগৃহীত মুখপাত্র মাত্র।’ এখানে জাতপাত বা ভাষার ঐক্যের চেয়ে পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক অনেক বেশি জোরদার। ডি. এ. ওয়াশব্রুক তাঁর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপর গবেষণায় একই ধরনের পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীত সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ও ভূমিকা সম্পর্কে এই ভাষ্যকে নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনই অষ্টাদশ শতকের হিন্দু আমল বা জেন্ট্রি নয়। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত একই সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনা করেছেন। এর পিছনে কাজ করেছিল একদিকে দেশীয় ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, অন্যদিকে পাশচাত্য শিক্ষার সুফলকে আত্মস্থ করা।

১৮৮৭ সালে ভারত ইংরাজী শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৯৮,০০০। ১৯০৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৫,০০০ জন। শুধু বাংলা নয়, ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে যে নতুন বৃত্তিগুলির জন্ম হয়েছিল সেগুলি এই ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণী করায়ত্ত করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ছিল নিরন্তরভাবে তার চারপাশকে প্রশ্ন করা—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তিন ধরনের ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রশ্ন করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই প্রচেষ্টার পিছনে কাজ করেছিল নিরন্তর আত্মসমালোচনা ও দেশ ও কাল সম্পর্কে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ মানে নিছক ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার নয়, বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি। কোলকাতা, বোম্বাই, পুনা, মাদ্রাজ সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার ও সংগঠন নির্মাণে এগিয়ে আসে। এমনকি ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সমালোচনা বা economic critique এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উপস্থিত করেছিল। বস্তুত ১৮৬০ সালের পর থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয় শ্রেণী ইংরাজ

শাসন সম্পর্কে আশা হারিয়ে ফেলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এই শ্রেণীর থেকে জন্ম নেয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদ দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দুটি নতুন শ্রেণী জন্ম নেয়। একটি হল পুঁজিপতি শ্রেণী, অন্যটি শ্রমিক শ্রেণী। তীর্থঙ্কর রায় ভারতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) ১৮৫০ ১৯১৪, (২) ১৯১৪-১৯২০, (৩) ১৯২০-১৯৩৯, (৪) ১৯৩৯-৪৭। এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দয়ে আধুনিক ভারতে শিল্পপতি ও শ্রমিক—উভয় শ্রেণী জন্ম নেয়। প্রথম দিককার শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রশিল্প, পরবর্তীকালে পাট ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় শিল্পপতিরা সাধারণভাবে মাড়োয়ারী, গুজরাটি ও চেট্টিয়ার গোষ্ঠীর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল। সাধারণ ব্রিটিশ কোম্পানী বা ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দি বা দলিল বা এজেন্ট রূপে এরা কাজ করে পুঁজি সংগ্রহ করে। এই পুঁজি পরে শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একাধিক নতুন ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ আমলের উল্লেখযোগ্য ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠী হল টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, শ্রীরাম, মফতলাল, গোয়েঙ্কা প্রমুখ।

শিল্পপতি শ্রেণীর বিকাশের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশও উনিশ-বিংশ শতকের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক উৎস ছিল। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতি ও অবশিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জনসমাজের একটি বড়ো অংশ ভূমিচ্যুত হয়ে জীবিকার খোঁজে শহরে শিল্পশ্রমিক রূপে কাজ নেয়। এর ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা উপাদান শহরের শ্রমিক মহল্লাগুলিতে আসে। শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শ্রমিকদের আদৌ কোন বেতনবৃদ্ধি হয়নি। পরবর্তীকালে ১৮৯০-৯৫ সালে খাদ্যদ্রব্যের যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল মজুরী সেই হারে বাড়েনি। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে সর্দারদের উপস্থিতি শ্রমিক শোষণকে আরো তীব্র করে তুলেছিল। বাগিচা বা খনি শ্রমিকদের অবস্থাও খুব করুণ ছিল। ১৯৩১ সালে রয়াল কমিশন অফ লেবার মন্তব্য করেছিলেন যে ১৯০৮ সালে ফ্যাক্টরি কমিশনের তদন্ত চলার সময়, অধিকাংশ বস্ত্রকলে শ্রমিকদের দিয়ে প্রায় ১৫ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করান হত। অন্যান্য শিল্পগুলিতেও একই অবস্থা ছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের দিয়ে নির্মম ভাবে কাজ করান হত। কিন্তু তাদের মজুরী ছিল পুরুষ শ্রমিকদের থেকে অনেক কম। এই অসহনীয় পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তনের জন্য ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্ট প্রণীত হয়। এই আইনে ৭ বছরের নিচে শিশুদের কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ৭ থেকে ১২ বছর বয়স্ক শিশুদের দৈনিক ৯ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়।

এই আইন কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা পাল্টাতে পারেনি। ১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় শিশুদের উপর শোষণ একই রকম নির্মম ভাবে অব্যাহত। এমনকি ১৯৩১ সালের রয়াল কমিশন অন লেবর ইন ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদনে দেখা যায় শ্রমিকদের অবস্থার আদৌ কোন উন্নতি হয়নি। বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাইনে ছিল গড় মাসিক ৩৭ টাকা। অদক্ষ শ্রমিকদের গড় মাসিক মাহিনা ছিল ২০ টাকা, নারী শ্রমিকদের মাসিক গড় মাহিনা ছিল ১৭ টাকা। শ্রমিকদের বাসস্থান ছিল এককথায় অতীব জঘন্য। কোন সামাজিক নিরাপত্তা শ্রমিকদের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত সংগঠিত প্রতিবাদ জানাতে সচেষ্ট হয়। আহমেদাবাদ, বোম্বাই, শোলাপুর, জামশেদপুর, কলকাতা, নাগপুর, মাদ্রাজ,

কোয়েম্বাটোর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বারবার ধর্মঘট করে। এই প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ ১৯২০ সালে গঠিত হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC)। AITUC-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায়। মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেল এর মঞ্চে ছিলেন। সাধারণভাবে ধরা যায় শ্রমিক সংগঠন গঠিত হওয়ার অর্থ শ্রমিক শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি।

সাম্প্রতিককালে কিছু গবেষণায় ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণী চেতনা'র বিষয়টিকে নানাভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। যেমন দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন বাংলার পাট শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীর থেকেও সম্প্রদায়ের বোধ ও চেতনা অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। প্রাক ধনতান্ত্রিক গ্রামীণ জীবনের নানা উপাদান শ্রমিকদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় যা শ্রেণী চেতনার বিকাশের সামনে প্রতিবন্ধকরূপে ছিল। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণী' রূপে বিকশিত হওয়ার ইতিহাস পাঠের সময় এই টানাপোড়েন মাথায় রাখা দরকার।

৭.৪.৭.৬ : উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের বিকাশ অত্যন্ত জটিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সম্প্রদায়, বর্ণ ও শ্রেণীর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। উনিশ ও বিংশ শতকে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে মৌলিক বদল এসেছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সব সময়ে স্বাধীনভাবে হয়নি। ঔপনিবেশিক শক্তি নানা ভাবে এহ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করেছে নিজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়ার সময় এই জটিলতাকে মাথায় রাখা দরকার। আরো মনে রাখা দরকার এই জটিল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ভাষ্যের জন্ম দিয়েছে। এই রাজনৈতিক ভাষ্য বিশ্লেষণও এই রকম জরুরী।

৭.৪.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Sekhar Bandyopadhyaya : From Plassey to Partition.

2. Sumit Sarkar : Modern India

3. Bipan Chandra : Essays in Colonialism

4. Sekhar Bandyopadhyay : Caste, Politics and the Raj

5. Sekhar Bandy opadhyay : Caste, Protest and Identity in Colonial India

6. Susan Bayly : Caste, Society and Politics in India

7. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital

8. Partha Chatterjee : Bengal, The Land Question

9. Dipesh Chakraborty : Rethinking Working Class History.

10. Tirthankar Roy : The Economic History of India

11. সুকোমল সেন ঃ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

৭.৪.৭.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় উপজাতি আদিবাসীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। নমঃশূদ্র আন্দোলন আলোচনা করে দেখাও যে ভারতীয় বর্ণ আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি কি কি ছিল?

৩। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি কাঠামোতে শ্রেণীর বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

৪। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ছিল?

৫। উনিশ ও বিংশ শতকের শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে ভারতে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ্ - ৩

INDUSTRY AND POPULATION

একক - ২

Trends in Population and National Income

ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও জাতীয় আয়

গঠন (Structure) ঃ

৪.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৩.২.১ ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

৪.৩.২.২ ঃ জাতীয় আয় পরিবর্তনের প্রবণতা

৪.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও জনসংখ্যার গঠন;

২। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রবণতা ও ধরন;

৪.৩.২.১ ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

ঔপনিবেশিক ভারতে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও অর্থনীতির হতশ্রী অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু, জনসংখ্যার গঠনকাঠামো প্রভৃতিকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করতেন জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা। আজও কোন অর্থনীতির মান উন্নয়ন সূচক হিসাবে জনসংখ্যার এই বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হয়। একটা ধারণা চালু ছিল যে দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনীতির উন্নয়নের সূচক। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বাড়ে, সমাজে মহিলা-পুরুষের অনুপাত মহিলাদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে, বয়সের গঠন অনুযায়ী মধ্যবয়স্ক কর্মক্ষম মানুষের আপেক্ষিক অনুপাত বেশি হয় তবে বুঝতে হয় দেশটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। ঔপনিবেশিক ভারতে যেখানে সাধারণ মানুষের আয়ের হিসাব, তার খরচের বিবরণ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তেমন পাওয়া যেত না সেখানে জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তার গঠন প্রণালিকে অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষণ হিসাবে তুলে ধরা হত। আর ভারতে জনগণনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অন্যান্য পশ্চাদপদ দেশের তুলনায় ভারতে আগের থেকে এবং অনেক বিস্তারিত ভাবে যেখানে পাওয়ার সুবিধা ছিল সেখানে পরিসংখ্যানের উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলো ধরে উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের ঝোঁকটা তুলে ধরা যায়। অন্তত একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠে যাকে একেবারে আন্দাজি হিসাব বলা চলে না।

ইংরেজরা ভারতের বৃটিশ রাজত্বের যতই গুণগান করুক না কেন, শিল্পায়নের যত চমকপ্রদ ছবিই আঁকুক না কেন দেশের আর্থিক দুরবস্থার কারণে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি লেগেই থাকত। শিশুমৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি, প্রত্যাশিত বয়সকাল ছিল ২৩ থেকে ২৫ এর মধ্যে, মহিলাদের অনুপাত পুরুষদের থেকে কম, পরনির্ভরতার সূচক ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরে আমরা অর্থনীতির ইতিহাসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার গঠনকাঠামো পরিবর্তনের গুরুত্ব তুলে ধরব।

নিচের সারণিতে ১৮৬৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ঝোঁকটা তুলে ধরা হল ঃ

অবিভক্ত ভারতে জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি

সময়কাল সংখ্যা (কোটি)	সরকারি হিসাবে বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	গড় বাৎসরিক হার (কোটি)	ডেভিসের সংখ্যা বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	সংশোধিত গড় বাৎসরিক
১৮৬৭-৭২	২০.৩৪	—	২৫.৫২	—
১৮৮১	২৫.০২	২.০৭	২৫.৭৪	০.০৯
১৮৯১	২৭.৯৬	১.১১	২৮.২১	০.৯২
১৯০১	২৮.৩৯	০.১৫	২৮.৫৩	০.১১
১৯১১	৩০.০৩	০.৬৫	৩০.৩০	০.৬০
১৯২১	৩০.৫৭	০.০৯	৩০.৫৭	০.০৯
১৯৩১	৩৩.৮২	১.০১	৩৩.৮২	১.০১
১৯৪১	৩৮.৯০	১.৪০	৩৮.৯০	১.৪০

উৎস ঃ কি)সলি ডেভিসের 'পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান (১৯৫১)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার একের নিচে। সরকারি হিসাবে ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালে বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হার একের বেশি হলেও কিংসলি ডেভিসের হিসাবে তা একের থেকে অনেক নিচে। দুটি হিসাবে ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার একের থেকে বেশি বলে দেখা যায়। জনগণনার সরকারি হিসাব থেকে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৭১-৮১ সালের মধ্যে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ২৪.৬ বছর। পরের লোকগণনার হিসাবে এটা কমে হয় ২৩.৮ বছর। বেসরকারি হিসাবে প্রত্যাশিত আয়ু আরও কম বলে দেখা যায়।

আমরা অঞ্চল ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার পাই তা নিচের সারণি থেকে পেতে পারি

শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার

সময়কাল	পূর্ব	পশ্চিম	মধ্য	উত্তর	দক্ষিণ	সর্বভারতীয়
১৮৬৭/৮২-১৯২১	০.৫২	০.১৪	০.৪৭	০.১৯	০.৪৭	০.৩৭
১৯২১-১৯৪১	১.৩৭	১.৩০	১.২৯	১.২৫	০.৯২	১.২২

উৎস ঃ লীলা বিসারিয়া ও প্রবীণ বিসারিয়া, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ১৯৮৩

দুটি সময়কালেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। ১৮৭০ এবং ১৮৯০ সালে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মৃত্যুর হার বাড়ে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হয়। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এই সময়কালে তেমন বড় দুর্ভিক্ষ বা মহামারি দেখা না যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্য অঞ্চল থেকে বেশি হয়। লক্ষণীয় যে ১৯২১-১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সব অঞ্চলেই বাড়ে। এই সময়কালে যোগাযোগের উন্নতি, টিকা ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে মৃত্যু হার কমে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ে। এছাড়া ১৯০৮ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে ভারতে তেমন বড় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা যায়নি। ১৯২১ সালের পর স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সরকারি নীতি এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

আমরা বিভিন্ন সময়ে শিশু, কর্মক্ষম বয়সী এবং বৃদ্ধদের ধরে শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার গঠন বিচার করি তবে নিচের সারণিটি পাই। কর্মক্ষম মানুষের বয়সের নীচে এবং ওপরে থাকা মানুষরা কর্মক্ষমদের ওপর নির্ভরশীল। তাই নির্ভরশীলতার মাত্রা বলতে প্রতি ১০০ জন কর্মক্ষম মানুষের ওপর কতজন নির্ভর করে তাকে বোঝায়। অর্থাৎ শতাংশ হিসাবে নির্ভরশীলতার সূচককে প্রকাশ করা হয় $\left(\frac{\text{শিশু + বৃদ্ধ}}{\text{কর্মক্ষম জোয়ান}} \text{১০০}\right)$। ওপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে ৩-১৪ বছর বয়সী ব্যক্তি ১৮৮১-১৯৪১ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৩৮.৫ শতাংশ। ৬০ বছরের অধিক বৃদ্ধের সংখ্যা ৫.৫ শতাংশের কাছাকাছি। আর ১৫-৫৯ বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। শিশু মৃত্যুর হার বেশি হলে তুলনামূলক ভাবে শিশু ও কিশোরের সংখ্যা বেশি হয়। সারণিতে তাই দেখা যাচ্ছে। প্রথম ১৪ বছরের গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৮.৫ শতাংশ এবং এর ওপরের ৪৫ বছরের গোষ্ঠী সংখ্যা ৫৬ শতাংশ হওয়া মানে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোরের সংখ্যা কর্মক্ষম যুবকদের তুলনা বেশি হওয়া। আর আয়ুষ্কাল খুব কম হওয়ায় বৃদ্ধদের শতকরা অনুপাত কম হওয়াই স্বাভাবিক। নির্ভরশীলতার সূচক থেকে এটা সহজেই ধরা পড়ে। নির্ভরশীলতার সূচক ৭৫-৮০ হওয়া মানে খুবই বেশি। উন্নত দেশে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু বেশি হওয়ায় উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা বেশি হয়। পরনির্ভরশীলতার সূচক কম হয়। পরনির্ভরশীলতার উচ্চ সূচক ঔপনিবেশিক দেশের অনুন্নয়নের লক্ষণ।

এবার আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে পুরুষ-মহিলার অনুপাত ধরে দেশের অর্থনীতির অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করব। নিচের সারণিতে এই বিষয়টা তুলে ধরা হল।

পুরুষ-মহিলার অনুপাত

(প্রতি হাজার মহিলাপ্রতি পুরুষের সংখ্যা)

অঞ্চল	১৮৮১	১৯০১	১৯২১	১৯৪১
পূর্ব	৯৯৫	১,০০৫	১,০৩১	১,০৮০
পশ্চিম	১,০৬৭	১,০৫৮	১,০৮৬	১,০৯৮
মধ্য	১,০৪০	১,০১৯	১,০২৯	১,০৩২
উত্তর	১,১৫	১,১০২	১,১৩৫	১,১২৫
দক্ষিণ	৯৯৮	৯৮২	৯৮৫	৯৯৮

উৎস ঃ লীলা বিসারিয়া ও ডি. কুমার, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, Vol-II

সারণি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে দক্ষিণ ভারতে এবং পূর্বভারতে ১৮৮১ সাল ছাড়া সর্বসময়েই ১০০০ মহিলার প্রতি ১০০০ এর বেশি পুরুষ দেখা যেত ঔপনিবেশিক ভারতে। তাছাড়া সর্বত্রই এই অনুপাত বৃদ্ধির একটা সাধারণ ঝোঁক ধরা পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে জৈবিক কারণে পুরুষের জন্মহার থেকে মহিলা জন্মহার বেশি। আর আর্থসামাজিক কারণে ভ্রূণ হত্যা, বা প্রসূতি কালে মৃত্যুর হার পশ্চাদপদ দেশে বেশি থাকে। সুতরাং বলা যায় যে জৈবিক কারণে এই অনুপাত ১ এর কম থাকা উচিত হলে আর্থসামাজিক কারণ অকালে মহিলা মৃত্যুর হার বেশি বলে এই অনুপাত ভারতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১ এর থেকে বেশি অর্থাৎ প্রতি এক হাজার মহিলা পিছু পুরুষের সংখ্যা একহাজার থেকে বেশি। অনেকে যুক্তি দেখান যে জনগণনায় মহিলাদের সঠিক সংখ্যা ধরা পড়ে না। পর্দানসীন থাকায় সব মহিলাকে গণনার মধ্যে ধরা যায় না। এটা সত্যি বলে ধরে নিলে বলা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে যখন পর্দানসীন মহিলার সংখ্যা কমেছে তখন সংখ্যা বৈষম্য কমা উচিত ছিল। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে এই বৈষম্য বেড়েছে। সুতরাং এই সমালোচনা টেকে না। সারণি ধরে দেখলাম যে দক্ষিণ ভারতে পুরুষ-মহিলা অনুপাত একের কম। দক্ষিণ ভারতে মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে এটা শক্তি। আবার উত্তর ভারতে কন্যা হত্যা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। সেখানকার আর্থসামাজিক কাঠামোর জন্য পুরুষদের অনুপাতে মহিলা সংখ্যা কম। সবশেষে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে শ্রমশক্তি বন্টনের ধরনটি নিয়ে আলোচনা করব। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাথমিক বিভাগ, মাধ্যমিক বিভাগ ও সেবা বিভাগে শ্রমশক্তি কিভাবে বন্টিত ছিল তা নিচের সারণিতে ধরা পড়ে।

বিভিন্ন বিভাগে শ্রমশক্তির বন্টন (শতাংশ)

	১৮৮১	১৯১১	১৯৫১
প্রাথমিক	৭২.৪	৭৩.৮	৭৩.২
মাধ্যমিক	১১.২	১০.৬	১০.৯
সেবা	১৬.৪	১৫.৫	১৫.৮

উৎস ঃ জে. কৃষ্ণমূর্তি, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, Vol-II

শ্রমশক্তির উপরোক্ত বন্টনের ধরনটি পশ্চাদপদ দেশে দেখা যায়। একে অনুন্নয়নের ধরন বলা হয়। অর্থাৎ অনুন্নত দেশ কৃষিপ্রধান হয় যেখানে জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ কৃষিজীবী। দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হলে দেখা যায় শিল্প ও সেবাবিভাগে শ্রমশক্তির শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এটা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

আমরা আমাদের আলোচনায় ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধরন আলোচনা করে এই ধরন বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে একটা দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা দেখলাম।

৪.৩.২.২ ঃ জাতীয় আয় পরিবর্তনের প্রবণতা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয় জানতে গেলে জনসংখ্যা সম্পর্কে যেমন সঠিক তথ্য দরকার তেমনি দেশের জাতীয় আয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দরকার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া গেলেও জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব দেখা যায়। এর মধ্যে ইংরেজ চিন্তাবিদ্‌রা ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নের সদর্থক দিকটি যেমন তুলে ধরার চেষ্টা করেন তেমনি দাদাভাই নওরোজির মত জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ইংরেজ আমলে দেশের এবং দেশবাসীর হতশ্রী অবস্থাটা তুলে ধরার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু খরচের হিসাব তুলে ধরেন। ১৮৮১ সালে লর্ড ক্রামার একটা সরকারি হিসাব প্রকাশ করেন যাতে বলা হয় যে তখন ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ২৭ টাকা। সংখ্যাতাত্ত্বিক অ্যাটকিসসন্ এর হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৯.৫ টাকা। দাদাভাই নওরোজি দেখান যে ১৮৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৩৪০ কোটি টাকা আর মাথাপিছু আয় ছিল ২০ টাকা। তবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত ত্রুটি বা সঠিক তথ্য সংগ্রহের বাস্তব অসুবিধা থাকায় উপরোক্ত তথ্যগুলো তেমন গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন।

জাতীয় আয় সম্পর্কে দাদাভাই নওরোজির হিসাব কেবল মাথাপিছু আয়ের ওপর আলোকপাত করে না। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের পুষ্টির দিকটির ওপরও গুরুত্ব দেন। বর্তমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য পরিমাপেও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে দাদাভাই তার ব্যাখ্যায় ভৌতিক উৎপাদনকে আয়ের প্রকৃত উৎস বলে মনে করতেন। ব্যবসা, পরিবহন, প্রশাসন প্রভৃতিকে এর মধ্যে ধরেননি।

শিবসুব্রামনিয়নের সংগ্রহ করা তথ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে বিভিন্ন গবেষণার কাজ হয়। প্রতি পাঁচবছরের গড় আয়ের ভিত্তিতে নিচের সারণিটি পাওয়া যায় যা থেকে জাতীয় আয় সম্পর্কে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে পারি ঃ

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয় (১৯০০-৪৭)

সময়কাল	গড় বার্ষিক জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ৫ বছরের গড় (টাকায়)
১৯০০/০১-১৯০৪/০৫	১৫০২	৫২.২
১৯০৫/০৬-১৯০৯/১০	১৫৭৫	৫৩.০
১৯১০/১১-১৯১৪/১৫	১৭৩০	৫৬.৫
১৯১৫/১৬-১৯১৯/২০	১৭৬০	৫৭.৩
১৯২০/২১-১৯২৪/২৫	১৮৪৪	৫৯.১
১৯২৫/২৬-১৯২৯/৩০	২০৪৪	৬২.৭
১৯৩০/৩১-১৯৩৪/৩৫	২১৩১	৬১.৬
১৯৩৫/৩৬-১৯৩৯/৪০	২২৫০	৬০.৬
১৯৪০/৪১-১৯৪৪/৪৫	২৪৪১	৫৬.৬
১৯৪২/৪৩-১৯৪৬/৪৭	২৫২৪	৬২.৩

উৎস ঃ এস. শিবসুব্রামনিয়ন National income of India, 1900-01 to 1947

নির্মল কুমার চন্দ্র long term stagnation in the Indian Economy 1900-75, Economic and Political Weekly, Vol-22 Annual number, 1982

ওপরের সারণি অনুসরণ করে বলা যায় যে, ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প হারে হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২০-২১ সাল থেকে মাথাপিছু আয় কখনও খুব কম হারে বেড়েছে আবার কখনও কমেছে। অর্থাৎ সামগ্রিক সময়কাল ধরে উন্নয়নের হার খুবই মন্থর। আমরা দেখেছি ১৯২০-২১ সালে জন্মহার তেমন বাড়েনি। এরই প্রতিফলন ঘটেছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতায়। আবার ১৯২১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। এটাই প্রতিফলিত হচ্ছে খুব মন্থর গতিতে; কখনও কখনও বৃদ্ধি এবং কখনও কখনও হ্রাসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখে ২০-২২ বছরে দীর্ঘকালীন মাথাপিছু আয় ৬২ টাকার কাছাকাছি স্থির থেকেছে। অর্থাৎ অর্থনীতিও স্থবিরতা লাভ করেছে। বিভিন্ন বছরের আয়কে তুলনাযোগ্য করার জন্য উপরোক্ত পরিসংখ্যান পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৩৮-৩৯ কে ভিত্তি বছর ধরে।

১৯৪৮-এ জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় আয়ের অবদানটি ব্যাখ্যা করা। প্রধানত কৃষি, শিল্প ও সেবাবিভাগে অর্থনীতিকে ভাগ করলে দেখা যায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং সেবাবিভাগের অবদান বাড়ে কিন্তু কৃষির অবদান কমে। উপরোক্ত তিনটি বিভাগের মধ্যেকার আন্তসম্পর্ককে অর্থনীতির কাঠামো বলা হয়। শিল্প ও সেবাবিভাগের অবদান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। উন্নত অবস্থায় একটা কৃষি অর্থনীতিকে শিল্প অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। এরই সঙ্গে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জ্ঞাননির্ভর উৎপাদনে পরিণত হয়। অর্থাৎ কৃষি নিজেই শিল্পে রূপান্তরিত হয়।

যা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায় যে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতে কৃষির অবদান বাড়েনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান মোটামুটি ১০০০ কোটি টাকার নিচে স্থির ছিল। পরের পঁচিশ বছরে কখনও ১০০০ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেছে, কখনও কমেছে। প্রকৃতি নির্ভর থাকায় কৃষি অবদানের স্বল্পকালীন ওঠানামা দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘকালে একটা স্থবিরতার লক্ষণ দেখা যায়, ১৯৩৫ সালের পর কৃষির অবদান একশ কোটি টাকার মত ছিল। জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান খুব স্বল্পহারে হলেও বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শিল্পবিভাগের অবদান ছিল ২০০ কোটি টাকা। বিশের দশকের পর তা বেড়ে হয় তিনশ কোটি টাকা। চল্লিশের দশকে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান চারশ কোটি টাকার বেশি হয়।

শতাংশ হিসেবে ১৯০০-৪৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে কৃষির আয় বৃদ্ধির হার ছিল ০.৪২ শতাংশের শিল্পক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির হার ১.৮২ শতাংশ এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে ছিল ২.২২ শতাংশ। কার্যত এই সময়কালে জাতীয় আয়ে যে বৃদ্ধি ঘটে-তা প্রধানত তৃতীয় বিভাগের বৃদ্ধির ফল। আমরা নিচের সারণিতে ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের অবদানের ওপর আলোকপাত করতে পারিঃ

জাতীয় আয়ে বিভিন্ন বিভাগের অবদান (শতাংশ হিসাবে)

সময়কাল	প্রাথমিক বিভাগ	মাধ্যমিক বিভাগ	সেবাবিভাগ
১৯০০/০১-১৯০৪/০৫	৬৩.৬	১২.৭	২৩.৭
১৯০৫/০৬-১৯০৯/১০	৬১.৭	১৩.৫	২৪.৮
১৯১০/১১-১৯১৪/১৫	৬০.১	১৩.৯	২৬.০
১৯১৫/১৬-১৯১৯/২০	৫৯.৬	১৩.৭	২৬.৭
১৯২০/২১-১৯২৪/২৫	৫৭.৪	১৩.৪	২৯.২
১৯২৫/২৬-১৯২৯/৩০	৫২.১	১৪.৯	৩৩.০
১৯৩০/৩১-১৯৩৪/৩৫	৫১.৪	১৫.৮	৩২.৮
১৯৩৫/৩৬-১৯৩৯/৪০	৪৯.৯	১৬.৪	৩৩.৭
১৯৪০/৪১-১৯৪৪/৪৫	৪৭.৬	১৬.৭	৩৫.৭

ওপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান খুব স্বল্পহারে কমেছে। শিল্পের অবদানও খুব সামান্য হারে বেড়েছে। তুলনামূলকভাবে তৃতীয় বিভাগ বা সেবা বিভাগের অবদান বেশি হারে বাড়ে। দাদাভাই নওরোজির মত অনেকেই মনে করেন যে তৃতীয় বা সেবা বিভাগে ভৌতদ্রব্য উৎপাদিত হয় না। বরং এক্ষেত্রে হস্তান্তর আয় ঘটে। সুতরাং একে জাতীয় আয় বলে মনে করা যায় না। ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগে লেনদেন বেড়ে যায়। এটাই প্রভাবিত হয় এই বিভাগীয় আয়ে।

ওপরের আলোচনায় আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয় হ্রাসবৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের অবদানের কথা বললাম। মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব। এই গড় হিসাব জাতীয় আয়ের বন্টনের দিকটা উপেক্ষা করে। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বন্টনের ওপরও নির্ভর করে যার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

৪.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রণেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিশার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agriculture at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism-the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধরনটি আলোচনা কর।

(২) ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় আয়ের বন্টনের ধরনটির সাহায্যে দেখাও ভারত কেন দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

SOCIETY IN COLONIAL INDIA

ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)

একক - ১

সমাজ গঠন ঃ উপজাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়

উপএকক - ২

Colonial Intervention and Social Change

গঠন (Structure) ঃ

৪.৪.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৪.১.২.১ ঃ ভূমিকা -- ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও সমাজ পরিবর্তন

৪.৪.১.২.২ ঃ সমাজ সংস্কার

৪.৪.১.২.৩ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৪.৪.১.২.৪ ঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

৪.৪.১.২.৫ ঃ বর্ণ আন্দোলন

৪.৪.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৪.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৪.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন।

২। সমাজ সংস্কার আন্দোলন

৩। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, ধারা ও বৈশিষ্ট্য

৪। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

৫। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৪.৪.১.২.১ ঃ ভূমিকা – ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও সমাজ পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করে। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার যে শুধুমাত্র পরবর্তীকালের ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, ভারতীয় সমাজ কাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতিকেও তা মৌলিক ভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই সামগ্রিক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকে আমরা 'ঔপনিবেশিকরণ' বা colonization বলে অভিহিত করতে পারি। ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আধুনিক (ইংরাজী) শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদী ছাপ ফেলে। সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান দিকসমূহ যা ব্যাখ্যা না করলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝা যাবে না। এই আলোচনায় আমাদের মূল লক্ষ্য এই জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুধাবন করা। চারটি পৃথক বিষয়--সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ এবং বর্ণ আন্দোলন — সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর প্রতিক্রিয়ার নিরিখে।

৪.৪.১.২.২ ঃ সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। বস্তুত এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল বহুলাংশে আধুনিক চেতনার প্রকাশ। আবার একই সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল অতীত ঐতিহ্যের যুগোপযোগী পুনর্চর্চা ও পুনরুদ্ধার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন

তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।" (চারিত্রপূজা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মূল্যায়ন থেকে স্পষ্ট ইংরাজী শিক্ষা ও প্রাচীন দেশজ ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারের সুষম মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন ও পরবর্তীকালের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা সচেতন ছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী (orientalist) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব তারা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সেডের (Edward Said) এই উক্তি মানা যায় না। এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামমোহন প্রমুখকে প্রাচ্যবাদীদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। বারাণসী, পুণা, মাদ্রাজ, কেরল প্রমুখ স্থানে সংস্কৃত পঠনপাঠনের ধারা অব্যাহত ছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ঊনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ যে ভাবে শাস্ত্র চর্চা করতেন তা মধ্যযুগের শাস্ত্র চর্চা থেকে পৃথক ছিল। নিছক ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে রামমোহন প্রমুখরা শাস্ত্রচর্চা করেননি। তাঁরা ধ্রুপদী সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে সনাতন প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একদিকে চিরায়ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার যথাযথ আত্তীকরণ — এই দুই ধারার প্রতিফলন ঘটে ঊনিশ শতকের ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনে।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন বা Hindu Widows' Remarriage Act ঔপনিবেশিক সরকার প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এই আইন প্রণীত হলেও হিন্দু সামাজিক বাস্তবতার কারণে তা খুব বেশী জনপ্রিয় হয়নি। লুসি ক্যারোল (Lucy Carroll)-এর মতে এই আইন মূলতঃ রক্ষণশীল চরিত্রের ; কারণ এই আইনে ঠিক হয় যে পুনর্বিবাহকারী বিধবা নারী পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। অশোক সেন এই ব্যর্থতাকে অনিবার্য বলে অভিহিত করেছেন, কারণ বিধবা বিবাহের জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক সম্মতির, যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার পূর্বে ভূপালের শুবজি বাপু (Subaji Bapu) এবং পুনার একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে সওয়াল করেন। ১৮৩৫ সালের আগস্ট 'The Bombay Darpan' নামক সাপ্তাহিক কাগজে শুবজি বাপুর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "Bapu saw widow marriage as a part of the general emancipation of women and hence emphasized the importance of female education." (K.N. Panikkar : "Culture and Ideology" Hegemony.)

বিধবা বিবাহ আইনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পুরুষের বহু বিবাহ ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেন। সমকালীন নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (নাট্যকার ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন-র রচনা) নাটকে বর্ণহিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করে। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালে প্রগতিশীল হিন্দুদের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকার যাতে বহুবিবাহ প্রথা রদ করে। সমাজের রক্ষণশীল অংশও সরকারের কাছে এই আইন প্রণয়ন না করার জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে

পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। যে ভিক্টোরিয়া উদারনীতিবাদী আদর্শের প্রভাবে ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষিত হিন্দু ভারতীয়দের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহ দিত, তা ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে যায় এবং উদীয়মান রক্ষণশীল মতাদর্শ ১৮৫৭-৫৮-এর পর থেকে ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতার প্রতি ব্রিটিশ নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Thomas R. Metcalf এই ঘটনাকে 'Complete non-interference in the traditional structure of Indian society' বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের এই নীতি পরিবর্তন ও মতাদর্শগত রূপান্তর সত্ত্বেও ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন বা Age of Consent Act সরকার প্রণয়ন করেন। এর ফলে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় দশ। ১৮৯১ সালে মহিলাদের ন্যূনতম বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। এই সময় কিন্তু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে তীব্র প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। এই প্রতিবাদের পিছনে কাজ করেছিল এক ধরনের রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী চেতনা যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক মনে করতেন ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি ও রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের নেই। চিরাচরিত ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম-বিধি পরিবর্তন করার অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই রয়েছে। Charles Heimsath দেখিয়েছেন, সরকার শোষিত সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছিল জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকরণ। এর পিছনে কাজ করছিল ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার মনোভাব। এই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিঃসন্দেহে বৈধতা দান করেছিল। এর ফলে সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কার নীতির বিরোধিতার মধ্যে থেকে জন্ম নেয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন। ঊনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্ম নেওয়া হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন এক চড়া ধর্মীয় অনুষঙ্গের জন্ম দেয় যা ছিল সমকালীন জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ভীরাসালিঙ্গম পান্টুলু (Veerasalingam Pantulu) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ভীরাসালিঙ্গম ‘Rajamundri Social Reform Association’ গঠন করেন। ১৮৮১ সালে প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানটি হয় রাজামুন্দ্রী শহরে। এরপর কে.এন. নটরাজন ১৮৯০ সালে গঠন করেন Indian Social Reformer। ১৮৯১ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে আরো গতি সঞ্চার করার জন্য রাজামুন্দ্রী শহরে সংস্কারপন্থীরা ‘Widow Remarriage Association’ গঠন করেন। পরের বছর মাদ্রাজে ‘Hindu Social Reform Association’ গঠন করা হয়। এই সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন যে খুব প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে তা বলা যাবে না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নির্দিষ্ট বা সংঘটিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধির বিরুদ্ধে এই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্য না পাওয়াই স্বাভাবিক।

বিপান চন্দ্রের মতন বাম-জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুধুমাত্র সাময়িক সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা সঠিক নয়। বস্তুত এই আন্দোলনগুলি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতার প্রাথমিক সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত ভিত্তি। একদিকে দেশজ ঐতিহ্যের শ্রদ্ধান্বিত পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল — এই দুই এর মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের আত্মপরিচয়ের ভাষা তৈরী করছিলেন। ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “It was not just an attempt at religious revival

and glorification, but an intellectual inquiry into the part, embracing almost every field a social, cultural and political endeavour.”

ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে) ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক ভিন্ন মাত্রার ধর্মীয় আন্দোলন বাংলায় শুরু হয় যাকে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছিল না। অর্থাৎ সরকারী আনুকূল্যে কয়েকটি ধর্মীয় বিধি বা নিয়ম পরিবর্তনের কথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কল্পনা করেননি। তাঁদের দুজনের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক উদার ও মহান — তা হল মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের পূর্ণ-বিকাশ ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই আন্দোলনের লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় সর্বজনীন, ফলতঃ বেদান্ত ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। রামকৃষ্ণ কথিত ‘যত মত তত পথ’ ছিল এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি। এই চিন্তা নিছক অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর সচেতন প্রয়াস নয়, বরং মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার মৌলিক প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ, আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধির প্রয়াসকে সাধকের ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বৃহত্তর সাংগঠনিক রূপদান করা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য। এই সাংগঠনিক প্রচেষ্টারই প্রকাশ ছিল রামকৃষ্ণ মিশন।

শুধু মাত্র শুষ্ক তর্ক আলোচনা নয়, বা ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভর করে আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার করা নয় — বরং প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তঃস্থ ব্রহ্মের (বা মনুষ্যত্বের) পূর্ণ-বিকাশের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য। সর্বোপরি এই যাত্রা কোন একক নিঃসঙ্গ পথিকের অনির্দিষ্ট যাত্রা নয় ; বরং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সুসংগঠিত ও সমষ্টিবদ্ধ, ভাবগত ও চৈতন্যগত আন্দোলন যা বস্তুত এক অপূর্ব মানবিক অনুভূতি, বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। এই অর্থে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের চেনা ছকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্তি প্রসূত আধুনিকতার প্রভাবশালী কাঠামোর মাধ্যমেও এই আন্দোলনকে চেনা যাবে না। এই আন্দোলন মুখ্যত বৈদান্তিক চেতনার বিশুদ্ধ প্রকাশ ও প্রসার।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেও নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্কারপন্থী মনোভাব পুরাতনপন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ১৮৬২ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হওয়ার পর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে আরো ব্যাপকতর করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সংস্কার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ আধুনিকতা প্রসূত, যেমন জাতিভেদ বর্জন, বিধবা-বিবাহ প্রচার, অসবর্ণ বিবাহ উদ্যোগ, পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। Meredith Borthwick-এর মতে, কেশব ও তার অনুগামীরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের চেয়ে সমাজ সংস্কারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও তার অনুগামীরা সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে সনাতন হিন্দু সমাজের বিধিগুলিকে আঘাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। উপবীত ধারনের ন্যায্যতাকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পুরাতনপন্থীদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৮৬৬ সালে কেশব ও তাঁর অনুগামীরা ‘ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ‘আদি ব্রাহ্মসমাজে’ সংগঠিত হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন এই জাতীয় বিভাজন প্রক্রিয়া শিক্ষিত ভারতীয়দের আত্মপরিচয় খোঁজার প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে উপস্থিত করে। এই দ্বন্দ্ব যতখানি না আদর্শগত, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মপরিচয়ের সংকট। বরং একটু অন্যভাবে বললে কোন

জাতীয় আদর্শগত প্রশ্নের অনুশীলন করলে এই আত্মপরিচয়ের সংকট এড়ানো যেত তা ব্রাহ্ম আন্দোলনে সুস্পষ্ট আকার নেয়নি।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে যান। তার প্রভাবে ১৮৬৭ সালে বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজের ভিত্তি ছিল একেশ্বরবাদ, জাতিভেদ বিরোধিতা ও সমাজসংস্কার। এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন আত্মারাম পান্ডুরঙ। সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। প্রার্থনা সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়রা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার প্রার্থনা সমাজ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজের মতন অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ চায়নি। সংস্কার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও রানাডে প্রমুখরা ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিল। সামাজিক কাঠামোকে বৈপ্লবিক ভাবে পাল্টানোর কোন পদক্ষেপ প্রার্থনা সমাজ নিতে চায়নি। প্রার্থনা সমাজের শাখা সুরাট, আহমেদাবাদ, করাচী, সাতারা, কোলাপুর প্রমুখ শহরে খোলা হয়।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। উপনিষদে যে একেশ্বরবাদের ধারণা পাওয়া যায় তার উৎস বেদ বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দু ধর্মের পূর্ণ শোধন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথাগুলিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন বেদের ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ শুধু যে ম্যাকসমূলারকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি তা নয়, তিনি সায়নভাষ্যকেও বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি। ঋকবেদ বাদ দিয়ে আর সবই তার কাছে বর্জনীয়, এমনকি বেদান্তও। শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে অহিন্দুদের হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার প্রয়াস শুরু হয়। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে তীব্র প্রচার শুরু করেন। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি জনমত সংগঠিত করার চেষ্টায় ব্রতী হন। দয়ানন্দের ঋকবেদে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস সাধারণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অথবা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। বস্তুত পূর্ব ভারতে দয়ানন্দের প্রভাব অল্পই ছিল। কিন্তু উত্তর ভারত বিশেষত পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যসমাজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ক্ষত্রি, অরোরা, আগরওয়াল প্রমুখ চিরাচরিত বণিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দয়ানন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। লালা হনস রাজ, লালা লাজপত রায়, লালা মুনসীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) প্রমুখ অগ্রণী আর্যসমাজীরা এই বণিক গোষ্ঠী বা বর্ণের সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তত চারটি অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলগুলি হল পেশওয়ার, রওয়ালপিন্ডি, মূলতান, রোহটক-হিসার এবং জলন্ধর। মুখ্যতঃ এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি আর্যসমাজ ও দয়ানন্দের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৯০০ খ্রীঃ থেকে দয়ানন্দ শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন যাকে সুমিত সরকার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বা 'Sanskritizing Process' বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৯১ তে আর্যসমাজের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ ; ১৯০১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২,০০০।

বিপানচন্দ্রের মতন ঐতিহাসিক মনে করেন হিন্দু সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্যকরণের (Westernization) চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী ছিলেন আধুনিকীকরণে (modernization)। তিনি স্পষ্টতই মন্তব্য করেছেন, "...the reformers were aiming at modernization rather than westernization. A blind initiation of western cultural norms was never an integral part of reform"। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ সংস্কারকদের লক্ষ্য ছিল না। সুমিত সরকার পক্ষান্তরে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু পরিচয় (Hindu Identity) খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধারণা অনেক বেশী আগ্রাসী ছিল। তিনি মন্তব্য করেছেন এই পার্থক্যটি 'was of degree rather than kind' । উপসংহারে আমরা এইটুকু সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে যে ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একাধিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দেশজ সংস্কৃতির

শিকড় খুঁজে পেতে তা সদর্থক ভূমিকা পালন করে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে, "The Indian modernisation project, therefore, always felt a compulsion to construct a modernity that would be located within Indian cultural space "। এই শিকড় সন্ধানী আত্মপরিচয় পর্ব না থাকলে পরবর্তীকালের ভারতীয় জাতিয়তাবাদের বিকাশ আদৌ কতখানি হত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৪.৪.১.২.৩ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে আধুনিক (বা পাশ্চাত্য) শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ১৮১৩ সালে চার্টার আইনের মাধ্যমে। এই আইনে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা সরকার ঘোষণা করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এরপর সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগেই শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয়। ১৮৩৫ সালে General Committee of Public Instruction' এর সভাপতি টমাস বাবিংটন মেকলের প্রচেষ্টায় সরকার ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়। উইলিয়াম অ্যাডাম ও চার্লস উড উভয়েরই শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কিন্তু দেশীয় ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের কথাও এই প্রতিবেদনগুলিতে বলা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা মনে করত যে ভারতীয় উচ্চবর্গীয় শ্রেণীগুলির জন্য যেমন বিশিষ্ট ধরনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ ভারতীয়দের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সাম্রাজ্যের স্বার্থেই শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিমাণে গণপ্রসার উচিত বলে সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী মনে করতো।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার ১৮৫৭ সালে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করা হয়। Charles Wood-এর প্রতিবেদনে যে তিনটি মূল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় তার একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। অন্য দুটি ছিল একটি পৃথক শিক্ষা দপ্তর স্থাপন করা ও সরকারী গ্রান্ট-ইন-এইড এর ব্যবস্থা করা। ১৮৫৮ সালে ভারতীয় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ার পর ইংল্যান্ডের ভারত সচিব (Secretary of State for India) উডের শিক্ষা প্রতিবেদনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধির যে লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থাকা উচিত নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই মান বা উৎকর্ষতা কিন্তু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অচিরেই পরীক্ষা নেওয়ার যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। নারী, তপশীলি ও উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার কাজও চূড়ান্ত অবহেলিত হয়। কলেজ শিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার মান ছিল নিম্নগামী। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। লর্ড রিপন এই প্রেক্ষাপটে স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন (১৮৮২ খ্রীঃ)। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে, "The University degree has become an accepted object of ambition, a passport to distinction in public services and in the learned professions."। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। বিদ্যালয় স্তরের এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গ্রহণ করতো, যাদের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে অতি সামান্য ধারণাই ছিল। এই বাস্তব ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) ইংরাজী নির্ভর উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষা নির্ভর জনশিক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা দূর করার চেষ্টা করে। কমিশনের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, "It is desirable that the whole population

of India should be literate." কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য এই বিশেষ বরাদ্দ খরচ করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সুপারিশগুলি খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। যেমন বর্ণ নির্ভর ভারতীয় সমাজে নিম্ন বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো কঠিন ছিল। কারণ নিম্নবর্ণভুক্ত ছেলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণভুক্ত ছেলেদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো না। ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীও এই বৈষম্য দূর করতে খুব বেশী আগ্রহী ছিল না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "This exclusion happened with the active support of the colonial bureaucracy, succumbing in the name of practicality to the pressures of the conservative sections of the Indian elite, many of whom had by now become grass-roots level functionaries of the empire. British education policy thus endorsed and supported differentiation in Indian society." B.T. McCully-র হিসাব অনুযায়ী ১৮৮৫ সালে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়র সংখ্যা ছিল ৫৫,০০০। ১৮৮১-৮২ সালে যেখানে মোট ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল ১৯৫ মিলিয়ন, সেখানে মাত্র ২ মিলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। শিক্ষার এই অসম বিকাশ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

ঊনিশ শতকে প্রবর্তিত ও প্রসারিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন প্রায়োগিক বিদ্যার জনপ্রিয়তা না পাওয়া। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। প্রচলিত শিক্ষা বা বিদ্যাচর্চার অভ্যাস থেকে বাঙালী বা ভারতীয়রা অন্য ধরনের কোন অনুশীলন করতে চায়নি। আবার এটিও সত্য যে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রাই কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি ও মতাদর্শকে প্রশ্ন করেছে। শিক্ষিত ভারতীয়রা ক্রমশঃ এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি, সাম্য বা আইনের শাসনের সাদৃশ্য সামান্যই। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে ধরনের আধিপত্যমূলক প্রক্রিয়ার সহায়ক রূপে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা বাস্তবে খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। সুতরাং ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিবর্তনের মধ্যে নানা টানাপোড়েন ছিল। ইংল্যান্ডে শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের নৈতিকতার শিক্ষাও দেওয়া হত ভারতে তা কখনই সম্ভব ছিল না। বরং শিক্ষিত ভারতীয়রাই শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেন হয়ে ওঠে যা দীর্ঘমেয়াদীভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

৪.৪.১.২.৪ ঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

ঊনিশ শতকের বিশেষত ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস-এর অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বা মুঘল আমলে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অর্থে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণ অর্থে ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়া থেকে জাত। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হল বি.বি. মিশ্রর 'The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times'। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে যেমন ক্রিস্টোফার বেইলি মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগেই অষ্টাদশ শতকে কৃষি সমাজ ও উচ্চবর্গীয় এলিটদের মধ্যে মধ্যবর্তী সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এরা সরকারী আমলা শ্রেণীর ভদ্রলোক বা বণিক গোষ্ঠী হতে পারে যারা পরবর্তীকালের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রসারণের সুযোগে নিজেদের শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত অবস্থান সুদৃঢ় করে। ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক পেশার পূর্ণ সুবিধা এই নবউত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম আত্মসাৎ করে।

আবার শুধুমাত্র সরকারী চাকুরী বা মুৎসুদ্দি/বেনিয়াবৃত্তি নয়, পূর্ব ভারতে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সুযোগে ভূমির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্ক দৃঢ় হয়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভূমি বন্দোবস্ত ও ঔপনিবেশিক চাকুরী এই দুই-এর সুবিধা মধ্যবিত্তরা পায়, নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান সবল করে এবং ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে এক ধরনের বৈধতা দান করে। J.R. McLane-এর হিসেব থেকে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৮৮০-এর দশকের শুরুতে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা পৌঁছয় ৫০৫,০০০ তে। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের প্রসারও সমভাবে ঘটতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও ঔপনিবেশিকতার কল্যাণে একাধিক নতুন বৃত্তির জন্ম হয় যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে ছিল না। যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবসা দ্রুত জনপ্রিয় হয়। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, ১৮৫৮-৮১ এর মধ্যে বাংলায় ১৭১২ জন স্নাতকের মধ্যে ৪৬৬ জন আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা প্রসারের মধ্যেও কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ছিল। ১৮৮৩-৮৪ সালে বার্ষিক আয় ২০০ টাকার কম এমন পরিবার থেকে আগত ছাত্রের সংখ্যা বাংলাদেশের কলেজের ৯ শতাংশেরও কম। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা সমাজের নিচের তলার শ্রেণীগুলিকে খুব অল্পই স্পর্শ করেছিল। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ছাড়াও, আঞ্চলিক বৈষম্যও ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল কলকাতা, বোম্বে বা মাদ্রাজের মতন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে। ১৮৮৬-৮৭ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাদ্রাজে শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা ১৮,৩৯০, বাংলায় ১৬,৬৩৯, বোম্বেতে ৭,১৯৬ জন, সেখানে যুক্তপ্রদেশে ৩,২০০, পাঞ্জাবে ১৯৪৪, সেন্ট্রাল প্রভিন্সে ৬০৮ ও আসামে ২৭৪ জন। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষাও একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ও কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যও ছিল। হিন্দুরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ও মুসলিমরা পিছিয়ে পড়ে। এমনকি হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষরা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেননি। ১৮৮৩-৮৪ সালে বাংলায় কলেজ ছাত্রদের ৮৪.৭ শতাংশই আসত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মধ্যবিত্তদের সামাজিক গঠনে এই আর্থিক, ধর্মীয় বা বর্ণগত বৈষম্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেহারা আমরা দেখতে পাই তা প্রধানত ইংরাজী শিক্ষিত বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) শ্রেণীদের নিয়ে গঠিত ; নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ এই সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল না বললেই চলে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বরূপ সম্পর্কে এক ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্রিস্টোফার বেইলি ও ডেভিড ওয়াশব্রুকের মতন কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা। বেইলির মতে এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আইনজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিভোগীরা দেশীয় শেঠ, ব্যাঙ্কার, বণিক, জমিদার প্রভৃতি প্রভাবশালী শ্রেণীগুলির অনুগৃহীত। এই সম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক-অনুগৃহীতের সম্পর্ক মাত্র। ডেভিড ওয়াশব্রুক মাদ্রাজের ক্ষেত্রে ও ক্রিস্টিন ডবিন বোম্বাই-এর ক্ষেত্রে এই একই ধরনের পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এই জাতীয় আদর্শ বর্জিত স্বার্থ-নির্ভর নেমিয়ারিস্ট ইতিহাস ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া কঠিন। তপন রায়চৌধুরী এই জাতীয় ব্যাখ্যাকে 'animal politics' এর সাথে তুলনা করেছেন। স্বদেশ প্রেমের কোন উপাদান বা জাতীয়তাবাদের কোন মহৎ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় কেম্ব্রিজগোষ্ঠীর কাছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা নিতান্তই অনুজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে। নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরাও মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে সন্দিহান। তাদের লেখায় মধ্যবিত্তরা দেশজ এলিটদের অংশ এবং এলিট বা সাবল্টার্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্বই ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক চালিকাশক্তি। এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। এর ফলে এটা ভোলা সহজ হয় যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ

হয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ-মেয়াদী সাংস্কৃতিক-মতাদর্শগত (প্রাথমিক পর্যায়ে) ও রাজনৈতিক (উচ্চতর পর্যায়ে) সংগ্রাম গড়ে তোলে। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী তার গর্বিত গঠন সত্ত্বেও একদিকে যেমন তার আত্মসত্ত্বা খুঁজে পাওয়ার জন্য ছেদহীন ভাবে সচেষ্ট ছিল, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে যাকে আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ধাপ বলে অভিহিত করতে পারি।

স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও পড়েছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এটি ছিল মুখ্যতঃ জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। প্রথম সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব। জন ম্যাকসুয়ারের হিসেব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮৫ ভাগ ধনী, ৬৮ ভাগ হয় জমিদার নয় ব্যবসায়ী। বর্ণগত ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল পঞ্চাশ টাকা যা দেওয়া মধ্যবিত্তদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে এবং নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান লীগ ও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যবিত্তশ্রেণী নির্ভরতা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান লীগের কর্মকর্তাদের ৬৮ শতাংশ মধ্যবিত্ত, ৩৮ শতাংশ আইনজীবি, ১৪ শতাংশ ছোট বা মাঝারি জমিদার, শিক্ষক, কর্মচারী প্রমুখ। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, প্রথমতঃ এর সদস্যরা অনেকেই পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সদস্যরা অনেকেই গোঁড়া হিন্দু নয়, খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম ঘেঁষা। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ইন্ডিয়ান লীগের তুলনায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অনেক বেশী মধ্যবিত্ত নির্ভর। নেতৃত্ব স্থানীয়দের শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল শিক্ষক ও শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল আইনজীবী। ধর্মীয় ভাবে ব্রাহ্মদের প্রভাব অনেক বেশী ছিল। আবার শিক্ষাগত বিচারে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, "...শিক্ষা, বৃত্তি, মানসিকতা এঁদের মধ্যে অনেক বেশী সংহতি দিয়েছিল।"

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সম্ভবত প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন যারা কৃষকদের সম্পর্কে সংগঠিত মতামত জানায়। ১৮৮৪ সালে প্রজাসত্ত্ব আইনের খসড়ার বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদ জানায়। কলকাতার বাইরেও এরা সাংগঠনিক বিস্তার লাভ করে। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৫-এর মধ্যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখা দশ থেকে আশীতে দাঁড়ায়। লর্ড লীটনের আমলে নানা দমনমূলক নীতি যেমন অস্ত্র আইন, দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রভৃতির কারণে ভারতীয় রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

বোম্বাই শহরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংগঠন ছিল দাদাভাই নৌরজি প্রতিষ্ঠিত (১৮৬৬) ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৬৯ সালে বোম্বাই শহরে এর শাখা খোলা হয়। এই সময়ে বোম্বাই শহরের প্রভাবশালী সংগঠন ছিল বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন। বোম্বাই শহরের প্রভাবশালী বণিক ও শেঠিয়ারা এর নেতৃত্বে ছিল। অচিরেই পৌর কর প্রভৃতি নিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে শেঠিয়াদের বিরোধ শুরু হয়। বোম্বাই পৌরসভাতেও শেঠিয়াদের প্রাধান্য ছিল। এরা সম্পত্তি কর দিতে চাইত না। অন্তত ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে ভোটাধিকার না থাকায় বণিক-শেঠিয়া প্রমুখ সম্পত্তিবান শ্রেণী, নিজ শ্রেণী স্বার্থ অনুসারে পৌর নীতি রচনা করত। বোম্বাই শহরের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন শ্রেণী স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় বোম্বে প্রেসিডেন্সী ইউনিয়ন। অনিল শীল বোম্বে প্রেসিডেন্সী ইউনিয়নের কার্যকলাপে খুব বেশী সক্রিয়তা দেখতে পাননি। এমনকি বোম্বাই শহরের বাইরে এদের কোন শাখা স্থাপনের নজিরও দেখতে পাওয়া যায় না। তুলনামূলকভাবে পুণাকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের

রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশ অনেক তীব্র ছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন ১৮৭৯ সালেই রিচার্ড টেম্পল পুণার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তার সংগঠিত প্রকাশ পুণা শহরে যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তা মহারাষ্ট্রে বিরল। এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পুণার ঐতিহ্যবাহী চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। বাংলায় যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন, মহারাষ্ট্রে তা করে চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। ইংরাজী শিক্ষার জোরে সরকারী চাকুরীর সিংহভাগ এরা করায়ত্ত করে। সরকারী চাকুরী ছাড়াও আইন, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশাতেও চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েন। পেশওয়াদের প্রাক-ঔপনিবেশিক মারাঠা স্বাদেশিকতার প্রভাবও উনিশ শতকের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের উপরে পড়েছিল।

একদিকে দেশজ স্বাদেশিকতা, অন্যদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব - এই দুই এর মধ্য থেকে জন্ম নেয় পুণা সার্বজনিক সভা (১৮৬৭)। পুণা সার্বজনিক সভার নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নাটু ভ্রাতৃদ্বয়। গোপালহরি দেশমুখ, জি.ভি. দোশী এবং সর্বোপরি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এই সভার কার্যকলাপের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একদিকে যেমন স্বাদেশিকতার প্রসার ঘটানো, অন্যদিকে তেমনি কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৭ এ মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে সভার সদস্যরা ত্রাণ কার্যে নামে। শুধু তাই নয়, কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে পুণা সার্বজনিক সভা তার শ্রেণী গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, স্বভাবতই যা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবাদে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ও নতুন ধরনের বৃত্তির ও চাকুরী সৃষ্টি হয়; এই প্রক্রিয়া থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গর্ভ থেকে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও এই উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুদৃঢ় দেশজ শিকড় ছিল। দেশের ঐতিহ্যকে এরা ভোলেননি। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক শাসন ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমালোচনা উপস্থিত করে। এই প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক ফল ছিল ১৮৮৫-র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রতিষ্ঠা।

৪.৪.১.২.৫ ঃ বর্ণ আন্দোলন

ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটি একটি বর্ণ ভিত্তিক সমাজ। অর্থাৎ সমাজ একাধিক বর্ণে বিভক্ত ও সমাজে এক একটি বর্ণের অবস্থান এক-এক ধরনের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিরা উচ্চবর্ণের। উচ্চ বর্ণের মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে। এমনকি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে সমাজের অগ্রণী অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরাই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি আত্মসাৎ করে। নিম্নবর্ণের মানুষরা ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈষম্য পুরোপরি বিদ্যমান থাকে।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈষম্য সত্ত্বেও এই সমাজ কিন্তু অনড়, অচল, গতিহীন নয়। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক M.N. Srinivas লক্ষ্য করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের তলার শ্রেণীগুলি সমাজের উপর তলায় উঠে এসেছে এবং মধ্য বা উচ্চবর্ণের সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে M.N. Srinivas সংস্কৃতায়ন বা 'Sanskritization' বলে অভিহিত করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে তাকে নতুন জীবন দান করে। ১৯০১ সালের

জনগণনা থেকে ঠিক হয় ভারতীয় সমাজে প্রতিটি বর্ণের অবস্থানকে লিপিবদ্ধ করা হবে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতে নানা ধরনের বর্ণ-ভিত্তিক সংগঠন বা caste association গঠিত হতে শুরু হয়। এর থেকে বোঝা যায় বর্ণ সংহতি নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এই উদীয়মান বর্ণ সংগঠনগুলির লক্ষ্য ছিল তাদের বর্ণের মানুষদের জন্য সরকারী চাকুরী, শিক্ষা, নির্বাচনী সংস্কার প্রভৃতি আদায় করা। শিক্ষা, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য সংরক্ষণ চালু করার প্রয়াস এই প্রক্রিয়া থেকে জাত। নিম্নশ্রেণীর মানুষরা অনুধাবন করেছিল সংরক্ষণ চালু না হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

১৮৭৩ সালে মহারাষ্ট্রে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন জটিরাও ফুলে। গঠিত হয় সত্যশোধক সমাজ (১৮৭৩)। ফুলে মনে করতেন ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণেই শুদ্র প্রমুখদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই। সুতরাং শুদ্রদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র ব্রাহ্মণবাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। জটিরাও ফুলে প্রথমে পুণা সার্বজনিক সভা ও পরে কংগ্রেস বয়কট করার কথা বলেন। নিম্নবর্ণের কৃষকদের সঙ্গেও তাঁর আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। Gail Omvedt এর গবেষণা থেকে দেখা যায় সত্যশোধক আন্দোলনের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল। একদিকে ছিল উচ্চবর্ণ নির্ভর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যদিকে ছিল গণনির্ভর র‍্যাডিকালিজম। এই আন্দোলনে একদিকে ছিল মারাঠাদের জন্য 'ক্ষত্রিয়ত্ব' খুঁজে বার করা, কোলাপুরের মহারাজার উপর নির্ভরশীলতা এবং ১৯১৯ সালের পর থেকে কংগ্রেস বিরোধিতা। এইগুলি সবই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ। অন্যদিকে ছিল গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে বর্ণ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, ইংরাজীর পরিবর্তে মারাঠা ভাষার ব্যবহার এবং উচ্চবর্ণের সুবিধা আদায় করার থেকে অনেক বেশী বর্ণ ব্যবস্থাকেই আক্রমণ করা। এই দ্বিতীয় ধারাটি ছিল অনেক বেশী Popular বা গণচরিত্রের। এমনকি ১৯১৯-২১ পর্যন্ত সাতারাতে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তার পিছনেও নিম্নবর্গীয় বর্ণচেতনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের গণভিত্তি প্রসারের ক্ষেত্রে এই নিম্নবর্গীয় আন্দোলন সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে ভেল্লা ও দ্রাবিড় আত্মপরিচয়কে কেন্দ্র করে নিম্নবর্ণের মানুষরা সংঘবদ্ধ হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ব্রাহ্মণরা ছিল জনসংখ্যার ৩.২ শতাংশ, অথচ ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা স্নাতক হন তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিল ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে তামিল ভেল্লা, তেলেগু রেড্ডি ও কাম্মা ও মালয়লী নায়াররা। শিক্ষার উপর আধিপত্য থাকার সুবাদে সরকারী চাকুরীর উপরও ব্রাহ্মণদের বিপুল আধিপত্য ছিল। সরকারী চাকুরীর ৪২ শতাংশ ছিল ব্রাহ্মণদের দখলে। তামিল ভেল্লা সম্প্রদায় এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও তামিল ভাষা। উত্তর ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির থেকে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও তামিল ভাষাকে পৃথক সত্ত্বা, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য প্রদান করার চেষ্টা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেন রেভারেন্ড Robert Caldwell ও G.E. Pope-এর মতন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করে আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব। সামগ্রিক ফল হিসেবে জন্ম নেয় তামিল ভাষা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্ফূরণ যাকে 'empowering discourse' বলে অভিহিত করা যায়। এর মূল লক্ষ্য ছিল একটি অ-ব্রাহ্মণ পরিচয় বা non-brahman identity গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে Justice Party গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯১৬ সালে অ-ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক দল রূপে Justice Party গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই দল কংগ্রেসকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে চিহ্নিত করে। রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং অব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক নির্বাচনী সংরক্ষণ দাবী করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা এই

দাবীকে সমর্থন করে ও ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারে এই দাবী মেনে নেওয়া হয়। ১৯২০ সালের নির্বাচনে Justice Party নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৯৮টি আসনের মধ্যে ৬৩টিতে জয় লাভ করে। এরপর থেকে Justice Party-র অবক্ষয় শুরু হয় কারণ নিম্নবর্গীয় মানুষের থেকে Justice Party ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে Justice Party-র পতন ঘটে, M.C. Rajah-এর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণের মানুষরা Justice Party পরিত্যাগ করে। গান্ধীবাদী আন্দোলন (আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো) দক্ষিণ ভারতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে।

দেশের অন্যান্য প্রান্তেও নিম্নবর্ণের মানুষরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। ১৮৭২ সাল থেকে বাংলায় নমঃশুদ্র আন্দোলন অন্যতম যা পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে social protest movement বা সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেছেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মাহার সম্প্রদায়ের ডঃ বি.আর. আমবেদকর নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবীতে বিপুল ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। আমবেদকর ১৯২৭ সালে ডিসেম্বরে মনুস্মৃতিকে আগুনে দাহ করেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে দলিতদের জন্য কোন উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। দলিতদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজনীতি ও শিক্ষায় দলিতদের বেশী করে অংশগ্রহণ। এটি বস্তুত নিছক ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দলিত আত্মসত্ত্বার পঠান্তর।

কংগ্রেসের পক্ষে এই ‘দলিত জাগরণ’কে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তাতে অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলা হয়। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনগত ভাবে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যদের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। এর ফলে দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরূপ থেকে যায়। ১৯৪৫ সালে আমবেদকর দলিতদের পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় (separate political identity) দাবী করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেসের যে গণভিত্তি ছিল দলিত সংগঠনগুলির তা ছিল না। এমনকি ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে জাতীয় কংগ্রেস দলিতদের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করে। আমবেদকরের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি একে 'crisis of representation' বলে অভিহিত করেন ও গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সংগঠনের অভাবে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্রুত স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে দলিত আন্দোলন ও নিম্নবর্ণের মানুষের চেতনার প্রকাশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পৃথক দলিত চেতনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামো ও চিন্তা-চেতনাকে উৎপাটিত করা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না। পৃথক দলিত চেতনা ও বর্ণ আন্দোলন জাতীয়তাবাদের অপূর্ণাঙ্গতার নিদর্শন মাত্র। আবার এটাও সত্যি যে দলিত চেতনা জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের মতন গণভিত্তি বা mass base অর্জন করতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় নেওয়ার চেষ্টা করতো। ইতিহাসের গতি কখনও যে একমুখী হয় না, বরং তা অজস্র চড়াই-উতরাই-এর মধ্য দিয়ে যায় তার নিদর্শন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বর্ণ আন্দোলনের টানাপোড়েন। বস্তুতঃ বর্ণ আন্দোলন জাতির বহুস্বরের সচেতন অস্তিত্বকে তুলে ধরে।

৪.৪.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Sumit Sarkar : Modern India 1885-1947.

২। Bipan Chandra : India's Struggle For Independence.

৩। Sekhar Bandyopadhyay : From Plassey to Partition.

৪। অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭।

৫। Suman Bagly : Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age.

৪.৪.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। তুমি কি মনে করো যে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ভারতের চিরাচরিত সমাজ পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল?

২। ঊনিশ শতকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৩। ঔপনিবেশিক শিক্ষা নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৪। ঊনিশ শতক ও বিংশ শতকের ভারতে বর্ণ আন্দোলনের বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল? বর্ণ আন্দোলন কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতাকে প্রকট করেছিল?

ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -6

National Movement in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

COR-206

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

<u>বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,</u>

শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২২ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন অংশ লেখকদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে, আবার কিছু অংশ বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকেও সংগৃহীত হয়েছে।
- সংগৃহীত অংশের মৌলিকত্ব নেই।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-206: Colonial India- 19th and 20th century- (Credit-4)

BLOCK 1: Indian experience of colonialism, an overview

Unit-1: Strategies of Colonial rule- growth of a new geo-political and administrative structure.

Unit-2: From company's management to the neo darbari mechanism of control.

BLOCK 2: Rural economy and society

Unit-3: Regional variation of agrarian relations, Debate on change and continuity.

Unit-4: Subinfeudation, commercialisation of agriculture and de-industrialization.

Unit-5: Trend in agricultural ecology and output, the stagnation debate and famines.

BLOCK 3: Urban Economy and Society: Expansion and Compression

Unit-6: Urban flow of capital and labour.

Unit-7: Features of new urbanisation- local and regional variations.

BLOCK 4: Trade and Industry

Unit-8: Changes in the commodity composition of trade-increasing monetisation.

Unit-9: The Railways-Rise of modern industry-Structural changes.

Unit-10: New industrial relations- Debate on the comprador status of Indian Capitalists.

BLOCK 5: Protestant India

Unit-11: Tribal and Peasant movements

Unit-12: Colonial policy of pacification and suppression, administrative categorisation of 'criminal tribes and castes'.

Unit-13: Demographic trends.

BLOCK 6: Colonial intervention and social change

Unit-14: 'Renaissance' beyond Bengal and Socio-religious reforms.

Unit-15: Indigenous and Western education.

Unit-16: Rise of the middle class with their press and Literature-tension between tradition and modernity,

<u>ACKNOWLEDGEMENT</u>

Unit-1: Strategies of Colonial rule-growth of a new geo-political and administrative structure.		
Unit-2: From company's management to the neo darbari mechanism of control.		
Unit-3: Regional variation of agrarian relations, Debate on change and continuity.		
Unit-4: Subinfeudation, commercialisation of agriculture and de-industrialization.		

Unit-5: Trend in agricultural ecology and output, the stagnation debate and famine		
Unit-6: Urban flow of capital and labour.		
Unit-7: Features of new urbanisation- local and regional variations.		
Unit-8: Changes in the commodity composition of trade-increasing monetisation.		
Unit-9: The Railways-Rise of modern industry-Structural changes.		
Unit-10: New industrial relations-Debate on the comprador status of Indian Capitalists.		
Unit-11: Tribal and Peasant movements		
Unit-12: Colonial policy of pacification and suppression, administrative categorisation of 'criminal tribes and castes'.		
Unit-13: Demographic trends.		
Unit-14: 'Renaissance' beyond Bengal and Socio-religious reforms.		
Unit-15: Indigenous and Western education.		
Unit-16: Rise of the middle class with their press and Literature-tension between tradition and modernity		

পর্যায় গ্রন্থ - ১

সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের নানা কৌশল

একক - ১

The Aftermath of Revolt : British Government's control over Indian Administration

গঠন (Structure) ঃ

৪.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.১.১.১ ঃ ভূমিকা — মহাবিদ্রোহের পরিণতি

৪.১.১.২ ঃ ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

৪.১.১.৩ ঃ ১৮৬১'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪.১.১.৪ ঃ ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪.১.১.৫ ঃ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

৪.১.১.৬ ঃ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও নিয়ন্ত্রণনীতি

৪.১.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.১.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। মহাবিদ্রোহের পরিণতি বা ভবিষ্যৎ ফল

২। ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

৩। ১৮৬১ এবং ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

৫। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের কৌশল

৪.১.১.১ ঃ ভূমিকা — মহাবিদ্রোহের পরিণতি

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। অর্থের বিনিময়ে পাওয়া ব্রিটিশ নৃপতির সনদবলে এই কোম্পানী ভারতে ও এশিয়ায় অন্যত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। এই বাণিজ্যের খাতিরেই কোম্পানী উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে জড়িয়ে পড়ে এবং তা এতই লাভজনক হয় যে অধিগ্রহণ উত্তরোত্তর একটি বলিষ্ঠ নীতিতে পরিণত হয়। অথচ এর দ্বারা কোম্পানীর যে কেবল আর্থিক লাভই হয়েছিল তা নয়। ক্রমশঃ কোম্পানী নিজেই একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় যার অপ্রীতিকর প্রভাব কেবল ভারতের মানুষের ওপরেই নয় ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরেও পড়তে থাকে। সার্বভৌমত্বের অধিকারী ব্রিটিশ রাষ্ট্র অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয় কোম্পানীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে। ১৭৭৩এ আরম্ভ হয় কোম্পানীকে বশে আনার একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৫৮য়।

১৭৭৩র রেগুলেটিং এ্যাক্ট ছিল কোম্পানীকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে আনার প্রথম ও দুর্বল এক প্রয়াশ সন্দেহ নেই, তবে ভবিষ্যতের জন্য তা দিক-নির্দেশকারীও হয়েছিল। ঐ বছর কোলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা ভারতে নতুন এক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপও বটে। ১৭৮৪র পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট একদিকে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের এক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে পার্লামেন্টের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা কোম্পানীর ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণেরও এক প্রচেষ্টা। ১৬০০য় আরম্ভ হওয়া ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয় ১৮১৩র চার্টার এ্যাক্টের দ্বারা। ১৮৩৩এ চীনে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারও চলে যায় কোম্পানীর হাত থেকে। ১৮৫৩র চার্টার এ্যাক্ট ছিল একটি তাৎক্ষণিক ও অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ। ১৮৫৭র বিদ্রোহ কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসানকে ত্বরান্বিত করে। কোম্পানীর অপশাসনই বিদ্রোহের কারণ এমন প্রবল জনমত এই সময়ে ইংল্যান্ডে তৈরী হলে ক্ষমতার হস্তান্তর অতি সহজেই ঘটে যায়। ১৮৫৮র গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশ নৃপতির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও শাসন।

৪.১.১.২ ঃ ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

১৮৫৮'র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষমতা বর্তায় পার্লামেন্টের ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ অবলুপ্তি ঘটে এতকাল যে দুটি সভা এই ক্ষমতা ভোগ করত, অর্থাৎ কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ও পার্লামেন্টের বোর্ড অফ কন্ট্রোলের পরিবর্তে ব্রিটিশ নৃপতির নামে শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের ওপর। কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীও এরপর থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হল। সেক্রেটারী অফ স্টেট হলেন পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য গঠিত হল ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইন্ডিয়া কাউন্সিল নামে একটি পরামর্শদাতাদের পরিষদ। অবশ্য এই পরিষদের সুপারিশ অবজ্ঞা করে পৃথক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। তবে অর্থবিষয়ক তাঁর কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাদের অনুমোদনকে একটি অবশ্য শর্ত হিসাবে রাখা হল। সাধারণত ভারতে শাসনকাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরই পরিষদে স্থান হত। এঁদের না জানিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সাথে যে কোন গোপন তথ্যের আদানপ্রদানের ক্ষমতা থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। ভারত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়-আইন, রেল, রাজস্ব, আয়ব্যয় ইত্যাদি-তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পরই অনুমোদন দিতেন। ভারতে রচিত বিভিন্ন আইনবিধি পার্লামেন্টে দাখিল করার দায়িত্ব ছিল তাঁর, এবং নিয়মিত কিছুকাল অন্তর পার্লামেন্টকে ভারতের খবরাখবর জানানোরও।

এরপর থেকে কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল হলেন গভর্ণর জেনারেল এ্যান্ড ভাইসরয়, অর্থাৎ এর দ্বারা স্পষ্ট করা হল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ নৃপতির প্রতিনিধি। ভারতে প্রত্যক্ষ শাসনভার বর্তালো তাঁর ওপর। অবশ্য যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদনসাপেক্ষ, সেহেতু নীতি অবলম্বন ও সম্পাদনে ভাইসরয় হয়ে পড়লেন পার্লামেন্টের অধীনস্ত। তাঁর সহায়তার জন্য গঠিত হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নামে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই পরামর্শদাতাদের পরিষদের সদস্যরা সাধারণত ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরাই হতেন।

১৮৫৮'র এই আইনের সাথে সাথে জারী হল কুইন্স প্রোকলামেশন বা মহারাণীর ঘোষণাপত্র। এর দ্বারা দেশীয় শাসকদের আশ্বাস দেওয়া হল যে কোম্পানীর সাথে তাঁদের যাবতীয় চুক্তি-সন্ধি মহারাণী সম্মানের সাথে পালন করবেন এবং তাঁদের যাবতীয় অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মহারাণী হস্তক্ষেপ করবেন না এমন আশ্বাসও দেওয়া হল। ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না, কেবল উপযুক্ত শিক্ষাগত ও অনুরূপ যোগ্যতাই ভারত সরকারের কাছে আমল পাবে, এই ঘোষনাপত্রের দ্বারা তা ভারতীয় প্রজাদের জানানো হল।

যদিও এটাই স্বাভাবিক, তবুও উল্লেখ করতেই হয় যে ১৮৫৮'র আইন ও মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতীয়দের জীবনে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, ইংরেজদের তেমন কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। অতএব বজায় থাকল স্থিতাবস্থা মাত্র। মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সমাজের একাংশ বহুদিন যাবৎ নানা অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসছিল পার্লামেন্টের কাছে, যেগুলি আগের মত এখনও উপেক্ষিত হল। প্রতিনিধিত্বমূলক কোন শাসনব্যবস্থার জন্ম তো হলই না, বরং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সেক্রেটারী অফ স্টেটের হাতে চলে যাওয়ায় প্রশাসনের

সংবেদনশীলতা আরও দুর-অস্ত হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, তাঁর কার্যালয়ের ব্যয়ভার যথারীতি বর্তালো ভারতীয় প্রজার ওপর। বিলিতি সমাজের যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বহুদিন যাবৎ কোম্পানীর বিশেষ অধিকারের অবলুপ্তির জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল, কেবল তাদেরই প্রত্যাশা পূরণ হল ১৮৫৮ য়।

৪.১.১.৩ ঃ ১৮৬১'র ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৬১র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টের দ্বারা একদিকে যেমন গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করা হল তেমনই অন্যদিকে ১৮৩৩ ও ১৮৫৩র চার্টার এ্যাক্ট দুটিতে শাসনতন্ত্রে যে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক দেখা গেছিল তা কিছুদূর কমানোর চেষ্টা হল। এই আইনের দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠনে পরিবর্তন আসে। তৈরী হল শাসনকাজের তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিভাগ। সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টনের দায়িত্ব থাকল গভর্ণর-জেনারেলের। সদস্যরা সাধারণ বিষয়গুলি নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে চালাবার অধিকারী হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশ-অনুমোদনকে অপরিহার্য মানা হল।

এই আইনসংস্কারের প্রণেতা স্যার চার্লস উড পার্লামেন্টের ধাঁচে সম্পূর্ণ পৃথক একটি আইন পরিষদ পছন্দ না করায় গভর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদেই আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিতীয় একটি বিভাগ তৈরী হল। নির্দিষ্ট করা হল তিন ধরণের সদস্যঃ 'সাধারণ সদস্য' (বাংলার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরদের মত 'অ-সাধারণ' সদস্য সহ), পাঞ্জাব ও বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণরেরা এবং 'অতিরিক্ত' সদস্য, (গভর্ণর-জেনারেল দ্বারা মনোনীত)। এই বিভাগের আইন রচনার ক্ষমতা হল ব্যাপক। ইংরেজ-শাসিত ভারতের সকল মানুষের জন্য তো বটেই, এমনকি দেশীয় রাজ্যে বসবাসকারী ভারত সরকারের কর্মচারীদের জন্যও আইন তৈরী করার ক্ষমতা হল এই বিভাগের। অথচ এরই সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপিত হল। যেমন, পার্লামেন্ট দ্বারা ভারতের জন্য রচিত কোন আইন পরিমার্জনাকারী অথবা ইংল্যান্ডের সংবিধান সংশোধনকারী কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এই বিভাগের থাকল না। অর্থাৎ, এই পরিষদকে স্পষ্টভাবে পার্লামেন্টের অধীনস্ত একটি সভায় পরিণত করা হল। এই ব্যবস্থাও জারী হল যে গভর্ণর-জেনারেলের, এবং সেক্রেটারী অফ স্টেটেরও, অনুমোদন ছাড়া আইন পরিষদের কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে পারবে না। তাছাড়া গভর্ণর-জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হল প্রয়োজনে, পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে, ছয় মাসের জন্য বিশেষ আইন জারী করার।

অন্যদিকে, নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা সহ বোম্বাই ও মাদ্রাজে এবং লেফটেনেন্ট-গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলিতেও আইন পরিষদের ব্যবস্থা হয় এই বছর। সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ও 'অতিরিক্ত' এই তিন ধরণের সদস্য নিয়ে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির আইন রচনা বিভাগ তৈরী হল। তবে ফৌজদারী আইন, মুদ্রাব্যবস্থা, বিদেশনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রস্তাবের ক্ষমতা দেওয়া হল না এই বিভাগকে। পার্লামেন্টের অনুমোদন অবশ্য শর্ত থাকল, যেমন থাকল এই শর্তও যে এই বিভাগের রচিত যে কোন আইন গভর্ণর-জেনারেল নাকচ করে দিতে পারেন।

যথারীতি নতুন এই আইনে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থাই থাকল না। কেবল এই সিদ্ধান্তই থাকল যে গভর্ণর-জেনারেল তাঁর ইচ্ছামত দেশীয় শাসকদের তাঁর আইন বিভাগে অতিরিক্ত সদস্যপদে মনোনীত করতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে, নতুন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে পার্লামেন্টের আজ্ঞানির্বাহী সভায় পরিণত করাই ছিল একমাত্র অভিপ্রায়। এই কারণেই বেসরকারী অপেক্ষা সরকারী সদস্য সংখ্যা বেশী রাখা হয়, অর্থাৎ যাতে এইসব সভায় সরকারের মতেরই প্রতিফলন হয়। আবার এই কারণেই গভর্ণর-জেনারেল, সেক্রেটারী অফ স্টেট ও পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করার অধিকার দেওয়া হল আইন পরিষদের সদস্যদের। অর্থাৎ ১৮৬১র সংস্কারের দ্বারা বিকেন্দ্রীকরণও সামান্যই হয়েছিল।

৪.১.১.৪ ঃ ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৯২র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টের দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির আইনরচনা বিভাগের সদস্যসংখ্যা আরেক দফা বাড়ানো হয় এবং সদস্যদের ক্ষমতাতেও পরিবর্তন আনা হয়। গভর্ণর-জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা হয় সর্বনিম্ন দশ থেকে সর্বোচ্চ ষোল, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন পরিষদ দুটির ক্ষেত্রে আট-কুড়ি। সমান অনুপাতে বাড়ল বেসরকারী সদস্যপদও। সদস্যদের নতুন অধিকার দেওয়া হল সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা করার ও প্রশ্ন তোলার। তবে এ নিয়ে কোন সংশোধনের ক্ষমতা তাদের থাকল না। জনস্বার্থ বিষয়ক প্রশ্ন তোলার ও উত্তর পাওয়ার অধিকারও সদস্যরা পেলেন, তবে তাঁদের তোলা প্রশ্ন বাতিল করার ক্ষমতা থাকল আইন পরিষদের প্রধানের। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির ক্ষেত্রে একই নিয়ম বলবৎ হল।

এই আইনে প্রথম সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম রচিত হয়। ব্যবস্থা হল এই যে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির বেসরকারী সদস্যরা এবং কোলকাতার বণিকসভা, আইনজীবি পরিষদ প্রভৃতি সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের জন্য পাঁচজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন। তেমনই স্নাতকগোষ্ঠী, পুরসভা, বৃহৎ জমিদার-বণিকেরা প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির জন্য মোট চারজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন, এই নিয়ম হল।

বস্তুতপক্ষে, এই 'নির্বাচন' সুপারিশ মাত্র। কারণ প্রেরিত তালিকা থেকে বেছে নিয়ে মনোনয়নের ক্ষমতাটা গভর্ণর-জেনারেলেরই হাতে রেখে দেওয়া হল। অতএব এটা স্বাভাবিক যে আইন পরিষদগুলির 'নির্বাচিত' সদস্যরা অন্যদের মত সরকারী নীতিই অনুসরণ করে চলবে। এই সংস্কারের দ্বারা ভারতীয়রা তাই প্রকৃত কোন অধিকার পেল না। কারণ যে ভারতীয়রা নতুন নিয়মে আইন পরিষদে স্থান পেলেন তাদেরকে কোন অর্থেই দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি বলা চলে না। সরকারের ব্যাখ্যা ছিল ভারতের মত বৃহৎ ও অনুন্নত দেশে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালানো বাতুলতা মাত্র। নতুন বিধির দ্বারা আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন ধরণের অগ্রনী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট, এই ছিল সরকারের মত। অন্যদিকে, আইন পরিষদের সদস্যদের নতুন অধিকার প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকারই নয়। কারণ সরকারের নীতি নির্দ্ধারণ অথবা নীতি পরিমার্জনার কোন ক্ষমতা তাঁরা পেলেন না। আসলে তাঁদের আলোচনা প্রশ্ন তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল নিতান্তই এই কারণে যাতে পরবর্তীকালে সরকার পক্ষকে আয়ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন না হতে হয়।

বলা যেতে পারে যে নীতিগ্রহণ ও নীতিসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার এযাবৎকাল যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল, তাতে কিছুদূর ভাটা পড়ল। কারণ এরপর থেকে সরকারকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হত। বস্তুতপক্ষে, দাদাভাই নৌরজীর মত ভারতীয় সদস্যরা নতুন এই যে অধিকার পেলেন, তার যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগটা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এটুকুর দ্বারা ভারতীয়দের প্রত্যাশা কোনভাবেই পূরণ হয়নি। ১৮৮৫

থেকে প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেস, এমনকি তার আগেও বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক সংগঠন, ইংরেজ সরকারের কাছে সীমিতভাবে হলেও স্বাধিকার দাবী করে আসছিল। ১৮৯২র সংস্কার তাই ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসকের মনোভাব স্পষ্ট করে দিল। এর প্রভাব পড়ে তাদের রাজনীতির ওপর; জাতীয় সংগ্রামকে আবেদন-নিবেদনের পথ থেকে বিক্ষোভমূলক পথে চালনা করার কারণটা ভারতীয়দের জুগিয়ে দেয় ইংরেজরাই।

৪.১.১.৫ ঃ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল, তার অন্যতম প্রধান ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন। এই কাজটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে করেছিল ইংরেজরা। এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সৈন্যদের ভবিষ্যত বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা, তবে এছাড়াও অন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করেছিল।

প্রথমত, সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় ইউরোপীয়দের আধিপত্য সুনিশ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ অবধি কোম্পানীর বাহিনীতে ছিল প্রায় দুই লক্ষ পনেরো হাজার ভারতীয় সৈন্য অথচ মাত্র চল্লিশ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য। তাই এরপর ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যদের আনুপাতিক হার বাংলায় ১ ঃ ২ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে ২ ঃ ৫ স্থির করা হল। তাছাড়া, সাম্রাজ্যের সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে উপমহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কেবল ইউরোপীয়দেরই মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই সময়। একই কারণে সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজ শাখাটিকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলা হল। এই কারণেই, ২০ শতকের নতুন শাখাগুলি, যেমন ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রাগার ডিভিসনগুলি, প্রথম থেকেই ইউরোপীয়দের কুক্ষিগত হল। আবার, আগের মত এখনও ভারতীয়দের উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত রাখা হল; যেমন, ১৯১৪তেও একজন ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে সুবাহদারের ওপরে ওঠা সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে ইংরেজরা বিভেদনীতি অবলম্বন করে। সৈন্যদের জাতি-ধর্ম-বাসস্থান ইত্যাদি পার্থক্যগুলিকে মাথায় রেখে এমনটা করা হয়। যেমন, একেকটি রেজিমেন্টে বিভিন্ন ধরণের সৈন্যকে প্রায় সমান সমান সংখ্যায় রাখা হয় এবং তাদের আপনাপন জাতি-ধর্ম-অঞ্চলের প্রতি সহজাত আনুগত্যকে এমনভাবে সমর্থন ও গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ হল যাতে তাদের পক্ষে একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিল ইংরেজরা ভারতীয়দের 'সামরিক'/'অসামরিক' দুটি ভাগে ভাগ করে। অযোধ্যা, বিহার, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সৈন্যরা, যারা ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল অথচ যারা ১৮৫৭র বিদ্রোহে প্রধান অংশ নিয়েছিল, তাদের 'অসামরিক' বলে চিহ্নিত করে সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে রাখা হল। অন্যদিকে যে শিখ, পাঠান, গুর্খারা বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল, তাদের আনুগত্যকে নিশ্চিত করতে ও অন্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক রাখতে, তাদের 'সামরিক' আখ্যায় ভূষিত করা হল।

কালক্রমে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল বাহিনীতে পরিণত হয়। যেমন, ১৯০৪এ সরকারের আয়ের প্রায় ৫২% এর ওপরেই ব্যয় হয়েছিল। এর কারণ, এর দ্বারা ইংরেজদের নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হত। আসলে, ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ভারত তার মধ্যমণি ছিল এমন বলা অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে রুশ, ফরাসী ও জার্মান আক্রমণ থেকে এই উপনিবেশটিকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। আবার এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের বাণিজ্যিক বন্দোবস্তগুলিকে সচল রাখারও প্রয়োজন ছিল। তেমনই, এই দুটি

মহাদেশে নতুন নতুন অঞ্চল অধিগ্রহণেরও প্রয়োজন হত মাঝে মাঝে। প্রধানত এই কয়েকটি কারণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীটি ইংরেজদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ, সম্পূর্ণভাবে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত এমন এক বাহিনীর প্রতিপালনের ব্যয়ভারটি বহন করতে হত ভারতবাসীকেই। তবে উল্লেখ্য যে সৈন্যদের ভারতীয় জীবন থেকে পৃথক রাখার ইংরেজদের উদ্যোগটি ব্যর্থই হয়। কারণ, বিভিন্ন সময় সৈন্যরা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

৪.১.১.৬ ঃ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও নিয়ন্ত্রণ নীতি

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসনের দরুন অতি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সাম্রাজ্যটি চলে যেতে বসেছিল বলে পার্লামেন্ট এখানে ব্রিটিশ নৃপতির প্রত্যক্ষ ও নিরঙ্কুশ শাসনের প্রবর্তন করে। উদ্দেশ্য ছিল, কার্যকরী বিভিন্ন নীতি-পদক্ষেপের দ্বারা এ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করা। এটা করতেই পার্লামেন্ট ভারতের শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলে। উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারত ছিল ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে সাম্রাজ্যর যে বিশাল অংশটি ছিল, তা ভারত থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। শক্তিশালী এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার পেছনে এটা ছিল অন্যতম এক যুক্তি। অথচ সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক স্বার্থ। ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্প-অর্থনীতির সহায়ক হিসাবে ভাবতেই পছন্দ করে ইংরেজরা। প্রয়োজন ছিল ভারতকে খাদ্যশস্য-কাঁচামাল যোগানকারী এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়কারী একটি অঞ্চল হিসাবে ধরে রাখা। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবী জুড়ে ইংরেজদের যে বাণিজ্য চলত ভারত ছাড়া তার ভারসাম্য নিজেদের অনুকূলে রাখাই অসম্ভব ছিল। তাই একদিকে যেমন গড়ে তোলা হল পূর্ণনিয়ন্ত্রিত এক সৈন্যবাহিনী অন্যদিকে তেমনই নজর দেওয়া হল আমলা-নিয়ন্ত্রিত এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে যাতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

অথচ প্রয়োজন ছিল অন্যায্য এই উপনিবেশিক ব্যবস্থাকেই ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয় করা। অতএব প্রথমেই এই প্রচার করা যে যেহেতু বহুবিভক্ত ভারতীয়রা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুপযোগী এবং যেহেতু তারা নিতান্তই অনগ্রসর, সেহেতু তাদের প্রতাপশালী, শান্তিপ্রদানকারী, উন্নয়নকামী, আলোকপ্রাপ্ত ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। একই কারণবশত ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখা হল নাগরিকত্বের অধিকার থেকে এবং তাদের পরিণত করা হল নিছক এক প্রজাবর্গে। প্রয়োজন ছিল এমন ব্যবস্থার সমর্থনকারী কিছু গোষ্ঠীর লালন-পালনও। এমন এক গোষ্ঠী ইংরেজরা খুঁজে পেল ১৮৫৭র বিদ্রোহে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারী, জনসমর্থনপুষ্ট সাবেকী অভিজাতদের মধ্যে। নতুন আমলে তাই নানাভাবে তাদের তুষ্ট রাখাটা একটা প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায় ইংরেজদের। অন্যদিকে, সংখ্যায় ও শিক্ষা-সচেতনায় দ্রুত বাড়তে থাকা মধ্যবিত্তদেরও অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। তাই নতুন আমলে শাসনব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের অধিকারকেও উত্তরোত্তর মেনে নিতে হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য বড়লাট রিপনের উদ্যোগে গৃহীত ১৮৮২র স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন (লোকাল সেল্ফ-গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট) যার দ্বারা ভারতবাসী স্থানীয় প্রশাসনে অন্তত কিছুদূর অংশ নেওয়ার অধিকার পেয়েছিল।

৪.১.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(ক) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পলাশী থেকে পার্টিশান (২০০৪)।

(খ) সুগত বসু ও আয়েষা জালাল ঃ মর্ডার্ন সাউথ এশিয়া (১৯৯৯)।

(গ) সুমিত সরকার ঃ আধুনিক ভারত (১৯৯৬)।

(ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ১ম ভাগ (১৯৭০)।

(ঙ) এস. গোপাল ঃ ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া (১৯৬৫)।

(চ) টি. আর. মেটকাফ ঃ দ্য আফটারম্যাথ অফ দ্য রিভোল্ট (১৯৬৫)।

(ছ) অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এ কন্সটিট্যুশনাল হিস্টরী অফ ইন্ডিয়া (১৯৭১)।

৪.১.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(ক) ১৮৫৮র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এবং কুইন্স প্রোক্লামেশনের (মহারাণীর ঘোষণাপত্রের) দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্রে কি পরিবর্তন এসেছিল? ১৮৬১ ও ১৮৯২র কাউন্সিল এ্যাক্ট দুটির দ্বারা ইংরেজরা কি অর্জন করে?

(খ) ১৮৫৭-পরবর্তী আমলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কি পরিবর্তন এসেছিল? এর পেছনে ইংরেজদের কি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল?

_পর্যায়- ১

একক-২

From companie's management to the Neo Darbari mechanism of Control

১) উদ্দেশ্য
২) আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানির পদক্ষেপ
৩) ১৮৫৮ এর পরে নব দরবারি রাষ্ট্র গঠনের বিষয়

৪) সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫) নমুনা প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য :- বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় কালের পরিস্থিতি আলোচনা করা হবে।

আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানির পদক্ষেপ

ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই ভারত অর্থনৈতিক বিকাশের নিজস্ব ধারণাটি তথা উন্নত শিল্প তান্ত্রিক প্রেক্ষাপট হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "*দা কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া"* দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যক্ত করা হয়েছে ভারতের অনগ্রসরতা ঔপনিবেশিক শোষণের জন্য নয় এর মূল কারণ হিসেবে তারা বলতে চেয়েছেন ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই দেশ ছিল অনগ্রসর দেশ তাদের কল্যাণময় শাসনের দৌলতেই অনগ্রসরতা দূর করার চেষ্টা হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের জন্যই মানুষের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছিল কিন্তু এখানকার জনগণের মাথাপিছু আয় এতই কম ছিল এবং মূল্যবোধ এত সেকেলে ছিল যে তার মধ্যে থেকে আধুনিক শিল্প সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিলনা। টমলিনসনের কণ্ঠেও একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তার মতে ভারতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ইংরেজদের আগমনের আগেও ছিল ব্রিটিশ আমলে তা দূর করা সম্ভব হয়নি, এমনকি ব্রিটিশদের প্রস্থানের পরেও তা বহাল ছিল। কাল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন ধণতন্ত্র এক বিশ্বব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহণ করেছে, বিশ্ববাজারের অনুসন্ধান করেই চলেছে এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অর্থাৎ ইংরেজশক্তি তথা কোম্পানির শিল্প সভ্যতার উপকরণগুলি ভারতে বিস্তারলাভ করেছিল ভারতের জনকল্যানের স্বার্থকে চরিতার্থ করবার জন্য নয়। প্রকৃতঅর্থে তার নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েই এই কার্যসাধন করেছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের বিজয়ের পর কোম্পানির শাসন পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে প্রথমত বাংলা লুণ্ঠন ছিল তাদের প্রাথমিক পুঁজি তথা সঞ্চয়ের অন্যতম উৎস 1764 খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজরা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, ফলে কোম্পানির উপর প্রশাসনিক দায়িত্বভার এসে পড়েছিল। এজন্যই শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে থাকে। কোম্পানি আইন ও ন্যায় বিচার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এবং লর্ড ডালহৌসি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পরোক্ষ হস্তক্ষেপের জন্যই কোম্পানি শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতে শাসনতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের উন্নততর শাসনের জন্য আইন ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের

উপর জ্ঞান আরোহনের ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট দেশের শাসনব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পণ করা কতটা যৌক্তিকতা আছে সে সম্পর্কে বড়সড় এক প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছিল। এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে তর্ক বিতর্কও কম হয়নি। শেষ পর্যন্ত রেগুলেটিংএক্ট 1773 খ্রিস্টাব্দে পাস করার মধ্যদিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ভারত অধিকৃত অঞ্চল সমূহের নিকট সুনির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিতকে মজবুত করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আইনের মূল তাৎপর্য ছিল ভারতে কোম্পানির শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠন করার পথকে সুগম করা।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট কার্যকর ছিল দীর্ঘ এগারো বছর এই আইনের প্রধানত দুটি দিক বেশ প্রণিধানযোগ্য ছিল প্রথমত কোম্পানির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে দ্বিতীয়ত ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে। ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল এবং তাকে সহযোগীতা করবার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই চারজন নবনিযুক্ত সদস্য হলেন ক্ল্যাভেবিং, মনসন, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বাইশে অক্টোবর 1774 খ্রিস্টাব্দে এবং এর কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল 1775 খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাস থেকে। স্যার এলিজা ইম্পে ছিলেন প্রধান বিচারপতি এছাড়া আরো তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের কাজ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে কারণে কোম্পানির কোর্টের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল অভিযোগ করেছিলেন "By the several acts and declarations of the Judges, it is plain that the company's office of Diwan is annihilated" সিলেক্ট কমিটি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন "The court has been generally terrible to the natives and has distracted the government of the company." 1781 খ্রিস্টাব্দের আইন অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ও কাউন্সিলরদের বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এমনকি সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্য একজন গভর্নর ও কউন্সিলরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাধারণত প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই দুই প্রেসিডেন্সিকে গভর্নর জেনারেলের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। যে কারণে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে ডিরেক্টর সভাকে নানান সংকটের সম্মুখীন হতে হতো। তবুও বলা যায় এই আইন দ্বারা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্রের যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তা অনেকাংশে দূর করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই আইন দ্বারা কোম্পানির নিকট থেকে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এই আইন প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় প্রশাসনের ভিত্তি প্রস্তূত করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতের জন্য এই প্রথম একটি লিখিত সংবিধান প্রস্তুত করেছিল। এই এক্ট দ্বারা রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও কার্যনির্বাহক ক্ষমতাগুলি সুনির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ও নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিল। কিন্তু এই আইনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কোম্পানির ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যর্থতার জেরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বিব্রত করে তুলেছিল। 1776 খ্রিস্টাব্দে পর থেকে যখন ব্রিটেন আমেরিকার উপনিবেশ হারিয়েছিল তারপর থেকেই ব্রিটিশ সরকার ঘোরতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, ফলে এই বিপুল আর্থিক ঘাটতি নিরসনের জন্য ভারতবর্ষে অভিনব রাজস্ব আদায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল।

পিটের ভারত শাসন আইন আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক্ট নামেও সুপরিচিত। এই অ্যাক্টের আনুষ্ঠানিক শিরোনাম ছিল "An act for the better regulation and management of the affairs of the East India Company and of the British possessions in India and for establishing a court of Judicature for the more speedy and effectual Trial of persons accused of offences committee in the East India." 1784 খ্রিস্টাব্দে ফক্স এর প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়াম পিট প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারত শাসন বিষয়ে এক প্রস্তাবনা পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বৃটিশ

পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পর আইনে রূপান্তরিত হয়। এই নতুন আইন রেগুলেটিং অ্যাক্ট এর বিভিন্ন রকম ত্রুটি গুলি পরিমার্জিত হয়েছিল এবং কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব অধিকতর ও সুস্পষ্টভাবে স্থাপিত হয়েছিল। এই আইন অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের অর্থ সচিব একজন রাষ্ট্রপতি এবং ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক মনোনীত চারজন প্রিভি কাউন্সিলকে নিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠন করা হয়েছিল। এই সংস্থাই ভারত শাসন বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বভার লাভ করেছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রীকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কোম্পানির তিনজন ডিরেক্টর কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও গোপন কমিটির যুগ্ম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা থেকে মালিক সভাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলকে প্রধান সেনাপতি ও দু'জন কাউন্সিলরের সদস্যকে শাসনকার্যে সাহায্য করবে বলে স্থির করা হয়েছিল। যুদ্ধ, শান্তি, রাজস্ব ও দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের ওপর গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার ঘোষণাও পিটের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল পিটের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। পিটের ভারত শাসন আইন ১৮৫৮খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল. এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোম্পানির সার্বভৌম ক্ষমতা বিলুপ্ত করার এক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং বৃটিশ পার্লামেন্টে হাতে নিবন্ধ করা হয়েছিল। তবে পিট্ কোম্পানির স্বার্থের দিকেও নজর দিয়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনো আইন বলবৎ করা হয়নি। অথচ কোম্পানির কাজে লাগাম টানার জন্য বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছিল।

পিটের ভারত শাসন আইন সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না কারণ বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও পরিচালক সভার দ্বৈত শাসনের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই ভারত সম্পর্কে সেইভাবে সঠিক ধারণা বা জ্ঞান না থাকার দরুন বিভিন্ন রকম সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল। আবার এই আইনকে সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাও হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 1792 খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস এই আইনকে অমান্য করেই টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। ইলবার্টের মতে, ভারত শাসন আইন ছিল অত্যন্ত জটিল। তবে এডমন্ড বার্ক মন্তব্য করেছিলেন এই আইন ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবোচিত। এই আইন সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

রেগুলেটিং এক্ট দ্বারা কোম্পানি কুড়ি বছরের জন্য একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করেছিল। ১৭৯৩ সালে এই আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক কারবার তুলে দিলে লোভী ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা করে ভারতের ব্যবসা নষ্ট করে দিতে পারে। সেই জন্যই 1793 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের শর্ত অনুসারে ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার মেয়াদ কুড়ি বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই আইন অনুসারে কোম্পানির গঠনতন্ত্র ও ভারত শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সদস্যদের কোন বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু নতুন সনদে তাদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল তার পরিষদের যে কোন সদস্যকে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি নিযুক্ত করার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলের অবর্তমানে তিনি তার সমস্ত পদ সামলানোর অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া কমিশনারদের সদস্য সংখ্যা ছয় জন থেকে কমিয়ে পাঁচ জন করা হয়েছিল। এককথায় 1770 খ্রিস্টাব্দের আইনের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সনদ আইনের মাধ্যমে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা বজায় রেখে কোম্পানির শাসন কার্য পরিচালনার অধিকার প্রদান করেছিলেন। কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আইনের ফলেই

ভারতীয়দের শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান -বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। বেশ কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও অন্যান্য বণিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভারতবর্ষকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন দ্বারা পুনরায় কুড়ি বছরের জন্য কোম্পানিকে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই সনদ আইন পূর্ববর্তী সনদ আইনের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে কারণে বলা হয়ে থাকে "The act might have been passed before empty benches and in uninterested audience of the House of Commons, but that does not minimize the importance of the said act." এই আইন দ্বারা কোম্পানির উপর একচেটিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার ও চীনের ওপর কারবার পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই আইন উদারনীতিবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস গ্রান্ট হাউস অব কমন্সের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে ভারত সরকারের দক্ষতা হ্রাসের মূল কারন হচ্ছে ব্যবসার সঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতার সংমিশ্রণ তিনি আরো বলেছিলেন যে ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হোক, সেই সঙ্গে কোম্পানির ব্যবসায়িক কাজকর্ম বন্ধ করা হোক। ইহা ভিন্ন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ভারতীয়দের শাসন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কিছু অধিকার প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের মেয়াদ শেষ হবার পর সর্বশেষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা যেমন আইন প্রণয়নের জন্য একটি আইন পরিষদ গঠন, ডাইরেক্টর সভার সদস্য সংখ্যা আঠারো জন করা তার মধ্যে ছয় জন ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী দ্বারা মনোনীত। গভর্নর জেনারেল বাংলার প্রেসিডেন্সির শাসনভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল প্রভৃতি। লর্ড ডার্বি ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্যাক্ত করেছিলেন, "It is our bounded duty in the interest of humanity of benevolence and of morality and religion, that and as far as you can do it safety wisely and prudently the inhabitants of India should be gradually entrusted with more and more of superintendence of their own internal affairs."

1773 খ্রিস্টাব্দে থেকে 1853 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আইন দ্বারা ভারত ভূখণ্ড ব্রিটিশ কোম্পানি ও পার্লামেন্টের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছিল। ফলে কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে এবং মহাবিদ্রোহের প্রভাবে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা গিয়েছে যে আইনে ক্ষেত্রে যা বলা হতো কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোটাই ঘটতো। আসলে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ একে অপরের পরিপূরক সেখানে উদারনৈতিক বা আদর্শের কোন স্থান নেই। মেকলে তাই স্পষ্ট ভাষায় ব্যাক্ত করেছিলেন, "We are trying to give a good government to a people to whom we cannot give a free government."

---------Justice

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের কিছু বছরের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সেখানে নবাবী প্রশাসন ও মুঘল ব্যবস্থা থেকেই গিয়েছিল। 1772 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সুবা বাংলার বিচারব্যবস্থার দায়িত্বভার প্রাথমিকভাবে ভারতীয়দের হাতে ন্যাস্ত ছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারির মামলার প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব ভারতীয় আধিকারিকদের হাতেই থাকতো। ক্লাইভ রেজাখান কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মূলত নাজিম হিসেবে নবাবের প্রশাসনের ফৌজদারি দিকটা তদারকি করতেন। 1772 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস শাসনকর্তা হিসেবে কার্যভার গ্রহণের পর থেকেই তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিচার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তার যুক্তি ছিল এই দেশের জনগণ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির সার্বভৌমত্বে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। তিনি সর্বপ্রথম বানিজ্য বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তার সুপারিশ অনুসারে হিন্দু পণ্ডিতদের সহযোগিতায় হিন্দু আইন বিধি সংকলন করা হয়েছিল। একজন কাজী ও একজন মুফতির তত্ত্বাবধানে থাকতো ফৌজদারি আদালত। তবে এই সমস্ত আদালতের চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকতো ইউরোপীয় কালেক্টররা। এর প্রস্তাব ক্রমে প্রত্তেক জেলায় কালেক্টর ও কাজীর অধীনে মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারি আদালত স্থাপন করার মাধ্যমে প্রেরিত আপিল সমূহ মীমাংসা করার জন্য তিনি কলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজাম আদালত নামে দুটি বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন।

1774 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে ছটি বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন, প্রত্যেক জেলার বিচার বিভাগের দায়িত্বভার একজন দেওয়ান অথবা আমিনের হাতে অর্পণ করেছিলেন। এই সময় আপিলের জন্য বিভাগীয় আপিল আদালত স্থাপন করা হয়েছিল ও প্রত্যেক বিভাগে একটি করে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। 1773 খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং আইনের প্রস্তাব ক্রমে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট নির্মিত হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচারবিভাগীয় সংস্কারের আসল প্রবণতা ছিল বিচারবিভাগীয় কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রশাসন কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমত এই কোট প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির ব্যাপারে নাক গলাত এবং আদালত গুলির কর্তৃত্ব মানতো না। দ্বিতীয়ত কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা এই সময়ের পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। বিশেষ করে কোম্পানি ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ। পাটনার শাহবাজ বেগের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তার বিধবা পত্নী নাদিরা বেগম ও ভাতুষ্পুত্র বাহাদুর বেগের মধ্যে জটিলতা। আরেকটি ঘটনা হল বিখ্যাত কাশীজোড়া মামলাকে কেন্দ্র করে।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য 1780 খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংবদ্ধ করা কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবুও বলতেই হয় যে তার রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারকার্য দ্বারা তিনি যথার্থই দাবি করতেই পারেন যে, রাজ্যের প্রত্যেক শাখায় কোম্পানির সার্বভৌম অধিকার সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (The sovereign authority of the company is firmly rooted in every branch of the state.) ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং ঘৃণ্য ঐতিহাসিক আইনি হত্যা হিসাবে কলঙ্কিত হয়েছিল মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি। নন্দকুমার ছিলেন নবাবের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারী মীরজাফরের বিশ্বস্ত বন্ধু। 1775 খ্রিস্টাব্দে নন্দকুমারকে দলিল জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আদেশে চক্রান্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক বেভারেজ, আলফ্রেড লায়াল প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে হেস্টিংস নিজের আত্মরক্ষার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ উপস্থাপিত করতে না পারে তার জন্যই চক্রান্ত করে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের সঙ্গেও অবিচার করেছিলেন। বিভিন্ন অছিলায় অন্যায় ভাবে প্রচুর অর্থ আদায় করেছিলেন। অবশেষে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস পদত্যাগ করেন অর্থাৎ তার আমলে ভারতে সাধারণত প্রায় সর্বত্রই সরকারের আদর্শ হিসেবে রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র তথা দণ্ড নীতি ব্যাপকভাবে কুলুষিত হয়েছিল। শাস্ত্রমতে প্রকৃত নৃপতি, প্রকৃত নেতা এবং প্রকৃত রক্ষাকর্তাই হল দণ্ড। দণ্ডের প্রয়োগ ব্যতিরেকে রাজ্যে অরাজগতা সৃষ্টি হয় কিন্তু ব্রিটিশ আমলে দণ্ডনীতিই ছিল পক্ষপাতদুষ্ট দুর্নীতিপরায়ন বা মাৎস্যন্যায়ের সমতুল্য।

The famous Cornwallis Code formed the steel frame of British Indian administration. ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকাল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ কর্মচারীদের লাগামছাড়া দুর্নীতি ও কার্যকলাপকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কঠোর বিধানের প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিধিকে বলা হয়ে থাকে কর্নওয়ালিস কোড। এই বিধানের সৌজন্যেই ভারতে আমলাতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। তার হাত ধরেই বিচারবিভাগেও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়েছিল। 1787 খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার আদালত গুলোকে পুনরায় কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। এখন থেকে কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান ও সীমিতভাবে ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলার বিচারের দায়িত্বভার ফৌজদারি ও সদর নিজামাত আদালতের হাতেই ন্যাস্ত থাকতো। আবার রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্বভার অর্পিত থাকতো রাজস্ব পরিষদের হাতে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে আনয়নের জন্য আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং প্রতিটি জেলায় ঘুরে বিচার করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। কর্নওয়ালিস বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করেছিলেন। কালেক্টরদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল; ভারতীয়দের কাছ থেকে সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ইউরোপিয়ানদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। ফলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জাতিগত ও কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য প্রকাশে আর কোন অস্পষ্টতা ছিলনা। দেওয়ানী আদালতের বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল জর্জ বা বিচারক নামক কর্মচারীদের হাতে। জেলা আদালতের নিচে কয়েকটি অধঃস্তন আদালত ছিল। সর্বনিম্ন আদালত ছিল মুনসেফ কোর্ট। একসময় কর্নওয়ালিস ঘোষণা করেছিলেন "I conceive that all regulations for the reform of that department (i.e. criminal justice) would be useless and negatory whilst the execution of them depends on any native whatever."

তিনি বিচার ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে ও বিচারপ্রার্থীদের পরিষেবা প্রদান কল্পে হিন্দু-মুসলিম উকিল নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। মামলার মূল্য অনুযায়ী পারিশ্রমিক স্থির করা হয়েছিল। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মহিলাদের সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। ইউরোপীয় কর্মচারীদের হাত থেকে ভারতীয় প্রজাদের কিছু কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ বহুলাংশে হ্রাস করেছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয়দের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে তার খুব বাজে ধারণা ছিল। সেজন্যই শাসন ও বিচার বিভাগে উচ্চ পদস্থ ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয়দের জন্য স্থির করা হয়েছিল যে 500 পাউন্ড ও তার উর্ধে বেতনের চাকরিতে তাদের নিযুক্ত করা যাবে না। ফলে ভারতীয়দের কাছে উচ্চ পদে চাকরির দরজা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। স্যার জন শোর এই নীতির কঠোর সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন "The Indians have been excluded from every honour, dignity or office which the lowest Englishman could be prevailed to accept." লর্ড কর্নওয়ালিস শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য জেলাগুলোকে এগারোটি থানার অধীনে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক থানার দায়িত্ব ভার অর্পিত থাকতো একজন দারোগা নামক অধিকারিকের হাতে তার নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী দেখাশুনা করতেন ম্যাজিস্ট্রেট। টমাস মনরো এই পুলিশি ব্যবস্থার দিকগুলো তুলেধরে বলেছিলেন এই ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত দেশাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের আরাধ্য ধর্মকে পরিপূর্ণতা প্রদানের যত্নবান ছিলেন কর্নওয়ালিস। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে "In the foundation of the civil administration had been laid by Warren Hastings the structure was laid by Cornwallis." ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে দারোগা ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রামের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা দায়িত্বভার এসে পড়েছিল কালেক্টরদের হাতে। বিচার বিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার তিনি প্রবর্তনে যত্নবান হয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল

ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কর্নওয়ালিস পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফলে বিচার ব্যবস্থা ও আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল সেই সঙ্গে অসন্তোষও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। “Few were destined to do more permanent work than Lord Cornwallis.”

পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ডবেন্টিঙ্ক একজন প্রগতিশীল ও সংস্কারকামী শাসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। প্রথমেই তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও প্রাদেশিক আপিল আদালতের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন তিনি ফৌজদারির মামলার দায়িত্ব জেলা বিচারকদের ওপর অর্পন করেছিলেন।কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রদান করেন তিনি। কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি ডিভিশন তৈরি করেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও জেরেমি বেন্থাম দ্বারা প্রচারিত উপযোগিতাবাদ বা হিতবাদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ভারতবাসীর স্বার্থে ঝাপিয়েছিলেন। তাই বলতেই হয় যে “… a benevolent ruler who in fused into oriental despotism the spirit of British freedom; who never forgot that the end of government is the welfare of the governed.” সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা করেছেন ভারতীয়দের যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ পদে নিয়োগ করা হবে এবং কোন বৈষম্য করা হবে না। আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। তার শাসনকালে লর্ড মেকলে "ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ড" রচনা করেন 1856 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় হাইকোর্ট আইন রচনা করেছিল। পরিশেষে বলতেই হয় যে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা বিচারবিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। বিচারবিভাগীয় এই রূপরেখাটি স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

<u>Establishment of the so-called legitimate Neo- Darbari State in India after 1858</u>

মহাবিদ্রোহের পূর্বে দরবারী বা দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই বিশেষ করে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রতক্ষ শাসনব্যবস্থার যাবতীয় দ্বায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো। উক্ত সময়ের ভারতবর্ষের প্রায় ৬০ শতাংশ ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষ্য ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাকি অংশের বিভিন্ন স্বায়ত্ব শাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ দরবারী শাসনব্যবস্তা কায়েম ছিল এবং দেশীয় রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। পূরণ চাঁদ যোশী তাঁর লেখা প্রবন্ধে ব্যাক্ত করেছেন, কিভাবে কিছু দেশীয় রাজ্যের রাজারা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের পশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জন ব্রস নটন তাঁর লেখা *'Topic for Indian Statesmen'* গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন, যদি হায়দ্রাবাদের অভ্যুত্থান ঘটতো তাহলে আমাদের দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরতো। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের প্রতি তাদের আস্থা ও অনুগত্য অবিচল রেখেছিলেন। রাজস্থানের দেশীয় রাজা নিজের সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য দানে সানন্দে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। মধ্য ভারতের প্রতাপশালী রাজা সিন্ধিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয় মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। আবার পাঞ্জাবের ঝিন্দ ও পাতিয়ালার রাজারা এবং কর্নালের নবাবও ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন। যেজন্য বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যগুলোকে সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল যে, এই দরবারী রাজ্যগুলোকে এখন থেকে আর জয় করা হবে না। অন্যদিকে রাজ্যগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্ত করা হবে। ১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং

ঘোষণা করেছিলেন যে, মহারানী ভিক্টোরিয়াই সমগ্র ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি এবং এই সম্পর্কে কোনো বিরূপ প্রশ্নের অবকাশ নেই। ১৮৭৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের উপর তাঁর ক্ষমতা আরোপিত হয়েছিল।

এই ঘোষণার দরুন দরবারী তথা দেশীয় রাজ্যগুলো সম্রাজ্ঞীর অধীনস্ত সামন্ত রাজ্যে বা করদ রাজ্যে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলো। মূলত প্রজাবিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই ব্রিটিশরা বন্ধুত্ব পূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদের এই কূটনৈতিক নীতির মাধ্যমেই দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল। ভারতের দেশীয় বা দরবারী রাজ্যগুলোকে মূলত দুটো ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে। উক্ত সময়ে ছোট বড় রাজ্য মিলিয়ে পাঁচশো টির অধিক দরবারী বা দেশীয় রাজ্য ছিল। প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল একশো আঠারো টির মতো। বাকি রাজ্যগুলো ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য। রাজ্যের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও একাধিপত্য কেন্দ্রীভূত হতো রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক ও তাঁর নিকট আত্মীয়দের হাতে। এই সমস্ত রাজ্যগুলোর বিভিন্ন ধরণের আয়তনে পরিব্যাপ্ত ছিল। বৃহদায়তনের দরবারী রাজ্য ছিল হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশুর, বরোদা প্রভৃতি। দেশীয় রাজ্যের রাজারা ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। প্রথম শ্রেণীর রাজ্যের রাজা ভারতের রাজধানিতে এলে ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ বন্দুক স্যালুটের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করতেন। গান স্যালুট বা তোপধ্বনির সংখ্যা নির্ভর করতো দেশীয় রাজাদের রাজকোষের আর্থিক সচ্ছলতার উপর, বংশ কৌলিন্যের উপর কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের উপর নির্ভর করে। তবে সিংহাসনের উত্তরাধিকার, সামরিক ও বেসামরিক পদে নিয়োগ সহ শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরেই ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ আইনসিদ্ধ ছিল। এর বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের বৈদেশিক আক্রমণ তথা অভ্যন্তরীন গোলযোগের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রায় সমস্ত রকমের ক্ষমতা হারিয়ে ব্রিটিশ শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আর্থিক দুরাবস্থা ছিল মারাত্মক। প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসিত রাজ্যের প্রজাদের চাইতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আর্থিক ভাবে করের বোঝা বেশি ছিল। প্রজাদের থেকে আদায়কৃত অর্থ দিয়ে শাসকগণ নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। হায়দ্রাবাদের পূর্ণাঙ্গ শাসক থেকে শুরু করে কাথিয়াওয়ারের একটি ক্ষুদ্র রাজত্বের প্রধান পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন মুদ্রা ব্যবস্থা থাকতো। কিছু রাজ্যের নিজস্ব আইন প্রণয়নের অধিকার থাকতো এবং তাদের প্রজাদের উপরও জীবন ও মৃত্যুর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়োজিত থাকতো। কিছু রাজ্যের সীমাহীন ক্ষমতা আবার কিছু রাজ্যের ক্ষমতার লেশমাত্র থাকতো যে কারণে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট লেখেন "... therefore originated the idea that rulers who enjoy full powers of internal administration should be separated from those rulers whose power are limited or in some cases next to nothing".

কিছু দেশীয় রাজাদের ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তি এত অফুরন্ত ছিল তাতে করে যে কোনো রূপকথার গল্পকেও হার মানিয়ে দেবে। ধনসম্পত্তির দিক থেকে সবথেকে ধনবান ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর স্যার মীর উসমান আলি খান সিদ্দিকি। কথিত আছে তিরিশের দশকে তার মোট সম্পত্তির পরিমান ছিল দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের তিনি ২৫ লক্ষ পাউন্ড অর্থ মূল্য দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়া ১৮৫ ক্যারেট প্রকান্ড এক হিরে পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করতেন। প্রিন্সেস এলিজাবেথকে তার বিয়ে উপলক্ষে হীরা, টায়রা খচিত একটি হার উপহার দেন এটি হায়দ্রাবাদের নিজামের হার নামে পরিচিত। মহীশুরের রাজা পাক্কা এক টন সোনা দিয়ে বানানো এক রাজাসন ব্যবহার করতেন। পাতিয়ালার মহারাজার ছিল হিরে মুক্তা বসানো এক বর্ম। তিন হাজারের রত্ন বসানো ভারতপুরের রাজার পাগড়ী দেখলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম হিরে "ষ্টার অফ দি সাউথ" ছিল বারোদার মহারাজের অধীনে।

উত্তর পূর্ব ভারতের ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকা করেছিল কোচবিহার রাজ্যটি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পূর্ব ভারতের সব থেকে জমকালো রাজপ্রাসাদ হিসেবে এই রাজ্যের গরিমা ছিল দিগন্ত বিসতৃত। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে এই রাজ্যটির পত্তন হয়েছিল ব্রিটিশ সংশ্রবের প্রভাবেই। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের শাসনকালে তার আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই ব্রিটিশ সংশ্রবের ফল। নৃপেন্দ্র নারায়ণ কে আধুনিক পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। ফলে এই সুমহান কর্মের প্রভাবেই কুসংস্কারাছন্ন কোচ রাজ্যকে নতুন আলোয় আলোকিত করবার দিশা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। সেজন্য আধুনিক কোচবিহারের জনক হিসেবে নৃপেন্দ্র নারায়ণকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাকে উত্তর পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ট নৃপতির আক্ষায় অভিষিক্ত করা হয়ে থাকে।

সাধারণত বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশদের মনে এই বিশ্বাস উদয় হয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে গণবিদ্রোহ সংঘটিত হলে বন্ধু হিসেবে দেশীয় রাজারাই সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসবে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব ভারও ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল। এমনকি ভারতবর্ষ ব্যাপী যখন তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলো ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে পশে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের রাজ্যে যে কোন ধরণের গণ অভ্যুত্থান দমনের ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। পি. ই. রবার্টস এর মতে, দেশীয় রাজ্যগুলো ছিল "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা প্রাচীর" জওহরলাল নেহেরুর মতে "দেশীয় রাজ্যের রাজারা হচ্ছেন ঘরের শত্রু বিভীষণ" মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন "ভারতীয় পোশাক পরিহিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী".

কিছু প্রতাপশালী দেশীয় রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীন স্বশাসন বা নিজস্ব দেশীয় শাসন বজায় ছিল তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল, নিজস্ব টাঁকশাল ছিল যেখান থেকে মুদ্রা ছাপানোর ব্যবস্থা থাকতো এবং অভ্যন্তরীন বিষয়ে বেশ ভালো রকমের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল। বিংশ শতকে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করবার বহুরকমের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এরই পেক্ষাপটে ১৯২১ সালে তারা চেম্বার অফ প্রিন্সেস নামের একটি পরামর্শমূলক উপদেষ্টার পদ তৈরী করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে নিয়ে এসে ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা

করা হয়েছিল কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পায় নি। দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। তাদের ধারণা ছিল, ক্রিপ্স মিশনের প্রস্তাব ভারতের ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতিকে অস্বীকার করেছে। দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা ভারতের বল্কানিকরণের পথ সুগম করবে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাদের ধারণা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর মত দেশীয় রাজ্যসমূহকে একই শর্তে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যোগদান করতে হবে।

উক্ত সময়ে দেশীয় রাজ্যের রাজারা ছিলেন বিভ্রান্ত এবং কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করাও ছিল কষ্টসাধ্য। কোন কোন রাজ্য যেমন বিকানির ও জওহর আদর্শগত ও দেশপ্রেমের কারণে স্বাধীন ভারতে যোগদান করতে ইচ্ছ প্রকাশ করেন। বহু দেশীয় রাজ্যের ধারণা ছিল যে তারা তাদের ইচ্ছামত ভারত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারবে, অথবা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে অথবা অন্যান্ন দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে একযোগে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্গত হতে পারে। ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদ ঘোষণা করে তারা ভারত বা পাকিস্তান কোন পক্ষই অবলম্বন করবেন না । হায়দ্রাবাদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে নিজের বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং সমুদ্রপথে

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পর্তুগালের কাছ থেকে গোয়া কেনা বা ভাড়া নেওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করে। থোরিয়াম সম্ভারের জন্য ত্রিবাঙ্কুর তার কৌশলগত গুরুত্বের উল্লেখ করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দাবি করতে থাকে। কিছু কিছু রাজ্য সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে উপমহাদেশে ভারত বা পাকিস্তানের বিকল্প একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। ভূপাল অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম লিগের সাথে সমঝোতা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভারতে যোগদানের চাপকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সিংহভাগ রাজ্যের রাজারা ছিলেন চরম সুবিধাবাদী এবং তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে বড় রাজ্যগুলো রক্ষা করবে এই বিশ্বাস কারুর ছিল না। হিন্দু রাজারা মুসলিম শাসকদের বিশ্বাস করতেন না। বিশেষ করে ভূপালের নবাব হামিদুল্লাহ্ খানকে পাকিস্তানের গুপ্তচর ভাবা হতো। অনেক রাজ্য আবার ভারতে অন্তর্ভুক্তিকে ভবিতব্য মনে করে কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে এই আশায় যদি কোনো উপায়ে বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায়। যে রাজ্যগুলো ভেবেছিল জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিম লিগের সাহায্যে কংগ্রেসের ভারতে অন্তর্ভুক্তির চাপকে প্রতিহত করতে পারবে, মুসলিম লিগ গণপরিষদে যোগ না দেওয়ায় সে আশা ভেঙে যায়। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ গণপরিষদে বরোদা, বিকানির, কোচিন, গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর, পাটিয়ালা ও রেওয়া যোগ দিলে একযোগে গণপরিষদ বয়কটের পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। বহু দেশীয় রাজ্যেই রাজা স্বাধীনতার পক্ষে হলেও প্রজারা তাদের রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিল। ত্রিবাঙ্কুরে দেওয়ান সি. পি রামস্বামীকে খুনের চেষ্টা হলে ত্রিনাঙ্কুরের রাজা স্বাধীনতার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কিছু কিছু রাজ্যের দেওয়ান অথবা মুখ্যমন্ত্রী রাজাকে বুঝিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে রাজি করান। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুত লর্ড মাউন্টব্যাটেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভি.পি. মেনন - প্রমুখেরাই মুখ্য ভূমিকা রাখেন। পরবর্তী দুইজন রাজ্যবিভাগের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন, যা দেশীয় রাজ্যসমূহের সাথে সম্পর্কে ভূমিকা রাখে।

বহদূর বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসন, দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর নিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য শর্ত দেশীয় রাজ্যের অধিপতিদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে সমর্থনের অভাববোধ অনুভব করা এই অধিপতিরা এইসকল কারণে ও অভ্যন্তরীণ চাপে একীভূত হওয়ার প্রতি এগিয়ে আসেন। মে, ১৯৪৭ থেকে ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক রাজ্য একীভূতকরণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিছু রাজ্য তখনও স্বাক্ষর করেনি। কিছু রাজ্য এমনিতেই স্বাক্ষরে দেরি করে। পিপলোদা, কেন্দ্রীয় ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্যন্ত একীভূত হয়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যোধপুর, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর। যোধপুর পাকিস্তানের সাথে একীভূত হতেই আগ্রহী ছিল; জুনাগড় বস্তুত পাকিস্তানের সাথে একীভূত হতে সম্মত হয়নি। এছাড়া হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর স্বাধীন থাকতেই চেয়েছিল।

একত্রীকরণের দলিল অনুযায়ী কেবলমাত্র তিনটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকারের হাতে সমর্পণের মাধ্যমেই তারা ভিন্ন ধরণের প্রশাসন ও শাসনাধীন একটি অপেক্ষাকৃত দূর্বল রাজ্যে, তথা একত্রীত ভারতের অংশে পরিণত হয়। রাজনৈতিক একত্রীকরণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদেরকে, ভারতের প্রতি তাদের আনুগত্য, প্রত্যাশা, এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাধ্য করবার প্রয়োজন ছিল। এই কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। যেমন মাইশোরের বিধানিক শাসন ব্যবস্থা একটি বিস্তৃত ভোটাধিকারের ভিত্তিশীল ছিল, যা ব্রিটিশ ভারতের ব্যবস্থার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন ছিল না। অন্যান্য স্থানে, রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণের ঘটনাগুলো ক্ষুদ্র ও অভিজাত চক্রের মধ্যেই সীমিত ছিল। সেইসাথে এর শাসন ব্যবস্থাও ক্ষণজীবী ও তোষামুদি ঘরানার ছিল। দেশীয় রাজ্যের একত্রীকরণের এইসব নানাবিধ ঝামেলা এড়ানোর জন্য ভারত সরকার

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ কলোনীভুক্ত প্রদেশগুলোতে একটিমাত্র প্রজাতন্ত্রী সংবিধান প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫) সহায়ক গ্রন্থ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. রাধারমন চক্রবর্তী - *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন*

2. ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ের - *ফ্রিডম এট মিডনাইট*

3. Judith M. Brown -*Gandhi's Rise to Power: Indian Politics 1915-1922.*

4. Romesh Chunder Dutta - *The economic history of India, Vols-II*

5. Amales Tripathi -*Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833.*

6. Anil Kumar Sarkar -*British Paramountcy and The Coach Behar State*

7. সমর কুমার মল্লিক - *আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর*

8. অনাদি কুমার মহাপাত্র- *ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন*

9. সুমিত সরকার- *আধুনিক ভারত -১৮৮৫-১৯৪৭*

10. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস*

11. Bipin Chandra- *Rise and Growth of Economic Nationalism in India*

12. Smt. N. K. Majumdar- *Justice and Politics in Bengal*

13. K N Raj- *Indian Economic Growth: Performance and Prospect.*

14. V. P. Varma, *Modern India Political Thought*

15. Jawaharlal Nehru- *The Discovery of India*

16. Luigi Sturzo-*Nationalism and Internationalism*

17. Ivan Timofeevich Frolov- *Dictionary of Philosophy,*

৬) নমুনা প্রশ্নাবলী

১) Describe the rise of Neo Darbari State in Company rule.

২) Discuss the Legal reformation by the East India Company.

৩) What was the concept of State by Gandhi, Tagore or Nehru?

৫.৩.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss the consequences of the periodic settlements.
2. How do you explain increase in the cultivation of export crops during the colonial period?
3. Analyse different aspects in the organization of production of export commodities.

হাতে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা কৃষিতে গতি আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া ফসল ফলার সাথে সাথে তারা পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী কম দামে ব্যবসায়ী বা মহাজনের কাছে ফসল, বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। ভারতের কৃষিতে ফসলের বাজার, ঋণের বাজার ও জমির বাজারের, মধ্যে একটা সংযুক্তির সৃষ্টি হয়। খাজনা, সুদ ও দামের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের হার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় বাণিজ্যিকীকরণ কৃষিতে গতিশীলতা এনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে সমৃদ্ধ করবে তা সম্ভব ছিল না। তবে অবশ্যই ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিকীকরণ সুফল দিতে কার্পণ্য করেনি। কৃষির বাণিজ্যিকীকরনের ফলে ও জমির বাজার তৈরি হওয়ায় জমির হস্তান্তর দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। ঋণগ্রস্ত কৃষককুল বহু জায়গায় মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়। শেষে বন্ধকী জমি হারিয়ে খাজনায় বা ভাগে জমি নেয়। ডেভিড ওয়াশব্রুক, নীল চালর্সওয়ার্থ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই ছিল মহাজন, কোন বাইরের লোক নয়। এরা শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। তবে এ ব্যাপারে অঞ্চল ভেদে পার্থক্য দেখা যায়। বহিরাগত (‘দিকু’) মহাজন, বানিয়া ও নানা ধরনের ঠিকাদারও গ্রামীণ কৃষি সম্পর্ককে জটিল করে।

উপরের আলোচনা থেকে যে ব্যাপারগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলি হল ঔপনিবেশিক ভারতে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যে বিকাশ ঘটেছিল, তা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রেখেই হয়েছিল। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাড়িয়ে সম্পদের নির্গমনের তাগিদ প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় থেকেছে ভারতে বেনিয়া ও মহাজনী পুঁজির প্রাধান্য বজায় রেখে। বড় ও মধ্যচাষীরা বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়। কিন্তু সাধারণ ও প্রান্তিক চাষীরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাপে পড়ে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। রপ্তানি পণ্য বা বাণিজ্যিক পণ্যের দামবৃদ্ধির সুযোগ অনেক ক্ষেত্রেই তারা পেত না। যাইহোক, রপ্তানির জন্য কৃষিপণ্যের ব্যাপক উৎপাদন কৃষিকে বাজারের উপর অধিক নির্ভরশীল করে তোলে ও বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তন আসে, যা কৃষি সম্পর্কগুলিকে প্রভাবিত করে।

৫.৩.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Kumar, Dharma ঃ The Cambridge Economic History of India, Vol. II (Delhi-1982)
2. Blyn, George ঃ Agricultural trends in India, 1891-1946
3. ভট্টাচার্য সব্যসাবী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৯৮৭)

দেখা যায় এরাই চাষীকে তুলা চাষ করতে আগাম দেয়, উৎপাদিত তুলো বাজার জাত করে, পণ্যের দাম নির্ধারণ করে, চাষীকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ দেয়। এই উদাহরণ থেকে এটা দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক কৃষি পণ্যের বাণিজ্যের প্রক্রিয়ায় কৃষকের পরাধীনতা বিভিন্নভাবে বাড়ে। উৎপাদনের বিনিয়োগের জন্য অগ্রিম, রাজস্ব বা জীবনধারনের জন্য ঋণ, পণ্য বাজারজাত করার জন্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর নির্ভরতা—এই রকম বিভিন্নভাবে কৃষকরা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে ধনী চাষীরাও মহাজনের ভূমিকায় নেমে পড়ে। অন্যদিকে সাধারণ কৃষকরা রাজস্বের চাপে, বা ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে বাণিজ্যিক ফসলের চাষে বাধ্য হয়। অনেকের মতে সাধারণ বা গরীব চাষীদের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কোন স্বেচ্ছা প্রণোদিত, স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয় বরং বাধ্যবাধকতার ফসল (forced commercialisation)।

যাইহোক বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের আরও দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে — আঞ্চলিক বিশেষীকরণ এবং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার। রেলপথ সম্প্রসারণের সাথে সাথে সীমিতমাত্রায় হলেও ভারতের কৃষিতে আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ঘটে। এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণ আবার কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ভারতের এক একটা অঞ্চলে জলবায়ু অনুযায়ী কৃষকরা এক এক ধরনের শস্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। যেমন দক্ষিণ ভারতে আগ্নেয়শিলাজাত কালোমাটির অঞ্চল লম্বা আঁশযুক্ত তুলো চাষের উপযোগী। ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পে এই ধরনের তুলো থেকে তৈরি সুতোর চাহিদাই বেশি ছিল। দক্ষিণ ভারতে চাষীরা আগে গম, বাজরার সাথে কিছুটা তুলোও উৎপাদন করত। রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় ও ইংল্যাণ্ডের তুলোর চাহিদা মেটাতে এখানকার কৃষকরা তুলো উৎপাদনে বিশেষীকরণ করে বা করতে বাধ্য হয়। তুলো বিক্রির টাকায় তারা খাদ্যশস্য কিনত। এর ফলে খাদ্যশস্যেরও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়। খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রি করার তাগিদ বাড়ে। আঞ্চলিক বিশেষীকরণ বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এটি আবার কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের পথ সুগম করে। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি উৎপাদনের উন্নতির জন্য কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়া হয় — এগুলির মধ্যে ছিল কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি বিভাগ স্থাপন প্রভৃতি। আলোচ্য সময়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় কৃষি বিভাগ গঠিত হয় (১৯০৬)। কৃষি বিভাগ, তুলা, আখ, গম প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উচ্চফলনশীল বীজ প্রবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

শস্য রপ্তানি ভারতের কৃষককে বাজারমুখী করেছিল। বিভিন্ন ফসলের দাম বাড়া কমার সাথে আবাদী জমির ব্যবহারের (land utilisation) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এটা কৃষি উৎপাদনে বাজারের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দিকটি স্পষ্ট করে। তবে এই ব্যাপারটি সমগ্র কৃষককুলকে-সমৃদ্ধ করেনি। ভারতের রপ্তানিজাত শস্য উৎপাদক চাষীরা ছিল প্রধানত ক্ষুদ্র কৃষক বা প্রান্তিক চাষী, যারা প্রায়ই মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সুদ ও দাদন ব্যবস্থার জালে জড়িয়ে থাকত। খাজনা ও সুদ মিটিয়ে তাদের

১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সময়কালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তুলো, বাংলায় পাট, উত্তর প্রদেশে চিনির জন্য আখ, মাদ্রাজে চিনা বাদামের উৎপাদন বিস্তারলাভ করে। এগুলি মূলতঃ বাজারজাত করার জন্যই চাষ করা হয় বলে, এগুলিকে অনেক সময় নগদী ফসল বা Cash crop বলা হয়। তবে কৃষিপণ্যের বাজার এই Cash crop মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না — খাদ্যশস্যও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। অকৃষি সম্প্রদায় থেকে শুরু করে নগদা ফসলের উৎপাদনকারীরাও খাদ্যশস্যের জন্য বাজারের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হতো। ১৮৬০-র দশকে চাল ও গম রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭০-র দশকের মধ্যবর্তী সময়কালে প্রতি বছর প্রায় ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের খাদ্য সরবরাহ সুরক্ষিত করতে খাদ্যশস্যের রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছিল। যাইহোক রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপেক্ষা নগদা ফসলের উৎপাদনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সরকারি হিসাবে মোটামুটি দেখা যায় যে, বর্মাসহ ব্রিটিশ ভারতে ১৯০১-৩৭ সময়কালে খাদ্যশস্যের আবাদ করা জমির এলাকা বেড়েছে মাত্র ১৬%, অন্যদিকে নগদা ফসলের আবাদী এলাকা বেড়েছে অনেক বেশি হারে — যেমন আখ চাষে ৬৯%, তুলা চাষে ৫৯% তৈলবীজ চাষে ৩৬%। পাট চাষের আবাদী জমি ১৪% হারে বৃদ্ধি পায় — এর কারণ ছিল পাট সর্বভারতীয় ফসল ছিল না। এর উৎপাদন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধ্যাপক George Blyn তাঁর Agricultural trends in India, 1891-1946 গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৮৯১-১৯৪৬ সময়কালে নগদা ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি দশকে ১৩% মতন, যেখানে মোট খাদ্যশস্যে বৃদ্ধির হার দশকে মাত্র ১%। তাছাড়া একর প্রতি উৎপাদনের হারও খাদ্যশস্য অপেক্ষা নগদা শস্যে বেশি ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে অধিক বিনিয়োগ নগদা শস্যেই বেশি হয়েছিল।

এবারে আমরা রপ্তানির জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার কয়েকটি দিকের উপর আলোচনা করতে পারি। নগদ টাকায় রাজস্ব দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে জমি থেকে অধিক আয়ের জন্য, বাণিজ্যিক শস্য চাষে কৃষকরা উদ্যোগী হতে থাকে। কিন্তু এরজন্য বেশি অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল — যা অনেক সময়ই কৃষকদের হাতে থাকত না। ফলে তারা মহাজনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হতো। আবাদের জন্য ঋণ (production loan) ছাড়াও মহাজনরা কৃষকদের জীবন ধারনের জন্য ঋণ (Consumption loan) দিত। এই ধরনের ঋণের সুদ ২০০ থেকে ৩০০% পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় মহাজনরা ঋণ দানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের উপর দাবিও করতে পারত। রপ্তানির পণ্য উৎপাদন করলেও চাষীর পক্ষে সরাসরি পণ্য নিয়ে বাজারে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে তাকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হতো। অর্থাৎ রপ্তানির জন্য কৃষক উৎপাদন করলেও তার লাভ সে খুব একটা পেত না — সচ্ছল চাষী, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীই লাভের বেশির ভাগ অংশ গ্রহণ করতো।

বস্তুত দেখা গেছে রপ্তানি উপযোগী কৃষি পণ্যের বাজার বাড়ার সাথে সাথে এই ধরনের কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী ও মহাজনি পুঁজির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে এবং সেখানে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণ বিধির চাপে ব্রিটিশ কোম্পানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য কৃষিজ পণ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। রপ্তানির জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৮৩০ সালের পর বাংলায় পাট চাষ বৃদ্ধি পায়। একই কারণে দাক্ষিণাত্যে তুলাচাষেরও বিস্তার লাভ ঘটে। ১৮৪০-র পরবর্তী সময়ে ভারতে কিছু বিদেশি জাতের তুলার উৎপাদনে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৮৫০-র পরবর্তী সময়কালে ভারতে রেলপথের সম্প্রসারণ হলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। রেলপথের মাধ্যমে ভারতের গ্রামীণ এলাকাগুলি বন্দরগুলির সাথে যুক্ত হয়। এর পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবহণের উন্নতি ও পরিবহণ ব্যয় কমে গেলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বহির্মুখী প্রবাহ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৪) ভারত থেকে কাঁচা তুলার রপ্তানির আয়তন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ বস্ত্র উৎপাদন কারীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা তুলার বড় অংশ আমেরিকার কাছ থেকে পেত। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের কারণে, সেখান থেকে তুলা রপ্তানি কমে গেলে, ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতীয় তুলার উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। D.R. Gadgil, তাঁর Industrial Evolution of India গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ব্রিটেনে ভারতীয় তুলার রপ্তানি আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে তুলার মূল্যও প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তুলা রপ্তানি আবার পূর্বের স্বাভাবিক স্তরে নেমে আসে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে তুলার মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি পায় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুলার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। এর পরের বছরগুলিতে তুলা ভারত থেকে রপ্তানিকৃত কৃষিপণ্যগুলির মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করে থাকে। ১৯২৯-র মহামন্দার সময় তুলার রপ্তানির পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। রপ্তানি মূল্যও হ্রাস পাওয়ায় ১৯২৫-২৬ সাল থেকে ১৯৩৩-৩৪ সালের মধ্যে কাঁচা তুলা রপ্তানি থেকে আয় ৭৫% হ্রাস পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শস্য উৎপাদনের জন্য অধিক জমি ব্যবহার করার জন্য তুলার উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ কাঁচা তুলার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১.৬ লক্ষ টন, যার মূল্য ছিল ২২.৬ কোটি টাকা। তুলার ব্যাপারটি থেকেই বোঝা যায় যে, ভারত বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে ঔপনিবেশিক সরকার যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সরকারি করনীতির দ্বারা কৃষিপণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হয়। কৃষিদ্রব্যের রপ্তানিশুল্ক খুব কম রাখা হয় ও ঊনবিংশ শতকের শেষে চাল ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রধান কৃষিপণ্য বিনাশুল্কে রপ্তানি হতো। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আবার বিভিন্ন সময়ে কাঁচা চামড়া, পাট ও চা, তুলো ইত্যাদির উপর রপ্তানি শুল্ক বসানো হয়। করনীতি ছাড়াও ঔপনিবেশিক আমলে রেলপথের বিন্যাস কৃষিপণ্যের রপ্তানিকে সুগম করে। রেলভাড়া এমনভাবে নির্ধারিত হয়, যাতে কাঁচামাল সস্তায় শহরে বা বন্দরে পৌঁছাতে পারে। এই সব ব্যাপারগুলি কৃষি পণ্যের রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করে।

গড়ে একর প্রতি ছিল ২.৬২ টাকা। কিন্তু এতে লাভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন সাধারণ কৃষকদের হয়নি- লাভবান হয়েছিল ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্ব ভোগী সম্প্রদায়। আর তাদের লাভের সাথে কৃষির উন্নয়ন বা কৃষিতে বিনিয়োগের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না। যাইহোক, অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলি কৃষির প্রসার, উৎপাদন ও রায়তদের জীবন যাত্রার মানকে ব্যাহত করেছিল, যার প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে।

৫.৩.২.২ : কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ

রপ্তানিকৃত কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নূতন উপাদান সমূহের আবির্ভাব :

রপ্তানিকৃত কৃষি পণ্যের (export crops) উৎপাদন বৃদ্ধি ও এগুলির উৎপাদন প্রক্রিয়ার (organization & production) ক্ষেত্রে নূতন উপাদানসমূহের উপস্থিতির ব্যাপারগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি দ্রব্য বাজারে আসত, যা অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। সপ্তদশ শতক থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ইউরোপের সাথে যে বাণিজ্য হতো, তাতে মূলতঃ কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হতো। তবে রঞ্জক নীলের মতো কয়েকটি কৃষিপণ্যও রপ্তানি হতো। সুতরাং প্রাক-ব্রিটিশ যুগে রপ্তানির জন্য কৃষি পণ্য যে উৎপাদিত হতো না তা নয়। কিন্তু উনিশ শতক থেকে বিপুল পরিমাণে কৃষিপণ্য রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য উৎপাদিত হতে থাকে, ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। আগের যুগের তুলনায় শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য নয়, রপ্তানিকৃত কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও কিন্তু নূতন উপাদানের সংযোজন ঘটে। আর সামগ্রিক ব্যাপারটিই ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকার্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটায় ঔপনিবেশিক ভারত থেকে কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে হয়— এটা ছিল ভারতের ঔপনিবেশিক বাধ্যবাধকতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতকে কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটাতে হয়। কৃষিপণ্য রপ্তানির বাজার যত বাড়তে থাকে, বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া তত ত্বরান্বিত হয়। কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পদ বহির্গমনের ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি করে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা হতো, যার মাধ্যমে ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদ নির্গমনের পথ প্রশস্ত করা হতো। সুতরাং সম্পদ নির্গমনের স্বার্থে কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

ঔপনিবেশিক যুগের বহু আগে থেকেই ভারতে নানা ধরনের উন্নত মানের তৈলবীজ, তুলা, পাট, মশলা, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় কৃষিজ পণ্যাদির রপ্তানির যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এই সময়

কৃষকরা শোষিত হবে-এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। তৎকালীন ভারতে ভূমি রাজস্ব ছিল রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস-ফলে ভারত থেকে ব্রিটেনে যে সম্পদ বহির্গমন হয়, তার বেশির ভাগটাই এসেছে-ভূমিরাজস্ব থেকে। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে রাজস্বের হার ছিল খুবই বেশি এবং প্রয়োজনে তা বাড়ানো যেত। এইসব অঞ্চলের কৃষকরা তাদের শস্য বেচার পাশাপাশি মহাজনের কাছে ঋণ নিয়েও সরকারের রাজস্ব মেটাতে বাধ্য হ'ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষিতে ঋণের বাজার ও কৃষি পণ্যের বাজারের মধ্যে এক ধরনের সংযুক্তি ঘটেছিল, ঋণের বাজারেও দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীরা ঋণদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ঋণদাতাদের কাছেই অনেক সময় কৃষকরা স্বল্প দামে কৃষি পণ্য বেচতে বাধ্য হ'ত। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপেরও একটা ভূমিকা ছিল। তুলো, নীল প্রভৃতি নগদ শস্যের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকরা প্ররোচিত হয়, এমনকি কোথাও বাধ্য হয়।

রায়তদের দুরবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়ার মধ্যে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন এলাকাগুলি অপেক্ষা অস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন এলাকাগুলিতে দুর্ভিক্ষের আধিক্য দেখা যায়। ১৮০২-৪, ১৮০৬-৭, ১৮১২-১৫, ১৮১৮-২০, ১৮২৩-২৬, ১৮৩০-৩২, ১৮৩৭, ১৮৫৪, ১৮৬০ - এই সব বছরগুলিতে রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মহারাণীর প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হবার প্রায় সাথে সাথেই উত্তর ভারতে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা যায় — ১৮৬০ সালে এই দুর্ভিক্ষের পর প্রথম দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত সরকারি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বেয়ার্ড স্মিথ দেখান যে অস্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব বেশি। তিনি এক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন, যাতে কৃষির আয়ের কিছুটা কৃষির উন্নতিতে নিয়োজিত হবে। নতুবা পরবর্তী বন্দোবস্তের সময় বর্ধিত রাজস্বের কারণে কেউ বিনিয়োগ করবে না। ভারত সচিব চার্লস উড নীতিগতভাবে স্মিথের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু স্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতির প্রবক্তারা সমালোচনা শুরু করেন। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে সরকারের আর্থিক অনটন দেখা যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ ছেড়ে দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষপর্যন্ত ভারত সচিব ঘোষণা করেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তই চালু থাকবে (১৮৮২)।

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রমেশচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা বাংলার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার দাবি করেন। এ ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের সাথে বড়লাট লর্ড কার্জনের বিতর্কও হয়। রমেশচন্দ্র দেখান যে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে কৃষির আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্বও বৃদ্ধি পেয়েছে— ফলে চাষির যতটা সুবিধা বেড়েছে তার থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে রাজস্বের চাপ। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষির কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এটা ঠিকই যে স্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে সরকারের কাছে, কৃষিজ আয় কম পরিমাণে যায়। ১৯৩৩-৩৪ সালের একটা হিসাব অনুযায়ী বাংলা প্রদেশে প্রতি একর আবাদী জমির উপর রাজস্ব ছিল ০.৯২ টাকা, যখন মাদ্রাজে রাজস্ব

পর্যায়ে খুব উঁচুহারে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া রাজস্ব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে বেশ ব্যবধান ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে প্রশাসনিক চাপ। রায়তওয়ারি ব্যবস্থার অন্যতম প্রবর্তক মুনরো চেয়েছিলেন রাজস্ব যেন অপরিবর্তনীয় থাকে — কারণ তা কৃষকের পক্ষে অনুকূল হবে। কৃষক চাষ করে যে লাভ অর্জন করবে, তা যাতে-নিষ্কাশিত না হয়ে যায় সেটাই মুনরোর কাম্য ছিল। কিন্তু মুনরোর বক্তব্য, অর্থাৎ রাজস্ব অপরিবর্তনীয় করে রাখার ব্যাপারটি কার্যকর করা হয়নি। ২০ বা ৩০ বছরের চুক্তি শেষে সরকার নূতন চুক্তি করার সময় রাজস্বের হারের পরিবর্তন করত। ফলে বেশির ভাগ সময়ে দেখা যেত যে, রাজস্ব পরিশোধের পর উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে কৃষকের হাতে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না, যা কৃষিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, ফসলের ক্ষতি হলেও রায়ত নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য থাকত। ১৮৭৮ সালে প্রচণ্ড খরা হওয়া সত্ত্বেও রায়তরা খাজনা প্রদানের হাত থেকে রেহাই পায়নি। রায়তের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার মতো বহু বৈশিষ্ট্য এই ভূমি ব্যবস্থায় ছিল। যেমন, সরকার ভূমি রাজস্বকে 'খাজনা' বলার পরিবর্তে এক ধরনের 'ভাড়া' বলে উল্লেখ করেন। ফলে জমির উপর রায়তের চিরাচরিত 'ভূমি-স্বত্ব'-র দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় মাদ্রাজে চাষের উন্নতি হয়নি, কৃষক-এরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি এবং রাজস্বের চাপও কমেনি, বরং বেড়েছে।

শেষোক্ত ব্যাপারটি সরকারের কাছে শুভ হয়েছিল। প্রয়োজনমত এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজস্বের হার পর্যালোচনা ও বৃদ্ধির সুযোগ থাকার ফলে সরকার জমি থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাছাড়া সরকারের সাথে রায়তদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে, প্রশাসনিক জটিলতা ও ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছিল। সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দুটি ক্ষেত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অপেক্ষা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এগিয়ে ছিল।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় আরেকটি দিক ছিল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অবসান। সরকার সরাসরি রায়তদের সাথে বন্দোবস্ত করায় মধ্যবর্তী শোষক জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। তবে রাজস্বের হার অধিক থাকার ফলে কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের মতে, রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে "চাষীই জমির মালিক" এই নীতি কার্যকর হয়নি। রায়তরা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিল যে, অনেকগুলি জমিদারের পরিবর্তে এক বৃহৎ জমিদার হিসাবে স্বয়ং সরকার আবির্ভূত হয়েছে। বোম্বাই-র বিভিন্ন প্রশাসনিক রিপোর্ট থেকে কৃষকদের উপর সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য যে অত্যাচার করা হত, তার বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষিতে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি, রাজস্বের হারও বাড়তে থাকায়, কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিরুৎসাহিত হয়। দেখা যায়, মোট জমির এক-তৃতীয়াংশের বেশি জমিতে চাষবাস হয় না। অস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের এই ত্রুটিগুলি মহলওয়ারি বন্দোবস্তেও ছিল।

বস্তুতঃ সব কটি ভূমিব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সাথে অস্থায়ীভাবে যুক্ত ছিল—সব কটি ব্যবস্থাই ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। প্রাক্-পুঁজিবাদী কৃষিকে ব্রিটিশদের স্বার্থে রাজস্বের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদায়

৫.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ফলাফল।

(২) কৃষির বাণিজ্যিকিকরণ।

(৩) রপ্তানীকৃত কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৪) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নূতন উপাদানসমূহের আবির্ভাব।

৫.৩.২.১ : অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ফলাফল

ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামীণ শ্রেণী সমাবেশ ও কৃষির অবস্থা বিচার করে, সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টায়, নানা জাতীয় ভূমিব্যবস্থার সূত্রপাত করে। এই সময়ে মোটামুটি তিনটি মূল ভূমি ব্যবস্থার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, - বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত ; মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ অস্থায়ী ৩০ বছরের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত, উত্তর ভারতে অস্থায়ী ৩০ বছরের মহলওয়ারি বন্দোবস্ত। অস্থায়ী মহলওয়ারি ব্যবস্থাকেই প্রয়োজনমত অদল বদল করে পাঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে প্রবর্তন করা হয়। বাংলার জমিদারদের মতোই, অযোধ্যার তালুকদারদের সাথে চুক্তি করা হয়, তবে এই চুক্তি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নয়, ৩০ বছরের জন্য করা হয়। বাংলার চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, ও উড়িষ্যায় প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশগুলিতে-সিন্ধু প্রদেশ, আসাম ইত্যাদি-রায়তওয়ারি বন্দোবস্তই অদল বদল করে প্রবর্তন করা হয়। সাধারণত অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি ৩০ বছরের হতো, কিন্তু অনগ্রসর প্রদেশে শীঘ্র আবাদ ও খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় ভূমিবন্দোবস্ত ২০ বছর অন্তর করা হতো। এর উদাহরণ হল পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে সারা ভারতের বৃহদাংশে অস্থায়ী বন্দোবস্তই চালু করা হয়। ১৯২৮-২৯ সালের একটি হিসাব আনুযায়ী দেখতে পাওয়া যায় যে মোট আবাদী জমির ১৯ শতাংশে জমিদারি, ২৯ শতাংশে মহলওয়ারী ও ৫২ শতাংশে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। এখন আমরা এই বিভিন্ন অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের ফলাফল নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে, সরকারি আমলাদের মধ্যে ও জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় প্রথম

পর্যায় গ্রন্থ্ - ৩

Agrarian Settlements and Agrarian Production

একক - ২

(a) Consequences of periodic settlements

(b) Increase in the cultivation of export crops.
New elements in the organization of production of export commodities

---

বিন্যাস ক্রম :

৫.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

৫.৩.২.১ : অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ফলাফল

৫.৩.২.২ : কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

৫.৩.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.৩.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss the background of the introduction of the Permanent Settlement in Bengal.
2. Why did Lord Cornwallis introduce the Permanent Settlement? How far were his expectations fulfilled ?
3. Discuss the effects of the Permanent Settlement on different social classes of agrarian Bengal.
4. Analyse the circumstances leading to the introduction of the Ryotwari settlements.
5. What are the specific features of the Ryotwari and Mahalwari Settlements ?

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সমালোচিত হতে শুরু করলে, সরকার সনাতনী গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবনের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে। অযোধ্যার কিছু অংশ, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা এবং পাঞ্জাবে গ্রামীণ সমাজ সংহতি ও প্রশাসনিক ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে সরকার মনে করে। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ছোট বড় বিভিন্ন মহলে বিভক্ত ছিল। এখানে সরকার সরাসরি রায়তের সাথে চুক্তি না করে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে মহলের বা গ্রামের কর্তৃপক্ষের সাথে অস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করতে মনস্থ করে। অর্থাৎ গ্রাম বা মহালভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থার সাথে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের কিছু নীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মহলওয়ারি ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়, সেখানে রায়তের পরিবর্তে মহল বা গ্রাম বা গ্রাম সমষ্টিকে রাজস্বের জন্য দায়ী ধরে নিয়ে, তার সাথে ভূমিবন্দোবস্ত করা হবে।

মহলওয়ারি ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করেন হোলট্ ম্যাকেনজী, ১৮১৯ সালে তিনি একটি প্রতিবেদনে এই নূতন ধরনের মহলওয়ারি ভূমি ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। ১৮২২ সালে এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় ও পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল বেন্টিংকের সমর্থন ও রবার্ট বার্ড এবং জেমস টমসনের ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই বন্দোবস্ত চূড়ান্তরূপ পায়। উত্তর ভারতে ভূমিবন্দোবস্ত বোম্বাই-র তুলনায় অনেক বেশি জমি জরিপ, পরিসংখ্যান ও হিসাবের ভিত্তিতে রূপায়িত হয়েছিল। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট রাজস্ব মহলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ করে আদায় করা হত। Holt Mackenzie-র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৮২২ সালের যে রেগুলেশন (Regulation VII) জারী করে 'মহলওয়ারি' বন্দোবস্তকে বাস্তবায়িত করা হয়, তাতে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের সুপারিশ ছিল। স্থির হয়, ২০/৩০ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। এই সময়সীমার পরে আবার পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করা হবে। রাজস্ব হিসাবে নিট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ নেবার কথা বলা হয়। কিন্তু এটা খুব বেশি মনে হওয়ায় ১৮৫৫ সালে ঠিক করা হয় যে যেখানে ভূস্বামী খাজনা পায়, সেখানে খাজনার অর্ধেক এবং অন্যত্র নিট উৎপাদন মূল্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো, এখানেও নিট উৎপাদন মূল্য হিসাব করা সহজ ছিল না। ফলে পূর্বতন রাজস্বের হার, উৎপন্নের দাম, পাশ্ববর্তী এলাকায় খাজনার হার ইত্যাদির সমন্বয়ে রাজস্ব নির্ধারিত হতে থাকে।

৫.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Kumar, Dharma ঃ The Cambridge Economic History of India, Vol II (Delhi, 1982)
2. Sinha, N. K.ঃ Economic History of Bengal Vol-II (Calcutta, 1965)
3. Mukherjee, Nilmoni ঃ The Ryotwari System in Madras, 1792-1827 (Calcutta, 1962)
4. ভট্টাচার্য সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৯৮৭)

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারলাভ করলে, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনার কথা ভাবা হয়। ১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজের বড়ামহল অধিগ্রহণ করে। নব অধিকৃত অঞ্চলের শাসনদায়িত্ব গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্মচারী আলেকজাণ্ডার রীড, টমাস মুনরো প্রমুখ বড়মহল অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। এখানে সরাসরি রায়তদের সাথে বন্দোবস্ত প্রথা চালু ছিল। ক্যাপ্টেন রাও এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে বড়ামহল অঞ্চলে, ১৭৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে রায়তওয়ারি প্রথা চালু করেন। এরপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এই ব্যবস্থা কিছুটা পরিপূর্ণতা পায়। ১৮২০-২৭ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজের গভর্নর থাকাকালীন মুনরো ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল না, সেখানে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু করেন। দক্ষিণী ভূস্বামীশ্রেণী পলিগারদের ক্ষমতাচ্যুত করে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরাসরি কৃষকদের সাথে বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় রায়তগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে জমির উপর মালিকানা স্বত্ব পায়। সাধারণত ২০ বা ৩০ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হত। নির্দিষ্ট সময়ের পরে সরকার নূতন করে বন্দোবস্ত দিতে পারত। নূতন বন্দোবস্তের সময় সরকার রাজস্বের হারও বৃদ্ধি করতে পারত। রীডের ঘোষণাপত্রে নীট আয়ের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে ধরা হয়। তবে নীট আয়ের পরিমাণ জানা সহজ ছিল না। মুনরোর মতে, প্রথম দিকে রাজস্ব বড় উঁচু হারে ধরা হয়েছিল, বিশেষত, যেহেতু ফসল ও তার দামের বাড়া-কমার সাথে রাজস্বের তারতম্য হতো না। মুনরোর নিজের সুপারিশ ছিল রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। ১৮৬১ সালে ৩০ বছরের জন্য নয়া বন্দোবস্ত শুরু হয়। এখানে মোট কৃষিজ আয় থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে, যা থাকে তার অর্ধাংশকে রাজস্ব হিসাবে ধরা হয়।

মাদ্রাজের মতো বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথমে আর. কে. প্রিংগল ও পরে গোল্ড স্মিথ, জর্জ উহনগেট প্রমুখ বোম্বাইয়ে এই ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এখানে একই রাজস্ব তত্ত্ব গৃহীত হলেও প্রয়োগের সময় একটু অন্যভাবে হিসাবটা করা হয়। ১৮২৪-২৮ ও ১৮৩৫-৭২ সালে বিভিন্ন পর্যায়ে যে বন্দোবস্ত করা হয় তার মূল সূত্র উৎপাদন ও খরচের হিসাব নয়,— বিভিন্ন জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও পূর্বতন বন্দোবস্তে রাজস্ব হারকে ভিত্তি করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়। মাদ্রাজের মতো বোম্বাই-তেও বন্দোবস্ত ছিল অস্থায়ী—সাধারণত ৩০ বছরের জন্য।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের মতন অঞ্চলগুলিতে গ্রাম সংগঠনের অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মাদ্রাজে মুনরো কিংবা বোম্বাই-এ এলফিনস্টোন তৎকালীন গ্রাম সমাজের প্রশাসনিক কার্যকারিতার উপর জোর দিলেও, এগুলিকে এড়িয়ে রায়তের সাথে সরাসরি চুক্তির কথা বলেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনে গ্রাম সমাজের কোন জায়গাই থাকেনি। কিন্তু

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছাড়াও ছিল ইংল্যাণ্ডের উপযোগবাদী (utilitarian) অর্থনীতি ও শাসননীতির প্রভাব—অন্যভাবে বলতে গেলে ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) ও জন বেন্থাম (John Bentham)-র চিন্তাধারার প্রভাব। Eric Stokes তাঁর 'The English Utilitarians and India' গ্রন্থে এই দুই মনীষীর ভারতের সরকারি নীতির উপর প্রভাব আলোচনা করেছেন। বেন্থামের প্রভাব পড়েছিল মূলতঃ আইন ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণে, আর রিকার্ডোর প্রভাব ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ে। ১৮২১ প্রকাশিত Principles of Political Economy গ্রন্থে রিকার্ডো বলেন যে জমিদাররা খাজনা পায় জমির উপর মালিকানা স্বত্বের কারণে। জমিদাররা খাজনা সংগ্রহ করে, কিন্তু কৃষি উৎপাদনে তাদের ভূমিকা নগণ্য। রিকার্ডোর মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, পুঁজিপতি পুঁজি দেয়, উদ্যোগী ব্যবসাদার বা শিল্পপতি দেয় উদ্যোগ, শ্রমিক দেয় শ্রম। সুতরাং এইসব উৎপাদক শ্রেণীর উপর কর বসালে তাদের বিকাশ ব্যাহত হয় বা উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যেহেতু জমিদার উৎপাদনের জন্য কিছু করে না, জমির উপর মালিকানা স্বত্বের কারণে অনার্জিত আয় (Unearned income) গ্রহণ করে, তাই জমিদারের আয়ের উপর কর স্থাপন ভাল—কারণ এতে সরকারের আয় হয় ও অন্যদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরও চাপ পড়ে না। সুতরাং জমিদারের আয়ের উপর যতটা সম্ভব কর চাপানো ভাল-জমিদারি ব্যাপারটাই পুরো তুলে দেওয়াও যেতে পারে, কেননা এতে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় না। এই রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতি ভারতে ইংরেজ প্রশাসকদের প্রভাবিত করেছিল, যারা জমিদারদের বাদ দিয়ে ভূমি বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন।

ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের অনুগামীদের মতে, ভারতে রায়তদের উপর জমির স্বত্বাধিকার দিলে, রায়তরা নিজ স্বার্থেই উৎপাদন প্রসারে উদ্যোগী হবে — জমিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হলে ব্রিটেনে এর রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এ সবের ফলে একদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, ভারত থেকে শিল্প সমৃদ্ধ ব্রিটেনে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত হবে ও অন্যদিকে কৃষকদেরও ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, যা ব্রিটিশদের বাজার দখলের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবে। সুতরাং রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে জমিদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের সরিয়ে দিয়ে রায়তদের সাথেই সরাসরি চুক্তি তথা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত-র ধারণা সরকারি মহলে গুরুত্ব লাভ করে।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার জনক ছিলেন Thomas Munro. তিনি ও জেমস মিল, দুজনেই ছিলেন রিকার্ডো পন্থী। এরা ভারতের ভূমিব্যবস্থা থেকে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অপসারণ চেয়েছিলেন। কিন্তু, জমির মালিকানা রায়তদের হাতে থাকা উচিত না রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত। তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মুনরো রায়তদের স্বত্বাধিকার স্বীকার করতেন; কিন্তু জেমস মিল রাষ্ট্রের হাতে জমির মালিকানা রাখার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৮২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে মুনরো রায়তকেই প্রকৃত জমির মালিক বলে মনে করেন। জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রতি আস্থাই মুনরোকে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার প্রতি অনুগত করে তুলেছিল।

প্রথমেই বোঝা গিয়েছিল। ফলে জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে কোম্পানি অন্য ভূমিব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকার ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ গ্রহণ করেছিল, উনিশ শতকে আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের মাত্র ২৮ শতাংশ সরকার পেত। ১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারের প্রাপ্য ১৮.৫ শতাংশে নেমে যায়। ভূমি থেকে আয় সরকারি কোষাগারকে নয়, জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সমৃদ্ধ করেছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, সরকারের রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আর্থিক প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। ভূমি থেকে বর্ধিত আয়ের ভাগ সরকার পায়নি, সেজন্য সরকার এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ভারতে অন্যত্র করতে চায়নি।

তবে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করতে, সরকার জমিদারদের এ ব্যাপারে অবাধ কর্তৃত্ব দিতে দ্বিধা করেনি। ১৭৯৩ সালে ১৭ নং রেগুলেশন এবং ১৭৯৫ সালে ৩৫ নং রেগুলেশন জারী করে সরকার অনাদায়ী রায়তের সম্পত্তি দখল করার অধিকার জমিদারের হাতে তুলে দেয়। ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন (Regulation VII) দ্বারা জমিদারদের হাতে অনাদায়ী রায়তের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ এই আইনকে ‘a blank cheque to the Zemindar’ বলে বর্ণনা করেছেন। অনেক পরে ১৮৫৯ সালের দশম রেগুলেশন ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন জারী করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যাইহোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক নূতন জমিদারি ও জমিদারের আবির্ভাব হয়। এই নূতন জমিদারদের অনেকে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারি ও জমিদারি আমলা। আর্থিক লাভ ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য এরা ভূমিব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন—কৃষিতে বিনিয়োগ বা পুঁজিবাদী পরিবর্তন ঘটানো এদের উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও এদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালের বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, গ্রামীণ বাংলার আর্থিক পুনরুজ্জীবনে এরা উৎসাহী ছিলেন না। বাংলার কৃষকরা ক্রমবর্ধমান মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের শোষণের শিকার হয়েছিলেন।

৫.৩.১.৩ : রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থা

পটভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ :

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমন কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল, যা এই ব্যবস্থার প্রবক্তাদের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারেনি, তবে এই বন্দোবস্তের রূপায়ণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোম্পানি ভারতের অন্যান্য অংশের ভূমি বন্দোবস্তে স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবর্তী শ্রেণী বাদ দিয়ে সরাসরি রায়তের সাথে রাজস্ব চুক্তি ও স্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে ২০ বা ৩০ বছর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ, যাতে কৃষির প্রসার ও বাজার বৃদ্ধি পেলে সরকার বর্ধিত আয়ের একটা অংশ পেতে পারে। তবে এই নতুন চিন্তার পেছনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলির

বেশি পরিমাণে অর্থ আদায় করতে থাকেন। তাছাড়া জমি থেকে রাষ্ট্রের আয় নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, পরবর্তীকালে জমির উৎপাদন ও দাম কয়েকগুণ বাড়া সত্ত্বেও সরকার এই বর্ধিত আয়ের ভাগ পায়নি। জমিদাররা এই বর্ধিত, অনার্জিত আয় বৃদ্ধির (unearned increment of income) সুবিধা লাভ করেছিল। কর্ণওয়ালিস ধরে নিয়েছিলেন যে জমিদার স্থায়ী স্বত্ব পেলে, তারাও রায়তদের স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করবে। কিন্তু তা হয়নি। ১৭৯৩-র অষ্টম রেগুলেশনে কৃষকদের পাট্টা প্রদানের নির্দেশ থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। জমিদাররা পাট্টা প্রদান করে রায়তদের স্বত্বদানে ইচ্ছুক ছিলেন না। আবার রায়তরাও পাট্টা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না কারণ পাট্টা নিলে জমি জরিপ করতে হবে — সেক্ষেত্রে তাদের যে কিছু অতিরিক্ত জমি দখলে আছে তা ধরা পড়ে যাবে এবং হস্তচ্যুত হবে। এতে কৃষকরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Peter J. Marshall রায়তদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতাকে সমালোচনা করেছেন।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথম দিকের জমিদারদের পক্ষে শুভ হয়নি। কঠোর সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিদার ঠিক সময়ে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত। ফলে ১৭৯৩-১৮১৫ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশ জমিদারি হাত বদল হয়। পরবর্তীকালে জমির উৎপাদন ও দাম বৃদ্ধির ফলে জমিদারি অধিক লাভজনক হয়ে ওঠে এবং জমিদারির হাত বদলের হার কমে যায়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, জমিদারির আয় বাড়ার সাথে কৃষিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের হারের উন্নতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে দক্ষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কৃষির উন্নতিতে কমই মনোযোগ দিতেন বা বিনিয়োগ করতেন। অনেক সময় জমিদাররা নিজের জমিদারিতে উপস্থিতও থাকতেন না (absentee landlord), এই অবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হলে, কৃষকদের দুর্গতি আরও বাড়তে থাকে। Floud Commission-র মতে, চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় খাজনার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে যে ব্যবধান, এই দুই-র মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে-তারই ফলস্বরূপ জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হয়। অনেক সময় জমিদাররা নিজে দায়িত্ব না নিয়ে, খাজনা আদায়ের জন্য নিজ জমিদারিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একজন ব্যক্তির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছেড়ে দিতেন। এই খণ্ডিত অংশকে বলা হত 'পত্তনি' ও 'পত্তনি'-র অধিকারীকে 'পত্তনিদার'। জমিদারদের মতো এরাও বংশানুক্রমিকভাবে পত্তনি থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। পত্তনিগুলি আবার আরও খণ্ডিত হয়ে 'দর-পত্তনি', যেগুলি পুনরায় খণ্ডিত হয়ে 'দর-দর-পত্তনি' - তে পরিণত হতো। ১৮১৯ সালে সরকার আইন পাশ করে পত্তনি ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। পত্তনি ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়ে উনিশ শতকে চরম আকার নিয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে উত্তরোত্তর বিভিন্ন স্তরে, উপস্তরে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়, যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কৃষক-শোষণ করে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করা। আর যেহেতু সরকারকে দেয় রাজস্ব স্থির হয়ে গিয়েছিল, বর্ধিত খাজনার অংশ সরকার পেত না, যা বণ্টিত হতো বিভিন্ন স্তর, উপস্তরে অবস্থিত মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে। বস্তুত চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের এই পরিণতি ঊনবিংশ শতকের

প্রভাবশালী এই জমিদাররা তাদের আর্থিক লাভের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল থাকবেন, কোম্পানি আশা করেছিল যে, জমিদাররা অন্তত শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ রাজের সমর্থকে পরিণত হবে। পঞ্চমত, কোন সামাজিক শ্রেণী বা গোষ্ঠী জমিদারি পেলে তা নিয়ে কর্ণওয়ালিসের কোন মাথাব্যথা ছিল না। সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমিদার কোম্পানির নির্ধারিত রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলামের মাধ্যমে হাত বদল হয়ে যেত। এর ফলে আরও উদ্যোগী ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ জমিদারি ভোগ করবে, যারা রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হয়েছিল। সর্বোপরি, ১৭৭০-র কুখ্যাত মন্বন্তরে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে। আশা ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষবাসের প্রসার ঘটবে - ফলে রাজস্বও বাড়বে।

কর্ণওয়ালিসের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার সাথে পিটের ভারত-আইন ও পরিচালক সভার নির্দেশনামার (১৭৮৬) সাদৃশ্য থাকায়, এ ব্যাপারে সত্বর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৭৮৯ সালে বাংলা ও বিহারে এবং ১৭৯০ সালে উড়িষ্যায় দশ বছরের জন্য জমিদারদের জমি বন্দোবস্ত দেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ডিরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে এই 'দশসালা' বন্দোবস্তই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে বিবেচিত হবে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরী ডাণ্ডাস ও প্রধানমন্ত্রী পিটের অনুমোদনক্রমে পরিচালক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন। এরপর ১৯৯৩-র ২২ শে মার্চ কর্ণওয়ালিস এক 'রেগুলেশন' জারী করে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করেন। এই নির্দেশনামায় বলা হয় যে জমিদারগণ বংশানুক্রমিকভাবে জমির স্বত্ব ভোগদখল, দান বন্ধক বা বিক্রী করতে পারবেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি করে সরকারি প্রাপ্য আদায় করা হবে। মোট ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ পাবেন সরকার ও ১০ শতাংশ পাবেন জমিদারবর্গ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ও মূল্যায়ন ঃ

ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এর প্রভাবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, যেসব আশা করে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধারণভাবে পরিপূরিত হয় — জমিদারদের আনুগত্য, রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি উৎপাদনের প্রসার। কিন্তু অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হয়। Baden Powell-র মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের বহু প্রত্যাশাকে মিথ্যা করে এমন কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, যা অকল্পনীয়।

আপাতদৃষ্টিতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার ও সরকার উভয়ের কাছেই শুভ হয়েছিল। সরকার বার্ষিক ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হওয়ায় বার্ষিক বাজেট করা সম্ভব হয় ও তার অন্যান্য কার্যাবলীতে মনেনিবেশ করতে পারে। অন্যদিকে জমিদাররা দুভাবে লাভবান হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস জমিদারদের সাথে নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তি করে জমিদাররা কতটা রাজস্ব দেবেন তা স্থির করলেও রায়তরা কতটা পরিমাণ রাজস্ব জমিদারদের দেবেন, তা স্থির করেননি। ফলে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে

জমিদার একজন রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র। এই বিতর্কে শোরকে সমর্থন করেন কর্ণওয়ালিস। ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের ভিত্তি বছর ও রাজস্বের পরিমাণ নিয়েও শোর ও গ্রান্টের মধ্যে বিতর্ক চলে। এখানেও শোরের বক্তব্যকে কর্ণওয়ালিস সমর্থন করেন ও ১৭৮৮-৮৯ এবং ১৭৮৯-৯০ সালের রাজস্বের ভিত্তিতে নূতন বন্দোবস্তের কথা বলেন। তবে কর্ণওয়ালিস বন্দোবস্তের মেয়াদ সম্পর্কে শোরের সাথে একমত ছিলেন না। শোর আপাতত জমিদারদের সাথে কোন দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন — কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। শোরের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে লোকালয় ও চাষ বাড়লেও সরকার তা থেকে আয়বৃদ্ধি করতে পারবে না। তাছাড়া ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য নেই — এ অবস্থায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। কর্ণওয়ালিস অন্যদিকে মনে করতেন কোম্পানির হাতে যথেষ্ট তথ্য আছে এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলার কৃষিব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছিল, তা সামাল দিতে একটি স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে জমিদাররা জমিতে স্থায়ী স্বত্ব পেলে কৃষির পুনর্গঠনে যত্নবান হবেন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটবে, যাতে সামগ্রিকভাবে কোম্পানির লাভ হবে।

বস্তুত একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই ধরনের বন্দোবস্তই কর্ণওয়ালিস ও কোম্পানির কর্তাদের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল। প্রথমত, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করতে কোম্পানি ১৭৬৫ সাল থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু এতে সাফল্য না আসায় একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের কথা ভাবা হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করে জমিদার নিজ এলাকায় কৃষি উৎপাদন প্রসারে উদ্যোগী হবেন বলে আশা করা হয়েছিল। সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডে এমন অনেক জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষী 'কৃষি বিপ্লব'-র দ্বারা শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। কর্ণওয়ালিস মনে করেছিলেন জমিদারদের জমিতে স্থায়ী স্বার্থ তৈরি হলে, কৃষির উন্নতি হবে এবং যেহেতু বাংলায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কৃষির উন্নতি হলে শিল্পের উন্নতি হবে— সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। আর এর পরোক্ষ ফল হবে কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার কথা কর্ণওয়ালিস অবশ্যই ভেবেছিলেন। ডিরেক্টর সভাকে তিনি জানিয়েছিলেন যে জমিতে লাভের সুযোগ থাকলে কলকাতার ধনী বণিক ও মহাজনরা নিশ্চিতভাবে জমিতে বিনিয়োগ করবেন। তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্বের পরিমাণ বেঁধে রাখলে, ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়াবার ক্ষমতা কোম্পানি হারাবে ঠিকই, কিন্তু আপাতত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এটা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ ঐ রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকেই কোম্পানি এদেশের দ্রব্যাদি কিনে ইংলণ্ডে বেচে লাভ করতো। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয়, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির ঘাটতি মেটানো এবং চীনের বাণিজ্য বাবদও কোম্পানির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। কিন্তু প্রাক ১৭৯৩ সময়ে বাংলার রাজস্ব থেকে আয় ছিল অনিশ্চিত। ফলে বাজেট তৈরি করতে অসুবিধা হতো। কোম্পানির আয়কে সুনিশ্চিত করাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্থত, কোম্পানি একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত জমিদারদের রাজনৈতিক বন্ধু হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। যেহেতু সামাজিকভাবে

রাখা হয়। পাঁচ-সালা বন্দোবস্ত শেষ হলে (১৭৭৭), বাৎসরিক বন্দোবস্ত শুরু হয়; অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের সাথে চুক্তি করে, বিগত তিন বছরের রাজস্বের ভিত্তিতে। ১৭৮৯ পর্যন্ত এই এক-সালা বন্দোবস্ত চালু থাকে। কিন্তু এ সব কোন বন্দোবস্তই ক্রটিমুক্ত ছিল না। বিলাতের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিল। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হলে ভূমি রাজস্বের আদায়ের ক্ষেত্রে নূতন পর্যায় শুরু হয়। এতদিন ধরে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তার অবসান ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (১৭৯৩) করে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন, লর্ড কর্ণওয়ালিস।

তবে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উদ্ভাবক ছিলেন না। ১৭৭০ সালে Alexander Dow চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাসী Dow মনে করেন রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কৃষির উন্নতি হবে, যার ফলে বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাবে। ফিজিওক্রাটিক মতবাদের অনুরাগী Henry Pattullo, (হেনরি পাতুল্ল) ১৭৭২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন। তাঁর মতে, এতে বাংলার কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে, কৃষির সাথে শিল্পের প্রসার ঘটবে। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সবথেকে বেশি সোচ্চার হন ফিজিওক্রাটিক মতবাদের অনুরাগী ফিলিপ ফ্রান্সিস, যাকে জেমস মিল এই বন্দোবস্তের প্রকৃত সংগঠক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে এই বন্দোবস্তের অনুকূলে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী পিট ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরি ডাণ্ডাস তাঁর প্রস্তাব (Philip Francis's Minute, 1776) দ্বারা প্রভাবিত হন। Pitt's India Act (1784) -এ অস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করা হয়। ১৭৮৬ সালে কোম্পানির পরিচালক সভা একটি ডেসপ্যাচ দ্বারা জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সুপরিশ করেন। ফলে কর্ণওয়ালিস যখন ভারতে আসেন (১৭৮৬) তখন নানা মহলে স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে যে ভাবে ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে কর্ণওয়ালিসের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যে কার্যকারি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কর্ণওয়ালিস নিজে ছিলেন ইংলণ্ডের বনেদী জমিদার বংশের সন্তান। প্রশাসন ও অর্থনীতিতে জমিদার শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জেমস মিলের মতে কর্ণওয়ালিসের 'অভিজাততান্ত্রিক সংস্কার' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য দায়ী ছিল।

১৭৮৬-১৭৮৯ সময়কালে সম্ভাব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন দিক-নিয়ে কোম্পানির উপর মহলে বিতর্ক চলেছিল। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস; বোর্ড অব রেভেন্যুর সভাপতি জন শোর ও কোম্পানির প্রধান সেরিস্তাদার জেমস গ্রান্ট। এই বিতর্কের বিষয়গুলি ছিল, জমির মালিকানা, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি বছর ও পরিমাণ বন্দোবস্তের মেয়াদ এবং রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে জমিদারদের প্রয়োজনীয়তা। জমির মালিকানা বিষয়ে শোরের বক্তব্য ছিল জমিদাররাই জমির মালিক, যা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করেন। মালিক হিসাবে তাদের জমি বিক্রি, দান ও বন্ধক রাখার অধিকার আছে। অন্যদিকে গ্রান্ট সরকারকে জমির মালিক মনে করেন—

মতে, এই জটিলতা ইংরেজরা স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেনি। প্রায় একশ বছর ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভুল ও তা সংশোধন করতে করতে, প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামীণ শ্রেণী সমাবেশ ও কৃষির অগ্রগতি বিচার করে, সবচেয়ে কম সমস্যায় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব কিভাবে আহরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজরা নানা ধরনের ভূমি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। প্রথমে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করব।

৫.৩.১.২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ :

১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু এদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল নগণ্য। ফলে কোম্পানি আপাতত প্রচলিত রীতি অনুসারে পরোক্ষভাবে রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে মনস্থ করে। ১৭৬৫-১৭৭২ সময়কালে নায়েব-নাজিম (দেওয়ান) রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়কে ২৪টি জেলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। এদেরকে সামনে রেখে কোম্পানি রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের জন্য 'আমিলদার' নিযুক্ত করেন। সাধারণত সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত ব্যক্তিকেই আমিলদারী দেওয়া হতো। কিন্তু এতে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের পরিমান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন যে, আলিবর্দী খাঁ-র সময়ে পূর্ণিয়া থেকে চার লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতো। রেজা খাঁ-র আমলে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫ লক্ষ টাকা। এর পরেও কোম্পানি আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য রেজা খাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায়, জেলায় রাজস্ব পরিদর্শক নিয়োগ (১৭৭০), মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় রেভিনিউ কাউন্সিল আর কলকাতায় কন্ট্রোলিং কমিটি নিয়োগ (১৭৭১) ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু সুপারভাইজররা রাজস্ব ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন। আর রেজা খাঁ রাজস্ব প্রশাসনে কোম্পানির অধিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে নানাভাবে অসহযোগিতা শুরু করেন। এসবের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে অরাজকতা দেখা দেয়। ১৭৭০-র দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তোলে। ঐ দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেলেও কিন্তু রাজস্ব আদায় কমেনি।

যাইহোক, কোম্পানি এরপর ঠিক করে যে রাজস্ব আদায়ের ভার সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নেবে। ১৭৭২ সালে গভর্নর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেই ওয়ারেন হেস্টিংস রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করেন এবং নায়েব নাজিম পদ বিলোপ করেন। গভর্নর ও তার কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে 'Board of Revenue' গঠন করে তার উপর রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দু-এক বছরের ইজারাদারির জায়গায় পাঁচশালা ব্যবস্থা চালু হয়। পুরাতন জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে গুরুত্ব পেতে থাকেন। তবে নিলামী ব্যবস্থা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে, তা বজায়

৫.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকার ভেদ

(২) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

(৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত -- উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

(৪) রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫.৩.১.১ : কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকারভেদ

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। জমির ক্ষেত্রে মালিকানা সম্পর্ক, ভূমি রাজস্বের প্রথাগত ধরন, রাজস্বনীতি, রাজস্ব সংগ্রাহকদের প্রকারভেদ, কৃষকদের স্তর বিন্যাস, উৎপাদনের ধরন ইত্যাদির কোনটিই অনড় ছিল না এবং অঞ্চলভেদে এগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন ছিল। মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন বিবর্তিত হয় তেমনি আবার এই বিবর্তন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। মুঘল ভারতে কৃষকরা ছিল মূলতঃ উৎপাদক সম্প্রদায় ও মোঘল শাসকদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল কৃষি থেকে আহরিত উদ্বৃত্ত সম্পদ। স্বভাবতই কৃষির অবস্থার ওপরই নির্ভর করত সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান, কৃষির অবস্থার উন্নতি হলে উদ্বৃত্ত আহরণের পরিমাণ বাড়ত। মুঘল আমলে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, যা কৃষি সমাজ ও উৎপাদনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসনভার গ্রহণ করার পর কৃষির যে দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা হল ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা তথা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। জমি কার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বা জমির মালিক কে, প্রকৃত উৎপাদক কারা এবং উৎপাদিত ফসলের কে কতটা কিভাবে পায় এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে ভূমিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক ভারতে, বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশরা তিন ধরনের ভূমি ব্যবস্থা চালু করেছিল - জমিদারি ব্যবস্থা, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা এবং মহলওয়ারি ব্যবস্থা। এই প্রত্যেক ধরনের মধ্যে আবার প্রভেদ ছিল। যেমন জমিদারি ব্যবস্থায় কোথাও রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হতো, আবার কোথাও অস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব কিছুদিন পর পর নূতন করে নির্ধারিত হতো। মহলওয়ারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থাতেও বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তিতে বিভিন্নতা ছিল। এক কথায় আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংরেজ সরকার যে ভূমিব্যবস্থা সৃষ্টি করে তা যথেষ্ট জটিল ছিল, যা বিভিন্ন প্রদেশের ভূমি ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

Agrarian Settlements and Agrarian Production

একক - ১

(a) Agrarian Conditions - Regional Variations

(b) The Permanent Settlement - objectives, operations, effects and official critiques

(c) Ryotwari Settlements and Mahalwari System

বিন্যাসক্রম :

৫.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

৫.৩.১.১ : কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকারভেদ

৫.৩.১.২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

৫.৩.১.৩ : রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থা

৫.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

Rural Economy : Changes and Continuity

একক - ১

গ্রামীণ অর্থনীতি

Rural Economy

বিন্যাসক্রম ঃ

৩.৬.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৩.৬.১.১ ঃ সুচনা (Introduction)

- ৩.৬.১.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?
- ৩.৬.১.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

৩.৬.১.২ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

- ৩.৬.১.২.১ ঃ পূর্ব ভারতবর্ষ
- ৩.৬.১.২.২ ঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ
- ৩.৬.১.২.৩ ঃ পশ্চিম ভারতবর্ষ
- ৩.৬.১.২.৪ ঃ উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ
- ৩.৬.১.২.৫ ঃ দেশীয় রাজ্য

৩.৬.১.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

৩.৬.১.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

৩.৬.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

(১) প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(২) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

(৩) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে কি ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পত্তন করা হয়েছিল তা জানা যাবে।

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি ও পূর্ব ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজকে এই ব্যবস্থা কতটা পরিবর্তিত করেছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(৫) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত কি ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজকে এই ব্যবস্থা কতটা পরিবর্তিত করেছিল সে বিষয়ে জানা যাবে।

(৬) পশ্চিম ভারতবর্ষে কি ধরনের বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল এবং সেখানকার গ্রাম সমাজকে তা কতটা পরিবর্তিত করেছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(৭) মধ্য ভারতবর্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ওপর ব্রিটিশ ভূমি বন্দোবস্তের প্রভাব কি ছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

(৮) আলোচ্য সময়কালে (১৭৫৭-১৮৫৭) দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল সে কথাও জানতে পারা যাবে।

৩.৬.১.১ ঃ সূচনা

৩.৬.১.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে সাধারণভাবে অর্থনীতির কাঠামোগত দিকটিকে বোঝায়। কৃষি, ব্যবসা- বাণিজ্য, দোকান বাজার, ঋণব্যবস্থা সবকিছুই অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একেবারে নীচুতলা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে কাঠামোগত পার্থক্য থাকে। এগুলি কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাজার এবং অর্থনীতির নানা সূত্র ধরে বিভিন্ন সংগঠন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা ধরনের টানাপোড়েনের মতো বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক সংগঠনেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক সংগঠনের এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ ও তার পরিবর্তনের ধারাকে না বুঝতে পারলে কোন দেশের বা কোন কালের ইতিহাসকে ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। কিছুকাল অগে পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা খুব একটা প্রাধান্য পেত না। অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা সেই দিক থেকে ইতিহাস চর্চায় নতুনত্বের দাবী রাখে।

> *অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে সাধারণভাবে অর্থনীতির কাঠামোগত দিকটি বোঝায়। কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান বাজার, ঋণ ব্যবস্থা সব কিছুই অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।*

প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে কি বোঝ ?

৩.৬.১.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনটি সমকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা সনাতন অর্থনীতির মতোই ছিল কতকটা ঢিলে ঢালা। স্বাভাবিক কারণেই কৃষিই ছিল সেই অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। দেশের এক অংশের কৃষিজ উৎপন্নের বাজার গড়ে উঠেছিল দূরবর্তী অংশে। নিকট ও দূরবর্তী উভয় প্রকার বাণিজ্যের অংশীদার ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছোট বড় নানা মাপের ব্যবসায়ীরা। জল এবং স্থল উভয় পথেই এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বলতে উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পও যেমন ছিল তেমনি ছিল বহু বিস্তৃত গ্রামীণ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর বিশেষ কদর ছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়াও ভারতীয় ইস্পাত ও তৈজসপত্র নিয়মিত রপ্তানি হতো। গ্রামীণ শিল্প বিশেষত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত ছিল। গুজরাট, করমন্ডল, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলায় বস্ত্র শিল্প ছিল কৃষির পরই গ্রামীণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা।

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন

১। প্রাক ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কি ছিল ?

এ সমস্ত সত্ত্বেও, প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব যে একটা উন্নত ছিল এরকম মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। তাই গ্রামবাসী অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পারিবারিক ভিত্তিতে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই এই কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতো। অবশ্য, ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চল বাণিজ্যিক শস্য চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল — যেমন তুলো, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি। এই সমস্ত কৃষিপণ্যের বিস্তৃত বাজারও গড়ে উঠেছিল, তবুও প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থা সাধারণভাবে ভালো ছিল না। উৎপন্ন ফসলের বেশিরভাগটাই রাজস্বদায় মেটাতে চলে যেত। মুঘল সম্রাটের হয়ে রাজস্ব আদায়ের কাজে সহযোগিতার জন্য ছিল বিপুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রামীণ এক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী।

কৃষকের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব আদায়ের সহযোগিতার মূল্য হিসাবে তারা নিয়ে নিত। ফলে, কৃষকের হাতে উদবৃত্ত বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং, গ্রামের বাইরে উৎপন্ন কোন জিনিষ কৃষকের পক্ষে কেনা প্রায়শই সম্ভব হতো না। কৃষি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অল্পবিস্তর শিল্পের কাজও হতো। গ্রাম বিশেষে এই শিল্পকর্মের চরিত্র এক এক রকম হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপন্নের একটা অংশ বাজারেও যেত। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ছোটখাটো বাইরের পাইকার বা ব্যবসায়ির আনাগোনাও ছিল। কিন্তু, প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রই ঠিক সেই অর্থে মুদ্রায়িত ছিল না।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে প্রায়ক্ষেত্রেই অধিকৃত অঞ্চলগুলির প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় এই পরিবর্তনের স্বরূপকে খুব একটা বোঝাবার চেষ্টা হয়নি। তার কারণ, ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা শুরু থেকেই আমাদের বুঝিয়ে এসেছিলেন যে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাই নতুন এই শাসনের নিয়মনীতি অথবা ব্যবস্থাপত্র কোনভাবেই ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠিত কাঠামোয়

বড়সড় কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি। সুতরাং, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে কি গ্রামাঞ্চল বা কি শহরাঞ্চলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রচলিত জীবনযাত্রা খুব একটা প্রভাবিত হয়নি। ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদরা অবশ্য গোড়া থেকেই এই ধরনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। কিন্তু, সে সময় তাঁদের সেই ভাবনাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই অধিকৃত অঞ্চলগুলির প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এ সম্পর্কে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদরা ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের বিরোধীতা করে এসেছিলেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় এই ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণায় ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদিস্তরে পরিবর্তনহীনতার প্রচলিত এই ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই, ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহ এ দেশের প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল সেগুলি আজ আর কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। সহজ কথায় পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া ছিল সাধারণভাবে বহুমুখী। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব ছিল সামান্য, আবার কোথাও কোথাও তা ছিল ব্যাপক এবং সামগ্রিক। ভারতীয় গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির উপর সংঘটিত ব্রিটিশ শাসনের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে আমরা স্বতন্ত্র দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো।

৩.৬.১.২ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের আলোচ্য প্রতিক্রিয়ার সুত্র ছিল প্রধানত দুটি : ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে বর্হিবাজারের সংযোগসাধন। প্রথমটিকে যদি আমরা ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে অভিহিত করি তবে দ্বিতীয়টি ছিল তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া; এবং অর্থনীতির নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের সামগ্রিক ফল। ঔপনিবেশিক শাসনের একেবারে শুরু থেকেই ভারতবর্ষের ক্রমবিজিত অংশে এই উভয় ধরনের প্রতিক্রিয়াই ক্রিয়াশীল ছিল। সেই দিক থেকে দেখলে ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ছিল গভীর ও সর্বব্যাপী। প্রত্যক্ষভাবে শাসিত নয় এমন অঞ্চলগুলির অর্থনীতিও এই ধরনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিল না। ছোট বড় স্বশাসিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণায় সেকথাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতীয় গ্রামীন অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের আলোচ্য প্রতিক্রিয়ার সূত্র ছিল প্রধানত দুটি — ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও গ্রামীন অর্থনীতির সঙ্গে বহির্বাজারের সংযোগসাধন।

ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থেই ভারতবর্ষের ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। প্রথমদিকে কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্য ও ভারতবর্ষে যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভার মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য একমাত্র উৎস ছিল এই ভূমিরাজস্ব। সুতরাং, ভূমিরাজস্ব নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল প্রথমযুগের ইংরেজ শাসকদের সমস্ত তৎপরতার মূল লক্ষ্য। এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণেই ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও তার প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টির এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে পূর্ব-ভারতবর্ষে। কারণ, বাংলা তথা পূর্ব-ভারতবর্ষেই ইংরেজ শাসনের শুরু।

প্রশ্ন

১। ব্রিটিশ শাসকের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?

৩.৬.১.২.১ ঃ পূর্ব ভারতবর্ষ

বাংলাদেশে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনের শুরু থেকে রাজস্ব-সংক্রান্ত নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। কেননা, এইসময়ে বাংলাদেশের ভূমিরাজস্বই ছিল ভারতবর্ষে কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস। এদেশে কোম্পানির যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচা চালাবার জন্য কোম্পানি পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের রাজস্ব-আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই রাজস্ব-আয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে নেওয়া এবং স্থিতিশীল ও নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে কলকাতার স্থিত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ইংল্যান্ডের কোম্পানির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল কতকটা সেইরকম। স্থিতিশীল রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক খবরাখবর সংগ্রহের পরই নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়। যার মধ্যে জমির মালিকানা-সংক্রান্ত বিতর্ক ছিল অন্যতম। খুঁটিনাটি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থাই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে বাংলা ও বিহারে প্রবর্তন করা হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার ফলে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রে সংঘটিত মৌলিক পরিবর্তনগুলি বাংলা ও বিহারের গ্রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তোলে। গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝাবার জন্য প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যেহেতু ভূমিরাজস্বই ছিল ভারতবর্ষে কোম্পানীর আয়ের প্রধান উৎস তাই কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসনের শুরু থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে বাংলা ও বিহারে।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে কবে প্রবর্তন করেন ?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিভিন্ন ধরনের জমি থেকে সরকারকে দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল জমির ওপর জমিদারদের চূড়ান্ত মালিকানা প্রদান। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের এই আদেশনামার ফলে এতদিন যাদের কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ছিল বাংলা ও বিহারের সেই জমিদারবর্গ রাতারাতি জমির মালিক বনে গেলেন। জমির মালিক অর্থাৎ তাদেরকে বংশ পরম্পরায় জমি ভোগদখল ও বিক্রী করবার অধিকার দেওয়া হল। আর এতকাল যারা ছিল জমির প্রকৃত মালিক এতদঞ্চলের সেই কৃষককুল সরকারি এই আদেশনামার ফলে জমির ওপর সবরকম মালিকানাস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে জমিদারের ইচ্ছাধীন খাজনা প্রদানের শর্তে তাদেরই বাপ-ঠাকুরদার জমির ভাড়াটে কৃষকে পরিণত হল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সংঘটিত মৌলিক পরিবর্তনের কথা এখানেই শেষ করা উচিত নয়। কিন্তু, প্রাসঙ্গিক পাঠ্যসূচীর অনুমোদিত পরিধির কথা বিবেচনা করে বিস্তৃত সেই সব আলোচনায় এখন আর যাচ্ছি না। লর্ড কর্নওয়ালিস বা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কেন এই ধরনের উলটপুরাণের ব্যবস্থা পত্তন করেছিলেন, তার ভাবগত প্রেরণা সম্পর্কিত নানা বিতর্ক, অথবা ১৭৯০ এর দশকে এই ব্যবস্থা পত্তনের আশু প্রয়োজনই বা কি ছিল সেইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করাও এখানে

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিল?

সম্ভব নয়। শুধু ছোটখাটো দু-একটি কথা সেরে নিয়ে পূর্ব-ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজ ও অর্থনীতির ওপর এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কঠোর আদায় ব্যবস্থা ও পূর্ব-নির্ধারিত দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব নগদ অর্থের মাধ্যমে জমা করা। অন্যথায়, রাজস্ব বাকি পড়ায় দায়ে সংশ্লিষ্ট জমিদারের জমিদারি সরকারিভাবে নিলাম করে দেওয়া হতো। সেরকম ক্ষেত্রে, সমপরিমাণ রাজস্ব প্রদানে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি নিলামের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে ঐ জমিদারির মালিকানা কিনে নিতে পারতো। প্রাক-ঔপনিবেশিক রাজস্ব শাসনের তুলনায় এই ব্যবস্থা ছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদুরপ্রসারী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান শর্ত ছিল নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমান রাজস্ব নগদ অর্থে জমা দেওয়া।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান শর্ত কি ছিল ?

বাংলা ও বিহারের প্রতিষ্ঠিত জমিদারবর্গ এই ধরনের অনমনীয় আদায় ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেও পরিচিত ছিল না। ফলে, তাদের ওপর কোম্পানির সরকারের কঠোরতার কারণে জমিদারেরাও তাদের অধীনস্থ কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু, কৃষকদের কাছে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার সবচাইতে ক্ষতিকর দিকটি ছিল কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ ও তার আদায় ব্যাপারে ইংরেজ সরকার কর্তৃক জমিদারদের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান। গোড়ার দিকে খাজনা সম্পর্কিত বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষমতাও ছিল তাদেরই। এসবের পিছনে ইংরেজ সরকারের যে কোন হিসেব নিকেশ ছিল না এমন নয় — তবে তার কোনটাই ফলপ্রসূ হয়নি। অথচ, কৃষি ও কৃষকের ওপর এসবের সামগ্রিক ফল ছিল ভয়াবহ।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতির দিক ছিল কৃষকদের দেয় খাজনার পরিমান ও তার আদায় ব্যাপারে ইংরাজ সরকার কর্তৃক জমিদারদের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান।

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকটি আলোচনা কর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় সমস্তরকম জমির ওপর রাজস্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়; সংশ্লিষ্ট জমির কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বভাবতই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্ধিত হারে রাজস্ব দেবার জন্য জমিদারেরাও তাদের অধীনস্থ কৃষকদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে শুরু করে। গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে পুরোনো অধিকাংশ জমিদারদের পক্ষেই এ ধরনের আচরণ অসম্ভব ছিল। তাই, গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বহু প্রতিষ্ঠিত জমিদার পরিবার তাদের জমিদারি অধিকার ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় ;এবং নিলামের মাধ্যমে এইসব জমিদারিগুলি একশ্রেণীর শহুরে ধনী মানুষের হাতে চলে যেতে থাকে, জমির সঙ্গে এতকাল যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। অনেক সময় পুরোনো জমিদার পরিবারের কর্মচারীরা নামে-বেনামে এইসব জমিদারিগুলি কিনে নেয়। যেভাবেই হোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ব-ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত জমিদারিস্বত্বের হস্তান্তর ঘটে। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় গ্রামসমাজের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলি অত্যন্ত দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে এবং কৃষকেরা নব্য-জমিদারবর্গের লাগামহীন শোষণের শিকার হয়।

ফলতঃ, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার অধীনস্থ পূর্ব-ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিব্যবস্থায় এক ধরনের নিরুৎসাহের ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভয়াবহ মন্দার অবস্থা সৃষ্টি হয়। কৃষি অর্থনীতির এই নিম্নমুখী প্রবণতা আঞ্চলিক ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব সংকট ডেকে আনে। এর সঙ্গে অনেক অঞ্চলে নীল চাষের পীড়ন এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক সংকটকে কাটিয়ে জমিদারশ্রেণী লাভবান হতে শুরু করলেও এই লাভের কোন অংশই তারা কৃষিব্যবস্থার উন্নতিতে নিয়োগ করেনি। কৃষিক্ষেত্র থেকে সৃষ্টি এই আয়ের অধিকাংশই জমিদারবর্গ তাদের বিলাসব্যসনের মতো অনুৎপাদক ক্ষেত্রে ব্যয় করতে শুরু করে। এসবের সামগ্রিক ফলে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের সংকট দেখা দেয় এবং কৃষি অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান সহনশীলতা দুর্ভিক্ষের প্রবণতাবৃদ্ধি ও লোকক্ষয়ের মতো দীর্ঘমেয়াদি গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। মজার কথা হলো, সার্বিক কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির যে আশু উদ্দেশ্য নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল তা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, এই ব্যবস্থার ফলে পূর্ব-ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি তার নিজস্ব গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।

> *চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রভাবে কৃষি ব্যবস্থায় নিরুৎসাহের ফলে কৃষি উৎপাদনে ভয়াবহ মন্দার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সংকট ডেকে আনে। ফলে পূর্ব ভারতে কৃষি অর্থনীতি তার নিজস্ব গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।*

প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষি অর্থনীতিকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল কিভাবে ?

পূর্ব-ভারতবর্ষের আসাম ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। প্রাক ঔপনিবেশিক সময়ে এই অঞ্চলগুলিতে মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব ছিল খুবই কম। রাজস্ব ব্যবস্থার সংগঠনও ছিল অনেকটাই অনির্দিষ্ট এবং অনিয়মিত। এ অবস্থায়, হঠাৎ করে নগদ অর্থের মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোর রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা চালু হবার ফলে আসাম ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে গভীর মুদ্রা সংকটের সৃষ্টি হয়, আঞ্চলিকভাবে যার মোকাবিলা করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্ধিত হারে খাজনা প্রদানের দায়বদ্ধতা পূরণ করা প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় খাজনা মেটাতে না পারলে কৃষকের পক্ষে জমির উপর অধিকার কায়েম রাখাও কঠিন ছিল। বিশেষত, এতদঞ্চলের মানুষের জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে কোন পূর্ব-ধারণা না থাকার ফলে তাদের এই সংকট বৃদ্ধি পায়। বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির সংযুক্তির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রা অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও তার দ্বারা প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং, গ্রাম থেকে খাদ্যশস্যের দ্রুত বর্হির্গমণের ফলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের কাছে খাদ্যের যোগান কমে গিয়ে অজন্মা বা আকস্মিক শস্যহানির বছরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে।

৩.৬.১.২.২ ঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ

পূর্ব-ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়নি। বাংলা বা বিহার মুলুকের জমিদারদের মতো দক্ষিণ ভারতে সাধারণভাবে কোম্পানির সরকার কোন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেনি। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পত্তন করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকেরা এখানে কৃষকদের সঙ্গে রায়তওয়ারি নামে এক প্রত্যক্ষ বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিল। স্বল্পকালের মধ্যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এধরণের একেবারে বিপরীত এই অবস্থানের কারণকে

ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সে আলোচনার মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে আমরা কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ওপর রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অঞ্চলে প্রভাবশালী ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার রীড এবং টমাস মুনরো কিছুটা ভিন্ন ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলগত ভাবনার তারা ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনে রীড ও মুনরোর তৎপরতা ও মতামতই প্রাধান্য পেয়েছিল। অন্যদিক থেকে এই ব্যবস্থা ছিল এতদঞ্চলের প্রচলিত প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার অনুসারী। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে টিপু সুলতানের কাছ থেকে বড়ামহল অঞ্চলটি ইংরেজ কোম্পানি অধিকার করে নেয়। মুনরো এবং রীড এই অঞ্চলে রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করেন। দেখা যায়, এখানে গ্রাম-প্রধানেরা কৃষকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব সংগ্রহ করে নিজেরাই সরকারি কোষাগারে জমা দিত। ফলে রাজস্ব-আদায় সংক্রান্ত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের আয়তন ও দায়দায়িত্ব ছিল অনেক কম।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে রীড ও মুনরোর তৎপরতা ও মতামতই প্রাধান্য পেয়েছিল।

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ভারতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কারা প্রচলিত করেন ?

প্রাক্-ঔপনিবেশিক এই ব্যবস্থা মুনরো এবং রীড উভয়কেই আকৃষ্ট করে। মূলতঃ তাঁদের প্রচেষ্টায় বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই ব্যবস্থাই ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা নামে চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণভাবে তিরিশ অথবা ঐরকম সময়কালের জন্য নবীকরণযোগ্য এই ব্যবস্থায় কৃষক এবং কোম্পানির সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থির হয়, নির্দিষ্ট হারে এবং নিয়মিত রাজস্বপ্রদানের শর্তে রায়তওয়ারি ব্যবস্থাভুক্ত কৃষক জমির ওপর সকলপ্রকার অধিকার ভোগদখলের সুযোগ পায়। রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাকালীন নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদানকারী কোনো কৃষককে তাঁর জমি থেকে আইনসিদ্ধভাবে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা যেত না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত কৃষকের স্বার্থরক্ষার অনুকূল ছিল। অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকার এবং কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীকে প্রদত্ত রাজস্ব অংশ সরকারি কোষাগারে জমা পড়তে থাকে। সুতরাং, সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ছিল অনেক লাভজনক।

প্রবর্তন উত্তর সরকার অঞ্চলে মালগুজারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। মালগুজারেরা তাদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য খাজনার হার ও খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারনের ক্ষমতা লাভ করে।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ছাড়াও দক্ষিণ ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে অন্য ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। পূর্বতন উত্তর সরকার অঞ্চলে মালগুজারি ব্যবস্থা নামে একপ্রকার বন্দোবস্ত চালু করা হয়। কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় এই অঞ্চলে মালগুজাররা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তার অনেকটাই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয়। এই অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থায় মালগুজারদের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মালগুজারেরা তাদের নিয়ন্ত্রিত গ্রামাঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে সংগৃহীত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে পাঠিয়ে দিত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এই ব্যবস্থাকেই প্রায় অবিকৃতভাবে স্বীকার করে নেয়। বিনিময়ে মালগুজারেরা মোটামুটি একটা হারে রাজস্ব দিতে সম্মত হয়। মালগুজারেরা তাদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য খাজনার হার ও খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করে। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থা কোম্পানির সরকারের কাছে মোটেও অভিপ্রেত ছিল না। কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেই

তারা এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই মালগুজারি ব্যবস্থাধীন অঞ্চলকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস করে দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রায়তওয়ারি ব্যবস্থাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্ন

১। মালগুজারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখ।

বাস্তবে, কৃষকের সঙ্গে রাজস্ব সম্পর্কিত সরাসরি বন্দোবস্ত দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ঐতিহ্যের অনুকূল ছিল। তাই, পূর্ব-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের গ্রামসমাজ ও তার আর্থিক সংগঠন ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা বড় একটা পরিবর্তিত হয়নি। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিভুক্ত অঞ্চলে গ্রামসমাজের প্রতিষ্ঠিত আভ্যন্তরীণ সংগঠনের ক্ষেত্রেও সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল ন্যূনতম। একমাত্র উপকূল অঞ্চলগুলি ছাড়া পূর্ব ও উত্তর ভারতের তুলনায় বাইরের বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে এতদঞ্চলের গ্রামসমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ছিল অনেক কম। সেইদিক থেকে দেখলে, এখানকার গ্রামজীবন ও সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার ওপর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাব ছিল তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সীমিত।

তাই, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে বাংলার তাঁতিরা যখন কর্মচ্যুত হতে থাকে, তখন মাদ্রাজ অঞ্চলের তাঁতশিল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ও জনসংখ্যার লঘু-ঘনত্বের কারণে রেলপথ সম্প্রসারণের আগে এখানকার গ্রামাঞ্চল বাইরের বাজারের প্রভাবগুলি থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল। এসমস্ত সত্বেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে কৃষকের রাজস্ব দায় আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। অথচ, এই বন্দোবস্তের অধীন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার সনাতন কাঠামোর খুব একটা পরিবর্তন হয় না। এর সঙ্গে বৃটিশ রাজস্বব্যবস্থার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত হওয়ায় কৃষকের অবস্থা আগের থেকে খারাপ হতে থাকে। এসবের সামগ্রিক ফলে গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থার উপর মহাজন শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ঋণগ্রস্ত কৃষক ও ভূমিহীনতার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মাদ্রাজ অঞ্চলে সরকারি হস্তক্ষেপ ন্যূনতম থাকায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও এখানকার তাঁত শিল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যহত ছিল। তাসত্ত্বেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে কৃষি ব্যবস্থায় মহাজন শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন

১। মাদ্রাজের কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রভাব কি ছিল ?

৩.৬.১.২.৩ ঃ পশ্চিম ভারতবর্ষ

পশ্চিম ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল আবার অন্যরকম। ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের শুরুতে এখানে নানা ধরণের ভূম্যধিকারীদের অস্তিত্ব ছিল; যেমন জমিদার, জিরাসিয়া, পাতিদার, তালুকদার ইত্যাদি। গুজরাট অঞ্চলের জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের বাংলাদেশের জমিদারদের মতো কেবল রাজস্ব সংগ্রাহক ছিল না। তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে তারাই ছিল দন্ডমুণ্ডের কর্তা। অনেক সময় তারা নিজ নিজ অঞ্চলের বাইরেও সুযোগ মতো তাদের হুকুম জারি করবার চেষ্টা করতো। এইসব জমিদার ও জিরাসিয়াদের নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আক্ষরিক অর্থেই ছিল কঠিন কাজ। সাধারণতঃ, এইসব তালুকদারি

ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের শুরুতে পশ্চিম ভারতবর্ষে নানা ধরনের ভূমধ্যকারীদের অস্তিত্ব ছিল। জমিদাররা নিজ নিজ অঞ্চলে ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই ভূমধ্যকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আক্ষরিক অর্থেই কঠিন ছিল।

মহল্লাগুলি দুই বা ততোধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। উনিশ শতকের গোড়াতে সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা আশিভাগ সরকারকে দিতে বাধ্য করে বোম্বাই সরকার তালুকদারদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার এইসব তালুকদারদের অংশ শতকরা কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগে উন্নীত করে।

প্রশ্ন

১। পশ্চিম ভারতবর্ষের ভূমধ্যকারীদের ভূমিকা কি ছিল?

১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের পতনের পর অধিকৃত অঞ্চলের একটা বড় অংশ নিয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী গঠিত হয়। এখানে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোটি বা মডেলটি পরিত্যক্ত হয়। কারণ, চিরস্থায়ী অথবা রায়তওয়ারি — এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পূর্বতন রাজস্ব ইজারা ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং কৃষকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান ব্যবস্থার পরিবর্তে নগদ অর্থে খাজনা আদায়ের নীতি গৃহীত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন এবং উইলিয়াম চ্যাপলিনের মনোগত ইচ্ছা ছিল পেশোয়ার আমলে ক্ষমতাভোগী গ্রামপ্রধান এবং মিরাসিদারদের ক্ষমতা অবিকৃত রাখা।

কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত কালেক্টর ও জেলাভিত্তিক ইংরেজ কর্মচারীরা এলফিনস্টোন এবং চ্যাপলিনের এই নীতিকে কার্যকরী হতে দেয়নি। নিচুতলার কর্মচারীরা গ্রামসমাজে স্বায়ত্ত শাসনের ধারণার বিরোধী ছিল। তাঁরা মনে করতেন গ্রামসমাজের স্বায়ত্তশাসন প্রকৃত অর্থে পাতিল বা গ্রামপ্রধানের ক্ষমতাবৃদ্ধির নামান্তর। সুতরাং প্রায়ক্ষেত্রেই এইসমস্ত রাজকর্মচারীরা কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে এইসব অঞ্চলেও প্রকৃত অর্থে একধরনের রায়তওয়ারি ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে গ্রামসমাজের সামগ্রিক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং কৃষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ উৎসাহিত হয়। ফলে দৃশ্যত গ্রামসমাজের ওপর গ্রামপ্রধানেরা অথবা গ্রামের সম্পন্ন কৃষক এতকাল যে অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল তা অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে।

> *নীচু তলার কর্মচারীরা গ্রাম সমাজে সায়ত্তশাসনের ধারনার বিরোধী ছিল। এরা কৃষকদের সাথে সরাসরি বন্দোবস্তের পক্ষপাতি ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে এই সব অঞ্চলেও প্রকৃত অর্থে একধরনের রায়তওয়ারি ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে।*

প্রশ্ন

১। নীচুতলার কর্মচারীরা সায়ত্তশাসনের বিরোধী কেন ছিলেন ?

বাস্তবে, পূর্ব-ভারতবর্ষের মতো এখানেও নির্ধারিত রাজস্ব প্রচলিত হারের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তালুকদারদের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কৃষিপণ্য মূল্যের দীর্ঘমেয়াদি মন্দা। সব মিলে তালুকদারদের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তারা মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়তে থাকে। অনেকক্ষেত্রে তালুকদারেরা গ্রামের উপর তাদের পুরোনো অধিকার ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এসবের ফলে তালুকদার প্রভাবিত অঞ্চলগুলির গ্রামীণ সমাজ ও আর্থিক সংগঠনে এমন এক ধরণের অস্থিরতার সৃষ্টি হয় যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সরকার আমেদাবাদ অঞ্চলের তালুকদারদের কিছু সুবিধা দেবার জন্য আইন প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে, গুজরাটের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের জমিদারদেরও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী এই ব্যবস্থা গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজস্বভার লাঘব করে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম ভারতের একটা বড় অংশ জুড়ে গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি ব্যবস্থায় গভীর এক সংকটের সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের কারণে আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে তুলোর যোগান হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ তুলো রপ্তানি শুরু হয়। ফলে, তুলোচাষকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় তেজীভাব লক্ষ্য করা যায় এবং তার ফলে এখানকার গ্রামাঞ্চলে মহাজনী তৎপরতাও ভীষণভাবে বেড়ে যায়। এইভাবে কয়েক বছর চলার পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারত থেকে তুলো রপ্তানি স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। তুলোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গ্রামীণ অর্থনীতির তেজিভাবও সঙ্গে সঙ্গেই মিইয়ে যায়। এতদঞ্চলের গ্রামসমাজের ওপর এসবের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। ঐতিহাসিক রবিন্দরকুমার তাঁর গবেষণায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম ভারতের একটা বড় অংশ জুড়ে গ্রামীন সমাজ ও কৃষি ব্যবস্থায় গভীর এক সংকটের সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের সময় তুলোর জোগানকে কেন্দ্র করে যে তেজীভাব দেখা দেয় তা যুদ্ধ শেষে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন

১। কি কারণে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে পশ্চিম ভারতে গ্রামীন সমাজ ও কৃষিতে সংকট দেখা দেয় ?

৩.৬.১.২.৪ ঃ উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ

মধ্য ও উত্তর ভারতবর্ষের অবস্থার মধ্যে কিছু গুণগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইংরেজ অধিকারে আসার আগে উভয় অঞ্চলই ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। মধ্য ভারতে পেশোয়াদের এবং উত্তরে নবাব ও অন্যান্য দেশীয় রাজাদের শাসনের অবসান ঘটলে এখানকার গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় এক মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এতকাল, গ্রামীণ উৎপাদকেরা এই সমস্ত শাসক ও অভিজাতদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে যে সমস্ত জিনিস তৈরী করছিল, হঠাৎ করেই সে সবের চাহিদা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে বহু মানুষ তাদের সনাতন পেশা ও উপজীবিকা থেকে আর জীবনধারণ করতে পারে না। এসবের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থাতেও দীর্ঘমেয়াদি মন্দা দেখা দেয়।

মধ্য ও উত্তর ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাত শ্রেণীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীন উৎপাদকরা জিনিস তৈরী করত। ইংরাজদের আগ্রাসনের ফলে তাদের অবসান ঘটলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রতক্ষ্যভাবে বহু মানুষ তাদের পেশা হারায়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট হারে নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কুড়ি অথবা তিরিশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট এই রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক

প্রশ্ন

১। উত্তর ও মধ্য ভারতের গ্রামীন উৎপাদকদের হঠাৎ বেকারত্বের কারণ কি ছিল ?

সময়ে এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্বদায় পূরণের প্রবণতা ছিল কম। ইংরেজ আমলের তুলনায় আদায়ব্যবস্থার কঠোরতাও ছিল অনেকাংশে শিথিল। তাই পরিবর্তিত এই ব্যবস্থা উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে একধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি করে। নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতা কৃষকদেরকে অর্থকরী ফসল যেমন নীল, আখ এবং গম চাষে বাধ্য করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে খাদ্যশস্যের চাষ হ্রাস পায়। নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতার কারণে গ্রামাঞ্চল থেকে শস্য নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে শস্যের মূল্যহ্রাস এবং কৃষকের জীবনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ মহাজন, গ্রামীণ হিসাবরক্ষক অথবা পাটোয়ারি এবং গ্রামপ্রধানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর শস্যব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্থিরতা ও স্থানচ্যুতি মধ্য ভারতের গ্রামজীবনের ক্ষেত্রে এক ভিন্নতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। পেশোয়া শাসনের অবসানের পর এই অঞ্চলে ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই ছিল এসবের জন্য মূলত দায়ী। এ বিষয়ে পেশোয়া আমলের প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার গুণগত ব্যবধানের কারণে জমির উপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির পুরোনো অধিকার ক্রমেই অস্বীকৃত হতে থাকে । মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের অধীনে মধ্য ভারতবর্ষের যে বিশাল অরণ্য এবং মালভূমি অঞ্চল ছিল, ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে সেইসব অঞ্চলে বসবাসকারী আরণ্যক জনগোষ্ঠীর জীবনে এক অস্থিরতা দেখা দেয়। প্রথমত, দেশীয় শাসনে এইসমস্ত অঞ্চলে মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত শিথিল। ইংরেজ শাসন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চলে জরিপের কাজ শুরু হয়। সরাসরি রাজস্বসংগ্রহ করবার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ইংরেজ সরকার এইসমস্ত অঞ্চলে রেভিনিউ ফার্মিং বা রাজস্ব ইজারাদারি ব্যবস্থা পত্তন করে। বিশাল বিশাল অঞ্চল থেকে ইজারাদারেরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে পাওয়া এইসব অঞ্চলগুলি থেকে ইজারাদারেরা তাদের ইচ্ছেমতন হারে ও শর্তে খাজনা আদায় শুরু করে। প্রান্তিক কৃষিব্যস্থার সঙ্গে যুক্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি এই ধরনের বলপূর্বক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায়ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রিত কৃষিজমি ঋণের দায় মেটাতে মহাজন বা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের নামে হস্তান্তরিত হয়।

> *আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্থিরতা ও স্থানচ্যুতি মধ্য ভারতের গ্রামজীবনের ক্ষেত্রে এক ভিন্নতর সমস্যা সৃষ্টি করে ছিল। ইংরাজ সরকার এখানে ইজারাদারি ব্যবস্থা পত্তন করে। প্রায় ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রিত কৃষিজমি ঋণের দায় মেটাতে মহাজন বা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের নামে হস্তান্তরিত হয়।*

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বনাঞ্চল সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক আইনকানুন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হতে শুরু হলে এই ধরনের সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি তাদের পুরোনো বসবাসের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। অধ্যাপক ক্রিসপিন বেটস মধ্য ভারত নিয়ে তাঁর নানা লেখায় ঔপনিবেশিক শাসনকালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রায় সংঘটিত পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন

১। ইজারাদারি ব্যবস্থার ফল কি ছিল ?

৩.৬.১.২.৫ ঃ দেশীয় রাজ্য

প্রথমেই বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসিত না হলেও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামাঞ্চলও ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাবমুক্ত ছিল না। দেশীয় রাজাদের শাসনদক্ষতা ও আঞ্চলিক অবস্থাভেদে তার কিছু তারতম্য ছিল মাত্র। এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল মোটামুটিভাবে এক। রাজ্যের কৃষিজমির একটা বড় অংশ খালসা নামে রাজ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। বাকি জমির একটা অংশ শাসকেরা রাজস্বমুক্ত অনুদান হিসাবে মন্দির, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গুণী মানুষদের মধ্যে বিলি করে দিত। অবশিষ্ট জমির বেশিরভাগই থাকতো সরাসরি কৃষকদের হাতে। কৃষকেরা নির্দিষ্ট হারে বিঘা হিসাবে নগদ অথবা উৎপন্ন শস্যের মাধ্যমে খাজনা দিত। পশ্চিম ভারতে এই ব্যবস্থা যথাক্রমে বিঘোতি বা ভাগবাতাই নামে পরিচিত ছিল।

দেশীয় রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রনাধীন গ্রামাঞ্চলও ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাবমুক্ত ছিল না। রাজ্যের কৃষি জমির যেটুকু কৃষকদের হাতে ছিল, নির্দিষ্ট হারে বিঘা হিসাবে নগদ অথবা উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে তার খাজনা দিত। এই ব্যবস্থার নাম ছিল বিঘোতি বা ভাগবাতাই।

প্রশ্ন

১। 'বিঘোতি' বা 'ভাগবাতাই' কি ?

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে রাজারা নান ধরনের অতিরিক্ত অর্থ (বেট) বা শ্রম (বেগার) আদায় করতেন। সাধারণভাবে, এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শিথিল এবং অসংগঠিত। তাই, কৃষিসমাজ এই ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের দাবি পূরণ করতে গিয়ে প্রায়ক্ষেত্রেই শাসকেরা কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ অর্থব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে কৃষকদের খাজনা প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বৃহত্তর বাজারের প্রভাবে রাজ্যগুলির আভ্যন্তরিক বাজারে মুদ্রায়ণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের দাম নিম্নমুখী হতে থাকে। এ সবের কারণে, সামগ্রিকভাবে গ্রামজীবনে নান ধরনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩.৬.১.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনীতি

২। Dharma Kumar, (Ed.), The Cambridge Economic History of India, Vol. II, c.1757-c.1970

৩। ইরফান হাবিব, মুঘল ভারতের কৃষি অর্থনীতি

৪। Eric Stokes, The English Utilitarians and India

৩.৬.১.৪ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে কি বোঝ? প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপটি বিশ্লেষণ কর।

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন কি ছিল?

৩। পূর্ব ভারতবর্ষের গ্রামসমাজের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৪। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা সামগ্রিকভাবে পূর্ব ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৫। দক্ষিণ ভারতবর্ষে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কারণ কি?

৬। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের গ্রামসমাজ কতটা পরিবর্তিত হয়েছিল?

৭। মধ্য ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ওপর ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৮। পশ্চিম ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্যগুলির গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৯। সমস্ত ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয় গ্রামসমাজকে কতটা পরিবর্তন করতে পেরেছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ২

ECONOMY AND AGRICULTURE

একক - ২

ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি অর্থনীতি

গঠন (Structure) ঃ

৪.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.২.২.১ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন

৪০২.২.২ ঃ বাজারমুখিতা ও কৃষি

৪.২.২.৩ ঃ রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

৪.২.২.৪ ঃ উৎপাদন বৃদ্ধির ধরন

৪.২.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ও ধরন ;

২। বাজারমুখিতা ও কৃষি

৩। বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

৪.২.২.১ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন

আমরা জানি যে কৃষি জমিতে দুধরনের ফসল উৎপাদিত হয় —খাদ্যশস্য ও নগদ শস্য বা বাণিজ্য শস্য। ধান, গম, বাজরা প্রভৃতি হল খাদ্য শস্য। আর পাট, তুলো, তৈলবীজ, নীল, পাট প্রভৃতি হল নগদ শস্য। প্রধানত খাদ্যশস্য প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য উৎপাদিত হয় আর নগদ শস্য বা বাণিজ্য শস্য কাঁচামাল হিসাবে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে একটা পশ্চাদপদ দেশে এই ধরনের সরলীকরণ সম্ভব। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি প্রভৃতি নির্ভরতা ত্যাগ করে জ্ঞাননির্ভব হয়। বাজার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সব শস্যই বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত বিভাজীকরণ তখন আর প্রযোজ্য হয় না। তবে ভারতের কৃষিতে আধুনিকীকরণ না ঘটায় আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদন এবং তার ধরন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার আলোচনা উপরোক্ত বিভাজন দিয়ে শুরু করতে পারি। বৃটিশ ভারতে কৃষক উৎপাদন করত প্রধানত নিজের পরিবারের ভরণপোষণের তাগিদে। বাজারের জন্য সামান্য যা উৎপাদন করত তা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে কাঁচামাল হিসাবে কাজে লাগত। খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্তের একটা অংশের রাজস্ব হিসাবে নিষ্কাশন ঘটত যার সাহায্যে অকৃষি সম্প্রদায়ের ভরণপোষণ চলত। ইরফান হাবিবের মত অর্থনীতিবিদ্রা মনে করেন যে মোঘল আমলেই ভারতের অচলায়তন অবস্থা ভাঙ্গতে শুরু করেছিল। বাজার অভিমুখে উৎপাদন শহরের সঙ্গে গ্রামের সংযোগ ঘটায়। ভারতে পুঁজিবাদ বিকাশের একটা শর্ত তৈরি হতে থাকে। মোঘল আমল থেকেই ইউরোপিয় বেনিয়াদের সংস্পর্শে এসে ভারতের কৃষি উৎপাদন এবং তাকে ঘিরে ব্যবসায় যে পরিবর্তন আসতে থাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে তা ত্বরান্বিত হয়। ভারত বিশ্বপুঁজিবাদের অংশ হয়। কিন্তু একই সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না। নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের মুখে ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটায়। একই সঙ্গে দেশের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিদেশের পণ্যের বাজার হিসাবে গড়ে ওঠে ভারতের অর্থনীতি। ভারত কৃষি থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করতে থাকে। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজার নয়, বিশ্ববাজারে ভারত হয়ে দাঁড়ায় কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী।

৪.২.২.২ ঃ বাজারমুখিতা ও কৃষি

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে আমরা শুধু কৃষি দ্রব্যের পণ্যরূপ ধারণ বা নগদ লাভের আশায় বাজার বিক্রয় বুঝি না। কৃষকের স্বেচ্ছায় বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি, কৃষিপণ্যের সঙ্গে জমির বাজারের সম্প্রসারণ এবং এদের সঙ্গে সংগতি রেখে কৃষি সমাজের স্তরবিন্যাসে পরিবর্তনকে বুঝি। এই সবকিছুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কে এক গুণগত পরিবর্তন আসে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের দুয়ার খুলে যায়। বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ধরনে পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ কৃষি সমাজে এক কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায়।

কোন অর্থনীতিতে বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করে বাণিজ্যিকীকরণ আত্মপ্রকাশ করতে পারে যেখানে বাজারে সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি কৃষকের স্বেচ্ছাধীন। এই প্রক্রিয়ায় রাজস্ব আদায় বা মহাজনের ঋণের দায়ে কৃষক শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয় না। বাজার দামের সুযোগ এবং তার ফলে বাড়তি আয় কৃষক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। কৃষকের দরকষাকষির ক্ষমতা থাকে। এর ফলে পুঁজিগঠনের হার বাড়ে। লাভের পুনর্বিনিয়োগ কৃষি উন্নয়নে সহায়ক হয়।

অপর দিকে রাজস্ব দেওয়ার দায়ে বা ঋণ মেটাবার বাধ্যবাধকতার জন্য কৃষক বাজারে শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হতে পারে। অভাবের তাড়নায় তাকে ভোগের অংশও বিক্রি করে দিতে হয় যাকে অভাবি বিক্রয় বলে। পরে ঋণ করে হলেও তাকে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বেশি দামে শস্য কিনতে হয়। বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে বাহ্যিক চাপে, কৃষকের ইচ্ছেয় নয়। একে বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণ বলে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের সুবিধা কৃষক পায় না। ব্যবসায়ী ও মহাজন এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব করে। একটা উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদীশক্তি এবং দেশের ব্যবসায়ী ও মহাজনের মধ্যে একটা অশুভ জোটবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এরাই বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেয়। অমিত ভাদুড়ী দেখান যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ও বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণের বিভিন্ন মাত্রায় সংযুক্তি ঘটে। উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের এই দুটি পদ্ধতিকে বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রিত হতে দেখা যায়। উভয়ের আপেক্ষিক শক্তির ওপর নির্ভর করে উদ্বৃত্ত হরণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক বলে। ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে দেখা যায় বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে প্রধানত বাহ্যিক শক্তি বলে। তাই একে মূলতঃ বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণ বলা চলে।

৪.২.২.৩ ঃ রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির পক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে ডেভিড রিকার্ডোর আপেক্ষিক সুবিধা এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে। এর পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছিল সেটা ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা বলেন না। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দিয়ে উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজ শিল্পপতিদের বিদেশ থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল অবাধে আমদানি করা যেমন দরকার ছিল তেমনি দরকার ছিল ভারতের বাজারকে তাদের শিল্পপণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা। এর জন্য ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি অপরিহার্য ছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ভারতে রেলশিল্প পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

শুধু আন্তর্জাতিক স্তরে কৃষির বিশেষীকরণ ঘটে তা নয়। দেশের অভ্যন্তরেও যে অঞ্চল যে শস্য উৎপাদনে বেশি নিপুণ সেই অঞ্চল সেই পণ্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। দেশের পক্ষে আঞ্চলিক এই বিশেষীকরণ কাম্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকা একটা দেশ নিজের উন্নয়নের কাজে এই বিশেষীকরণকে কাজে লাগাতে পারে না। আঞ্চলিক এই বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে সাহায্য করে। ভারতে এক একটা অঞ্চল তাদের সুবিধামত কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করে। যেমন দক্ষিণ ভারতে আগ্নেয় শিলাজাত কালোমাটির অঞ্চল লম্বাআঁশযুক্ত তুলোচাষের উপযোগী। ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের জন্য এই ধরনের তুলো আসত দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। ১৮৬০ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বাঁধায় ইংরেজরা বাধ্য হয় ভারত থেকে তুলো আমদানি করতে। ভারতে তুলোর চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। দক্ষিণে কৃষকরা এতদিন অল্প পরিমাণ তুলো উৎপাদন করত। তার সঙ্গে খাদ্যশস্যও কিছু উৎপাদন করত। তুলোর চাহিদা এবং তার সঙ্গে দাম বাড়ায় তারা তুলো উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। এর ফলে তারা খাদ্য শস্য বাজার থেকে কেনে। অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ে। বাজারের সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষকরা বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন শুরু করে। বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। রপ্তানি ও বাণিজ্যিকীকরণ এই ভাবে কৃষি উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটিয়ে অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা পরাধীন দেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত বজায় রেখে সম্পদের নির্গমন ঘটানো হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত সুবিধা বিদেশে চালান হয়। ধনী কৃষকরা না সুবিধা পেলেও আমরা দেখব যে গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরা এতে সুবিধা পায় না।

৪.২.২.৪ ঃ উৎপাদন বৃদ্ধির ধরন

আমরা বিভিন্ন শস্য ধরে উৎপাদন, চাষের এলাকাও একর প্রতি উৎপাদনের গতিপথ আলোচনা করতে পারি। দেখা যায় যে খাদ্যশস্যের তুলনায় নগদ শস্যের আওতায় চাষের এলাকা আপেক্ষিকভাবে বেড়েছে। নীল, আফিম, তৈলবীজ, পাট প্রভৃতি ছাড়াও গমের ক্ষেত্রেও চাষ এলাকা বেড়েছে। লক্ষ্যনীয় যে দক্ষিণভারতে ১৮৬০ সালের পর তুলাচাষের ক্ষেত্রে যে স্ফীতি দেখা যায় তার ফলে ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তুলা চাষের এলাকা বৃদ্ধির শতকরা হার সবচেয়ে বেশি। এই এলাকা ১৮৯১-১৯০১ সালের থেকে ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ে। একই সময়ে ধান উৎপাদনের এলাকা কমেছে। এছাড়া গম উৎপাদনের এলাকাও যথেষ্ট বেড়েছে। পাট চাষের এলাকাতেও উর্দ্ধগতি দেখা যায়। তবে জোয়ারের মত নিকৃষ্ট শস্যের উৎপাদন এলাকা কমেছে। এর সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে উৎপাদনও কমেছে। বাজরা ও জোয়ারের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে। জোয়ারের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক। লক্ষ্যণীয় যে তুলোর ক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন কমেছে। ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তুলোর উৎপাদন বেড়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়েছে সেসব ক্ষেত্রে তা ঘটেছে চাষের এলাকা বৃদ্ধির দরুন। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তা ঘটেনি। অর্থাৎ প্রযুক্তির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক পাওয়া যায় না। চাষ এলাকা বাড়ায় উৎপাদনের হার বেড়েছে।

নিচের সারণিতে আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরা হল ঃ

কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হারের প্রবণতা ঃ

উৎপাদন, চাষের এলাকা, একর প্রতি উৎপাদন (শতকরা বার্ষিক হার)

	১৮৯১-১৯০১	১৮৯৬-১৯০৬	১৯০১-১৯১১	১৯০৬-১৯১৬
উৎপাদন				
চাল	০.৩৭	-০.৩৭	০.৪৯	১.১২
গম	১.৬৩	২.৩৫	২.০৩	১.৫৬
জোয়ার*	১.৪৮	-০.১৭	-০.৪২	১.০৯
বাজরা*	২.৪৭	১.৯৬	১.৭৪	০.৪৬
ভুট্টা	২.২০	১.৩১	১.০৫	১.৬৩
তুলা	২.১৭	৪.৮৫	২.৯০	১.৪৩
পাট	২.৬১	৪.০৩	১.০৭	০.৮১

	১৮৯১-১৯০১	১৮৯৬-১৯০৬	১৯০১-১৯১১	১৯০৬-১৯১৬
চাষের এলাকা				
চাল	-০.২১	-০.৩৬	০.৩১	০.৩৮
গম	-০.২৬	২.২৯	০.৬০	০.৮৮
জোয়ার*	০.৭০	-০.১৭	-০.৭৬	-০.১৭
বাজরা*	১.৮২	১.৯৪	১.৫২	-০.১৮
ভুট্টা	১.৭২	০.৭৩	০.১৩	০.১০
তুলা	-০.৩৩	৪.২৫	৩.১১	০.৫৭
পাট	-০.৫৫	৫.৪৯	২.১৬	-১.৮৫
একর প্রতি উৎপাদন				
চাল	০.৫২	০.০৭	০.২১	০.৭৪
গম	২.৫৩	০.৩৪	১.৩৫	০.৭৬
জোয়ার*	০.৮০	০.১৬	০.৪১	১.১৭
বাজরা*	০.৭৮	-০.২৬	০.২২	০.৬৪
ভুট্টা	০.৪৬	০.৬৩	০.৯১	-১.৫২
তুলা	২.৪৪	০.৮৭	-০.৩৫	০.৯৫
পাট	৩.২২	-১.০৫	-১.৪০	২.৬১

* ভোগের দিক থেকে নিকৃষ্ট দানাশস্য

দ্রষ্টব্য ঃ G. Blyn, Agricultural Trends, pp. 327-29.

৪.২.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি -- রণেশ রায়

২। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি -- সব্যসাচী ভট্টাচার্য

৩। Essays on Commercialization of Indian Agriculture – K. N. Raj (Ed.)

৪। Cambridge Economic History – Vol. II

৫। George Blyn – 1891-1946 Agricultural Trend in India

৬। Amit Bhaduri – A study in Agriculture at backwardness under semi-feudalism (1973) Economic Journal, Vol. 83.

৪.২.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের স্বরূপটি ব্যাখ্যা কর।

২। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন আলোচনা কর।

৩। রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে কৃষির সংযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

TRADITIONAL HANDICRAFT INDUSTRY AND THE QUESTION OF DE-INDUSTRIALIZATION

একক - ১

Ecological Changes and Rural Society
বাস্তুপরিবেশের পরিবর্তন ও ভারতের গ্রামসমাজ (ঔপনিবেশিক আমল)

বিন্যাসক্রম

৫.৪.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৫.৪.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

৫.৪.১.২ ঃ বাস্তুপরিবেশ বা ইকলজি

৫.৪.১.৩ ঃ বাস্তুপরিবেশ ও অর্থনীতি

৫.৪.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক অভিঘাত ঃ গ্রামসমাজ ও বাস্তুপরিবেশের অবক্ষয়

৫.৪.১.৫ ঃ কৃষিপরিবেশ ও কৃষিনীতির সম্পর্ক ঃ ইতিহাসচর্চার নতুন ধরন

৫.৪.১.৬ ঃ ভারতের কৃষি অর্থনীতি ঃ প্রধান লক্ষণ

৫.৪.১.৭ ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবক্ষয়

৫.৪.১.৮ ঃ নদীসংকটের কারণ

৫.৪.১.৯ ঃ প্রাকৃতিক বিরূপতা ও উৎপাদকগোষ্ঠী

৫.৪.১.১০ ঃ ভারতের বনাঞ্চল ঃ ঔপনিবেশিক চাপ

৫.৪.১.১১ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.১.১২ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক ইতিহাসে উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে ইকলজি বা বাস্তুপরিবেশের সম্পর্ক কি এবং গ্রামীণ সমাজের সংগঠনে এর গুরুত্ব কতটা, তা এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে।

৫.৪.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

ভারতে ইংরেজদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের পথে যে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা সরানোর কাজ শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে; প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হয় ১৭৬৫-তে দেওয়ানি প্রাপ্তির মাধ্যমে; দৃঢ়তর হয় ১৭৯৩ ও ১৮২০-র চিরস্থায়ী এবং রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের পর; আর পরিণতি পায় সিপাহি বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে। ১৮৫৭-র পর ইংরেজদের আমলাতান্ত্রিক সরকারি প্রশাসন কঠোরভাবে ভারতের ওপর চেপে বসে। সেই সূত্রে শুধু উৎপাদক সমাজ নয়, উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপরেও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করতে চায় ইংরেজরা। এর প্রভাব যেমন সাধারণভাবে অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির ওপর পড়ে, তেমনি উৎপাদক সমাজের ইকলজি বা প্রাকৃতিক অবস্থার ওপরেও পড়ে। কেননা কৃষি উৎপাদনের উপকরণগুলোর সঙ্গে প্রাকৃতিক অবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই বিষয়টিই ভারতের ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হবে এই এককে। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া হবে, ইকলজি বলতে ঠিক কি বোঝায়।

৫.৪.১.২ ঃ বাস্তুপরিবেশ বা ইকলজি

ইকলজি কথাটি দুটো গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। ওইকোস (Oikos) অর্থাৎ বাসের জায়গা এবং লোগোস (Logos) অর্থাৎ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী আর্নস্ট হিকেল (Ernst H. Haekel) ১৮৬৯ সালে জীববিদ্যার একটি বিশেষ শাখাকে চিহ্নিত করতে ইকলজি (Ecology) কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। জীবজগতে সবচাইতে প্রভাবশালী প্রাণী হল মানুষ। আর সব প্রাণী প্রকৃতিকে যেভাবে পায়, সেইভাবে ভোগ করে। মানুষই একমাত্র তাকে ব্যবহার করে উৎপাদনের সূত্রে। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে ‘ইকলজি’ বিষয়টি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। সহজ করে বলতে গেলে, উৎপাদক যেখানে বাস করে এবং যেখানে উৎপাদন করে, সেখানে জমি, জল, বায়ু এবং অন্যান্য প্রাণীর সমষ্টিগত ব্যবহার তাকে করতে হয়, এবং সেই ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সে তৈরি করে তার নির্দিষ্ট ইকলজি বা বাস্তু পরিবেশ।

৫.৪.১.৩ ঃ বাস্তুপরিবেশ ও অর্থনীতি

ইকলজি ও অর্থনীতির সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ডেভিড হারলিহ্ বলেছিলেন, বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্যের দরকার, তার উৎপাদনের ইতিহাসকে যদি অর্থনৈতিক ইতিহাস বলে গণ্য করা হয়, তাহলে অবশ্যই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ইতিহাসকে জড়িয়ে দেখিতে হবে। 'ইকলজির' এবং 'ইকনমি'র মূল উপাদান তো একই — জমি, জল, বায়ু, প্রাণসম্পদ ইত্যাদি। উৎপাদনের এইসব উপকরণের ওপর যদি উৎপাদকের নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে সে নিজের স্বার্থেই বাস্তুপরিবেশ ঠিকঠাক রক্ষা করবে। কিন্তু যদি শুধু উৎপাদনের দায়িত্ব তার ওপর থাকে, আর উৎপাদনের প্রাকৃতিক উপকরণের নিয়ন্ত্রণ, চলে যায় অন্য কোন হাতে, তাহলে মুশকিল হয়। তখন কর্তৃত্ব যে করে, উৎপাদনের কথা সে ভাবে না, বাস্তুপরিবেশের কথাও তার মাথায় থাকে না, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবসায়িক ব্যবহার বাড়াতে বাড়াতে পরিবেশের অবনমন ঘটায়, আর তার ফলে উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে পড়ে; অথচ সেটা ঠেকানোর কোন উপায় উৎপাদক বা কৃষকের হাতে থাকে না, কেননা উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর তার সব নিয়ন্ত্রণই ততদিনে নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এই জিনিসটিই ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে গ্রাম-ভারতে ঘটেছিল। বর্তমান এককে এই পরিণতিটাই ব্যাখ্যা করা হবে।

৫.৪.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক অভিঘাত ঃ গ্রামসমাজ ও বাস্তুপরিবেশের অবক্ষয়

রাষ্ট্রের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ যে একটি গ্রামসমাজের উৎপাদনব্যবস্থা ও বাস্তুপরিবেশের কী ক্ষতি করতে পারে, ঔপনিবেশিক আমলের ভারত তার অন্যতম উদাহরণ। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের 'ইকলজি' বা 'বাস্তুপরিবেশ' সর্বোত্তম ছিল, এমন দাবি করা যাবে না। কিন্তু রিচার্ড গ্রোভ যেমন 'গ্রিন ইম্পেরিয়ালিজম' বইতে দেখাতে চেয়েছেন যে, বাস্তুপরিবেশ রক্ষা করতে ভারতীয়রা জানতই না, তা একেবারেই ভুল। "Rapid and extensive ecological transition was frequently a feature of pre-colonial landscapes and states" — গ্রোভের এই মন্তব্যটিও মেনে নেওয়া যায় না। ঐতিহাসিক পরম্পরায় ভারতে বরাবর মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও সমতা স্বীকৃত হয়েছে। 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' ও 'বৃক্ষচৈতন্যে'র তত্ত্বই তার প্রমাণ। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা মঙ্গলকাব্যে বারবার বলা হয়েছে যে, উৎপাদন ও সামাজিক ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের একটি সম্পর্ক ভারতে ছিল, আর সেই সম্পর্কের কেন্দ্রীয় আদর্শ ছিল বাস্তুপরিবেশ রক্ষা। ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এই সম্পর্কটিকে নষ্ট করে দিয়েছিল, তাই একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাস্তুপরিবেশ ও গ্রাম সমাজ।

তিনটি প্রধান পর্বের মধ্য দিয়ে ভারতের গ্রামীণ সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধারণা গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্বটি ছিল ১৭৬৫ থেকে ১৮০০, এই পঁয়ত্রিশ বছরের। এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল কৃষির বাণিজ্যায়ন (Commmercialisation)। ক্রমবর্ধমান কৃষিজ উদ্বৃত্তের ঝোঁকে অবহেলিত হয়েছিল স্বাভাবিক সবুজায়ন। পরের পঁচাত্তর বছরে ভারত ইংলণ্ডীয় শিল্পের কাঁচামালের আড়তে পরিণত হয়েছিল। এই সময়েই সূচিত হয় বনাঞ্চল ধবংস প্রক্রিয়া এবং চলতে থাকে প্রাকৃতিক সম্পদব্যবস্থার বিকৃতি। সব শেষ পর্বে জোর দেওয়া হয় ঔপনিবেশিক বিনিয়োগের ওপর। ভারতের বাস্তু পরিবেশের ওপর ভারতীয় গ্রামসমাজের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই পর্বে, কেননা ভারতের জমি, জল, বায়ু এবং প্রাণীসম্পদ, এই সবই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে বিদেশি পুঁজি বৃদ্ধির স্বার্থে। ডঃ পাণ্ডিয়ানের ভাষায় —

The mode, time and extent of land revenue payment were altered, forests were enclosed, irrigation works and organisations were disrupted and codified laws restricted the freedom of village communities (MSS Pandian : The Political Economy of Agrarian change, Nanchiland 1880-1939, New Delhi, 1990).

৫.৪.১.৫ ঃ কৃষিপরিবেশ ও কৃষিনীতির সম্পর্ক ঃ ইতিহাসচর্চার নতুন ধরন

আলোচ্য বিষয়টির গভীরে যাওয়ার আগে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়েছে তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখা ভাল। ভারতের যে কোনো অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতিতে গত দেড়শো, দুশো বছরে যে মন্দ লক্ষণগুলো দেখা গেছে তার সবগুলোকেই সাধারণত ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাজস্ব ও ভূমিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক চাপ ও বাণিজ্যিক শোষণের ফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশপরবর্তী কালে কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নের পরিকল্পনায় জমির মালিকানার সংস্কার, রাজস্বনীতির জনমুখীনতা বা উপযোগী বাণিজ্যিক কাঠামোর কথাই মুখ্য স্থান অধিকার করে। প্রাকৃতিক প্রভাবের সমস্যা সেখানে ততটা স্থান পায় না। সম্প্রতি প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হয়েছে এবং তা সম্ভবত য়োরোপীয় প্রভাবের ফল। য়োরোপে বেশ কিছুদিন ধরেই—প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে কৃষি-উৎপাদনকাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে — এ ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে। এখন যারা কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাদের অনেকের কাছেই মানুষের তৈরী ভূমি-সম্পর্ক বা ভূমিব্যবস্থা যেমন গুরুত্ব পায়, প্রকৃতির দেওয়া উৎপাদন পরিবেশও তেমনি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আর সেখানেই অর্থবহ হয় কৃষিপরিবেশ বা ইকলজি, কৃষি-অর্থনীতি ও গ্রাম-সমাজের সম্পর্ক সংক্রান্ত গবেষণা।

৫.৪.১.৬ ঃ ভারতের কৃষি অর্থনীতি ঃ প্রধান লক্ষণ

এই আলোচনায় যে-সময়টিকে ধরা হয়েছে, তার শুরু থেকেই ভারতের কৃষি উৎপাদনে কখনো দ্রুত অবনতি, কখনো বা মন্দা চলছিলো। গোটা ভারতেই তখন কৃষি-মন্দার যুগ। কিন্তু ভারতের সব অঞ্চলে কার্যকারণপরম্পরা একইরকম ছিলো কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আঞ্চলিক বিভিন্নতার কথা মনে রেখে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে, কোথাও ঔপনিবেশিক ভূমিসম্পর্ক, কোথাও জনসমস্যা, কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশ আবার কোথাও বা কমবেশী হারে, সবগুলো কারণই কার্যকর ছিলো। তবে প্রাকৃতিক প্রভাব যে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে অবনতি বা মন্দা কতটা ছিলো, তার একটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। আর এইখানেই রয়েছে সবচাইতে বড়ো অসুবিধে, তথ্যসংক্রান্ত অসুবিধে। প্রবণতা লক্ষ্য করা যতো সহজ, পরিষ্কার তথ্য যোগানো ততো সহজ নয়। সারা ভারতের পটভূমিতে মন্দার কথা বলতে গিয়ে ড্যানিয়েল ও অ্যালিস থর্নার সমর্থন খুঁজেছেন জর্জ ব্লিনের দেওয়া তথ্যের মধ্যে। কিন্তু ব্লিনের দেওয়া তথ্যই যে সঠিক, এমন কথা আজো ঠিক জোর দিয়ে বলা যায়নি। তর্ক এখনো চলছে। এই অবস্থায় বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক তথ্য দিয়ে উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি বোঝানো প্রায় দুঃসাধ্য। সুতরাং কিছু পরোক্ষ উপায়েই বিষয়টি বুঝতে হবে। উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে কুড়ি শতকের দুই বা তিনের দশক পর্যন্ত সময়ের কৃষি-সম্পর্কিত যেসব তথ্য বিভিন্ন নথিপত্রে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জেলায় কর্ষিত জমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে এবং পতিত জমির পরিমাণ ততোধিক হারে বাড়ছে। যদি ধরে নেওয়া হয় (ধরে নেওয়া যে অযৌক্তিক হবে না, তা পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে) যে, ঐ সময়ে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হয় কমেছে, নয়তো স্থির থেকেছে, তাহলে কর্ষিত জমির-পরিমাণ কমে যাওয়ায় অর্থ মোট উৎপাদনের পরিমাণও কমে যাওয়া। তথ্যসারণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক একটি জেলায় ১৮৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯০১-০২ সালের মধ্যে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ কমেছে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ একর। পরবর্তী পাঁচ বছরেও উৎপাদনের এই ধারাটিই কমবেশী বজায় থাকে। যেমন ১৯১০ সালে লেখা নদীয়ার জেলা-প্রতিবেদনে বলা হয়, "গত পাঁচবছরে মোট কর্ষণযোগ্য জমির মাত্র একচল্লিশ শতাংশ চাষের আওতায় ছিলো।" এর-কয়েক বছর পরের প্রিঙ্গলের সমীক্ষায় অবশ্য বলা হয়েছে, কুড়ি শতকের শুরুতে প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ জমি চাষ করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রিঙ্গলের হিসেবটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। জেলা-প্রতিবেদক স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রদত্ত তথ্য সমূহের সতর্ক বিশ্লেষণের পরই তাঁর মন্তব্য করেছিলেন এবং তাঁর দেওয়া হিসেবের সঙ্গে ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হিসেবের মিল আছে। সেন্সাস রিপোর্টেও চল্লিশ শতাংশ জমি প্রকৃত অর্থে কর্ষিত বলে দেখানো হয়েছে। আসল পরিমাণ চল্লিশ বা একচল্লিশ শতাংশ যাই হোক না কেন, যে-ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার মতো তা হলো, উৎপাদন কমেছিল।

১৯১১-১২ সাল থেকে চাষের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছিলো এবং ১৯১৩-১৪ সালের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কিছু জমিকে জোর করে কর্ষণযোগ্য করে তোলা হয়েছিলো, কিন্তু এসব নিতান্তই সাময়িক ঘটনা। ১৯১৫-১৬ সাল থেকে আবার অবনতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং ১৯১১-১২ সালের তুলনায় ১৯১৯-২০ সালে কর্ষিত জমির পরিমাণ কমে আসে। কিছুটা উৎপাদন-হ্রাসের কারণেই সেই সময়ে শস্যের দামও চড়তে থাকে। চার্চ মিশনারী সোসাইটির জনৈক ধর্মযাজক ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরকে লেখেন, "কয়েক বছর আগেও তিন চার পয়সায় যতটুকু চাল পাওয়া যেতো, এখন ততটুকু চালের দামই তেরো চোদ্দ পয়সা। চালের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মানুষের বর্তমান দুর্দশার বড়ো কারণ।" ১৮91 সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত ধানের উৎপাদন ক্রমাগতই কমেছে, এরকম হিসেব সরকারী রিপোর্টে আছে। তবে পরিস্থিতির চাপে অনেক পতিত বা অকর্ষিত জমিতে ধানচাষ বাড়ানোর ফলে ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত ধানের উৎপাদনে কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তারপর ধানের উৎপাদন আবার কমতে থাকে এবং ১৯১৫-১৬ সালের তুলনায় ১৯৯৯-২০ সালে ধান-উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ প্রায় আঠারো হাজার একর কমে যায়। অন্যদিকে গম, রবিশস্য প্রভৃতির উৎপাদনে মাঝে মাঝে দু'এক বছরের বাতিক্রম ছাড়া মোটের ওপর অবনতি বা মন্দার প্রবণতাটিই প্রধান লক্ষণ হয়ে থাকে।

৫.৪.১.৭ ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবক্ষয়

এই অবক্ষয় কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। ভূমিকাঠামোর প্রগতিহীনতা, কৃষকের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও ঋণভার অবশ্যই সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। সমস্যাগুলোকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলো দীর্ঘসময়ের ঔপনিবেশিক শোষণ। কিন্তু শুধুই ভূমিব্যবস্থা বা ঔপনিবেশিক শোষণের কথা বলে কৃষি-অর্থনীতির অবক্ষয়কে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষি-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিলো এবং এরই প্রতিকূলতা অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ।

নদীব্যবস্থা ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত যে জিনিসগুলোকে বোঝায় তার মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসই হলো নদীব্যবস্থা। এশিয়াটিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে নদী ও নদীর জল কৃষির প্রধান শর্ত। কিন্তু উনিশ ও কুড়ি শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে নদীব্যবস্থার সংকট ভারতে কৃষিকাজকে পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সমসাময়িক সরকারী কাগজে বারবার এই নদীসংকটের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, নদীগুলোর মজে যাওয়ার সঙ্গে কৃষির সামগ্রিক দুর্দশা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

৫.৪.১.৮ ঃ নদীসংকটের কারণ

ঔপনিবেশিক রেলব্যবস্থার পরিকল্পনাগত ত্রুটি অবশ্যই নদীসংকটের একটা বড় কারণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভারতে রেলপথ স্থাপন শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বাঁধ ও সংযোগকারী সড়ক-নির্মাণ। রেলপথ উঁচু করতে গিয়ে যে বাঁধ তৈরি করতে হলো তাও যেমন বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিক জলস্রোতে বাধার সৃষ্টি করলো, তেমনি রেলস্টেশনের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগসাধন করবার জন্যে যেসব সড়ক তৈরি করা হলো, সেগুলোও জল প্রবাহের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। রেলপথ বসানোর সময় রেলদপ্তর, নদী-পর্যবেক্ষণ-বিভাগ এবং পূর্তদপ্তরের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সবদিক ঠিক রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেলো রেল চলছে তার নিজের যুক্তিবুদ্ধিমতো, তাতে আর কিছুর ক্ষতিবৃদ্ধি হলো কিনা, তার কিছু এসে যায় না।

কৃষি-উৎপাদনে নদীসংকটের প্রভাব ঃ

কৃষি-সংকট ছিলো নদীসংকটের অনিবার্য পরিণতি। জলস্রোতহ্রাসের ফলে পলিস্তর ফিকে হয়ে আসা এবং জমিতে জল ও আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাওয়া—এই দুই কারণে সাধারণ জমির উর্বরতা কমে গিয়েছিলো। তৎকালীন কৃষিদপ্তরের পদস্থ কর্মচারীরা অনেকবার জমির অনুর্বরতাবৃদ্ধির কথা বলেছেন।

৫.৪.১.৯ ঃ প্রাকৃতিক বিরূপতা ও উৎপাদকগোষ্ঠী

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতা যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রকে আঘাত করেছিলো নানাভাবে, উৎপাদকগোষ্ঠিকেও তেমনি রেহাই দেয়নি। নদীসংকট থেকে উদ্ভুত এবং অন্যভাবে বর্ধিত পারিবেশিক বিরূপতা বিভিন্ন মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে উৎপাদকগোষ্ঠীকে হয় নিঃশেষ করেছিলো, নয় তাদের জীবনীশক্তি নিংড়ে নিয়েছিলো। এর ফলে কৃষিতে একসময় রীতিমতো শ্রমসংকট দেখা দিয়েছিলো। সাধারণত যে রোগগুলো সেই সময় বেশী ছড়িয়ে পড়তো, সেগুলো হলো ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং ডায়েরিয়া। এর ফলে শুধু যে উৎপাদকদের মৃত্যু হল, তা নয়, যারা রোগ মহামারীর হাত এড়িয়ে বেঁচে থাকতে পেরেছিলো তাদেরও আগের মতো খাঁটবার সামর্থ্য রইলো না। কৃষিতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেই পরিশ্রম করবার মতো জীবনীশক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছিলো। এর থেকেই জন্ম নিয়েছিলো তাদের কাজে অনাগ্রহ বা আলস্য। অনাগ্রহ বা আলস্য কৃষকের সংস্কারগত নয়। প্রিঙ্গল বলেছিলেন ঃ "মন্দ আবহাওয়া ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণেই এখানকার কৃষকেরা অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। কোনো তত্ত্বকথা দিয়ে তাদের কর্মঠ করে তোলা যাবে না। তাদের জন্যে দরকার — ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার।"

প্রাকৃতিক বিরূপতা ও গবাদি পশু

প্রাকৃতিক অবক্ষয় শুধু মানুষকেই আঘাত করেছিলো তা নয়, পশুকেও ছেড়ে কথা বলেনি। পশুরোগের প্রাদুর্ভাব ও গো-মরাই একসময় ছিলো প্রতিদিনকার খবর। ১৮৭০ সালে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় ৬.৯ শতাংশ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছিলো। ঐ সময়ে নিশ্চিন্দপুরে মারা যায় ২৪.০ শতাংশ পশু। গবাদি পশুর মৃত্যু ভূমিকর্ষণেই যে শুধু সংকটের সৃষ্টি করেছিলো তা নয়, গোবর সারের সরবরাহও কমিয়ে দিয়েছিলো।

নদী-ব্যবস্থার অবনতি ও জমির উর্বরতা কমে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন প্রচুর আবাদী জমি পতিত রাখা শুরু হয়, অন্যদিকে তেমনি অনেক জঙ্গল এলাকা ও গোচারণ-ভূমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। ফলে পশুপালকদের গোপালন সমস্যা দেখা দেয় এবং পশুর সংখ্যা কমতে থাকে। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে গোচারণভূমি ও কর্ষিত জমির অনুপাতের পরিবর্তন হয় ১০ঃ৬ থেকে ১ঃ১৫-এ। পরবর্তী দশকগুলোতে এই ধারায় খুব একটা হেরফের হয়নি। ১৯১৫-১৬ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে বাচ্চা গরুমোষের সংখ্যা এক জেলাতেই ৩৪১,৪৩০ থেকে কমে হয় ২৬৫,৭৩৮। ১৯১০-১১ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে হালের সংখ্যা ১৩৯,৬৩৬ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৩৩,৫১৪টিতে।

দায়িত্ব কার?

যদিও জমির গুণগত মানের ক্রমাবনতি, উৎপাদকগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসমস্যা বা গবাদিপশুর জীবনসংকট এবং এসবের ফলে সামগ্রিক কৃষিসংকট প্রাকৃতিক দুরবস্থার পটভূমিতে দেখা দিয়েছিলো, তবু তার দায় শুধু প্রকৃতির উপরেই চাপিয়ে দিয়ে বসে থাকা চলে না। অবক্ষয় যখন শুরু হয়েছিলো তখন তাকে রোধ করবার বা পাল্টা ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব কার? সরকার কর্তৃক জেলাবোর্ড, লোকালবোর্ডগঠন, পরিবহনব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পূর্তদপ্তরের কাজকর্ম বা জলকর-আদায়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে নদী-পর্যবেক্ষণ বিভাগের সক্রিয় তৎপরতা—এসবই ছিলো ওপরকার ঘটনা। গ্রামাঞ্চলে কৃষির উন্নতির বিষয়টা কিন্তু ইংরেজকর্তৃপক্ষ প্রধানত ভূস্বামী গোষ্ঠীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলো। যে ফিজিওক্র্যাটিক অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে তারা এটা করেছিলো, সেটা একেবারেই নিরর্থক এমন মনে করবার কোনো কারণ বোধ হয় নেই। তাছাড়া আঠারো শতকে স্থানীয় মালিক ও জমিদাররা এতই প্রভাবশালী ছিলো যে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ছাড়া ইংরেজদের আর কোনো উপায়ও ছিলো না। তবে ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা যখন চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে তখন তারা এমন একটি ভূস্বামী শ্রেণীর ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলো যারা বাংলাদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদী উত্তরণের সম্ভাবনাকে অকেজো করে রাখবে, আবার

সামন্তীকরণের মধ্যেই জমিদারীর উন্নতিসাধনে অনুপ্রাণিত হবে এবং কৃষিসংকটের সমাধান করবে। কিন্তু সূর্যাস্ত আইনের ধাক্কায় বনেদী ভূস্বামীগোষ্ঠীর পতনের পর যে নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিলো, কৃষিসংকটের সমাধানের দিকে তাদের কোনো দৃষ্টি ছিলো না। রাজবংশে'র পতনের পর নতুন উঠে আসা ভূস্বামীরা কৃষির উন্নয়নে মূলধন বিনিয়োগ করেছিলো, এমন খবর পাওয়া যায় না। পূর্বেকার রাজারা যে এ ব্যাপারে কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলো সে খবর পাওয়া গেছে। জমিদারী বা জোত ঘন ঘন নীলামে ওঠার দরুণ ক্ষুদ্রজোতের অধিকারীরা নিরাপত্তাবোধ হারিয়ে ফেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো। অন্যদিকে যারা রাজার কাছ থেকে পাওয়া নিষ্কর জমি ভোগ করতো তারাও বিবাদে নামতে বাধ্য হয় এবং মানসিক উত্তেজনার শিকার হয়ে উৎপাদনের ব্যাপারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যে সেই উৎপাদনব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে, এই বোধ কারো মনেই তখন জাগেনি। রায়তওয়ারি এলাকায় রায়তী পালাবদলের পরিণতিও প্রায় একইরকম।

শুধুই প্রাকৃতিক ?

ইংরেজ বা ভূস্বামী— যার অপদার্থতার ফলেই হোক না কেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষি-অর্থনীতিতে পচন ধরেছিলো, এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বাকী থেকে যায় তা হলো, ইংরেজ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার সম্পর্কে এতদিনকার যে সমালোচনা, কৃষি-উৎপাদনের অবনতির ইতিহাসে তার স্থান কোথায়? প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি ভূমিকাঠামোর শোষণমূলক দিকটি অবশ্যই ছিলো এবং সেটা প্রতিফলিত হয়েছিলো রায়তী স্বত্বের নড়বড়ে প্রকৃতিতে।

জমির ওপর স্বত্বাধিকার সম্পর্কে তীব্র অনিশ্চয়তা রায়তদের কৃষি-উৎপাদনের উন্নতি-সম্পর্কে হতোদ্যম করে তুলেছিলো। মোট জমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ছিলো মুকারারি রায়তদের কাছে, একমাত্র রায়তশ্রেণী, যাদের স্থায়ী দখলী স্বত্বাধিকার ছিলো। দুই-পঞ্চমাংশ ছিলো অন্য এক শ্রেণীর দখলী প্রজাদের হাতে যারা একদিকে জমির ক্রমবর্ধমান অনুর্বরতা আর অন্যদিক ভূস্বামীর অন্যায় দাবি এই দুইয়ের চাপের মধ্যে পড়ে হতাশ হয়ে উৎপাদনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলো। বাকী দুই-পঞ্চমাংশের অর্ধেক ছিলো জমিদারদের খাস মালিকানায়, সে জমি কখনোই ঠিকমতো চাষ করা হতো না। আর অর্ধেক ছিলো উত্বন্দী রায়তদের হাতে। এই উত্বন্দী জোতে চক্রাকারে জমি পতিত রাখবার নিয়ম ছিলো এবং জমি চাষ করা না হলে রায়তের কোনো দখলী স্বত্ব থাকতো না। এই অবস্থায় উৎপাদন-পরিবেশ বজায় রাখার সামাজিক প্রয়াস যে থাকবে না তা সহজেই অনুমেয়। উপনিবেশিক ভূমি-ব্যবস্থায় এটাই ঘটেছিল এবং উৎপাদন ও বাস্তু-পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটেছিল।

৫.৪.১.১০ ঃ ভারতের বনাঞ্চল ঃ ঔপনিবেশিক চাপ

কৃষি-অর্থনীতি ও বাস্তু-পরিবেশে সবচাইতে বড় ধাক্কা দিয়েছিল ইংরেজদের জঙ্গলনীতি। এককথায়, ঔপনিবেশিক সরকারের অরণ্যনীতি আসলে ছিল ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধবংস করার কৌশল। ইংরেজরা আসার আগে ভারতের আরণ্যক মানুষ আর সাধারণ কৃষক খাদ্য, জ্বালানি আর গোচারণের জন্য অরণ্যভূমি ব্যবহার করত। কিন্তু সেটা ছিল ব্যবহার, তাতে অরণ্যধবংসের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভিল্-দের সম্পর্কে যেমন হার্ডিম্যান লিখেছেন, (they) had a strong affinity with these woods and hills — their home as will as place of refuge — and any destruction which they carried out was on so small a scale as to make very little difference to the environment as a whole (David Hardiman, 'Power in the Forest, the Dangs 1820-1940' in David Arnold and David Hardiman eds. Subalterm Studies, vol. VIII, Delhi 1996) কিন্তু শাল-দেওদারের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা ভেবে ইংরেজরা যখন ভারতের জঙ্গলের দখল নিয়েছিল, তখন আর অরণ্যের ক্ষতি কোন স্বল্প-সীমায় আবদ্ধ ছিল না।

বাংলাদেশের জঙ্গলমহলের বন্দোবস্ত ইংরেজরা করতে শুরু করেছিল ১৭৬৭ সাল নাগাদ। খরা বা বন্যায় জমিদারি বন্দোবস্তের কৃষিজমিতে যে রাজস্ব-মকুব করতে হয়, তার কিছুটা জঙ্গলমহল থেকে পুষিয়ে নেওয়ার হিসেব ইংরেজের ছিল। সেই সঙ্গে বনাঞ্চলের বাণিজ্যিক ব্যবহারের কথাও তারা ভেবেছিল। মেদিনীপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, আখ, তুলো ও তুঁত চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা যেতে পারে। আবার ১৭৮২-তে ক্লিভল্যাণ্ডের সঙ্গে রাজমহল পাহাড় ঘুরে এসে উইলিয়ম হজ লিখেছিলেন, বাণিজ্যিক কৃষির চাইতে উঁচুমানের কাঠের জন্য জঙ্গলগুলোকে ব্যবহার করা অনেক বেশি লাভজনক। ইংরেজদের বনসৃজন ও বনরক্ষা প্রকল্প তাই আসলে ছিল মুনাফার লক্ষ্যে কাঠ সংগ্রহের পরিকল্পনা। রামচন্দ্র গুহ লিখছেন, 'At a deeper epistemic level, the language of scientific forestry was purposely used to justify the shift toward commercial working (R. Guha : The Unquiet Woods, Delhi 1991)

যে কারণেই হোক, জঙ্গল দখল করা ইংরেজের পক্ষে খুব জরুরি ছিল। এর জন্য দরকার ছিল জঙ্গল থেকে ভারতীয় কৃষক ও আরণ্যক সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে দেওয়া। এই কাজটা জঙ্গল সংরক্ষণের অছিলায় ইংরেজরা শুরু করেছিল ১৮৬৪ তে। ঐ বছর প্রথম 'কনজার্ভেটর অব্-ফরেস্ট' নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। পরের বছর প্রথম 'জঙ্গল আইন' পাস করা হয় আর ১৮৭৪ সালে শুরু হয় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ঘোষণা, ১৮৭৩-এ ঘোষিত হয় 'Wildlife Preservation Act' এবং ১৮৭৯ তে পাস হয় 'Elephant Preservation Act'. ১৮৮৪ সালের মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গেজেট প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে, ইংরেজ সরকার এইসব

আইনকানুন দিয়ে এদেশের জঙ্গল বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় 'আরণ্যক' ও 'কৃষকদের' পরম্পরাগত অধিকার থেকে জঙ্গলগুলো কেড়ে নেওয়া। গ্রামীণ সমাজ ও দেশজ রাষ্ট্রশক্তির ওপর আধিপত্য কায়েম করাও ছিল একটি অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য। অজয় স্কারিয়া-র কথায়, "(essential forms of state making were) increase in information about forest tribes, demilitarization of forest chiefs, sedentarisation of forest tribes and demarcation of reserved forests." (উদ্ধৃতিসূত্র K. Sivaramakrishnan, 'British Imperium and Forested zones of Anomaly in Bengal, 1767-1833, in Indian Economic and Social History Review, Vol. 33, No. 3, 1996)

কিন্তু দু'দিক দিয়ে এর ধ্বংসাত্মক ফল দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, ভারতীয় আরণ্যকগোষ্ঠী ও কৃষকরা 'মানা-তত্ত্বে'র প্রভাবে যে দেশজ পদ্ধতিতে জঙ্গল বাঁচানোর কাজ করত, সে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ ইংরেজরাও আইনগুলো প্রকৃত অর্থে জঙ্গল রক্ষার জন্য করেনি, জঙ্গল বাড়লে গাছ কেটে বাণিজ্যিক মুনাফা লাভই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাছাড়া ১৮৫০ এর দশকে শুরু হয়েছিল জঙ্গল পরিষ্কার করে চা-বাগান বসানোর নীতি। সুতরাং নিট ফল ছিল অরণ্যসম্পদের সংকোচন। অন্যদিকে এতদিনের অধিকার বিদেশির হাতে হারিয়ে আরণ্যক সম্প্রদায়ও মারমুখী হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিবাদের একটা ধরন ছিল জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া। সব চাইতে বড় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২১ সালে। ঐ এক বছরেই কুমায়ুন ডিভিশনে জঙ্গল পোড়ানো হয়েছিল ১১,৩,৪০০ হেক্টর। ১৮৭২ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের রিপোর্টেও এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে। গ্রামসমাজের জনৈক মুখিয়া জঙ্গল পোড়ানোর কাজকে সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, ইংরেজরা তাদের পূর্বপুরষের পালন করা বনাঞ্চল যেহেতু তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, তাই ইংরেজদের সেটা ভোগ করতে দেওয়া যাবে না। (A.S. Rawat, 'Deforestation and forest policy in the lesser Himalayan Kumaun' in Mountain Research and Development, Vol. 15, No. 4, 1995).

ফলাফল ঃ

বাস্তু-পরিবেশ, গ্রাম-সমাজ ও বনাঞ্চলের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের এই অভিঘাতের প্রধান ফল ছিল দেশীয় অর্থনীতির অবক্ষয়, কৃষি-উৎপাদন হ্রাস, জমির গুণগত মানের ক্রমাবনতি, উৎপাদকগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা, গবাদিপশুর জীবনসংকট এবং সামগ্রিক কৃষিসংকট। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষি-অর্থনীতিতে পচন ধরেছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভূমিকাঠামোর শোষণমূলক দিকটিও অবশ্যই ছিল, এবং সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল রায়তী স্বত্বের নড়বড়ে প্রকৃতিতে। শেষবিচারে বলা যায়, প্রাকৃতিক অবক্ষয় ভূমিকাঠামোরই একটি বড় দিক, এবং উভয়ের ক্ষতিকর প্রভাব ছিল পরস্পরাভিমুখী।

৫.৪.১.১১ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Chittabrata Palit & Amit Bhattacharyya (eds) : Science Technology, Medicine and Environment in India, Historical Perspectives, Calcutta 1998.
2. Ranjan Chakraborti (ed.) : Situating Environmental History. New Delhi, 2007.
3. Ramachandra Guha : Environmentalism – A Global History, New Delhi 2000.
4. Richard Grove : Green Imperialism, Delhi 1995.
5. Tapan Kumar Chattopadhyay : India and the Ecology Question, Calcutta 1999.
6. Ramachandra Guha : The Unquiet Woods, Delhi 1991.

৫.৪.১.১২ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইকলজির সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক কি? এই বিষয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২। ঔপনিবেশিক চাপে ভারতে কৃষি-উৎপাদনে মন্দা এসেছিল কি? এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। ঔপনিবেশিক আমলে নদী সংকটের কারণ কি ছিল? এর পরিণতি কি হয়েছিল?

৪। ভারতীয় উৎপাদক গোষ্ঠীর ওপর ঔপনিবেশিক বাস্তু-সংকটের কী ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল?

৫। ভারতে ইংরেজদের জঙ্গলনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তার পরিণতি কী হয়েছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

TRADITIONAL HANDICRAFT INDUSTRY AND THE QUESTION OF DE-INDUSTRIALIZATION

একক - ২

হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী - পটভূমিকা
(Artisans and handicraft product-background)

বিন্যাসক্রম

৫.৪.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৫.৪.২.১ ঃ হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী-পটভূমিকা (Artisans and handicraft product - background)

৫.৪.২.২ ঃ শিল্প পুঁজিবাদ (Industrial Capitalism) ও ব্রিটিশ বস্ত্র ও সুতোর আমদানি [Industrial Capitalism and import of English cloth and yarn]

৫.৪.২.৩ ঃ অবশিল্পায়ন - আঞ্চলিক তারতম্য; অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত বিতর্ক (Debate over de-industrialization-regional variations)

৫.৪.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে হস্তশিল্পসামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী।

(২) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্প পুঁজিবাদ এবং ব্রিটিশ বস্ত্র ও সুতোর আমদানি।

(৩) অবশিল্পায়ন, আঞ্চলিক তারতম্য এবং অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিতর্কের নানা দিক।

৫.৪.২.১ ঃ হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারিগর শ্রেণী-পটভূমিকা (Artisans and handicraft product background)

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি উৎপাদন। এর পাশাপাশি শিল্প উৎপাদনেও ভারত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠেছিল। শিল্প পণ্যের জন্য চাহিদা, কাঁচামাল, কারিগর, শ্রমিক ও পুঁজির অভাব ছিল না। ফলে এই সময়ে বহু দক্ষ কারিগরের আবির্ভাব ঘটে, যারা হস্তশিল্পে আত্মনিয়োগ করে জীবিকা অর্জন করতে পারতেন। কারিগরী দক্ষতা ও কৃৎকৌশলের সমন্বয়ে হস্তশিল্পীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি বিলাস পণ্য ও উৎপাদন করতেন। বস্তুতঃ মোগলযুগে এই দুই ধরনের শিল্প সামগ্রীরই বিশাল চাহিদা ছিল। এই যুগে নগরায়ণে যে গতি আসে তার ফল হিসাবে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি শহরে অভিজাত, সৈনিক, বণিক, ও মধ্যশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিল্প পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে শহরকেন্দ্রিক শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে নগদ বেতনের বিনিময়ে শিল্প-শ্রমিক নিয়োগের রীতি প্রবর্তিত হয়। দিল্লী, আগ্রা, সুরাট, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি ছিল শিল্পপণ্য উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। পাটনা, বেনারস, আজমীর প্রভৃতি শহরেও শিল্প উৎপাদন হতো। শহরের শিল্প গুলিতে উৎপাদিত হতো, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, গালিচা, লৌহ ও কাঠ নির্মিত দ্রব্য, চর্মজাত দ্রব্য, মৃৎপাত্র, শৌখিন দ্রব্যাদি প্রভৃতি। আভ্যন্তরীণ চাহিদার পাশাপাশি বৈদেশিক চাহিদাও মেটাত এইসব উৎপাদন কেন্দ্রগুলি।

বিভিন্ন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম, বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের জন্য রাজকীয় উদ্যোগেও শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র বা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে সরকারি উদ্যোগে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারখানাকে কেন্দ্র করেও বেশ কিছু শহর গড়ে ওঠে। তবে আবুল ফজল লিখেছেন, রাজ প্রাসাদের যে বিপুল চাহিদা ছিল, সরকারি কারখানাগুলি তার একটি ছোট অংশই পূরণ করতে পারত, বেশির ভাগই সংগ্রহ করা হতো বেসরকারি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে হস্তশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্র বয়ন শিল্প। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা থাকায়, গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র উৎপাদিত হতো। কার্পাস, সিল্ক, পশম বস্ত্র বয়নে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা ছিল, যা সমকালীন দেশি ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। বস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল বাংলা, গুজরাট, করমণ্ডল, পাটনা, বেনারস প্রভৃতি। সুতো তৈরি ও তাঁত বোনা - দুধরনের কাজেই হস্তশিল্পীরা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কাশিমবাজার, বালেশ্বর, ব্রোচ ইত্যাদি জায়গায় উন্নতমানের সুতো উৎপাদিত হতো, যা বিদেশেও রপ্তানি হতো। বস্ত্র বয়ন শিল্পে বাংলার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সমকালীন বিদেশী পর্যটকরা বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি, স্থলপথে খোরাসান, পারস্য প্রভৃতি দেশে এবং জলপথে পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলিতে বাংলার মসলিন রপ্তানি হত।পাটনা ও সুতীবস্ত্র উৎপাদনের অন্যতম ব্যস্ত কেন্দ্র ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে, আকবর রেশম ও রেশম বস্ত্রের উৎপাদনে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর আমলে, গুজরাট উন্নত সুতী ও রেশম বস্ত্রের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। গুজরাটের তাঁত ও রেশমবস্ত্র পারস্য, তুরস্ক, আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো। বস্ত্র ও পোশাক ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিস, যেমন চাদর, কার্পেট, কম্বল, পর্দা ইত্যাদি তাঁত শিল্পীরা তৈরী করতেন। ভারতের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় ১৫০ ধরনের তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত হত বলে মোরল্যাণ্ড উল্লেখ করছেন, যার মধ্যে মসলিন ও ক্যালিকো বস্ত্রই বেশি রপ্তানি হতো।

মুঘল যুগে বহু হস্তশিল্পী ও কারিগর পরিবহণ শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন, যারা গো-শকট, নৌকা, জাহাজ নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন ধরনের ধাতুশিল্পী, স্বর্ণকার, সূচিশিল্পী, চিত্রকর, কাচ শিল্পী, কাগজ শিল্পী প্রমুখ হস্তশিল্পীগণ। শহরগুলিতে বিভিন্ন কারিগর ও শিল্পীদের বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল। শহরগুলিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের যে সৌধগুলি নির্মিত হয়, তাতেও বহু শিল্পী ও কারিগর নিযুক্ত হতেন।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের সংখ্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির অভাব রয়েছে। সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কারিগর ও শিল্পীরা ছিলেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বণিক বারাণসী দাস জানিয়েছেন যে ভারতে কারিগর ও শিল্পীদের ছত্রিশটি জাতি ছিল, অন্যদিকে পণ্ডিত আবদুর রহিমের মতে ছেষট্টি জাতি ছিল। আবার পর্যটক পেলসার্ট-র মতে সংখ্যাটি ছিল একশ। যাইহোক প্রাথমিক পর্বে ভারতের কৃষিজীবী মানুষ কৃষি ও শিল্প-উভয় পেশাতেই থাকতেন।

গ্রামীণ কারিগররা 'যজমানি পদ্ধতি'-র মাধ্যমে গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতেন।

ডঃ জে. এন. সরকারের মতে মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে যজমানি প্রথার সর্বাধিক প্রচলন থাকলেও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্রই এই প্রথা উপস্থিত ছিল। বাজারের প্রসার ও চাহিদা বৃদ্ধি ঘটলে 'দাদনি প্রথা'-র বিকাশ ঘটে। এই ব্যবস্থায় বণিক ও মহাজনরা শিল্পী ও কারিগরদের উৎপাদনের জন্য অগ্রিম অর্থ বা দাদন দিতেন। এতে কারিগরদের কাঁচামাল কেনার বা অন্যান্য ব্যয় করার সুবিধা হত ঠিকই, কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের উপর দাদন প্রদানকারী বণিক বা মহাজনের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হতো। দাদনি ব্যবস্থায় শিল্পী, কারিগরদের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, উৎপন্ন পণ্য নির্দিষ্ট দামে দাদন প্রদানকারীকে, তাদের যোগান দিতে হত।

ভারতীয় হস্তশিল্পে ছিল ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন ব্যবস্থা। কারিগরদের পরিবারের সব সদস্যই উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হতেন। কারিগররা সামান্য মূলধন ও দাদনি নিয়ে, পারিবারিক শ্রমের দ্বারা পণ্য উৎপাদন করে বণিক ও মহাজনদের সরবরাহ করতেন। এই ব্যবস্থায় কারিগররা উৎপাদনের উপকরণের মালিক ছিলেন। তবে রাজকীয় কারখানায় ভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল। এখানে বহু কারিগর এক জায়গায় সমবেত হয়ে সরকারের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে উৎপাদনের কাজ করতেন ও বিনিময়ে মজুরি পেতেন। ধনী বণিক ও অভিজাতরাও এই উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

ভারতীয় হস্তশিল্পী ও কারিগররা নিম্নমানের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করতেন। প্রাক্-আধুনিক চীন ও ইউরোপ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল। নূতন প্রযুক্তি প্রবর্তনের মতো মূলধন কারিগরদের হাতে ছিল না। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে অনেকে কর্মচ্যুত হতে পারেন, এই আশঙ্কাও হয়ত ছিল। তবে সাধারণ মানের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যেই ভারতীয় কারিগররা উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে পারতেন। সাধারণ মানের তাঁত, তকলি ইত্যাদির মাধ্যমেই ভারতে উন্নতমানের মসলিন প্রস্তুত সম্ভব হয়েছিল। যাইহোক শিল্পীদের কারিগরী দক্ষতা থাকলেও প্রযুক্তিবিদ্যার ঘাটতি নিঃসন্দেহে উন্নততর উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

৫.৪.২.২ ঃ **শিল্প পুঁজিবাদ** (Industrial Capitalism) **ও ব্রিটিশ বস্ত্র ও সুতোর আমদানি** [Industrial Capitalism and import of English cloth and yarn]

উপরের আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতের বিভিন্ন হস্ত শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সুতিবস্ত্র শিল্প। তুলো উৎপাদনকারী কৃষক থেকে শুরু করে সুতোকাটুনি, তাঁতি, সূচশিল্পী প্রভৃতিরা এই শিল্পের উপর নির্ভর করতেন। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে ব্যবসার প্রসার

ঘটেছিল। ভারতে আগত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি ভারত থেকে যে শিল্প পণ্যগুলি রপ্তানি করত, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সুতীবস্ত্র। ইংলণ্ডে ভারতীয় সুতী সামগ্রী এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প মালিকরা, আমদানিকৃত সুতিবস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসানোর জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। উচ্চহারে আমদানি শুল্ক স্থাপন করেও ভারতীয় বস্ত্রের ব্রিটিশ বাজার বন্ধ করা যায়নি। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরো অষ্টাদশ শতক জুড়ে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি অব্যাহত রেখেছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, বেনিয়া পুঁজি বা সওদাগরি পুঁজির প্রাধান্য ছিল। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সওদাগরি পুঁজির লাভ ও বৃদ্ধির রাস্তা হল সস্তায় কেনা ও বেশী দামে বেচা এবং একচেটিয়া ক্রেতা কম দামে কিনতে ও বেশী দামে বিক্রী করতে পারে। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কোম্পানি জন্মলগ্ন থেকেই ভারতসহ সমগ্র প্রাচ্যে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ভারতে অন্য কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় বণিক যাতে তাদের সাথে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না পারে তার জন্য কোম্পানি সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখত ও এরজন্য বিভিন্ন যুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোম্পানি ভারতে তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করতে থাকে ও শেষপর্যন্ত ভারতীয় শিল্প পণ্যের বাজারে বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ভারতীয় তাঁতি ও অন্যান্য কারিগররা নামমাত্র মূল্যে তাদের অন্য কোম্পানিকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বেনিয়া পুঁজি বা সওদাগরির পুঁজির গুরুত্ব কমতে থাকে — ক্রমশ তার স্থান অধিকার করতে এগিয়ে আসে শিল্প পুঁজি। ফলে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে। এর প্রতিফলন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তনের মধ্যে।

বস্তুতঃ এই সময় ছিল ইংলণ্ডে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের উন্মেষ পর্ব — ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছে ও শিল্পপতি শ্রেণী সেখানে উদীয়মান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্প পুঁজির বিকাশের স্বার্থে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতকে আর শুধু ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী ছিল না। শিল্প পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি তাদের কাম্য ছিল। ব্রিটেনে শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য, যাতে ভারত থেকে পাওয়া যায় এবং ভারতকেই আবার ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজার হিসাবে ব্যবহার করা যায় — তার জন্য ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রদ করা যায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে, পুরনো বণিক সম্প্রদায় না নবোদিত পুঁজিপতি সম্প্রদায় — কাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা যায়।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তার বক্তব্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারকে ব্রিটিশ পুঁজির পক্ষে ক্ষতিকারক বলে বর্ণনা করেন। ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণী অ্যাডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্য (Free trade) নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তারা ভারতে অবাধে বাণিজ্য করার দাবি জানাতে থাকে।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে অগ্রগামী ক্ষেত্র বা 'leading sector' ছিল সুতীবস্ত্র শিল্প। ইংরেজরা তাদের উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচা তুলো আমদানি করতে পারত। আর মিলগুলিতে সুতীবস্ত্র বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ায় এটি অনেক সস্তা ছিল। ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের মিলগুলি প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র ও সুতো উৎপাদন করতে থাকে। এই উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্য এখানকার মিল মালিকরা সংঘবদ্ধভাবে পার্লামেন্টের কাছে ভারতীয় বাজার উন্মুক্ত করে দিতে আবেদন জানান, কারণ ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পার্লামেন্টের সনদ দ্বারা স্বীকৃত থাকায়, তাদের পক্ষে সরাসরি ভারতে মাল বিক্রি সম্ভব ছিল না। ক্রমে পার্লামেন্টও এই শিল্পপতিদের দাবী ন্যায্য বলে মনে করতে থাকে। ঔপনিবেশিক মতাদর্শে সওদাগরি পুঁজি বা বেনিয়া স্বার্থসিদ্ধির বদলে শিল্প পুঁজির প্রসার তথা শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা কোম্পানি মারফৎ ভারতে ৩০০০ টন পণ্য পাঠাবার অধিকার পায়। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে চা ছাড়া ভারতে অন্যান্য ব্যবসার উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয়। শুধুমাত্র চিনের সাথে বাণিজ্যে তার একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকে। ১৮১৩ সালে ভারতের দরজা অবাধ বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হলে, ইংলণ্ডের শিল্পপণ্যে বিশেষ করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলে তৈরি সুতিবস্ত্রে ভারতের বাজার পূর্ণ হয়ে যায়। এই পণ্য বিনাশুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ভারতে প্রবেশ করে ও ছোট শহর, এমনকি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৭৯৫ সালে ইংলণ্ড থেকে ভারতে মাত্র ১৫৬ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় রপ্তানি হয়। ১৮১৩ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১০,০০০ পাউণ্ডে। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে ভারতে চা ব্যবসা ও চিনা বাণিজ্যের ওপর থেকেও কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয়। ফলে ১৮৩৩ সালের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক অস্তিত্বের অবসান ঘটে। এতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র শিল্পের মালিকরা। কারণ এতদিন পর্যন্ত কোম্পানি তাদের বস্ত্র ব্যবসা বাঁচানোর জন্য ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করতে, কিছুটা হলেও চেষ্টা করত। কোম্পানির বাণিজ্যের অধিকার লোপ পেলে এই চেষ্টাও কোম্পানি ত্যাগ করে। ব্রিটিশ সুতীবস্ত্র বিপুল ভাবে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে। ১৮১৩ সালে ভারতে ইংলণ্ডের সুতীবস্ত্র আমদানি হয় ১১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের। ১৮৫৩ সালে তা দাঁড়ায় ৬৩,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের।

সুতরাং দেখা যায়, ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য, ভারতীয় পণ্যসামগ্রী দখলের বদলে ভারতীয় বাজার দখলে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তিত উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ। কোম্পানি ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে, ভারতীয় পণ্যাদির, বিশেষ করে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের ব্যবসা করত। ভারতীয় সুতিবস্ত্র যাতে আভ্যন্তরীণ বাজার না হারায় তার জন্য কোম্পানি তার একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের অস্ত্র ব্যবহার করে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্রকে ভারতের বাজারে ঢুকতে দিতে অসম্মত হয়। কিন্তু শিল্প পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক স্বার্থ, কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থকে বিসর্জন দেয় ও অবাধ বাণিজ্যের অজুহাত দেখিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক অস্তিত্বই লোপ করে। ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পপতিরা, ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের বাজার লোপ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনকারীদের তাদের দেশীয় বাজারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে, ঔপনিবেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে। ইংলণ্ড থেকে ভারতে সুতিবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পেল ১৮১৫ সালের ০.৪০ মিলিয়ন গজ থেকে ১৮৩০-এ ৪৫ মিলিয়ন গজে। ১৮৩৫ ও ১৮৩৯ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১.৭৮ মিলিয়ন গজ ও ১০০.৫ মিলিয়ন গজ। বিলাতী বস্ত্রের পাশাপাশি বিলাতী সুতোও এই সময়ে ব্যাপক ভাবে ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলে। সুতি টুইস্ট, ১৮১৪ সালে এসেছিল মাত্র ৮ পাউণ্ড। ১৮২৮-এ এটি বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৫৬ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ১৮৩৯-এ ১০.৮১ মিলিয়ন পাউণ্ড। অর্থের হিসাবে দেখলে, ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র এসেছিল তার মূল্য ছিল ১৮৩৯ সালে ২.২৯ মিলিয়ন পাউণ্ড, সুতি টুইস্টের মূল্য ছিল ০.৬৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৮৫৫ সালে এই দুটি পণ্যের মোট মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ১.২৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। অধ্যাপক ইরফান হাবিব একটি পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদকগণ ১৮৩৯ সাল নাগাদ ভারতের বার্ষিক ব্যবহৃত কাপড়ের খুব বেশী হলে ৯.৪% সরবরাহ করে। ১৮৬০ সাল নাগাদ এই সরবরাহের পরিমাণ তিনগুণ বেড়ে ২৭%-র বেশী হয়েছিল বলে মনে হয়। ভারতীয় হস্তশিল্পের উপর ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের এই বিপুল আমদানি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়টিই এখন আমরা আলোচনা করব।

৫.৪.২.৩ ঃ **অবশিল্পায়ন - আঞ্চলিক তারতম্য ; অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত বিতর্ক** (Debate over de-industrialization-regional variations)

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম কুফল ছিল ভারতের চিরাচরিত হস্তশিল্পের অবক্ষয়, যা সাধারণ ভাবে অবশিল্পায়ন (De-industrialization) নামে পরিচিত। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য অবশিল্পায়নের

সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, অবশিল্পায়ন হল শিল্পের অধোগতি বা শিল্পায়নের বিপরীত। যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে কৃষিকর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন শুরু করে অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে ও শিল্পজ অংশ কমতে থাকে, তাকে অবশিল্পায়ন বলা চলে। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদগণ অবশিল্পায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, মদন মোহন মালব্য প্রমুখ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বিলাতী পণ্য বর্জন করে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার, কিংবা গ্রামীণ ও হস্তশিল্পের সম্বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ — এ সবের পেছনে এই অবশিল্পায়নের ধারণা কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক, আঞ্চলিক তারতম্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে, এমন অনেক অর্থনীতিবিদ রয়েছেন, যারা অবশিল্পায়নের ব্যাপারটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। এদের মধ্যে একদল বলেন যে, অবশিল্পায়ন ব্যাপারটি ঘটেইনি। অন্যদল বলেন যে, ভারত কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায়, অবশিল্পায়ন হলেও তার ক্ষতি তেমন হয়নি।

ঔপনিবেশিক আমলে জাতীয়তাবাদীগণ, বিদেশীদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, মুঘল আমলের বিভিন্ন রচনা, ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিবেদন, তদন্ত রিপোর্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, শিল্পে ভারত যথেষ্ট উন্নত ছিল কিন্তু এরপর থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সময়ে সম্পদের বহির্গমন ও ঊনবিংশ শতকে শিল্পোন্নত ব্রিটেনের স্বার্থে ভারতকে ব্যবহার করার ফলে ভারতীয় শিল্প ও সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় অর্থনীতি অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত, মদনমোহন মালব্য প্রমুখরা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতীয় শিল্পপণ্যাদির রপ্তানি কমেছে ও অন্যদিকে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানি বেড়েছে। এদের মতে, রপ্তানি কমা মানে ভারতীয় শিল্প তার বৈদেশিক বাজার হারাচ্ছিল এবং আমদানি বাড়ার অর্থ ছিল দেশীয় বাজার থেকেও ভারতীয় শিল্প পিছু হটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের পতন ঘটে। ভারত ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয় ও শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে ইংলণ্ডের শিল্পগুলির কাঁচামাল সরবরাহকারীতে পরিণত হয়।

এই সময়ে শিল্পসংরক্ষণ নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করা যেত। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সরকার নিজেই তাদের বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডে আগত ভারতীয় বস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে। ব্রিটিশ মিলগুলির সস্তা পণ্যসামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় হস্তশিল্পজাত ভারতীয় পণ্য যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন শুল্ক প্রাচীর দিয়ে ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ না করে এবং ব্রিটিশ

পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশের অনুমতি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। প্রথম বড় ধরনের আঘাত আসে মসলিন ও সুতিবস্ত্রের উপর। ১৮১৪-১৫ সাল নাগাদ বাংলার মসলিনের উপর অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা ও শান্তিপুরে কোম্পানির নিজস্ব বিনিয়োগও বন্ধ হয়। ১৮১০-৩০ সময়কালে উৎপাদিত পণ্যের উপর শুল্কও বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩ সালের সনদ আইন অনুসারে ভারতে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্যের উপর ২$\frac{১}{২}$% হারে শুল্ক ধার্য করা হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে আভ্যন্তরীণ শুল্ক কমানো হয়নি। একই সময়ে ভারতীয় বস্ত্রের উপর ব্রিটেনে উচ্চহারে শুল্ক ধার্য হত। ব্রিটেনে ১৮২৪ সালে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের উপর ৬৭$\frac{১}{২}$% শতাংশ ও মসলিনের উপর ৩৭$\frac{১}{২}$% শুল্ক ধার্য হয়। রেশম শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বৈষম্য দেখা যায়। কলকাতায় ব্রিটিশ রেশমবস্ত্রের উপর সেখানে ৩$\frac{১}{২}$% শুল্ক দিতে হতো, ব্রিটেনে ভারতীয় রেশমবস্ত্রের উপর ২০% শুল্ক দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প পণ্য দেশে-বিদেশে তার বাজার হারায় ও শিল্পের সাথে যুক্ত সব শ্রেণীর মানুষই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবশিল্পায়নের এই ধারণার বিরুদ্ধমতগুলি মোটামুটি তিন ধরনের। প্রথমঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হয়তো অবশিল্পায়ন ঘটেছিল। কিন্তু তারপর ভারতে কলকারখানা গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অবশিল্পায়ন আর ছিল না। দ্বিতীয় ঃ অবশিল্পায়ন ব্যাপারটিই ভারতে হয়নি। তৃতীয়ঃ অবশিল্পায়ন হলেও আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ, কৃষি প্রধান ভারত ও শিল্প প্রধান ইংলণ্ডের মধ্যে হওয়ায়, উভয়ের পক্ষেই তা লাভজনক হয়েছিল।

প্রথম মতের প্রবক্তা, ডানিয়েল থর্ণার ১৮৮১, ১৯০১ ও ১৯৩১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ১৮৮১ সালের পর থেকে অবশিল্পায়ন খুব সামান্যই ঘটেছিল। তবে তাঁর পদ্ধতিতে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাছাড়া অবশিল্পায়ন ঘটেছিল মূলতঃ ১৮০০-১৮৬৫ সময়কালে, আর থর্ণারের বক্তব্য ১৮৮০-র পরবর্তীকালের।

দ্বিতীয় মতের অন্যতম প্রবক্তা মরিস ডেভিড মরিস। তাঁর মতে, অবশিল্পায়ন আদৌ ঘটেনি, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নয়। অবশিল্পায়নের পুরো ব্যাপারটিই হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা বহুল প্রচারিত একটি নিছক ‘অলীক কল্পনা’ বা ‘Myth’। মরিসের প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি। প্রথমতঃ শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন - জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই ভেবে ভুল করেছেন। যদি জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহলে বাজারের প্রসারণের কারণে আমদানি বাড়লেও দেশীয় শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা কম হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ শিল্পদ্রব্য আমদানি করা হলে, কোন একটি বিশেষ দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অন্য শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। যেমন, লোহার বাঁট আমদানির ফলে এদেশে বাঁট তৈরির শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, প্রচুর পরিমাণে

সস্তা লোহার বাঁট আসায় দেশীয় কামারদের সুবিধা হতে পারে। অথবা ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সুতো আমদানিতে দেশীয় সুতো প্রস্তুতকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, সস্তা সুতো পেয়ে তাঁতীরা সস্তায় কাপড় বানাতে পারে ও আমদানিকৃত ব্রিটিশ বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

তৃতীয়তঃ ব্রিটিশ মিলের কাপড় ভারতীয় বাজারে এলেও বিশেষ কিছু ধরনের দেশীয় বস্ত্র শিল্পের ক্ষতি হয়নি। যেমন, দামী কাপড়, যা মিলে প্রস্তুত হয় না, বা পুজোর কাজে ব্যবহৃত বস্ত্র, বা মোটা কাপড় — এই সব বস্ত্র শিল্পগুলিকে ব্রিটিশ বস্ত্রের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ডঃ সুমিত সরকার প্রমুখরা মরিসের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন। প্রথমতঃ জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাজারের প্রসারণের যুক্তির সপক্ষে মরিস কোন প্রমাণ দেননি। দ্বিতীয়তঃ আমদানি করা সুতার স্বল্পমূল্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ শিল্পজাত বস্ত্রের সাথে, ভারতীয় তাঁতীরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। কারণ তাদের কাপড়ের মোট উৎপাদন ব্যয় বেশী ছিল। জাপানি গবেষক তোরু মাৎসুই দেখিয়েছেন যে, যে পরিমাণ সুতা ভারতে আমদানি হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশী বস্ত্র ভারতে এসেছিল। ইংলণ্ডে তৈরি কাপড় এ দেশের বাজার দখল করার অনেক পরে ভারতে বিলাতী সুতোর আমদানি শুরু হয়। ততদিনে বস্ত্র শিল্পে অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সস্তায় বিলাতী সুতো কিনে ভারতীয় তাঁতিরা সস্তা দামে বস্ত্র তৈরি করে, বিলাতী বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে মরিসের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। মাৎসুই-র মতে, ঊনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে যায় এবং তাদের অবস্থারও অবনতি ঘটে। অর্থনীতিবিদ ডঃ অমিয় বাগচী পরিসংখ্যান সহ দেখিয়েছেন যে, ১৮০৯-১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এই সময়কালে শিল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যার অনুপাত ১৮.৬% থেকে ৮.৫% এ নেমে আসে। একই সময়কালে মোট শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁতি ও সুতা প্রস্তুত কারকদের সংখ্যা ৬২.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৫.১% দাঁড়ায়।

তবে এটা ঠিক যে কিছু হস্তশিল্প ও হস্তশিল্পী টিকে ছিলেন। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, তারা অনুকুল অবস্থার মধ্যে ছিলেন। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এই টিকে যাবার কারণ ছিল, শিল্পীদের জাত ব্যবসার প্রতি লেগে থাকার ঝোঁক, জীবিকা অর্জনে বিকল্প পথের অভাব ও সর্বোপরি মহাজনের কাছে দেনার দায়ে জড়িত কুটির শিল্পীর পরাধীনতা।

অবশিল্পায়ন ধারণার বিরুদ্ধে তৃতীয় মতটি হল যে ভারতের হস্তশিল্পের অবনতি ঘটলেও তা ভারতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি। এখানে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা হলেন রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট থেকে শুরু করে স্যার

থিয়ডর মরিসন, কেইনস্ প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। এখানে বলা হয় যে, শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে। এই তত্ত্বকে আঞ্চলিক স্তরে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, একটি দেশের যে অঞ্চলে যে স্বাভাবিক সুযোগ আছে তাকে ব্যবহার করে, উৎপাদন করে (কৃষি বা শিল্প উৎপাদন যাই হোক না কেন) সেই অঞ্চলটি লাভবান হতে পারে। এই তত্ত্বটিকে যদি আন্তর্জাতিক স্তরে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ইংলণ্ডের মতো দেশগুলি যদি শিল্প উৎপাদনে পারদর্শী হয়, ও ভারতের মতো দেশগুলি কৃষি উৎপাদনে পারদর্শী হয়, তাহলে উভয় ধরনের দেশেরই লাভ। কারণ শিল্পোন্নত দেশগুলি কৃষি সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকে কৃষিজ দ্রব্য কিনবে ও একইভাবে শেষোক্ত দেশগুলি প্রথমোক্তদের কাছ থেকে শিল্প দ্রব্য কিনবে। এই তত্ত্বের প্রয়োগে বলা হয় যে, অবশিল্পায়ন হয়ে কৃষি সমৃদ্ধ ভারতের কোন লোকসান হয়নি। কিন্তু ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রে, শ্রম বিভাজন বা উৎপাদন বিশেষীকরণ, সেই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শুভ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু পরাধীন ও প্রভুত্বকারী দেশের মধ্যে এই শ্রমবিভাজন শুধুমাত্র শেষোক্ত-র সুবিধায় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের শ্রমবিভাজনে উপনিবেশের মানুষ কোনদিনই শিল্পায়নের সুদূর প্রসারী বিকাশমুখীন প্রভাবগুলি ভোগ করতে পারবে না। এর পাশাপাশি দেশগুলি উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনেও ব্যর্থ হবে।

সুতরাং অবশিল্পায়ন ও তার কারণে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতির ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায় না। তবে অবশিল্পায়নের জন্য বিটিশ নীতি ছাড়াও আরও কিছু কারণও ছিল। ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গ্যাডগিলের মতে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে দরবারে শৌখিন বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়। উনিশ শতকে নবোদিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিলাতী কাপড় ও বিলাস দ্রব্য বেশী ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে উঁচুদরের ও শহুরে শিল্পগুলি বাজার হারায়। বরঞ্চ গ্রামীণ শিল্পী শ্রেণী, তাদের গ্রামীণ ক্রেতাদের কল্যাণে আরও বেশী টিকে ছিল। যাইহোক, অবশিল্পায়নের জন্য কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের নীতিগুলি যে প্রধানত দায়ী তা অনস্বীকার্য। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ দেখিয়েছেন যে, কোম্পানী কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে জোর করে বাংলার তাঁতিদের স্বল্প মূল্যে কাপড় সরববাহ করতে বাধ্য করত। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে সারদা রাজু, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে রমন রাও, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আর. ভি. চোক্‌সি, বাংলা ও বিহারের ব্যাপারে হরিরঞ্জন ঘোষাল প্রমুখরা ব্রিটিশ নীতির ফলে হস্তশিল্পের দুরবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ধর্মা কুমার দেখিয়েছেন যে, অনেক জেলায় বস্ত্র উৎপাদনের একক মূল্য নিশ্চিত ভাবে দ্রুত কমে গিয়েছিল এবং সম্ভবত কমেছিল তাঁতীদের কয়েকটি শ্রেণীর আয়। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে "There is considerable quantitative data from south India, central India, and

eastern India confirming that employment declined in textiles" (The Economic History of India 1857-1947; Oxford, 2006, P-64)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, অবশ্য এই অবনতির সময় ও পরিমাণে তারতম্য ছিল। যেমন, মধ্য ভারতে (Central India) ১৮৬০-র দশকে রেলপথের বিস্তারের ফলে বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হলে অবনতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিছু সমসাময়িকের মতে, ১৮৩০ ও ৪০-র দশকে পশ্চিম ভারতে মূল্য হ্রাসের (Price depression) ফলে বস্ত্র বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বস্ত্রবয়নের যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তা হল সুতো তৈরি (Spinning)। ভারতের বহু অঞ্চলে মহিলারা একটি part-time activity হিসাবে সুতা তৈরির সাথে যুক্ত ছিলেন। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে "This activity was, more or less, destroyed by English yarn" (ibid p. 65)

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের হস্তশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবনতি যে হয়েছিল, তা স্পষ্ট, যদিও এই অবনতির প্রভাব কতটা গভীরভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পড়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে এই অবশিল্পায়ন ইংরেজ শাসনের শোষণমূলক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছিল। মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চাতেও বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। চিরাচরিত হস্তশিল্পের অবনতি শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সূচনা করেনি, বরং ভারতকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সম্পর্কে আবদ্ধ রেখেছিল।

৫.৪.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Chandra Bipan ঃ The Rise and Growth of Economic Nationalism in India (New Delhi, 1966)

(2) Kumar, Dharma (Ed) ঃ Cambridge Economic History of India (Cambridge, 1983)

(3) Roy, Tirthankar ঃ The Economic History of India 1857-1947 (Oxford.2006)

(4) ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)

৫.৪.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) Discuss various aspects of handicraft production in the Eighteenth Century India.

(2) How do you explain the rapid growth in import of English cloth and yarn to India in the first half of the nineteenth century?

(3) Analyse different aspects of the debate over de-industrialization.

(4) Critically examine the character of de-industrialization. Was there an industrial decline in India in the early nineteenth century?

TRADITIONAL HANDICRAFT INDUSTRY AND THE QUESTION OF DE-INDUSTRIALIZATION

একক - ৩

ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর (Handicraft industry in transition under colonialism)

বিন্যাসক্রম

৫.৪.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৫.৪.৩.১ ঃ ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর (Handicraft industry in transition under colonialism)

৫.৪.৩.২ ঃ হস্তশিল্পে নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রম আমদানি (Capital and labour in handicraft industry)

৫.৪.৩.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.৩.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর।

(২) ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের হস্তশিল্পে নিয়োজিত পুঁজির উৎস।

(৩) ভারতের হস্তশিল্পের শ্রমিক।

৫.৪.৩.১ ঃঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতের হস্তশিল্পের রূপান্তর (Handicraft industry in transition under Colonialism)

পূর্ববর্তী এককে, আমরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় হস্তশিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, এই হস্তশিল্পের দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভাল চাহিদা ছিল। তবে গ্রামীণ ও শহুরে কারিগররা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, স্থানীয় ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করত। গ্রামীণ ও শহুরে ক্রেতাদের চাহিদার মধ্যে পার্থক্য ছিল। গ্রামীণ শিল্পগুলিতে উৎপন্ন হত, মোটা ধরণের বস্ত্র, মাটির জিনিসপত্র, কাষ্ঠ ও লৌহ নির্মিত কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। উৎপাদনের প্রধান একক ছিল পরিবার, বা কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী। উৎপাদনের সংগঠনও (organization of production) ছিল সরল, বড় মাপের শ্রমবিভাজন বা শ্রম বিশেষীকরণ সাধারণত ছিল না। কিছু গ্রামীণ উৎপাদনে, যেমন কাঁচা রেশম, লবন, সোরা, নীল, কৃষকরা নিযুক্ত থাকতেন এবং এগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদিত হত না।

শহুরে শিল্পগুলির মধ্যে ছিল সুক্ষ্ম বস্ত্র, কার্পেট, শাল, শৌখিন ধাতব ও মৃৎ শিল্প, কাঠ ও হাতির দাঁতের জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি সম্প্রদায়। এগুলির দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও ব্যবসা একান্তভাবেই নির্ভর করত শাসক শ্রেণীর ও ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীর আর্থিক সমৃদ্ধির উপর। শহুরে হস্তশিল্প, কয়েকটি ক্ষেত্রে শাসকবর্গ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 'কারখানা'-গুলিতে উৎপাদিত হতো। প্রাক্-আধুনিক ইউরোপের শহুরে শিল্পগুলিতে যে গিল্ডগুলিকে দেখা যায়, সেগুলির অস্তিত্ব ভারতে প্রায় ছিল না বললেই চলে। গুজরাটে এধরনের কিছু সংগঠন দেখা যায়, তবে এগুলির কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব ছিল না বা ইউরোপীয় গিল্ডগুলির মতো প্রভাবও ছিল না। ভারতে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় কারিগররা কখনোই একটি প্রভাবশালী শ্রেণী হয়ে উঠতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হলে শহুরে হস্তশিল্পগুলি শুধুমাত্র বৃহৎ মুঘল শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ না থেকে, আরও অন্যান্য ছোট ছোট শহরে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের বেনারস, ফারুকাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, আহম্মদনগর, ঔরঙ্গাবাদ, বরঙ্গল, দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই -- এসব শহরেই দক্ষ হস্তশিল্পীরা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এগুলিতে তারা বাজার ও নিরাপত্তা -- দুইই লাভ করে। পরবর্তীকালের স্থানীয় স্তরে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। গ্রামীণ শিল্পগুলির তুলনায় শহুরে শিল্পগুলির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় -- এই শিল্পগুলিতে শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণেরও বৃদ্ধি ঘটে। এই ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ এবং ঋণদানেরও প্রসার ঘটে।

ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে হস্তশিল্পগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছিল তা ভারতীয় শিল্পগুলিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। উন্নতমানের শিল্প দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও রপ্তানি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সংকটাপন্ন হয়। এই সময়ে ইউরোপে ভারতীয় বস্ত্র সম্ভারের রপ্তানি কমতে থাকে। অন্যদিকে ভারতে ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরী বস্ত্রাদির আমদানি বাড়তে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত ছিল বিশ্বে সুতীবস্ত্রের অন্যতম যোগানদার। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ইংলণ্ডে, অষ্টাদশ শতকের শেষে, শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগামী অংশ বা leading sector হিসাবে আবির্ভূত হয় কার্পাস বস্ত্রশিল্প। কারখানায় উৎপাদিত সুতো ও বস্ত্র, ভারতের হস্তশিল্পের মতো অতটা সূক্ষ্ম না হলেও বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হতো বলে, সস্তা ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ড তার উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় তুলো আমদানি করত। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা, বিশেষ করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল মালিকরা, তাদের বিপুল শিল্প পণ্য বিক্রি করার জন্য ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসাবে দেখতে শুরু করে। তাদের চাপে ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি কমে যায়। ১৮১৩ সালের সনদ আইন দ্বারা ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বানিজ্যাধিকারের অবসান ঘটলে, ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব জাত বিভিন্ন দ্রব্য, বিশেষত সুতিবস্ত্রে, ভারতের বাজার পূর্ণ হয়ে যায়। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতে ঔপনিবেশিক সরকার তার শুল্ক নীতি নির্ধারণ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ব্রিটিশ পণ্য বিনা শুল্কে বা স্বল্প শুল্কে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর ইংলণ্ডে বিরাট শুল্কের বোঝা চাপানো হয়। এর ফলে ভারতীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার ও আভ্যন্তরীণ বাজার দুই-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ফলে ঐসব অঞ্চলের ক্ষমতাচ্যুত শাসক ও অভিজাত শ্রেণী হস্তশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতে অপারগ হন। এর ফলেও এর চাহিদা হ্রাস পায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল কারিগর, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত

কারিগরদের জীবিকাচ্যুতি। "There is considerable quantitative data from South India, Central India and Eastern India confirming that employment declined in textiles" (Tirthankar Roy, The Economic History of India 1857-1947, Oxford, 2006, p.64) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয়কে অবশিল্পায়ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে অবশিল্পায়নের আঞ্চলিক তারতম্য, ভারতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে, যার একটা রূপরেখা পূর্বের এককে দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক ঔপনিবেশিকতার আওতায় উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে অবশিল্পায়ন হলেও, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু বৃহদায়তন শিল্পের (large-scale industry) উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এই শিল্পগুলিতে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও কৃৎকৌশল প্রযুক্ত হতো। শিল্পোৎপাদন হতো বৃহৎ কারখানা বা factory-তে এবং এগুলি সরকারী বিধি নিয়মের অধীন ছিল। এই সবদিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি (small scale industry) ভিন্ন ছিল। এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অধিকাংশই প্রাক্-ঔপনিবেশিক উৎপাদন ও কৃৎকৌশল বজায় রেখেছিল। এগুলিকে 'চিরাচরিত' ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বা হস্তশিল্প বলা যেতে পারে। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে, "Important examples of traditional small-scale industry or handicrafts are handloom weaving, leather manufacture, and a variety of industries using metals, wood, and minerals" (ibid, p-183) এই হস্তশিল্পগুলি বা চিরাচরিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ছাড়াও আরও কিছু ক্ষুদ্রশিল্প ছিল, যেগুলির আধুনিক যুগে উদ্ভব হয়েছিল। এগুলিকে 'modern small-scale industry' বলা যেতে পারে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরনের শিল্পের অগ্রগতি দেখা যায় - এর উদাহরণ ছিল ফাউন্ড্রিসমূহ, যন্ত্রচালিত তাঁত, পাটকল, ধান কল, ময়দা কল প্রভৃতি। এই শিল্পগুলি ক্ষুদ্রায়তন ছিল ও ততটা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। তবে হস্তশিল্পগুলির তুলনায় এগুলিতে বেশী যন্ত্রপাতি, শ্রম বিশেষীকরণ ইত্যাদি করা হত। তবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই দুটি ভাগের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। কখনও হস্তশিল্প থেকে প্রাপ্ত লাভ, আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিনিয়োগ করা হতো কিংবা হস্তচালিত তাঁতের কারিগররা যন্ত্রচালিত তাঁত বসিয়ে উৎপাদন করত। উভয় বিভাগের মধ্যে শ্রমের গতিশীলতাও ছিল। একইভাবে বৃহদায়তন শিল্প ও আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃহদায়তন শিল্পের উন্মেষ ঘটলেও, বিংশ শতকের প্রথম দিকেও দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প থেকে জাতীয় আয়, আধুনিক কলকারখানার থেকে অনেক বেশী। S. Sivasubramonian তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ১৯০০/০১ সালে কারখানা থেকে জাতীয়

আয় ছিল ২৯.৮ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র শিল্প থেকে ১২৫.১ কোটি টাকা, দশ বছর পরে এটি বেড়ে যথাক্রমে হয়, ৫৭.০ কোটি টাকা ও ১৫৬.৫ কোটি টাকা। একমাত্র বিংশ শতাব্দীর চারের দশক থেকে কারখানা শিল্পজনিত আয় ক্ষুদ্রশিল্পকে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে সবটাই প্রাচীন কুটির শিল্প নয়, ছোট মাপের কল (machine) ব্যবহার করে এমন শিল্পও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যাই হোক এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও হস্তশিল্পগুলি বা চিরাচরিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের (handloom weaving) ব্যাপারটি দেখলে এটি স্পষ্ট হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত তাঁতীদের সংখ্যা ছিল ২৪,০৭,৩০০। হাতে বোনা শিল্পের সাথে জড়িত সব শ্রেণীর কর্মীদের ধরলে সংখ্যাটি বোধ হয় ৩০,০০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে, যা ছিল ভারতে নিযুক্ত মোট শিল্প শ্রমিকদের ২০%। অন্যদিকে বস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩,৩২,২০০ যা ছিল মোট শিল্প শ্রমিকদের মাত্র তিন শতাংশ। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে, "Handloom weaving was by far the largest industry in India. ... including cotton, silk and synthetics and excluding wool, in the 1930s, handloom's market share in total cloth consumption (in terms of value) may have been about 50." (ibid, p.193)

সুতরাং দেশীয় তাঁতীদের সামগ্রিক উৎপাদন, বিংশ শতকের প্রথমদিকে কারখানা উৎপাদনের তুলনায়, কম ছিল না। ১৯০১-০৫ সময়ে গড়ে বাৎসরিক উৎপাদন হস্তশিল্পে ৯১ কোটি গজের মতন, কারখানায় ৫৯ কোটি গজ। বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পার্থক্য কমে প্রায় সমান হয়ে যায় ও ১৯২১-২২ সালে কারখানায় কাপড় উৎপাদন ও হস্তশিল্পের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৮০ কোটি গজ ও ১১৪ কোটি গজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে কারখানার উৎপাদন হস্তশিল্পের প্রায় তিনগুণ ছিল। ব্রিটিশ কাপড়ের কলগুলির স্বার্থে, সরকার যে সমতামূলক করনীতি (countervailing excise) ১৮৯৬-১৯২৫ সময়কালে ভারতীয় কারখানাগুলির উপর চালু রেখেছিল, তা পরোক্ষভাবে হস্তশিল্পকে সাহায্য করে, কারণ তাঁতীর কাপড়ের উপর কোন শুল্ক ছিল না। ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও ১৯২১ সাল থেকে হস্তশিল্পের পেছনে জাতীয়তাবাদী সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার মূল লাভটা নিয়েছিলেন দেশীয় কারখানার মালিকরা, কারণ তাঁরা, তাঁতীদের থেকে অনেক সস্তায় দেশীয় কাপড় সরবরাহ করতে পারতেন। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে, শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ শিল্পের পুনর্জীবন, স্বরাজ আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে চরকা ও খাদি কাপড়কে গুরুত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য--এসব কারণে হস্তশিল্প একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দেশীয় কাপড় কারখানাগুলি তাদের কারিগরী সামর্থ্যের কারণে, স্বদেশিয়ানার জোয়ারে অনেক বেশী এগিয়ে যায়। তবে মিলে প্রস্তুত হয় না,

এমন কিছু বস্ত্রের ক্ষেত্রে, যেমন, বিশেষ ধরণের শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি, হস্তশিল্পের বাজার অবশ্য বজায় থাকে।

বস্ত্র ছাড়া আর যেসব দ্রব্যাদি হস্তশিল্প বা ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদিত হতো, সেগুলি হল চর্ম, পশমের কার্পেট, পেতলের দ্রব্যাদি, শাল, লৌহ ও কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি ইত্যাদি। ১৮৭০-র পর থেকে মহামন্দা পর্যন্ত চর্ম ছিল গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি সামগ্রী। বিদেশে উন্নতমানের চর্মের চাহিদা থাকায় কানপুর, মাদ্রাজ, বম্বে ও কলকাতায়, চর্ম ব্যবসায়ীদের অধীনে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। পশমের কার্পেট, পেতলের দ্রব্যাদি, গয়না, কাঠ ও হাতির দাঁতের কাজ প্রভৃতি ছিল শহুরে হস্তশিল্প। এগুলি বাইরে রপ্তানি হতো এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলির বাজার ছিল।

৫.৪.৩.২ ঃহস্তশিল্পে নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রম (Capital and Labour in handicraft industry)

(i) পুঁজি

সাধারণ ভাবে, 'হস্তশিল্পগুলির' ব্যাঙ্ক বা এই ধরনের ঋণদানকারী সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ ছিল না, থাকলেও খুব কম ছিল। অসংগঠিত টাকা ও পুঁজির বাজারের সাথেও এগুলির কম যোগাযোগ ছিল। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে, "The main form of working capital financing seems to have been trade credit... Producers and merchants often devised their own systems of informal finance." (ibid p. 214) উত্তর-ভারতে এমন একটি ব্যবস্থা ছিল, যাকে বলা হতো 'baqi'। এই ব্যবস্থায় কারিগররা নিয়োগকর্তা বা মালিকের কাছে ঋণ বা অগ্রিম পেত। নিয়োগকর্তারা কারিগরদের মজুরি থেকে এ বাবদ পাওনা কেটে নিয়ে, বাকী অংশ কারিগরদের দিতেন। এ ধরনের আর্থিক লেনদেন শহুরে হস্তশিল্পে প্রচুর দেখা যেত। একই ধরনের জিনিস হস্তশিল্পের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যায়।

ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য কুটির শিল্পের ব্যাপারে, মহাজনী পুঁজির আধিপত্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ছত্রছায়ায় মহাজনী পুঁজি গজিয়ে উঠেছিল। এই পুঁজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা হতো না -- সুদে খাটানো হত ও বেচা কেনা ব্যবসায়ে লাগানো হত। এই ঋণদাতারা কুটীর শিল্পীদের দাদন বা আগাম দিয়ে, উচ্চহারে সুদ আদায় করত ও শিল্প দ্রব্যের বিপননে হস্তক্ষেপ করে লাভ করত। "এই জাতীয় অনগ্রসর পুঁজিবাদের জালে আবদ্ধ কুটীর শিল্পী দেনার সুদ মেটাতে

সর্বদা ব্যস্ত, বিপননের ব্যাপারে মহাজনের মুখাপেক্ষী বলে কম দামে উৎপন্ন জিনিষ ছাড়তে বাধ্য, লভ্যাংশ সবই প্রায় মহাজনের হাতে যায় বলে, পুঁজি জমাতে (capital accumulation) অসমর্থ এবং পুঁজির অভাবে চিরস্থায়ীভাবে মহাজনের অধীনতায় থাকতে বাধ্য" (ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃঃ ৮৪-৮৫) হস্তশিল্পে পুঁজির যোগানদার হিসাবে মহাজন, পাইকার ফড়ে ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য সমগ্র ঔপনিবেশিক যুগে বর্তমান ছিল।

(ii) শ্রম

উনবিংশ শতাব্দীতে, হস্তচালিত তাঁত বোনা সাধারণত কারিগরদের গৃহেই সম্পন্ন হত। তাঁতী পরিবারে পুরুষরা তাঁতে বোনার ব্যাপারটি করতেন, পরিবারের মহিলা ও শিশুরা বোনার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি করতেন। তবে এই ব্যাপারে ধীরে ধীরে কিছু পরিবর্তন আসে। বস্ত্র উৎপাদনকারী শহরগুলিতে handloom factory'-র আবির্ভাব হয়, যেখানে দুর-দুরান্ত থেকে আসা শ্রমিকদেরও নিয়োগ করা হত। এগুলির সূচনা করেছিলেন ধনী তাঁতীরা ও বণিকরা, যারা বস্ত্র, সূতা, রেশম ইত্যাদির বাণিজ্যের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন। এই factory গুলিতে উন্নতমানের যন্ত্র (tool) ব্যবহৃত হত। এগুলিকে পশ্চিম ভারতের বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত বিভিন্ন শহরে দেখা যেত, যেমন শোলাপুর, মালেগাঁও, বুরহানপুর, সুরাট ইত্যাদি।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে বিভাজন ছিল। উপরের স্তরে যারা ছিলেন তারা ভালই উপার্জন করতেন -- এদের বসবাস সাধারণত ছিল শহরে, এঁরা সূক্ষ্ম নক্সা সমন্বিত রেশম ও সূতীর কাপড় উৎপাদন করতেন, দুর-দূরান্তের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতেন। এইসব 'weaver elite'দের বিপরীতে ছিলেন গ্রামীণ কারিগররা, যারা স্থানীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগান দিতেন। মোটা ধরনের সূতীবস্ত্র উৎপাদনে, কারিগর ও কৃষি শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য খুব কম ছিল। অর্থাৎ প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে একই ব্যক্তি কখনও কারিগর হিসাবে তাঁত শিল্পে, কখনও কৃষি শ্রমিক হিসাবে কৃষিতে কাজ করতেন। এই গ্রামীণ কারিগরদের উৎপাদিত দ্রব্য সাধারণতঃ স্থানীয় স্তরেই বেচা কেনা হতো। সাধারণতঃ রেশম বা খুব সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র যারা উৎপাদন করতেন, তাদের আয় ছিল, মোটা বা সাধারণ বস্ত্র উৎপাদক তাঁতীদের অপেক্ষা তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশী। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে বিভিন্ন শ্রেণীর তাঁত শিল্পী ছিলেন, যারা যে যার দক্ষতা, মূলধন, চাহিদা মতো শহরে বা গ্রামে উৎপাদন করতেন।

যাই হোক, সামগ্রিক ভাবে হস্তশিল্পে শ্রমের ব্যবহার পর্যালোচনা করলে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। "...one of the fundamental long-term tendencies in traditional

small-scale industry has been the increasing employment of hired labour or the growth of a labour market." (T. Roy, ibid, p.208)। এই ধরনের প্রবণতা বেশী দেখা যায়, যেখানে ফ্যাক্টরীগুলি বেশী করে আবির্ভূত হয়েছিল। এই ফ্যাক্টরীগুলি অবশ্যই বৃহদায়তন শিল্পের কারখানা নয় -- এগুলি ছিল মূলত শেড (shed), যেখানে অনেক শ্রমিক বা কারিগর কাজ করত। এই শেডগুলি সাধারণতঃ রেজিষ্ট্রীকৃত হত না, ফ্যাক্টরী হিসাবে। বিভিন্ন শিল্পে এগুলিকে দেখা যেত। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরে যেখানে 'handloom weaving' গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেখানে দুর-দূরান্ত থেকে আসা শ্রমিকদের (migrant labour), এই ফ্যাক্টরীর মাধ্যমে কাজে লাগানো হতো। যে সব শিল্পে ততটা দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল না, যেমন চামড়া প্রস্তুতকরণ (tanning) শিল্প -- সেখানে ফ্যাক্টরীগুলিকে দেখা যায়। উত্তর ভারতের কিছু জায়গায় বণিকরা শেড স্থাপন করতেন যেখানে মূল কারিগর (master artisan) তাঁর সহযোগীদের (apprentices) নিয়ে এসে কাজ করতেন। অর্থাৎ এখানে দক্ষ কারিগররা এই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েন।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে, বিভিন্ন শহরে বা উৎপাদন কেন্দ্রে এই ধরনের ফ্যাক্টরীগুলি বিকাশ লাভ করলে, কারিগররা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সেখানে ভিড় জমান। তবে যেসব শিল্পে খুব দক্ষতার প্রয়োজন হতো, সেখানে সেভাবে কোন শ্রমের বাজার গড়ে ওঠেনি। এই ধরনের শিল্পের কারিগররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কর্মসংস্থানের জন্য যেতেন কম, আর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও এখানে প্রায় ছিল না। মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ এক্ষেত্রে কম হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক শ্রম কাজে লাগানো হতো, কিংবা মূল কারিগর (master) সহযোগী কারিগরদের (apprentice) মাধ্যমে উৎপাদন করতেন। প্রথমটি, হিন্দু কারিগরদের মধ্যে বেশী দেখা যায় ও দ্বিতীয়টি মুসলিম কারিগরদের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল। কার্পেট শিল্পে apprenticeship ব্যবস্থার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উভয় ধরনের উৎপাদনেই শিশুদের নিয়োগ করা হতো।

বস্তুতঃ হস্তশিল্পে, বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পে নারী ও শিশু শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁতী পরিবারের মহিলারা, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁতী সাধারণতঃ পুরুষরাই হতেন। তবে তাঁতী পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁত বুনতে জানতেন। ১৯৩১-র একটি হিসাবে দেখা যায় যে বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমের ৪০% ছিল মহিলাদের শ্রম। Household industry-র ক্ষেত্রেও অনুপাতটি একই রকম ছিল।

যাই হোক, পরিবার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা বা apprentice-দের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা -- এ দুটি ছিল হস্তশিল্পে চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থা। বিংশ শতকে এ দুটির অবনতি দেখা যায়। এ সময়

শ্রমের বাজার-এর আয়তন বৃদ্ধি পায় পারিবারিক শ্রমের বদলে মজুরির বিনিময়ে শ্রম (wage labour) নিয়োগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিকীকরণ, বাজারের প্রসার, বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিকদের আগমন, শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ, কৃৎকৌশলের পরিবর্তন প্রভৃতি, হস্তশিল্পে শ্রম নিয়োগের চিরাচরিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের সূত্রপাত করে।

৫.৪.৩.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Kumar Dharma (Ed) : Cambridge Economic History of India (Cambridge, 1983)

(2) Roy, Tirthankar : The Economic History of India 1857-1947, Second Edition (Oxford, 2006)

(3) ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)

৫.৪.৩.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) How do you explain the transition in handicraft industry under colonialism ?

(2) Discuss the importance of traditional small-scale industry or handicrafts to Indian economy in the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century.

(3) Discuss various sources of capital in the handicraft industry during colonial rule.

(4) Analyse different aspects of labour in handicraft industry under colonialism.

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

Rural Economy : Changes and Continuity

একক - ২

নগর অর্থনীতি

Rural Economy

বিন্যাসক্রম ঃ

৩.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৩.৬.২.১ ঃ সুচনা (Introduction)

৩.৬.২.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

৩.৬.২.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

৩.৬.২.২ ঃ নগর অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

৩.৬.২.২.১ ঃ কারিগর ও শিল্প উৎপাদন

৩.৬.২.২.২ ঃ অবশিল্পায়ন বিতর্ক ও আঞ্চলিক তারতম্য

৩.৬.২.২.৩ ঃ অভ্যন্তরীণ বাজার ও নগরায়ণ

৩.৬.২.২.৪ ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা — ডাক ও তার এবং রেলওয়ে

৩.৬.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৬.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করলে কি কি জানা যাবে ঃ

(১) সাধারণভাবে ভারতবর্ষের নগর ও নগরায়ণের ইতিহাসকে জানা যাবে।

(২) প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নগর অর্থনীতির আদল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

(৩) ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত নগর অর্থনীতির পরিবর্তনকে এখানে বোঝানো হয়েছে।

(৪) নগর অর্থনীতিতে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকা ও তার পরিবর্তন প্রক্রিয়া এখানে আলোচিত হয়েছে।

(৫) অবশিল্পায়নের স্বরূপ, তার উৎস সর্ম্পকে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

(৬) অবশিল্পায়ন বিতর্কের সনাতন রূপটি সর্ম্পকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশিল্পায়ন বিতর্কের প্রচলিত ধারণাটি কতটা পরিবর্তিত হয়েছে সেকথাও বলা আছে।

(৮) ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া সর্ম্পকে এখানে আলোচনা আছে।

(৯) ডাক, তার ও রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

৩.৬.২.১ ঃ সুচনা (Introduction)

৩.৬.২.১.১ ঃ অর্থনৈতিক সংগঠন কী?

অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে সাধারণভাবে অর্থনীতির কাঠামোগত দিকটিকে বোঝায়। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান বাজার, ঋণব্যবস্থা সবকিছুই অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একেবারে নিচুতলা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে কাঠামোগত পার্থক্য থাকে। এগুলি কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাজার এবং অর্থনীতির নানা সূত্র ধরে বিভিন্ন সংগঠন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা ধরনের টানা পোড়েনের মতো বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক সংগঠনেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক সংগঠনের এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ ও তার পরিবর্তনের ধারাকে না বুঝতে পারলে কোন দেশের বা কোন কালের ইতিহাসকে ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা খুব একটা প্রাধান্য পেত না। অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা সেই দিক থেকে ইতিহাস চর্চায় নতুনত্বের দাবী রাখে।

প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে কী বোঝ ?

৩.৬.২.১.২ ঃ প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ

প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংগঠনটি সমকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা সনাতন অর্থনীতির মতোই ছিল কতকটা ঢিলে ঢালা। স্বাভাবিক কারণেই কৃষিই ছিল সেই অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। দেশের এক অংশের কৃষিজ উৎপন্নের

বাজার গড়ে উঠেছিল দূরবর্তী অংশে। নিকট ও দূরবর্তী উভয় প্রকার বাণিজ্যের অংশীদার ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছোট বড় নানা মাপের ব্যবসায়ীরা। জল এবং স্থল উভয় পথেই এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বলতে উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পও যেমন ছিল তেমনি ছিল বহু বিস্তৃত গ্রামীণ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। উৎকর্ষ ভিত্তিক শিল্পের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর বিশেষ কদর ছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়াও ভারতীয় ইস্পাত ও তৈজসপত্র নিয়মিত রপ্তানি হতো। গ্রামীণ শিল্প বিশেষত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত ছিল। গুজরাট, করমন্ডল, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলায় বস্ত্র শিল্প ছিল কৃষির পরই গ্রামীণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা।

স্বাভাবিক কারণেই কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। গ্রামীণ শিল্প বিশেষত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত ছিল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও, প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব যে একটা উন্নত ছিল এরকম মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। তাই গ্রামবাসী অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পারিবারিক ভিত্তিতে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই এই কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতো। অবশ্য, ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চল বাণিজ্যিক শস্য চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল — যেমন তুলো, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি। এই সমস্ত কৃষিপণ্যের বিস্তৃত বাজারও গড়ে উঠেছিল, তবুও প্রাক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থা সাধারণভাবে ভালো ছিল না। উৎপন্ন ফসলের বেশিরভাগটাই রাজস্বদায় মেটাতে চলে যেত। মুঘল সম্রাটের হয়ে রাজস্ব আদায়ের কাজে সহযোগিতার জন্য ছিল বিপুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রামীণ এক মধ্যস্তত্বভোগী শ্রেণী।

পারিবারীক ভিত্তেতে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হতো।

কৃষকের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব আদায়ের সহযোগিতার মূল্য হিসাবে তারা নিয়ে নিত। ফলে, কৃষকের হাতে উদবৃত্ত বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং, গ্রামের বাইরে উৎপন্ন কোন জিনিষ কৃষকের পক্ষে কেনা প্রায়শই সম্ভব হতো না। কৃষি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অল্পবিস্তর শিল্পের কাজও হতো। গ্রাম বিশেষে এই শিল্পকর্মের চরিত্র এক এক রকম হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপন্নের একটা অংশ বাজারেও যেত। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ছোটখাটো বাইরের পাইকার বা ব্যবসায়ির আনাগোনাও ছিল। কিন্তু, প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রই ঠিক সেই অর্থে মুদ্রায়িত ছিল না।

রাজস্ব আদায়ের পর কৃষকদের হাতে উদ্বৃত্ত বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। গ্রাম সমাজের বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে নাগরিক সমাজকে গড়ে তুলছে।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নগরের স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। প্রাক্-মুঘল উত্তর ভারতের নগরায়ণ নিয়ে অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবের আলোচনায় গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে নগর-অর্থনীতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। গ্রামসমাজের বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে নাগরিক সমাজকে গড়ে তুলেছে। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া নতুন করে উৎসাহিত হয়। সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকেরা অনেকসময়েই মুঘল নগরগুলিকে সামরিক শিবিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রধান প্রধান মুঘল শহরগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত দুর্গপ্রাকারই তাদের এই ধরনের ভ্রান্তির প্রধান কারণ।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের নগর ও নগরায়ণকে নিয়ে সাম্প্রতিককালে বহু গবেষণা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণার মূল সূত্রটিকে এখানে সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে। নগরায়ণ ও নাগরিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নগরগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তথা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নগরগুলিকে ভাগ করা হয়েছে যা সমসাময়িক ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রাজধানী শহর। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর অথবা অযোধ্যা, পাটনা, ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের মতো অসংখ্য রাজধানী শহর গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিল। রাজধানী অথবা শাসকের আবাসস্থল এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত শহরগুলি সমসাময়িক ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এইসব রাজধানী শহরের পাশাপাশি কতকগুলি শহর ছিল বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো বড়ো নদীপথ, রাজপথ অথবা বাজারকে কেন্দ্র করে এই ধরনের নগরায়ণ সংগঠিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, রাজধানী শহরের তুলনায় এইসব বাণিজ্যিক বা বাজার শহরের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবও ছিল অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এক-এক শহরে একেক ধরনের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণীর বসবাসের ফলে বাণিজ্যিক শহরগুলির চরিত্র ও মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।

রাজধানী এবং বাণিজ্যিক শহরের পাশাপাশি আরও একধরনের শহর সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে দেখতে পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে এগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং স্থিতিশীল। এক অর্থে বাণিজ্যিক শহরের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এই শহরগুলি তীর্থ বা মন্দির শহর নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এই ধরনের মন্দির শহরগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

নগরগুলির বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র থাকলেও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল লক্ষ্য করা যায়।

রাজধানী, বাণিজ্যকেন্দ্র অথবা তীর্থ শহরগুলির বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্য ছিল। কিন্তু এই তিনধরনের শহরের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পোৎপাদনের সূত্রে সম্পূর্ণ মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি শহরের অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিপতি মহাজনশ্রেণী সাধারণ ব্যবসায়ী ও পাইকার এবং নানা ধরনের শিল্পকর্মে নিযুক্ত কারিগর সমাজ ছিল নগরজীবনের প্রধান অঙ্গ। প্রত্যক্ষভাবে শাসিত মুঘল রাজধানী শহরগুলিতে কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রশ্ন

১। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। তা কিভাবে নগরায়ন উদ্ভবে সহায়তা করেছিল।

৩.৬.২.২ ঃ নগর অর্থনীতি ঃ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

৩.৬.২.২.১ ঃ কারিগর ও শিল্প উৎপাদন

ইংরেজ শাসন পত্তনের ফলে ভারতবর্ষের নগর জীবনের প্রতিষ্ঠিত ধারাটি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের সবথেকে বড় প্রভাব পড়েছিল নগরভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। শহুরে উৎপাদন ব্যবস্থার বেশিরভাগটাই জুড়ে ছিল কারিগর সমাজ। প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। বিস্তৃত সেসব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

মূল কথা হলো, নগর ভিত্তিক এই শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত অভিজাত সমাজ ও দূরবর্তী বাণিজ্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হতো। সংখ্যার দিক থেকে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কারিগরেরা খুব একটা বড় না হলেও বৈচিত্র্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অর্থমূল্যে তাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এইসব কারিগর ও তাদের সহযোগী নানা গোষ্ঠীর মানুষরাই দৈনন্দিন নাগরিক জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকতো। শহরাঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সে কারণে, নাগরিক ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

নগরভিত্তিক এই কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাতশ্রেণীর চাহিদা। ভারতবর্ষের বিস্তৃত অংশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের অপসারণের ফলে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অভিজাত চাহিদার অবসান ঘটে। শহুরে কারিগর সমাজ তাদের পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। ঢাকা অথবা মুর্শিদাবাদ শহরের মসলিন ও রেশম শিল্প মুঘল শাসনের অবলুপ্তি এবং বাংলার নবাবি আমলের অবসানের ফলে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঐতিহাসিক নির্মল কুমার সিংহের আলোচনায় সে বিষয়ে বিস্তৃত পরিসংখ্যান ও তথ্য পাওয়া যায়। অভিজাত চাহিদার এই আকস্মিক অবলুপ্তি শহুরে শিল্পব্যবস্থার পুরোনো সংগঠনটাই নষ্ট করে দেয়। প্রতিক্রিয়ায় পারস্য বা এশিয়ার অন্যান্য দেশ বা ভারতবর্ষের দূরবর্তী অংশের সঙ্গে এইসব শহরের যে দীর্ঘ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তাও দ্রুত ভেঙে পড়ে। সনাতন এইসব শিল্পের উপর নির্ভরশীল এককালের সম্পন্ন কারিগর সমাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

> *শহরে উৎপাদন ব্যবস্থার বেশিরভাগটাই জুড়ে ছিল কারিগর সমাজ। অভিজাত চাহিদার আকস্মিক অবলুপ্তি শহুরে শিল্প ব্যবস্থার পুরানো সংগঠন নষ্ট করে।*

ক্রমে ক্রমে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হতে শুরু করলে সেই সব অঞ্চলের নগর ভিত্তিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তর ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে শহুরে কারিগর সমাজের ওপর অভিজাত চাহিদার অবলুপ্তির প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঐতিহাসিক বেঈলি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মধ্য ভারতবর্ষে পেশোয়া শাসনের অবসানও ঠিক একই রকম প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের কিছু কিছু অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম ঘটে। বিস্তৃত সেই সব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অভিজাত চাহিদার অবলুপ্তি ছাড়াও আর্থিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথমযুগে ইংরেজ প্রবর্তিত কিছু কিছু নীতিগত কারণেও কারিগর নির্ভর শহুরে উৎপাদন ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরোনো বাজার, মূলধন ও ঋণ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলেও কারিগরদের পক্ষে ঠিক আগের মতন উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কারিগরদের এই ক্ষতি তাদের অন্যান্য সহযোগী সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করে।

আগে মনে করা হতো ইংরেজ শাসন পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। যার ফলে সেখানকার কারিগরেরা নতুন জীবিকার সন্ধানে শহরাঞ্চল ত্যাগ করে গ্রামমুখী হতে থাকে। পরবর্তী কালের গবেষণায় এই ধারণা অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়েছে। ইংরেজ শাসন সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে শহরাঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত চেহারাটা পাল্টে গেলেও কারিগর সমাজ নানা কারণে তাদের সনাতন উপজীবিকাকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে। অবশ্য এতদিন তারা যে ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করতো অথবা যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বাজারকে লক্ষ্য রেখে তাদের জীবন পরিচালিত হতো সে সমস্ত কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটে। তবুও, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা বা মাদ্রাজ মুলুকের শহরাঞ্চলেও শিল্পোৎপাদনের পুরোনো আদলটাই মোটামুটিভাবে বজায় থাকে। মজার কথা হলো, ইংরেজ কোম্পানির শাসন একদিকে যেমন এইসব পরিবর্তনের সূত্রপাত করে তেমনি অন্যদিকে কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থ আবার ভারতবর্ষের কতকগুলি শিল্পকর্মকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

> *অভিজাত চাহিদার অবলুপ্তি ছাড়াও আর্থিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ প্রবর্তিত কিছু কিছু নীতিগত কারণেও কারিগর নির্ভর শহুরে উৎপাদন ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।*

প্রশ্ন

১। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নগর অর্থনীতিতে কারিগরী ও শিল্প উৎপাদন কি পরিবর্তন এনেছিল ?

৩.৬.২.২.২ ঃ অবশিল্পায়ন বিতর্ক ও আঞ্চলিক তারতম্য

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের অবসান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিবর্তন এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। ইতিমধ্যে, ইংল্যান্ড বস্ত্রশিল্প-নির্ভর শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে উন্নীত হওয়ায় সে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রনির্মিত সস্তা সুতো ও কাপড় ভারতের বন্দর শহরগুলিতে আসতে শুরু করে। প্রথম দিকে কাপড়ের তুলনায় সুতোর যোগান ছিল বেশি এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অনিয়ন্ত্রিত। পরবর্তীকালে অবশ্য কাপড়ের যোগানও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় সুতিবস্ত্র শিল্প সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু, শহরাঞ্চলের কারিগরদের ওপর এর প্রভাব ছিল আশু এবং অত্যন্ত ব্যাপক। অনিয়ন্ত্রিতভাবে সুতো আমদানির ফলে কেবলমাত্র সুতো কেটে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের শহরগুলিতে সুতো তৈরি করা ছিল এক শ্রেণীর মানুষের সর্বক্ষণের উপজীবিকা। এ ছাড়াও শহরের তাঁতিদের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ সুতোর যোগান আসতো। সুতো বোনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল অসংখ্য গ্রামীণ পরিবারের মেয়েরা।

ইংল্যান্ড থেকে সস্তা সুতোর অনিয়ন্ত্রিত যোগানের ফলে এই উভয় শ্রেণীর মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই প্রথম দিকে তাঁতিদের থেকে সুতো কাটনিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সংখ্যাগত দিক থেকেও তাঁতিদের তুলনায় তাদের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব মানুষের কর্মহীনতা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর কিছুকাল পর থেকে, সুতো কাটনিদের মতো এক শ্রেণীর তাঁতিরাও এই কর্মহীন মানুষের দলে যোগ দিতে থাকলে গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থাও এসবের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোক্তা হিসাবে বিপুল সংখ্যক কর্মহীন এইসব মানুষের চাহিদা কমে গেলে গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি মন্দার অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার কথা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। নিতান্ত দরিদ্র এইসব শ্রেণীর মানুষ কৃষিকে নির্ভর করে নতুন জীবিকা সন্ধানের চেষ্টা করলে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা ও ব্যবস্থাগত সহনশীলতা হ্রাস পেতে থাকে।

> *সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় সুতিবস্ত্র শিল্প সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।*

ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় দেশীয় শিল্পব্যবস্থার ওপর ব্রিটিশ শাসনের এই সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াই অবশিল্পায়নের ধারণা নামে পরিচিত। অবশিল্পায়ন অর্থাৎ দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং ফলতঃ কৃষি ও শিল্পের মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যের বিনাশ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী চিন্তাবিদদের কাছে অবশিল্পায়নের তত্ত্ব ছিল এক মস্ত হাতিয়ার। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বারবার এই তত্ত্বের ব্যবহার করেন। সে কারণে, অবশিল্পায়নের ভাবনা একদিকে যেমন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, তেমনি অন্যদিকে এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় অবশিল্পায়নের তত্ত্বকে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। এই সময় জাতীয়তাবাদী ভাবনার অনুসারী চিন্তাবিদরা সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সংঘটিত অবশিল্পায়নের ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। অপর এক দল এইসব সংখ্যাতত্ত্বের প্রকৃতি ও প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আলোচনা পদ্ধতি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা পদ্ধতিগত বিষয়ের উল্লেখ করে তাদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ড্যানিয়েল থর্নার, অমিয়কুমার বাগচী, তরু মাতসুঈ বা মরিস ডেভিড মরিসের মতো ঐতিহাসিকেরা। এই সময়ে অবশিল্পায়নের পক্ষে বিপক্ষে সন্নিবেশিত নানা যুক্তি, তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রাসঙ্গিক ইতিহাসচর্চার প্রচলিত ধারণার সম্প্রসারণ ঘটায়।

> *অবশিল্পায়ন বলতে বোঝা যায়, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং ফলতঃ কৃষি ও শিল্পের মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যের বিনাশ।*

প্রশ্ন

১। অবশিল্পায়ন বলতে কি বোঝ ?

অধ্যাপক মরিস ডেভিড মরিসের মতে অবশিল্পায়ন সম্পর্কিত ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় প্রচলিত ধারণাটি ভীষণভাবে অতিরঞ্জিত। তিনি মনে করেন ব্রিটিশ আমলে ইংল্যান্ড থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র আমদানি করা হয়েছিল, ভারতবর্ষের মোট বস্ত্র-চাহিদার অনুপাতে তার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট কম। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভারতের বস্ত্র চাহিদাও ইতিমধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমদানিকৃত বস্ত্র ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বস্ত্রোৎপাদনের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছিল এই যুক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য মরিস স্বীকার করেন যে সুতো আমদানির ফলে ভারতবর্ষে সুতো বোনার কাজের সুযোগ অনেকটাই সংকুচিত হয়েছিল।

অবশিল্পায়ন তত্ত্বের সমর্থনকারী ঐতিহাসিকেরা অবশ্য মরিসের তত্ত্বকে নানাভাবে অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুতো বোনার কাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়। সমকালীন সময়ে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা কঠিন। তাই মরিসের যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশেষে গোটা উনিশ শতক ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতীদের জীবনযাত্রার মান দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, যার সঙ্গে মরিসের সিদ্ধান্তকে কোনোভাবেই মেলানো যায় না।

এসমস্ত সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান অপূর্ণ থেকে যায়। ভারতের মতো বিশাল দেশজুড়ে এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সর্বত্র একই সঙ্গে একইভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল কি ? সুতরাং, অবশিল্পায়ন সম্পর্কিত পরবর্তীকালের আলোচনায় আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেতে থাকে। মূলতঃ ১৯৮০ দশক থেকে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের তাঁতশিল্পকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু হয়। এই সমস্ত গবেষণার সামগ্রিক ফলস্বরূপ অবশিল্পায়ন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত ভাবনাটির অনেক পরিবর্তন ঘটে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ব্রিটেন থেকে অবাধে যন্ত্রনির্মিত সুতো ও কাপড় আমদানির ফলে ভারতের তাঁতশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু, এই প্রক্রিয়ার অভিঘাত ছিল একেক জায়গায় এক এক রকম। অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার তারতম্য ও তার স্বরূপ নিয়ে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা নতুন করে বহু তথ্য ও পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে যে সময়ে ও যে ভাবে অবশিল্পায়ন সংঘটিত হয়েছিল সুদূর রাজস্থানে সেই সময়ে তাঁত শিল্পের ওপর তার কোন প্রভাব পড়েনি। আবার, সুতো উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, হস্তচালিত তাঁতশিল্প সেরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অবশিল্পায়নের অভিঘাত প্রক্রিয়ার সময়গত তারতম্যের প্রশ্নটিও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও এতকাল অনালোচিত ছিল। প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিল্প ব্যবস্থায় তাঁতের প্রাধান্য থাকলেও সেটিই কেবল একমাত্র শিল্প ছিল না। তাঁতশিল্পের পাশাপাশি আরো অনেক শিল্প ছিল যেগুলির দিকে অবশিল্পায়ন তত্ত্বের ঐতিহাসিকরা এতকাল ফিরে তাকাননি। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁতশিল্প যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সময় অন্যান্য শিল্পগুলির অবস্থা কি হলো সেই প্রশ্নের মীমাংসা না হলে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অভিঘাতের স্বরূপ সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা করা চলে কি?

অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে আলোচনাকালে মরিস ডেভিড মরিস সর্বপ্রথম প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কিন্তু, এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী আর পাঁচজনের মতো তিনি নিজেও তাঁতশিল্প ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পের দিকে খুব একটা নজর দিতে

পারেননি। তবে তাঁর আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এমন দু-একটি ইঙ্গিত ছিল যেগুলি পরবর্তী গবেষকদের কাজ নিঃসন্দেহে সহজ করেছে। অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালের প্রকাশিত লেখাপত্রে দীর্ঘকাল অবহেলিত এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। মোট কথা হলো, তাঁতশিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পগুলি অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরঞ্চ , নানা কারণে ঔপনিবেশিক শাসনকালে কতকগুলি শিল্প বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন ধাতু ও অন্যান্য কাঁচামাল আসতে শুরু করে। একইভাবে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য এবং ইংরেজ শাসন সীমিতভাবে হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয় কারিগরী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। ঠিক একইভাবে নতুন পরিবহন ব্যবস্থা এবং সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে সহজ সমুদ্রযাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক নিবিড়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে কতকগুলি অর্ধসমাপ্ত কারিগরী দ্রব্যের চাহিদা ইউরোপের বাজারে বাড়তে থাকে। এর ফলে ভারতবর্ষের ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক তীর্থঙ্কর রায় চামড়া তৈরীকে কেন্দ্র করে এবিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। কাঁচা চামড়ার বর্ধিত চাহিদার ফলে কলকাতা, মাদ্রাজ, প্রভৃতি শহরের চামড়া-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। এসমস্ত শিল্পে গ্রামাঞ্চল থেকে বহু মুচি এসে ভিড় জমায়। কাঁসারী বা কামারদের মতো কারিগরদের ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক যুগে এই ধরনের চাহিদা বিস্তারের ঘটনা ঘটে ;যদিও সেখানে বহির্ভারতীয় চাহিদার ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত।

> তাঁতশিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পগুলি অতটা ক্ষতিক্রস্ত হয় নি। নানা কারণে তৎকালীন সময়ে কতগুলি শিল্প বিশেষ লাভবান হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। অবশিল্পায়ন বিতর্কে আঞ্চলিক তারতম্য ব্যাখ্যা করো।

৩.৬.২.২.৩ ঃ অভ্যন্তরীণ বাজার ও নগরায়ণ

ঔপনিবেশিক শাসনের আলোচ্য পর্বে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অপর গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারের সংযুক্তি সাধন। ইংরেজ শাসন শুরু হবার অব্যবহিত আগে ভারতবর্ষের বাজারের অবস্থা ছিল ভীষণভাবে অসংগঠিত এবং বহু বিভক্ত। এক এক অঞ্চলের বাজারের অবস্থা ছিল এক এক রকম। মোটা দাগের এই আঞ্চলিক তারতম্যের কথা ছেড়ে দিলেও এক একটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলির মধ্যেও কোন প্রকার যোগাযোগ বা ব্যবহারিক সমতা ছিল না। একেবারে বুনিয়াদি স্তরে অবস্থিত বাজারগুলির অবস্থা ছিল আরো খারাপ। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বাজারে ক্রেতা ও গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি বিনিময়ই ছিল বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা। এমনকি জেলা স্তরে অবস্থিত প্রধান প্রধান বাজারের অবস্থাও ছিল কতকটা একই রকম। একই দ্রব্যের জন্য কাছাকাছি অবস্থিত বাজারগুলিতেও এক এক ধরনের মূল্যমান ও ব্যবসায়িক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল।

> *ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অবস্থা পরিবর্তনে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে শুরু করে। সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর।*

সমগ্র দেশ জুড়ে এ রকম অসংগঠিত এবং বহু বিভক্ত বাজারের অস্তিত্বের প্রধান কারণ ছিল প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। এ সবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর। বন্দর শহর বা বড় বড় জলপথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অবস্থা কিছুটা অন্যরকম হলেও প্রায়ক্ষেত্রেই দেশের ভেতরকার অংশগুলি ছিল ব্যবসা বাণিজ্য থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা পরিবর্তনে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে শুরু করে। বাংলা বা মাদ্রাজ মুলুকের মতো অঞ্চলগুলিতে কোম্পানি তার বাণিজ্যিক রসদ সংগ্রহের প্রয়োজনে একটু একটু করে দেশের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করতে থাকে। একই সঙ্গে সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বার্থে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ যোগাযোগের উপযোগী পথ তৈরীর চেষ্টাও শুরু করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার চলে যাওয়ার ফলে দেশের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করবার সরকারি এবং বে-সরকারি প্রচেষ্টা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এ সবের সূত্র ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেকার ব্যবসা ও বাণিজ্যিক যোগাযোগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর ভারতবর্ষ জুড়ে একই ধরনের মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার প্রচলন এই প্রবণতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষে একদিকে যেমন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মতো অতিবৃহৎ ঔপনিবেশিক শহরগুলি গড়ে উঠতে থাকে তেমনি অন্যদিকে প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহরগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়। এর একটা বড় কারণ দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আশ্রিত অভিজাত শ্রেণীর অবলুপ্তি। উত্তর ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে পূর্ব-পশ্চিম ও মধ্য ভারতবর্ষের সর্বত্র এই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পুরনো রাজধানী শহর বা বাণিজ্যিক শহরগুলি থেকে প্রভাবশালী মানুষজন নতুন ঔপনিবেশিক শহরগুলির দিকে পাড়ি জমাতে থাকেন। ফলে পুরনো শহরগুলি জনশূন্য হয়ে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হারায়। একইভাবে এইসমস্ত শহরগুলির ওপর নির্ভরশীল কারিগর সমাজ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক শাসনের নতুন স্থান ও পরিবেশে ব্যবসা পত্তন করতে পারলেও অধিকাংশই তাদের পূর্বতন প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক ভারতে বাজারের সংযোগ সাধনের অর্থনৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

আলোচ্য সময়কালে বড় বড় ঔপনিবেশিক শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৃহৎ বাজারগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাজারের সঙ্গে এক ধরনের ব্যবসায়িক সংযুক্তিসাধন ঘটায়। এদেশে ইংরেজ শাসন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো শহরগুলিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে অতি বৃহৎ বাজার গড়ে উঠতে থাকে। সাধারণভাবে ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে ইংরেজ ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত অঞ্চলে দেশি বিদেশী ব্যবসায়ী ও মহাজন গোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটে। এদের টানে কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো শহরগুলিতে একদিকে যেমন নিকট অথবা দূর পার্শ্ববর্তী সমস্ত জায়গার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী জড়ো হতে থাকে; তেমনি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আনা পণ্যসমূহের বাজারও গড়ে ওঠে। দেশীয় শাসনের অবলুপ্তি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে।

এই সমস্ত শহরে বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়িক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বীমা ও ব্যাংক সংগঠন এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে নানা ধরনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজে অবস্থিত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে লন্ডনের বাজার এবং অন্যদিকে এ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলির মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। এদের মাধ্যমেই দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের তুলো চাষকে কেন্দ্র করে সংঘটিত উন্মাদনা এই ধরনের বাজার-নির্ভর সংযোগসাধনের সবচাইতে বড় উদাহরণ। পূর্ববর্তী অংশে সে কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কোলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো প্রধান প্রধান ঔপনিবেশিক শহরগুলি ছাড়াও রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই নতুন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। নতুন এইসব ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্মের মূল লক্ষ্যই ছিল ইংরেজ বাণিজ্যস্বার্থে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরকে আরো বেশি বেশি করে উন্মুক্ত করা ; যাতে করে এ দেশ থেকে কৃষিপণ্যের সহজ রপ্তানি এবং ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়। এই স্বার্থের টানে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ছোট ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায়িক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলের এইসব অঞ্চলের সঙ্গে কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো ভারতের প্রধান প্রধান ঔপনিবেশিক শহরের মধ্যে নিবিড় ব্যবসায়িক সংযোগ গড়ে ওঠে। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের স্বার্থে ঔপনিবেশিক শহরে অবস্থিত ব্যবসা, বাণিজ্য, বীমা, ব্যাংক ও পণ্য পরিবহণ প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট শহরগুলিতে তাদের কাজকর্ম সম্প্রসারণ করতে থাকে।

৩.৬.২.২.৪ ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা — ডাক ও তার এবং রেলওয়ে

এই ব্যবসায়িক স্বার্থেই লন্ডনের সঙ্গে ভারতবর্ষকে আরো নিবিড়ভাবে যুক্ত করবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা শুরু হয়। ব্রিটিশ পুঁজি ও ব্যবসায়িক স্বার্থের কাজে ভারতের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করবার জন্য পথঘাট নির্মাণের কথা আগেই বলা হয়েছে। আলোচ্য সময়কালে, নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বাষ্পীয় জলযান এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন। বাষ্পীয় জলযান প্রথমে ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত শুরু করে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীপথেও এই ধরনের জলযানের ব্যবহার শুরু হলে দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর শহরগুলিতে পণ্য আমদানি আরো সহজ হয় এবং তার যোগানও বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত স্থানগুলি থেকে কৃষিপণ্যের পরিবহণের ক্ষেত্রে এই ধরনের জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা নতুন এক পর্বের সূচনা করে।

ব্রিটিশ পুঁজি ও ব্যবসায়িক স্বার্থের কাজে ভারতের অভ্যন্তরে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। ডাক ব্যবস্থাকে নির্ভর করে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠে।

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন পত্তনের শুরু থেকেই সীমিত দূরত্বের মধ্যে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয়ে ছিল। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইংরেজ সেনা ছাউনির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার স্বার্থে গড়ে তোলা এই ডাক ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সামরিক। পরবর্তীকালে, শাসনতান্ত্রিক স্বার্থেও এর ব্যবহার শুরু হলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ডাক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। দেশব্যাপী বিস্তৃত এই ডাক ব্যবস্থাকে নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

এই ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে প্রবর্তিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করে। এ দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল পুরোপুরি সামরিক। সে কারণে, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নয়নের ধারা এখানে অনুসরণ করা হয়নি। এখানে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারি তৎপরতায় ও সরকারি খরচে। ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের কাজ যে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা হয়েছিল অথবা টেলিগ্রাফের প্রধান প্রধান লাইন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ দেশের যেসব অঞ্চলগুলিকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি রাখলে এই কথার যথার্থতা বোঝা যাবে।

সরকারের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পাশাপাশি ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজও ভীষণভাবে লাভবান হয়।

সে যাই হোক, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের ফলে ভারতবর্ষের দূরবর্তী অঞ্চলেও লন্ডন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। মোট কথা, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ফলে সরকারের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পাশাপাশি

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজও ভীষণভাবে লাভবান হয়। বাজারের সংযুক্তিসাধনের যে প্রক্রিয়ার বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের ফলে সে কাজ যে ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

১৭৫৭-১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পত্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু এ দেশীয় অর্থব্যবস্থার উপর তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তখনো অনুভূত হয়নি। এ দেশে রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে পদ্ধতিগত আলোচনা ও রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ব্যক্তিগত পুঁজিকে আকৃষ্ট করবার কাজে বহু কালক্ষেপ হয়। অবশেষে, আলোচ্য সময়ের একেবারে শেষের দিকে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতবর্ষে স্বল্প দূরত্বের দুটি মাত্র রেলপথ কার্যকরী হয়েছিল। তাই, দেশীয় অর্থব্যবস্থার উপর রেলপথের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াকে লক্ষ্য করবার জন্য আমাদের উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক একটা কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে সিপাহী বিদ্রোহের মত যুগান্তকারী ঘটনায় বিদ্রোহী শক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির চূড়ান্ত সাফল্যে টেলিগ্রাফ এবং রেলপথ — এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন এই উভয় ব্যবস্থারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

প্রশ্ন

১। ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে নতুন যোগাযোগ ব্যবস্তার ফলাফল কী হয়েছিল ?

৩.৬.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

১। Binay Bhushan Chaudhuri (Ed.) Economic History of India from Eighteenth to Twentieth Century, Chapter-IV

২। সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি

৩। Indu Banga (Ed.), The City in Indian History.

৪। Dharma Kumar (Ed.), The Cambridge Economic History of India, Volume II, c.1757 – c.1857

৫। Tirthankar Roy, Traditional Industry in the Economy of Colonial India.

৩.৬.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতীয় নগরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২। প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নগর অর্থনীতিতে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের ভূমিকা আলোচনা কর। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা এই প্রক্রিয়াকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। অবশিল্পায়ন বলতে কি বোঝ? অবশিল্পায়ন বিতর্কের সনাতন ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। অবশিল্পায়ন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি সাম্প্রতিক গবেষণায় কতটা প্রভাবিত হয়েছে?

৫। ঔপনিবেশিক ভারতে বাজারের সংযুক্তি সাধনের অর্থনৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

৬। ঔপনিবেশিক শহর বলতে কি বোঝ? এই ধরনের শহরগুলির সঙ্গে প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতীয় শহরগুলির পার্থক্য কোথায়?

৭। ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে ডাক, তার ও রেলওয়ের মতো নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলাফল কি ছিল?

৮। আলোচ্য সময়কালে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) ভারতবর্ষের নগর অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তনের ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

ECONOMY AND AGRICULTURE

একক - ১

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ভারত

সম্পদের নির্গমন এবং ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

গঠন (Structure) ঃ

৪.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.২.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা বলতে বোঝায়

৪.২.১.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘরানা

৪.২.১.৩ ঃ বৃটিশ সওদাগরদের প্রাধান্য বিস্তার

৪.২.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারত

৪.২.১.৫ ঃ পুঁজির প্রবাহ

৪.২.১.৬ ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন

৪.২.১.৬.১ ঃ লেনদেন হিসাব ও সম্পদ নির্গমন

৪.২.১.৬.২ ঃ সম্পদ নির্গমনের ধারা

৪.২.১.৬.৩ ঃ নির্গমনের হিসাব

৪.২.১.৬.৪ ঃ নির্গমন তত্ত্বের সমালোচনা

৪.২.১.৬.৫ ঃ নির্গমনের ফলাফল

৪.২.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৪.২.১.৭.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রানীতি

৪.২.১.৭.২ ঃ রৌপ্যমানের প্রবর্তন

৪.২.১.৭.৩ ঃ রূপোর দাম হ্রাস ও মুদ্রানীতি নিয়ে বিতর্ক

৪.২.১.৭.৪ ঃ স্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা

৪.২.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে ও বিভিন্ন ঘরানায় সাম্রাজ্যবাদ

২। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় ভারত

৩। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে সম্পদের নির্গমন

৪। ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৪.২.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলতে বোঝায়

যে বিশ্বব্যবস্থায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বলে পশ্চাদপদ অনগ্রসর দেশগুলোকে নিজেদের তাবেদে রেখে তাদের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখে তাকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলে। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে পশ্চাদপদ দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করে শুধু সে দেশগুলোকে শাসন করে না, সে দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা জুড়ে বৃটেনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারত বৃটেনের অধীনে এক উপনিবেশে পরিণত হয়।

পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিশেষ করে ১৮১৩ সালে চার্টার আইনের নবীকরণের পর থেকে পরাজিত ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে একটা উপগ্রহ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা হয়। বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতে এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়। উদ্দেশ্য হোল, যেন সে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে সেবা করতে পারে। ভারত তার নিজের বাজার বৃটিশ পণ্যের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আর সে বৃটেনকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য জোগান দেওয়া শুরু করে। ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটাতে বাধ্য হয়। নিজের দেশের শিল্প ধ্বংস হয়। ভারত থেকে অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি হয়। নীট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় থাকা সত্ত্বেও প্রতিদানে সে তার প্রাপ্য পায় না। একে দাদাভাই নওরোজী নির্গমন বলেন। অর্থাৎ ঔপনিবেশিকরণের মাধ্যমে অবশিল্পায়ন ঘটানো হয়, ভারতে কৃষিতে বিশেষীকরণ করতে বাধ্য করা হয় আর ভারত থেকে সম্পদের নির্গমন ঘটে যাকে দেহের রক্তক্ষরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভারত পুঁজিস্বল্প দেশে পরিণত হয়।

এই অংশে আমাদের পাঠে আমরা বৃটেনের অধীনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকরণের মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতিকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। আরও দেখব যে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটানো হয় কিন্তু শিল্পায়নের কাজ ততদূরই অগ্রসর হতে পারে যতদূর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় থাকে। এই প্রসঙ্গে অস্কার ল্যাংগে বলেন, "অনুন্নত দেশগুলো হয়ে দাঁড়ায় একপেশেভাবে কাঁচামাল এবং খাদ্য রপ্তানিকারির অর্থনীতি। এইসব দেশে বিদেশি পুঁজির দৌলতে যে মুনাফা হত তার সেখানে পুনর্বিনিয়োগ ঘটত না, পাঠিয়ে দেওয়া হত সেই সব দেশে যেখান থেকে পুঁজি আসত।"

৪.২.১.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘরানা

ভারতে দুশো বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যে অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তার সঠিক প্রেক্ষিত তুলে ধরা দরকার। এর জন্য প্রথমেই আমরা যে বিভিন্ন ঘরানায় সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় তা সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি।

ইংলন্ডের লেবার পার্টির একজন বুদ্ধিজীবী জন হব্সন্ Imperialism নামক বইতে (১৯০২) যে সাম্রাজ্যবাদের ধারণার ব্যাখ্যা দেন তাতে বলা হয় উন্নত পুঁজিবাদি দেশে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বন্টনে বৈষম্য বাড়ে। সংখ্যায় বেশি হলেও শ্রমজীবী মানুষের আয় কম হয় আর উচ্চবিত্তদের আয় বেশি অথচ উচ্চবিত্তরা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে তার ওপর খুব বেশি অনুপাতে ভোগ করে না। উন্নত দেশে ধনী ব্যক্তিদের এই স্বল্পভোগ সমস্যা পণ্য উৎপাদনের সমস্যা তৈরি করে, দেশে পণ্যের বাজার না পাওয়ায় তাদের নজর দিতে হয় অন্যদেশে যেখানে বাজার পায়। অনগ্রসর দেশগুলোতে বাজার দখলের লড়াই শুরু হয়। ভোগস্বল্পতা এবং সঙ্গে সঞ্চয় প্রাচুর্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে উপনিবেশ গড়তে হয় কারণ দেশের বাজার সীমাবদ্ধ থাকায় সেখানে বিনিয়োগের সুযোগও সংকুচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিলফার্ডিং (১৯১০), লুকসেমবুর্গ (১৯১৩) এবং বলশেভিক রাশিয়ার রূপকার লেনিনের (১৯১৬) বই তিনটি প্রকাশিত হয়। এদের নাম যথাক্রমে Finance Imperialism, Accumulation of Capital এবং Imperialism– The Highest Stage of Capitalism. উল্লেখযোগ্য যে এই তিনজনই সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করেন। এঁদের ঘরানা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের উৎস নিহিত থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই। একে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করা হয়। এই ঘরানা অনুযায়ী ইউরোপের অতিরিক্ত পুঁজি উপনিবেশে বিনিয়োগ করার তাগিদ দেখা যায়। তাছাড়া নিজেদের পণ্য বিক্রি করার তাগিদেই উপনিবেশ সৃষ্টি করা দরকার হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পুঁজিকে কেন্দ্র করে স্বার্থের সংঘাত দেখা যায়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার লগ্নী পুঁজির আগ্রাসী চরিত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংযুক্তিকরণ ও সংবন্ধনে সাহায্য করে। দুনিয়া ব্যাপী একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বের তাগিদ প্রতিফলিত হয় এই ঘরানার সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বে।

দাদাভাই নওরোজির মত ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষদের দারিদ্র্য, দেশের শিল্পের ধ্বংসসাধন (অবশিল্পায়ন), সম্পদ নির্গমন প্রভৃতি অর্থনৈতিক দৈন্যদশার প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যায় পশ্চাদপদ দেশের অনগ্রসরতা এবং দেশের মানুষের দারিদ্র্যের মত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরেন। রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কের দিকটায় এঁরা তেমন আগ্রহী ছিলেন না। বরং ইংরেজদের শাসন ভারতের মত দেশে যে অনেক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে সেটাই তাঁরা স্বীকার করেন।

জর্জ চেস্‌লি, রিচার্ড স্ট্রেচি এবং পরবর্তীকালে থিয়ডর মরিসন, ভেরা এনস্টি, পর্সিভল গ্রিভিয়সের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসকরা মনে করেন যে পশ্চাদপদ দেশের স্বার্থেই ঐতিহাসিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর জন্য তারা ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে এক 'জাড্যের' কথা বলেন। স্বনির্ভর বিচ্ছিন্ন ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে উন্নয়নের উদ্দীপনাটি ছিল খুব দুর্বল। উদ্যোক্তা সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতিতে এই ধরনের অর্থনীতি পুঁজিবাদের যাদুর স্পর্শ পায়নি। এদের মতে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় অনন্তকাল ধরে গতিহীনতা বা অচলায়তন সৃষ্টি হয়। সুতরাং উন্নতির তাপ

ভেতর থেকে সৃষ্টি হত না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় এই তাপ সৃষ্টি করে দেশকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে, ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, উন্নত প্রশাসন চালু হয়েছে। সিলির মত ঐতিহাসিকরা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন যে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন একটা ঘটনাচক্র। বৃটিশরা বাণিজ্য করতে এসে ক্ষমতার বিড়ম্বনায় জড়িয়ে গেছে। কেইন্‌সের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখাবার চেষ্টা করেন যে ভারত থেকে বৃটেনে যত সম্পদ নির্গমিত হয়েছে তার থেকে বিপরীত মুখি নির্গমন ঘটেছে বেশি।

৪.২.১.৩ ঃ বৃটিশ সওদাগরদের প্রাধান্য বিস্তার

ভারতে বৃটিশ শাসনের পত্তন তাদের দীর্ঘদিনের লড়াই-এর ফসল। প্রাক্ শিল্প বিপ্লব কালে প্রথমে বৃটিশ সওদাগররা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই-এ লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে তাদের দেশে শিল্প বিপ্লব আগে ঘটার সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা ভারতে পুঁজিবাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় নৌপথে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। বাণিজ্য প্রাধান্যের কাছে ভারতের শাসকবর্গ নতি স্বীকার করে। চুক্তি অনুযায়ী আকবর বাদশাহেরও পর্তুগীজ বেনিয়াদের অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে বাণিজ্য করার ক্ষমতা ছিল না। ১৫৪৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী সমুদ্রপথে ভারতসহ সব সওদাগরদের পর্তুগীজের রাজার অনুমতি নিয়ে বাণিজ্য করতে হত। এক বছর ধরে পর্তুগীজদের অধীনে ভারতের সওদাগররাও ব্যবসা করে। পর্তুগীজ বেনিয়া ও ভারতের সওদাগরদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধন সৃষ্টি হয়। পর্তুগীজরাই বাণিজ্যে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে থাকে।

পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ইংরেজ ঐতিহাসিক হন্ডেন ফারবার দেখান যে ১৬৪১ সালে পর্তুগীজদের হটিয়ে ওলন্দাজরা নিষ্ঠুর পথ গ্রহণ করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরেজরা গুজরাটসহ সমস্ত ভারতীয় বণিকদের তাদের অনুগত থাকতে বাধ্য করে।

৪.২.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারত

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। এরপর ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী গ্রহণের পর ইংরেজরা ভারতে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা পায়। সেই রাজস্বের সাহায্যেই নিজেদের ব্যবসা চালু রাখে। অর্থাৎ মাছের তেলে মাছ ভাজার নীতি চালু হয়। আর এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ বিদেশে পাচার হত। অর্থাৎ শুরু হয় সম্পদ চালান যাকে দাদাভাই নওরোজি পরবর্তীকালে নির্গমন (drain) বলে উল্লেখ করেন। ভারত দিনে দিনে পুঁজিস্বল্প দেশে পরিণত হয় আর ভারতের পুঁজিতে বৃটেনে পুঁজিগঠনের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ রাজতন্ত্রের শাসন চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতকে কৃষিতে বিশেষায়ন ঘটাতে বাধ্য করা হয়। ভারতের হস্ত ও কুটির শিল্প যা মোঘল আমলের শেষে স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল তার ওপর নেমে আসে অপঘাত। ১৮১৩ সালে চার্টার আইন বলবৎ হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু করে বৃটেন থেকে উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে আসা হয়। ভারতের হস্ত ও কুটির শিল্পের

ওপর নানা ধরনের কর চাপানো হয়। ভারতে বৃটিশ পণ্য খুব সামান্য বা বিনাশুল্কে প্রবেশ করে। ভারত থেকে অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির ব্যবস্থা হয়। রিকার্ডোর আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতির ওপর ভিত্তি করে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু হয়। উল্লেখযোগ্য যে সাম্রাজ্যবাদীদের এই অবাধ নীতি শুধু তাদের স্বার্থেই অবাধ ছিল। ভারত নিজের ইচ্ছেমত অবাধে তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারত না। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে এই অসম নীতি চালু থাকে। ঔপনিবেশিকরনের কাজ সম্পূর্ণ হয় ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে। রেলপথ যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে তা বৃটিশদের একতরফা ব্যবসায় সুবিধা করে দেয়। রেলপথে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচামাল যেমন ইংলন্ডে রপ্তানি হয় তেমনি সেখানকার শিল্পদ্রব্য ভারতে অবাধে আসে রেলপথে। আর দেখা যায় যে রেলের মাশুলে একতরফা ভাবে বৃটিশদের আমদানি করা দ্রব্য এবং রপ্তানি দ্রব্য সুবিধা পায়। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীন লেনদেনে সেই সুযোগ পাওয়া যায় না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের মাধ্যমে যে উপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার সুত্রপাত করে তা শিল্পবিপ্লবের পর বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পরিণতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ নীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপযোগিতাবাদী দর্শন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতে ধ্রুপদী অর্থনীতি প্রয়োগের তাগিদ অনুভব করে বৃটিশ প্রশাসন। ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও ধ্রুপদী অর্থনীতির দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। নতুন শতকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে বেনিয়া পুঁজির জায়গা দখল করে শিল্পপুঁজি। ভারতকে শুধু ব্যবসার মৃগয়া ক্ষেত্র হিসাবে পণ্যের উপর দখলদারী নয়, বাজারের ওপর দখলদারীও হয়ে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য। ভারতের ওপর বৃটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ

“সম্প্রতি বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে.....। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন কাণ্ড ঘটিয়াছে। তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব। এত বড় প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। ইউরোপের এই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।”

৪.২.১.৫ ঃ পুঁজির প্রবাহ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের জন্য দরকার পুঁজির। একটা স্বাধীন দেশে এই পুঁজি আসে দেশের অভ্যন্তর থেকে, যাকে দেশীয় পুঁজি বলা হয়। ভারতে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প এবং কৃষি থেকে এই পুঁজি প্রবাহের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনা লোপ পায়। প্রয়োজন হয় বিদেশী পুঁজির। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদেশী পুঁজির প্রবাহ ঘটে।

ভারতে কৃষি ও বাণিজ্য থেকে খুব মন্থর গতিতে হলেও সীমিত পুঁজির বিকাশ ঘটে। বাংলা দেশের গন্ধ বণিক, সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়, দক্ষিণ ভারতের চেট্টী সম্প্রদায়, তামিল-মুসলিম সম্প্রদায়, কেরালায় মোপলা নামে এক বেনিয়া মুসলমান গোষ্ঠী, কোঙ্কোন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, গুজরাটী বেনিয়া ও পার্সী সম্প্রদায় এবং রাজস্থান প্রদেশের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটায়। পরবর্তীকালে এরাই পর্তুগাল, ব্রিটেন, ওলন্দাজদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিভিন্ন শিল্পে পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। চা, পাট, কফি প্রভৃতি শিল্পে এরা ইংরেজদের সঙ্গে আংশিক ভাবে হলেও পুঁজি বিনিয়োগ

করে। ব্রিটিশ আমলে গুজরাটী, পার্সী ও অন্যান্য সম্প্রদায় বস্ত্রশিল্প ও লৌহ ইস্পাত শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশীয় পুঁজির একটা ভূমিকা থাকলেও পরবর্তীকালে বৃহদায়তন শিল্পে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম হয়। কলকাতা কোর্টের একটা হিসেবে দেখা যায় ১৮০৫-১৮২৬ সালের মধ্যে মোট জাহাজের টনেজে ভারতীয় বণিকদের ভাতা ছিল মাত্র ৫%--১০%। ১৯৩০ সালে দেখা যায় যে মাত্র ৬টি ইংরেজ এজেন্সি মোট রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজের টনেজের ৬৫% মালিক হয়ে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলশিল্প সহ, পাট, চা, কফি প্রভৃতি শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে। কিন্তু দেখা যায় ভারতের মত উপনিবেশে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ছিল সীমিত। সারা পৃথিবীতে যত ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে তার মধ্যে এশিয়ায় ছিল ১৪%। এর মধ্যে ব্রিটিশদের উপনিবেশে তার প্রবাহ ছিল ৪০%। লেলাণ্ড জেংকস্ ভারতের ব্রিটিশ পুঁজির যে অনুপ্রবেশ ঘটে তার একটা হিসাব দেন। তাঁর হিসাবে দেখা যায় ১৮৫৪-১৮৫৯ সালের মধ্যে যখন ভারতে রেল লাইন পাতার কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে তখন ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড এর বিনিয়োগ ঘটে। এর প্রায় অর্ধেক বিনিয়োজিত হয় রেলে। একটা অপরিচিত সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতে ৪৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের অনুপ্রবেশ ঘটে। জর্জ পাইসের একটা হিসাবে দেখানো হয় যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ১৯১০ সাল পর্যন্ত ৩৬৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। ১৯১১ সালে এম.এফ. হার্ডওয়ার্ডের হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫০ মিলিয়ন পাউন্ড।

পাইস তাঁর গবেষণায় দেখান যে, যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছে সেই সব ক্ষেত্রগুলির সাথে ভারতের অর্থনীতির তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রায় অর্ধেক পুঁজি এসেছিল ভারতে ঋণ হিসাবে। চা-বাগিচা ইত্যাদিতে ৭ শতাংশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে। কয়লা ও পেট্রোলের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মাত্র ২ শতাংশ বিনিয়োগ ঘটে। বয়ন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটেনি।

উপরোক্ত হিসাবে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ গেছে। ভারতে ব্রিটিশদের অর্জিত আয় যা বিদেশীদের মালিকানাধীন কোম্পানীতে বিনিয়োজিত নয় তা ধরা হয়নি। ব্যক্তিগত স্তরে ইংরেজদের কোম্পানীর শেয়ারে যে টাকা খেটেছে তা ধরা হয়নি। সুতরাং ওপরে যে হিসেব দেওয়া হয় তার থেকে বেশি বিদেশী পুঁজির প্রবাহ ঘটে। তাও এই পুঁজি যৎসামান্য, আমেরিকা বা কানাডায় ইংরেজরা যে পুঁজি খাটিয়েছে তার তুলনায় খুবই কম।

৪.২.১.৬ ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন (Balance of Payments and Drain of Wealth)

৪.২.১.৬.১ ঃ লেনদেন হিসাব ও সম্পদ নির্গমন

দুটি দেশের মধ্যে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদ্রব্যের লেনদেন হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে এই লেনদেন থেকে দুটি দেশের মধ্যে দেনা ও পাওনার উদ্ভব ঘটে। দুটি খাতে এই দেনা ও পাওনার হিসাব রাখা হয়— একটা হল চলতি খাতে আরেকটা হল মূলধন খাতে। কোনো দেশে কোন বছরে চলতি খাতে উদ্বৃত্তের বা ঘাটতির উদ্ভব ঘটলে বিদেশী মুদ্রা, সোনা এবং ঋণের মাধ্যমে এই ঘাটতি মেটানো হয়। ফলে সামগ্রিক লেনদেন সব সময় সমতায় বিরাজ করে।

চলতি খাতকে আবার দৃশ্য আমদানি রপ্তানি এবং অদৃশ্য আমদানি রপ্তানি খাতে ভাগ করে দেনা পাওনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া চলতি খাতে থাকে একতরফা হস্তান্তরিত দ্রব্য ও সেবা। যেমন উপহার দ্রব্য।

ভারতে বৃটিশ আমলে যে লেনদেন হত তাতে বাণিজ্য খাতে (ভৌতিক দ্রব্য) উদ্বৃত্ত বজায় থাকত। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত থেকে ভারত কোন প্রতিদান পেত না। বিভিন্ন ভাবে অদৃশ্য খাতে (যেমন বিদেশীদের শাসনখরচ বা তাদের দেশে তাদের খরচ যাকে ঘরোয়া খরচ বা (Home Charge) বলে বিদেশিদের পাওনা দেখিয়ে এবং প্রয়োজনে মূলধন খাতে দায় সৃষ্টি করে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পাওনা অস্বীকার করা হত। একে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন বলেন। বিভিন্ন উৎস ধরে ভারতের বৃটিশদের প্রতি এই দায়ের উদ্ভব ঘটানো হত। এমন কি বৃটিশরা অন্য কোথাও যুদ্ধ করলেও তার খরচকে ভারতের দায় বলে চাপানো হত।

আমরা ভারত থেকে এই সম্পদ নির্গমন ও তার প্রভাবের ওপর আলোচনা করব।

৪.২.১.৬.২ ঃ সম্পদ নির্গমনের পর্যায় ও ধারা

দাদাভাই নওরোজীর মত উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা দুশো বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বে ঔপনিবেশিক ভারত থেকে যে সম্পদের নির্গমন ঘটানো হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। দাদাভাই নওরোজীর Poverty and Un-British Rule in India, ডিগ্‌রির Prosperous British India এবং রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History of India নামক বইগুলো প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলোতে নির্গমন তত্ত্বের ওপর বিশদ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে ভারতে অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী ছিল বিবেকহীন এই নিষ্ঠুর অব্যাহত নির্গমন। কর্নওয়ালিশ, শোর প্রমুখ ইংরেজ কর্তাব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীরাও এই নির্গমনের ঘটনার নিন্দা করেন। তবে থিওডোর মরিসনের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা সম্পদ নির্গমনের ঘটনা স্বীকার করলেও এর সবটাই অনুৎপাদনশীল এবং ভারতের স্বার্থ বিরোধী তা মনে করেন না।

পলাশীযুদ্ধের পর এক নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি সমাজের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো তার মোটা অংশ উপঢৌকন হিসাবে বৃটেনে পাঠানো হতো। এই রাজস্ব থেকে প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে ‘মুনাফা’ বলে চিহ্নিত করে একে বৈধতা দান করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই রাজস্বের টাকা থেকে ব্যবসা শুরু করে। তাদের লাভের বড় অংশ বৃটেনে চালান হতো, ভারতে তার পুনর্বিনিয়োগ ঘটত না। ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের টাকায় পণ্য কিনে তা রপ্তানি করত। এর থেকে মুনাফা হত। অর্থাৎ ভারতে আদায়ীকৃত রাজস্বই মুনাফার উৎস ছিল। ব্যবসায়ের জন্য যে দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হত তার প্রতিদান ভারত পেত না। প্রথম পর্যায়ের এই সম্পদ চালানকে নির্গমন বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া ভারতে কর্মরত ইংরেজরা তাদের আয় বিদেশে পাঠাতো। এখানে কর্মরত অবস্থায় যে দক্ষতা তৈরী হত তা ছিল ভারতে সৃষ্ট মূলধন। দেশের লোক প্রশাসনে থাকলে এই সৃষ্ট মানবিক মূলধন পরের প্রজন্মের কাজে লাগত। কিন্তু ইংরেজরাই প্রধানত প্রশাসনের কাজে থাকত এবং তারা অবসরের পর দেশে ফিরে যেত। এক্ষেত্রে যে মানবিক মূলধনের নির্গমন ঘটত তাকে নওরোজি নৈতিক নির্গমন বলেন। নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের অর্থনীতিতে যে দুর্যোগ দেখা যায় তাকে প্রণামী দশা বা ‘করদশা’ বলে।

১৮১৩ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই পর্যায় চলে। পিটের ভারত আইন অনুযায়ী ভারতে বৃটিশ শিল্পগোষ্ঠীর শাসনের সূত্রপাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়া স্বার্থের জায়গা

নিতে শুরু করে শিল্পপুঁজির স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সরে আসে পণ্যের ওপর দখল থেকে বাজার দখলের ওপর।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুষ্ঠানিক পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবাধ বাণিজ্য নীতি বৃটিশ পণ্যের যেমন অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দেয় তেমনি ভারত থেকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রবাহ বাড়ে। একই সঙ্গে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতে সস্তা বৃটিশ পণ্য বিশেষ করে সূতী পণ্যের বিক্রি বাড়ে। তবে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি মার খায়। ফলে সরকারের রাজস্ব কমে। এছাড়া বৃটিশরা ভারতে যে বিশাল বাজারের আশা করেছিল তাও পায় না। কারণ ভারতে ক্রয়ক্ষমতা কম থাকায় পণ্যের চাহিদা ছিল সীমিত। ভারতে আর্থিক মন্দার দরুন কর রাজস্ব ভীষণভাবে কমে যায়। কর রাজস্ব কমে যাওয়ায় আফিম করের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা বাড়ে। আফিম কর বিস্তারের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হয়। দাদনব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে কৃষককে আফিমের চাষে বাধ্য করা হয়। আফিমের বাজার বাড়াবার জন্য চীনের জনগণের ওপর আফিমের নেশা চাপিয়ে দেওয়াই ছিল বৃটিশ নীতি। আর এর থেকে প্রাপ্য বিশাল পরিমাণ করই হল 'প্রণামী'র বড় উৎস যা নির্গমন হিসাবে চালান হত বৃটেনে। ভারতের এই অবস্থাকে 'আফিম দশা' বলা হয়। নির্গমনকে অব্যাহত রাখল এই 'আফিম দশা'।

ভারতের ওপর শিল্প পুঁজির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে অবশিল্পায়ন ঘটে। ভারত যে পর্যায়ে প্রবেশ করে তাকে বাণিজ্য দশা বলা হয়। ভারতের বাজার বিদেশের কবলে চলে যায়। ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটায় বলে মনে করা হয়। ভারত থেকে খাদ্য ও কাঁচামালের রপ্তানি বাড়ে। ভারত বিদেশ থেকে শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। রপ্তানি মূল্য আমদানি মূল্য থেকে বেশি হওয়ায় রপ্তানি উদ্বৃত্ত বাবদ ভারতের পাওনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই পাওনা রয়ে যায় অদেয়। এর বিনিময়ে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বস্তুগত কোন প্রতিদান ভারত পায় না। এই অদেয় প্রাপ্যকেই জাতীয়তাবাদী নেতারা সম্পদ নিঃসরণ বা নির্গমন বলেন। বাণিজ্য উদ্বৃত্তের ফলে ভারতে সোনার আমদানি বাড়ে। দাদাভাই -এর হিসাব ধরলে দেখা যায় ১৮০১-১৮৬৩ সালের মধ্যে ভারতে নিট সোনার আমদানির পরিমাণ ছিল ২৩,৪৩৫ কোটি পাউন্ড। এই সময় আমদানির পরিমাণ খুব কম ছিল। ১৮৬৪ সালের পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ভারতে রপ্তানি উদ্বৃত্ত বাড়িয়ে সোনার আমদানি বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু সোনার এই আমদানিতে ভারতে সোনার (ও রূপার) মজুত বাড়তে পারেনি। একই সঙ্গে ভারতে মুদ্রার প্রচলন বাড়ে ২৮.৬ কোটি পাউন্ড। অর্থাৎ, সোনার আমদানি ভারতে মূলধন সঞ্চয় ঘটিয়েছে তা বলা যায় না। বরং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অদেয় থেকে যাওয়ায় সম্পদ নির্গমন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।

ভারত থেকে যে সম্পদের নির্গমন ঘটতো তার অন্তর্ভুক্ত ছিল এখানে যে ইংরেজ প্রশাসক, কর্মচারী, সামরিক বাহিনী, রেলের কর্মচারীদের বেতন, সঞ্চয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা তাদের দেশে পাঠানো হত। এই প্রেক্ষিতে দাদাভাই -এর মত জাতীয়তাবাদী নেতারা দাবী করতেন যে ভারতে ভারতবাসীদের উপরোক্ত সব ক্ষেত্রে নিয়োগ করা দরকার। তাহলে দেশের টাকা দেশেই থাকে। এখানে যেমন কর্মসংস্থান ঘটে তেমনি সঞ্চিত সম্পদ দেশের পুঁজি হিসাবে কাজ করতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতে সম্পদ নির্গমনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল ঘরোয়া খরচ বা Home Charge. ভারতের সঙ্গে যুক্ত ইংল্যান্ডে বসবাসকারী সামরিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের খরচ, সেখান থেকে যে সব দ্রব্য ভারতে পাঠানো হত তার দাম, ইংল্যান্ডে অবস্থিত সেক্রেটারি অব স্টেট্ এর প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সব কিছুই

ঘরোয়া খরচ বলে বিবেচিত হয়। এগুলো ভারতের লেনদেন হিসাবে দেনার তালিকায় দেখানো হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই খরচ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হত তার সঙ্গে এই দেনা দেখিয়ে ভারতের পাওনা অদেয় রেখে দেওয়া হত। উল্লেখযোগ্য যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত যত বেশি হয় তত ঘরোয়া খরচ বেশি দেখিয়ে অদেয় রেখে দেওয়া হয়। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বেশি হলে সম্পদ নির্গমন বাড়ত। অর্থাৎ ভারতের ন্যায্য পাওনা অস্বীকার করার এ এক যন্ত্র। ঘরোয়া খরচের যাদুমন্ত্রে ভারতের পাওনা হারিয়ে যেত।

৪.২.১.৬.৩ ঃ নির্গমনের হিসাব

আমরা দেখলাম যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সমপরিমাণ প্রতিদান না থাকায় ভারতের প্রাপ্য যা অদেয় থেকে যায় তাকে নির্গমন বলা হয়। বাণিজ্য লেনদেনের হিসাব থেকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নির্ধারণ করতে পারলে নির্গমনের হিসাব পাওয়া যায়। অনেকে একে এক সরলিকৃত হিসাব বলে মনে করেন যা বাণিজ্য লেনদেনের বিভিন্ন হিসাবের জটিলতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। দাদাভাই নওরোজি আবার এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সঙ্গে রপ্তানি থেকে প্রাপ্য মুনাফাকে সম্পদ নির্গমন বলে বিবেচনা করেন। সমালোচনার উত্তরে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ইংরেজদের আমদানি ও রপ্তানি মূল্যের মধ্যে একটা গরমিল আছে। সেটা ধরলে নির্গমনের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এই গরমিলটা হল এই যে ভারতের রপ্তানি পণ্যের দাম রপ্তানিকারক দেশের বন্দর দামে ধরা হয়। ফলে আমদানি করা দ্রব্যের দাম বেশি করে দেখানো হয় আর রপ্তানি করা দ্রব্যের দাম বেশি করে দেখানো হয়। দাদাভাই নির্গমনের যে হিসাব দেন তা নিচের সারণীতে দেখানো হল ঃ

ভারত থেকে নির্গমনের হিসাব

সময়কাল	বাৎসরিক গড় (পাউন্ড)
১৮৩৫-'৩৯	৫,৩৪৭,০০০
১৮৪০-'৪৪	৫,৯৩০,০০০
১৮৪৫-'৪৯	৭,৭৫০,০০০
১৮৫০-'৫৪	৭,৪৫৮,০০০
১৮৬০-'৬৪	১৭,৩০০,০০০
১৮৬৫-'৬৯	২৪,৬০০,০০০
১৮৭০-'৭২	২৭,৪০০,০০০

ওপরের হিসাবের মধ্যে রেল কোম্পানীকে দেওয়া গ্যারেন্টি বাবদ সুদও ধরা হয়েছে। অনেকে রেলের জন্য দেয় সুদকে নির্গমন বলে মানতে চান না কারণ রেল ভারতে সম্পদ সৃষ্টি করে। এর জন্য খুব কম হারে সুদ ধার্য হয় যা যে কোন দেশকে বিনিয়োগের স্বার্থে দিতে হয়। ১৮৮৩-৯৩-এর মধ্যে দশ বছরে নির্গমন ছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। এর থেকে রেলের জন্য ঋণের ওপর সুদের অংশ বাদ দিলে তা দাঁড়ায় ২৮৮ কোটি টাকা বলে দাদাভাই দেখান। ওপরের আলোচনায় দেখা যায় যে পরিমাপের পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলেও ভারত থেকে সম্পদের যে নির্গমন ঘটত তা সত্যি। পরের দিকে ঘরোয়া খরচ বা হোমচার্জের খুব বৃদ্ধি ঘটে। ১৮৬১-৬২ সাল থেকে ১৮৭৪-৭৫ সালের মধ্যে ঘরোয়া খরচ ছিল ১০.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

৪.২.১.৬.৪ ঃ নির্গমন তত্ত্বের সমালোচনা

দেখা যায় যে ইংরেজ সমালোচকরাও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমনের ঘটনা স্বীকার করেন। তবে এই নির্গমন অনৈতিক এবং সবটাই বৃটিশ স্বার্থ সিদ্ধি করেছে তা মনে করেন না থিওডোর মরিসনের মত ইংরেজ সমালোচকরা। এল.সি.এ. নোল্স্ বা ভেরা এন্স্টে-ও মরিসনকে সমর্থন করেন। মরিসন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঋণের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে ভারতের মত পশ্চাদপদ দেশকে আধুনিক করতে বিনিয়োগের দরকার হয়। এই বিনিয়োগ আসে ঋণ থেকে। একে অনুৎপাদনশীল ঋণ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে উন্নত করতে, ভারতকে একটা 'উন্নত সরকার' উপহার দিতে ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এটা রাজনৈতিক অর্থে খরচ হলেও ভারতের স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং, একে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে বাতিল করা যায় না। তবে ভেরা এন্স্টে এই রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ আরও কমানো দরকার ছিল বলে মনে করেন। মরিসন মনে করেন যে ভারত বৃটেন থেকে কম সুদে ঋণ পেয়েছে। এটা বরং বৃটেনের দিক থেকে ভারতের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। জে. এম. কেইন্স আরও একধাপ এগিয়ে বলেন যে ভারত থেকে সম্পদের নির্গমনতো ঘটেইনি বরং বৃটেন থেকে ভারতে নির্গমন ঘটেছে যাকে তিনি বিপরীতমুখী নির্গমন বলেন।

সমালোচকদের মতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্রা আবেগের তাড়নায় নির্গমন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। একে অনেকটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে।

৪.২.১.৬.৫ ঃ নির্গমনের ফলাফল

ভারতের অর্থনীতির ওপর সম্পদ নির্গমনের এক বিরূপ প্রক্রিয়া কাজ করত যা অর্থনীতির উদ্দীপককে কাজ করতে দিত না। এই সম্পদ নির্গমন একদিকে দেশের পুঁজিগঠনের কাজকে প্রতিহত করে অনুন্নোয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখত অন্যদিকে নির্গমন ভারতের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য তীব্রতর করে চাহিদার অভাব ঘটাতো। চাহিদার অভাবে অর্থনীতির উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যেত। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্রা ভারতের অর্থনীতির ওপর সম্পদের এই বিরূপ প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেন। দাদাভাই নওরোজি ও রমেশ দত্তের মত অর্থনীতিবিদ্রা মনে করতেন যে ভারতের দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের কারণ ছিল সম্পদ নির্গমন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইংল্যান্ড থেকে বিদেশে যদি এই নির্গমন ঘটত তবে ইংল্যান্ড ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হত যা ইংল্যান্ডবাসীকে ত্রাস করত। তিনি তাঁর বই-এর মুখবন্ধে বলেন যে নির্গমিত এই সম্পদ ইংল্যান্ডের মাটিতে যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিল তাতে ইংল্যান্ডের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছিল। আর শুষে নিয়েছিল ভারতের মাটির আর্দ্রতা। ভারতকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। প্রকৃত সম্পদের নির্গমন তিনভাবে ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করত।

প্রথমতঃ রপ্তানির উচ্চ হার বজায় রাখার জন্য জোর করে বাণিজ্যিকীকরণ ঘটানো হয়। কৃষককে বাণিজ্য শস্য উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। এর সুফল পেত বিদেশী ব্যবসায়ী ও দেশি দালালরা। কৃষকরা দাম পেত না। তাছাড়া নগদ শস্য বাড়াবার তাগিদে জোয়ার ও বাজরার মত নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। এই শস্য ভোগ করত গরিব মানুষরা। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত।

দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি বৃদ্ধির চাপে দেশের অভ্যন্তরে ফসলের দাম খুব বেড়ে যায়। অকৃষি পণ্যের তুলনায় কৃষি পণ্যের দাম বেশি হারে বাড়ে।

তৃতীয়তঃ নির্গমনের তাগিদে রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে দেশীয় অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত বন্টনের ধরন এবং উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর ধরনে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনগুলি ঘটে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রপ্তানিজাত শস্য উৎপাদন করা বা জোর করে উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার ফলে। শুধু উৎপাদন নয় বিপনীকরনের ধাঁচেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশি ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায় বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব। দেশীয় ব্যবসায়ীরা কোনরকমে বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে টিকে থাকে। দাদন ব্যবস্থা আগেই চালু ছিল। তা আরও ব্যাপকতা ধারণ করে। গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরা আরও ঋণপুঁজির জালে জড়িয়ে যায়। তারা ফসলের দাম পায় না। দেশে ফসলের ধরনে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি আয় বন্টনে পরিবর্তন আসে। কৃষিতে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে যে আয় বৃদ্ধি ঘটে তা বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে বেশী আসে। নির্গমনের তাগিদে যা ঘটে তা আবার নির্গমনকে সাহায্য করে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে স্থায়িত্ব দিতে নির্গমন বিশেষ ভুমিকা পালন করে।

নির্গমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির ওপর যে ভয়াবহ প্রভাব দেখা যায় তার চিত্র ফুটে ওঠে ইংরেজ বুদ্ধিজীবী মন্টগোমারি মার্টিনের ১৮৩৮ সালের লেখায় যেখানে তিনি বলেনঃ

"অর্ধেক শতাব্দী ধরে আমরা বছরে বিশ থেকে ত্রিশ, কখনো বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ভারতবর্ষ থেকে নিকাশ করে নিয়ে চলেছি। অর্থ গ্রেট বৃটেনে পাঠানো হয়েছে ব্যবসায়িক ফাটকাবাজির ঘাটতি মেটাবার জন্য, ঋণ-সুদ দেবার জন্য, 'হোম এস্টাব্লিশমেন্ট' রাখার জন্য এবং যাঁরা হিন্দুস্থানে কাটিয়েছে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ ইংল্যান্ডের মাটিতে লগ্নীর জন্য। ভারতবর্ষের মত একটি সুদৃঢ় দেশ থেকে বছরে ত্রিশ বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ডের নিরন্তর নিকাশ যা কোনদিনই ফেরৎ যায়না— তার কুফল পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিতে সম্ভব বলে মনে করি না।"

৪.২.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৪.২.১.৭.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রানীতি

মোঘল আমলে দ্বি-ধাতু মুদ্রানীতি চালু ছিল। স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রার একই সঙ্গে প্রচলন ছিল। এছাড়া স্বাধীন রাজা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যার যার শীলমোহর ব্যবহার করে নিজেদের মুদ্রা চালু রাখত। দেখা যায় যে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন তাদের মধ্যেকার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে পারতো না। এর ফলে মুদ্রার কেনাবেচা ঘটতো। তৈরি হয়েছিল মুদ্রার এক ফাটকা বাজার। বিনিময় হারের ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন হারে মুদ্রা কেনাবেচা হত। ফাটকা কারবারিরা বিনিময় হারকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করে কেনাবেচা থেকে লাভ করতো। একে টাকা ব্যবহারের জুয়াখেলা বলা হয়।

৪.২.১.৭.২ ঃ রৌপ্যমানের প্রবর্তন

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮০৬ সালে দ্বি-ধাতু নীতি বর্জন করে রৌপ্য মুদ্রাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে ঘোষণা করে। বিভিন্ন মানের ও ওজনের রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকায় বিনিময় হার ওঠানামার সমস্যা মেটেনা এবং তা দূর করার জন্য ১৮৩৫ সালে একই গুণমানের মুদ্রা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। টাঁকশালে ১৮০ গ্রেন অর্থাৎ বারোভাগের এগারো ভাগ রুপো থাকবে বলে স্থির হয়। স্বর্ণমুদ্রা তৈরি বন্ধ করা হয় তবে সরকারি কোষাগারে বেশ কিছুদিন স্বর্ণমুদ্রা চালু রাখা হয়। কেউ স্বর্ণমুদ্রা জমা দিলে তাকে রৌপ্যমুদ্রায় দাম মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নতুন স্বর্ণমুদ্রা তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আইনত সঙ্গত মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণমুদ্রা আর চালু থাকে না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে সোনার দাম কমে। ভারতের রপ্তানি ও আমদানি ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রার প্রচলন বাড়াতে হয়। বহির্বাণিজ্যে যুক্ত ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়ে। এই অবস্থায় তিনটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আসে। প্রথমত, আবার দ্বি-ধাতু ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। রৌপ্যমুদ্রা চালু করে পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে স্বর্ণমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব আসে। দ্বিতীয়ত, কাগজি মুদ্রার প্রচলন করে তার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের হাতে রাখার কথা বলা হয়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটিয়ে ধাতুমুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার অভাব দূর করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বড়লাটের কার্যনির্বাহক পর্ষদের সদস্য মি. চালর্স উইলসন আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিতে কাগজি মুদ্রা পদ্ধতি চালু করার অনুমোদন দেন। তাঁর মৃত্যু ঘটায় স্যামুয়েল ইয়ং এই অনুমোদন কার্যকরী করেন। ইংল্যান্ডে তৎকালীন চলতি ব্যবস্থার অনুকরণে ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত মজুতবিহীন নোট প্রচলন ব্যবস্থা চালু হয়। সমমাত্রার রূপো বা সোনা মজুত রেখে এর বেশি নোট ছাপানো অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনমনীয় ব্যবস্থা হওয়ায় প্রয়োজনে মুদ্রার প্রচলন বাড়ানো যেত না। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য নোইং এর উত্তরাধিকারী চার্লস্ ট্রাভেলিয়ন ইংল্যান্ড ও আষ্ট্রেলিয়ায় তৈরি স্বর্ণমুদ্রাকে ভারতে বিহিত মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। এর বিনিময় হার ১পাঃ ১০টাঃ স্থির হয়। তৎকালীন ভারতের সচিব এই সুপারিশ নাকচ করে দেন। অবশ্য সরকারের দায় মেটাতে এই মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করা হয়। যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা মজুত থাকে তার সমমূল্যের কাগজি মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। রুপোর দাম কমে গেলে চলতি বিনিময় হারে সোনার বিনিময় হার কমে।

১৮৬৬ সালে ম্যানসফিল্ড কমিশন স্বর্ণমুদ্রার মান বাড়াতে সুপারিশ করায় তা বাড়িয়ে ১০.৫০ টাকা (১ পাউন্ডের বিনিময়ে) করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর বাজারে রূপোর দাম কম থাকায় এই বিনিময় হার বাস্তবে ধরে রাখা যাবে না এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা বর্জন করা হয়। আবার একধাতু ব্যবস্থা চালু হয়।

৪.২.১.৭.৩ ঃ রূপোর দাম হ্রাস ও মুদ্রানীতি নিয়ে বিতর্ক

আন্তর্জাতিক বাজারে রূপোর দাম হ্রাস পাওয়ায় স্বর্ণমানের স্টার্লিং এর তুলনায় রূপোভিত্তিক টাকার দাম কমতে থাকে। ১৮৭২ সালের রূপোর টাকার দাম ছিল ১ শিলিং ১০.৭ পেন্স। ১৮৯৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ শিলিং ২.৫ পেন্স। ভারতে টাকার অবমূল্যায়ন রোধ করার জন্য ইংরেজরা উদ্যোগী হয়। টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়াবার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্রা আন্দোলন শুরু করেন। এই বিতর্কটি তুলে ধরতে হলে মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাসের সম্ভাব্য প্রভাবটি আগে আলোচনা করে নিতে হয়।

রূপোর টাকার দাম কমে গেলে ভারতকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘরোয়া খরচের দায় মেটাতে বেশি পরিমাণ স্টার্লিং পাঠাতে হত কারণ স্বর্ণমূল্যের স্টারলিং পেতে ভারতকে বেশি রূপোর টাকা দিতে হত। ১৮৯৪-৯৫ সালে ভারতকে ঘরোয়া খরচ বাবদ দিতে হয়েছিল ২৮.৯ কোটি টাকা। ১৮৭২-৭৩ সালের বিনিময় হারে সমপরিমাণ ঘরোয়া খরচের দাম ছিল ১৬.৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতকে বেশি স্টারলিং পাঠাতে হয় সমপরিমাণ দায় মেটাতে। এর ফলে ভারতের রাজকোষ শূন্য হতে থাকে। এর থেকে রেহাই পাবার জন্য ভারত সরকারকে কর বাড়াতে হত। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর জনরোষের ভয়ে সরকার তা করতে পারেনি। সে টাকার দাম বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতারা খরচ কমিয়ে ঘরোয়া খরচের দায় মেটাবার জন্য চাপ দেয়। তাঁরা দেখান যে

টাকার দাম বাড়িয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা মানে চোরাপথে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা। কারণ টাকার দাম বাড়লে সাধারণ মানুষকে একই পরিমাণ কর দিতে বলা মানে তাকে বেশি কর দিতে বাধ্য করা। কারণ যে ১০০ টাকা সে কর দিত এখন তার দাম বেশি, সে সেই টাকায় বেশি দ্রব্য পায়। দাদাভাই নওরোজি দেখান যে টাঁকশাল বন্ধ করে দিয়ে তখনকার সোনার মূল্যে ১১ পেঃ টাকাকে ১৬ পেন্সে নিয়ে যাওয়া মানে গোপনে ভারতীয় করদাতাকে আরও প্রায় ৪৫ শতাংশ নতুন কর দিতে বাধ্য করা যদিও আপাতদৃষ্টিতে করের হার বাড়ে না। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা দেখানোর চেষ্টা করেন কিভাবে বৃটিশ শাসকদের এই অপচেষ্টা তাদের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতঃ

(ক) ইংরেজরা কোন অবস্থাতেই এমন নীতির সুপারিশ করত না যাতে নির্গমনের পরিমাণ কমে। সেই জন্য তারা ঘরোয়া খরচ কমানোর পথে যেতে রাজি ছিল না।

(খ) সরকারি কর্মচারীরা ছিল ইংরেজ। তাদের মাইনের টাকা তারা সোনায় দেশে পাঠাত্রে। রূপোর দাম কমে যাওয়া সমপরিমাণ রূপোর টাকায় কম পরিমাণ সোনা পাওয়া। তারা কম সোনা পাঠাতে পারত। এটা ইংরেজ সরকার মেনে নিত না। টাকার দাম বাড়িয়ে তারা ইংরেজদের এই লোকসান পূরণের চেষ্টা করে। তাতে ভারতীয়দের ক্ষতি হলেও তাদের কিছু এসে যেত না।

(গ) দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে ইংরেজরা লাভবান হত। টাকার দাম বাড়লে আমদানিজাত দ্রব্যের দাম কমে। ভারতীয় দ্রব্যের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে সুবিধা হত।

(ঘ) টাকার দাম কমলে আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে। ফলে দেশিয় পণ্য সুবিধা পায়। এটা ইংরেজদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অনেকে মনে করেন যে টাকার বিনিময় মূল্য কমলে বিদেশের বাজারে ভারতের রপ্তানিদ্রব্যের দাম কমে। ফলে ভারত লাভবান হত। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্রা উদাসীন ছিলেন বলে সমালোচনা করা হয়। বাস্তবে তা নয়। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্রা সবসময়ই বলেছেন যে রপ্তানি ভারতে ব্যবসায় কর্তৃত্ব করত ইংরেজরা। তাতে সেটা বিদেশে চালান হত। তাছাড়া ভারতে রপ্তানিদ্রব্যের চাহিদা ছিল অস্থিতিস্থাপক। তাই দাম কমলেও চাহিদা তেমন বাড়ত না। এই দুটি কারণে জাতীয়তাবাদী নেতারা টাকার দাম হ্রাসের অসুবিধার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেননি।

১৯১৩ সালে চেম্বারলিন কমিটি গঠিত হয় যার সদস্য ছিলেন জে. এম. কেইন্স। ভারতের স্বর্ণবিনিময় ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয় না কারণ এর ফলে রূপোর টাকা তৈরি করতে গেলে ভারত সরকারের লোকসান হত। ১৯১৯ সালে টাকার বিনিময়মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ২ শিলিং ৪ পেন্স।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ভারতের মুদ্রার বাজারে এক সংকট দেখা যায়। ভারতে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা কমে। এছাড়া যুদ্ধের খরচ মেটাতে ইংল্যান্ড থেকে টাকা পাঠানোর দরকার হয়। ইংল্যান্ডে স্বর্ণ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইংল্যান্ড ভারতের প্রাপ্য সোনা পাঠায়। ভারতে স্বল্প রূপোর যোগানের মুখে টাকা তৈরির জন্য রূপোর চাহিদা বাড়ে। যুদ্ধের বাজারে ভারতে টাকার বিনিময় মূল্য কমে। কাউন্সির বিলের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলে।

যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে মে মাসে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে রূপোর দাম চড়ে দাঁড়ায় পাউন্ড প্রতি ৫৮ পেন্স। ডলারের তুলনায় স্টার্লিং এর দাম কমায় তা রূপোর দাম বৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। রূপোর এই দাম বৃদ্ধির ফলে টাকার বাহ্যিক মূল্য (face value) তার ধাতু মূল্যে নীচে নেমে যায়। হিল্টন কমিশন মনে করে যে ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার ১ টাকা =১ শিলিং ৬ পেন্সে স্থির থাকা উচিত। স্বর্ণপিণ্ড মান সম্পর্কে নীতিগত বিরোধিতা না থাকলেও ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একে ১ টাকা =১ শিলিং ৪ পেন্সে স্থির রাখার পক্ষে মত দেন। শিল্পপতি পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের মতে প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই বিনিময় হার একটা প্রবণতা হিসাবে দেখা যায়।

১ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেন্সে বিনিয়োগ হার নির্ধারিত হওয়ায় বৃটেনের তুলনায় ভারতে সোনার দাম কম থাকে। এর ফলে সোনা দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা দেখা যাবে বলে মনে করা হয়। সোনার এই চালান ভারতবাসীর পক্ষে শুভ নয় বলে জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন। সাধারণ মানুষ অভাবে পড়ে সোনা বিক্রি করে কম দামে। এই সোনা বিক্রি হয়ে বিদেশে চলে গেলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংকোচন ঘটে। আর এর সুবিধা চালান হয় বিদেশে।

৪.২.১.৭.৪ ঃ স্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা

১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান বর্জন করলে ভারতেও নতুন নীতি অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া মন্দাকালীন অর্থনীতিতে স্বর্ণমুদ্রামান কার্যকরী নয় বলে প্রমাণ হয়। সরকার সরাসরি টাকার সঙ্গে স্টার্লিং এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। বিনিময় হার ১ টাকায় ১ শিঃ ৬ পেঃ স্থির রাখা হয়। ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা আবার পুনরায় বিশুদ্ধ স্টার্লিং বিনিময়ের রূপ পায়। এই ব্যবস্থাতেও বিনিময় হার বেশি থাকায় ভারতের বাজারে সোনার দাম বৃটিশ বাজারের তুলনায় কমে যায়। ফলে সোনার নির্গমন ঘটে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে দেশের মজুত সোনার থেকে প্রায় ৩০৬ কোটি আউন্স পর্যন্ত স্বর্ণ নিঃশেষিত হয়। স্বর্ণ-রপ্তানির মূল্য ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ভারত থেকে সোনার এই বাণিজ্যিক প্রবাহ ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার পতন ঘটায় বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে স্টার্লিং মজুতের ভিত্তিতে প্রচলিত টাকার যোগান বাড়ে ১৯৩৮-৩৯ সালে টাকার যোগান ২১০.৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৪৮-৪৯ সালে হয় ১২৫৩.৮৬ কোটি টাকা। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। ১৯৩৯ সালের ভিত্তিতে ১৯৪৩ সালে দাম সূচক দাঁড়ায় ২২০.১। ১৯৫০ সালে তা বেড়ে হয় ৩৯৫.৬।

৪.২.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রনেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agriculture at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.২.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ইংরেজ আমলে ভারতের অর্থনীতি কিভাবে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীভূত হয় তা আলোচনা কর।

(২) ভারতের শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা আলোচনা কর ।

(৩) সম্পদের নির্গমন বলতে কি বোঝায়? সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও ধারাটি আলোচনা কর।

(৪) সম্পদ নির্গমনের প্রভাব আলোচনা কর।

(৫) উপনিবেশিক ভারতে মুদ্রাসমস্যার প্রকৃতি আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

Railways and Indian Economy

একক - ১

(a) Economic and Political Compulsions

(b) Unification and subjugation of Indian market

(c) Effects on agrarian production and export of raw material — commercialization of agriculture

---

গঠন (Structure) ঃ

৫.৫.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৫.৫.১.১ ঃ ভূমিকা

৫.৫.১.২ ঃ ভারতে রেলপথের প্রবর্তন, বিস্তার এবং প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

৫.৫.১.৩ ঃ রেলপথ নির্মাণে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগে

৫.৫.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.৫.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৫.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি দুটি এককে বিভক্ত। প্রথম একককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার প্রবর্তন, এর উদ্দেশ্য এবং রেলপথের প্রসার।

(২) রেলপথ নির্মাণে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের কথা।

৫.৫.১.১ ঃ ভূমিকা

রজনীপাম দত্ত তাঁর ইণ্ডিয়া টুডে (India Today) গ্রন্থে উনবিংশ শতককে লগ্নী পুঁজির যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (১৯১৪-১৮) এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসক শ্রেণীর বৈষম্যমূলক নীতি, নানা ধরনের অসহযোগিতা এবং প্রযুক্তি ও পুঁজির অভাব হেতু তখন ভারতীয় শিল্পোদ্যোগী শ্রেণী অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট প্রণীত হলে ব্রিটিশ নাগরিকরা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অধিকার পায়। উদ্যোগী ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সুফলভোগী এই শ্রেণীর হাতে ছিল প্রচুর পুঁজি ; যা বিনিয়োগের জন্য তারা লাভজনক ক্ষেত্র সন্ধান করছিলেন। ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, সস্তা কাঁচামাল এবং সুলভ শ্রম এদের আকৃষ্ট করেছিল। এহেন অবস্থায় যে সব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা অর্থ বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে রেলপথ অন্যতম প্রধান। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সরদেশাই মনে করেন যে, "উনিশ শতকের মধ্যভাগে রেলপথ চালু হওয়ায় ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়েছিল।"

৫.৫.১.২ ঃ ভারতে রেলপথের প্রবর্তন, বিস্তার ও প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ভারতে রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসি-র শাসনকালে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। তাই ডালহৌসিকে 'ভারতীয় রেলপথের

জনক' বলা হয়। তিনিই প্রথম সমগ্র ভারতব্যাপী রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই Dalhousic Minute April, ১৮৫৩ বলা হয় "text book for all future railway Projects in India". তার শাসনকালে ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল কোম্পানী" সর্বপ্রথম বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত একুশ মাইল রেলপথ যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তার সমগ্র শাসনকালে ভারতে মোট ২০০ মাইল রেলপথের বিস্তার ঘটে। যেমন, রেল কোম্পানীকে তাঁর পুঁজি East India Company-র ট্রেজারীতে রাখতে হবে এবং তার অনুমোদন প্রয়োজন হবে ঐ পুঁজি কোথায় কিভাবে খরচ হবে তার সম্পর্কে। কোন পথ ধরে লাইন বসবে, অথবা যাত্রীভাড়া বা মালভাড়া কি হবে সবকিছুর অনুমোদন দেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। প্রত্যেক রেল বোর্ডে একজন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকবে যার কোম্পানীর কোন সিদ্ধান্তে veto দানের অধিকার থাকবে। সাধারণভাবে ২৫ বা ৫০ বছর পরে রেলের মালিকানা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিয়ে নিতে পারবে, এমনকি বিশেষ অবস্থায় রেল কোম্পানী নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ না করলে যে কোন সময় শুধু তিন মাসের নোটিশ দিয়ে তার মালিকানা নেবার অধিকার থাকবে। ৯৯ বছর পরে স্বাভাবিক নিয়মেই সকল রেল সম্পদ কোন রকমের ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে ভারত সরকারের অধীনে চলে আসবে। বস্তুত ভারত সরকারের রেল-কোম্পানীগুলির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের এই প্রচেষ্টা ছিল বৃথা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — বলা হয়েছিল বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে রেলকোম্পানী অসুবিধা বোধ করলে তার উদ্যোগ গুটিয়ে নিতে পারবে এবং সে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবারও অধিকারী হবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রেলপথ অধিগ্রহণের বিষয়টি মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

ভারতে রেলপথের প্রবর্তন কার্ল মার্কসের মত অনেকের দৃষ্টিতে আধুনিকতার বার্তা বহন করে নিয়ে এলেও এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পথকে প্রশস্ত করলেও সমকালীন অনেক বুদ্ধিজীবিই রেলপথের প্রসারকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। দাদাভাই নরৌজী, দিনশাহ ওয়াচা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি. ভি. যোশী-র মত অনেকেই রেলপথ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির মিনিট থেকেই তা' স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, "England is calling aloud for the Cotton which India does already produce in some degree, and would produce sufficient in quality and plentiful in quantity, if only there were provided the fitting means of conveyance for it for distant plains to the several ports adopted for its shipment." ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ থেকে কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করা এবং শিল্পজাত সামগ্রী উপনিবেশের বাজারে বিক্রী করা। সুতরাং অল্প খরচে ও সময়ে যাতে

ভারতের কাঁচামাল ও খাদ্য সামগ্রী কোলকাতা, বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজ বন্দর মারফত ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী করা যায়, তার জন্য এই বন্দরগুলিকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী এলাকার সঙ্গে রেলপথে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আবার ঐ সব বন্দরের মাধ্যমেই রেলপথের সাহায্যে ব্রিটিশ পণ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যে ভারতে রেল পরিবহন চেয়েছিলেন এবং তার জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

ইংল্যাণ্ডে বেসরকারী রেলপথ নির্মাণে বিভিন্ন বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা ছিল বলেই লর্ড ডালহৌসি গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলেন যাতে বেসরকারী রেলপথ নির্মাণে এদেশে অনুরূপ কোন ব্যত্যয় না ঘটায়। সেই জন্যই সর্বক্ষেত্রে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট হাওড়া ও হুগলীর পাণ্ডুয়ার মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে কোম্পানীর দ্বারা রেলপথ চালু হয়। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ১২১ মাইল তা বিস্তৃত হয়েছিল। এইভাবে ১৯০৫ সালের মধ্যে ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী হয় প্রায় ২৮,০৫৪ মাইল রেলপথ।

রেলপথ তৈরীর উদ্দেশ্য ঃ ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি তাঁর প্রতিবেদনে ঘোষণা করেছিলেন যে, রেলপথ হলে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটবে। তবে রেলপথ তৈরীর পেছনে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিই ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল একথা ভাবা ভুল। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের রেলমালিক, মূলধন লগ্নীকারী, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যরত বণিক সংস্থা এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদকদের প্রবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ কোম্পানীর পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব হয় নি। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলিতে প্রচুর পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ পণ্যের খোলাবাজার ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য রেলপথ ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত পুঁজি জমে এবং তারা সেই পুঁজি কোন লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল। রেলপথ ছিল একটি ভালো সুবিধাজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগ ক্ষেত্র। ব্রিটিশ ইস্পাত ব্যবহারীরা মনে করেছিল যে, ভারতে রেলব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে রেল-ইঞ্জিন, রেল লাইন, মালগাড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করবে। এছাড়া মনে করা হত যে, রেলপথের বিস্তার ঘটলে সেখানে বহু ইংরেজের কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, "এই সব লাভের লোভই ছিল আসল কথা। এদেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ মোটেই নয়।"

রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনেও রেলপথ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশাল ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান ও যোগাযোগ অতি প্রয়োজনীয় ছিল। এছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিদ্রোহের মোকাবিলা করা, সেনাবাহিনীকে খাদ্য ও রসদ দ্রুত পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি কাজেও রেলপথ অপরিহার্য ছিল। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি তাদের প্রতিবেদনে সামরিক প্রয়োজনে রেলপথ নির্মাণের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার সামরিক প্রয়োজনে রেলপথের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। এই কারণে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সময়েও বহু রেলপথ নির্মিত হয়। এ সময়ে এমন অনেক স্থানে রেলপথ নির্মিত হয়েছিল, সে সব স্থানের কোন বাণিজ্যিক গুরুত্বই ছিল না — বরং সামরিক দিক থেকে স্থানগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরও একটি কারণে রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তা' হল ভারতে বারংবার আবির্ভূত দুর্ভিক্ষ। ১৮৮৪ সালে গঠিত পার্লামেন্ট সিলেক্ট কমিটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পাঠাবার উদ্দেশ্যে রেলপথ নির্মাণের কথা বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রেলপথ স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মেকী ছিল, সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. এম. হার্ডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি বলেছেন, রেলপথ স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এখনও সম্ভব না হলেও, এর পেছনে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত হবার পর ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে আর্কট পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। বস্তুতঃ ১৮৫৬ সালের মধ্যেই বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ বন্দর রেলপথের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে রেলপথের ইতিহাস দ্রুত সম্প্রসারণের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৩৯ কিলোমিটার। ১৮৬০ সালের মধ্যে ১৩৪৯ কি.মি., ১৮৭০ সালের মধ্যে ৭,৬৭৮ কি.মি., ১৮৯০ সালের মধ্যে ২৫,৪৯৫ কি.মি., ১৯২০-২১ সালের মধ্যে ৫৬,৯৮০ কি.মি., এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে ৬৫,২১৭ কি.মি. এ দাঁড়ায়। ১৮৬৭ সালের মধ্যেই ভারতের ২০টি সর্ববৃহৎ শহরের মধ্যে ১৯টিই রেল পরিবহনের আওতায় আসে। ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডের ৭৮% এলাকা রেলপথের অধীনে আসে।

৫.৫.১.৩ ঃ রেলপথ নির্মাণে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগ

ভারতে রেলপথ নির্মাণে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলি আগ্রহী হলেও তা' লাভজনক হবে কিনা, সে ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই তাদের কোম্পানীর তরফ থেকে ৫% লাভের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ঠিক হয় যদি আয়ের পরিমাণ লগ্নীকৃত অর্থের ৫% এর কম হয়, তবে সরকার তার রাজস্ব থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ঐ অর্থ দেবে। ইহা "গ্যারান্টি সিস্টেম" নামে পরিচিত হয়। ঠিক হয় সরকার কোম্পানীগুলিকে বিনা মূল্যে জমি দেবে। বিনিময়ে রেল কোম্পানীগুলি স্বল্প মূল্যে সৈন্য চলাচলে রাজী হয়। ৯৯ বছরের মেয়াদে এই চুক্তি হয়। ঠিক হয় ৯৯ বছর পর এই সব রেলপথ বিনা ক্ষতিপূরণে সরকারের বলে স্বীকৃত হবে। তবে তার আগেই সরকার ইচ্ছা করলে ২৫ বছর বা ৫০ বছর পর ঐ রেলপথ কিনে নিতে পারবে। ১৮৪৯ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় রেলপথের প্রসার ঘটে। এবং ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত ভারতে ৪,২৫৫ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। লভ্যাংশের গ্যারান্টি থাকায় কোম্পানীগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বার্ষিক হিসাবে প্রচুর ঘাটতি দেখায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর খরচ করতে থাকে। লর্ড ডালহৌসির আমলে প্রতি মাইল রেলপথ নির্মাণে খরচ হয় ৪০০০ পাউণ্ড। ১৮৬৮ সালে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১৮,০০০ পাউণ্ড। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত গ্যারান্টি বাবদ ভারত সরকারকে দিতে হয়েছিল ২৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই ঘাটতি মেটাতে হতো ভারতীয় রাজস্ব থেকে। এর ফলে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

এই অবস্থায় সরকার গ্যারান্টি ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে নিজেই রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এবং ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু রেলপথ নির্মিত হয়। ১৮৭৯ সালে সরকার দেশের বৃহত্তম রেলপথ ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ কিনে নেন। এই পর্যায়ে সরকারী উদ্যোগে রেলপথের পাশাপাশি অবশ্য বেসরকারী সংস্থার দ্বারাও কিছু কিছু রেলপথ নির্মিত হয়। অপরদিকে সরকারী মালিকানায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ হলে কোম্পানীগুলির মুনাফা লাভের পথ স্তব্ধ হয়। তারা সরকারি মালিকানায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ করার জন্য পার্লামেন্টের ওপর চাপ দিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের ফলে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি হ্রাস পায়। বেসরকারী রেলপথ প্রমোটারগণ এই বিপর্যয়ের সুযোগে Secretary of State-এর ওপর চাপ দিয়ে এই সিদ্ধান্ত আদায় করে যে সরকার শুধুমাত্র সামরিক রেলপথ-ই নির্মাণ করতে পারবে। অর্থাৎ লাভজনক রেলপথ নির্মাণ করবে একমাত্র বেসরকারী উদ্যোগ। ফলে পুনরায় গ্যারান্টি প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। নতুন ব্যবস্থায় অবশ্য রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনার ভার থাকে সরকারের হাতে। কোম্পানীগুলিকে রেলপথ নির্মাণের ও পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। অবশ্য পূর্ববর্তী গ্যারান্টি ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান গ্যারান্টি ব্যবস্থায় পার্থক্য ছিল। এই সময় ৫% এর বদলে ৩.৫% সুদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় নবনির্মিত রেলপথগুলি ভারত সচিবের সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়।

২৫ বছর পরে লগ্নীকৃত মূলধন ফেরত দিয়ে ভারত সচিব চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ করতেন। এই ব্যবস্থা ১৯০০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। রেলপথের যাবতীয় খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত লাভ সরকার এবং প্রোমোটারদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ায় রেল-প্রশাসন সর্বত্র এক ধরণের ছিল না। কিছু কিছু রেলপথ ছিল সম্পূর্ণ সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। কিছু ছিল বিভিন্ন কোম্পানী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং কিছু ছিল গ্যারান্টি প্রথাভুক্ত বেসরকারী মালিকানাধীন ও পরিচালিত। এছাড়াও আরও কিছু ছোট ছোট রেলপথ ছিল। বিভিন্ন ধরণের এই রেলপথের উপস্থিতি পরিচালন ব্যবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে টমাস রবার্টসনের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। রবার্টসনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৫ সালে তিনজন সদস্য নিয়ে একটি রেলওয়ে বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রেলপথ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে এবং সঠিক পথে খরচ করা। এদিকে রেল প্রশাসনে জটিলতা হ্রাস করার জন্য বেসরকারী রেলপথগুলির চুক্তির মেয়াদের শেষে সেগুলি সরাসরি অধিগ্রহণের দাবী তোলা হয়। এই অবস্থায় ১৯২০ সালে স্যার উইলিয়াম অ্যাকওয়ার্থের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯২৫ সালে স্বতন্ত্র রেল বাজেট প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া রেল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ৫ করা হয় এবং বোর্ডকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রেল ব্যবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, কারণ এতে ভারতীয় অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছিল। এছাড়া ভারতীয় যাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার। ভারতীয় পণ্যের ওপর বাড়তি মাশুল প্রভৃতি সম্পর্কেও ভারতীয়রা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় সরকার ১৯২৫ সালে থেকে তার নীতির পরিবর্তন ঘটায় এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে অধিগ্রহণ করতে থাকে। রেলবোর্ডকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং রেলবাজেট সাধারণ বাজেট থেকে পৃথক করা হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল।

৫.৫.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। Dharma Kumar ed. — *Cambridge Economic History of India, Vol.2*

২। Vera Anstey — *Economic Development of India.*

৩। Dhires Bhattacharyya — *A Concise History of the Indian Economy.*

৫.৫.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতে কোথায় এবং কবে রেলপথ প্রথম চালু হয় ? এদেশে রেলপথের বিস্তার কিভাবে ?

২। ভারতীয় অর্থনীতির উপর রেলপথের প্রভাব বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখ।

৩। ভারতে রেলপথের ইতিহাসে গ্যারান্টি ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? কি কারণে তা বাতিল হয়েছিল ?

—————

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

INDUSTRY AND POPULATION

একক - ১

ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্প অর্থনীতি

গঠন (Structure) ঃ

৪.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৩.১.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতির বুনিয়াদ—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্পের উদ্ভব

৪.৩.১.২ ঃ কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংস-সাধন

৪.৩.১.৩ ঃ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

৪.৩.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

 ৪.৩.১.৪.১ ঃ পাটশিল্প

 ৪.৩.১.৪.২ ঃ রেল শিল্প

 ৪.৩.১.৪.৩ ঃ বস্ত্র শিল্প

 ৪.৩.১.৪.৪ ঃ চা শিল্প

 ৪.৩.১.৪.৫ ঃ চিনি শিল্প

 ৪.৩.১.৪.৬ ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

৪.৩.১.৫ ঃ পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

৪.৩.১.৬ ঃ ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর অবির্ভাব

৪.৩.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র

৪.৩.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতি—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্প

(২) ভারতে কুটিরও হস্তশিল্পের ধ্বংসসাধন

(৩) অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

(৫) পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

(৬) ভারতে শিল্পায়নের সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

৪.৩.১.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতির বুনিয়াদ—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্পের উদ্ভব

মোঘল ভারতে কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ কুটির ও হস্ত শিল্পের উদ্ভব ঘটে। কৃষকরা যা উৎপাদন করতো তার একটা অংশ তাদের জীবিকায় সাহায্য করতো। জমিদারদের দেয় খাজনা ছাড়াও একটা বড় অংশ যেত সরাসরি রাজদরবারে। রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সেবা বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের রক্ষণাবেক্ষণে উদ্বৃত্তের একটা অংশ খরচ হতো, আর একটা অংশ উন্নয়নের কাজে লাগতো। গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে জোগান আসতো কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এছাড়া শহরে যে কারখানা শিল্প গড়ে উঠতো তা শহরের বিত্তশালী মানুষ ও রাজা-বাদশাদের ভোগে কাজে লাগতো। উদ্বৃত্তের একটা অংশ শিল্পে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের কাজে লাগানো হত। এই ধরনের শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা আসতো ভূ-স্বামী ও কেন্দ্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত রাজা-বাদশাদের কাছ থেকে। ভারতে গড়ে উঠেছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কৃষিকর্মীদের পরিপূরক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতো যখন কৃষি কাজ বন্ধ থাকতো। অর্থাৎ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প মৌসুমী বেকারের বিরুদ্ধে কৃষিকর্মীদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতো। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা সমাজকে অনেকে 'এশিয়াটিক' সমাজ বলেন। একে 'প্রাচ্য দেশীয় স্বৈরাচারী' ব্যবস্থাও বলা হয়।

৪.৩.১.২ ঃ কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধন

ভারতে ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে গেলে দেশকে কৃষিতে বিশেষায়ণ ঘটানো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন করা একটা সাম্রাজ্যবাদী বাধ্যবাধকতা বলে বিবেচনা করা হয়। সেই অনুযায়ী দেশের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, শুল্কনীতি পরিবর্তন করা দরকার হয়। আবার একই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দেশ থেকে কৃষিপণ্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া এবং বিদেশ (বৃটেন) থেকে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভারতে নিয়ে আসার পথ সুগম করতে হয়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সঙ্গে কাজ হারিয়ে বিভিন্ন শহরাঞ্চল থেকে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামমুখী হয়। গ্রামে শ্রমজীবী মানুষের এই পশ্চাদ্‌মুখী স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে বিনগরীকরণ (বা গ্রামিণীকরণ) বলা হয়। অর্থনৈতিক এই কাঠামো পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া ভারতের ইতিহাসে অবশিল্পায়ন নামে পরিচিত। অর্থাৎ

"অবশিল্পায়ন বলতে আমরা প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে নেহাৎ পুরানো ক্ষয়িষ্ণু শিল্পগুলির পতন বুঝি না। অবশিল্পায়ন বলতে বুঝি শিল্পায়নের বিপরীত প্রক্রিয়া যা দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন আনে যে সেই দেশে উন্নয়নের নিজস্ব উপাদানগুলি ক্রিয়া করতে পারে না।"

৪.৩.১.৩ ঃ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে বৃটিশ নীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়া স্বার্থের জায়গায় বৃটিশ শিল্পপুঁজির স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইংল্যান্ডে তখন বেনিয়া পুঁজির জায়গায় দখল নিচ্ছে শিল্পপুঁজি। ভারতে শুধু বেনিয়া স্বার্থ বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদ সন্তুষ্ট থাকে না। নতুন শতকের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নেহাত ভারতে পণ্যের উপর দখলদারি নয় বাজারের ওপর দখলদারিরও দরকার হয় বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর থেকে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের বাজার মন্দীভূত হতে থাকে। ১৭৯৪ সালে কোম্পানি ভারতের ছিট কাপড়ের ওপর ৪.৭৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৮১০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২.৫৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্পবিপ্লব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপণ্য নয়, ব্রিটিশ পণ্যের জন্য ভারতের বাজার দখল প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বাজার দখলের দুটো উদ্দেশ্য ছিল— বৃটেনের পণ্য অবাধে ভারতে বাজার করে নেওয়া এবং তাদের শিল্পের প্রয়োজনে ভারত থেকে কাঁচামাল ও খাদ্য নিয়ে যাওয়া। ১৮১৩ সালে চার্টার আইনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বেনিয়া অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনে শস্য আইন তুলে দেওয়া হয়। রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় নীতির যুক্তি দেখিয়ে ভারতে কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী হিসাবে বিশেষীকরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।

ভারতের সঙ্গে বৃটেনের আমদানি-রপ্তানির ধরনটায় বিপরীতমুখী এক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারত বৃটিশ পণ্যের, বিশেষ করে, সুতি পণ্যের আমদানি শুরু করে। আর ভারত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানিতে বিশেষীকরণ ঘটায়। বিদেশ থেকে পাকানো ও কাটানো সুতোর আমদানি খুব বেড়ে যায়। বৃটেন থেকে ভারতে সুতি বস্ত্রের রপ্তানি ১৮১৫ সালে ছিল ০.৪০ মিলিয়ন গজ। ১৮৩৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০.০৫ মিলিয়ন গজ। পাকানো সুতো ১৮১৪ থেকে ১৮২৮ সালে ৮ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয় ৪.৫৬ মিলিয়ন পাউন্ড। এবং ১৮৩৯ সালে তা আরও বেড়ে হয় ১০.৮১ মিলিয়ন পাউন্ড। অপরদিকে ভারত থেকে কাপড় রপ্তানিতে এক ভয়াবহ মন্দা দেখা য়ায়। ১৮৪৯ সালে ভারত থেকে রপ্তানিকৃত তুলোদ্রব্য, পাকানো ও কাটানো সুতোর মূল্য মাত্র ০.৬৯ মিলিয়ন পাউন্ডে নেমে আসে। ভারতে কাপড় ব্যবহারে বৃটিশ রপ্তানিকৃত অনুপাতের হার ১৮৬০ সালে তিনগুন বেড়ে হয় মোট ব্যবহৃত পরিমাণের ২৭ শতাংশের বেশি।

ভারতের তাঁতিরা টিকে থাকার স্বার্থে আমদানি করা সস্তা পাকানো ও কাটানো সুতো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতে সুতি কাটানো শিল্প মন্দার কবলে পড়ে। এর সর্বপ্রথম আঘাত আসে তাঁতশিল্পের ওপর। মনে করা হয় যে বৃটেনের আধুনিক কারখানায় তৈরি কাপড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত পেরে ওঠে না। এর কারণ বৃহদায়তন উৎপাদনে খরচের সুবিধা। কিন্তু এই যুক্তি অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকও অস্বীকার করেন। বয়নশিল্প ধ্বংসের জন্য এইচ.এইচ. উইলসন সরাসরি ইংরেজ সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন,—

...... "বলা চলে যে ভারতে যে তুলো ও রেশমপণ্য উৎপাদিত হতো তা বৃটেনের বাজারে এতদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে দামে উৎপাদিত হতো তার থেকে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে বিক্রি করা যেত। এর ফলে ইংল্যান্ডের পণ্যকে সংরক্ষিত করতে গিয়ে আমদানিকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শুল্ক বসাতে হয় বা অন্য কোন প্রত্যয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয়। এটা না করলে পেইল্‌সি বা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে যেত। বাষ্প ইঞ্জিনের ব্যবহারও একে বাঁচাতে পারত না। ভারতের উৎপাদককে বলি দিয়েই এটা করা হল। ভারত স্বাধীন থাকলে এর প্রতিশোধ নিতে পারত পাল্টা ভারতে বৃটিশ পণ্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্কনীতি গ্রহণ করে।"[২]

ইংরেজদের ভারতের বাজার জয় করার স্বপ্ন সার্থক হয় রেলপথ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৫০ সালের পর থেকে ভারতে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি বাড়তে থাকে। ১৮৪৬-৫৫ সালের মধ্যে বৃটেনের বহির্বিশ্বে রপ্তানির ৯.১৫ শতাংশ রপ্তানি হত ভারতে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে এই অনুপাত বেড়ে হয় ১২.৬ শতাংশ। ১৮৪৯ সালে ভারতে কাপড় ও সুতো রপ্তানির অংশ ছিল সমজাতিয় সমগ্র বৃটিশ রপ্তানির ১১.৭ শতাংশ। ১৮৭৫ সালে তা বেড়ে হয় ২৭ শতাংশ। রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ দ্রব্যের অবাধ আমদানি সম্পর্কে ইরফান হাবিবের মন্তব্য ঃ

"আমদানির এই নির্বিচার হননে অপরিসীম দুর্দশায় মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া প্রাচীন হস্তশিল্প আর কিছুই করতে পারে না।"[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই ভারতের বেশিরভাগ দেশীয় শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। দেশীয় শিল্পের এই ধ্বংসসাধনকে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারতের অসহনীয় দারিদ্র্যের ও বেকারির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। অবশিল্পায়ন যে হারে বেড়েছে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সেই হারে বেড়েছে। অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরে নিয়োগ হারিয়ে মানুষ গ্রামে ফিরে আসে। একে ভারতের ইতিহাসে 'গ্রামিণীকরণ' বা বিপরীতে "অবনগরীকরণ" বলা হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় কুটির ও হস্তশিল্প মৌসুমী বেকারত্বের মুখে গরিবমানুষের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করতো। অবশিল্পায়ন মানুষের এই ভরসার জায়গাটা ধ্বংস করে।

সমালোচকদের চোখে অবশিল্পায়ন ঃ-

অনেকেই ভারতের অবশিল্পায়ন তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। এঁদের মতে, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের মুখে সনাতনী প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা হস্ত ও কুটির শিল্প ধ্বংস হওয়াটা একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্দের অনেকের মতে ব্রিটিশরা ভারতে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে অবশিল্পায়নের ক্ষতি পুষিয়ে যায় বলে দাবী করা হয়। যেমন মরিস্ ডেভিড মরিস্ বলেন যে, বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় এবং একই সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়লে যে বাড়তি বাজার সৃষ্টি হয় তা বিদেশি এবং দেশি উভয় শিল্পকেই সমর্থন দিতে পারে। তিনি আরও দেখান যে ভারতে সুতো আমদানিতে সুতো কাটার শিল্প মার খায়। কিন্তু সস্তা সুতো ব্যবহার করে দেশি কাপড় শিল্প সমৃদ্ধির সুযোগ পায়। ড্যানিয়েল থর্নার বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে অবশিল্পায়নের কিছু প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে তা আর দেখা যায় না। তৃতীয় এক গোষ্ঠী বলেন যে, ভারতে অবশিল্পায়ন ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ বৃহদায়তন শিল্প যে খরচের সুবিধা ভোগ করতো, কুটির-হস্তশিল্প তা

করতো না। সুতরাং ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ভারতে পড়লে গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। ধ্রুপদী অর্থনীতির অনুগামী রিচার্ড কবডন, জন ব্রাইট প্রমুখ ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা মনে করি যে স্বাধীন দেশে সেটা প্রগতির ফল বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ অবশিল্পায়ন ভারতে বৃটিশ স্বার্থসিদ্ধ করে। ভারতের মানুষের যে শিল্পমানস এবং শ্রমিকের যে দক্ষতা তা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয় অবশিল্পায়ন। ভারতে অবশিল্পায়ন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা ঘটনা।

৪.৩.১.৪ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলপথ, চট, পাট, চা, কাপড় এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্প আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এর মধ্যে কয়েকটির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা চলে।

৪.৩.১.৪.১ ঃ পাট শিল্প

ভারতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে হস্তচালিত শিল্প হিসাবে পাটশিল্প চালু ছিল। আধুনিক পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে রিষড়ায় ইংরেজ উদ্যোক্তা জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে। ইতিমধ্যে স্কটল্যান্ডের ডান্ডি শহরে ১৮৩৮ সাল নাগাদ পাট শিল্পের অভিষেক ঘটে। ভারতেও পাট শিল্প বিকাশে উদ্যোগ নেয় স্কটল্যান্ডের শিল্পপতিরা।

১৮৫৫ সালে প্রথম চালু হলেও বাষ্পশক্তির সাহায্যে পাটবোনার শিল্প ১৮৫৯ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সালের আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বেড়ে যাওয়ায় ভারতে পাট শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ১৮৭৩ সালে পাটকলে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৫০। ১৯০০ সালে এর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫০০০ এর বেশি। ১৯০০ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে এর সংখ্যা ১৩৫ শতাংশ বাড়ে। ভারতে কাঁচামাল প্রচুর থাকায় এবং শ্রম সস্তা হওয়ায় বিদেশের বাজারে ভারতে পাটশিল্প ডান্ডি থেকে এগিয়ে যায়। ১৮৮০ সালে ভারত ২১.৩১ মিলিয়ন মূল্যের পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে। ১৮৮৯ সালে এই মূল্য বেড়ে হয় ২৫.৭১ মিলিয়ন টাকা। ভারতের পাটশিল্পে ১৮৭৯-৮০ সালে নিয়োজিত ছিল ২৬.৮২৬। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ২,৯৮,৯৬৭। কার্যত ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রথমে রেল, পাট ও চা ও পরে লৌহ-ইস্পাত কারখানায়।

৪.৩.১.৪.২ ঃ রেল শিল্প

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলশিল্পের প্রতিষ্ঠাকে নেহাৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা বলে ভাবলে ভুল হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ইতিহাসে রেলশিল্পের পত্তন হল সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণতা। কার্যত রেল শিল্পের মাধ্যমে একদিকে ভারতের বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সাফল্য অর্জন করে, অপরদিকে ভারত থেকে বৃটেনে সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্য রপ্তানির পথ সুগম হয়। ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে নির্গমনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণে রেল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া ভারতে সামরিক বাহিনীর গতিশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থাকে আরও নিপুণ করে তোলে রেল ব্যবস্থা।

রেলশিল্প বিদেশী উদ্যোগে ভারতে স্থাপিত হয়। এর জন্য যে বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হয় তার ওপর ন্যূনতম সুদ ধার্য করা হয়। এটা ভারতবাসিকে শোধ দিতে হত। মনে রাখা দরকার যে ভারতে রেলশিল্প একটা শিল্পহিসাবে সামগ্রিকতায় ভারতে আসেনি। কেবল লাইন পাতার কাজটাই হয়েছে ভারতে। লাইন, ইঞ্জিন, বগি সবই আমদানি হয়েছে ভারতে। তাই এর বিস্তৃত প্রভাব ভারতে দেখা যায়নি, তা চালান হয়েছে বৃটেনে। ১৮৫৩ সাল নাগাদ ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৮৫৪-১৮৬০ সালের মধ্যে ১২টি রেলকোম্পানি গড়ে ওঠে। ভারতে রেল শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে তৎকালীন ভারত সরকারও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪.৩.১.৪.৩ ঃ বস্ত্র শিল্প

ভারতে বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাবকে দেশীয় উদ্যোগে সর্বপ্রথম আধুনিক শিল্পের প্রবর্তন বলে মনে করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও তা সবসময় হয় না। তাছাড়া ঔপনিবেশিক দেশে পুঁজির প্রবাহ অবাধ হয় না। সেখানে দেশি পুঁজি জায়গা খোঁজে। তাছাড়া বিদেশি শিল্পগোষ্ঠীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে। এর সঙ্গে স্থানীয় ও ভৌগোলিক কিছু উপাদান যুক্ত হয়ে কোন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে যা দেশীয় পুঁজি প্রবেশকে সাহায্য করে। এই সব কিছু সুযোগ পেয়ে ভারতে সুতিশিল্প উনবিংশ শতাব্দী শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। ভারত স্বাধীন থাকলে এই শিল্পের সংযোগ প্রভাব আরও তীব্র হতে পারত। রেল ও সুতিশিল্প শিল্পায়নে নেতৃত্ব দিতে পারলে ভারতের শিল্পায়ন সম্পূর্ণতা লাভ করত। ভারতকে আর কৃষিনির্ভর পশ্চাদপদ দেশ হিসাবে থাকতে হত না।

পার্সি ব্যবসায়ী কওয়াসজী নানাভাই দাভার নেতৃত্বে ভারতে ১৮৫১ সালে অধুনা মুম্বাই শহরে সুতিবস্ত্র শিল্পের সার্থক রূপায়ণ ঘটে। অনেকে একে দেশের বাণিজ্য পুঁজি থেকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন। বস্ত্রশিল্পের বিকাশকে ভারতের অর্থনৈতিক জগতে শিল্পপুঁজিতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেকের মতে একে পুরোপুরি দেশীয় পুঁজির সাফল্য বলতে পারি না কারণ শিল্পের বিকাশের জন্য যে প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি দরকার তা আনা হয়েছিল বৃটেন থেকে। বৃটেনের বস্ত্রশিল্পের মালিকরা এই শিল্পের বিকাশে আপত্তি করেনি যদিও কাপড় শিল্পের পক্ষ থেকে একে সুনজরে দেখেনি। তাছাড়া পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত নানাভাই দাভার বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ ঘটে ইংরেজদের প্রভুত্বে ব্যবসা থেকে এবং ম্যানেজিং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থেকে । উল্লেখযোগ্য যে নানাভাই-এর প্রচেষ্টায় দুজন ইংরেজও অংশগ্রহণ করেছিল।

১৮৫৪ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বস্ত্রশিল্প খুব মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। ১৮৭৫ সাল অবধি মাত্র ৪৮টি সুতিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মুম্বাইতে। ১৮৮২ সালে ভারতে সুতিকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২।

৪.৩.১.৪.৪ ঃ চা শিল্প

বৃটিশ উদ্যোগ ও পুঁজির সাহায্যে ভারতে যে কটি শিল্প গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে চা বাগিচা শিল্প অন্যতম। ১৮৩৩ সালে চার্টার আইন বৃটিশ পুঁজিপতিদের জমির মালিকানা অধিকার পেতে সাহায্য করে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটেনে চা-এর চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া বৃটেনের পুঁজিপতিরাও চিনের সঙ্গে ভারতকে চিনি সরবরাহকারী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছিল। বৃটিশ পুঁজিতে এই শিল্প গড়ে উঠলে তার থেকে প্রচুর লাভের সুযোগ থাকায় ভারতে ইংরেজদের উদ্যোগে যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চা বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে। চা উৎপাদনে

সুদক্ষ ইউরোপিয় দক্ষ পরিচালকদের নিয়োগ করা হয়। ভারতে সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে সস্তায় চা শিল্প গড়ে ওঠে। চা প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দক্ষিণে নীলগিরি পাহাড় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং এবং আসামে চা বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে।

১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৮৯১-৯২ সালের মধ্যে ভারত থেকে বৃটেনে চায়ের রপ্তানির পরিমাণ ২৪,২৮৭,৪৮৮ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয় ১১১,১৬৮,৮৯৫ পাউন্ড। ১৮৮৬-৯০ এর মধ্যে বছরে গড়ে ৩২২,৭০০ একর জমিতে চা-এর আবাদ হত। স্বাধীনোত্তর ভারতের চা ছিল এক অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। চা-বাগিচা শিল্প কর্মসংস্থানের একটা অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য যে ৩০ এর দশক থেকেই পাট-এর সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগিচা শিল্পের মালিকানাও ইউরোপিয়দের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

৪.৩.১.৪.৫ ঃ চিনি শিল্প

প্রাচীনকাল থেকেই দেশীয় প্রযুক্তিতে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের রীতি চালু ছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াকরণের এই পদ্ধতির সাহায্যে ততটা বিশুদ্ধ ও মসৃণ চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হত না। আধুনিক কারখানায় চিনি উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠার। ইউরোপের উন্নত প্রযুক্তিতে চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বড় মাপের উদ্যোগ ও বেশি পরিমাণে মূলধনের দরকার হয়। এশিয়া জুড়ে চিনির চাহিদা খুব বেশি থাকায় ভারতে চিনি উৎপাদন লাভজনক বলে বিবেচিত হত। তাছাড়া চিনির কাঁচামাল আখ উৎপাদনে ভারত ছিল অগ্রণী। কিন্তু ভারতে সাবেকি প্রযুক্তিতে চিনি উৎপাদনে খরচ বেশি হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হত না। অথচ উপযুক্ত উদ্যোগ ও বড় মাপের পুঁজির অভাবে ভারত প্রয়োজনীয় সংখ্যায় আধুনিক চিনি কারখানা গড়ে তুলতে পারেনি। সেইজন্যই ভারত ১৮৬৩ সালে চিনির বড় আমদানিকারী দেশ ছিল। মরিসাসে বৃটিশ শিল্পপতিদের মালিকানায় আধুনিক চিনি শিল্প গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকেই ভারতে বিট চিনির যোগান আসত। এই আমদানিতে মরিসাসে বৃটিশ মালিকরা শুল্কের সুবিধা পেত। জার্মান ও অস্ট্রেলিয়া থেকে চিনি রপ্তানি কমাবার জন্য তাদের চিনি ভারতে রপ্তানির ওপর বেশি হারে শুল্ক ধার্য করা হয় ১৯০২ সালে। অর্থাৎ ১৮৭০ দশকে যে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু ছিল তা আর অবাধ থাকে না। সংরক্ষণের দরকার হয় মরিসাসে বৃটিশ প্রভুদের স্বার্থে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রাসেলে ১৯০১-০২ সালে আন্তর্জাতিক চিনি সম্মেলনের চাপে ভারত সরকার চিনির ওপর শুল্ক প্রাচীর তুলে নেয় ১৯০৪ সালে। জাভা ভারতের চিনির বাজার দখল করে। ১৯৩১ সালে আবার প্রায় ২৫ শতাংশ হারে চিনির ওপর সারচার্জ বসালে ভারতে চিনির আমদানি কমে যায়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিবেশে বৃটেন পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সময়কাল থেকে ভারতে চিনি শিল্প বেড়ে ওঠে। চিনি উৎপাদনে ভারত আত্মনির্ভর হয়। ভারত থেকে চিনি রপ্তানি সম্ভব হয়ে ওঠে।

৪.৩.১.৪.৬ ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

অর্থনীতির ইতিহাসে দেখা যায় শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতে যেখানে খুব দ্রুত হারে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ শিল্পায়নে জোয়ার আনতে পারত। কিন্তু ভারতে তা ঘটেনি কারণ সময়মত এই শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ জড়িত না থাকায় তৎকালীন বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

প্রাথমিক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লোহা ঢালাই শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যাহত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী জোসেয়া মার্শাল হিথ্ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও সে প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি।

হিথ্-এর মৃত্যুর পর ইস্ট ইন্ডিয়া আয়রন কোম্পানি মার্শাল হিথের প্রস্তাবিত প্রোটোনভ আয়রন ওয়ার্কস নামে কোম্পানিটি ১৮৫৩ সালে অধিগ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কার্যতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আধুনিক শিল্প হিসাবে আবির্ভূত হয় ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত স্যার জামশেদজী টাটা। দক্ষিণ বিহারে তৎকালীন সাক্চি শহরে (অধুনা জামশেদপুর) এর অভিষেক ঘটে ১৯০৮ সালে। জামশেদপুরই আজ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পীঠস্থান বলে পরিচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল কাঁচা লোহা উৎপাদন করলেও ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম হতে বেশি সময় লাগে না। ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে এই কোম্পানি রেললাইন উৎপাদন করলে রেলশিল্প ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। একেই অর্থনীতিতে সংযোগ প্রভাব বা Linkage effect বলা হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তন ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ভবিষ্যত গড়তে সাহায্য করে।

অমিয় বাগচী, তার 'ভারতে আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন' নামক গ্রন্থে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির উল্লেখ করেন।

৪.৩.১.৫ ঃ পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

ভারতে বৃটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই বাণিজ্যিক পুঁজির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই দেশীয় বণিকরা পর্তুগীজ বেনিয়াদের অধীনে সমুদ্রপারের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। একশ বছর ধরে ভারতের বাণিজ্যের ওপর কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ বেনিয়া ও ভারতের বণিকদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ডাচ ও ইংরেজদের সঙ্গে এবং তাদের অধীনে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসা করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিপত্য স্থাপিত হলে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশের অভ্যন্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যে সাহায্য করতে আরম্ভ করে। বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে যায়। এই সময়কাল ধরে ভারতে বাণিজ্য পুঁজি গড়ে ওঠে।

বাণিজ্য পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটলেও পুঁজিবাদীদের স্বাধীন উদ্যোগে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। ১৮৫০ সালের পর বৃটিশ পুঁজির উদ্যোগে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজশক্তি কখনও ভারতকে শিল্পোন্নত অর্থনীতি হিসাবে দেখতে চায়নি। ভারতকে নিজেদের স্বার্থেই কৃষি অর্থনীতি হিসাবে রেখে দিতে চায়। এরই মধ্যে তাদের উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত শিল্পোন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেশীয় পুঁজিপতিরা এতে অংশগ্রহণ করলেও তারা কখনও নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে না। সম্পদ নির্গমন, অবাধ অর্থনীতি, সরকারের শিল্পনীতি এবং সর্বোপরি বিনিয়োগের এবং তার সঙ্গে শিল্পায়নের গতি ও অভিমুখ, বিচার করলেই আমরা ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে পারি।

পশ্চিমী দেশের মতো ভারতে অর্থনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটেনি। সাধারণত তিনটি স্তর ধরে শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনের স্তর, পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের স্তর এবং কারখানা ভিত্তিক উৎপাদনের স্তর। অনেকেই মনে করেন যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারত অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনের স্তর থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন স্তরে পৌঁছলেও ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া ভারতকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় আধুনিক কারখানা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। অবশিল্পায়ন ও তার সঙ্গে

সঙ্গে সম্পদের নির্গমন স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিপথগামী করে। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় দেশি স্বাধীনচেতা শিল্পোদ্যোগের বিকাশ বজায় থাকতে পারেনি। অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় শিল্পজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য বিদেশি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। বিদেশি উদ্যোগের সঙ্গে দেশীয় যে নির্ভরশীল পুঁজি যুক্ত তাকে অনেকে পরগাছা পুঁজি বা মুৎসুদ্দি পুঁজি বলেন। শাসকদেশের মহানগরী (Metropolis) থেকে ভারতের শহরে কারখানা শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়া নয়। বুকাননের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা একে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া (impartation rather than evolution) বলেন। বিদেশের কারখানার শিকড় এখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। যেমন রেললাইন পাতা হয় কিন্তু রেললাইন, ইঞ্জিন, রেলবগি, কলকব্জার মত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বৃটেন থেকে আসে। অর্থাৎ শিল্প হিসেবে নয় বরং সেবা বিভাগ হিসাবে রেলশিল্প গড়ে ওঠে। পুঁজির সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকেও বৃটিশ অর্থনীতির উপাঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে কোন শিল্প সম্প্রসারণের বিস্তৃত প্রভাব বিদেশে চালান হয়। রেল শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্প তেমন গড়ে উঠতে পারে না। মনে করা যেতে পারে যে, ভারতে ইতিমধ্যে দীর্ঘ তিনশত বছর ধরে যে মুৎসুদ্দি পুঁজি গড়ে উঠেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যে যারা নিজেদের ভাগ্য তৈরি করেছে তাদের সঙ্গে বৃটিশ পুঁজির সংবন্ধনের সাহায্যেই ভারতের শিল্পায়নের সূত্রপাত হয়। ভারতে স্বাধীন পুঁজিপতি যে ছিল না তা নয়। কিন্তু শিল্পায়নে তারা কোন নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ঘটে যা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছে। আর দেশি পুঁজির একটা অংশ স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিল এরা। এমনকি কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। ফার্মেসিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মেসিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বেঙ্গল ল্যাম্প প্রভৃতি শিল্প দেশীয় পুঁজিপতিদের পুঁজিতে বিকাশলাভ করে। এরা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতো তা দেশীয় প্রযুক্তি ছিল। নিজেদের গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে এরা উৎপাদন করত। এই ধরনের পুঁজি বিদেশি পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাধেনি। তবে এদের তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। ফরাসি অর্থনীতিবিদ্ আঁদ্রে গুন্ডের ফ্রাঙ্ক মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্রাজ্যবাদ যখন সংকটে পড়েছে তখন দেশীয় শিল্প তার সুযোগ নিয়েছে। এটাও সত্য যে বিভিন্ন সময় কোন গাঁটছড়া পুঁজিপতিও এই স্বাধীন পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে লড়াইএ যোগ দিয়েছে। অনেক সময়ই দেশি পুঁজির সঙ্গে সংঘাত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়েছে। দেশি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যে বিভাজন করাটা সম্ভব হলেও স্বাধীন ও পরগাছা পুঁজির মধ্যে বিভাজনটা অনেক সময়ই অস্পষ্ট। স্বাধীন দেশীয় পুঁজি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্বটা প্রধান হলেও বিদেশি ও মুৎসুদ্দি পুঁজির মধ্যে ঐক্যটাই ছিল প্রধান। অনেকে বিদেশি পুঁজি এবং দেশি পুঁজির মধ্যে বিভাজনটাকে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভাজনের কারণ বলে মনে করেন। এদের মতে বিদেশি পুঁজির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সংগঠিত আধুনিক শিল্প আর দেশি পুঁজি গড়ে তোলে অসংগঠিত শিল্প। কিন্তু এই বিভাজন ঠিক নয়। অনেক সময়ই দেশি পুঁজি সংগঠিত শিল্পে বিনিয়োজিত হয়। দেশি পুঁজিপতির নেতৃত্বে সংগঠিত শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন ভারতে বস্ত্র শিল্পে নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশি পুঁজিপতি। বিদেশি উদ্যোগ এই বিভাগে নেয়নি।

রেলপথ, চটশিল্প, পাটশিল্প এবং চা ও বরারের মত বাগিচা শিল্প ভারতে বিদেশি উদ্যোগ ও পুঁজিতে গড়ে ওঠে। তবে পরের দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন দেশীয় পুঁজি এই সব শিল্পে যথেষ্ট বিনিয়োগ করে। বিভিন্ন যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানিতে দেশীয় মালিকানা বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা যায়। বৃটেন অর্থনীতি থেকেই এই মন্দার সূচনা হয়। এই সময়কাল থেকে বিভিন্ন দেশে বৃটিশ কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে চটকল, চা, রবার প্রভৃতি শিল্পের মালিকানা বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে আসার প্রবণতা দেখা যায়। এই সব শিল্প থেকে ইংরেজদের পশ্চাদপসারণের দুটি কারণ আছে বলে অনেকে মনে করেন। একটা ব্যাখ্যা অনুয়ায়ী এই সময়কালে ভারতে জাতীয়তাবাদের জোয়ার আসে। বিদেশি পুঁজির জায়গায় দেশীয় পুঁজি জায়গা করে নেয়। আরেকটা ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয় যে এই সময়ে বৃটিশরা বুঝতে পারছিল যে সাবেকি শিল্পের তেমন ভবিষ্যত নেই। তাছাড়া তারা ভারতের ওপর বেশিদিন খবরদারি করতে পারবে না। এই অবস্থায় তারা মালিকানা ছেড়ে দিয়ে ভারত থেকে পুঁজি তুলে নিতে শুরু করে। নতুন ধরনের শিল্পের ওপর বিনিয়োগের ঝোঁক বাড়ে। তামাক, বাদামতেল, ঔষধ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি উঠতি শিল্পে পুঁজির স্থানান্তর ঘটে। এছাড়া পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বহুজাতিক সংস্থা গড়ে তুলতে শুরু করে। সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কর্তৃত্ব না করে পরোক্ষভাবে পুঁজি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু হয় যাকে বলে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ। স্বাধীনতার আগে থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। মনে করা হয় যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে বিদেশি শিল্পের বিরুদ্ধে দেশীয় শিল্পের উত্থান বলে মনে করা হয় তা কার্যত এক ধরনের পরোক্ষ কর্তৃত্ব। এটা হয় সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশলে। একে ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জয় বলা যায় না।

কোন দেশে বিদেশি পুঁজির কর্তৃত্ব শুধু বিদেশি পুঁজির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। নেহাৎ পরিমাণগত বিষয় হলে বলা চলে না যে ভারতে বিদেশি পুঁজির কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিল কারণ পরিসংখ্যান বলে যে ভারতে আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ছিল কম। অমিয় বাগচীর মত অর্থনীতিবিদরা দেখান যে অর্থনীতির গঠন ও কাঠামোই ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশি পুঁজির প্রাধান্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ইংরেজ ব্যবসায়ী কম দামে কাঁচামাল কেনে। শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত রাখে। বণিক সমিতিগুলো সামাজিক ভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজনীতিবিদ্, ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করে। বেতন কমিয়ে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, পণ্যের দাম বাড়িয়ে ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণে রেখে চা, কয়লা, পাট প্রভৃতি শিল্পে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন কয়েকটা এজেন্সি বিভিন্ন শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখত। চা শিল্পে ৬১ শতাংশ, কয়লায় ৪৬ শতাংশ এবং পাটশিল্পে ৫৫ শতাংশ কোম্পানিকে এরা নিয়ন্ত্রণ করত। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প সুদে লগ্নির সুবিধা দেওয়া হত। বহির্বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত জাহাজ কোম্পানিগুলোয় একচেটিয়া ইংরেজদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব-ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি বজায় ছিল। পশ্চিম ভারতে বিদেশি পুঁজি এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করত না। তাদের স্বার্থী মুৎসুদ্দি পুঁজিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের এই একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি বজায় ছিল। উল্লেখযোগ্য যে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারতে বিদেশিদের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে বোঝাপড়া এবং অন্যদিকে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সওদাগরশ্রেণী বেড়ে উঠেছে। বিদেশি পুঁজির উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত যে শিল্পায়ন ঘটে তাতে অংশগ্রহণের মধ্যে দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য পুঁজি শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। ভারতে পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের ভূমিকা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের অর্থনীতিতে এঁরাই হয়ে দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৩. ১.৬ ঃ ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রেলপথ স্থাপনের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক কারখানা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ইতিমধ্যে ভারতে হস্ত ও কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আধুনিক কারখানা শিল্পে মালিক শ্রমিকের মধ্যে যে পুঁজিবাদী সম্পর্ক দেখা দেয় সেখানে শ্রমিকরা শ্রম সময় বিক্রি করে তাদের জীবিকা অর্জন করে। পুঁজিবাদের নিয়মে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রমিকরা শুধু যে মালিকানাহীন এক সর্বস্বান্ত শ্রেণী তা-ই নয়, তারা তাদেরই উৎপাদিত পণ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই শ্রমিক শ্রেণীকেই কার্ল মার্কস সর্বহারা শ্রেণী বলে আখ্যা দেন। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ জুড়ে শিল্পবিপ্লবের সময়কালে আধুনিক কারখানা শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। এর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। একই সঙ্গে সমাজের সর্বক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জগতে যে মৌলিক পরিবর্তন আসে ত শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবকে এক নতুন মাত্রা দেয়। শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে নয় গুণগত দিক দিয়েও শ্রমিক মালিক সম্পর্কে এক মৌল পরিবর্তন ঘটে। উভয়ের মধ্যে যে বিমূর্ত্ত মালিকানা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা সমাজকে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীতে ভাগ করে দেয়। কিন্তু ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে নিয়ন্ত্রিত যে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে তা শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটালেও সংখ্যা ও গুণগত দিক দিয়ে সমাজকে শ্রমিক শ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত করতে পারেনি। আমরা দেখি যে কৃষি ও শিল্পবিভাগের মধ্যে কৃষির প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সামন্তবাদের পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি শ্রমজীবী মানুষকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থনীতিতে কাঠামোগত এক অচলায়তন অবস্থাকে বৃহদায়তন শিল্পের বিচ্ছিন্ন এবং নিয়ন্ত্রিত বিকাশ অটুট রাখতে সাহায্য করে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তার ওপর আলোকপাত করব।

দ্রুতহারে রেলপথে বিকাশসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। রেলের ওপর বিনিয়োগ সবথেকে বেশি হলেও রেলে সেই অনুপাতে নিয়োগ ঘটতে পারেনি। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ জে. এম. হার্ড The Cambridge Economic History of India, Vol-II গ্রন্থে স্বীকার করেন যে ভারতে রেল শিল্প অর্থনীতিতে সংযোগ প্রভাব বা বিস্তৃতি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি কারণ ইঞ্জিন থেকে আরম্ভ করে যন্ত্রপাতিসহ বগি পর্যন্ত আমদানি করা হত বৃটেন থেকে। শুধু রেললাইন পাতার জন্য অদক্ষ শ্রমিকের ব্যবহার হত। কিছু সারাই করার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সাল নাগাদ ১১ লক্ষ শ্রমিক এই ওয়ার্কশপগুলিতে নিযুক্ত হয়। ড্রাইভার ও গার্ড হিসেবেও কিছু শ্রমিকের নিয়োগ ঘটে। পরবর্তীকালে এই রেলশিল্পে সবচেয়ে সংহত ও শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় এই বিভাগে পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সংহতি লাভ করে।

রেল ছাড়াও বস্ত্রশিল্প, চটকল, কয়লাখনি এবং বাগিচা শিল্পে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। নিচের সারণিতে দেখানো হল বিভিন্ন শিল্পে ১৯০০-১৯০১ সাল থেকে ১৯৪৬-৪৭- এব মধ্যে কিভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে।

ভারতে বিভিন্ন পণ্যশিল্পে নিয়োগের হার (শতকরা)

১৯০০-০১ থেকে ১৯৪৬-৪৭

সময়	সুতিশিল্প (১)	পাট শিল্প (২)	কাগজ (৩)	সিমেন্ট (৪)	পশম (৫)	লৌহ ও স্টীল (৬)	দেশলাই (৭)	মোট (১-৭) (৮)	অন্যান্য পণ্যশিল্প (৯)	মোট পণ্যশিল্প (১০)	মোট পণ্যশিল্প (হাজারে) (১১)
১৯০০-০১	৩২.১	২০.৬	০.৯	—	০.৫	—	—	৫৪.১	৪৫.৯	১০০	৫৩৯
১৯১৩-১৪	২৮.৩	২৩.৫	০.৫	—	০.৪	০.৯	—	৫৩.৬	৪৬.৪	১০০	৯১৮
১৯১৮-১৯	২৬.৬	২৫.১	০.৫	০.২	০.৪	১.৫	—	৫৪.৩	৪৫.৭	১০০	১,১০১
১৯২৩-২৪	২৬.৪	২৪.৪	০.৪	০.৪	০.৭	১.৬	—	৫৩.৯	৪৬.১	১০০	১,৩৫০
১৯২৮-২৯	২৩.৮	২৩.৬	০.৪	০.৫	০.৬	১.৩	১.১	৫১.৩	৪৮.৭	১০০	১,৪৫৭
১৯৩৩-৩৪	২৮.৩	১৮.৯	০.৫	০.৫	০.৬	১.২	১.৩	৫১.৩	৪৮.৭	১০০	১,৩৬০
১৯৩৮-৩৯	২৩.৪	১৫.৯	০.৫	০.৭	০.৬	১.১	০.৯	৪৩.৫	৫৬.৫	১০০	১,৮৫৪
১৯৪৬-৪৭	১৮.৪	১১.৪	০.৪	১.০	০.৭	০.৪	০.৭	৩৪.২	৬৫.৪	১০০	২,৬৫৪

উৎস ঃ কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৪৩

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় যে আলোচিত পঞ্চাশ বছরে বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক সংখ্যার আনুপাতিক হার তেমন বাড়েনি। তবে মোট শ্রমিক সংখ্যা নেহাত কম নয় বলে মরিস্ ডি মরিস্ তাঁর ‘The growth of Large Scale Industry to 1947’ নামক লেখায় মনে করেন। তিনি ইউরোপীয় দেশের সাথে তুলনা করে এই মন্তব্য করেন। তাছাড়া কয়েকটি প্রদেশে কারখানা শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্রীভূত বলে দেখা যায়। ওপরের সারণি ধরে আরও বলা যায় যে বস্ত্র ও পাটশিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ পুরনো শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের হার সাম্রাজ্যবাদ শাসনের শেষের দিকে কমতে থাকে। নতুন শিল্পগুলি এই শিল্পগুলির মতো শ্রমিক নিয়োগে সক্ষম ছিল না। মোট কারখানা শিল্পে নিয়োগের শতাংশ হিসাবে সারণিতে তালিকাভুক্ত সাতটি শিল্পে নিয়োগের অনুপাত শেষের দিকে কমে বলে দেখা যায়।

আমরা এই সময়কালে মোট-শ্রমিকের অংশ হিসাবে মহিলা ও শিশু শ্রমিকের বিষয়টি উত্থাপিত করতে পারি। দেখা যায় যে কারখানা শিল্পে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মহিলা ও শিশু শ্রমের অনুপাত কম। নিচের সারণিতে সেটা দেখা যায়

কারখানা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের দৈনিক শ্রমিকের অনুপাত (১৮৯২-১৯৪৬ সাল)

সময়	পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
১৮৯২	৮০.২	১৩.৮	৬.০	১০০
১৯১৩	৭৮.৭	১৫.৩	৬.০	১০০
১৯২৮	৮০.০	১৬.৬	৩.৪	১০০
১৯৩৯	৮৫.৬	১৩.৯	০.৫	১০০
১৯৪৬	৮৭.৮	১১.৮	০.৪	১০০

উৎস ঃ কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি পৃঃ ৬৪৫

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকের অনুপাত সামান্য হারে হলেও বাড়ে। ১৯২৮ সালের পর তা কমতে থাকে। শিশু শ্রমের নিয়োগের শতকরা হার কমতে থাকে। সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায় যে ছবিটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমন বদলায়নি।

সনাতনি অর্থনীতিতে শিল্পায়নকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সমার্থক বলে বিবেচনা করা হত। পশ্চিমী দেশেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকশোষণের যে নগ্ন চেহারাটা দেখা যেত তা ঔপনিবেশিক ভারতে আরও বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। পুরুষ, মহিলা, শিশু সবধরনের শ্রমজীবী মানুষই অভাবনীয় এক নিষ্ঠুর শোষণের শিকার ছিল। শ্রমিকদের দিনে ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করতে হত। কাজের মধ্যে বিরতি থাকার কোন প্রথা ছিল না। ১৮৮৫ সালের শ্রম কমিশন মন্তব্য করেন যে ভারতের কারখানায় সারাবছরে গড়ে ১৫ দিনের ছুটি পাওয়া যেত। ইংল্যান্ডে সেই সময় শ্রমিকরা শনি রবিবার মিলে সারা বছরে ৮৮ দিন ছুটি পেত। ১৮৯১ সালের কারখানা আইনে ৭-১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯ ঘন্টা শ্রম সময় ঠিক হয়। মহিলাদের জন্য ১১ ঘন্টা বেধে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আইনও কারখানাগুলোতে মানা হত না।

রেল শিল্প, চা বাগিচা বা পাটশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কাজ করত তা পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবীদেরও পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক সংঘ গঠন এবং তাদের আন্দোলন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পেতে থাকে। সারা ভারতে শ্রমিকশ্রেণী একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বর্ণিত বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার সঙ্গে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার মিল তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে ভারতে পশ্চিমী ধরনের শিল্পপুঁজির বিকাশ ঘটলে, "দেশি বা বিদেশি যে পুঁজিপতিশ্রেণীনীতির উদ্ভব ঘটবে যাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধিতে শ্রমজীবী জনসাধারণের সাচ্ছন্দ সম্ভব নয়।" শ্রমজীবী মানুষ এক পশুর জীবন যাপন করবে যারা হয়ে দাঁড়াবে, "আত্মসম্মান খোয়ানো, মালিকদের দ্বারা তাড়িত, অসহায় মানুষ যন্ত্রে।"

আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অসংগঠিত বিভাগে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা বলে নেওয়া দরকার। উল্লেখযোগ্য যে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের নিয়ন্ত্রিত বিকাশ ঘটে। কিন্তু অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন তেমন হয়নি। কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তরের পশ্চিমী ধারণা ভারতে ধরা পড়ে না। এই অবস্থায় কৃষি বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে ব্যাপক শ্রমের স্থানান্তর ঘটে না। বরং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রামীণীকরণ বা অবনগরীকরণ ঘটে তাতে শহরে নিযুক্ত হস্তশিল্পে নিয়োগ হারিয়ে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামমুখী হয়। কৃষিতে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। শহরে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মত কিছু সহশিল্প গড়ে ওঠে। এই সহশিল্পগুলি ছিল অসংগঠিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। যেমন— বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গানদীর পশ্চিম পারে হাওড়া জেলায় বা কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

আমরা অসংগঠিত বিভাগ বলতে কৃষি, সাবেকি হস্ত কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বুঝি। এই ধরনের উৎপাদন সংগঠন ব্যক্তি মালিকানায় সীমিত পুঁজিতে গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্যোগ দেখা যায়। এই বিভাগ আধুনিক যৌথমূলধনী কারবারের মত সংগঠিত নয় বলে এদের অসংগঠিত শিল্প বলা হয়। গ্রামে কুটির শিল্পগুলো ছিল কৃষির পরিপূরক। অনেকক্ষেত্রে পরিবারের শ্রমেই এগুলো পরিচালিত হত। কৃষিতে মৌসুমী রেখাবৃত্তের সময় এই শিল্প মানুষের জীবিকায় সাহায্য করত। বৃটিশ আমলে কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার

ওপর বিশ্বাসযোগ্য তেমন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর মত শহরগুলোতে যেভাবে জনসংখ্যা কমেছে তা ধরে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। শহরে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা যেমন কমেছে গ্রামে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা তেমনই বেড়েছে। একে অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণীকরণ বা অবনগরায়নের ফল বলা যায়। তৎকালীন উত্তর প্রদেশের এগুলো ছিল মৌসুমী বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৮৬৯ সালে লক্ষ্ণৌতে মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৮৪,৭৭৯ জন। ১৯১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২,৫৯,৭৯৮ জন। মনে করা হয় যে, ১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই শহরটি ইংরেজ রাজতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসার পর অবনগরায়ন আরও বেশি হারে শুরু হয়। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামে আশ্রয় পায়। আমরা ধরে নিতে পারি যে শহরে বিকল্প নিয়োগের সুযোগ না থাকায় গ্রামে এই শ্রমজীবী মানুষ ঐ জীবিকার জন্য আশ্রয় খোঁজে। উনা, রায়বেরিলি, শহরগুলোকেও একই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। একই সঙ্গে দেখা যায় কলকাতা ও হাওড়ার জনসংখ্যার স্ফীতি ঘটে। এই সময়কালে রেল ও অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের সুযোগ থাকায় শ্রমজীবী মানুষের স্থানান্তর ঘটে এই সব এলাকায়। একই সঙ্গে আধুনিক শিল্পের সহযোগী ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে থাকায় এই সব অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ে।

আমরা আমাদের আলোচনায় আধুনিক শিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের দিকটা যেমন আলোচনা করলাম তেমনি অসংগঠিত শিল্পে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিভাবে শ্রমজীবী মানুষের গঠনে পরিবর্তন এসেছে তার একটা রূপরেখা তুলে ধরলাম। সাধারণ ধরনটা অনুমান করা গেলেও তার পরিসংখ্যানের অভাবে এই পরিবর্তনের ধরনের খুঁটিনাটির বিষয়টি অনেকটাই অধরা রয়ে গেল।

৪.৩.১.৭ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র

বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তাত্ত্বিক সমর্থকরা খোলা বাজারের অর্থনীতির দর্শনের ভিত্তিতে অবাধ অর্থনীতি (Laissez Faire) চালু রাখার পক্ষে মত দেন। ঔপনিবেশিক ভারতেও ইংরেজ সরকার অবাধ অর্থনীতির প্রবর্তন করেন যাতে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে পণ্যের লেনদেনে তেমন বাধা না থাকে। বিনা শুল্কে বৃটেনে উৎপাদিত পণ্য ভারতে প্রবেশের পথ এবং ভারত থেকে কৃষিপণ্য সে দেশে প্রবেশের পথ অবাধ করে দেওয়ার নীতিই প্রতিফলিত হয় ঔপনিবেশিক ভারতে গৃহীত শিল্পনীতিতে ঔপনিবেশিক ভারতে বৃটিশ অনুসৃত নীতিকে যতটা অবাধ বলা হয় কার্যত তা ততটা অবাধ ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বার্থ যেখানে বজায় থাকত সেখানে বৃটিশ নীতি অবাধ ছিল। কিন্তু যেখানে দরকার সে সেখানে সংরক্ষণের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। রাজস্বের খাতিরে বৃটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক বসালে ভারতের দ্রব্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসানো হয়েছে।

রেলের মত পরিকাঠামো শিল্পে বেসরকারী পুঁজি যথেষ্ট না হওয়ায় সরকার প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৮৬৭ এবং ১৮৬৯ সালে ভাইসরয় লর্ড লরেন্স সরকারের সচিবকে রেল প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেন। ১৮৭০-৭১ সালে রেল পরিবহন শিল্পে সরকারি ঋণ অর্থ ব্যবহৃত হয়। নতুন গ্যারান্টি ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের এক সমন্বয় ঘটে। ভারতের শুল্কনীতি কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা আমরা আলোচনা করতে পারি। বাজেট ঘাটতি মেটাবার জন্য সরকারকে কিভাবে শুল্কনীতি পরিবর্তন করতে হয় তা দেখা যেতে পারে।

রেলপথ স্থাপনে সঙ্গে সঙ্গে সরকার এক 'বাণিজ্য দশায়' পৌঁছায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়কে বাণিজ্য দশা বলা হয়। অনেকে মনে করেন যে শিল্পায়নের এই পর্যায়ে ভারত আধুনিক যুগে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়।

রেলপথের সাথে পাট, চা, রবার প্রভৃতি শিল্পের বিকাশ ঘটে। পরে বয়ন ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। যদিও ভাবা হয়েছিল যে রেলশিল্প ভারতে শিল্পায়নের অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। বরং একদিকে অবশিল্পায়ন আর অন্যদিকে সমপদ নির্গমনে সাহায্য করেছে রেলপথ, আর সরকার হয়েছে এর সাথী।

চা-শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ে সরকার সরাসরি উৎসাহ দেখায়। পরে সরকার তা বিদেশি বেসরকারি উদ্যোক্তার কাছে বিক্রি করে। অর্থাৎ চা-শিল্প বিকাশেও বাজার অর্থনীতি তথা অবাধ উদ্যোগের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছিল তা বলা যায় না।

দেখা যায় যে পূর্ব ভারতে রেল, চা বা পাট শিল্পে সরকারি সাহায্য দরকার হয়। কিন্তু বয়নশিল্প বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরের দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলালে সরকার কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন সময়ে সরকারের শুল্কনীতি আলোচনা করলে এই সত্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৯৪ সালে সরকারের বাজেটে ৩.৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা যায়। উপায় না থাকায় ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে নতুন শুল্ক আইন চালু হয়। কাপড় ও সূতো ছাড়া সবরকমের আমদানি দ্রব্যের ওপর ৫% হারে শুল্ক বসানো হয়। বৃটেনে কাপড় শিল্পের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। বাধ্য হয়ে সরকার ৫% হারে সূতো বস্ত্র ও সূতোর ওপর আমদানি কর বসায়, কিন্তু বৃটিশ বস্ত্র শিল্প গোষ্ঠীর চাপে ভারতে সূতো ও সূতীবস্ত্রের উপর ৫% হারে শুল্ক বসানো হয়। ইতিহাসে একে সমতুল্য শুল্কনীতি বলে।

বিভিন্ন কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকারকে বৈষম্যমূলক শিল্পনীতির পরিবর্তন করতে হয়। এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যুদ্ধের সময় বৃটিশরা ভারতে পণ্যের যোগান দিতে না পারায় জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাজার দখল করতে চেষ্টা করে। তাদের ঠেকাবার জন্য ভারতের শিল্পপতিদের সুযোগ দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে গণ আন্দোলনের ভয়ে সরকার কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৬ সালে শিল্প কমিশন গঠিত হয়। তারা শিল্প প্রসারের জন্য 'উৎসাহমূলক হস্তক্ষেপ নীতি' গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। এছাড়া ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেমস্ফোর্ড রিপোর্টেও ভারতের জন্য একটা সংগতিপূর্ণ শিল্পনীতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়। সরকার সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না।

ভারতে শিল্পোন্নতির জন্য বৃটিশদের কোনো সুষ্ঠ শিল্পনীতি ছিল না। অবাধ বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাস করলেও তারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে চলত, যা তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের থেকে একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অপরদিকে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তারা কিছুটা হলেও নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম যে নীতিগত ভাবে অবাধ অর্থনীতির সমর্থক হলেও ভারতে রাষ্ট্রের নীতি ততটা অবাধ ছিল না। সেই পর্যন্তই এই নীতি অবাধ ছিল যতক্ষণ তা বৃটিশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা গেছে। ভারতের বস্ত্র বা চিনি শিল্পের প্রয়োজনে সময়মত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হয়নি। রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে বা জার্মানের মত প্রতিযোগী দেশকে আটকাবার জন্য কখনও কখনও শুল্ক প্রাচীর তুলেছে। তখন ভারতের কিছুটা সুবিধা হয়েছে ঠিকই কিন্তু বলা চলে না যে ভারতের শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কোন ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করেছে।

৪.৩.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রণেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি

অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agriculture at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.৩.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) অবশিল্পায়ন কাকে বলে? বৃটিশ আমলে অবশিল্পায়নের ফলাফল আলোচনা কর।

(২) বৃটিশ ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

(৩) ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(৪) শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

একক - ১

প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার

প্রাক্ ১৮৫৭ খ্রীঃ কৃষক, উপজাতিয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

বিন্যাস ক্রম ঃ

৩.৭.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৩.৭.১.১ ঃ প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার

৩.৭.১.২ ঃ ১৮৫৭ সালের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

৩.৭.১.৩ ঃ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধ আন্দোলন

৩.৭.১.৪ ঃ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (1763-1800) ঃ উদ্ভব এবং বিকাশ

- ৩.৭.১.৪.১ ঃ তাৎপর্য
- ৩.৭.১.৪.২ ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ
- ৩.৭.১.৪.৩ ঃ রংপুর বিদ্রোহ
- ৩.৭.১.৪.৪ ঃ কোল বিদ্রোহ (1832)
- ৩.৭.১.৪.৫ ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855)

৩.৭.১.৫ ঃ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

- ৩.৭.১.৫.১ ঃ ফরাজী আন্দোলন
- ৩.৭.১.৫.২ ঃ ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ

৩.৭.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৭.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.৭.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার।

(২) প্রাক্ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতিয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।

(৩) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ের আন্দোলন

(৪) সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

(৫) ফরাজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য।

৭.১.১ ঃ প্রতিরোধের প্রকৃতি ও আকার

ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণ ও আধিপত্য স্থাপনের চরিত্র ছিল পূর্ববর্তী সকল বৈদেশিক আক্রমণের চরিত্রের থেকে ভিন্ন। পূর্বে বৈদেশিক আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে কেবল সর্বোচ্চ স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হত। কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোন প্রভাব সাধারণ ভারতীয়ের ওপর পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণের চরিত্র গুণগতভাবেও ভিন্ন ছিল। এই অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশশীল, শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতির পতন ঘটে, অন্যদিকে বাণিজ্যের সূত্র ধরে একটি নতুন অর্থনীতির জন্ম হয়। এই নতুন ব্যবস্থার সঠিক ফল হিসাবে ভারত অতি দ্রুত দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যায়। এটি একদিকে যেমন কৃষক এবং কারিগরদের অবস্থার এবং স্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি এর ফলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধ্বংসাবশেষের ওপর ভারতে পশ্চিমী দেশগুলির ন্যায় নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়নি। এইভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব একটি নতুন ধরণের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও কাঠামো গড়ে তুলেছিল যা ছিল সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদগামী। প্রথাগত হস্তশিল্পের অবনমন কৃষিকার্যের ওপর চাপ বৃদ্ধি করেছিল। কৃষকরাই সবচেয়ে বেশী চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের দ্বারা ক্রমাগত প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল ভারতীয়দের বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রেখেছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধগুলিকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। (1) **উপজাতিয় উত্থান** এবং (2) **কৃষক বিদ্রোহ**।

> *ঊনবিংশ শতাব্দিতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশশীল, শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।*

প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধ প্রকৃতি ও আকার পর্যালোচনা করো।

৩.৭.১.২ ঃ 1857 সালের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতিয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনতার অসন্তোষ প্রাথমিকভাবে অসামরিক বিদ্রোহের রূপ নেয় যা পরিচালিত হয়েছিল ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বারা পদচ্যুত প্রাক-ঔপনিবেশিক কালের ভারতীয় রাজকর্মচারী, জমিদার, কর্মবিচ্যুত মুঘল সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা। ভারতীয় কৃষক এবং কারিগরদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজ শাসন সৃষ্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কথা বলা যায়। এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও বাংলার অধিকারচ্যুত জমিদারদের দ্বারা (1763-1800) এবং এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কর্মবিচ্যুত সেনাগণ, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক শ্রেণী এবং সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যারা কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। চুয়াড় বিদ্রোহও (1766-1772) ছিল একটি অভ্যুত্থান যা বাংলা এবং বিহারের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এইরূপ অভ্যুত্থান সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই বিদ্রোহগুলির মুখ্য কারণ ছিল প্রথাগত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিচ্যুতি ও অবনমন। ঔপনিবেশিক সরকারের সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের পন্থা ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি আলগা করে দেয়। ফলে ঐতিহ্যিক অর্থনীতিকে পুনর্বহাল করার তাগিদে জমিদার, কৃষক সকলেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই অসামরিক বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল 1857 সালে মহাবিদ্রোহের সময় যখন প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সামন্ত নেতাদের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও কারিগর এই মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে 1857 র পর কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কারণ 1857-র মহাবিদ্রোহের পর দেশীয় রাজন্যবর্গ হয় পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছিল অথবা ইংরেজরা নানা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে এসেছিল। ফলে পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলির ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি হিসেবে কৃষকরাই সামনে থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে থাকে।

> *১৮৫৭ সালের পূর্বে বিদ্রোহগুলির মুখ্য কারণ ছিল প্রথাগত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিচ্যুতি ও অবনমন।*

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা বা আদিবাসী সমাজগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং কখনো কখনো তারা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। 'Tribe' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় 'caste' বা জাতিপ্রথা থেকে এই জনগোষ্ঠীগুলিকে পৃথকীকরণের জন্য। তবে প্রাক-ঔপনিবেশিক সমাজে উপজাতিগুলি সমাজের মূল প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেটি ইতিহাসে একটি পৃথক আলোচনার বিষয়, বর্তমান আলোচনায় এই বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনার সুযোগ নেই। ঔপনিবেশিক শাসন উপজাতিদের জীবনে এক নতুন ধরনের দুঃখ দুর্দশা বহন করে এনেছিল যা ইতিপূর্বে তারা কখনো লাভ করেনি। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা ও মিশনারীদের কার্যকলাপ আদিবাসী অঞ্চলে চালু হলে সরল প্রাণ, সাদাসিধা আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদারদের শোষণ ও মহাজনদের প্রবঞ্চনার শিকার হয়। 1757 থেকে 1857 খ্রীঃ মধ্যে সংগঠিত অসংখ্য উপজাতি বিদ্রোহের মধ্যে কোল বিদ্রোহ (1820-1837) এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855-56) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রশ্ন

১। ১৯৫৭ সালের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সমন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এদেশীয় কৃষকশ্রেণী। ফলে প্রথম দিকের কৃষক বিদ্রোহগুলির মেরুদণ্ড ছিল এই কৃষক শ্রেণী যা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। বিশেষ সরকারী নথিপত্রের অভাবে সব কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারিনা। অনেক অজানা, ছোট ছোট কৃষক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। কিছু কিছু কৃষক বিদ্রোহ আবার ধর্মীয় রূপও পরিগ্রহ করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ওয়াহাবী আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলন এবং কুকা আন্দোলন।

৩.৭.১.৩ ঃ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধ আন্দোলন

1765 খ্রীঃ বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, যা তৎকালীন সময়ে সুবা বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, তা কিন্তু ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক কার্যকলাপকে একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করেছিল। তখন থেকেই কোম্পানীর শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল যতটা সম্ভব কম বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি করা যা অনিবার্যভাবেই কৃষকদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাছাড়া এইসময় বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের বহু প্রাচীন প্রথা, জীবন ও জীবনের মানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বিকল্প পরিকাঠামো সেখানে গড়ে ওঠেনি। নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কৃষক, পুরানো জমিদার এবং সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্নভাবে ক্ষতি করেছিল যা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়া। এই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনকে অসংখ্য প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সমস্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ এবং চুয়াড়দের অভ্যুত্থান।

প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৩.৭.১.৪ ঃ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (1763-1800) ঃ উদ্ভব এবং বিকাশ

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল W.W. Hunter-এর *Annals of Rural Bengal*, Suprakash Roy-এর "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" A. N. Chandra এর *The Sannyasi and Fakir Rebellion*, Atish Dasgupta-এর *The Fakir and Sannyasi Uprisings*, Ananda Bhattacharya-এর *Sannyasi and Fakir Uprising in Bengal in the Second Half of the Eighteenth Century* (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপ্রকাশিত গবেষণা পুস্তক 1991) এবং Suranjan Chatterjee-এর *New Reflections on the Sannyasi Fakir and Peasant War*. (*EPW*তে প্রকাশিত 1984)।

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের উদ্ভব ঘটেছিল অদ্বৈত স্কুলের দশটি শাখা থেকে যা দশনামী নামে পরিচিত।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সামাজিক উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকমহলে দীর্ঘদিন ধরে একটি বির্তক চালু আছে। কোন কোন গবেষক মনে করেন যে সন্ন্যাসীরা ছিলেন বহিরাগত যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলায় এসেছিলেন। অবশ্য কিছু গবেষক সন্ন্যাসীদের বাংলা প্রেসিডেন্সির অধিবাসী হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরা অন্যান্য অধিবাসীদের মতোই

ব্রিটিশদের অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বলে তারা মনে করেন। এই বিতর্ক থেকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে আমাদের সন্ন্যাসী ও ফকিরদের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট এবং তাদের আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের উদ্ভব ঘটেছিল অদ্বৈত স্কুলের দশটি শাখা থেকে যা দশনামী নামে পরিচিত। এই দশটি শাখা হল — গিরি (*Giri*), পুরি (*Puri*), ভারতী (*Bharati*), বান (*Ban*), অরণ্যা (*Aranya*), প্রভাত (*Prabat*), সাগর (*Sagar*), তীর্থ (*Tirtha*), আশ্রম (*Ashram*), সরস্বতী (*Saraswati*)। অদ্বৈত দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য দেশের চারপ্রান্তে চারটি মঠ বা ধর্মোপাসনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে এই দশটি নাম গ্রহণ করতেন। এইভাবে শঙ্করাচার্যের দশনামী ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শত বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণে বিশ্বাসী ছিলেন যারা নাগা (*Naga*) সন্ন্যাসী নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অপর গোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছিলেন। তারা অবিবাহিত থাকার নীতি পরিত্যাগ করে বিবাহ করেছিলেন এবং একটি স্থিরীকৃত জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছিলেন। স্থায়ী সন্ন্যাসীরা গোঁসাই (Gossains) নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সন্ন্যাসীরা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মঠগুলি ব্যবসা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্রে চলে আসে। বহু সন্ন্যাসী কাঁচা রেশম, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবসায় নিযুক্ত হন। এলাহাবাদ, বান্দা, অযোধ্যা, ঝাঁসী, রাজপুতানা, শাহাবাদ, রামগড়, ঢাকার রমনা প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য মঠের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিম্মত বাহাদুর, মতি গিরি, পুরাণ গিরি, গণেশ গিরি, মোহন গিরি, বেনি গিরি প্রভৃতি সন্ন্যাসী নেতারা উত্তর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে দলাদলি শুরু হয়েছিল, তার ফলে তারা বেতনভোগী সেনা হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। ধনী সন্ন্যাসীরা টাকা ধার দেওয়ার কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে তীর্থযাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করতেন।

প্রশ্ন

১। দশনামী বলতে কি বোঝ?

ফকিররা সুফী ঐতিহ্যের কাছে তাদের উদ্ভবের জন্য ঋণী ছিলেন। সুফী ঐতিহ্যবাহী ফকিরদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ ছিল। যেমন — মাদারিয়া (Madariya), কালানন্দ্রিয়া (Kalandriya) প্রভৃতি। ফকিরদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মাদারিয়া (Madariya) ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। মাদারি ফকিরদের আবির্ভাব ঘটেছিল সুফী সাধক বাদীউদ্দীন শাহ-ই-মাদর বা সৈয়দ বাদীউদ্দীন মাদার এর প্রচারিত শিক্ষার মাধ্যমে। তিনি মাখনপুরে বাস করতেন। 1659 খ্রীঃ বাংলার শাসক শাহ সুজা একটি সনদের মাধ্যমে ফকিরদের কিছু সুবিধা প্রদান করেছিলেন যার মাধ্যমে ফকিরদের যেকোন স্থানে স্বাধীনভাবে ভ্রমণের অধিকার প্রদান করা হয় এবং ফকিরদের শুল্ক থেকে ছাড় দেওয়া হয়। ফকিররা দরগাতে বসবাস করতেন। মাদারি ফকিরদের দরগাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল গোরক্ষপুর, মাখনপুর, পূর্ণিয়া, মহেশথানগর, শেরপুর, মালদা, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি। ফকিররা ব্যবসা বা টাকা ধার দেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তারা বেতনভোগী সেনা হিসাবে কাজ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাদারিয়া ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ যিনি মাখনপুরে বাস করতেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন মুসা শাহ, চিরাগ আলি শাহ, করম শাহ প্রমুখ।

অতীশ দাশগুপ্ত সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মধ্যে সাদৃশ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে এই দুই বিদ্রোহের মধ্যে শুধুমাত্র বাহ্যিক সাদৃশ্যই লক্ষ্য করা যায় তাই নয়, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়াতেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সন্ন্যাসী ও ফকির, উভয়ের মধ্যেই বাৎসরিক তীর্থযাত্রা ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কারণেই তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের শ্রদ্ধা করতেন এবং সন্ন্যাসী ও ফকিররা গ্রামীণ জনসাধারণের সেবার দান গ্রহণ করতেন। এটা প্রমাণ করে যে, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

পলাশী যুদ্ধোত্তর যুগে শোষণকামী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উদয় হয়েছিল। কোম্পানীর ব্যবসা মূলতঃ কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁতীদের নির্মমভাবে শোষণ করতেন। স্বভাবতই এই ইংরেজ কুঠীগুলি সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাড়িয়েছিল। 1763 খ্রীঃ ফকিররা ঢাকা ফ্যাক্টরী আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের কারণে সমস্ত সিপাহীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে এবং কারখানার মালিক মি. লিসেস্টারও পলায়ন করেন। ফকিররা অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য কারখানাগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। পরে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট এই কারখানাগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। একই বছরে সন্ন্যাসীরা রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া ফ্যাক্টরী আক্রমণ করে। ফ্যাক্টরীর প্রধান মি. বেনেটকে সন্ন্যাসীরা ঘেরাও করে ও পরে তাকে হত্যা করে। 1767 খ্রীঃ প্রায় 5000 সন্ন্যাসী সিরকার সরণে প্রবেশ করে এবং কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে কোম্পানীর প্রচুর ক্ষতি হয়। এই সময় থেকে উত্তরবঙ্গ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

1770 খ্রীঃ বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর প্রকৃত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 1770 খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। খাদ্যের অভাবে মানুষ গাছের পাতা, ঘাস খেতে লাগল। শেষপর্যন্ত তারা মানুষের শবদেহ পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। একসময়কার শান্ত সুন্দর পল্লীগ্রামগুলি মৃত্যু এবং জনগণের বর্হিগমনের ফলে গভীর বনাঞ্চলে পরিণত হল। পরিত্যক্ত গ্রাম, মাইলের পর মাইল কৃষিকার্যে অব্যবহৃত জমি, পশুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত গ্রামীণ গভীর বনাঞ্চল — এটাই হয়ে উঠেছিল দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সময়ে বাংলার গ্রামীণ সমাজ-চিত্র। কিন্তু বহু মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণ 1771 খ্রীঃ যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা প্রমাণ করে যে দুর্ভিক্ষের পর মানুষ যখন ক্ষুধার্ত, দিশাহীন মৃত্যুপথযাত্রী তখনও কিন্তু কোম্পানীর সরকার গ্রামীণ জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি। বরং নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়ে গিয়েছিল যার অনিবার্য ফল ছিল চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি।

> *কোম্পানী সরকার নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়ে গিয়েছিল, অনিবার্য ফলস্বরূপ ছিল চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাজস্বের পরিমাণের উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি।*

1771 খ্রীঃ প্রথম আড়াই দশকে হাজার হাজার সন্ন্যাসী সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিং, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানে একত্রিত হতে শুরু করেন। মজনু শাহ 1771 খ্রীঃ মার্চ মাসে বাংলায় প্রবেশ করেন। 1772 খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে রাজশাহীর সরকারী পরিদর্শক একটি রিপোর্টে বর্ণনা করেছেন ফকিররা কিভাবে কাছারি থেকে 1,000 টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। জয়াসীনের কাছারি থেকেও ফকিররা 1690 টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই সময়ে মজনু শাহ ও তার অনুগামীরা বগুড়া ও দিনাজপুর থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। 1772 খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পূর্ণিয়া জেলাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীরা রংপুরের ভবানীগঞ্জ কাছারিও আক্রমণ করে। 1772 খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে রংপুরে কোম্পানীর বাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে কোম্পানীর বাহিনী পরিচালিত হয়েছিল। এই বাহিনী 1772 খ্রীঃ 30শে

ডিসেম্বর রংপুরের শ্যামগঞ্জে হাজারেরও বেশী সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করে। প্রাথমিকভাবে সিপাহীরা জয় লাভ করে এবং সন্ন্যাসীরা পলায়ন করে। ক্যাপ্টেন টমাস এবং তাঁর সিপাহীরা সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করেন এবং সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে তাদের সব গোলাবারুদ ব্যবহার করে ফেলেন। সন্ন্যাসীরা উপলব্ধি করে যে কোম্পানীর বাহিনীর সব গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে তখন তারা সিপাহীদের ঘিরে ধরে আক্রমণ চালায় এবং ক্যাপ্টেন টমাসকে হত্যা করে। সিপাহীদের গোপন আস্তানা চিনিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীদের সাহায্য করে। গ্রামবাসীরা অনেকে নিজেরা লাঠি হাতে সন্ন্যাসীদের দলে যোগদান করে। সন্ন্যাসীদের এই সাফল্য ঔপনিবেশিক শাসকদের বিচলিত করেছিল।

প্রশ্ন

১। ফকির বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করো।

ঔপনিবেশিক শাসকদের রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসীরা কোন প্রকার শুল্ক ছাড়াই জমি ভোগ করার অধিকার ভোগ করত। এই শুল্কহীন জমি ময়মনসিং, দিনাজপুর, রংপুর, মালদা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান ছিল। কোম্পানীর সরকার এই শুল্কহীন রায়তীস্বত্বকে তাদের আয়ের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করেছিল। আর এই কারণেই কোম্পানী শুল্কহীন রায়তীস্বত্বকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। এই ব্যবস্থা সন্ন্যাসী ও মঠগুলির উপর দারুণ আঘাত এনেছিল কেননা সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত শুল্কহীন রায়তীস্বত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া সন্ন্যাসী ও ফকিররা জনসাধারণের কাছ থেকে যে সেবার দান গ্রহণ করত, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, তাও তাদের রাজস্ব বৃদ্ধির পরিপন্থী। সন্ন্যাসীরা অনেক সময় জমিদারদের টাকা ধার দিতেন। এই টাকা দিয়ে জমিদার তাঁর খাজনা পরিশোধ করত। বিনিময়ে জমিদারদের কাছ থেকে সন্ন্যাসীরা কিছু সুদ পেতেন। কিন্তু কোম্পানীর সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং সুদের হার কমিয়ে দেয়। কোন পীরের মৃত্যুর পর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দিনাজপুরের নেকমার্ডের হাটে বিক্রীত দ্রব্যের উপর সন্ন্যাসীরা যে কর সংগ্রহ করত সেখানেও কোম্পানী হস্তক্ষেপ করে। কোম্পানীর সরকার অস্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ভ্রমণের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল।

সন্ন্যাসী ও ফকিরা কিছুটা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী।

1776 খ্রীঃ পর থেকে একদিকে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহী এবং কোম্পানীর সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিররা সরকারী রাজকোষ, কাছারী লুঠ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এইভাবে মজনু শাহ 1781 খ্রীঃ রাজশাহী জেলা থেকে 5,000 টাকা লাভ করেছিলেন। 1783 খ্রীঃ মালদা ফ্যাক্টরীর এজেন্ট মি. গ্রান্ট এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জনসাধারণের থেকে রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত সরকারী অর্থ ফকিররা লুঠ করেছিলেন। 1786 খ্রীঃ আবার মজনু শাহ দিনাজপুর জেলার গিলবাড়ী পরগণার তহশিলদারকে অপহরণ করে অর্থ দাবী করেন। মজনু শাহ ছাড়া ফকিরদের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন মুসা শাহ, করম শাহ, চিরাগ আলি শাহ, জেহরি শাহ প্রমুখ। 1783 খ্রীঃ থেকে মুসা রংপুর এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে শুরু করেন। 1787 সালের জুলাই-আগস্ট মাসে মুসা শাহ দিনাজপুর জেলায় বেশ কয়েকটি সরকার-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই আক্রমণের সময় তিনি সরকারী রাজকোষ লুণ্ঠন করেন এবং কোম্পানী রাজস্ব হিসাবে যে অর্থ জমা ছিল তা ছিনিয়ে নেন। 1790 সালে ময়মনসিং জেলায় চিরাগ আলির নেতৃত্বে ফকিররা সরকারী রাজস্ব লুণ্ঠন করে।

ফকিরদের পাশাপাশি, সন্ন্যাসীরাও বাংলা প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন প্রদেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। 1770 খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ বাংলার তাঁতীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিল। ফলে বহু কর্মচ্যুত তাঁতী সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। 1774 খ্রীঃ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে প্রদত্ত একটি রিপোর্টে বলেন যে রংপুর জেলায় রাজস্ব আদায় সন্ন্যাসীদের অবিরত আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের ফলে ব্যাহত হচ্ছে। এই সময়ে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীর সংখ্যা 50,000 ছড়িয়ে গিয়েছিল। 1773 খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে প্রায় 5,000 সন্ন্যাসী ময়মনসিং জেলায় জাফরশাহী পরগণা আক্রমণ করে 1,600 টাকা সংগ্রহ করেন। মোতি গিরি, ধর্ম গিরি প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন জমিদারদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। 1780-র দশকে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণী নামে দুজন সন্ন্যাসী নেতার আবির্ভাব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে এই দুই নেতার কার্যকলাপকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলক এবং অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। এই বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিকৃত ছবিকে তুলে ধরে। ভবানী পাঠক রংপুর, ময়মনসিং এবং বগুড়া জেলায় সক্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন বাজপুরের বাসিন্দা এবং তিনি ফকির নেতা মজনু শাহর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। 1787 খ্রীঃ ভবানী পাঠক ও তাঁর অনুগামীরা বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করেন এবং ব্রিটিশ বণিকদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। 1787 খ্রীঃ লেফটেন্যান্ট ব্রেনান (Brennan) এর সঙ্গে সংঘর্ষে পাঠক মারা যান। সরকারী রিপোর্ট এবং রংপুর জেলা অভিধান থেকে জানা যায় যে দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন ছোট জমিদার যিনি ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন। দেবী চৌধুরাণী সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতে না পেরে পলায়ন করেন এবং বিদ্রোহে যোগ দেন। ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পর তিনি আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন।

1800 খ্রীঃ নাগাদ সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ অস্তমিত হয়ে আসে। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে শোভন আলি শাহ একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি দিনাজপুর জেলার শালবাড়ী পরগণা অঞ্চলে সরকারী রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করেন। 1793 খ্রীঃ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একটি যৌথ দল রাজশাহী জেলায় বিদ্রোহ পরিচালনা করে। 1799 সালে সরকার শোভন আলিকে গ্রেপ্তারের জন্য 4,000 টাকা পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করে। 1800 সালের পর এই আন্দোলন পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

যামিনী মোহন ঘোষ এবং আধুনিক গবেষক আনন্দ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সন্ন্যাসী ও ফকিররা ছিল বহিরাগত এবং বাংলায় তাঁদের কোন সামাজিক ভিত্তি ছিল না। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বহু নেতা যেমন মজনু শাহ, উত্তর ভারতের জেলাগুলি থেকে এসেছিলেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ তথ্যগুলি 5,000, 1,000 এমনকি 50,000 সন্ন্যাসী এবং ফকিরের একত্রিতকরণের কথা বলে। সুপ্রকাশ রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন যে 70 এবং 80-র দশকে দুর্ভিক্ষের পর যখন বাংলায় চরম দারিদ্র্য এবং কোনরূপ খাদ্যশস্য, অর্থ কিছুই ছিল না তখন কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বহিরাগতরা বাংলায় প্রবেশ করবে। দ্বিতীয়ত, অসংখ্য বিদ্রোহ, ক্যাপ্টেন টমাসের হত্যা সংক্রান্ত ঘটনা, (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রমাণ করে যে, বৃহৎ নেতা বা নেত্রীদের নেতৃত্বে যে দরিদ্র কৃষক, তাঁতীরা একত্রিত হয়েছিল তারা কিন্তু বাইরের কেউ ছিলেন না বরং তারা ছিলেন বাংলার মাটিতেই বেড়ে ওঠা মানুষ। তাঁরাই ছিলেন এই আন্দোলনের মূল পরিচালিকা শক্তি। সুতরাং সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ বহিরাগতদের কোন আন্দোলন ছিল না, বরং এটা ছিল এদেশীয় জনতার আন্দোলন। উপরোক্ত আলোচনার পর সুপ্রকাশ রায়ের এই বক্তব্য আমাদের যথেষ্ট গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

৩.৭.১.৪.১ ঃ তাৎপর্য

সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রথম প্রতিরোধ অন্দোলন যা প্রায় 40 বছর (1763-1800) ধরে স্থায়ী হয়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডব্লু. ডব্লু. হান্টার 'সন্ন্যাসী', 'ফকির', 'দস্যু' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার

করেছেন। অন্যান্য ব্রিটিশ কাগজপত্র বা তথ্যগুলিতে সন্ন্যাসীদের ‘ডাকাত’, ‘লুণ্ঠনবাজ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নথি অনুযায়ী এরা অশান্তি সৃষ্টি এবং শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করত। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে নানা আদেশ প্রণয়ন করেছিলেন। যামিনী মোহন ঘোষ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মধ্যে হিংসা ও দস্যুতা ব্যতীত আর কিছুই খুঁজে পাননি।

প্রশ্ন

১। সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের তাৎপর্য বর্ণনা করো।

আমরা ইতি পূর্বে বিদ্রোহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে চিহ্নিত করেছি। বিদ্রোহের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহীরা সর্বদাই কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিল। দরিদ্র জনগণকে তারা কখনো আক্রমণ করেনি। তাঁরা কোম্পানীর সেনা অফিসারদের হত্যা করেছিল। সুরঞ্জন চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন যে বিদ্রোহীরা মনে করেছিল যে, যদি কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে তা প্রশাসনের ওপর তীব্র আঘাত হানবে। সুতরাং এই দাবি করা অযৌক্তিক হবে না যে সন্ন্যাসী এবং ফকিররা কিছুটা রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী।

মজনু শাহ 1772 খ্রীঃ নাটোরের মহারাণী ভবানীর কাছে যে পিটিশন দাখিল করেছিলেন সেখানে তিনি ভবানীকে ফকিরদের দিকে যত্ন নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন, কারণ ভবানী ছিলেন দেশের শাসক। সুতরাং ফকির এবং সন্ন্যাসীদের কাছে নবাগত কোম্পানীর প্রশাসন ছিল বিদেশী এবং তারা দেশে কোম্পানীর শাসনকে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। অতীশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে প্রথাগত শাসকদের প্রতি এই বিশ্বস্ততা ছিল বিপ্লবীদের একটি নৈতিক ভাষ্য।

সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন যে, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিকশিত হওয়া কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে সংগঠিত দরিদ্র কৃষক, কর্মচ্যুত সৈনিক, তাঁতী এবং সমাজের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষের স্বপ্নের সমবেত রূপ।

এ.এন. চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, যদিও সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল তথাপি এই বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে ভারতের কৃষক সম্প্রদায় সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণে সহায়তা করেছিল।

৩.৭.১.৪.২ ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ

চুয়াড়রা ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায় যারা জঙ্গল মহলে বসবাস করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্বে জঙ্গল মহল বিস্তৃত ছিল মেদিনীপুর থেকে রাচী, বাকুড়া এবং পুরুলিয়া ও বীরভুম জেলার কিছু অংশে। অষ্টাদশ শতকের 70 এর দশক থেকে চুয়াড়রা ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন কিন্তু চুয়াড়দের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল 1798-99 খ্রিঃ যা ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পর্কে পুরনো রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেদিনীপুরের সেটলমেন্ট অফিসার J. C. Price এর ‘দ্য চুয়াড় রিবেলিয়ান’ (*The*

Chuar Rebellion)। পরবর্তী কালে তিনজন গবেষক চুয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এস. বি. চৌধুরী (S. B. Chaudhuri) তাঁর 'সিভিল ডিসটারব্যানসেস ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া (*Civil Disturbances During the British Rule in India*), সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' এবং বিনোদ এস. দাস (Binod S. Das) তাঁর 'সিভিল রিবেলিয়ান ইন দ্য ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল (*Civil Rebellion in the Frontier Bengal*) এবং 'চেঞ্জিং প্রোফাইলস অব দ্য ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল' (*Changing Profiles of the Frontier Bengal*) গ্রন্থে চুয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

চুয়াড়দের সর্দাররা পাইক নামে পরিচিত ছিলেন। পাইকরা বহু শতাব্দী ধরে শুল্কহীন জমি ভোগ করে আসছিলেন। বিনিময়ে তারা শাসককে প্রয়োজনের সময়ে সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। কৃষকরা পাইকদের এই শুল্কহীন জমিতে চাষাবাদ করতেন। এই জমিগুলি পাইকান জমি বা পাইকজাগীর নামে পরিচিত ছিল যা জঙ্গল মহলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পাইকান জমিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। যে কোন ধরনের শুল্কহীন জমি মানেই তা আর্থিক ক্ষতির কারণ বলে কোম্পানী মনে করেছিল। সুতরাং কোম্পানী পাইকান জমিগুলি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ব্যবস্থা জঙ্গল মহলের সমগ্র পাইক সম্প্রদায় এবং কৃষককে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফার্মিং সিস্টেমের প্রবর্তন অধিকাংশ জমিদারকে সংশ্লিষ্ট স্থানে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) পর জঙ্গল মহলের জমিদাররা সঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান করতে ব্যর্থ হয় এবং জমিদারী থেকে অধিকারচ্যুত হয়ে আরও বেশী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাছাড়া কোম্পানী নুন উৎপাদনের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ফলে নিমকি মহলও সংকটের সম্মুখীন হয়।

চুয়াররা ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায় যারা মূলত জঙ্গল মহলে বসবাস করতেন। এরা সর্দার এবং অধিকারচ্যুত জমিদারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতেন। জে.সি. প্রাইস এর মতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাইকান জমি অধিগ্রহণ ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের মূল কারণ।

শস্যের ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরে 1770 এর দুর্ভিক্ষ জঙ্গল মহলের আদিবাসী কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢাল ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিতে চাননি। জগন্নাথ ঢাল 1774 খ্রীঃ বিদ্রোহ করেন এবং এই সময়ে চুয়াড়রা কোম্পানীর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 80'-র দশক থেকে জঙ্গল মহলের সংকট একটি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং চুয়াড়রা সর্দার এবং অধিকারচ্যুত জমিদারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করতে থাকেন। 1783, 1789-90 এবং 1792 খ্রীঃ চুয়াড়রা যথাক্রমে কালিয়াপাল, রামগড় এবং পাটক্যুমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাটক্যুম অঞ্চলের বিদ্রোহ ছিল সর্ববৃহৎ যা জলদা, রামগড় এবং তোমার অঞ্চলে 1794 খ্রীঃ মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। 1795 খ্রীঃ সংকট আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে যার শেষ পরিণতি ছিল 1798-99-এর বিধ্বংসী বিদ্রোহ।

1795 খ্রীঃ পাচেট জমিদারী বিক্রীর জন্য ঘোষিত হয়েছিল। 1798 খ্রীঃ দুর্জন সিং, যিনি ছিলেন রায়পুরের জমিদার তাঁর অধিকার থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। 1798 খ্রীঃ ক্ষমতাচ্যুত দুর্জন সিং 1,500 জন চুয়াড়ের সহযোগিতা নিয়ে রায়পুর পরগণা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা বাজার এবং কাছারিতে অগ্নিসংযোগ করে। ক্রমশ অসন্তোষ প্রসারিত হতে থাকে। বছরের শেষে বাসুদেবপুর, তমলুক, কাশিজোড়া, জলেশ্বর, বলরামপুর, রামগড়, শালবনী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ প্রসারিত হয়। 1799 খ্রীঃ বিদ্রোহ আরো সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করে। 1799 খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাস থেকে চুয়াড়দের অত্যাচারের স্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরে মেদিনীপুরের কালেক্টর জে. ইমহফ (J. Imhoff) অসংখ্য চিঠি ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠান। গ্রাম পোড়ানো হয়েছিল, খাদ্যশস্য লুট করা হয়েছিল এবং যারা চুয়াড়দের বিরুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে কথা বলেছিল তাদের তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়েছিল। কর্ণাগর (Karnagar)-এর রাণী সহ অসংখ্য অধিকারচ্যুত জমিদার চুয়াড়দের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। 1799 খ্রীঃ এপ্রিল মাসের

দ্বিতীয় সপ্তাহে মেদিনীপুরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার আনন্দপুর চুয়াড়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এমনকি মেদিনীপুর শহরেও আক্রমণের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছিল। একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং নিষ্ঠুর দমননীতির দ্বারা কোম্পানীর সরকার কোনক্রমে চুয়াড়দের দমন করতে সক্ষম হয়।

চুয়াড় বিদ্রোহের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে জে. সি. প্রাইস (J. C. Price) দেখিয়েছেন যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাইকান জমি অধিগ্রহণ বিদ্রোহের মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মতে চুয়াড় বিদ্রোহ ছিল বন্য প্রতিরোধমূলক এবং এই কারণেই তা, Price এর মতে, চরম নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বিনোদ এস. দাস চুয়াড় বিদ্রোহকে সাধারণ মানুষের আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন কারণ তা সাধারণ জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল। সুতরাং চুয়াড়দের যে নিষ্ঠুরতা তা একেবারে নির্বোধ ছিল না কারণ তা সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছিল। সুপ্রকাশ রায় দেখিয়েছেন যে, যদিও ঔপনিবেশিক শাসকরা চুয়াড়দের অসন্তোষের কারণগুলি অনুধাবন করেছিল তথাপি চুয়াড়দের নিষ্ঠুরতায় তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল। সুপ্রকাশ রায় মনে করেন যে চুয়াড়দের এই নিষ্ঠুরতা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিক্রিয়া। ঔপনিবেশিক শাসকরাই এই নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও চুয়াড়রা ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এস. বি. চৌধুরী যথাযথই বলেছেন যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাই চুয়াড়দের একটি শক্তিশালী বিদ্রোহ গড়ে তোলার মূল উপাদান সরবরাহ করেছিল।

প্রশ্ন

১। চুয়াড় কাদের বলা হত ?
২। চুয়াড়রা কেন বিদ্রোহ শুরু করেন ?

৩.৭.১.৪.৩ ঃ রংপুর বিদ্রোহ

কোম্পানী নিযুক্ত ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে সংগঠিত রংপুরের কৃষক অভ্যুত্থান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত। ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল অতি অল্প খরচে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়। ওয়ারেন হেস্টিংস এই পথের সূচনা করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব আদায় এবং মূল্যায়নের জন্য একটি 'কমিটি অব সার্কিট' গঠন করেন। সর্বাধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের যিনি প্রতিশ্রুতি দিতেন তার সঙ্গে কোম্পানী জমি বন্দোবস্ত করত। এই ব্যবস্থায় ইজারাদাররা কোম্পানীকে প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করতেন। পাশাপাশি ইজারাদাররা কৃষকের খাজনা সর্বাধিক হারে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতেন এবং এই জন্য কৃষকদের ওপর বলপ্রয়োগও চলত। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষকশ্রেণী। কৃষকদের যখন সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হত তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করত। রংপুর বিদ্রোহ ছিল এই ধরনেরই কৃষক অসন্তোষের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যা ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

দেবী সিংহ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী যিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি পশ্চিম ভারত থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন এবং কোম্পানীর ইজারাদারে পরিণত

প্রশ্ন

১। রংপুর বিদ্রোহ সমন্ধে যা জানো লেখ।
২। রংপুরে কারা কীভাবে বিদ্রোহ করেছিল ? এই বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও তাৎপর্য বর্ণনা করো।

হয়েছিলেন। তিনি পূর্ণিয়া (বিহার) জেলা থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছিলেন এবং এর শাসক হয়েছিলেন। দেবী সিংহ নায়েব নাজিম রেজা খানকে 16 লক্ষ টাকা দিয়ে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। দেবী সিংহের সরকার পূর্ণিয়াতে একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁর প্রতিনিধিদের একটি অংশের উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে সর্বাধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা। নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে জনগণ পূর্ণিয়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে। ফলে ঐ অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়ে যেতে থাকে। দেবী সিংহের অত্যাচারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তিনি হেস্টিংসের দ্বারা বরখাস্ত হন। কিন্তু দেবী সিংহ হেস্টিংসকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করেন এবং প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হন। তিনি ইজারা কিনতে থাকেন এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। 1780 খ্রীঃ তিনি মুর্শিদাবাদের একজন ছোট রাজা রাধানাথ সিংহের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 1781 খ্রীঃ দেবী সিংহ রংপুর এবং দিনাজপুরের প্রতিবেশী পরগণার ইজারা ক্রয় করেন।

ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যছিল অল্প খরচে সর্ব্বোচ্চ রাজস্ব আদায়। রংপুরের কৃষক অসন্তোষ ব্রিটিশ প্রশাসনকে আতঙ্কিত করে তোলে।

পূর্ণিয়ার ন্যায় রংপুর এবং দিনাজপুরেও তিনি যে কোন উপায়ে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই অঞ্চলে রাজস্বের হার অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ রাজস্ব ছাড়াও তার প্রতিনিধিরা নানা প্রকার কর আরোপ করত যা সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও দুর্দশাপূর্ণ করে তুলেছিল। দেবী সিংহের প্রতিনিধিদের হাত থেকে রায়তদের পলায়নের কোন পথ ছিল না। রায়তরা যদি বকেয়া মেটাতে ব্যর্থ হত তাহলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। রায়তরা রাজস্ব কমানোর উপযুক্ত কারণ দর্শালেও তাদের বকেয়া কখনও কমানো হত না। রাজস্বের জন্য নিষ্ঠুর অত্যাচার কৃষকদের শেষপর্যন্ত জমিদারের কাছে যেতে বাধ্য করত। হাজার হাজার কৃষক জমি হারিয়েছিলেন। তাঁরা গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি জমিদাররা যারা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারাদারদের সাথে স্বত্বভোগী হিসাবে কাজ করত তারাও দেবী সিংহর হাত থেকে নিস্তার পায় নি। এই জমিদাররাও অনেক ক্ষেত্রে দেবী সিংহের অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা নানাভাবে অপমানিত হত। জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে পিটিশন পাঠানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে রংপুরের উন্মত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের সামনে প্রতিরোধ ব্যতীত আর কোন পথ খোলা ছিলনা। 1783 খ্রীঃ 18 ই জানুয়ারী বিভিন্ন গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় টেপা (Tepa) গ্রামে সংঘবদ্ধ হন এবং দেবী সিংহের রাজত্বের অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা নিজেদের একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে। বিদ্রোহীদের সরকার পাঁচ সপ্তাহ টিকে ছিল। বিদ্রোহীরা নুরুলউদ্দীনকে তাঁদের নেতা এবং অপর একজন কৃষক দয়ারাম শীলকে তার সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করে।

নুরুলউদ্দীন স্থানীয় কৃষকদের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেবী সিংহকে খাজনা প্রদান করতে নিষেধ করেন। কৃষকরা জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটি তহবিলও গঠন করে। এই বিদ্রোহ কোচবিহার ও দিনাজপুরে প্রসারিত হয়েছিল। রাজকোষ, কাছারি এবং স্থানীয় জেলগুলি আক্রান্ত হয়েছিল এবং দেবী সিংহের প্রতিনিধিদের হত্যা অথবা বিতাড়িত করা হয়েছিল। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ বন্দী কৃষকদেরকেও তারা মুক্ত করেছিল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল। অসংখ্য কৃষক লাঠি, তীর, বর্ষা, বল্লম নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। মণ্ডলঘাটের দুইপ্রান্তে একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে রংপুর বিদ্রোহের নেতা নুরুলউদ্দীন গুরুতরভাবে আহত হন। দয়ারাম শীলকে হত্যা করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিদ্রোহীরা পাটগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হন। কয়েক শত বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কয়েক শত বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পিটারসনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্টে এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দেবী সিংহকে দায়ী করা

হয়েছিল। কিন্তু হেস্টিংস দেবী সিংহের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি অপর একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি খণ্ডন করেছিলেন।

রংপুর বিদ্রোহের তাৎপর্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম থেকেই দেবী সিংহের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁরা শ্রেণী, জাতি এবং ধর্ম প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধী দল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েই তাদের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষক বিদ্রোহ যদিও তার নেতৃত্ব এসেছিল গ্রামপ্রধান বা বসুনিয়াদের (Bosuneahs) কাছ থেকে। এরা সাধারণ জনতার আস্থা অর্জন করেছিলেন। তৃতীয়তঃ রংপুর বিদ্রোহের তাৎপর্যকে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করা হয়ে থাকে। এই বিদ্রোহ ইজারাদারদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে পেরেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনীর দমননীতি সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁরা আমৃত্যু তাদের দাবীগুলির প্রতি অনুগত ছিল। তাৎক্ষণিক অর্থে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু সুদূরপ্রসারীভাবে বিচার করলে বলা যায় এই বিদ্রোহ পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। রংপুর বিদ্রোহ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিল ইজারা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক হতে, আর এটি ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে অনুপ্রাণিত করেছিল রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে। যার প্রকাশ ঘটেছিল 1793 খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে।

৩.৭.১.৪.৪ ঃ কোল বিদ্রোহ (1832)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপজাতিগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশী আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক 'Tribe' এই শব্দটি কিছু জনগোষ্ঠীকে 'Caste' থেকে পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসন আসার পর আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি আর বিচ্ছিন্ন থাকেনি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বলপূর্বকভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে গ্রাস করে নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর মধ্যে আদিবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিগুলি ব্রিটিশদের শোষণের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধানকে জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করে নতুন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন আদিবাসী এলাকাগুলিতে খ্রীস্টান মিশনারীদের আগমনকে সাহায্য করেছিল। সাঁওতাল, কোল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজস্ব আদায়কারী প্রভৃতি শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। শহুরে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান চাবিকাঠি। মধ্যবিত্তরা ছিল মূলতঃ বহিরাগত যারা বলপূর্বকভাবে কৃষকদের জমিগুলিকে ভোগ দখল করছিল। এইভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকারচ্যুত হয়েছিল যা তারা বহুকাল ধরে ভোগ করে আসছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি ভূমিচ্যুত হয়ে কৃষি শ্রমিক, ভাগচাষী এবং ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া

> *শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান চাবিকাঠি। উপজাতিরা ব্রিটিশদের শোষণের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিল।*

প্রশ্ন

১। কোল বিদ্রোহ কীভাবে গড়ে ওঠে ?

২। কোল বিদ্রোহের উদ্ভবের কারণগুলি কি ?

৩। কোল বিদ্রোহ সম্বন্ধে যা জান লেখ ?

আদিবাসীরা শৈশবকাল থেকে যে জঙ্গলের অধিকার ভোগ করে আসছিল তা থেকেও তাঁরা বিতাড়িত হয়। ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের সহযোগীরা বন্য জমিগুলিকে বেআইনীভাবে দখল করেছিল এবং বিভিন্ন বনোৎপাদিত দ্রব্য, বন্য জমি এবং সাধারণ জমির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

ছোটনাগপুর অঞ্চল 1820 খ্রীঃ-এ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় আসে। ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় কোলদের পূর্বের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কোম্পানী সরকার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলের জমিগুলির ইজারা দেয়। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দু, শিখ অথবা মুসলিম মহাজন। কোল সম্প্রদায় এদের বহিরাগত বা ডিকু নামে সম্বোধন করতেন। ভূস্বামী এবং ইজারাদাররা কিভাবে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করা যায় কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সচেষ্ট ছিলেন। ফলে কোলদের উপর রাজস্বের চাপ বাড়তে থাকে। সময়ের সাথে সাথে কোলরা তাদের বহু জমি হারায় কেবল রাজস্ব না দিতে পারার অপরাধে। এই রূপ পরিস্থিতিতে ইজারাদাররা নানারকম আইনী-বেআইনী উপরি কর আদায় করত কোলদের কাছ থেকে। অন্যথায় জমিদার ও তার প্রতিনিধিদের অত্যাচার ছিল অবধারিত। সরলমতি কোলদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হত। পুরুষদের উপর তীব্র অত্যাচার করা হত। মহিলাদের উপর একইভাবে তীব্র অবমাননা এবং শারীরিক নির্যাতন চালানো হত। তাঁদের ঠিকাদার হিসেবে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কোন পারিশ্রমিক পেত না। এই উপজাতি সম্প্রদায় ছিলেন মাদকাসক্ত যা তারা স্বগৃহে উৎপাদন করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার মদের উপর কর আরোপ করে। কোলদের জমিতে ইংরেজ সরকার আফিমের মত লাভজনক পণ্যশস্য উৎপাদন করতে থাকে। আফিম চাষ করতে কোলরা অনিচ্ছুক ছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কোলরা অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। কোল নেতা বুদ্ধভগৎ, জোয়া ভগৎ, ঝিন্দরাই মানাকি এবং সুই মুণ্ডা কোলদের সংগঠিত করে। 1832 খ্রীঃ রাচীর মুণ্ডা ও ওঁরাওরা সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়। কোলরা বহিরাগত ডিকুদের ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেয়। জে. সি. ঝা (J. C. Jha) মন্তব্য করেছেন, কোল বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ কৃষকদের অসন্তোষের ফলশ্রুতি।

এই বিদ্রোহ দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে। যদিও ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে উপজাতিদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না তথাপি এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের উপর আঘাত করতে পেরেছিল। কোলরা ভূস্বামী, ইজারাদার, মহাজন, শস্য ব্যবসায়ী এবং ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের বাড়িগুলিকে লুঠ অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমনের কোন পন্থা খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত কোলদের শক্ত হাতে দমন করার জন্য ক্যাপটেন উইলকিনসনের অধীনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পাঠানো হয়। প্রবল বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে কোলরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ কৌশল ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের কাছে তারা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রায় দুবছরের প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণী এই অঞ্চলের স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। 1833 খ্রীঃ ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয় বহু কোলের প্রাণের বিনিময়ে, এমনকি মহিলা ও শিশুরাও এই অত্যাচার থেকে বাদ যায়নি।

> *কোল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের উপরে আঘাত করতে পেরেছিল। যদিও এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশরা বহু কোলের প্রাণ নিয়েছিল।*

প্রশ্ন

১। সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ?

কোল বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয় আদিবাসী শ্রেণীর প্রতি তাদের প্রশাসনিক নীতিকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করে। ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উপলব্ধি করেন, সাধারণ আইন উপজাতিয় প্রেক্ষিতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলতে পারে না। তারা বুঝতে পারে এই অঞ্চলগুলি ভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাবী করে। মহাজন ও ভূস্বামীর হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষার জন্য কিছু নিশ্চিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়। তবে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসনের অত্যচারমূলক চরিত্র কিন্তু কোল বিদ্রোহের পরেও স্বমহিমায় উপস্থিত ছিল।

৩.৭.১.৪.৫ ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855)

সাঁওতালরা ছিল পরিশ্রমী, সরলমতি এক কৃষিজীবী উপজাতি বা আদিবাসী শ্রেণী। এরা ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যভাগে 'দামিন-ই-কো' নামক অঞ্চলে বাস করত। পরে এরা প্রধানত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, মালভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ব্রিটিশ ক্ষমতার বিস্তৃতির সাথে সাথে সাঁওতালদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। তারা জমি হারিয়ে ক্রমশ পশ্চিমদিকে সরতে থাকে এবং সেখানেই তাদের নতুন বসতি গড়ে তোলে। এই অঞ্চলটিকে তারা 'দামিন-ই-কো' নামে উল্লেখ করত। 1851 সালে এই 'দামিন-ই-কো' অঞ্চলে প্রায় 1,437 টি সাঁওতাল গ্রাম ছিল এবং প্রায় 82,715 জন সাঁওতাল আদিবাসী এখানে বাস করত।

1855 খ্রীঃ সাঁওতালরা ডিকু বা বহিরাগতদের বিতাড়িত করতে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে কারণগুলি শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের বিদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তা ছিল অনেকটা কোল বিদ্রোহের অনুরূপ। সাঁওতাল বিদ্রোহ হল ভারতের আদিবাসী আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনের প্রধান কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতালরা ভূমি উদ্ধার বা সংস্করণের কাজ খুব সাফল্যের সঙ্গে করত। তারা তাদের পরিশ্রমের দ্বারা ছোটনাগপুরের অনুর্বর জমিকে উর্বর করে তুলেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের সহযোগী দেশীয় জমিদাররা বেআইনীভাবে সাঁওতালদের জমি দখল করতে থাকে। এই দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায় কোনক্রমেই ব্রিটিশ শাসনের বজ্র আঁটুনি থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। এমনকি 'দামিন-ই-কো'তে আসার পরও তারা মুক্তি পায়নি।

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের উপর উচ্চ ভূমিকর আরোপ করে যা বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে ইজারাদার, জমিদার এবং মহাজনরা, যাদেরকে সাঁওতালরা 'ডিকু' নামে সম্বোধন করত। ব্রিটিশ সরকারকে উচ্চ রাজস্ব প্রদান করতে গিয়ে সাঁওতালদের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হত। একবার এই ধারের কবলে পড়লে তার থেকে মুক্তির আর কোন উপায় ছিল না। কারণ মহাজনদের সুদের হার ছিল অস্বাভাবিক বেশী, যা সাধারণত 50 শতাংশ থেকে 500 শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডব্লুউ. ডব্লুউ. হান্টার (W.W. Hunter) দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ সাঁওতাল কৃষকেরই ঋণ পরিশোধ করার মত জমি ছিল না। ফলে তাঁরা মহাজনদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হত। এই ঋণের সুযোগ নিয়ে মহাজনরা তাদের জমিতে সাঁওতালদের বেগার খাটিয়ে নিত। সুতরাং তারা মহাজনের অধীনে দাসে পরিণত হত। এইভাবে সাঁওতালদের অবস্থার অবনতি ঘটতে ঘটতে তারা ভাগচাষী বা ভূমিহীন দিন-মজুরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক মুক্তির প্রেরণা সাঁওতালদের সেই আন্দোলনকে আরো বেশী শক্তিশালী করে তুলেছিল।

তৃতীয়তঃ প্রাত্যহিক জীবনেও সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যা আগে কখনও হয়নি। অধিকাংশ দোকানগুলি ডিকু বা বহিরাগতদের অধীন থাকায় তারা নানাভাবে প্রতারিত হত। যেহেতু তারা পরিমাপের নিয়ম-নীতি এবং আধুনিক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল না তাই তাদের বিভিন্নভাবে ঠকতে হত।

প্রশ্ন ১। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল ? এর গতিপ্রকৃতি আলোচনা করো।

চতুর্থতঃ সাঁওতালরা ডিকুদের বর্বরতার শিকার হয়। প্রায়ই তাদের মারধোর করা হত, অপমানের শিকার হতে হত। সাঁওতাল মহিলাদের উপর মহাজনদের প্রতিনিধি, ইজারাদার, ইউরোপীয় রেলকর্মী ও অন্যান্যরা অত্যাচার এবং শোষণ চালাত।

জমিদার ও মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির স্বার্থও এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল।

পঞ্চমতঃ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সাঁওতালদের জীবনযাত্রার গুণগত মানের অবনতি ঘটে। সাঁওতালরা নিজেদের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু নতুন ঔপনিবেশিক যুগের আইন আদালত, পুলিশী ব্যবস্থা তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। অন্যদিকে নীল চাষের জন্যও নীলকর সাহেবরা সাঁওতালদের উপর অত্যাচার চালাত।

ষষ্ঠতঃ সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপকে সাঁওতালরা প্রশ্রয় দিতে পারেনি। সর্বোপরি, সাঁওতালরা ভবিষ্যতে একটি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল, ঈশ্বর সর্বদা তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে এই বিশ্বাসই সাঁওতালদের আন্দোলনমুখী হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগায়। সাঁওতালদের সামাজিক অবস্থাই যে তাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার প্রধান কারণ সে সম্পর্কে Calcutta Review নামে সমসাময়িক একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল —

"*Zamindars*, the police, the revenue and court *amlas* have exercised a combined system of extortions, oppressive exactions, forcible dispossession of property, abuse and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the timid and yielding Santhals. Usurious interest on loans of money ranging from 50 to 500 percent; false measures at the *haat* and the market; wilful and uncharitable trespass by the rich by means of their untethered cattle, tattoos, ponies and even elephants, on the growing crops of the poorer race; and such like illegalities have been prevalent."

প্রথমে সাঁওতালরা তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পন্থাই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তারা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই নীতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় সাঁওতালরা বিদ্রোহের পন্থা গ্রহণ করে। 1850 খ্রীঃ 30শে জুন ভাগনাডিহির সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা সংগঠিত হয় এবং 10,000 সাঁওতালকে নিয়ে তারা একটি স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গড়ে তোলে। তারা বিশ্বাস করত শুভ ও অশুভের যুদ্ধে শুভশক্তির-ই জয় হবে। সাঁওতালরা উপলব্ধি করেছিল যে এই সংঘর্ষে তারা শুভ পক্ষকেই প্রতিনিধিত্ব করছে, অন্যদিকে শাসক ও তার সহযোগীরা আছে অশুভ পক্ষে। অর্থনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মুক্তির প্রেরণা তাদের সেই আন্দোলনকে আরো বেশী শক্তিশালী করেছিল। বিদ্রোহী নেতারা একটি নতুন ধরণের রাজস্ব কাঠামো গড়ে তুলেছিল যা ছিল খুবই কম এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। 1855 খ্রীঃ 7ই জুলাই সাঁওতাল হুল শুরু হয়েছিল। সরকারী ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে বিদ্রোহীরা রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট অফিস, পুলিশী থানাকে এবং জমিদার, মহাজন ও বিভিন্ন ইউরোপীয় অফিসারদের বাসস্থানকেই আক্রমণ করেছিল। যেহেতু হুল প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল সেহেতু বিদ্রোহীর সংখ্যাও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী জনগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চর্মকার, ডোম, তাঁতী প্রভৃতি সমাজের নিম্নশ্রেণীর সমর্থনও

সাঁওতালরা লাভ করেছিল। প্রাথমিক পর্বে ভাগলপুর এবং মুঙ্গের প্রদেশের মধ্যে আন্দোলন সীমিত ছিল। পরে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন স্থানে রেলওয়ে, পোষ্ট অফিসের কাজকে তারা পঙ্গু করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সরকারের প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে পুলিশবাহিনী বিদ্রোহীদের সামনে অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু সাঁওতালরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে প্রাথমিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 1856 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়। প্রায় 23,000 বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। আন্দোলনের দুই নেতা সিধু ও কানু এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। অনেককেই নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং এমনকি সাধারণ গ্রামবাসীদেরও বিভিন্নভাবে নিপীড়িত করা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহ। রণজিৎ গুহ তাঁর ‘এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পিজেন্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া’ (*Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিরোধ স্বরূপই এই বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল। জমিদার ও মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর সাহসী আন্দোলন। যদিও এটি সাঁওতাল হুল নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, তথাপি অপরাপর দুর্বল শ্রেণীগুলির স্বার্থও এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্থানীয় ডাকাতরা বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র যেমন — বল্লম, তীর-ধনুক দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলি বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে একগুচ্ছ ডাকাতির মাধ্যমে এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। 1854 সালে বিরাট সংখ্যক দেশীয় ডাকাত স্থানীয় মহাজনদের বাসভবন আক্রমণ করতে থাকে। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় চরিত্র দান করতে চেয়েছেন, তথাপি এই বিদ্রোহের মূল চরিত্র ছিল অর্থনৈতিক। যদিও সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে নিষ্পাপী ও পাপীর দ্বন্দ্বরূপে, তথাপি এই বিদ্রোহের মুখ্য কারণ ছিল কৃষি অসন্তোষ। শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহকে চরিত্রের দিক থেকে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের আখ্যা দেওয়া যায়।

তাৎক্ষণিক দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্যর্থ। কারণ এর ফলে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন দূরীভূত হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসকদের ‘পাপের রাজত্ব’ বাধাহীনভাবে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু সুদূরপ্রসারীভাবে বিচার করলে এই বিদ্রোহ কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। প্রত্যেকটি প্রতিরোধ আন্দোলন কিছু ঐতিহ্য রেখে যায় যা পরবর্তী আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করে। এই আন্দোলন উপজাতিদের জীবনে একটি স্মৃতি হিসাবে থেকে গিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ ভবিষ্যতের বিপ্লবের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কে. কে. দত্ত (K. K. Dutta) মন্তব্য করেছেন — সাঁওতাল বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলা ও বিহারের ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। এটি কিন্তু শুধুমাত্র আঞ্চলিক বিদ্রোহ ছিল না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এই আন্দোলন ছিল একটি গণআন্দোলন যার প্রভাব বহু দূর বিস্তৃত হয়েছিল। এই বিদ্রোহের একটি ইতিবাচক দিক হল -- এই বিদ্রোহ ভারতের আদিবাসী জনগণের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা এবং দুর্ভোগ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার আদিবাসী জেলাগুলিকে সুসংগঠিত করে একটি পৃথক সাঁওতাল পরগণা গঠন করে। সর্বোপরি, সাঁওতালরা একটি পৃথক আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শেতাঙ্গ শাসকরা উপলব্ধি করে যে সাঁওতালদের চাহিদা হল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং তারা একটি পৃথক আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা উপলব্ধি করেছিল যে সরকারের সাধারণ নিয়মকানুনগুলি ঔপনিবেশিক ভারতের এই সম্প্রদায়ের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে

এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি কিন্তু সাঁওতালদের জীবনের গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। সাঁওতালদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ প্রবহমান ছিল। সাঁওতালদের খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। এই অঞ্চলে খ্রীস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত করে তোলা। সাঁওতাল বিদ্রোহ 1857 খ্রীঃ বিদ্রোহের পথকে প্রশস্ত করেছিল। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রশ্ন

১। ফরাসী ও ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আনোচনা করো।

৩.৭.১.৫ ঃ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

প্রাক্-পলাশী পর্বে মুসলমানরা প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত; অন্যদিকে কৃষি ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল হিন্দুদের ওপর। যেহেতু রাজনীতি এবং প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব বহন করত মুসলমানরা, সেহেতু হিন্দুদের হাতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক শান্তি কোনভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু 1757 সালের পর ব্রিটিশদের এদেশে দ্রুত ক্ষমতা বিস্তার — অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। কর্মক্ষেত্রে পার্শীর বদলে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার (1837 সাল থেকে) ক্রমশ হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে। কারণ এই সময় ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। 1793 খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক ধরণের নতুন ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যারা ছিল উচ্চবিত্ত হিন্দু যেখানে কৃষকদের একটি বিরাট অংশ ছিল ভগ্নোদ্যম মুসলমানরা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূস্বামী ও রায়তের দ্বন্দ্ব অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে। তবে কৃষকদের দুর্দশার প্রকৃতি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। মুসলিমরা তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতাকে ধর্মের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তৎপর হয়। অন্যদিকে ইসলামের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনগুলি ছিল কৃষক আন্দোলন যাদেরকে ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলিকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে। সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — (1) বাংলায় ফরাজী আন্দোলন, (2) দিল্লীতে তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া, (3) আরবের ওয়াহাবী আন্দোলন। আরবে ওয়াহাবী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন আব্দুল ওয়াহাব (1703-1787) ভারতে অনুরূপ একটি বিদ্রোহ তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া পরিচালিত হয়েছিল দিল্লীর শাহ-ওয়ালি-আল্লাহর দ্বারা। তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ। 1818 খ্রীঃ দিল্লীতে সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ও শিখদের বিতাড়িত করে এদেশকে দার উল-ইসলামে পরিণত করা। জানা যায় 1820 খ্রীঃ কলকাতায় পরিদর্শনে এসে সৈয়দ আহমেদ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যার ইতিবাচক ফলস্বরূপ 1827 খ্রীঃ বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে।

ফরাজী আন্দোলন ছিল বাংলার সংঘটিত প্রথম ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। ১৮১৮ খ্রী হাজি শরিয়ৎ আল্লার নেতৃত্বে বাংলায় প্রথম প্রবর্তিত হয়। শরিয়তের পরিচালিত ফরাসী আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

৩.৭.১.৫.১ ঃ ফরাজী আন্দোলন

ফরাজী আন্দোলন ছিল বাংলায় সংঘটিত প্রথম ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনটি বাংলায় প্রথম প্রবর্তিত হয় 1818 খ্রীঃ হাজি শরিয়ৎ আল্লার দ্বারা। 1799 সালে শরিয়ৎ মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন এবং সেখানকার ওয়াহাবী আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষকদের কাছে ফরাজী ভ্রাতৃত্ববোধ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ফরাজী মতে সকল ফরাজী ছিল সমান। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা অবশ্য এই আন্দোলনে যোগ দেননি। এর মাধ্যমে যে সত্যটি প্রকাশিত হয় তা হল ফরাজী আন্দোলন কিছু অর্থনৈতিক শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাজীরা ব্রিটিশদের দার-উল-হাবী হিসেবে দেখতেন। সুতরাং প্রথমদিকে এই আন্দোলন একটি রাজনৈতিক রূপরেখাকে অনুধাবন করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটি কৃষি চরিত্র ধারণ করে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। James Wise এবং H. Beveridge শরিয়তকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মানতে অসম্মত হয়েছেন। তারা এটাও মানেন না যে শরিয়তের ফরাজী আন্দোলন ছিল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ। শরিয়তের পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

শরিয়ত উল্লাহের পুত্র দাদু মিঞার (1819-1862) আমলে ফরাজী আন্দোলন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। এটাই ছিল আন্দোলনের একটি যুক্তিগ্রাহ্য প্রকাশ। পূর্ব বাংলায় দাদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যখনই মুসলমান কৃষকরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে তখনই জমিদার ও নীলকর সাহেবরা সচেতন হতে শুরু করে। দাদুর নেতৃত্বে ফরাজী কেন্দ্র থেকে লাঠিয়াল বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য গড়া হয় এবং তাদেরকে সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দাদু সর্বত্র এই মত প্রচার করেন যে, জমি আল্লাহের দান। সুতরাং জমিদারদের কর ধার্য করার অধিকার নেই। তিনি অনুগামীদের বলেন যে, কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ হল অন্যায়। তিনি কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন সরকারের নিয়ন্ত্রিত খাস মহলে বসবাসের জন্য। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দাদু মিঞা একটি সমান্তরাল সরকার স্থাপন করেন। তার অনুগামীদের সুবিচারের তাগিদে দাদু মিঞা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন। এই থাকবন্দী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান ছিলেন দাদু মিঞা।

কানাইপুরের সিকদারদের বিরুদ্ধে এবং ফরিদপুরের ঘোষদের বিরুদ্ধে দাদু মিঞার প্রাথমিক সাফল্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। অবদমিত কৃষকদের কাছে দাদুর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে থাকে যারা দাদুকে রক্ষাকর্তা হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ক্রমশ ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে দাদু মিঞার জনপ্রিয়তার পারদ চড়তে থাকে। জমিদার এবং নীলকররা কৃষকদেরকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইউরোপীয় আবাদকারী মি. ডানলপ ছিলেন জমিদারদের বন্ধু এবং দাদু মিঞার শত্রু। 1846 খ্রীঃ দাদু মেদিনীপুরে ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। 1844 সালে দাদুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং অপরাধের মামলায় জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তথ্যের অভাবে

প্রশ্ন

১। ফরাজী আন্দোলন কি ? এর মূল উদক্তা কে ?

তিনি বেকসুর খালাস পান। দাদুর বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলে কেউ সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়নি। দাদুকে পরে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং আলিপুর জেলে আটকে রাখা হয়। 1857 খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তাকে কারাগারে রাখা হয়। কারাবাসের সময় তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এবং 1862 সালে বাহাদুরপুরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর ফলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই আন্দোলন তার গতি হারায়। বিংশ শতকেও এই আন্দোলন বহাল ছিল তবে ধর্মীয় আন্দোলনরূপে। ফরাজী আন্দোলন কৃষক আন্দোলন হলেও সচেতনভাবে তাকে একটি ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। অধ্যাপক বি. বি. চৌধুরী (B. B. Chaudhuri) এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন। তিনি এই আন্দোলনের অস্পষ্ট চরিত্র এবং বিদ্রোহীদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যর্থতার দিকে আলোকপাত করেছেন। এই আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক যে লক্ষ্য তাই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যা সেই সময়ে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল।

৩.৭.১.৫.২ ঃ ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ

বাংলার ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন তিতুমীর, যার আসল নাম ছিল মীর নিসার আলি (1782-1831)। তিতুমীর 24 পরগণার একটি ছোট্ট গ্রাম বাঁদুড়িয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1822 খ্রীঃ মক্কাতে সৈয়দ আহমেদের আদর্শে দীক্ষিত হন। সৈয়দ কিন্তু একটি শক্তিশালী নীতি বাংলায় গ্রহণ করতে পারেননি এবং মুসলমানরা কিছু সময় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সম্ভবতঃ তিতুমীর উপলব্ধি করেছিলেন যে বাংলার মুসলমানদের পাক্কা মুসলমান তৈরী না করে জেহাদ ঘোষণা সঠিক কাজ হবে না। যাইহোক বাংলা বিভিন্নভাবে সৈয়দকে প্রয়োজনীয় মানুষ ও অন্যান্য রসদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। এটা ইতিহাসের পরিহাস যে তিতুমীর প্রথম জীবনে নদীয়াতে হিন্দু জমিদারদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন যেখানে তিনি দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে বকেয়া আদায় করতেন।

1827 সালে তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে মুসলিম কৃষক এবং কারিগরদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণের জন্য অভিযান শুরু করেন। তিনি ফরাজী আন্দোলনের সমর্থকদের শুক্রবার ও ঈদে নমাজ পড়ার বিরোধী ছিলেন। তবে ফরাজী আন্দোলনের মতই ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল ধর্মীয় সংস্কার, কৃষি অসন্তোষ ও ব্রিটিশ শাসনকে অবমাননার একটি মিশ্রিত রূপ। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। সুতরাং মুসলিমদের উচিত সেই সকল অমুসলিমদের সাহায্য করা যারা দুর্বল, অবদমিত। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং তাঁর বক্তব্য অনেক হিন্দুকেও আকর্ষণ করেছিল। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন — হিন্দু ও মুসলিম, দুই ধর্মেরই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত অত্যাচারী ভূস্বামী সম্প্রদায় ও আবাদকারীদের বিরুদ্ধে। তথাপি তিনি একজন মুসলিম হওয়ায় মুসলিম দমনকারীর সামনে নীরব থেকে ছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্র হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করেছিল। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে, তিতুমীর তার আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে জমিদারদের অত্যাচার তার গৃহীত নীতির পরিপন্থী তখনই তিনি শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তন সাধন করলেন। এই আন্দোলন ক্রমশ হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের কার্যকলাপ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয় এবং একধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, মালদার বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করে।

তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নাগপুরের গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুরাশের কৃষ্ণদেব রায় প্রমুখ জমিদাররা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তিতুমীরের বিদ্রোহকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। হানাফী মতের অনুরাগী মুসলমানরা তিতুর মতের বিরোধী

ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য এই হানাফী মতের অনুরাগীদের সাহায্য নেন। তিনি প্রচার করেন যে, তিতুমীরের অনুরাগীদের দাড়ির ওপর, মসজিদ নির্মাণের ওপর এবং বাংলার নাম আরবীতে পরিবর্তনের ওপর কর আরোপ করা হবে। গোহত্যার শাস্তি স্বরূপ দক্ষিণ হস্ত ছেদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কৃষ্ণদেব রায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিতুমীর ইসলাম ধর্মোপাসনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় কোনরকম প্রত্যুত্তর প্রদান না করে পত্রবাহককে বন্দী করেন এবং পরে জেলেই তার মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনা তিতুমীর এবং তার অনুগামীদের যৎপরোনাস্তি বিদ্রোহী করে তোলে। ফলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। এই আন্দোলন আরো হিংসাত্মক ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণ করে। কলকাতার জমিদাররা সকলেই কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষাবলম্বন করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এস. বি. চৌধুরী (S.B. Chaudhuri) তাঁর সিভিল ডিসটারব্যানসেস ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল-ইন-ইণ্ডিয়া (Civil Disturbances During the British Rule in India) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, যদিও এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল একটি কৃষক অসন্তোষের মধ্য দিয়ে তথাপি পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে।

নারকেলবেড়িয়া এবং তার পাশাপাশি গ্রামগুলি তিতুমীরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তিতুমীরের অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ, যেমন-হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহে আগুন লাগানো, গোহত্যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু সময় ধরে যথেষ্ট আশঙ্কার মধ্যে রেখেছিল। বহু মানুষ নিরাপত্তার অভাবে অঞ্চলছাড়া হতে বাধ্য হয়। তিতুমীর 300 জনের একটি দল নিয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারী আক্রমণ করেন। অভিযান চালানোর সময় তিতুমীরের অনুগামীরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ও হিন্দু পুরোহিতদের হত্যা করে। পুড়ার অভিযানের সাফল্যের পর তিতুমীর ঘোষণা করেন যে, বাংলায় কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং তিনি বাদশা উপাধি ধারণ করেন।

তিনি একটি সমান্তরাল সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা গড়ে তোলেন। যেহেতু নারকেলবেড়িয়ায় বারাসতের প্রশাসনিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই এই আন্দোলন বারাসত আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। জমিদার, নীলকর সাহেব এবং ইংরেজদের অন্যান্য সহযোগীদের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ সাহায্যের অনুরোধ আসতে থাকায় ইংরেজ সরকার সেনাবাহিনী সহযোগে প্রতিরোধে তৎপর হয়। তিতুমীর 1831 খ্রীঃ 19শে নভেম্বর গোলার আঘাতে প্রাণ হারান। ইংরেজ কামানের সামনে বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে তিতুমীরের ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান হয়। তবে তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার অনুপ্রেরণা তখনও তার মহিমা প্রচার করতে সক্ষম ছিল।

তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনকে অনেক সময় ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে কিছু অভিন্নতা থাকলেও এদের যোগসূত্র কোন ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা সমর্থিত হয় না। ওয়াহাবীরা অতীন্দ্রিয়বাদকে অ-ইসলামীয় বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিতুমীর অতীন্দ্রিয়বাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। বারাসত বিদ্রোহের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা উপস্থিত ছিল। বিদ্রোহীদের

প্রশ্ন

১। ফরাজী আন্দোলন কি ? এর মূল উদক্তা কে ?

মধ্যে ভারতকে ব্রিটিশদের অধীন থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় থাকলেও তাদের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বরং তারা ভারতে মুসলিম শাসনকেই পুনর্বহাল করতে চেয়েছিলেন। আর.সি. মজুমদার (R.C. Majumder) মনে করেন যে 'It was a movement of the Muslims, by the Muslims and for the Muslims' কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই আন্দোলন কিন্তু সরাসরি সাধারণ হিন্দু জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। বিপরীতভাবে, সাধারণ হিন্দু জনসাধারণ তিতুমীরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসাবে ভেবেছিল। আন্দোলন যদি প্রকৃত অর্থেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করত তাহলে তিতুমীর নারকেলবেড়িয়ায় একটি গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হতেন না। এই বিদ্রোহ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি ঐক্যের বীজ বপন করেছিল যা 1860 সালে নীল বিদ্রোহের সময় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেষ বিচারে একথা বলা যায় যে, ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীগুলি সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সর্বোপরি, এই আন্দোলন মুসলিমদের সচেতন করেছিল কি বিষয়ে তারা অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমঝোতা করবে না। এটা কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করেছিল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল।

৭.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*
2. Suprakash Roy, *Bharater Krishak Bidroha O Ganatantrik Sangram*
3. Girish Chandra Bose, *Sekaler Darogar Kahini*
4. Anand A. Yang (ed.), *Crime and Criminality in British India*
5. J. Hutton, *A Popular Account of Thugs and Dacoits*
6. Radhika Singha, *Despotism of Law*
7. B. S. Haikerwal, *Economic and Social Aspects of Crime in India*
8. C. Palit, *Tensions in Bengal Rural Society*
9. W. W. Hunter, *Annals of Rural Bengal*
10. Ranjan Chakrabarti, *Authority and Violence in Colonial Bengal*
11. David Arnold, *Police Power and Colonial Rule*
12. W. K. Firminger (ed.), *The Fifth Report From the Select Committee on the House Commons on the Affairs of the East India Company*, 2 vols
13. Basudeb Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal*
14. Daniel Rycroft, *Representing the Santal Hool*
15. Rudrangshu Mukherjee, *Awadh in Revolt*
16. William Dalrymple, *The Last Mughal*

৭.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)-এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

২. ওয়াহাবী মুভমেন্টের উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল? এই পরিপ্রেক্ষিতে, তিতুমীরের আন্দোলন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংগঠিত ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহের উপর একটি নিবন্ধ লেখ।

৪. ১৭৮৩ সালের রংপুর বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. ফরাজী আন্দোলনে দাদু মিঞার ভূমিকা আলোচনা কর।

৬. ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

Society In Colonial India

সমাজ ঃ উপজাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়

একক-৭

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.৭.০	:	উদ্দেশ্য
৭.৪.৭.১	:	ভূমিকা
৭.৪.৭.২	:	ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আদিবাসী—উপজাতি জনসমাজ
৭.৪.৭.৩	:	ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন
৭.৪.৭.৪	:	নিম্নবর্ণের নানা আন্দোলন
৭.৪.৭.৫	:	ঔপনিবেশিক ভারতে নানা শ্রেণীর বিকাশ
৭.৪.৭.৬	:	উপসংহার
৭.৪.৭.৭	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৭.৪.৭.৮	:	সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৪.৭.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় আদিবাসী—উপজাতিদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ।

(২) ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন।

(৩) নিম্নবর্ণের আন্দোলনসমূহ এবং ভারতীয় বর্ণ আন্দোলন নানা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিকাশ।

৭.৪.৭.১ : ভূমিকা

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গ ভারতীয় সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল মূলতঃ

দমনমূলক ও নিপীড়িন মূলক। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, ভূমি রাজস্ব ও অরণ্য সম্পদ এবং খনিজ দ্রব্য আত্মসাৎ করা ও ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি সুনিশ্চিত করা। এক কথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক, সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা, ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা ও ভারতে বৃটিশ পণ্য বিক্রি করা। প্রাক বৃটিশ বা মুঘল আমলে ভারতীয় সমাজ এই জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক দমন পীড়নের সাথে পরিচিত ছিল না। বস্তুত ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতীয় সমাজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় সমাজের এক এক অংশের উপর ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত এক এক ভাবে পড়েছিল। এর কারণ ছিল ভারতীয় সমাজ ছিল বহুত্ববাদী সমাজ বা Plural society। অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে আদিবাসী উপজাতি সত্ত্বা, বর্ণ ও শ্রেণীর অবস্থার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে বোঝাই আমাদের এই পাঠের লক্ষ্য।

৭.৪.৭.২ : ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আদিবাসী—উপজাতি জনসমাজ

মুঘল আমলে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসী-উপজাতি জনজাতিদের দূরত্ব ছিল। মুঘল রাষ্ট্র যদিও অরণ্য সম্পদ আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল, তবে তার মাত্রা কখনও বৃটিশদের মতন হয়নি। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ বৃটিশ রাষ্ট্র ছিল ঔপনিবেশিক চরিত্রের বৃটিশ রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ ও নীতি প্রণয়নের পিছনে কাজ করত একধরনের উপযোগবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী, রাষ্ট্র দর্শন। এই দর্শনে মনে করা হত ভারতীয় সমাজ সভ্যতাহীন ও অনুন্নত। এর পরিবর্তন জরুরী। ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপে এই জাতীয় উচ্চবর্গীয় মানসিকতার জন্ম হয়। ভারতে বৃটিশদের বিভিন্ন নীতি গ্রহণের পিছনে এই মানসিকতা ও দর্শন কাজ করেছিল। উপজাতি আদিবাসীদের সামাজিক ও কৌম জীবনে হস্তক্ষেপ করা বৃটিশ সরকার ন্যায্য বলে মনে করতো। যেমন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ময়মনসিংহের পারো উপজাতিদের উপর ইংরাজ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৮২২-১৮৬৯ এর মধ্যে নানান ধরনের আইন প্রণয়ন ও সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই তথাকথিত 'অসভ্য' পারো উপজাতিকে সুসভ্য রাষ্ট্র কাঠামোর অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র উপজাতি জনজাতি ও তাদের বহুবিধ অভ্যাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং স্বতন্ত্রিয়তাকে বৃটিশ রাষ্ট্রকাঠামোর অঙ্গীভূত না করা পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের অস্বস্তি ছিল।

এই 'অস্বস্তি' থেকে জন্ম নেয় 'ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব' ও জনগণনা ব্যবস্থা। জনগণনা বা 'Census' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Bernanrd S. Chon মন্তব্য করেছেন, 'The history of the Indian census must be seen in the total context of the efforts of the British colonial government to collect systematic information about many aspects of Indian society and economy.' Census বা জনগণনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের প্রতিটি অংশকে চিহ্নিত করা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার করে। তথ্য জানা থাকলে শাসন করার সুবিধা হয়।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আর্থিক নীতির ফলেও উপজাতি জনজাতিদের জীবনে পরিবর্তন আসে। অরণ্য আইন বা Forest Acts গুলির মাধ্যমে সরকার উপজাতি আদিবাসী জনজাতিরা

অরণ্যের সম্পদের উপর দীর্ঘদিন ধরে যে অধিকার গুলি ভোগ করে আসছিল এবং অরণ্যের সঙ্গে তাদের যে আত্মিক সম্পর্কে যে (যে আত্ত্বিক সম্পর্ককে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা সম্ভব নয়) তাকে ভেঙে দিতে অগ্রহণী ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে উপজাতি আদিবাসীদের চিরাচরিত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বহিরাগত বর্ণহিন্দুদের আগমন এবং মাড়োয়ারী মহাজনদের উপস্থিতি উপজাতি আদিবাসীদের জীবনের ছন্দকে বিপন্ন করে তোলে। বৃটিশ সরকার সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারে বিশ্বাস করত। সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা উপজাতি জনজাতি সমাজে ছিল না। তারা সম্পত্তির কৌম মালিকানায় বিশ্বাস করত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণা আদিবাসী উপজাতি সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আদিবাসী উপজাতিদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। Sumit Sarkar এর ভাষায়, 'British legal conceptions of absoute private property eroded traditions of joint ownership (like the khuntkatti tenure in Chote Nagpur) and sharpended tensions within tribal society.' মুঘল আমলে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসী উপজাতিদের এই জাতীয় দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপও বহুক্ষেত্রে উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এক কথায় বলতে গেলে নানা ভাবে আদিবাসী উপজাতি সমাজে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব জন্ম নিতে থাকে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও তার সহযোগী ভারতীয় শক্তিসমূহর কার্যকলাপের ফলে উপজাতি আদিবাসী সমাজে যে বিপুল ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল তার প্রকাশ ঘটে একাধিক রক্তাক্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এই বিদ্রোহগুলির পিছনে কাজ করত tribal idenity বা উপজাতি সমাজের নিজস্ব সংহতি বোধ। এই বিদ্রোহগুলি লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদ সাধন করা।

ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে আদিবাসী অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী

ভারতীয় জনসমাজ ও বিশেষত উপজাতিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার একাধিক উপজাতি আদিবাসী গোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ (বা criminal tribe) বলে চিহ্নিত করে। ব্রিটিশ শাসকদের মনে হয়েছিল অপরাধ বা crime কিছু কিছু উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর বংশগত জীবিকা। ব্রিটিশ সরকারী দলিলে লেখা হয়, 'crime is their trade and they are born to it and must commit it.' এই গোষ্ঠীগুলিকে সরকার 'criminal tribe' বলে চিহ্নিত করে। এই তথাকথিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৭১ সালে সরকার 'Criminal Tribes Act of 1871' প্রণয়ন করে। ১৮৩০ এর দশকে W.H. Sleeman যখন ঠগীদের নির্মূল করার অভিযান চালান তখন তিনিও এই অপরাধী উপজাতির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত অপরাধী উপজাতি বা criminal tirbal-এর ধারণা ঔপনিবেশিকতাবাদ সৃষ্ট 'rule of law' এর আইনী কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার নিম্নবর্ণের ভ্রাম্যমান উপজাতিগুলিকে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ১৮৬৭ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ইন্সপেক্টর জেনারেল তার প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন 'It must be remembered, in dealing with the wandering predatory tribes of India, that the fraternities are of such ancient cretion, their numbers so vast, the country over which their depredations spread so vast, their organization so complete, and

their evil of such formidable dimensions, that nothing but special legislation will suffice for their suppression and conversion' অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা বা 'special legislation' ছাড়া এই ভ্রাম্যমান উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে আইনী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এই চিন্তার ফলশ্রুতি ছিল ১৮৭১ সালের 'Crimial Tribes Act' এর প্রণয়ন। ১৮৭১ এর এই আইনে চারটি উপজাতিগোষ্ঠীকে অপরাধী উপজাতি বা 'criminal tribe' বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে যাতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যায় তার ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়। সরকার এই চিহ্নিত করা অপরাধী উপজাতিগুলির সদস্যদের নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করে। তাদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা এলাকার বাইরে গেলে তাদের আটক করার কথাও এই আইনে বলা হয়।

Thomas R. Metcalf এর গবেষণা থেকে দেখা যায় সরকারের এই প্রচেষ্টা কিন্তু সমালোচনার উর্দ্ধে ছিল না। যেমন পাঞ্জাব চিফ কোর্টের বিচারকরা বলেন একমাত্র তখনই কারুর নাম নথিভুক্ত করা যায় যদি সে কোন অপরাধ করে। এই যুক্তিও দেওয়া হয় এর ফলে নির্দোষও অকারণে শাস্তি পাবে। শুধু তাই নয় এর ফলে পুলিশের হাতে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে যার অপব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা তৈরী হবে। কিন্তু সরকার এই সমালোচনায় খুব বেশি কর্ণপাত করেনি। স্বাধীনতার পর এই কুখ্যাত ঔপনিবেশিক আইনের অবসান ঘটান হয়।

৭.৪.৭.৩ : ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় হিন্দু সমাজে পেশাগুলি ছিল মূলতঃ বংশানুক্রমিক। বর্ণব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস বংশগত রূপ ধারণ করেছিল। হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ 'স্বতন্ত্র এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক কতগুলি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সমাজে স্বতঃগুণ ছিল পরিত্রতম এবং যেহেতু ব্রাহ্মণরা ছিল স্বতঃগুণের অধিকারী তাই তারা ছিল সমাজের সবচেয়ে উপরের বর্ণ। ব্রাহ্মণরা ছাড়া কায়স্থ ও বৈদ্যরাও সমাজের উপরতলার বা উচ্চবর্ণ চিহ্নিত ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের কোন গুণ নেই বলে ধরা হত। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের সমাজে social mobitlity বা সামাজিক গতিশীলতা অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয়দিকেই কম বা সীমাবদ্ধ। প্রাক-ঔপনিবেশিক কালপর্বে এই বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের আদৌ কোন পরিবর্তন হয়নি তা কিন্তু নয়। নানান ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সীমাবদ্ধ আকারে হলেও চলছিল। কিন্তু কখনই তা বর্ণব্যবস্থার মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আনেনি। ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার পর বর্ণব্যবস্থায় কতকগুলি পরিবর্তন আগে, আগের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয় কিন্তু বর্ণব্যবস্থার বিলুপ্তি কিন্তু আদৌ হয়নি। বরং বর্ণ ব্যবস্থা নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয় ও নিজের অবস্থাকের যথাসাধ্য সুদৃঢ় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে নানা কারণে চিরাচরিত ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন আসে। গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতির প্রবর্তন ও জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা চিরাচরিত বর্ণ নির্ভর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও দুর্বল করেছিল। ব্রিটিশ আমলে এক নতুন ধরনের নাগরিক অর্থনীতি জন্ম নেয় যার ভিত্তি

কখনই বর্ণ ছিল না। এই নতুন ধরনের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ইংরাজী ভাষা জানার মতন পেশাদারী শিক্ষা তথা দক্ষতা। ইংরাজী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয় colonial clerks বা ঔপনিবেশিক কেরানী কুলের। এটা সত্যি যে ইংরাজী শিক্ষার উপর কায়স্থ বা বৈদ্যদের মতন উঁচু বর্ণগুলির অধিপত্য ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে ইংরাজী শিক্ষা কখনই বর্ণভিত্তিক ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে, একদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে কতকগুলি নতুন ঔপনিবেশিক বৃত্তির জন্ম অষ্টাদশ শতকের বর্ণভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিল এবং social mobility বা সামাজিক গতিশীলতার জন্ম দিয়েছিল। বর্ণভিত্তিক পেশার পরিবর্তে যোগ্যতা ভিত্তিক পেশা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে বর্ণব্যবস্থার রূপান্তর প্রসঙ্গে হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকাকালীন দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংস ও কৃষি ব্যবস্থার অবনতি চিরায়ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল, যা বস্তুত পারস্পরিক নিরাপত্তাবোধের জন্ম দিত এবং বর্ণনির্ভর সমাজ কাঠামোতে প্রত্যেকের অবস্থান নির্দেশ করত। ঔপনিবেশিক আমলে তা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলে কারিগর, তাঁতিরা তাদের চিরাচরিত পেশাগুলি থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ভীড় করতে লাগল। অনেকক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির চাপে কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরের শিল্প অর্থনীতিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। শহরের শ্রমিক মহল্লা বা বস্তিগুলির সঙ্গে গ্রামের জীবনবোধের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ভাঙনে এই গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ জাতিভেদপ্রথা, পবিত্রতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ধারণাগুলি নতুন ধরনের সামাজিক কাঠামোতে অপ্রসাঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। নিম্নবর্ণের মানুষরাও এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য বহুক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হওয়ার ও আন্দোলনমুখী হওয়ার জন্য সংঘটিত হতে লাগল। এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক সুবিধা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মতন উঁচু বর্ণের মানুষরা আত্মসাৎ করেছিল, নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলিও কিন্তু পিছিয়ে থাকতে যে রাজী ছিল না তা উনিশ বা বিশ শতকে সংগঠিত নিম্নবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির আন্দোলন থেকে স্পষ্ট। সামাজিক মর্যাদা ও সরকারী আনুকুল্য লাভের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনগুলি একদিকে পরিবর্তিত বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, অন্যদিকে আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে 'Divide and Rule Policy' প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে উচ্চবর্ণগুলির দায়িত্ব কিছু কম ছিল না।

৭.৪.৭.৪ : নিম্নবর্ণের নানা আন্দোলন

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতের সংগঠিত নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮.৭২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সংগঠিত নমঃশূদ্র আন্দোলন। এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও জটিলতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। নমঃশূদ্ররা মূলতঃ পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মন সিংহ, যশোর এবং খুলনা জেলায় থাকত। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের অবস্থান ছিল সমাজের একদম নিচের দিকে, সাধারণভাবে এদের চণ্ডাল বলে অভিহিত করা হত। নানা ধরনের সামাজিক অবিচারের ফলে নমঃশূদ্রদের

সঙ্গে উচ্চবর্ণের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। ১৮৭২.৭৩ সালে ফরিদপুর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম নমঃশূদ্র আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এই আন্দোলন সাফল্য পায়নি। এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় সতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের। এই নতুন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ছিলেন শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর। এই সতুয়া ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১২ সালে গঠিত হয় Bengal Namasudra Association.

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন গড়ে ওঠে। উপরের স্তরটি ছিল সম্ভ্রান্ত অংশের; নিচের স্তরটি ছিল মূলতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের। যাইহোক নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের ফলে সরকার ১৯১১ সালের জনগণনায় চণ্ডাল শব্দটির পরিবর্তে নমশূদ্র শব্দটি ব্যবহার করে। তারা উপরের বর্ণগুলির নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক সাম্মানিক চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীতে পৃথক সুযোগ দাবী করতে থাকে। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে তাদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নমঃশূদ্রদের কোন প্রতিনিধি না থাকায় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্বন্ধে নমঃশূদ্ররা সন্দিহান ছিল ও সবসময়ে দূরত্ব বজায় রাখত। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল নমঃশূদ্ররা যেখানে ব্রিটিশ শাসনকে প্রাক-ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় উন্নততর বলে মনে করত, সেখানে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। এর থেকে বোঝা যায় কেন নমঃশূদ্ররা স্বদেশী আন্দোলন থেকে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়া আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছে।

নমঃশূদ্র আন্দোলনের তলার দিকে ছিল কৃষক। এরা উচ্চবর্ণের জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি চাইত। এর জন্য কখন তারা জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ নিয়েছে, কখনও নমশূদ্র কৃষকরা মুসলিম কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উচ্চবর্ণের জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আবার নিজেদের সম্প্রদায়ের সংহতি বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের সঙ্গে তারা তীব্র সংঘাতে গেছে, যেমন যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে হয়েছিল ১৯১১, ১৯২৩-২৫ এবং ১৯৩৮ সালে।

১৯৩০ এর দশক থেকে নমঃশূদ্র নেতৃত্ব সাংবিধানিক রাজনীতিতে বেশি করে জড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিপরীত প্রক্রিয়া রূপে কৃষকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি এই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও নমশূদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মুলস্রোতের সমান্তরাল ধারা রূপে বহমান ছিল। ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদের মৃত্যুর পর এবং সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসুর প্রচেষ্টায় নমঃশূদ্র নেতৃত্বের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব কমে আসে। অন্যদিকে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় কৃষকদের (যাদের অধিকাংশই নমঃশূদ্র) সংগঠিত করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয় ১৯৪২ সালে জুন মাসে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে এবং জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে। এর ফলে হিসেবে ১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনে ফরিদপুর, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় নমঃশূদ্র কৃষকরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। নমঃশূদ্র আন্দোলনের উপরতলার নেতারা কিন্তু নমঃশূদ্র

কৃষকদের এই 'শ্রেণী' ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্তে এসেছেন নমঃশূদ্র আন্দোলনে একটি বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা উপসংহার টানতে পারি এই বলে যে কর্ণগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় ছাপিয়ে নমঃশূদ্র আন্দোলনে শ্রেণীগত পরিচয় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বর্ণভিত্তিক এই আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণীগতসত্ত্বা নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র কৃষকদের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে উপরতলার নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বৃত্তের থাকতে উৎসাহিত হয়। শ্রেণীগত সত্ত্বার উন্মেষ ও কৃষক আন্দোলনের বিকাশ নিশ্চিতভাবেই সমকালীন যুগ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে। মহারাষ্ট্রের উপর গেইল ওমভেট্ এর গবেষণা থেকে দেখা যায় মহারাষ্ট্রের বর্ণ আন্দোলনেও দুটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল। প্রথম ধারাটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং নিম্নবর্ণের স্বচ্ছল অংশটির দ্বারা পরিচালিত। এই রক্ষণশীল অংশটি ব্রিটিশ সরকারের নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করত এবং ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের পর 'Non-Brahman Association' নামক একটি রক্ষণশীল ও ব্রিটিশ অনুগত রাজনৈতিক দল গঠন করে। অপর অংশটি ছিল অনেক বেশি চরমপন্থী ও আন্দোলনমুখী। এই র‍্যাডিকাল অংশটি 'Satyasodhak Samaj' গঠন করে। এরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত ছিল। এদের দৃষ্টিতে সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত-একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন সমাজ যারা নানাভাবে শোষিত, অন্যদিকে মূলসংখ্যক শেঠজি ভাটজি অর্থাৎ বণিক ও ব্রাহ্মণ যারা শোষণ করে। ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকে মহারাষ্ট্রের বর্ণ আন্দোলন গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পশ্চিম ভারতে কুনবি ও মারাঠী ছিল অব্রাহ্মণ বর্ণ আন্দোলনের ভিত্তি, দক্ষিণ ভারতে এই ভিত্তি ছিল ভেল্লাল ও দ্রাবিড় সত্ত্বা। Bernard Cohn-এর পূর্ব যুক্ত প্রদেশের উপর গবেষণা থেকে দেখা যায় চামরার (মূলতঃ প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুর) শিবনারায়ণ গোষ্ঠীর ধর্মীয় নীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার পালন করতে থাকে। আবার কেরালায় ইজাভা নামক নিম্নবর্ণীয় মানুষরা বিংশশতকের গোড়া থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে থাকে। তাদের অন্যতম দাবী ছিল মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ। সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ তামিলনাড়ুর নাদার, উত্তর তামিলাড়ুর পাল্লি, মহারাষ্ট্রের মাহার প্রভৃতি বর্ণগোষ্ঠীগুলির মধ্যে। ১৯৩০ বিশেষত ১৯৪০-এর দশক থেকে দেখা যায় নিম্ন বর্ণের র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনের একটি বড়ো অংশ বামপন্থী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যেমন সহজানন্দ প্রথমে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ও পরে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। সাতরার সত্যশোধক আন্দোলনের অন্যতম নেতা নানা পাতিল মহারাষ্ট্রের অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা হন। প্রথমদিককার তামিল কমিউনিষ্ট যেমন সিঙ্গারাভেলু ও পি. জীবনানধন ১৯৩০-এর দশকে বর্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের বর্ণ ব্যবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্বন্ধে যে আলোচনা এখানে কারা হোল তার থেকে দু একটি সিদ্ধান্ত সাধারণ ভাবে আমরা টানতে পারি। প্রথমতঃ ভারতীয় বর্ণগুলির, বিশেষত নিম্ন বর্ণগুলির, অবস্থা আদৌ অনড়, অচল, পরিবর্তনহীন ছিল না। একদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব, অন্যদিকে নিজেদের প্রতিবাদী স্বত্ত্বার বিকাশ ও চেতনার ক্রমউন্মীলন বর্ণের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্কি উভয় অবস্থাকে পাল্টে দিয়েছিল। অন্যভাবে বললে প্রতি মুহূর্তে বর্ণ ভিত্তিক ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছিল, নিম্নবর্ণগুলি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে লড়াই করেছিল তা উঁচু বর্ণ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতা সম্পর্ককে পাল্টে দিচ্ছিল। এই অর্থে অর্থাৎ ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীগুলি

এবং ঔপনিবেশি রাষ্ট্রও নিজেদের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। অর্থাৎ এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী লড়াই যা নানা চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন (‘জাতি ও নিম্নবর্ণের চেতনা’) শ্রমজীবী মানুষরা তাদের ‘সাধারণ বোধের’ মধ্যে, সাংস্কৃতিক মাধ্যমে, প্রতিনিয়তই এমন এক সম্প্রদায়রে রূপগুলিকে খুঁজে চলেছে। রাজনীতির কাজ হল জনগণের ভিতরের এই কাজগুলিকে, গুণগুলিকে বিকশিত করা। বাইরে থেকে কোন ‘বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে’ আমদানী করা নয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরের গুণগুলির বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রতিরোধের রাজনীতি তার নিজস্ব ভাষা তৈরী করে নেয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর এই বক্তব্য ও যুক্তি থেকে বোঝা যায় না কেন বিংশ শতাব্দীর ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ভারতে নিম্নবর্ণের আন্দোলনে ধীরে ধীরে শ্রেণী চেতনার বিকাশ ও বামপন্থী মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করলো। বস্তুত এটি শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সাধারণ বোধের বিকাশের প্রশ্ন নয়, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে এই প্রশ্নটি যুক্ত বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মতাদর্শের যথার্থার উপর। বামপন্থী মতাদর্শ ইউরোপের থেকে নেওয়া ‘বৈজ্ঞানিক চিন্তা’ কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, বরং যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বামপন্থী চিন্তা ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকের ভারতীয় নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা। ভারতীয় নিম্নবর্ণের বিভিন্ন আন্দোলনের তথ্যগত বিশ্লেষণ দেখায় যে বর্ণ আন্দোলনের মধ্য থেকেই শ্রেণীবোধ জেগে উঠেছিল, যার পিছনে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং বামপন্থী মতাদর্শ এখানে বাইরে থেকে নেওয়া কোন বিষয় নয়, বরং তা বর্ণগুলির বস্তুগত অবস্থান ও তাঁর রূপান্তরের প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। আর ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল বলেই বর্ণ আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রেণী চেতনার বিকাশ কিয়দংশে হলেও সফল হয়েছিল।

৭.৪.৭.৫ : ঔপনিবেশিক ভারতে নানা শ্রেণীর বিকাশ

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রেণীর বিকাশও এই প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যেতে পারে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রেণী মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। যেমন দাস সমাজে মুখ্য শ্রেণী দুটি—দাস মালিক ও দাস। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস। ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্প মালিক বা পুঁজিপতি ও শিল্প শ্রমিক।

পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ভাঙনের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হয় এবং রবার্ট ব্রেনারের ভাষ্য অনুযায়ী এই উৎক্রমণ বা transition-এ শ্রেণী সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলেনা। এর পিছনে দুটি মুখ্য কারণ ছিল। প্রথমত ভারতীয় সমাজ বর্ণনির্ভর সমাজকাঠামো, যা পশ্চিম ইউরোপে ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুঘল আমলের ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারা অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিকতার দ্বারা মৌলিকভাবে প্রভাবিত হয়; যা পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে হয়নি। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে মুঘল আমলে বিদ্যমান ভারতীয় কৃষি কাঠামো ও ভূমি সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়, খুব সীমিতভাবে হলেও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয এবং বন্দরকেন্দ্রিক কানবি পাতিদার, মাদ্রাজে রেড্ডি, মহারাষ্ট্রের সামওয়াদ মালি প্রমুখরা এই জাতীয় ধনী কৃষকদের উদাহরণ। আমাদের এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব নীতির কল্যাণে কৃষি সমাজে

নতুন ধরনের শ্রেণী বিকাশ ও শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি সমাজের আভ্যন্তরীণ মেরুকরণ বা polarisation বৃদ্ধি পেয়েছিল অতি দ্রুত হারে যার অর্থ ছিল একাধিক গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে অল্পসংখ্যক কৃষকের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি।

ব্রিটিশ আমলে যে নতুন ধরনের শহর অর্থনীতির বিকাশ ঘটে, সেখানে অন্তত তিনটি নতুন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত। এরা ভারতের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী। বর্ণগত গতিশীলতা কম থাকায় প্রথম দিককার ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা। ঐতিহাসিক বি. বি. মিশ্রর মতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। পক্ষান্তরে ক্রিস্টোফার বেইলির গবেষণা থেকে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকেই উত্তরভারতের শহরগুলিতে আমলা শ্রেণী, বণিক প্রভৃতিরা বসতি স্থাপন করে একটি সুসংবদ্ধ শ্রেণীরূপে বিকাশের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এরাই কালক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে বিকশিত হয়। এই অর্থে অষ্টাদশ শতক ও উনিশ শতকের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরণ একটি নিরন্তর ধারাবাহিকতার ইতিহাস। বেইলি তাঁর এলাহাবাদের উপর গবেষণায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উকিল ও অন্য বৃত্তিভোগী স্বদেশী নেতারা আসলে শেঠিয়া শ্রেণীর অনুগৃহীত মুখপাত্র মাত্র।' এখানে জাতপাত বা ভাষার ঐক্যের চেয়ে পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক অনেক বেশি জোরদার। ডি. এ. ওয়াশব্রুক তাঁর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপর গবেষণায় একই ধরনের পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীত সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ও ভূমিকা সম্পর্কে এই ভাষ্যকে নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনই অষ্টাদশ শতকের হিন্দু আমল বা জেন্ট্রি নয়। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত একই সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনা করেছেন। এর পিছনে কাজ করেছিল একদিকে দেশীয় ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলকে আত্মস্থ করা।

১৮৮৭ সালে ভারত ইংরাজী শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৯৮,০০০। ১৯০৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৫,০০০ জন। শুধু বাংলা নয়, ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে যে নতুন বৃত্তিগুলির জন্ম হয়েছিল সেগুলি এই ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণী করায়ত্ত করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ছিল নিরন্তরভাবে তার চারপাশকে প্রশ্ন করা—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তিন ধরনের ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রশ্ন করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই প্রচেষ্টার পিছনে কাজ করেছিল নিরন্তর আত্মসমালোচনা ও দেশ ও কাল সম্পর্কে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ মানে নিছক ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার নয়, বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি। কোলকাতা, বোম্বাই, পুনা, মাদ্রাজ সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার ও সংগঠন নির্মাণে এগিয়ে আসে। এমনকি ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সমালোচনা বা economic critique এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উপস্থিত করেছিল। বস্তুত ১৮৬০ সালের পর থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয় শ্রেণী ইংরাজ

শাসন সম্পর্কে আশা হারিয়ে ফেলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এই শ্রেণীর থেকে জন্ম নেয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদ দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দুটি নতুন শ্রেণী জন্ম নেয়। একটি হল পুঁজিপতি শ্রেণী, অন্যটি শ্রমিক শ্রেণী। তীর্থঙ্কর রায় ভারতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) ১৮৫০ ১৯১৪, (২) ১৯১৪-১৯২০, (৩) ১৯২০-১৯৩৯, (৪) ১৯৩৯-৪৭। এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দয়ে আধুনিক ভারতে শিল্পপতি ও শ্রমিক—উভয় শ্রেণী জন্ম নেয়। প্রথম দিককার শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রশিল্প, পরবর্তীকালে পাট ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় শিল্পপতিরা সাধারণভাবে মাড়োয়ারী, গুজরাটি ও চেট্টিয়ার গোষ্ঠীর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল। সাধারণ ব্রিটিশ কোম্পানী বা ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দি বা দলিল বা এজেন্ট রূপে এরা কাজ করে পুঁজি সংগ্রহ করে। এই পুঁজি পরে শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একাধিক নতুন ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ আমলের উল্লেখযোগ্য ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠী হল টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, শ্রীরাম, মফতলাল, গোয়েঙ্কা প্রমুখ।

শিল্পপতি শ্রেণীর বিকাশের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশও উনিশ-বিংশ শতকের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক উৎস ছিল। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতি ও অবশিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জনসমাজের একটি বড়ো অংশ ভূমিচ্যুত হয়ে জীবিকার খোঁজে শহরে শিল্পশ্রমিক রূপে কাজ নেয়। এর ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা উপাদান শহরের শ্রমিক মহল্লাগুলিতে আসে। শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শ্রমিকদের আদৌ কোন বেতনবৃদ্ধি হয়নি। পরবর্তীকালে ১৮৯০-৯৫ সালে খাদ্যদ্রব্যের যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল মজুরী সেই হারে বাড়েনি। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে সর্দারদের উপস্থিতি শ্রমিক শোষণকে আরো তীব্র করে তুলেছিল। বাগিচা বা খনি শ্রমিকদের অবস্থাও খুব করুণ ছিল। ১৯৩১ সালে রয়াল কমিশন অফ লেবার মন্তব্য করেছিলেন যে ১৯০৮ সালে ফ্যাক্টরি কমিশনের তদন্ত চলার সময়, অধিকাংশ বস্ত্রকলে শ্রমিকদের দিয়ে প্রায় ১৫ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করান হত। অন্যান্য শিল্পগুলিতেও একই অবস্থা ছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের দিয়ে নির্মম ভাবে কাজ করান হত। কিন্তু তাদের মজুরী ছিল পুরুষ শ্রমিকদের থেকে অনেক কম। এই অসহনীয় পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তনের জন্য ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্ট প্রণীত হয়। এই আইনে ৭ বছরের নিচে শিশুদের কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ৭ থেকে ১২ বছর বয়স্ক শিশুদের দৈনিক ৯ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়।

এই আইন কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা পাল্টাতে পারেনি। ১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় শিশুদের উপর শোষণ একই রকম নির্মম ভাবে অব্যাহত। এমনকি ১৯৩১ সালের রয়াল কমিশন অন লেবর ইন ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদনে দেখা যায় শ্রমিকদের অবস্থার আদৌ কোন উন্নতি হয়নি। বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাইনে ছিল গড় মাসিক ৩৭ টাকা। অদক্ষ শ্রমিকদের গড় মাসিক মাহিনা ছিল ২০ টাকা, নারী শ্রমিকদের মাসিক গড় মাহিনা ছিল ১৭ টাকা। শ্রমিকদের বাসস্থান ছিল এককথায় অতীব জঘন্য। কোন সামাজিক নিরাপত্তা শ্রমিকদের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত সংগঠিত প্রতিবাদ জানাতে সচেষ্ট হয়। আহমেদাবাদ, বোম্বাই, শোলাপুর, জামশেদপুর, কলকাতা, নাগপুর, মাদ্রাজ,

কোয়েম্বাটোর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বারবার ধর্মঘট করে। এই প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ ১৯২০ সালে গঠিত হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC)। AITUC-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায়। মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেল এর মঞ্চে ছিলেন। সাধারণভাবে ধরা যায় শ্রমিক সংগঠন গঠিত হওয়ার অর্থ শ্রমিক শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি।

সাম্প্রতিককালে কিছু গবেষণায় ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণী চেতনা'র বিষয়টিকে নানাভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। যেমন দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন বাংলার পাট শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীর থেকেও সম্প্রদায়ের বোধ ও চেতনা অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। প্রাক ধনতান্ত্রিক গ্রামীণ জীবনের নানা উপাদান শ্রমিকদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় যা শ্রেণী চেতনার বিকাশের সামনে প্রতিবন্ধকরূপে ছিল। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণী' রূপে বিকশিত হওয়ার ইতিহাস পাঠের সময় এই টানাপোড়েন মাথায় রাখা দরকার।

৭.৪.৭.৬ : উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের বিকাশ অত্যন্ত জটিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সম্প্রদায়, বর্ণ ও শ্রেণীর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। উনিশ ও বিংশ শতকে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে মৌলিক বদল এসেছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সব সময়ে স্বাধীনভাবে হয়নি। ঔপনিবেশিক শক্তি নানা ভাবে এহ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করেছে নিজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়ার সময় এই জটিলতাকে মাথায় রাখা দরকার। আরো মনে রাখা দরকার এই জটিল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ভাষ্যের জন্ম দিয়েছে। এই রাজনৈতিক ভাষ্য বিশ্লেষণও এই রকম জরুরী।

৭.৪.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Sekhar Bandyopadhyaya : From Plassey to Partition.

2. Sumit Sarkar : Modern India

3. Bipan Chandra : Essays in Colonialism

4. Sekhar Bandyopadhyay : Caste, Politics and the Raj

5. Sekhar Bandy opadhyay : Caste, Protest and Identity in Colonial India

6. Susan Bayly : Caste, Society and Politics in India

7. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital

8. Partha Chatterjee : Bengal, The Land Question

9. Dipesh Chakraborty : Rethinking Working Class History.

10. Tirthankar Roy : The Economic History of India

11. সুকোমল সেন ঃ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

৭.৪.৭.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় উপজাতি আদিবাসীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। নমঃশূদ্র আন্দোলন আলোচনা করে দেখাও যে ভারতীয় বর্ণ আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি কি কি ছিল?

৩। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি কাঠামোতে শ্রেণীর বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

৪। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ছিল?

৫। উনিশ ও বিংশ শতকের শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে ভারতে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

INDUSTRY AND POPULATION

একক - ২

Trends in Population and National Income

ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও জাতীয় আয়

গঠন (Structure) ঃ

৪.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৩.২.১ ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

৪.৩.২.২ ঃ জাতীয় আয় পরিবর্তনের প্রবণতা

৪.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও জনসংখ্যার গঠন;

২। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রবণতা ও ধরন;

৪.৩.২.১ ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

ঔপনিবেশিক ভারতে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও অর্থনীতির হতশ্রী অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু, জনসংখ্যার গঠনকাঠামো প্রভৃতিকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করতেন জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা। আজও কোন অর্থনীতির মান উন্নয়ন সূচক হিসাবে জনসংখ্যার এই বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হয়। একটা ধারণা চালু ছিল যে দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনীতির উন্নয়নের সূচক। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বাড়ে, সমাজে মহিলা-পুরুষের অনুপাত মহিলাদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে, বয়সের গঠন অনুযায়ী মধ্যবয়স্ক কর্মক্ষম মানুষের আপেক্ষিক অনুপাত বেশি হয় তবে বুঝতে হয় দেশটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। ঔপনিবেশিক ভারতে যেখানে সাধারণ মানুষের আয়ের হিসাব, তার খরচের বিবরণ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তেমন পাওয়া যেত না সেখানে জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তার গঠন প্রণালিকে অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষণ হিসাবে তুলে ধরা হত। আর ভারতে জনগণনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অন্যান্য পশ্চাদপদ দেশের তুলনায় ভারতে আগের থেকে এবং অনেক বিস্তারিত ভাবে যেখানে পাওয়ার সুবিধা ছিল সেখানে পরিসংখ্যানের উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলো ধরে উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের ঝোঁকটা তুলে ধরা যায়। অন্তত একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠে যাকে একেবারে আন্দাজি হিসাব বলা চলে না।

ইংরেজরা ভারতের বৃটিশ রাজত্বের যতই গুণগান করুক না কেন, শিল্পায়নের যত চমকপ্রদ ছবিই আঁকুক না কেন দেশের আর্থিক দুরবস্থার কারণে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি লেগেই থাকত। শিশুমৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি, প্রত্যাশিত বয়সকাল ছিল ২৩ থেকে ২৫ এর মধ্যে, মহিলাদের অনুপাত পুরুষদের থেকে কম, পরনির্ভরতার সূচক ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরে আমরা অর্থনীতির ইতিহাসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার গঠনকাঠামো পরিবর্তনের গুরুত্ব তুলে ধরব।

নিচের সারণিতে ১৮৬৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ঝোঁকটা তুলে ধরা হল ঃ

অবিভক্ত ভারতে জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি

সময়কাল সংখ্যা (কোটি)	সরকারি হিসাবে বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	গড় বাৎসরিক হার (কোটি)	ডেভিসের সংখ্যা বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	সংশোধিত গড় বাৎসরিক
১৮৬৭-৭২	২০.৩৪	—	২৫.৫২	—
১৮৮১	২৫.০২	২.০৭	২৫.৭৪	০.০৯
১৮৯১	২৭.৯৬	১.১১	২৮.২১	০.৯২
১৯০১	২৮.৩৯	০.১৫	২৮.৫৩	০.১১
১৯১১	৩০.০৩	০.৬৫	৩০.৩০	০.৬০
১৯২১	৩০.৫৭	০.০৯	৩০.৫৭	০.০৯
১৯৩১	৩৩.৮২	১.০১	৩৩.৮২	১.০১
১৯৪১	৩৮.৯০	১.৪০	৩৮.৯০	১.৪০

উৎস ঃ কি)সলি ডেভিসের 'পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান (১৯৫১)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার একের নিচে। সরকারি হিসাবে ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালে বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হার একের বেশি হলেও কিংসলি ডেভিসের হিসাবে তা একের থেকে অনেক নিচে। দুটি হিসাবে ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার একের থেকে বেশি বলে দেখা যায়। জনগণনার সরকারি হিসাব থেকে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৭১-৮১ সালের মধ্যে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ২৪.৬ বছর। পরের লোকগণনার হিসাবে এটা কমে হয় ২৩.৮ বছর। বেসরকারি হিসাবে প্রত্যাশিত আয়ু আরও কম বলে দেখা যায়।

আমরা অঞ্চল ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার পাই তা নিচের সারণি থেকে পেতে পারি

শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার

সময়কাল	পূর্ব	পশ্চিম	মধ্য	উত্তর	দক্ষিণ	সর্বভারতীয়
১৮৬৭/৮২-১৯২১	০.৫২	০.১৪	০.৪৭	০.১৯	০.৪৭	০.৩৭
১৯২১-১৯৪১	১.৩৭	১.৩০	১.২৯	১.২৫	০.৯২	১.২২

উৎস ঃ লীলা বিসারিয়া ও প্রবীণ বিসারিয়া, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ১৯৮৩

দুটি সময়কালেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। ১৮৭০ এবং ১৮৯০ সালে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মৃত্যুর হার বাড়ে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হয়। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এই সময়কালে তেমন বড় দুর্ভিক্ষ বা মহামারি দেখা না যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্য অঞ্চল থেকে বেশি হয়। লক্ষণীয় যে ১৯২১-১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সব অঞ্চলেই বাড়ে। এই সময়কালে যোগাযোগের উন্নতি, টিকা ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে মৃত্যু হার কমে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ে। এছাড়া ১৯০৮ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে ভারতে তেমন বড় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা যায়নি। ১৯২১ সালের পর স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সরকারি নীতি এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

আমরা বিভিন্ন সময়ে শিশু, কর্মক্ষম বয়সী এবং বৃদ্ধদের ধরে শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার গঠন বিচার করি তবে নিচের সারণিটি পাই। কর্মক্ষম মানুষের বয়সের নীচে এবং ওপরে থাকা মানুষরা কর্মক্ষমদের ওপর নির্ভরশীল। তাই নির্ভরশীলতার মাত্রা বলতে প্রতি ১০০ জন কর্মক্ষম মানুষের ওপর কতজন নির্ভর করে তাকে বোঝায়। অর্থাৎ শতাংশ হিসাবে নির্ভরশীলতার সূচককে প্রকাশ করা হয় $\left(\frac{\text{শিশু + বৃদ্ধ}}{\text{কর্মক্ষম জোয়ান}} \text{১০০}\right)$। ওপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে ৩-১৪ বছর বয়সী ব্যক্তি ১৮৮১-১৯৪১ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৩৮.৫ শতাংশ। ৬০ বছরের অধিক বৃদ্ধের সংখ্যা ৫.৫ শতাংশের কাছাকাছি। আর ১৫-৫৯ বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। শিশু মৃত্যুর হার বেশি হলে তুলনামূলক ভাবে শিশু ও কিশোরের সংখ্যা বেশি হয়। সারণিতে তাই দেখা যাচ্ছে। প্রথম ১৪ বছরের গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৮.৫ শতাংশ এবং এর ওপরের ৪৫ বছরের গোষ্ঠী সংখ্যা ৫৬ শতাংশ হওয়া মানে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোরের সংখ্যা কর্মক্ষম যুবকদের তুলনা বেশি হওয়া। আর আয়ুষ্কাল খুব কম হওয়ায় বৃদ্ধদের শতকরা অনুপাত কম হওয়াই স্বাভাবিক। নির্ভরশীলতার সূচক থেকে এটা সহজেই ধরা পড়ে। নির্ভরশীলতার সূচক ৭৫-৮০ হওয়া মানে খুবই বেশি। উন্নত দেশে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু বেশি হওয়ায় উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা বেশি হয়। পরনির্ভরশীলতার সূচক কম হয়। পরনির্ভরশীলতার উচ্চ সূচক ঔপনিবেশিক দেশের অনুন্নয়নের লক্ষণ।

এবার আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে পুরুষ-মহিলার অনুপাত ধরে দেশের অর্থনীতির অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করব। নিচের সারণিতে এই বিষয়টা তুলে ধরা হল।

পুরুষ-মহিলার অনুপাত

(প্রতি হাজার মহিলাপ্রতি পুরুষের সংখ্যা)

অঞ্চল	১৮৮১	১৯০১	১৯২১	১৯৪১
পূর্ব	৯৯৫	১,০০৫	১,০৩১	১,০৮০
পশ্চিম	১,০৬৭	১,০৫৮	১,০৮৬	১,০৯৮
মধ্য	১,০৪০	১,০১৯	১,০২৯	১,০৩২
উত্তর	১,১৫	১,১০২	১,১৩৫	১,১২৫
দক্ষিণ	৯৯৮	৯৮২	৯৮৫	৯৯৮

উৎস ঃ লীলা বিসারিয়া ও ডি. কুমার, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, Vol-II

সারণি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে দক্ষিণ ভারতে এবং পূর্বভারতে ১৮৮১ সাল ছাড়া সর্বসময়েই ১০০০ মহিলার প্রতি ১০০০ এর বেশি পুরুষ দেখা যেত ঔপনিবেশিক ভারতে। তাছাড়া সর্বত্রই এই অনুপাত বৃদ্ধির একটা সাধারণ ঝোঁক ধরা পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে জৈবিক কারণে পুরুষের জন্মহার থেকে মহিলা জন্মহার বেশি। আর আর্থসামাজিক কারণে ভ্রূণ হত্যা, বা প্রসূতি কালে মৃত্যুর হার পশ্চাদপদ দেশে বেশি থাকে। সুতরাং বলা যায় যে জৈবিক কারণে এই অনুপাত ১ এর কম থাকা উচিত হলে আর্থসামাজিক কারণ অকালে মহিলা মৃত্যুর হার বেশি বলে এই অনুপাত ভারতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১ এর থেকে বেশি অর্থাৎ প্রতি এক হাজার মহিলা পিছু পুরুষের সংখ্যা একহাজার থেকে বেশি। অনেকে যুক্তি দেখান যে জনগণনায় মহিলাদের সঠিক সংখ্যা ধরা পড়ে না। পর্দানসীন থাকায় সব মহিলাকে গণনার মধ্যে ধরা যায় না। এটা সত্যি বলে ধরে নিলে বলা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে যখন পর্দানসীন মহিলার সংখ্যা কমেছে তখন সংখ্যা বৈষম্য কমা উচিত ছিল। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে এই বৈষম্য বেড়েছে। সুতরাং এই সমালোচনা টেকে না। সারণি ধরে দেখলাম যে দক্ষিণ ভারতে পুরুষ-মহিলা অনুপাত একের কম। দক্ষিণ ভারতে মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে এটা শক্তি। আবার উত্তর ভারতে কন্যা হত্যা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। সেখানকার আর্থসামাজিক কাঠামোর জন্য পুরুষদের অনুপাতে মহিলা সংখ্যা কম। সবশেষে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে শ্রমশক্তি বন্টনের ধরনটি নিয়ে আলোচনা করব। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাথমিক বিভাগ, মাধ্যমিক বিভাগ ও সেবা বিভাগে শ্রমশক্তি কিভাবে বন্টিত ছিল তা নিচের সারণিতে ধরা পড়ে।

বিভিন্ন বিভাগে শ্রমশক্তির বন্টন (শতাংশ)

	১৮৮১	১৯১১	১৯৫১
প্রাথমিক	৭২.৪	৭৩.৮	৭৩.২
মাধ্যমিক	১১.২	১০.৬	১০.৯
সেবা	১৬.৪	১৫.৫	১৫.৮

উৎস ঃ জে. কৃষ্ণমূর্তি, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, Vol-II

শ্রমশক্তির উপরোক্ত বন্টনের ধরনটি পশ্চাদপদ দেশে দেখা যায়। একে অনুন্নয়নের ধরন বলা হয়। অর্থাৎ অনুন্নত দেশ কৃষিপ্রধান হয় যেখানে জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ কৃষিজীবী। দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হলে দেখা যায় শিল্প ও সেবাবিভাগে শ্রমশক্তির শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এটা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

আমরা আমাদের আলোচনায় ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধরন আলোচনা করে এই ধরন বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে একটা দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা দেখলাম।

৪.৩.২.২ ঃ জাতীয় আয় পরিবর্তনের প্রবণতা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয় জানতে গেলে জনসংখ্যা সম্পর্কে যেমন সঠিক তথ্য দরকার তেমনি দেশের জাতীয় আয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দরকার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া গেলেও জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব দেখা যায়। এর মধ্যে ইংরেজ চিন্তাবিদ্‌রা ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নের সদর্থক দিকটি যেমন তুলে ধরার চেষ্টা করেন তেমনি দাদাভাই নওরোজির মত জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ইংরেজ আমলে দেশের এবং দেশবাসীর হতশ্রী অবস্থাটা তুলে ধরার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু খরচের হিসাব তুলে ধরেন। ১৮৮১ সালে লর্ড ক্রামার একটা সরকারি হিসাব প্রকাশ করেন যাতে বলা হয় যে তখন ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ২৭ টাকা। সংখ্যাতাত্ত্বিক অ্যাটকিসসন্ এর হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৯.৫ টাকা। দাদাভাই নওরোজি দেখান যে ১৮৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৩৪০ কোটি টাকা আর মাথাপিছু আয় ছিল ২০ টাকা। তবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত ত্রুটি বা সঠিক তথ্য সংগ্রহের বাস্তব অসুবিধা থাকায় উপরোক্ত তথ্যগুলো তেমন গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন।

জাতীয় আয় সম্পর্কে দাদাভাই নওরোজির হিসাব কেবল মাথাপিছু আয়ের ওপর আলোকপাত করে না। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের পুষ্টির দিকটির ওপরও গুরুত্ব দেন। বর্তমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য পরিমাপেও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে দাদাভাই তার ব্যাখ্যায় ভৌতিক উৎপাদনকে আয়ের প্রকৃত উৎস বলে মনে করতেন। ব্যবসা, পরিবহন, প্রশাসন প্রভৃতিকে এর মধ্যে ধরেননি।

শিবসুব্রামনিয়নের সংগ্রহ করা তথ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে বিভিন্ন গবেষণার কাজ হয়। প্রতি পাঁচবছরের গড় আয়ের ভিত্তিতে নিচের সারণিটি পাওয়া যায় যা থেকে জাতীয় আয় সম্পর্কে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে পারি ঃ

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয় (১৯০০-৪৭)

সময়কাল	গড় বার্ষিক জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ৫ বছরের গড় (টাকায়)
১৯০০/০১-১৯০৪/০৫	১৫০২	৫২.২
১৯০৫/০৬-১৯০৯/১০	১৫৭৫	৫৩.০
১৯১০/১১-১৯১৪/১৫	১৭৩০	৫৬.৫
১৯১৫/১৬-১৯১৯/২০	১৭৬০	৫৭.৩
১৯২০/২১-১৯২৪/২৫	১৮৪৪	৫৯.১
১৯২৫/২৬-১৯২৯/৩০	২০৪৪	৬২.৭
১৯৩০/৩১-১৯৩৪/৩৫	২১৩১	৬১.৬
১৯৩৫/৩৬-১৯৩৯/৪০	২২৫০	৬০.৬
১৯৪০/৪১-১৯৪৪/৪৫	২৪৪১	৫৬.৬
১৯৪২/৪৩-১৯৪৬/৪৭	২৫২৪	৬২.৩

উৎস ঃ এস. শিবসুব্রামনিয়ন National income of India, 1900-01 to 1947

নির্মল কুমার চন্দ্র long term stagnation in the Indian Economy 1900-75, Economic and Political Weekly, Vol-22 Annual number, 1982

ওপরের সারণি অনুসরণ করে বলা যায় যে, ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প হারে হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২০-২১ সাল থেকে মাথাপিছু আয় কখনও খুব কম হারে বেড়েছে আবার কখনও কমেছে। অর্থাৎ সামগ্রিক সময়কাল ধরে উন্নয়নের হার খুবই মন্থর। আমরা দেখেছি ১৯২০-২১ সালে জন্মহার তেমন বাড়েনি। এরই প্রতিফলন ঘটেছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতায়। আবার ১৯২১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। এটাই প্রতিফলিত হচ্ছে খুব মন্থর গতিতে; কখনও কখনও বৃদ্ধি এবং কখনও কখনও হ্রাসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখে ২০-২২ বছরে দীর্ঘকালীন মাথাপিছু আয় ৬২ টাকার কাছাকাছি স্থির থেকেছে। অর্থাৎ অর্থনীতিও স্থবিরতা লাভ করেছে। বিভিন্ন বছরের আয়কে তুলনাযোগ্য করার জন্য উপরোক্ত পরিসংখ্যান পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৩৮-৩৯ কে ভিত্তি বছর ধরে।

১৯৪৮-এ জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় আয়ের অবদানটি ব্যাখ্যা করা। প্রধানত কৃষি, শিল্প ও সেবাবিভাগে অর্থনীতিকে ভাগ করলে দেখা যায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং সেবাবিভাগের অবদান বাড়ে কিন্তু কৃষির অবদান কমে। উপরোক্ত তিনটি বিভাগের মধ্যেকার আন্তসম্পর্ককে অর্থনীতির কাঠামো বলা হয়। শিল্প ও সেবাবিভাগের অবদান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। উন্নত অবস্থায় একটা কৃষি অর্থনীতিকে শিল্প অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। এরই সঙ্গে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জ্ঞাননির্ভর উৎপাদনে পরিণত হয়। অর্থাৎ কৃষি নিজেই শিল্পে রূপান্তরিত হয়।

যা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায় যে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতে কৃষির অবদান বাড়েনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান মোটামুটি ১০০০ কোটি টাকার নিচে স্থির ছিল। পরের পঁচিশ বছরে কখনও ১০০০ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেছে, কখনও কমেছে। প্রকৃতি নির্ভর থাকায় কৃষি অবদানের স্বল্পকালীন ওঠানামা দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘকালে একটা স্থবিরতার লক্ষণ দেখা যায়, ১৯৩৫ সালের পর কৃষির অবদান একশ কোটি টাকার মত ছিল। জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান খুব স্বল্পহারে হলেও বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শিল্পবিভাগের অবদান ছিল ২০০ কোটি টাকা। বিশের দশকের পর তা বেড়ে হয় তিনশ কোটি টাকা। চল্লিশের দশকে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান চারশ কোটি টাকার বেশি হয়।

শতাংশ হিসেবে ১৯০০-৪৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে কৃষির আয় বৃদ্ধির হার ছিল ০.৪২ শতাংশের শিল্পক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির হার ১.৮২ শতাংশ এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে ছিল ২.২২ শতাংশ। কার্যত এই সময়কালে জাতীয় আয়ে যে বৃদ্ধি ঘটে-তা প্রধানত তৃতীয় বিভাগের বৃদ্ধির ফল। আমরা নিচের সারণিতে ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের অবদানের ওপর আলোকপাত করতে পারিঃ

জাতীয় আয়ে বিভিন্ন বিভাগের অবদান (শতাংশ হিসাবে)

সময়কাল	প্রাথমিক বিভাগ	মাধ্যমিক বিভাগ	সেবাবিভাগ
১৯০০/০১-১৯০৪/০৫	৬৩.৬	১২.৭	২৩.৭
১৯০৫/০৬-১৯০৯/১০	৬১.৭	১৩.৫	২৪.৮
১৯১০/১১-১৯১৪/১৫	৬০.১	১৩.৯	২৬.০
১৯১৫/১৬-১৯১৯/২০	৫৯.৬	১৩.৭	২৬.৭
১৯২০/২১-১৯২৪/২৫	৫৭.৪	১৩.৪	২৯.২
১৯২৫/২৬-১৯২৯/৩০	৫২.১	১৪.৯	৩৩.০
১৯৩০/৩১-১৯৩৪/৩৫	৫১.৪	১৫.৮	৩২.৮
১৯৩৫/৩৬-১৯৩৯/৪০	৪৯.৯	১৬.৪	৩৩.৭
১৯৪০/৪১-১৯৪৪/৪৫	৪৭.৬	১৬.৭	৩৫.৭

ওপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান খুব স্বল্পহারে কমেছে। শিল্পের অবদানও খুব সামান্য হারে বেড়েছে। তুলনামূলকভাবে তৃতীয় বিভাগ বা সেবা বিভাগের অবদান বেশি হারে বাড়ে। দাদাভাই নওরোজির মত অনেকেই মনে করেন যে তৃতীয় বা সেবা বিভাগে ভৌতদ্রব্য উৎপাদিত হয় না। বরং এক্ষেত্রে হস্তান্তর আয় ঘটে। সুতরাং একে জাতীয় আয় বলে মনে করা যায় না। ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগে লেনদেন বেড়ে যায়। এটাই প্রভাবিত হয় এই বিভাগীয় আয়ে।

ওপরের আলোচনায় আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয় হ্রাসবৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের অবদানের কথা বললাম। মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব। এই গড় হিসাব জাতীয় আয়ের বন্টনের দিকটা উপেক্ষা করে। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বন্টনের ওপরও নির্ভর করে যার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

৪.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রণেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিশার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agriculture at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism-the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধরনটি আলোচনা কর।

(২) ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় আয়ের বন্টনের ধরনটির সাহায্যে দেখাও ভারত কেন দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

SOCIETY IN COLONIAL INDIA

ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)

একক - ১

সমাজ গঠন ঃ উপজাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়

উপএকক - ২

Colonial Intervention and Social Change

গঠন (Structure) ঃ

৪.৪.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৪.১.২.১ ঃ ভূমিকা -- ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও সমাজ পরিবর্তন

৪.৪.১.২.২ ঃ সমাজ সংস্কার

৪.৪.১.২.৩ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৪.৪.১.২.৪ ঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

৪.৪.১.২.৫ ঃ বর্ণ আন্দোলন

৪.৪.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৪.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৪.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন।

২। সমাজ সংস্কার আন্দোলন

৩। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, ধারা ও বৈশিষ্ট্য

৪। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

৫। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৪.৪.১.২.১ ঃ ভূমিকা – ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও সমাজ পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করে। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার যে শুধুমাত্র পরবর্তীকালের ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, ভারতীয় সমাজ কাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতিকেও তা মৌলিক ভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই সামগ্রিক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকে আমরা 'ঔপনিবেশিকরণ' বা colonization বলে অভিহিত করতে পারি। ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আধুনিক (ইংরাজী) শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদী ছাপ ফেলে। সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান দিকসমূহ যা ব্যাখ্যা না করলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝা যাবে না। এই আলোচনায় আমাদের মূল লক্ষ্য এই জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুধাবন করা। চারটি পৃথক বিষয়--সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ এবং বর্ণ আন্দোলন — সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর প্রতিক্রিয়ার নিরিখে।

৪.৪.১.২.২ ঃ সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। বস্তুত এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল বহুলাংশে আধুনিক চেতনার প্রকাশ। আবার একই সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল অতীত ঐতিহ্যের যুগোপযোগী পুনর্চর্চা ও পুনরুদ্ধার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন

তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।" (চারিত্রপূজা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মূল্যায়ন থেকে স্পষ্ট ইংরাজী শিক্ষা ও প্রাচীন দেশজ ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারের সুষম মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন ও পরবর্তীকালের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা সচেতন ছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী (orientalist) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব তারা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সেডের (Edward Said) এই উক্তি মানা যায় না। এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামমোহন প্রমুখকে প্রাচ্যবাদীদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। বারাণসী, পুণা, মাদ্রাজ, কেরল প্রমুখ স্থানে সংস্কৃত পঠনপাঠনের ধারা অব্যাহত ছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ঊনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ যে ভাবে শাস্ত্র চর্চা করতেন তা মধ্যযুগের শাস্ত্র চর্চা থেকে পৃথক ছিল। নিছক ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে রামমোহন প্রমুখরা শাস্ত্রচর্চা করেননি। তাঁরা ধ্রুপদী সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে সনাতন প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একদিকে চিরায়ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার যথাযথ আত্তীকরণ — এই দুই ধারার প্রতিফলন ঘটে ঊনিশ শতকের ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনে।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন বা Hindu Widows' Remarriage Act ঔপনিবেশিক সরকার প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এই আইন প্রণীত হলেও হিন্দু সামাজিক বাস্তবতার কারণে তা খুব বেশী জনপ্রিয় হয়নি। লুসি ক্যারোল (Lucy Carroll)-এর মতে এই আইন মূলতঃ রক্ষণশীল চরিত্রের ; কারণ এই আইনে ঠিক হয় যে পুনর্বিবাহকারী বিধবা নারী পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। অশোক সেন এই ব্যর্থতাকে অনিবার্য বলে অভিহিত করেছেন, কারণ বিধবা বিবাহের জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক সম্মতির, যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার পূর্বে ভূপালের শুবজি বাপু (Subaji Bapu) এবং পুনার একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে সওয়াল করেন। ১৮৩৫ সালের আগস্ট 'The Bombay Darpan' নামক সাপ্তাহিক কাগজে শুবজি বাপুর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "Bapu saw widow marriage as a part of the general emancipation of women and hence emphasized the importance of female education." (K.N. Panikkar : "Culture and Ideology" Hegemony.)

বিধবা বিবাহ আইনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পুরুষের বহু বিবাহ ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেন। সমকালীন নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (নাট্যকার ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন-র রচনা) নাটকে বর্ণহিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করে। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালে প্রগতিশীল হিন্দুদের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকার যাতে বহুবিবাহ প্রথা রদ করে। সমাজের রক্ষণশীল অংশও সরকারের কাছে এই আইন প্রণয়ন না করার জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে

পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। যে ভিক্টোরিয়া উদারনীতিবাদী আদর্শের প্রভাবে ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষিত হিন্দু ভারতীয়দের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহ দিত, তা ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে যায় এবং উদীয়মান রক্ষণশীল মতাদর্শ ১৮৫৭-৫৮-এর পর থেকে ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতার প্রতি ব্রিটিশ নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Thomas R. Metcalf এই ঘটনাকে 'Complete non-interference in the traditional structure of Indian society' বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের এই নীতি পরিবর্তন ও মতাদর্শগত রূপান্তর সত্ত্বেও ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন বা Age of Consent Act সরকার প্রণয়ন করেন। এর ফলে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় দশ। ১৮৯১ সালে মহিলাদের ন্যূনতম বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। এই সময় কিন্তু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে তীব্র প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। এই প্রতিবাদের পিছনে কাজ করেছিল এক ধরনের রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী চেতনা যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক মনে করতেন ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি ও রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের নেই। চিরাচরিত ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম-বিধি পরিবর্তন করার অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই রয়েছে। Charles Heimsath দেখিয়েছেন, সরকার শোষিত সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছিল জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকরণ। এর পিছনে কাজ করছিল ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার মনোভাব। এই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিঃসন্দেহে বৈধতা দান করেছিল। এর ফলে সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কার নীতির বিরোধিতার মধ্যে থেকে জন্ম নেয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন। ঊনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্ম নেওয়া হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন এক চড়া ধর্মীয় অনুষঙ্গের জন্ম দেয় যা ছিল সমকালীন জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ভীরাসালিঙ্গম পান্টুলু (Veerasalingam Pantulu) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ভীরাসালিঙ্গম 'Rajamundri Social Reform Association' গঠন করেন। ১৮৮১ সালে প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানটি হয় রাজামুন্দ্রী শহরে। এরপর কে.এন. নটরাজন ১৮৯০ সালে গঠন করেন Indian Social Reformer। ১৮৯১ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে আরো গতি সঞ্চার করার জন্য রাজামুন্দ্রী শহরে সংস্কারপন্থীরা 'Widow Remarriage Association' গঠন করেন। পরের বছর মাদ্রাজে 'Hindu Social Reform Association' গঠন করা হয়। এই সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন যে খুব প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে তা বলা যাবে না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নির্দিষ্ট বা সংঘটিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধির বিরুদ্ধে এই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্য না পাওয়াই স্বাভাবিক।

বিপান চন্দ্রের মতন বাম-জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুধুমাত্র সাময়িক সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা সঠিক নয়। বস্তুত এই আন্দোলনগুলি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতার প্রাথমিক সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত ভিত্তি। একদিকে দেশজ ঐতিহ্যের শ্রদ্ধান্বিত পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল — এই দুই এর মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের আত্মপরিচয়ের ভাষা তৈরী করছিলেন। ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "It was not just an attempt at religious revival

and glorification, but an intellectual inquiry into the part, embracing almost every field a social, cultural and political endeavour.”

ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে) ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক ভিন্ন মাত্রার ধর্মীয় আন্দোলন বাংলায় শুরু হয় যাকে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছিল না। অর্থাৎ সরকারী আনুকূল্যে কয়েকটি ধর্মীয় বিধি বা নিয়ম পরিবর্তনের কথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কল্পনা করেননি। তাঁদের দুজনের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক উদার ও মহান — তা হল মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের পূর্ণ-বিকাশ ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই আন্দোলনের লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় সর্বজনীন, ফলতঃ বেদান্ত ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। রামকৃষ্ণ কথিত ‘যত মত তত পথ’ ছিল এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি। এই চিন্তা নিছক অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর সচেতন প্রয়াস নয়, বরং মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার মৌলিক প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ, আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধির প্রয়াসকে সাধকের ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বৃহত্তর সাংগঠনিক রূপদান করা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য। এই সাংগঠনিক প্রচেষ্টারই প্রকাশ ছিল রামকৃষ্ণ মিশন।

শুধু মাত্র শুষ্ক তর্ক আলোচনা নয়, বা ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভর করে আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার করা নয় — বরং প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তঃস্থ ব্রহ্মের (বা মনুষ্যত্বের) পূর্ণ-বিকাশের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য। সর্বোপরি এই যাত্রা কোন একক নিঃসঙ্গ পথিকের অনির্দিষ্ট যাত্রা নয় ; বরং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সুসংগঠিত ও সমষ্টিবদ্ধ, ভাবগত ও চৈতন্যগত আন্দোলন যা বস্তুত এক অপূর্ব মানবিক অনুভূতি, বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। এই অর্থে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের চেনা ছকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্তি প্রসূত আধুনিকতার প্রভাবশালী কাঠামোর মাধ্যমেও এই আন্দোলনকে চেনা যাবে না। এই আন্দোলন মুখ্যত বৈদান্তিক চেতনার বিশুদ্ধ প্রকাশ ও প্রসার।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেও নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্কারপন্থী মনোভাব পুরাতনপন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ১৮৬২ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হওয়ার পর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে আরো ব্যাপকতর করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সংস্কার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ আধুনিকতা প্রসূত, যেমন জাতিভেদ বর্জন, বিধবা-বিবাহ প্রচার, অসবর্ণ বিবাহ উদ্যোগ, পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। Meredith Borthwick-এর মতে, কেশব ও তার অনুগামীরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের চেয়ে সমাজ সংস্কারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও তার অনুগামীরা সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে সনাতন হিন্দু সমাজের বিধিগুলিকে আঘাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। উপবীত ধারনের ন্যায্যতাকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পুরাতনপন্থীদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৮৬৬ সালে কেশব ও তাঁর অনুগামীরা ‘ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ‘আদি ব্রাহ্মসমাজে’ সংগঠিত হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন এই জাতীয় বিভাজন প্রক্রিয়া শিক্ষিত ভারতীয়দের আত্মপরিচয় খোঁজার প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে উপস্থিত করে। এই দ্বন্দ্ব যতখানি না আদর্শগত, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মপরিচয়ের সংকট। বরং একটু অন্যভাবে বললে কোন

জাতীয় আদর্শগত প্রশ্নের অনুশীলন করলে এই আত্মপরিচয়ের সংকট এড়ানো যেত তা ব্রাহ্ম আন্দোলনে সুস্পষ্ট আকার নেয়নি।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে যান। তার প্রভাবে ১৮৬৭ সালে বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজের ভিত্তি ছিল একেশ্বরবাদ, জাতিভেদ বিরোধিতা ও সমাজসংস্কার। এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন আত্মারাম পান্ডুরঙ। সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। প্রার্থনা সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়রা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার প্রার্থনা সমাজ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজের মতন অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ চায়নি। সংস্কার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও রানাডে প্রমুখরা ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিল। সামাজিক কাঠামোকে বৈপ্লবিক ভাবে পাল্টানোর কোন পদক্ষেপ প্রার্থনা সমাজ নিতে চায়নি। প্রার্থনা সমাজের শাখা সুরাট, আহমেদাবাদ, করাচী, সাতারা, কোলাপুর প্রমুখ শহরে খোলা হয়।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। উপনিষদে যে একেশ্বরবাদের ধারণা পাওয়া যায় তার উৎস বেদ বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দু ধর্মের পূর্ণ শোধন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথাগুলিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন বেদের ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ শুধু যে ম্যাকসমূলারকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি তা নয়, তিনি সায়নভাষ্যকেও বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি। ঋকবেদ বাদ দিয়ে আর সবই তার কাছে বর্জনীয়, এমনকি বেদান্তও। শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে অহিন্দুদের হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার প্রয়াস শুরু হয়। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে তীব্র প্রচার শুরু করেন। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি জনমত সংগঠিত করার চেষ্টায় ব্রতী হন। দয়ানন্দের ঋকবেদে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস সাধারণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অথবা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। বস্তুত পূর্ব ভারতে দয়ানন্দের প্রভাব অল্পই ছিল। কিন্তু উত্তর ভারত বিশেষত পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যসমাজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ক্ষত্রি, অরোরা, আগরওয়াল প্রমুখ চিরাচরিত বণিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দয়ানন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। লালা হনস রাজ, লালা লাজপত রায়, লালা মুনসীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) প্রমুখ অগ্রণী আর্যসমাজীরা এই বণিক গোষ্ঠী বা বর্ণের সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তত চারটি অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলগুলি হল পেশওয়ার, রওয়ালপিন্ডি, মূলতান, রোহটক-হিসার এবং জলন্ধর। মুখ্যতঃ এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি আর্যসমাজ ও দয়ানন্দের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৯০০ খ্রীঃ থেকে দয়ানন্দ শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন যাকে সুমিত সরকার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বা 'Sanskritizing Process' বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৯১ তে আর্যসমাজের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ ; ১৯০১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২,০০০।

বিপানচন্দ্রের মতন ঐতিহাসিক মনে করেন হিন্দু সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্যকরণের (Westernization) চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী ছিলেন আধুনিকীকরণে (modernization)। তিনি স্পষ্টতই মন্তব্য করেছেন, "...the reformers were aiming at modernization rather than westernization. A blind initiation of western cultural norms was never an integral part of reform"। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ সংস্কারকদের লক্ষ্য ছিল না। সুমিত সরকার পক্ষান্তরে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু পরিচয় (Hindu Identity) খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধারণা অনেক বেশী আগ্রাসী ছিল। তিনি মন্তব্য করেছেন এই পার্থক্যটি 'was of degree rather than kind' । উপসংহারে আমরা এইটুকু সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে যে ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একাধিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দেশজ সংস্কৃতির

শিকড় খুঁজে পেতে তা সদর্থক ভূমিকা পালন করে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে, "The Indian modernisation project, therefore, always felt a compulsion to construct a modernity that would be located within Indian cultural space "। এই শিকড় সন্ধানী আত্মপরিচয় পর্ব না থাকলে পরবর্তীকালের ভারতীয় জাতিয়তাবাদের বিকাশ আদৌ কতখানি হত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৪.৪.১.২.৩ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে আধুনিক (বা পাশ্চাত্য) শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ১৮১৩ সালে চার্টার আইনের মাধ্যমে। এই আইনে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা সরকার ঘোষণা করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এরপর সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগেই শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয়। ১৮৩৫ সালে General Committee of Public Instruction' এর সভাপতি টমাস বাবিংটন মেকলের প্রচেষ্টায় সরকার ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়। উইলিয়াম অ্যাডাম ও চার্লস উড উভয়েরই শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কিন্তু দেশীয় ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের কথাও এই প্রতিবেদনগুলিতে বলা হয়। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা মনে করত যে ভারতীয় উচ্চবর্গীয় শ্রেণীগুলির জন্য যেমন বিশিষ্ট ধরনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ ভারতীয়দের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সাম্রাজ্যের স্বার্থেই শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিমাণে গণপ্রসার উচিত বলে সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী মনে করতো।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার ১৮৫৭ সালে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করা হয়। Charles Wood-এর প্রতিবেদনে যে তিনটি মূল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় তার একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। অন্য দুটি ছিল একটি পৃথক শিক্ষা দপ্তর স্থাপন করা ও সরকারী গ্রান্ট-ইন-এইড এর ব্যবস্থা করা। ১৮৫৮ সালে ভারতীয় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ার পর ইংল্যান্ডের ভারত সচিব (Secretary of State for India) উডের শিক্ষা প্রতিবেদনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধির যে লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থাকা উচিত নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই মান বা উৎকর্ষতা কিন্তু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অচিরেই পরীক্ষা নেওয়ার যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। নারী, তপশীলি ও উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার কাজও চূড়ান্ত অবহেলিত হয়। কলেজ শিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার মান ছিল নিম্নগামী। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। লর্ড রিপন এই প্রেক্ষাপটে স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন (১৮৮২ খ্রীঃ)। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে, "The University degree has become an accepted object of ambition, a passport to distinction in public services and in the learned professions."। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। বিদ্যালয় স্তরের এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গ্রহণ করতো, যাদের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে অতি সামান্য ধারণাই ছিল। এই বাস্তব ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) ইংরাজী নির্ভর উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষা নির্ভর জনশিক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা দূর করার চেষ্টা করে। কমিশনের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, "It is desirable that the whole population

of India should be literate." কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য এই বিশেষ বরাদ্দ খরচ করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সুপারিশগুলি খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। যেমন বর্ণ নির্ভর ভারতীয় সমাজে নিম্ন বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো কঠিন ছিল। কারণ নিম্নবর্ণভুক্ত ছেলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণভুক্ত ছেলেদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো না। ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীও এই বৈষম্য দূর করতে খুব বেশী আগ্রহী ছিল না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "This exclusion happened with the active support of the colonial bureaucracy, succumbing in the name of practicality to the pressures of the conservative sections of the Indian elite, many of whom had by now become grass-roots level functionaries of the empire. British education policy thus endorsed and supported differentiation in Indian society." B.T. McCully-র হিসাব অনুযায়ী ১৮৮৫ সালে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়র সংখ্যা ছিল ৫৫,০০০। ১৮৮১-৮২ সালে যেখানে মোট ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল ১৯৫ মিলিয়ন, সেখানে মাত্র ২ মিলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। শিক্ষার এই অসম বিকাশ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

ঊনিশ শতকে প্রবর্তিত ও প্রসারিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন প্রায়োগিক বিদ্যার জনপ্রিয়তা না পাওয়া। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। প্রচলিত শিক্ষা বা বিদ্যাচর্চার অভ্যাস থেকে বাঙালী বা ভারতীয়রা অন্য ধরনের কোন অনুশীলন করতে চায়নি। আবার এটিও সত্য যে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রাই কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি ও মতাদর্শকে প্রশ্ন করেছে। শিক্ষিত ভারতীয়রা ক্রমশঃ এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি, সাম্য বা আইনের শাসনের সাদৃশ্য সামান্যই। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে ধরনের আধিপত্যমূলক প্রক্রিয়ার সহায়ক রূপে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা বাস্তবে খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। সুতরাং ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিবর্তনের মধ্যে নানা টানাপোড়েন ছিল। ইংল্যান্ডে শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের নৈতিকতার শিক্ষাও দেওয়া হত ভারতে তা কখনই সম্ভব ছিল না। বরং শিক্ষিত ভারতীয়রাই শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেন হয়ে ওঠে যা দীর্ঘমেয়াদীভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

৪.৪.১.২.৪ ঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

ঊনিশ শতকের বিশেষত ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস-এর অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বা মুঘল আমলে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অর্থে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণ অর্থে ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়া থেকে জাত। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হল বি.বি. মিশ্রর 'The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times'। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে যেমন ক্রিস্টোফার বেইলি মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগেই অষ্টাদশ শতকে কৃষি সমাজ ও উচ্চবর্গীয় এলিটদের মধ্যে মধ্যবর্তী সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এরা সরকারী আমলা শ্রেণীর ভদ্রলোক বা বণিক গোষ্ঠী হতে পারে যারা পরবর্তীকালের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রসারণের সুযোগে নিজেদের শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত অবস্থান সুদৃঢ় করে। ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক পেশার পূর্ণ সুবিধা এই নবউত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম আত্মসাৎ করে।

আবার শুধুমাত্র সরকারী চাকুরী বা মুৎসুদ্দি/বেনিয়াবৃত্তি নয়, পূর্ব ভারতে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সুযোগে ভূমির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্ক দৃঢ় হয়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভূমি বন্দোবস্ত ও ঔপনিবেশিক চাকুরী এই দুই-এর সুবিধা মধ্যবিত্তরা পায়, নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান সবল করে এবং ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে এক ধরনের বৈধতা দান করে। J.R. McLane-এর হিসেব থেকে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৮৮০-এর দশকের শুরুতে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা পৌঁছয় ৫০৫,০০০ তে। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের প্রসারও সমভাবে ঘটতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও ঔপনিবেশিকতার কল্যাণে একাধিক নতুন বৃত্তির জন্ম হয় যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে ছিল না। যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবসা দ্রুত জনপ্রিয় হয়। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, ১৮৫৮-৮১ এর মধ্যে বাংলায় ১৭১২ জন স্নাতকের মধ্যে ৪৬৬ জন আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা প্রসারের মধ্যেও কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ছিল। ১৮৮৩-৮৪ সালে বার্ষিক আয় ২০০ টাকার কম এমন পরিবার থেকে আগত ছাত্রের সংখ্যা বাংলাদেশের কলেজের ৯ শতাংশেরও কম। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা সমাজের নিচের তলার শ্রেণীগুলিকে খুব অল্পই স্পর্শ করেছিল। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ছাড়াও, আঞ্চলিক বৈষম্যও ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল কলকাতা, বোম্বে বা মাদ্রাজের মতন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে। ১৮৮৬-৮৭ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাদ্রাজে শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা ১৮,৩৯০, বাংলায় ১৬,৬৩৯, বোম্বেতে ৭,১৯৬ জন, সেখানে যুক্তপ্রদেশে ৩,২০০, পাঞ্জাবে ১৯৪৪, সেন্ট্রাল প্রভিন্সে ৬০৮ ও আসামে ২৭৪ জন। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষাও একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ও কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যও ছিল। হিন্দুরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ও মুসলিমরা পিছিয়ে পড়ে। এমনকি হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষরা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেননি। ১৮৮৩-৮৪ সালে বাংলায় কলেজ ছাত্রদের ৮৪.৭ শতাংশই আসত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মধ্যবিত্তদের সামাজিক গঠনে এই আর্থিক, ধর্মীয় বা বর্ণগত বৈষম্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেহারা আমরা দেখতে পাই তা প্রধানত ইংরাজী শিক্ষিত বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) শ্রেণীদের নিয়ে গঠিত ; নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ এই সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল না বললেই চলে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বরূপ সম্পর্কে এক ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্রিস্টোফার বেইলি ও ডেভিড ওয়াশব্রুকের মতন কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা। বেইলির মতে এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আইনজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিভোগীরা দেশীয় শেঠ, ব্যাঙ্কার, বণিক, জমিদার প্রভৃতি প্রভাবশালী শ্রেণীগুলির অনুগৃহীত। এই সম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক-অনুগৃহীতের সম্পর্ক মাত্র। ডেভিড ওয়াশব্রুক মাদ্রাজের ক্ষেত্রে ও ক্রিস্টিন ডবিন বোম্বাই-এর ক্ষেত্রে এই একই ধরনের পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এই জাতীয় আদর্শ বর্জিত স্বার্থ-নির্ভর নেমিয়ারিস্ট ইতিহাস ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া কঠিন। তপন রায়চৌধুরী এই জাতীয় ব্যাখ্যাকে 'animal politics' এর সাথে তুলনা করেছেন। স্বদেশ প্রেমের কোন উপাদান বা জাতীয়তাবাদের কোন মহৎ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় কেম্ব্রিজগোষ্ঠীর কাছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা নিতান্তই অনুজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে। নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরাও মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে সন্দিহান। তাদের লেখায় মধ্যবিত্তরা দেশজ এলিটদের অংশ এবং এলিট বা সাবল্টার্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্বই ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক চালিকাশক্তি। এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। এর ফলে এটা ভোলা সহজ হয় যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ

হয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ-মেয়াদী সাংস্কৃতিক-মতাদর্শগত (প্রাথমিক পর্যায়ে) ও রাজনৈতিক (উচ্চতর পর্যায়ে) সংগ্রাম গড়ে তোলে। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী তার গর্বিত গঠন সত্ত্বেও একদিকে যেমন তার আত্মসত্ত্বা খুঁজে পাওয়ার জন্য ছেদহীন ভাবে সচেষ্ট ছিল, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে যাকে আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ধাপ বলে অভিহিত করতে পারি।

স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও পড়েছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এটি ছিল মুখ্যতঃ জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। প্রথম সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব। জন ম্যাকসুয়ারের হিসেব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮৫ ভাগ ধনী, ৬৮ ভাগ হয় জমিদার নয় ব্যবসায়ী। বর্ণগত ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল পঞ্চাশ টাকা যা দেওয়া মধ্যবিত্তদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে এবং নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান লীগ ও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যবিত্তশ্রেণী নির্ভরতা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান লীগের কর্মকর্তাদের ৬৮ শতাংশ মধ্যবিত্ত, ৩৮ শতাংশ আইনজীবি, ১৪ শতাংশ ছোট বা মাঝারি জমিদার, শিক্ষক, কর্মচারী প্রমুখ। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, প্রথমতঃ এর সদস্যরা অনেকেই পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সদস্যরা অনেকেই গোঁড়া হিন্দু নয়, খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম ঘেঁষা। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ইন্ডিয়ান লীগের তুলনায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অনেক বেশী মধ্যবিত্ত নির্ভর। নেতৃত্ব স্থানীয়দের শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল শিক্ষক ও শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল আইনজীবী। ধর্মীয় ভাবে ব্রাহ্মদের প্রভাব অনেক বেশী ছিল। আবার শিক্ষাগত বিচারে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, "...শিক্ষা, বৃত্তি, মানসিকতা এঁদের মধ্যে অনেক বেশী সংহতি দিয়েছিল।"

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সম্ভবত প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন যারা কৃষকদের সম্পর্কে সংগঠিত মতামত জানায়। ১৮৮৪ সালে প্রজাসত্ত্ব আইনের খসড়ার বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদ জানায়। কলকাতার বাইরেও এরা সাংগঠনিক বিস্তার লাভ করে। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৫-এর মধ্যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখা দশ থেকে আশীতে দাঁড়ায়। লর্ড লীটনের আমলে নানা দমনমূলক নীতি যেমন অস্ত্র আইন, দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রভৃতির কারণে ভারতীয় রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

বোম্বাই শহরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংগঠন ছিল দাদাভাই নৌরজি প্রতিষ্ঠিত (১৮৬৬) ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৬৯ সালে বোম্বাই শহরে এর শাখা খোলা হয়। এই সময়ে বোম্বাই শহরের প্রভাবশালী সংগঠন ছিল বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন। বোম্বাই শহরের প্রভাবশালী বণিক ও শেঠিয়ারা এর নেতৃত্বে ছিল। অচিরেই পৌর কর প্রভৃতি নিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে শেঠিয়াদের বিরোধ শুরু হয়। বোম্বাই পৌরসভাতেও শেঠিয়াদের প্রাধান্য ছিল। এরা সম্পত্তি কর দিতে চাইত না। অন্তত ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে ভোটাধিকার না থাকায় বণিক-শেঠিয়া প্রমুখ সম্পত্তিবান শ্রেণী, নিজ শ্রেণী স্বার্থ অনুসারে পৌর নীতি রচনা করত। বোম্বাই শহরের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন শ্রেণী স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় বোম্বে প্রেসিডেন্সী ইউনিয়ন। অনিল শীল বোম্বে প্রেসিডেন্সী ইউনিয়নের কার্যকলাপে খুব বেশী সক্রিয়তা দেখতে পাননি। এমনকি বোম্বাই শহরের বাইরে এদের কোন শাখা স্থাপনের নজিরও দেখতে পাওয়া যায় না। তুলনামূলকভাবে পুণাকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের

রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশ অনেক তীব্র ছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন ১৮৭৯ সালেই রিচার্ড টেম্পল পুণার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তার সংগঠিত প্রকাশ পুণা শহরে যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তা মহারাষ্ট্রে বিরল। এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পুণার ঐতিহ্যবাহী চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। বাংলায় যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন, মহারাষ্ট্রে তা করে চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। ইংরাজী শিক্ষার জোরে সরকারী চাকুরীর সিংহভাগ এরা করায়ত্ত করে। সরকারী চাকুরী ছাড়াও আইন, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশাতেও চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েন। পেশওয়াদের প্রাক-ঔপনিবেশিক মারাঠা স্বাদেশিকতার প্রভাবও উনিশ শতকের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের উপরে পড়েছিল।

একদিকে দেশজ স্বাদেশিকতা, অন্যদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব - এই দুই এর মধ্য থেকে জন্ম নেয় পুণা সার্বজনিক সভা (১৮৬৭)। পুণা সার্বজনিক সভার নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নাটু ভ্রাতৃদ্বয়। গোপালহরি দেশমুখ, জি.ভি. দোশী এবং সর্বোপরি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এই সভার কার্যকলাপের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একদিকে যেমন স্বাদেশিকতার প্রসার ঘটানো, অন্যদিকে তেমনি কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৭ এ মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে সভার সদস্যরা ত্রাণ কার্যে নামে। শুধু তাই নয়, কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে পুণা সার্বজনিক সভা তার শ্রেণী গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, স্বভাবতই যা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবাদে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ও নতুন ধরনের বৃত্তির ও চাকুরী সৃষ্টি হয়; এই প্রক্রিয়া থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গর্ভ থেকে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও এই উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুদৃঢ় দেশজ শিকড় ছিল। দেশের ঐতিহ্যকে এরা ভোলেননি। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক শাসন ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমালোচনা উপস্থিত করে। এই প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক ফল ছিল ১৮৮৫-র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রতিষ্ঠা।

৪.৪.১.২.৫ ঃ বর্ণ আন্দোলন

ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটি একটি বর্ণ ভিত্তিক সমাজ। অর্থাৎ সমাজ একাধিক বর্ণে বিভক্ত ও সমাজে এক একটি বর্ণের অবস্থান এক-এক ধরনের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিরা উচ্চবর্ণের। উচ্চ বর্ণের মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে। এমনকি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে সমাজের অগ্রণী অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরাই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি আত্মসাৎ করে। নিম্নবর্ণের মানুষরা ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈষম্য পুরোপরি বিদ্যমান থাকে।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈষম্য সত্ত্বেও এই সমাজ কিন্তু অনড়, অচল, গতিহীন নয়। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক M.N. Srinivas লক্ষ্য করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের তলার শ্রেণীগুলি সমাজের উপর তলায় উঠে এসেছে এবং মধ্য বা উচ্চবর্ণের সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে M.N. Srinivas সংস্কৃতায়ন বা 'Sanskritization' বলে অভিহিত করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে তাকে নতুন জীবন দান করে। ১৯০১ সালের

জনগণনা থেকে ঠিক হয় ভারতীয় সমাজে প্রতিটি বর্ণের অবস্থানকে লিপিবদ্ধ করা হবে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতে নানা ধরনের বর্ণ-ভিত্তিক সংগঠন বা caste association গঠিত হতে শুরু হয়। এর থেকে বোঝা যায় বর্ণ সংহতি নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এই উদীয়মান বর্ণ সংগঠনগুলির লক্ষ্য ছিল তাদের বর্ণের মানুষদের জন্য সরকারী চাকুরী, শিক্ষা, নির্বাচনী সংস্কার প্রভৃতি আদায় করা। শিক্ষা, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য সংরক্ষণ চালু করার প্রয়াস এই প্রক্রিয়া থেকে জাত। নিম্নশ্রেণীর মানুষরা অনুধাবন করেছিল সংরক্ষণ চালু না হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

১৮৭৩ সালে মহারাষ্ট্রে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন জটিরাও ফুলে। গঠিত হয় সত্যশোধক সমাজ (১৮৭৩)। ফুলে মনে করতেন ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণেই শুদ্র প্রমুখদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই। সুতরাং শুদ্রদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র ব্রাহ্মণবাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। জটিরাও ফুলে প্রথমে পুণা সার্বজনিক সভা ও পরে কংগ্রেস বয়কট করার কথা বলেন। নিম্নবর্ণের কৃষকদের সঙ্গেও তাঁর আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। Gail Omvedt এর গবেষণা থেকে দেখা যায় সত্যশোধক আন্দোলনের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল। একদিকে ছিল উচ্চবর্ণ নির্ভর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যদিকে ছিল গণনির্ভর র‍্যাডিকালিজম। এই আন্দোলনে একদিকে ছিল মারাঠাদের জন্য 'ক্ষত্রিয়ত্ব' খুঁজে বার করা, কোলাপুরের মহারাজার উপর নির্ভরশীলতা এবং ১৯১৯ সালের পর থেকে কংগ্রেস বিরোধিতা। এইগুলি সবই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ। অন্যদিকে ছিল গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে বর্ণ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, ইংরাজীর পরিবর্তে মারাঠা ভাষার ব্যবহার এবং উচ্চবর্ণের সুবিধা আদায় করার থেকে অনেক বেশী বর্ণ ব্যবস্থাকেই আক্রমণ করা। এই দ্বিতীয় ধারাটি ছিল অনেক বেশী Popular বা গণচরিত্রের। এমনকি ১৯১৯-২১ পর্যন্ত সাতারাতে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তার পিছনেও নিম্নবর্গীয় বর্ণচেতনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের গণভিত্তি প্রসারের ক্ষেত্রে এই নিম্নবর্গীয় আন্দোলন সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে ভেল্লা ও দ্রাবিড় আত্মপরিচয়কে কেন্দ্র করে নিম্নবর্ণের মানুষরা সংঘবদ্ধ হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ব্রাহ্মণরা ছিল জনসংখ্যার ৩.২ শতাংশ, অথচ ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা স্নাতক হন তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিল ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে তামিল ভেল্লা, তেলেগু রেড্ডি ও কাম্মা ও মালয়লী নায়াররা। শিক্ষার উপর আধিপত্য থাকার সুবাদে সরকারী চাকুরীর উপরও ব্রাহ্মণদের বিপুল আধিপত্য ছিল। সরকারী চাকুরীর ৪২ শতাংশ ছিল ব্রাহ্মণদের দখলে। তামিল ভেল্লা সম্প্রদায় এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও তামিল ভাষা। উত্তর ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির থেকে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও তামিল ভাষাকে পৃথক সত্ত্বা, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য প্রদান করার চেষ্টা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেন রেভারেন্ড Robert Caldwell ও G.E. Pope-এর মতন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করে আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব। সামগ্রিক ফল হিসেবে জন্ম নেয় তামিল ভাষা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্ফূরণ যাকে 'empowering discourse' বলে অভিহিত করা যায়। এর মূল লক্ষ্য ছিল একটি অ-ব্রাহ্মণ পরিচয় বা non-brahman identity গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে Justice Party গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯১৬ সালে অ-ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক দল রূপে Justice Party গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই দল কংগ্রেসকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে চিহ্নিত করে। রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং অব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক নির্বাচনী সংরক্ষণ দাবী করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা এই

দাবীকে সমর্থন করে ও ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারে এই দাবী মেনে নেওয়া হয়। ১৯২০ সালের নির্বাচনে Justice Party নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৯৮টি আসনের মধ্যে ৬৩টিতে জয় লাভ করে। এরপর থেকে Justice Party-র অবক্ষয় শুরু হয় কারণ নিম্নবর্গীয় মানুষের থেকে Justice Party ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে Justice Party-র পতন ঘটে, M.C. Rajah-এর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণের মানুষরা Justice Party পরিত্যাগ করে। গান্ধীবাদী আন্দোলন (আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো) দক্ষিণ ভারতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে।

দেশের অন্যান্য প্রান্তেও নিম্নবর্ণের মানুষরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। ১৮৭২ সাল থেকে বাংলায় নমঃশুদ্র আন্দোলন অন্যতম যা পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে social protest movement বা সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেছেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মাহার সম্প্রদায়ের ডঃ বি.আর. আমবেদকর নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবীতে বিপুল ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। আমবেদকর ১৯২৭ সালে ডিসেম্বরে মনুস্মৃতিকে আগুনে দাহ করেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে দলিতদের জন্য কোন উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। দলিতদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজনীতি ও শিক্ষায় দলিতদের বেশী করে অংশগ্রহণ। এটি বস্তুত নিছক ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দলিত আত্মসত্তার পঠান্তর।

কংগ্রেসের পক্ষে এই 'দলিত জাগরণ'কে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তাতে অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলা হয়। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনগত ভাবে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যদের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। এর ফলে দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরূপ থেকে যায়। ১৯৪৫ সালে আমবেদকর দলিতদের পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় (separate political identity) দাবী করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেসের যে গণভিত্তি ছিল দলিত সংগঠনগুলির তা ছিল না। এমনকি ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে জাতীয় কংগ্রেস দলিতদের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করে। আমবেদকরের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি একে 'crisis of representation' বলে অভিহিত করেন ও গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সংগঠনের অভাবে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্রুত স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে দলিত আন্দোলন ও নিম্নবর্ণের মানুষের চেতনার প্রকাশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পৃথক দলিত চেতনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামো ও চিন্তা-চেতনাকে উৎপাটিত করা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না। পৃথক দলিত চেতনা ও বর্ণ আন্দোলন জাতীয়তাবাদের অপূর্ণাঙ্গতার নিদর্শন মাত্র। আবার এটাও সত্যি যে দলিত চেতনা জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের মতন গণভিত্তি বা mass base অর্জন করতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় নেওয়ার চেষ্টা করতো। ইতিহাসের গতি কখনও যে একমুখী হয় না, বরং তা অজস্র চড়াই-উতরাই-এর মধ্য দিয়ে যায় তার নিদর্শন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বর্ণ আন্দোলনের টানাপোড়েন। বস্তুতঃ বর্ণ আন্দোলন জাতির বহুস্বরের সচেতন অস্তিত্বকে তুলে ধরে।

৪.৪.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Sumit Sarkar : Modern India 1885-1947.

২। Bipan Chandra : India's Struggle For Independence.

৩। Sekhar Bandyopadhyay : From Plassey to Partition.

৪। অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭।

৫। Suman Bagly : Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age.

৪.৪.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। তুমি কি মনে করো যে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ভারতের চিরাচরিত সমাজ পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল?

২। ঊনিশ শতকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৩। ঔপনিবেশিক শিক্ষা নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৪। ঊনিশ শতক ও বিংশ শতকের ভারতে বর্ণ আন্দোলনের বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল? বর্ণ আন্দোলন কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতাকে প্রকট করেছিল?

ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -7

National Movement in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

COR-207

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

<u>বিষয় সমিতিঃ</u>

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

<u>বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,</u>

শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২২ ।
- গ্রন্থটি রিবিভিন্ন অংশ লেখকদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে, আবার কিছু অংশ বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকেও সংগৃহীত হয়েছে।
- সংগৃহীত অংশের মৌলিকত্ব নেই।

<u>Director's Note</u>

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-207: National Movement in India- (Credit-4)

BLOCK-1: Background of Indian Nationalism

Unit-1: Social, Economic and Political background of Indian Nationalism

Unit-2: Historiographical Debates.

BLOCK-2: Politics of Associations

Unit-3 : Objectives and Methods.

Unit-4 : The rise of the Indian National Congress, the foundation debate, myth and reality.

Unit-5: Moderate and extremist phases of Congress politics.

BLOCK-3: Different Nationalist Ideas.

Unit-6: Bankimchandra, Vivekananda, Aurobindo, Tilak,Rabindranath.

Unit-7: Spread of radical nationalism through literature and sports, Revolutionary terrorism and students' politics.

Unit-8: Rise of M.K.Gandhi and the era of mass politics.

Unit-9: Formation of Congress Left Wing, Socialist ideas of Nehru, Subhas and Bhagat Singh.

BLOCK-4: Left Movement in India

Unit-10: Workers and Peasants Struggle.

Unit-11: Indian National Army- the Naval Revolt.

BLOCK-5: Marginal voices of India

Unit-12: The question of caste and untouchability- anti-caste movements.

Unit-13: Women participation in caste struggle.

BLOCK-6: Growth of Communal Politics in India

Unit-14: The British Policy of divide and rule.

Unit-15: The Muslim league and Pakistan.

Unit-16: Partition of India and Independence.

ACKNOWLEDGEMENT

Unit-1: Social, Economic and Political background of Indian Nationalism	

Unit-2: Historiographical Debates.	
Unit-3 : Objectives and Methods.	
Unit-4 : The rise of the Indian National Congress, the foundation debate, myth and reality.	
Unit-5: Moderate and extremist phases of Congress politics.	
Unit-6: Bankimchandra, Vivekananda, Aurobindo, Tilak,Rabindranath.	
Unit-7: Spread of radical nationalism through literature and sports, Revolutionary terrorism and students' politics.	
Unit-8: Rise of M.K.Gandhi and the era of mass politics.	
Unit-9: Formation of Congress Left Wing, Socialist ideas of Nehru, Subhas and Bhagat Singh.	
Unit-10: Workers and Peasants Struggle.	
Unit-11: Indian National Army- the Naval Revolt.	
Unit-12: The question of caste and untouchability- anti-caste movements.	
Unit-13: Women participation in caste struggle.	
Unit-14: The British Policy of divide and rule.	
Unit-15: The Muslim league and Pakistan.	
Unit-16: Partition of India and Independence.	

<u>CONTENT</u>

Unit-1: Social, Economic and Political background of Indian Nationalism	

Unit-2: Historiographical Debates.	
Unit-3 : Objectives and Methods.	
Unit-4 : The rise of the Indian National Congress, the foundation debate, myth and reality.	
Unit-5: Moderate and extremist phases of Congress politics.	
Unit-6: Bankimchandra, Vivekananda, Aurobindo, Tilak,Rabindranath.	
Unit-7: Spread of radical nationalism through literature and sports, Revolutionary terrorism and students' politics.	
Unit-8: Rise of M.K.Gandhi and the era of mass politics.	
Unit-9: Formation of Congress Left Wing, Socialist ideas of Nehru, Subhas and Bhagat Singh.	
Unit-10: Workers and Peasants Struggle.	
Unit-11: Indian National Army- the Naval Revolt.	
Unit-12: The question of caste and untouchability-anti-caste movements.	
Unit-13: Women participation in caste struggle.	
Unit-14: The British Policy of divide and rule.	
Unit-15: The Muslim league and Pakistan.	
Unit-16: Partition of India and Independence.	

পর্যায়- ১

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পটভূমি

একক- ১

জাতীয়তাবাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক পটভূমি

উদ্দেশ্যঃ বর্তমান পর্যায়ে আমরা জানতে পারব ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে কী পটভূমিকা ছিল। কী কী কারণে ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ হওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

সূচনা ঃ- ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এদেশে সংগঠিত আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল। ১৮৮৫ ডিসেম্বর মাসে জন্ম নেয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সে সংগ্রাম ছিল বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম। যে সংগ্রাম জয়ে পরিণত হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট।

বিদেশী প্রাধান্যের পরিণাম

আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব প্রধানত বিদেশী প্রাধান্যের মোকাবিলা করার জন্যই ঘটেছিল। ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় ভাবাবেগ জেগে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পরিণামেই এদেশে জাতীয় আন্দোলনের মননশীল ও নৈতিক পরিবেশ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তার শিকড় নিহিত ছিল এদেশবাসীর স্বার্থের সাথে ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত। ব্রিটিশ তার নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য ভারত জয় করেছিল। সেই উদ্দেশ্যেই মুখ্যত তারা ভারত শাসন করেছিল। ব্রিটিশে তার লাভ চরিতার্থ করতে গিয়ে ভারতের মনদলকে বলি দেয়। ভারতীয়রা ক্রমেই টের পায় যে ব্রিটেনের ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদকগোষ্ঠীর ও অনান্য প্রাধান্য সৃষ্টিকারীদের স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ এদেশের স্বার্থকে বলি দিয়েছিল।

ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী ছিল ব্রিটিশ শাসন—এই বোধের মধ্যেই নিহিত ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল। ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মননশীলতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতির বা উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা ছিল ব্রিটিশ শাসন। অধিকন্তু ভারতের এই দুরাবস্থার বিষয়টি ক্রমেই অধিক সংখ্যক ভারতীয়রা টের পেয়ে যায়।

ভারতীয় সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারে যে বিদেশী শাসকদের হাতে পড়ে তাদের স্বার্থ জলাগুলি যাচ্ছিল। কৃষকরা বুঝতে পারে যে তার উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ বিদেশী শাসক ভূমিরাজস্ব হিসেবে নিয়ে যাচ্ছিল। সে আরো দেখে যে সরকার ও তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা পুলিশ, আদালত ও সংগিত আধিকারিকরা সকলে মিলে জমিদার ও ভূস্বামীদের পক্ষ নিয়ে তাদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে, অথচ এরাই কৃষককে ভাড়াটে চাষীতে পরিণত করেছে। সরকার ব্যবসায়ী ও সুদের কারবারীদেরকেও আশ্রয় দিত যারা কৃষকদের নানাভাবে ঠকিয়ে তাদের জমি কেড়ে নিত। যখনই কৃষক ভূস্বামী ও সুদের কারবারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তখনই আইন শৃংখলা রক্ষার নামে পুলিশ ও সেনাবাহিনী কৃষক-বিদ্রোহীকে দখল করেছে।

কারিগর ও হস্তশিল্পীরা লক্ষ্য করে যে বিদেশী শাসন বিদেশী প্রতিযোগিতাকেই সহায়তা দিয়েছে। আর তাতে এদেশীয় কারিগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার কোন ক্ষতিপূরণের জন্য কিছুই করা হত না। পরবর্তীকালে বিংশ শতকে আধুনিক কারখানা, খনি ও বাগিচা শিল্পে শ্রমিক লক্ষ্য করে যে মৌখিক সহানুভূতি দেখালেও সরকার কিন্তু সেই ধনীদেরই পক্ষ নিয়েছিল, বিশেষ করে বিদেশী ধনীদের। যখন শ্রমিক তার সংগঠনের সাহায্যে ধর্মঘট, বিক্ষোভ সমাবেশ বা অন্যকোন পথে সংগ্রাম করে নিজের অবস্থা ফেরানোর চেষ্টা করেছে, তখনই সরকার তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অধিকন্তু শ্রমিক বুঝতে পারে যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বকে ঠেকানো যেতে পারে কেবলমাত্র শিল্পায়নের মাধ্যমে। আর সেই কাজটি একমাত্র স্বাধীন সরকার-ই করতে পারে।

ভারতীয় সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষেরাও কম অসন্তুষ্ট ছিল না। উদীয়মান, মননশীল তথা শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের নতুন করে অর্জিত আধুনিক জ্ঞান দিয়ে এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হতভাগ্য অবস্থাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালে এদেশের একশ্রেণীর মানুষ ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিল এই আশা করে যে বিদেশী হলেও ব্রিটিশ তাদের দেশকে আধুনিক করে তুলবে, দেশে শিল্পায়ন ঘটাবে। কিন্তু শেষে তারাও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। আর্থিক দিক থেকে তারা আশা করেছিল যে, ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতের উৎপাদন শক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। যেমন ভাবে তারা নিজেদের দেশের উন্নতি ঘটিয়েছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা টের পায় যে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রীদের তত্বাবধানেই এদেশে ব্রিটিশনীতি নির্ধারিত হত। তার ফলে এদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে এবং অনুন্নত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা এদেশের উৎপাদন শক্তিগুলির উল্লাস বন্ধ করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে শিক্ষিত ভারতীয়রা বুঝতে পারে, ব্রিটিশ যে ভারতকে স্ব-শাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেসব ত্যাগ করেছে। অধিকাংশ ব্রিটিশ আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশরা ভারতে থাকবে। অধিকন্তু বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে ক্রমেই সরকার সেসব অধিকারকে সীমিত করে দেয়। ব্রিটিশ আধিকারিক ও লেখকরা ঘোষণা করেছেন যে ভারতীয়রা গণতন্ত্রের পক্ষে অনুপযুক্ত। স্ব-শাসনের পক্ষেও অনুপযুক্ত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকার। ক্রমেই নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করেছে। আধুনিক ধারণার প্রসারের বিষয়েও শাসক শ্রেণী বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেছে।

উদীয়মান ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর মধ্যেও ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতা জেগে উঠছিল। এই শ্রেণীর মানুষেরাও ক্রমেই বুঝতে পারে যে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থেকে কষ্ট পাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের নানারকম বাণিজ্য কর, শুল্ক, পরিবহন নীতির কারণে এদেশীয় ধনিক শ্রেণীর যে উন্নতি হচ্ছিল না, একথা তারা বুঝে গিয়েছিল। ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ছিল নতুন ও দুর্বল। তাই এর প্রয়োজন ছিল সরকারী সাহায্যের। যাতে সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাদের সেরকম কোন সাহায্য দেওয়া হত না। পরিবর্তে সরকার ও তার আমলারা বিদেশী পুঁজিবাদীদের সাহায্য করতো। যারা প্রচুর সম্পদ নিয়ে ভারতে এসে এদেশের শিল্পক্ষেত্রটিকে আত্মসাৎ করেছিল। ভারতীয় পুঁজিবাদীরা বিদেশী পুঁজিবাদীদের কঠোর প্রতিযোগিতার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ভারতীয় পুঁজিবাদীরাও উপলব্ধি করেছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার মধ্যে অসংগতি ছিল। কেবলমাত্র একটি জাতীয় সরকার-ই ভারতীয় ব্যবসা ও শিল্পের অগ্রগতি ঘটাবার মতো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

পূর্বের একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় সমাজের জমিদার, ভূস্বামী, শাসকরাই একমাত্র অংশ যাদের স্বার্থ ও বিদেশী শাসকদের স্বার্থ ছিল অভিন্ন, যারা শেষ অবধি বিদেশী শাসনকেই সমর্থন করে গিয়েছিল। কিন্তু সেই হেন শ্রেণীর অনেক ব্যক্তিরাই জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। দেশে জাতীয়তাবাদী যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দেশপ্রেমে অনেকে সাড়া দিয়েছিল। এছাড়াও জাতিগত বৈরীতা, ও ঔদ্ধত্যমূলক নীতি অনুসরণের কারণে প্রত্যেকটি আত্ম-সম্মানীয় ভারতীয়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে, প্রতিটি চিন্তাশীল ভারতীয়, তাতে জেগে ওঠে, যে যে শ্রেণীতে থাকুক না কেন। সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনের বিদেশী চরিত্রই জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কারণ বিদেশী প্রাধান্যের কারণে অধীনস্থ যে কোন জাতির অন্তরেই অনিবার্যভাবেই জেগে ওঠে দেশাত্মবোধক আবেগ।

সারবত্তা দাঁড়ালো এই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা চরিত্র এবং ভারতীয়দের জীবনে তার ক্ষতিকর প্রভাবের ফলেই ক্রমশ ভারতের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল জাতীয় আন্দোলন। কারণ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এদেশের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে সরিয়ে রেখে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল।দেশের মধ্যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একত্রীকরণ

ভারতবাসীর মধ্যে সহজেই জাতীয়তাবাদী ভাব জেগে উঠেছিল। কারণ ভারত ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ভালোভাবেই ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা এক আধুনিক ও সরকারী প্রথা চালু করেছিল। এইভাবেই ব্রিটিশ এদেশকে প্রশাসনিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। স্থানীয় ও গ্রামীণ স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির ধ্বংসসাধন করে, আধুনিক ব্যবসা ও শিল্প সারা ভারতে চালু করে ক্রমেই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে এক করে তুলেছিল। দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী মানুষগুলির অর্থনৈতিক ভাগ্য পরস্পরের সন্দে জুড়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের কোন অংশে যদি দুর্ভিক্ষ হত বা খাদ্যাভাব দেখা দিত, তবে সারা দেশে দ্রব্যমূল্য ও খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার বিষয়ে তার প্রভাব পড়তো। এমন কি, রেলপথ, একটি ঐক্যবদ্ধ ডাক ও তার বিভাগ চালু হওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশ আর বিচ্ছিন্ন ছিল না, তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আবার এক্ষেত্রেও জাতি, ধর্ম, সামাজিক শ্রেণী, অঞ্চল নির্বিশেষে বিদেশী শাসক যেভাবে নিপীড়ন চালিয়েছিল, সেই আচরণও এদেশীয়দের মধ্যে ঐক্যের ভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সারা দেশ জুড়ে মানুষ দেখেছিল যে তাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশ শাসনের কারণেই তাদের কষ্ট। একদিকে জাতি হিসেবে ভারতের উত্থান এদেশের জাতীয়তাবাদের উত্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও ঐক্যবোধের অনুভূতি ভারতীয় জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

পাশ্চাত্য চিন্তা ও শিক্ষা

ঊনবিংশ শতকে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার প্রসারের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় আধুনিক যুক্তিবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছিল। তারা

সমসাময়িক ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বুঝতে শুরু করেন, প্রশংসা করেন, সমর্থন করেন। এবং অনুসরণও করেন। রুশো, পাইন, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা তাদের রাজনৈতিক গুরু হয়ে ওঠেন। আবার মাৎসিনি, গ্যারিবোল্ডি ও আইরীশ জাতীয়তাবাদী নেতারা হয়ে ওঠেন তাদের রাজনৈতিক বীর।

এইসব শিক্ষিত ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম বিদেশী শাসনাধীনে থাকার লজ্জাকে অনুভব করেছিলেন। চিন্তায় আধুনিক হয়ে তারাও বিদেশী শাসনের কুপ্রভাবকে বুঝতে পারার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তারা এক আধুনিক, শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী ও ঐক্যবাদ ভারতের স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব শিক্ষিত ও সচেতন ভারতীয়দের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠরাই পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের সংগঠক ও দেশের কাণ্ডারী হন। তবে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার

কল্যাণে জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হয় নি। জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যবর্তী স্বার্থ সংঘাতের পরিণামে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র এদেশীয় শিক্ষিতদের পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করতে সক্ষম করেছিল, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে শিখিয়েছিল, সেই আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক করতে শিখিয়েছিল, তাকে আধুনিক দিশা দিতে শিখিয়েছিল। বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদেশী শাসনের প্রতি অনুগত হয়ে থাকার, সংস্কার জন্মিয়ে দিতেন। আধুনিক ভাবনা-চিন্তার প্রসারের অংশস্বরূপ ছিল জাতীয়তাবাদী ভাবনা। এশিয়ার অন্যান্য দেশে যেমন চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং সমগ্র আফ্রিকায় আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও আধুনিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সামান্যই।

আধুনিক শিক্ষাও খানিকটা ঐক্যের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল স্বার্থের অভিন্নতা, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী। এইক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই আধুনিক ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের সঙ্গে এই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের ভাবের আদান-প্রদান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক ভাবনা, জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইংরাজী ভাষা বাধা হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিক্ষিত, শহুরে মানুষদের তফাৎ ঘটিয়ে দেয় ইংরাজী ভাষা। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার সঙ্গেও শহুরে এলাকার তফাৎ ঘটে ইংরাজী ভাষার কারণে। ভারতীয়, জাতীয় নেতারা এই বিষয়টি, সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন। দাদাভাই নওরোজী, সৈয়দ আহমেদ খান এবং বিচারক রানাডে থেকে শুরু করে তিলক, গান্ধীজি পর্যন্ত সকলেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় ভাষার বৃহত্তর ভূমিকার পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন। বস্তুত, সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে, ক্রমবর্ধমান সাহিত্যের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি দেশীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটেছিল।

সংবাদ পত্র ও সাহিত্যের ভূমিকা

জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন ভারতীয়রা যে মুখ্য উপায়ে দেশাত্মবোধের বার্ত আধুনিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা দেশের মানুষের মধে ছড়িয়ে দিয়ে, চেতনার সৃষ্টি করেছিল, তা হল সংবাদপত্র। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব সংবাদপত্রে সর্বক্ষণ সরকারী নীতির

সমালোচনা করা হত। এছাড়াও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হলে এ হতে বলা হত। জাতীয় সাহিত্য, তথ্য উপন্যাস, প্রবন্ধ ও দেশাত্মবোধক কবিতাও এদেশের মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসমীয় ভাষায় লক্ষীনাথ বেজবরুয়া, মারাঠি ভাষায় বিষ্ণু শাস্ত্রী চিল্লুকর, তামিল ভাষায় সুব্রহ্মণ্য ভারতী, হিন্দি ভাষায় ভরাতেন্দ্র হরিশচন্দ্র এবং উর্দু ভাষার আলতাফ হসেন হালি ছিলেন সেকালের নাম।

ভারতের অতীতের পুনরাবিষ্কার

ব্রিটিশ আধিকারিক ও লেখকদের এইরকম প্রচার ছিল যে, অতীতে ভারতীয়দের কখনোই নিজেদের শাসন ক্ষমতা ছিল না, হিন্দু, মুসলমানেরা সবসময় লড়াই করছে, তাদের ধর্ম ও সামাজিক জীবন ছিল নিচুমানের এবং গণতন্ত্রের, এমনকি স্বশাসনের অনুপযুক্ত। জাতীয়তাবাদী অনেক নেতাই এইসব প্রচারের বিরোধিতা করে দেশের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন, তাদের আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনতে সোচ্চার হন। তারা ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। সম্রাট আশোক, চন্দ্রগুপ্ত ও আকবরের মতো শাসকদের রাজনৈতিক কীর্তির কথা তুলে ধরে তারা সেই সব নিন্দুকদের নিন্দার জবাব দেন। এই কাজে তারা ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতা, উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কৃত হয়। দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন জাতীয়তাবাদী নেতা বিনা বিচারে ভারতের অতীতের জয়গান করতে আরম্ভ করেন, তার ত্রুটি-বিচ্যুতির ও অনগ্রসরতার কথা না ভেবেই তারা ভারতের অতীতকে গৌরবময় হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করে দেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের দিকেই শুধু তাকানোর প্রবণতা থাকায় বড়ো ক্ষতি হয়েছিল। কেননা মধ্যকালীন ভারতের মহান কীর্তিগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাবাবেগ জেগে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। পাল্টা প্রবণতা দেখা দেয় মুসলমানদের মধ্যে। তারা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণার খোজ করে আরব ও তুরস্কের ইতিহাসের মধ্যে। অধিকন্তু পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করার জন্য অনেক ভারতীয়রাই একটি বিষয় উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের মানুষ সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। আত্মতুষ্টি ও গর্বের মিথ্যা অনুভূতিতে পড়ে ভারতীয়রা নিজেদের সমাজকে খুটিয়ে দেখেনি। এর ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এরই সূত্র ধরে অনেক ভারতীয়ই বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণে বিমুখ হয়ে যায়।

শাসকদের জাতিগত ঔদ্ধত্য

শাসকের জাতিগত ঔদ্ধত্য ভারতে জাতীয় ভাববৃদ্ধিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল । ভারতীয়দের সঙ্গে অনেক ইংরাজ ব্যক্তিই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে অন্যায় আচরণ করতেন। একজন ভারতীয়ের সঙ্গে একজন ইংরাজ কোনরকম মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে ভারতীয়ের পক্ষে সে বিচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। এইটিই ছিল জাতিগত ঔদ্ধত্যের সবথেকে স্পষ্ট, বিশেষ ও পুনঃপুনঃ প্রকাশ। জি. ও. ট্রেভেলিয়ান ১৮৬৪ সালে উল্লেখ করেন : "আদালতে যেকোন সংখ্যক হিন্দু অপেক্ষা আমাদের দেশের লোকের মূল্য অনেক বেশী, এ এমন এক পরিস্থিতি ছিল। যেখানে এক নীতি জ্ঞানবর্জিত, লোলুপ ইংরেজের হাতে ক্ষমতা ছিল। জাতিগত ঔদ্ধত্যের কারণে জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, প্রদেশ, নির্বিশেষে সব ভারতীয়ই নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়। তাদেরকে ইয়োরোপীয় সংঘগুলি থেকে দূরে রাখা হত। প্রায়শই রেলেগাড়ীতে এক কামরায় ইয়োরোপীয়দের সন্দে ভ্রমণ করতে দেওয়া হত না। এরই ফলে ভারতীয়রা নিজেদের জাতিগত লজ্জার বিষয়ে সচেতন হয় এবং সেই অবস্থা থেকেই তারা ভাবতে শুরু করে যে তারা এক জাতি, এক প্রাণ, হয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করবে।

সংগৃহীত ঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস।

সহায়ক গ্রন্থাবলিঃ

১) পলাশী থেকে পার্টিশন – শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২) আধুনিক ভারত – সুমিত সরকার।

৩) Modern India- Sumit Sarkar.

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীঃ

১) Discuss the reasons behind the rise of Nationalism in India.

2) What was the socio-economic cause of Nationalism in India?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

একক - ১

উপএকক - ১

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

Approaches to Indian Nationalism

গঠন (Structure) ঃ

৪.৫.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৫.১.১.১ ঃ সূচনা

৪.৫.১.১.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৫.১.১.৩ ঃ কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৫.১.১.৪ ঃ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৫.১.১.৫ ঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৫.১.১.৬ ঃ নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৫.১.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৫.১.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৫.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি

(২) সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ধরন ও সীমাবদ্ধতা

(৩) কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর মতাদর্শ ও দুর্বলতা

(৪) জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ

(৫) মার্কসবাদী ও নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চা

৪.৫.১.১.১ ঃ সূচনা

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা বিচার করতে গিয়ে ভারতীয় ও বিদেশী ঐতিহাসিকগণ নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন। মতামতের এই বিভিন্নতা থেকে নানা ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর (Schools of historians) মতাদর্শগত পার্থক্য বেশ ভালভাবে ধরা পড়েছে।

৪.৫.১.১.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ (Imperialist school of historians) ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের মনগড়া দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী ধারার গুরুত্বকে অনুধাবন করার কোন চেষ্টা করেননি, বরং এই সংগ্রামকে কখনও কোনভাবেই সমর্থন করেননি এবং ভাল চোখে দেখেননি। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ বহুকাল ধরে তাদের নানা রচনার মাধ্যমে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের নানা উপকারে এসেছিল এবং ইংরেজরা এদেশবাসীর জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এই উদ্যোগের ফলেই এদেশে উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন, শৃঙ্খলা নানা প্রতিষ্ঠান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সূচনার ফলেই ভারত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছিল। ব্রিটিশদের সদর্থক ভূমিকার ফলে এদেশে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারলাভ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান ধারণার প্রসারের ফলে ভারতীয়রা এর সংস্পর্শে এসে নিজেদের জীবন ও চিন্তাকে উন্নত করতে পেরেছিল। ব্রিটিশদের প্রয়াসের ফলেই এদেশে আধুনিক শিল্পব্যবস্থা, রেল, প্রযুক্তি ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার শুধু প্রসারই ঘটেনি, তা অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী মনে করেন যে ভারতীয়দের মধ্যে যেটুকু জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয়েছিল তাও ব্রিটিশ শাসনের সদর্থক পরিণাম বলা যেতে পারে। ভারতের অখন্ডতা, ঐক্যবোধ, প্রশাসনিক একতা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকেই উদ্ভুত বলে এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর ধারণা। এর পূর্বে ভারতবর্ষ ছিল ‘a mere geographical expression’ যে ভারতীয় অর্থনীতি ব্রিটিশদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ব্রিটিশদের নিরলস প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ বিশ্বের বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক

গড়ে তুলতে সক্ষম হল। উদার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শ ইংরেজরাই ভারতীয়দের শিক্ষা দিয়েছিল এবং সেই পথে হাঁটার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদি যা কিছু ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে হয়েছিল তা সবই ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ধার করা। এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশরাই ভারতীয়দের করে দিয়েছিল এবং প্রশাসনেও ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ কেন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম শুরু করেছিলো এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলো তার কারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর বোধগম্য হয়নি। এই নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ধারাটি পাওয়া যায় লর্ড ডাফরিন, লর্ড কার্জন এবং লর্ড মিন্টো প্রভৃতি বড়লাটদের বিভিন্ন বিবৃতিতে, রাওলাট কমিটি রিপোর্ট, মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ইত্যাদির মধ্যে। এই সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় Valentine Chirol, Varney Lovett রচিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলি থেকে। এছাড়াও Percival Spear এবং Reginald Coupland তাঁদের রচনার মাধ্যমে এই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারাকে সদর্পে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে গেছেন।

আমেরিকান ঐতিহাসিক T.Mc cully তাঁর 'English Education and the origins of Indian Nationalism' (New York, 1940) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রসারের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, ইংরেজী শিক্ষার সূত্র ধরেই ভারতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্রিটিশ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতবর্ষে একটা শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদের কোন ধারণা বা অস্তিত্ব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে Mccully নানা যুক্তিসহ তাঁর তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্ত্ব নিঃসন্দেহে একপেশে ও অতিরঞ্জিত। এই মতাদর্শের ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষে 'mass articulation of nationalism'কে বুঝতে এবং তার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে এরা জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনকে এবং এর জঙ্গী চরিত্রকে তাদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই মতাদর্শের ঐতিহাসিকরা শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে 'সুবিধার রাজনীতির' প্রেক্ষাপটে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তারা সবসময়ই এই শ্রেণীকে সুবিধাবাদী স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্খী, নানারকম পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার অভিলাষী বলে বর্ণনা করেছেন যা সঠিক নয়। এর ফলে এই শ্রেণীর আদর্শ ও ভাল গুণগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, এই মতাদর্শের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর অনেকের ইতিহাস রচনাকালে জাত্যভিমান ও জাতিগত শ্রেষ্ঠতার ধারণা থাকার ফলে এশিয়াবাসীদের ইউরোপীয়দের অধীনস্থ প্রজা হিসেবেই তারা সবসময়ে মনে করেছে এবং সেভাবেই তাদের বিচার করেছে। এর ফলে এদের সকলের বক্তব্য একপেশে এবং আংশিকভাবে সত্য।

৪.৫.১.১.৩ ঃ কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি

অধুনা অন্য এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এই গোষ্ঠী Cambridge School of historians নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকবৃন্দ সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় White man's burden এর মহিমা উচ্চগ্রামে কীর্তিত না হলেও বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের উপর তাঁদের লেখাগুলিতে ও বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস এখন অঞ্চল বা প্রদেশ ছাড়িয়ে প্রতি গ্রামে গঞ্জে প্রসারিত। ১৯৫৩ সালে গ্যালাহার (J. Gallagher) এবং রবিনসন (Robinson) এই মতবাদের

প্রতিষ্ঠা করেন 'The Imperialism of Free Trade' নামক গ্রন্থে। ১৯৬১ সালে 'Africa and the Victorians' গ্রন্থে আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ঐ দশকেই এদের প্রেরণায় অনিল শীল এবং পরে এদের কিছু শিষ্য আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রে নানা গবেষণা চালিয়ে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করলেন। এর ফলে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'Locality, Province and Nation' নামক গ্রন্থে পূর্বের মতামত কিছুটা সংশোধিত ও পরিমার্জিত হল। ১৯৭৪ সালের ফোর্ড বক্তৃতাবলীতে ও ১৯৮১ সালের 'Nationalism and the crisis of Empire 1919-1922' প্রবন্ধে গ্যালাহারের ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠির মতে, এই সব প্রচেষ্টায় প্রচারিত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ বিশ্লেষণ হলেও, তার প্রেক্ষাপটে ঠান্ডা লড়াই (Cold War) এর মনস্তত্ত্ব কাজ করছিল। এক দিকে হবসন-লেনিন প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদের মার্কসীয় ব্যাখ্যা খন্ডন করার চেষ্টা এবং অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা থেকেই কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনার বাসনা জেগেছিল বলে মনে করা হয়। এই নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা অনুসরণ করেছিলেন আচার্য লুই নেমিয়ারের পদ্ধতি। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী নেমিয়ারের ইতিহাসতত্ত্বের ও ধ্যানধারণার উত্তরাধিকারীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেমিয়ার (Namier) কোন মহৎ আদর্শের দিক তো দেখেনইনি, বরং তিনি দেখেছিলেন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত ছোট বড় গোষ্ঠীর স্বার্থদ্বন্দ্ব। তিনি পৃষ্ঠপোষক ও অনুগৃহীতের সম্পর্কের আলোকে (Patron-Client relationship) ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচার করেন। পরে সমসাময়িক পূর্ব ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাকালে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি তাকে যুক্তিবোধবর্জিত আবেগপ্রবণ ও নৈরাজ্যপ্রসূত বলে মনে করেছিলেন। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের অযৌক্তিকতার ভাবাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বদেশ ত্যাগের ও ইংলন্ডে পুনর্বাসনের ঘটনা। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদকে দায়ী করেছিলেন। অন্যদিকে যে ইংলন্ডে তিনি বসবাস করতে এলেন সেখানে উদারতন্ত্রের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে শুরু হয়েছে এলিয়টের 'পোড়োজমির' যুগ। এই মর্মান্তিক পরিবেশে নেমিয়ারের ইতিহাসচর্চা স্বাভাবিক কারণেই এলিটপন্থী, রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী রূপ নিল। আর তার উত্তরসাধক কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী সাম্রাজ্যের অবসান ও ঠান্ডা লড়াই এর মনস্তত্ত্বে নেমিয়ারকে আদর্শ হিসেবে বরণ করে নিলেন।

কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গ্যালাহার, অনিল শীল, জনসন এবং বেকার। এরপর এঁদের শিষ্যরা এই মতাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যান নানা গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। গ্যালাহার, জনসন ও শীল সম্পাদিত 'Locality, Province and Nation'এ জোর দেওয়া হল বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের ওপর। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ঐক্য খোঁজার চেষ্টাকে তাঁরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন এবং রোমান্টিকতা ও অজ্ঞতার নামান্তর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বরং ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য প্রথম থেকেই ব্রিটিশ এবং অন্য ইউরোপীয় বণিকদের চোখে পড়েছিল। আরও দেখেছিল, সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে সর্বত্র ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এখানকার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এদের একাংশকে পক্ষে নিতে হবে, এবং অপর অংশের বিরাগভাজন হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এই সহযোগিতা ও বিরোধ বারবার লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় স্তরে সহযোগিতার নীতি ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। তেমনি স্থানীয় বিরোধিতা প্রথমে আঞ্চলিক ও পরে জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছিল। কোনরকম উদ্দেশ্য, সাধারণ লক্ষ্য বা আদর্শবাদ এ ক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। বাংলায় কৃষ্ণদাস পাল ও সুরেন ব্যানার্জীর দল, পাঞ্জাবে মহাত্মা ও কলেজ দল, মহারাষ্ট্রে ডেকান সোসাইটি ও পুণা সার্বজনিক সভার নেতৃত্ব নিয়ে তিলক ও গোখলের দল যে কলহে

লিপ্ত হয়েছিল তাই প্রসারিত হয়েছে কংগ্রেসের সভামন্ডপে। ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমতা দখলের জন্য এক অঞ্চলের গোষ্ঠী অন্য অঞ্চলের সমধর্মী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ দখলের চেষ্টা করেছে। এর ফলে শেষ অবধি কংগ্রেস একটা 'নড়বড়ে কোয়ালিশনে' থেকে গেছে। তাই ভারতীয় গৌরবময় সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাস সীমাবদ্ধ থেকেছে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জয়-পরাজয়, ক্রমাগত দলবদলের ও নতুন চক্র গঠনের মধ্যে। কোন আদর্শবাদ বা লক্ষ্য এই সংগ্রামের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের এই সব মতামতের উপর লুই নেমিয়ারের ছায়া পড়েছে। কারণ অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নেমিয়ারও কোন মহৎ আদর্শবাদের সন্ধান পাননি।

কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী স্বীকার করেছে যে সাম্রাজ্যের স্বার্থে এবং ব্রিটিশ শক্তির যে দুর্বলতা ছিল তা পূরণ করার জন্যই তাদের ভারতীয় সহযোগীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। এত বড় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে অর্থবল, অস্ত্রবল, লোকবল, এমন কি শেষের দিকে মনোবল দরকার ছিল, তা ব্রিটিশ শক্তির ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রদেশে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরাজদের প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ক্ষমতাবান গোষ্ঠী সুবিধা পাওয়ার জন্য রাজনীতি শুরু করে। এই রাজনীতি শুরু হয় পোষ্য ও পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এইভাবে ভারতীয় রাজনীতি গড়ে উঠতে লাগল পোষ্য ও পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে বড় বড় নেতার আবির্ভাব ঘটল যারা স্থানীয় ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য দালালের ভূমিকা পালন করল। এই ভাবে গোটা ভারতে ইংরেজ শাসন চলাকালীন রাজনৈতিক দালাল তৈরি হল। তাই ভারতীয় রাজনীতির কোন পটভূমিকা নেই, শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত হয়েছে। আর কংগ্রেস সভামঞ্চে ঘটেছে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিরোধের পুনরভিনয়। ইংরেজ শাসন যতদিন ছিল পরোক্ষ, স্থানীয় সহায় সম্পদ বন্টনে তা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি, ততদিন কোন প্রতিরোধ বা অসন্তোষ দেখা যায়নি। কিন্তু যখন আঞ্চলিক স্বার্থে হস্তক্ষেপ শুরু হল তখনই প্রতিরোধ এল। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা প্রভৃতি সুযোগ দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তা কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখা গেল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও শাসন সংস্কার থেকে যে পতনের শুরু হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ক্ষমতা হস্তান্তরে তার অবসান ঘটল। ভারত জোড়া অসংখ্য দাবার ছকে জয়-পরাজয়ের ভারসাম্য না রাখতে পেরে ইংরেজকে বিদায় নিতে হল। তাই গ্যালাহারের ভাষায় বলা যায়, পিকউইক ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই দুই 'খড়ের পুতুলের লড়াইকে' কে প্রকৃত সংগ্রাম বলবে? ভারতের জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞা এখানে সুস্পষ্ট। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের লড়াই একটা বড় ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। .....“it was nothing more than a battle between the two men of straws”. এই কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'Nation in making' ধারণাকে অস্বীকার করেছেন এবং ভারতের অখন্ডতা নস্যাৎ করে দিয়ে জাতপাত ভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্ন, খন্ড রাজনীতিকেই মুখ্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং জাতীয়তাবাদকে নিছক একটা আবরণ বলে গন্য করেছেন। ভারত বলতে তাঁরা বুঝেছেন জাতপাত, ধর্ম, জনগোষ্ঠী ও স্বার্থ নিয়ে গড়ে উঠা এক দেশ। এদের মতে সমাজের উচ্চকোটির সংকীর্ণ স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই বা তাদের অধীনস্থ গোষ্ঠী ও তার স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই জাতীয় আন্দোলনকে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম জনগণের আন্দোলন ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের আদর্শকে তাঁরা অবান্তর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ইতিহাসে পোষ্য-পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ককে একমাত্র বড় করে দেখানো হয়েছে। তাই এই সম্পর্ককে বড় করে দেখাতে গিয়ে বেইলি (C.A. Bayly) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এলাহাবাদের উপর রচিত গ্রন্থটির সমাপ্তি টেনেছেন। এলাহাবাদের ক্ষেত্রে বেইলি, দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ওয়াশব্রুক, (D.A. Washbrook), বোম্বাই এর নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ক্ষেত্রে

গর্ডন জনসন (Gordon Johnson) এবং যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে রবিনসন (F. Robinson) প্রভৃতি তাঁদের গ্রন্থে বলবার চেষ্টা করেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশে পৃষ্ঠপোষাক-পোষ্য সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো প্রাদেশিক, এমন কি জাতীয় মঞ্চে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তবে কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণের বেতার যন্ত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য একেবারেই ধরা পড়েনি। তাঁরা তাদের মনগড়া ইতিহাস লিখেছেন যা একপেশে এবং অর্ধসত্য। ঐতিহাসিক S. Gopal এই গোষ্ঠীর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে শোভনতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতা ছিল সে কথা এই ঘরানা একেবারেই ভুলে গেছে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী এঁদের মতামতকে খন্ডন করে বলেছেন যে, এই ঘরানা যখন দেশব্যাপী জরিমানা, পিটুনি কর, সম্পত্তি ক্রোক, লাঠি ও গুলি চালনা, পুলিশ হাজতে অকথ্য অত্যাচার, নির্জন কারাবাস, ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান সব ভুলে গিয়ে অসংখ্য জ্ঞাত ও ততোধিক অজ্ঞাত নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আত্মবলিদানকে অগ্রাহ্য করেন, তখন মনে হয় এ ধরনের বিশ্লেষণে কোথায় একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, নেতারা ভাবী মন্ত্রিত্ব বা ব্যবসার সুবিধা বা ভালো চাকুরির লোভে দুঃখবরণ করেছেন, জনগণও নিশ্চয় তা করেননি। বারদোলি, মেদিনীপুরের কৃষক, বোম্বাই এর শ্রমিক, অন্ধ্রের আদিবাসী, সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমদগার সবাই হয় কোন মন্ত্র বা স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই অধ্যাপক ত্রিপাঠী আক্ষেপের সুরে বলেছেনঃ ‘বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।’ তাই অধ্যাপক ত্রিপাঠী যুক্তিসহকারে নেতাদের প্রতি তাঁদের নানা অভিযোগ খন্ডন করেছেন। অধ্যাপক বিপান চন্দ্রও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিম্নবর্গ, মধ্যবিত্ত, নারী সমাজের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ভুলভ্রান্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

৪.৫.১.১.৪ ঃ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগোষ্ঠীও তাদের মতাদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। এই জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার ধারাটি ঔপনিবেশিক যুগে যে সব ঐতিহাসিকদের লেখায় তুলে ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— লালা লাজপৎ রায়, দাদাভাই নৌরজী, পট্টভি সীতারামাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, জওহরলাল নেহেরু, সি.এফ. অ্যান্ড্রুজ ও গিরিশ মুখার্জীর মত লেখক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন তারাচাঁদ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বি.আর নন্দ, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, এস. গোপাল, অমলেশ ত্রিপাঠী, বিমান বিহারী মজুমদার ও আরও অনেকে। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় ইংরেজ শাসনের শোষণ, অত্যাচার এবং কুফলগুলি তুলে ধরা হয়েছে। দাদাভাই নৌরজী থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মূল কথা হল- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কারণ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। এই সব ঐতিহাসিকেরা বেশ কিছু ব্যাপারে একমত না হলেও মোটামুটি একটি ব্যাপারে একমত যে, ইংরেজদের এদেশে আসার পূর্ব থেকেই ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা ও স্বদেশী ঐতিহ্য ছিল। এ সমস্ত ঐতিহাসিকরা গুরুত্ব দেন ভারতবাসীর সংস্কৃতিগত ঐক্যের উপর। এই সংস্কৃতিগত ঐক্যের জন্যই এ দেশের মানুষ নিজেদের একটা দেশের, একটা জাতির সদস্য হিসেবে গণ্য করত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ‘A nation in making’ বা জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার উপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। এঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জনগণের সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই সংগ্রাম কোনও বিশেষ শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ দেখাতে চেয়েছেন যে, ঔপনিবেশিকতার নানাবিধ কুফল, শোষণ ও অপশাসনের ফলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ হয়েছিল এবং তা সারা ভারতে ছড়িয়ে

পড়েছিল। জাতীয়তাবাদ যতই প্রবল হতে থাকল ভারতের জাতীয় সত্তা ততই স্পষ্ট হতে থাকল। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিস্কার ভাবেই উপলব্ধি করেছিল যে ব্রিটিশ শাসনে তাদের নানা আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে না এবং তাদের হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছিল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাই তখন পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাল। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় নেতাদের নেতৃত্ব ও কৃতিত্বকে বড় করে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের আদর্শ ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের মতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ক্রমে ক্রমে এক গণ- আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এর কারণ ব্রিটিশ অপশাসনে শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী ও অন্যান্য নানা নিম্নবর্গীয় মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর হতাশা, আশা-আকাঙ্খার সংযোগ ঘটায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাই এই আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে জাতীয়তাবাদের ইডিওলজি (আদর্শবাদ) ভারতে একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদ ইতালি, জার্মানী, আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদের মতই প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সেই সংস্কৃতি ছিল high culture. তার পেছনে ছিল প্রথমে বেদান্ত, পরে মহাভারত ও ভাগবত, শেষে বেদ। পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতীয় চিন্তানায়করা বার্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্য দিতে শিখেছিলেন। ম্যাৎসিনি থেকে শিখলেন তারা দেশপ্রেম। জার্মান রোমান্টিকদের অনুসরণ করে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য থেকে ভারতীয় সত্তার আদি ও অবিকৃত রূপটি খুঁজে পেতে চেষ্টা করলেন। এদেশের চিন্তানায়করা ব্রিটিশ ধ্যানধারণার অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে নিজেদের ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চাইলেন। নরমপন্থীরা প্রধানতঃ ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করলেন, চরমপন্থীরা সব ব্রিটিশ ধারণাকেই নস্যাৎ করে দিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গবেষণায় কৃতিত্ব দেখালেও জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ধর্মীয় ভিত্তিভূমির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যার ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি অনেক লঘু হয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন যে, ইতিহাস রচনার একটি প্রবণতা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে জাতীয়তাবাদী লেখাপত্র সাধারণভাবে পর্যাপ্ত নয় বললেও কম বলা হয়। ১৯৫০ এর দশক অবধি ভারতীয় পন্ডিতরা এ-রকম বিষয় থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতেন। বরং পরিবর্তে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজপুত বা মারাঠা আন্দোলনের নিরাপদ বিষয়ে লেখালেখি করে তাঁদের দেশপ্রেম ব্যক্ত করতে চাইতেন। সময়ে সময়ে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক বিকৃতিও খুবই স্পষ্ট ও বড় হয়ে উঠত। যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত বই "History of Freedom Movement" (3vols) এর প্রতিটি খন্ডেই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু নিয়ে রীতিমতো ভজনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজাতি পরিমার্গকে খোলাখুলি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, আধুনিক ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যায়, তাঁরা, এমন কি দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্তের প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের অনুসন্ধানের ফলাফলকেও নিজেদের রচনার অঙ্গীভূত করতে চাননি। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যে শ্রেণী সংঘাত ও বর্ণ বৈষম্যের দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ও জাতপাত সম্বন্ধে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে যে সব দ্বন্দ্ব রয়েছে তা গুরুত্ব না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে গেছেন বা লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অথচ, বর্ণবিভেদ, শ্রেণীবিভেদ, জাতপাতের দ্বন্দ্ব তো ভারতীয় সমাজের মধ্যে ছিলই। এইসব তথ্যকে উপেক্ষা করলে ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের ও জাতীয় আন্দোলনের অনেক প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যাবে। এই সব অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রায় সর্বদাই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী দল লড়াই করেছে, একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং একে অপরকে আক্রমণ পর্যন্ত করেছে। এইসব নানা সামাজিক টানাপোড়েনকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ যথার্থ প্রেক্ষাপটে তুলে ধরে বিচার করেননি। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক বিষয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের নজর এড়িয়ে গেছে।

৪.৫.১.১.৫ ঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের মার্কসীয় ভাষ্যটির প্রচলন করেছিলেন রজনী পাম দত্ত তাঁর ‘India Today’ গ্রন্থে। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান মানবেন্দ্রনাথ রায়, এ.আর. দেশাই, ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ, সুপ্রকাশ রায় প্রমুখ। এই ঘরানার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে রুশ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের যেমন— Levkovsky, Goldberg, V.I. Pavlov-র মত সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণীগত বিষয়টি এবং শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তারা বলতে চেয়েছেন যে ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব ও বাজার অর্থনীতির প্রসারের প্রেক্ষাপটে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিচার করতে হবে। তাঁদের বিচারে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থবিজড়িত দ্বন্দ্ব অথবা শ্রেণী সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে চলেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম, আর অন্যদিকে চলেছে শ্রেণী সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছিল, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই বুর্জোয়ারা অবশ্য নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্যই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। অতএব বুর্জোয়া ভূমিকার কথা মেনে নিলেও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ মুক্তিযুদ্ধের সর্বভারতীয় চরিত্র বিচার করেননি। রজনীপাম দত্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি আধুনিক শিল্পের বিকাশের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এ.আর. দেশাই তাঁর ‘Social Background of Indian Nationalism’ গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে, ব্রিটিশ যুগে আধুনিক শিল্পের বিকাশের ফলে আধুনিক বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই আধুনিক বুর্জোয়ারা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়েছেন অনেক সময়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে। সোভিয়েত ঐতিহাসিক Pavlov দেখিয়েছেন যে বিশ শতকে দেশীয় বুর্জোয়ারা এদেশীয় বাজার দখলের জন্য এখানকার বাজার থেকে বিদেশীদের বিতাড়নের লক্ষ্যে স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

তবে পুরোনো মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার পরিমার্জিত ও সংশোধিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এস.এন. মুখার্জী, সুমিত সরকার, বিপান চন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ। বিপানচন্দ্র পূর্বতন মার্কসবাদী ঘরানার সমালোচনা করে এই অভিযোগ করেছেন যে অনেক মার্কসবাদী লেখকই আমজনতাকে আন্দোলনে টেনে আনার রণনীতি, কর্মসূচী, মতাদর্শ, পরিসর নিয়ে মুক্তি সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল কতটা দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছিল যে সব দিক নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা সঠিকভাবে চালান নি। ‘India’s Struggle for Independence’ গ্রন্থে বিপানচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা বলতে চেয়েছেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হল প্রধানতঃ ভারতীয় জনগণের স্বার্থ ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব। ভারতীয় নেতৃত্ব প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং অনুন্নত অবস্থা । এর কারণেই ঊনিশ

শতকে তাঁরাই প্রথম উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক দোষগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অভিন্ন স্বার্থগুলি বুঝে নিয়ে জাতীয় নেতারা ক্রমশ একটি সুস্পষ্ট উপনিবেশ বিরোধী মতাদর্শ তৈরি করতে পেরেছিলেন যার উপর ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। জাতীয় নেতারা মনে করতেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও কাজ হল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ লড়াই এর মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেখা হয়েছিল একাধারে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে ওঠার বা জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার ফসল এবং এই প্রক্রিয়ার এক সক্রিয় শক্তি হিসেবে। সুমিত সরকারের মতে, গোড়ার দিকের মার্কসবাদী ঘরানা শ্রেণী বিশ্লেষণের প্রয়োগে কখনও কখনও খানিকটা যান্ত্রিক। তিনি তাঁর ‘Modern India’ গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে দুটি স্তর চিহ্নিত করেছেন তা হলো, শিরোমণিতান্ত্রিক এবং লোকায়ত। তার মতে, এই লোকায়ত দিকটি বারবারই উপেক্ষিত থেকে গেছে। এমন কি গোড়ার দিকের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও এই লোকায়ত বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই সুমিত সরকার ‘তলা থেকে ইতিহাস’ (History from below) লেখার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীগণ মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার সমালোচনা করে বলেছেন যে মার্কসবাদীরা নিম্নবর্গের পৃথক অস্তিত্বের কথা মেনে নিলেও এদের কর্মপদ্ধতিকে তাঁরা দেখেছেন কেবলমাত্র একটি শ্রেণীসংগ্রাম (Class struggle) হিসেবে। কিন্তু নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চাকারীরা মনে করেন, ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক চেতনার পরিবর্তনের সমস্যা ও জটিলতা কোনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণা বা সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

৪.৫.১.১.৬ ঃ নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের গবেষণার এবং আকর্ষণীয় আলোচনার সৃষ্টি করেছেন ‘সাবল্টার্ন’ (Subaltern) বা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীগণ। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের এবং তাদের পূর্ববর্তী সব ইতিহাসতত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করে তা বর্জন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে পূর্বের সব ইতিহাসতত্ত্ব ‘আচ্ছাদিত’ এবং অস্পষ্ট, পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। পূর্বের সব ইতিহাসচর্চার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারিগণ শুধু এক নতুন দিক নির্দেশই করেননি, সেই সঙ্গে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল ধারার সৃষ্টি করেছেন। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর ও গভীরতর করেছে। অবশ্য এর মধ্যে অনেক অপূর্ণতাও থেকে গেছে।

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ‘Subaltern Studies’ এর প্রথম খন্ড প্রকাশনার মাধ্যমে। এই প্রথম খন্ডের শুরুতেই ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক গুহ বলেন, ‘The historiography of Indian Nationalism has for a long time been dominated by elitism-Colonialist elitism and bourgeois nationalist elitism’’. সাবলটার্ন স্টাডিজের বিভিন্ন খন্ডে এই মতাদর্শই ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁদের মতে, ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে যে মূল সংঘাত দেখা গিয়েছিল তার এক মেরুতে অবস্থান করেছিল যথাক্রমে দেশী-বিদেশী elite শ্রেণী এবং উচ্চবর্গ শ্রেণী। একেবারে অন্য মেরুতে ছিল নিম্নবর্গ বা ‘Subaltern’ শ্রেণী। এই চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হলেন-রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, শহিদ আমিন, দীপেশ চক্রবর্ত্তী, ডেভিড আর্নল্ড, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের গবেষণায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চায় যে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বারবার পাওয়া যায় তার বিরোধিতা করে নিম্নবর্গের

প্রকৃত ভূমিকা তুলে ধরার একটা ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না এবং ভারতীয় জনগণ কখনই উচ্চবর্গের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেননি। বরং নিম্নবর্গই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল দেশী-বিদেশী এলিট (Elite) শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী মনে করে যে কেম্ব্রিজ ও জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি তে কেবলমাত্র গুরুত্ব পেয়েছে উচ্চবর্গের ইতিহাস ও তাদের নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। নিম্নবর্গের মানুষরা সেখানে ব্রাত্য উপেক্ষার পাত্র এবং উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা চালিত। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার সমালোচনা করে এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ আমজনতার প্রতিবাদী আন্দোলনকে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিকতা ও ভারতীয় জনগণের সংঘাতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্লেষণ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাদের কাছে সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনই উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন বলে মনে হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সব আন্দোলন হয়েছে সেগুলোকেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এর বাইরেও যে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন হয়েছে সেগুলোকে জাতীয় কংগ্রেসের মূল স্রোতের টানে ক্ষুদ্র খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে দেখেছেন। অন্যদিকে মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার সমালোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে, মার্কসবাদীরা নিম্নবর্গের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেও তাদের সব কর্মপদ্ধতিকে যান্ত্রিক মার্কসবাদী শ্রেণীসংগ্রাম (Class struggle) হিসেবে দেখেছেন এবং শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন, ভারতবর্ষের মত কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষক চৈতন্যের পরিবর্তনের নানা সমস্যা ও জটিলতা কোনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা বা তাত্ত্বিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা একেবারেই সঠিক হবে না।

এই মতাদর্শের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় সুদীর্ঘকাল ধরে বিদেশী উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে এসেছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় এই উভয় ধরনের উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। রণজিৎ গুহের মতে, সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম হল উচ্চবর্গের কার্যকলাপের ফসল। এই দুটি ইতিহাসের কোনটিতেই নিম্নবর্গের স্বকীয় রাজনীতি, তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, তাদের আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য বা জনগণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রকৃত অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কিছুই আলোকপাত করা হয়নি।

তাই রণজিৎ গুহ তাঁর বিখ্যাত 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India' গ্রন্থে এবং তাঁর অনুগামী গবেষকরা যেমন-ডেভিড হার্ডিম্যান, ডেভিড আর্নল্ড, শাহিদ আমিন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, পার্থ চ্যাটার্জী, দীপেশ চক্রবর্ত্তী, গৌমত ভদ্র প্রমুখরা তাঁদের নানা রচনায় নিম্নবর্গের প্রতিরোধ আন্দোলন, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দিক নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে অযোধ্যায় কৃষক বিদ্রোহে (১৯১৯-২২) কৃষকদের প্রাথমিক সুযোগ্য নেতৃত্বের কথা, ডেভিড হার্ডিম্যান গুজরাটের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের কথা এবং এইসব আন্দোলনের নিজস্ব চরিত্র ও গতির ইতিহাস লিখেছেন। গোরখপুরের কৃষক আন্দোলন অবশেষে কিভাবে একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন শাহিদ আমিন তাঁর 'Sugar Cane and Sugar in Gorokhpur' গ্রন্থে। এছাড়া গৌতম ভদ্রের 'মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ' এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'Bengal 1920-1947: The Land Question নিম্নবর্গের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রের কথাই জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে।

'সাবলটার্ন' ঐতিহাসিকগণ ইতালির বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশ্চির লেখা থেকে তাঁদের Subaltern চেতনার ও ইতিহাসচর্চার প্রেরণা ও উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্রামশ্চির বিখ্যাত 'Prison

Notebooks' -এ এই শব্দটির ('Subaltern') ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু এটা বলা দরকার যে গ্রামশ্চির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি 'সাবলটার্ন' শব্দটি 'প্রেলেতারিয়েট' এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রণজিৎ গুহ ও তাঁর অনুগামীরা এই 'Subaltern' তত্ত্বের ধারণাটিকে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সূত্ররূপে গ্রহণ করে যত্রতত্র একে নির্বিচারে ব্যবহার করে চলেছেন। এর ফলে তাঁদের বিচার ধারার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ঘরানার সাদৃশ্য রয়ে গেছে। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী ও সাবলটার্ন গোষ্ঠীর বক্তব্যের মধ্যে বহু মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সাবলটার্ন ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর রচনায় নিম্নবর্গের শুধু জয়গান করা হয়েছে। উচ্চবর্গের বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত প্রচেষ্টা, কার্যকলাপ, অবদানের গুরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে এবং এদের সম্পর্কে নেতিবাচক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেনঃ...... 'This (Subaltern) approach is characterised by a generally 'ahistorical' glorification of all forms of popular militancy and consciousness......'' সাবলটার্ন স্টাডিজ এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মেটালিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক এর প্রবন্ধে। ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য', এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কিভাবে নির্মাণ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। হাজার আওয়াজের ভিতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে কণ্ঠস্বরই শোনা যাক না কেন, তা নিম্নবর্গের নয়, অন্যের নির্মাণ। গায়ত্রী স্পিভ্যাক আরও বললেন, এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলো কী, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তা তৈরী হয়, কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সে সব প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মোটামুটিভাবে এই সমালোচনার পর থেকে সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম-ষষ্ঠ খন্ড থেকে সাবলটার্ন স্টাডিজ-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝোঁক এবং পুরোনো আদিকল্পের বা মডেলের সংশোধন, পরিবর্তন বা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এখন থেকে স্পষ্টই স্বীকার করে নেওয়া হল যে, নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ। আগের সঙ্গে নতুন পর্বের চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য হল এই যে, ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যাগ করা হল। আশির দশকের শেষে এসে দেখা গেল নতুন এক ব্যাখ্যায় 'আধিপত্য' বলতে কেবলই বোঝানো হচ্ছে এক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আবহকে। নিম্নবর্গ সেখানে নানা ধরনের গ্রস্ত সাংস্কৃতিক ভুবন। আগেকার সমাজ-অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন নব্যপন্থীরা। এখন দেখা যাচ্ছে, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এর কোনও নির্দিষ্ট' বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না। সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখা শুরু হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীগণ নিজেরা উচ্চবর্গভুক্ত এবং তাঁদের রচিত ইতিহাসের প্রায় সবটাই এসেছে উচ্চবর্গীয় ইতিহাসের উৎসসমূহ থেকে। নূতন উৎস তাঁরা খুঁজে পান নি। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় তথ্যের সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর ভাষায়, সীমিত তথ্যে নিম্নবর্গের ইতিহাসকারেরা বিশাল সৌধ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। সুতরাং, সে স্বপ্ন সব সময় বাস্তবের খুব কাছাকাছি এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চা 'নিম্নবর্গকে'

ইতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠায় টেনে তুলে নিয়ে এসেছে। 'History from below' তাঁদের রচনায় শুধু যে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়, নিম্নবর্গই সেই ইতিহাসের নায়ক, তাঁরা একটা ব্যাপার স্পষ্ট করেছেন—স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্তই একমাত্র নায়ক নয়।

৪.৫.১.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Ranajit Guha (ed) 'Subaltern Studies' (all Volumes)

(২) Sumit Sarkar–Modern India 1885-1947

(৩) Amales Tripathi– স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(৪) Bipan Chandra–(a) Modern India (ed) (b) India's struggle for Independence.

(৫) Rajani Palme Dutt–India Today

(৬) Gautam Bhadra & Partha Chattopadhyay– নিম্নবর্গের ইতিহাস (e.d)

(৭) A.R. Desai–Social Background of Indian Nationalism

(৮) Bruce T. Mccully–English Education and the origins of Indian Nationalism'

৪.৫.১.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতাদর্শের মূল্যায়ন কর।

(২) সাম্রাজ্যবাদী ও কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন।

(৩) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসবাদী ইতিহাসকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিচার কর। এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন কি লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

(৪) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। এই ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কি?

(৫) 'সাবলটার্ন' ইতিহাসচর্চার উদ্ভব কেন এবং কিভাবে হল? এক্ষেত্রে গ্রামশ্চির অবদান আলোচনা কর।

(৬) 'সাবলটার্ন' ইতিহাসচর্চার গুণাগুণ বিচার কর। এই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বর্তমানে কি কি পরিবর্তন ও সংশোধন লক্ষ্য করা যায়?

পর্যায়- ২

রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ

একক-৩

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক সংগঠন গুলির সম্পর্কে আলোচনা করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরীগণ

১৮৭০ সালের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বেশ গুরুতর হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে ভারতীয়দের সেই ভাবাবেগ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সমগ্র ভারতব্যাপী ভারতীয়দের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত প্রকাশ। এই সংগঠনের পূর্বসূরী ছিলেন অনেকে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি এদেশে প্রথম রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৩৬ সালের পরে ভারতের বিভিন্ন অংশে অনেকজন সংগঠনে যোগ দেন। এসব সভা সমিতিতে প্রাধান্য ছিল ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের। তখনকার দিনে তাদেরকে বলা হত 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'; তারা ছিলেন আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক বা স্থানীয় চরিত্রের ব্যক্তি। তারা প্রশাসনের সংস্কারের জন্য কাজ করেছিলেন। তাদের কাজ ছিল প্রশাসনের সন্দ্বে ভারতীয়দের যুক্ত করা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ভারতীয়দের দাবি সম্বলিত পত্র পেশ করা।

১৮৫৮ সালের পরে শিক্ষিত ভারতীয় এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। শিক্ষিত ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র ও ভারতের পক্ষে তার পরিণামকে যতই অনুধাবন করেছিলেন ততই তারা এদেশে ব্রিটিশ নীতির সমালোচক হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তাদের অসন্তোষ ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকে। যেসব সভাসমিতি ছিল তারা আর রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

১৮৬৬ সালে দাদাভাই নওরোজী লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, ভারতীয়দের মদলকে উদ্দীপিত করার জন্য ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করা। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের অন্যান্য নামকরা শহরগুলিতে সেই অ্যাসোসিয়েশনের শাখা সংগঠন খোলেন। ১৮২৫ সালে দাদাভাই-এর জন্ম। সমগ্র জীবনকে তিনি জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ভারতের 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান' হিসেবে পরিচিত হয়ে যান। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক চিন্তাবিধ। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর লেখায় তিনি দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশের ভারত শোষণ ও সম্পদ নির্গমনের মধ্যেই নিহিত ছিল ভারতের দারিদ্র্যের মূল। দাদাভাই তিনবার জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি হয়েছিল। এইভাবে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের দীর্ঘ সারির প্রথম নেতাই ছিলেন দাদাভাই যার নাম শুনে ভারতবাসীর অন্তর আন্দোলিত হত।

কংগ্রেস পূর্ব কালে ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। বাংলার তরুণ জাতীয়তাবাদীরা ক্রমেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের ভূস্বামী ঘেঁষা এবং

রক্ষণশীল নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। তারা চেয়েছিল দেশের বৃহত্তর জনস্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমাগত আন্দোলন। তারা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মধ্যে সেই কাণ্ডারীর সন্ধান পান। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উজ্জ্বল লেখক ও বক্তা। অন্যায়ভাবে তাঁকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে বহিষ্কার করা হয়। যেহেতু তাঁর উপর তলার কর্তারা চাইতেন না যে এই সার্ভিসে কোন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি থাকুক। জনপ্রতিনিধি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ১৮৭৫ সালে। সেই সময়ে তিনি কলকাতার ছাত্র সমাজে জাতীয়তাবাদী বিষয়গুলিকে সম্বোধন করে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বোস কর্তৃক পরিচালিত হয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদীরা ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সামনে লক্ষ্য ছিল—দেশের মানুষকে রাজনৈতিক প্রশ্নে ও অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা। এই অ্যাসোসিয়েশনের ছত্রছায়ায় অধিক সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে উক্ত অ্যাসোসিয়েশন গরীব শ্রেণীর মানুষদের জন্য সামান্য চাঁদা ধার্য করেছিল। বাংলার ঘরে ও বাইরে অনেক গ্রামে ও শহরে এই অ্যাসোসিয়েশনের শাখা খোলা হয়।

ভারতের অন্যান্য অংশেও তরুণ সংগ্রামীরা তাদের কাজ করতেন। ১৮৭০ সালে পুনা শহরে জস্টিস রানাডে ও অন্যরা মিলে পুনা সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৪ সালে এম. বীররাঘবাচারী, জি. সুব্রমনিয়ম আইয়ার, আনন্দ চালু এবং অন্যান্যরা মিলিত হয়ে মাদ্রাজ মহাজন সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ সালে ফিরোজশাহ্ মেহেতা, কে. টি. তেলাং, বদরুদ্দীন তৈয়বজী এবং অন্যান্যরা বোম্বে প্রেসিডেন্সী অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। এইভাবে পরিস্থিতি বেশ পরিণত হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদীরা টের পান যে সাধারণ শত্রু বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সারা ভারতব্যাপী রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেসব সংগঠন প্রচলিত ছিল, সেগুলির কাজকর্মের পরিধি ছিল ছোট। তাদের বেশির ভাগ কাজ ছিল স্থানীয় সমস্যা কেন্দ্রিক এবং তাদের নেতা ও সদস্যরাও ছিল কোন একটি মাত্র প্রদেশ বা শহরে সীমাবদ্ধ। এমনকি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও সর্বভারতীয় সংগঠন হয়ে উঠতে সফল হয়নি।

সংগৃহীত ঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস।

সহায়ক গ্রন্থাবলিঃ

১) পলাশী থেকে পার্টিশন – শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২) আধুনিক ভারত – সুমিত সরকার।

৩) Modern India– Sumit Sarkar.

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীঃ

১) Discuss the rise of political association in India.

2) What was political situation before the rise of the political associations in India?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

একক - ১

উপএকক - ২

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি (১৮৮৫)

Origin of Indian National Congress 1885

গঠন (Structure) ঃ

৪.৫.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৫.১.২.১ ঃ সুচনা

৪.৫.১.২.২ ঃ কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে নানা ঐতিহাসিক বিতর্ক—বিতর্কের আলোচনা ও মন্তব্য

৪.৫.১.২.৩ ঃ উপসংহার

৪.৫.১.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৫.১.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৫.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) কংগ্রেসের জন্মবৃত্তান্ত

(২) জন্ম নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিতর্ক

(৩) বিতর্কের নানা দিক

(৪) সিদ্ধান্ত বা নিরপেক্ষ মতামত

৪.৫.১.২.১ ঃ সুচনা

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায় পট্টভি সীতারামায়ার লেখা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে এবং ওয়েডারবার্নের লেখা হিউমের জীবনী গ্রন্থ থেকে।

৪.৫.১.২.২ ঃ কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে নানা ঐতিহাসিক বিতর্ক

কারো কারো মতে, থিওজফিস্টরা (Theosophists) জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে কর্নেল অলকট, ১৮৮৩ তে রঘুনাথ রাও, ১৮৮৯ তে নরেন্দ্রনাথ সেন দাবি করেন যে থিওজফিস্টরাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৫ তে অ্যানি বেসান্ট এই মত সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমকে কংগ্রেসের স্রষ্টা ও জনক বলে অভিহিত করেছেন। এই দলে আছেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সভাপতি ওয়েডারবার্ন, কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামায়া এবং কংগ্রেসের কঠিনতম সমালোচক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী নানা সাক্ষ্যপ্রমাণাদির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ করেছিলেন। পরে অনিল শীল ও বৃটন মার্টিন অধ্যাপক ত্রিপাঠীর বক্তব্য মেনে নিয়েছেন।

ওয়েডারবার্নের ভাষায়, লিটনের আমলের শেষদিকে সরকারের অন্যতম সচিব হিউমের হাতে এমন সব কাগজপত্র আসে যাতে তাঁর বিশ্বাস হয় যে ভারতে গণবিদ্রোহ আসন্ন। এটা দানা বাঁধলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে। বিদ্রোহের ফল মঙ্গলজনক হবে না মনে করে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং বিশেষ করে যুবকদের মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে তিনি তাদের দেশপ্রেম ও ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করেন। একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল প্রাদেশিক সমিতিগুলি রাজনীতি করুক, সর্বভারতীয় সম্মেলন করবে সামাজিক সমস্যা বিচার। যেখানে প্রাদেশিক ছোটলাট সভাপতিত্ব করবেন এবং ভারতীয় নেতা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্যই কংগ্রেসের মত এক Safety Valve তৈরী করতে হিউম উদ্যোগী হন। তাঁর ভাষায় "A Safety Valve for the escape of great and growing forces...urgently needed"। এই সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ডাফরিন। ডাফরিনের নির্দেশেই তিনি কংগ্রেস

এর মতো একটি সংগঠন গড়ার কথা চিন্তা করেন এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। নেতৃবর্গ এবং ডাফরিনের এরকম সংগঠন গড়ার যুক্তি ও প্রস্তাব সমর্থন করে তা কার্যকরী করতে এগিয়ে যান হিউম। তবে ডাফরিনের নির্দেশ সংক্রান্ত ব্যাপারটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে ব্যাপারে তথ্যের অভাব রয়েছে। কারণ হিউম সম্পর্কে ডাফরিনের মনোভাব থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাফরিন হিউমকে একজন পূর্বতন সরকারী কর্মচারীর বেশি মর্যাদা দেননি এবং হিউম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল যে হিউম "seemed to have got a bee in his bonnet"। আসলে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "Introduction to Indian Politics" (১৮৯৮) গ্রন্থে হিউমের সঙ্গে কংগ্রেসের মতো সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে ডাফরিনের আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হিউম বলেছিলেন যে, প্রতি বছর ভারতীয় নেতারা সামাজিক সংস্কার নিয়ে একটি বৈঠকে মিলিত হবে এবং হিউমকে ভাইসরয় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই সভাগুলিতে রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচিত হলে সরকার পূর্বেই পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। তিনি তা সত্ত্বেও ডাফরিন এ ধরনের সমাজ সংস্কার সভার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে যা দরকার তা হল সরকারী নীতির দায়িত্ববান সমালোচনা তাকে আরও ভাল করার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক। এ ধরনের সভায় প্রাদেশিক লাটের উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়াবে। হিউম নিজের ও ডাফরিনের প্রস্তাব ভারতীয় নেতাদের সামনে উপস্থিত করলেন— কোনটা কার না জানিয়ে। তাঁরা ডাফরিনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ঠিক হল ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর (১৮৮৫) পুণায় বসবে সেই সর্বভারতীয় সম্মেলন। হিউম তার নাম দিয়েছিলেন Indian National Union। মাদ্রাজ ও কলকাতা ঘুরে জনমত সংগ্রহ করে হিউম বিলেতে গেলেন লিবারেল নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। পুণায় কলেরা দেখা দেওয়ায় শেষ মুহূর্তে সম্মেলনের স্থান সরিয়ে নেওয়া হল বোম্বাই শহরে। সেই সম্মেলনের নাম বদলে রাখা হল Indian National Congress। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এভাবে ঘটেনি। বাঙ্গালী নেতৃত্বের, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা এতে ছোট করে দেখানো হয়েছে। বাঙ্গালী নেতৃত্বের, বিশেষতর সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা, এতে ছোট করে দেখানো হয়েছে। হিউমের মনে সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা উঠবার আগেই সুরেন্দ্রনাথ তা ভেবেছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মে তাঁর পত্রিকা 'Bengalee'-তে আমরা প্রথম National Congress কথাটি পাই। এর উদ্দেশ্য হবে 'to prepare the way for concerted action in reference no political matters among the different political badies scattered throughout the country'.প্রথম কংগ্রেসের (১৮৮৫) দুই বছর পূর্বে তাঁর জাতীয় কনফারেন্সের প্রথম (কলকাতা) অধিবেশনকে জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া বলা চলে। আর ভারতীয় নেতারা কোনকালেই ডাফরিন বা আমলাদের সঙ্গে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, 'হিউমের নানা স্বকপোল কল্পিত উক্তি ও তার ওয়েগুারবার্ন উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষ্য ইতিহাস বলে চলছে। তার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে রজনী পাম দত্তও ভুল করেছেন।'

তবে হিউম সম্পর্কে ডাফরিনের মন্তব্য 'Seems to have got a bee in his bonnet' (মনে হয় তাঁর মাথায় ছিট রয়েছে) সমীচীন হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতীয়দের জন্য কিছু করার চিন্তা তাঁর মনে ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের বেড়াজালে আটকে পড়ে তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয়। সব সময় তিনি গণ বিদ্রোহের দুঃস্বপ্ন দেখতেন। অবশ্যই ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুভাবে তিনি অবিচল ছিলেন। এজন্য তাঁকে আমলাদের বিরাগভাজন হতে হয়। লীটন তাঁকে উত্তর প্রদেশে বদলি করলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। রিপনের স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাব (১৮ই মে ১৮৮২) তাঁকে আবার সক্রিয় রাজনীতির দিকে টেনে আনল। রিপন হিউমের অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য কাজে লাগাতে চাইলেন। হিউম তদানীন্তন পরিস্থিতি কাজে

লাগিয়ে রিপনের বিশ্বাসভাজন হয়ে গেলেন এবং জনমতকে কিছুটা খুশি করার জন্য রিপন তাঁর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাবটিকে পেশ করলেন। এভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ইলবার্ট বিল নিয়ে যে বিক্ষোভ ছিল তা রিপন কিছুটা প্রশমিত করলেন। এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এবং সরকারী অনুগ্রহ লাভ করে হিউম একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন। ভারতীয়দের তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষে প্রলেপ দেওয়ার জন্য তিনি একটা 'Safety Valve' এর আস্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে সব অভাব-অভিযোগ আছে সেগুলি শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে সরকারের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ দূর করা হলে গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকবে না।

ডঃ অনিল শীলের মতে, হিউম কংগ্রেসকে একটি 'Safety Valve' হিসাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ভারতীয় জনমতের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পূর্বাভাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এস.আর. মেহরোত্রা কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে হিউম ছিলেন ভারতীয় ভারতীয়দের বিশেষ বন্ধু। ভারতীয়দের প্রতি দুর্বলতা এবং সরকারী সমালোচনার জন্য তাকে চাকুরি থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। ঠিক একই মত পোষণ করেছেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি হিউমের লেখা সরকারী নানা চিঠি—পত্রের উল্লেখ করেছেন।

বিপানচন্দ্র, বরুণ দে, অমলেশ ত্রিপাঠী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ অবশ্য কংগ্রেসের উৎপত্তিতে হিউমের অবদানের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, জাতীয় কংগ্রেস কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসাবে হিউমের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের আলোচনার বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। এই ব্যাপারে হিউমের ভূমিকা ও উদ্দেশ্যের একটা সীমিত আভাস পাওয়া গেলেও একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় নেতারা কেন এত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার ব্যাখ্যা মেলে না। বরং ভারতীয় নেতৃত্ব নূতন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করা যাবে। এইসব নেতারা দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং বিদেশী সরকারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা তাই ভেবেছিলেন যে হিউমের মতো একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর সাহায্য পাওয়া গেলে তাদের কার্যকলাপ নিয়ে সরকারী মহলে সন্দেহ দেখা, দেবে না। তাই যদি বলা যায় যে হিউমের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে 'Safety Valve' রূপে ব্যবহার করা তাহলে একথা বলতে হয় যে কংগ্রেস নেতারা হিউমকে 'hightening Conductor' রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রজনীপাম দত্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে হিউম, ডাফরিন ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক গভীরতর ষড়যন্ত্রের (Conspiracy theory) উল্লেখ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্বল্প—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এর আংশিক সমর্থন এসেছে এস.আর. মেহরোত্রার (S.R. Mehrotra) 'The Emergence of the Indian National Congress'' পুস্তকে। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি রিপনকে লেখা হিউমের ১৩ জানুয়ারী, ১৮৮৯ এর চিঠি। মেহরোত্রার মতে হিউম এ ব্যাপারে ডাফরিনের মত চেয়েছিলেন এবং বোম্বাই এর ছোটলাট লর্ড রিএ (Reay)-র সভাপতিত্বের প্রস্তাব ছাড়া অন্য ব্যাপারে সম্মতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ত্রিপাঠী এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ডাফরিন কোনও দিন এরকম প্রতিষ্ঠান তো চানইনি, পরেও তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ডাফরিন যদি কংগ্রেসের মত কোন প্রতিষ্ঠান হোক চাইতেন তাহলে ১৮৮২-র ৩০ শে নভেম্বর সেন্ট অ্যানড্রুজ ডে ডিনার বক্তৃতায় তাকে 'অনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি' বলে উপহাস করতেন না। অর্থাৎ ডাফরিন সম্বন্ধে অনেক মনগড়া কথা হিউম বলতেন, উমেশ

চন্দ্রদের কাছেও বলেছেন। তারই ওপর ভিত্তি করে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মকাহিনী লেখেন এবং সীতারামায়া, রজনীপাম দত্ত সবাই তা বিশ্বাস করে বসেন। আসলে অধ্যাপক ত্রিপাঠী মনে করেন, হিউম নিজের ধারণা অন্যের ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন। হয়তো বা ডাফরিনের প্রশ্রয় আছে বলে তিনি ভারতীয়দের বিশ্বাসভাজন হতে চেয়েছিলেন।

এইসব নানা কারণেই হিউমের Safety Valve তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র, বরুণ দে প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এই তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন। এমন কি ওয়েণ্ডারবার্নের সাত খণ্ডের সরকারী গোপন নথির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তুলেছেন। অতএব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে হিউম বর্ণিত আসন্ন বিদ্রোহের কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে হিউমকে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক' আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। তাঁর ভারত প্রীতি, সাংগঠনিক প্রতিভা, উদারতন্ত্রী মনোভাব ও বড়লাটদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের কথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে যে, তিনি প্রেসিডেন্সিতে, বিশেষ করে বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রিপনের শাসন সংস্কারের ফলে আশায় এবং ইলবার্ট বিলের পরাজয়ের ফলে হতাশায় যেভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তাতে হিউম ছাড়াই কোন না কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হোতো। হয়তো তার কেন্দ্র হতো কলকাতা, আর কর্তা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তৈরিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা আধুনিক ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী স্বীকার করে নিয়েছেন। পট্টভি সীতারামায়া ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারের মধ্যে যে কংগ্রেসের উৎস সন্ধান করেছেন সেই দরবার সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল সুরেন্দ্রনাথকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ওয়েণ্ডারবার্ন বা সীতারামায়া কারো লেখাতেই সুরেন্দ্রনাথের কোন উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, হিউম নিজেও কংগ্রের বোম্বাই গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন কি 'Indian National Union' সম্পর্কে কথা বলতে কলকাতায় এসেও তিনি অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু আনন্দমোহন বসু বা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেননি। হিউমের বোম্বাই গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতি এবং বোম্বাই গোষ্ঠীর মাদ্রাজ গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং কলকাতার নেতৃবৃন্দের প্রতি বীতরাগ নানা ঘটনায় সুস্পষ্ট। ডঃ ত্রিপাঠী মনে করেন যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যানি বেসান্ত, প্রমুখ সমকালীন লেখকদের ভাষ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। আসলে হিউমের আগেই সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা ভেবেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত National Conference এর মধ্যে তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়েছিল। অনিল শীল এই সম্মেলনকে আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক মনে না করলেও অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মতে এই ধরনের সম্মেলন আহ্বান করাটাই ছিল বড় কথা। এই সমাবেশে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার সঙ্গে দু বছর পরে আহুত কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির সাদৃশ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই কারণেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনকে 'জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া' বলে উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও কংগ্রেস ছিল তাঁর মানস সন্তান।

৪.৫.১.২.৩ ঃ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত নয়। আবার জাতীয় কংগ্রেস সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দান তা মনে করা একেবারে ভুল হবে। হিউমের 'Safety Valve' তত্ত্ব জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের মূল কারণ সে কথাও বলা ঠিক হবে না। আসলে কংগ্রেসের জন্মের প্রেক্ষাপট দীর্ঘদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর ভারতীয় জনগণ ক্রমশঃই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতের রাজনীতি সচেতন সমাজ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্যে একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। দেশপ্রেমিক ও কঠোর সে সময়কার ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রাথমিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে সফল করলে এবং ব্রিটিশ সরকারের রোষানল থেকে সংগঠনটিকে রক্ষা করার জন্যই তারা হিউমের সাহায্য নিয়েছিলেন। ভারতের জনগণের বিক্ষোভ যেভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ও জাতীয়তাবাদ যেভাবে প্রসারিত হচ্ছিল তাতে হিউমের মত কোন ব্যক্তিবিশেষ ছাড়াই অনিবার্য পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটত। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, "......It (the Congress) was the culmination of process of political awakening that had its begining in the 1860s and 1870s and took a major leaph forward in the late 1870s and erly 1880s.''

৪.৫.১.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(২) সুমিত সরকার— আধুনিক ভারত।

(৩) সমর মল্লিক—আধুনিক ভারতের রূপান্তর।

(৪) R.P. Dutta—India Today

(৫) Mehrotra, S.R.— The Emergence of Indian National Congress

৪.৫.১.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) হিউমকে কি 'জাতীয় কংগ্রেসের জনক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

(২) জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পেছনে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতামতের মূল্যায়ন কর।

(৩) জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে যে ঐতিহাসিক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে তা পর্যালোচনা কর।

(৪) জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পেছনে 'Safety Valve' তত্ত্ব কতখানি প্রযোজ্য?

(৫) জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তা কি তুমি মনে কর?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

একক - ১

উপএকক - ৩

নরমপন্থী কংগ্রেসের রাজনীতি

Moderate Congress Politics

গঠন (Structure) ঃ

৪.৫.১.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৫.১.৩.১ ঃ সুচনা

৪.৫.১.৩.২ ঃ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কার্যকলাপ

৪.৫.১.৩.৩ ঃ নরমপন্থী আন্দোলনের অবদান

৪.৫.১.৩.৪ ঃ নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা

৪.৫.১.৩.৫ ঃ নরমপন্থীদের সামাজিক চরিত্র

৪.৫.১.৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৫.১.৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৫.১.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নরমপন্থী কংগ্রেসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

(২) নরমপন্থী আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা

(৩) নরমপন্থীদের সামাজিক ভিত্তি

৪.৫.১.৩.১ ঃ সুচনা

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি যাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল তাঁরা সাধারণভাবে ইতিহাসে নরমপন্থী বা Moderate রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। নরমপন্থী নেতৃবর্গ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং সরকারের প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে শাসন সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। এরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতীয় জনসাধারণের নানা দাবী দাওয়া ধীরে ধীরে আদায়ের ব্যাপারে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সভাসমিতি, প্রচারমূলক বক্তৃতা বা আবেদন পত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়াগুলিকে সরকারের নজরে এনে কিছু পরিমাণে সুযোগ সুবিধা আদায় করাই ছিল এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকারের সমালোচনাতে এইসব নরমপন্থী নেতৃবর্গ অসাধারণ নমনীয়তার পরিচয় দিতেন এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর দুর্দশার কারণ সম্পর্কে জানতে পারলেই তা মোচন করার কাজে অগ্রসর হবেন।

৪.৫.১.৩.২ ঃ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কার্যকলাপ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। অনেকটাই স্ব-নিযুক্ত ৭২ জন প্রতিনিধি চাঁদা দিয়ে সেখানে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্বের প্রথম কুড়ি বছর জুড়ে লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি মোটামুটি একই রকম ছিল। প্রতি বছর শেষে তিন দিনের কংগ্রেস মিলিত হতো। তা হয়ে উঠেছিল এক বিরাট সামাজিক উপলক্ষ্য তথা রাজনৈতিক সমাবেশ। সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণ ও বিস্তর বক্তৃতা এবং প্রায় তা সর্বদাই ইংরেজীতে শোনা হতো ও হাততালি পড়ত। আর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক-এই তিনটি মুখ্য বিষয়ে প্রায় একই ধাঁচের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সভা শেষ হত। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে নয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমটিতে ভারতীয় প্রশাসন পর্যালোচনার জন্য এক রাজকীয় কমিশন গঠনের দাবি করা হয়। দ্বিতীয়টিতে ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলোপের দাবি করা হয়। তৃতীয়টিতে বর্তমান আইনসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যায় এবং পাঞ্জাবে আইনসভা প্রবর্তন ও সরকারী কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার দাবি জানানো হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে ছিল ভারতে ও ইংল্যান্ডে একই সময়ে আই.সি.এস পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধির দাবি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাবে সামরিক ব্যয় হ্রাস চাওয়া হল। সপ্তমটিতে জানানো হয় উত্তর ব্রহ্ম অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অষ্টম প্রস্তাবে বলা হল কংগ্রেসের আলোচ্য প্রস্তাবগুলি যেন বিভিন্ন জনসভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার পর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভার মাধ্যমে পাঠানো হয়। শেষ প্রস্তাবে পরবর্তী অধিবেশনের স্থান ও কাল ঘোষণা করা হয়। কেউই এই সব প্রস্তাবকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেবেনা।

বস্তুত দুদশক ধরে নরমপন্থী নেতারা এ ধরনের প্রস্তাবে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ও জনগণের কাছে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন জানিয়ে যান।

প্রথম কুড়ি বছর (১৮৮৫-১৯০৫) কংগ্রেসে যে সব সমস্যা আলোচিত হয়েছে এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রথম পর্বের কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি ও চরিত্র ছিল নেহাৎই নরমপন্থী। এই যুগের নেতারা রাজভক্তি প্রদর্শনে সবসময়ই তৎপর ছিলেন। তারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও ব্রিটিশ শাসকদের সুবিচারের উপর তাদের অত্যন্ত আস্থা ছিল। শাসনসংস্কারের ব্যাপারে ১৮৮৫, ১৮৯৩ ও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্ব্বোচ্চ আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সম্প্রসারণ, তাদের অন্তত অর্ধেক সদস্যের, নির্বাচন এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে আইন পরিষদ প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রাষ্টাব্দে দাবী তোলা হয় বড়লাটের শাসন পরিষদে দুজন ভারতীয় এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের ছোটলাটের শাসন পরিষদে একজন করে ভারতীয় সদস্য নিতে হবে। কিন্তু ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার অনুযায়ী যে সব বিধি চালু হয় তাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভ্যসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি করা হলেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথা একেবারেই চালু হয়নি বরং প্রায় সব অগণতান্ত্রিক প্রথাই চালু থাকল। কংগ্রেসের শাসন সংস্কার বিষয়ক নানা প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দাবি ছিল প্রশাসনিক সংস্কার। প্রশাসনের উচ্চপদে ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় নিয়োগের দাবি জানানো হয়। অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে এই দাবি উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যয়সাপেক্ষ হবে অন্যদিকে তেমনি অনেক কম বেতন দিয়ে এদেশের অর্থ এদেশেই ব্যয় করা হবে। অন্যদিকে ইংরেজদের বেতনের প্রায় সবটাই চলে যেত ইংলন্ডে এবং ভারতের অর্থ ঐ দেশে খরচ হত। কিন্তু আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি দেখানো সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার নরমপন্থীদের প্রশাসনিক সংস্কারের নানা দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

সামরিক ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করার জন্য অধিক পরিমাণে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১,০০০ নতুন ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। ভারতীদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আধুনিক কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার অভাবের জন্য ইংরেজ সরকারের শাসননীতিকেই দায়ি করা হয়। নরমপন্থীদের অভিমত হল, ভারতের দারিদ্র্য মোচনের জন্য দেশে আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তাদের অভিযোগ ছিল, ব্রিটিশ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ভারতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে। এতে দেশের সম্পদের নির্গমন হয়েছে, দেশজ শিল্প ধ্বংস হয়েছে, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপে জনগণের দারিদ্র্য চরমে উঠেছে। দাদাভাই নৌরজী, গোখলে প্রমুখ ভারতীয় নেতৃত্ব নানা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রশাসনিক ব্যয়ের মাত্রা, সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ, জাতীয় ঋণের পরিমাণ তুলে ধরেন।

প্রতিকারস্বরূপ নরমপন্থীদের দাবি ছিল ঃ (১) কর ভার হ্রাস করতে হবে; (২) ভারতকে শিল্পায়িত করতে হবে (৩) অবাধ বাণিজ্য নীতি বর্জন করতে হবে। কংগ্রেস রাজস্বের উচ্চহার, ত্রিশশালা বন্দোবস্ত, রাজস্ব আদায়ের কঠোর পদ্ধতির প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস কৃষি ও কৃষকের উন্নতি দাবি করে। এইসঙ্গে কৃষির উন্নতির সঙ্গে কুটির শিল্পও সংযুক্ত করে। আধুনিক কৃৎকৌশলে প্রশিক্ষণের দাবি জানানো হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে শিল্প প্রদর্শনী বসত।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনজীবী ছিলেন বলে স্বভাবতই আইন ও বিচার বিষয়ক সমস্যা কংগ্রেসের আলোচ্য ছিল। কংগ্রেস প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ দাবি করে।

৪.৫.১.৩.৩ ঃ নরমপন্থী আন্দোলনের অবদান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা হয় যে প্রথম যুগের কংগ্রেসের অবদান নেহাৎই কম ছিল না একথা মনে করা ভুল হবে। প্রথম কুড়ি বছরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও আইনজনিত দাবী-দাওয়া উত্থাপিত হয়েছিল। এই সব তাহাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া অপূর্ণ থেকে গেলেও ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। জন্মের সূচনা থেকেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আর্থিক অভাব, অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের চরম শোষণ ও নিদারুণ অসহযোগিতা ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস সক্রিয় গণ-আন্দোলনের পথ বা সরকারের সঙ্গে বিরোধিতার পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং আবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ বেছে নেয়। এই কারণেই এস.আর. মেহরোত্র কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দকে 'বাস্তববাদী' বলে অভিহিত করেছেন। রজনীপাম দত্ত নরমপন্থী নেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটা মনে করা ভুল হবে যে প্রথম-যুগের কংগ্রেস নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশী শোষকদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন। বরং তাঁরাই ছিলেন ঐ সময়ের ভারতীয় সমাজের সর্বাধিক প্রগতিশীল শক্তির প্রতিনিধি। প্রথম পর্বের কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজ সরকারের শোষণ ও অসহযোগিতা ছাড়াও ভারতীয়দের একাংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ দেশের জমিদার ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী কংগ্রেসের অনেক দাবি-দাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। সামন্তশ্রেণী ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্রিটিশ রাজশক্তির অনুগত সমর্থক। এই সব নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনুসারে ফিরোজশাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের এক এক অঞ্চলে হওয়ার ফলে কংগ্রেস জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। নরমপন্থী নেতারা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ ভুলে লবণ কর, দেশে বিদেশে ভারতীয় কুলিদের উপর দুর্ব্যবহার। অরণ্য আইনে দরিদ্র শ্রেণীর অসুবিধা ইত্যাদি প্রস্তাবও তুলে ধরেছিল। কৃষক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও দুর্দশার কথা, ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের কথা তারা বারবার ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরেছে। কংগ্রেসের মঞ্চেও কাউন্সিল কক্ষে নরমপন্থীরা যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের দিক তুলে ধরেছিলেন তা শুধু চরমপন্থী নয়, গান্ধীবাদীদের চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে রূপান্তরিত হয়। তাঁরা একটি সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও উদ্ভাবন করে যান। প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। করের বোঝা বৃদ্ধি, ভারতীয় কুটিরশিল্পের অবনতি, দুর্ভিক্ষ, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, কর্মের অভাব, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য ভারতবাসীর মনে ব্যাপক বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। রাজনৈতিক দাবি দাওয়ার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক অসন্তোষের কথা তুলে ধরেন। ভারতের দারিদ্র্য ও সম্পদ নির্গমনের প্রসঙ্গে দাদাভাই যে অর্থনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত করেন তা সংবাদপত্র, বক্তৃতা, সভা-সমিতির মাধ্যমে জনমত তৈরি করতে সাহায্য করে এবং ভারতীয়দের মধ্যে অর্থনৈতিক সচেতনতা সঞ্চার করে। অতএব এইসব নানা দিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম পর্বের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যে একটি সদর্থক ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

৪.৫.১.৩.৪ ঃ নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবৃন্দের অবদান নিয়ে অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। চরমপন্থীরা একে 'ভিক্ষুকের রাজনীতি' বলে ব্যঙ্গ করার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'জয়

রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো, ইহাই তাহাদের পলিটিকস্।' অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসকে 'তিন দিনের তামাশা' আখ্যা দিয়েছিলেন, লালা লাজপৎ রায় নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা প্রসঙ্গে বলেন, 'The Congress under the Moderates lacked essentials of a national movement' অনেক নরমপন্থী আন্দোলনকে নিছকই 'আবেদন নিবেদনের' রাজনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তারা কংগ্রেসের প্রতিটি বাৎসরিক অধিবেশনে কতকগুলি আবেদন ও নিবেদনমূলক প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করতেন যা সরকার উপেক্ষা করতেন। কংগ্রেসের দাবি আদায়ে ব্যর্থতা ও নরমপন্থী মনোভাব জনগণের মধ্যে হতাশার সঞ্চার করেছিল এবং এই কারণেই অনেকে তাদের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেন।

প্রথম পর্বের কংগ্রেসী নেতাদের অবদান স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতে হয় যে তাদের সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এর পেছনে তাদের দুর্বলতাগুলি দায়ী ছিল। প্রথমতঃ কংগ্রেসী সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা অস্বীকার করা যায় না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সংবিধান রচিত হলেও তা কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। ১৯০৬ খ্রীর কলকাতা অধিবেশন পর্যন্ত বোম্বাই গোষ্ঠীর ফিরোজ শাহ মেহতা ও দীনশা ওয়াচার কঠিন হস্তে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও মাদ্রাজের আনন্দ চার্লুর সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরা আপন প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ কংগ্রেসে মেহতার আপত্তিতে পিছিয়ে যায় নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব। জে. আর. ম্যাকলেন এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য, ইংরেজী শিক্ষা ও সম্পদ গর্বের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কে ভীতিও লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত তখনকার রাজনীতি ছিল শক্তিমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তিলক ও গোখেলকে কেন্দ্র করে পুনায় দুটি পৃথক গোষ্ঠী গড়ে উঠে। ঠিক তেমনি আলাদা বৃত্ত বোম্বাইতে মেহতা-ওয়াচাকে ঘিরে, বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও ভুপেন বসুকে কেন্দ্র করে, গড়ে ওঠে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস যে একটি সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগঠন- এই বোধের উন্মেষ ঘটতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল।

দ্বিতীয় দুর্বলতা মুসলিমদের কংগ্রেস বর্জন। প্রথম যুগের নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতা অতীব প্রশংসার্হ। বদরুদ্দিন তায়েবজির অন্জুমান গঠনে ও আইন পরিষদে রহমৎউল্লা সায়ানির নির্বাচনে হিন্দু ও পার্শীরা প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাদের সর্বৈব চেষ্টা মুসলিম সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনতে পারেনি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলিম রাজনীতিকে ব্রিটিশ সহযোগীর ভূমিকায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করলেন। তাঁর মুখ থেকেই নিঃসৃত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের সুস্পষ্ট উল্লেখ। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এলাহাবাদ কংগ্রেসে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ২২২ হলেও ছোটলাট কলভিনের ভাষায়, কোন সম্ভ্রান্ত বা সম্পন্ন মুসলিম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তায়েবজি যখন স্যার সৈয়দ আহমেদকে কংগ্রেসের ভেতর থেকে মুসলিম স্বার্থরক্ষা করতে আহ্বান জানলেন তখন সৈয়দ আহমেদ বলেন, সৈয়দ তার উত্তরে (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮) লিখলেন, "এই অন্যায়ভাবে নামিত জাতীয় কংগ্রেস কেবল আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতকে এক জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংগ্রেসে আমার আপত্তি রয়েছে।" কংগ্রেসের প্রতিটি প্রস্তাবই মুসলিমদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন তিনি, এমন কি কংগ্রেস প্রভাব ক্ষুন্ন করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চরও পাঠিয়েছিলেন।

নরমপন্থীদের তৃতীয় দুর্বলতা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ বিষয়ে সজাগ হলেও চরম দারিদ্র্যে নিপীড়িত, জাতপাতের জটিল সংস্কারে আবদ্ধ, অশিক্ষায় অন্ধ জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁরা কোনো সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। কৃষকদের সমস্যা সমাধান রানাডের পথে হত না। রমেশচন্দ্র দত্তের কল্পনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয় সংস্কারের বেশি এগোয়নি। একই সঙ্গে বড় জমিদার ও দখলদারী রায়তকে খুশি রাখতে তাঁরা চেয়েছিলেন-ইংরেজদের মতই। শুধু তিক্ত ভেষজকে কৃষি ব্যাঙ্ক, কুটির শিল্প ইত্যাদি মধুর অনুপান দিয়ে গ্রহনীয় করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। পার্থ চ্যাটার্জী 'Bengal 1920-

1947 The Land Question' গ্রন্থে দেখিয়াছেন এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, অক্ষমতা বাংলার কংগ্রেসকে কত দুর্বল করেছিল এবং শেষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জালে জড়িয়ে ফেলেছিল। কি ভাবে যে রানাডে ইংরেজদের কাছে— দেশী শিল্পের সংরক্ষণ আশা করতেন তা বোঝা শক্ত। পরাধীন ভারত বিসমার্কের জার্মানীর মত শুল্ক নীতি নিতে পারে না এ কথা তিলক মুহূর্তেই বুঝেছিলেন। তাই বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ শেষ পর্যন্ত স্বরাজের দাবিতে পরিণত হয়।

১৮৮৫-১৯০৫ এর মধ্যে তোলা সব কিছু দাবি যখন নাকচ হল বা অতি খন্ডিতাকারে গৃহীত হল তখন নরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়ল। তার ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ উদারতন্ত্রে দুর্মর বিশ্বাস। কিন্তু কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি ও ভারতীয় পার্লামেন্টারী কমিটি শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংলন্ডের জনচিত্তে সাড়া জাগাতে পারেননি। এর একটা বড় কারণ ভারতের জনচিত্তে কংগ্রেসের মূল। ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র রচিত হয়নি। বিচিত্র ধরনের স্থানীয় দল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হত। অনেক সময় প্রতিনিধিরা স্বনির্বাচিত হতেন। স্থানীয় কমিটি হয় নেই, না হয় অস্থায়ী। যেখানে বাৎসরিক অধিবেশন বসার কথা সেখানকার কমিটিই আয়োজন করত। কোন নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় উপস্থিতির হার ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। ১৮৯৬ থেকে কমতে কমতে ১৯০২-এ তা দাঁড়ালো মাত্র ৪৭১-এ। তিলক বারবার নতুন গঠনতন্ত্র দাবি করেছিলেন। ১৯০০ সালের ১৮ নভেম্বর কার্জন ভারত সচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার উচ্চাকাঙ্খা হবে তার শান্তিপূর্ণ মরণে সাহায্য করো।'

বাংলায় স্বদেশী অন্দোলনের সময় নরমপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠী এই স্বদেশী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ অরবিন্দ নরমপন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ শাসক শ্রেণী সম্পর্কে নরমপন্থীদের উচ্চ ধারণা সে যুগের নেতাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করেছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের মধ্যে থেকেই তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল।

৪.৫.১.৩.৫ ঃ নরমপন্থীদের সামাজিক চরিত্র

পুরোনো মার্কসীয় দৃষ্টিতে কংগ্রেস বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান। আধুনিক কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগণ জাতীয় কংগ্রেসকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'Fragmented Elite'দের সংগঠন বলেছেন। জে.আর. ম্যাকলেন মনে করেন যে এটি ছিল বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সংগঠন। তবে কংগ্রেসের মধ্যে যে বহুবিধ স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে তাদের মধ্যে ঘন ঘন নেতৃত্ব বদল হয়েছে। অনীল শীল, জুডিথ ব্রাউন ও জে. এম. ব্রুমফিল্ড মনে করেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়রা ছিল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। ব্রুমফিল্ড ভদ্রলোক-অভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করে কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে বলেছেন 'They had virtually no institutional context with the lower orders...they were in points to make it clear that though they lived with people, they were not of them.''

কলকাতা ও বোম্বাই এর উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের সংগঠক। ব্যক্তিগত জীবনে কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতারা ইংরেজ ভাবাপন্ন এবং নিজের নিজের পেশার ক্ষেত্রে খুবই সাফল্যমণ্ডিত। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের অর্ধেক ছিলেন আইনজীবী এবং পরবর্তী কংগ্রেসের কয়েকটি

বাৎসরিক অধিবেশনে এদের সংখ্যা ছিল মোট প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতী। এসব বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফিরোজশাহ্ মেহতা, বদরুদ্দিন তায়েবজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এরা সকলেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবাধীনে আসেন, রানাডে, জি.ভি. যোশী, কে.টি. তেলাং, আনন্দ চারলু, সুব্রহ্মানিয়া আয়ার প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত।

তাছাড়া কংগ্রেসের প্রথম পর্বে কয়েকজন খ্যাতনামা সরকারী কর্মচারীও যোগদান করেন। এরা হলেন রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম চারটি অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্তদের ব্যাপার এবং অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়া হত ইংরেজী ভাষায়।

সাম্প্রতিককালে জে.আর. ম্যাকলেন মনে করেন যে পাশ্চাত্যপন্থী চাকুরিজীবী শিক্ষিত ব্যক্তিরা, যারা ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে নিম্নতর শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল তারাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিল। প্রথম দিকে কৃষক সম্প্রদায়কে কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার কোন কর্মসূচী কংগ্রেসের ছিল না। হিউম-এর প্রস্তাবিত কংগ্রেসের নির্বাচকমন্ডলী (electoral college) গঠনের পরিকল্পনায় কৃষকশ্রেণীর কোন উল্লেখ ছিল না। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পরিক্রমার সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রতি নিম্নশ্রেণীর কোনরকম উৎসাহ লক্ষ্য করেননি। কংগ্রেসের নরমপন্থী শ্রেণী নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ছিল সার্থক এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্বদানের ইচ্ছা থেকেই তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সমাজের নিম্নতর শ্রেণীতে যে জাতীয় চেতনা ছিল এই শ্রেণী তার অংশীদার ছিলেন না। তাই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা যা ছিল, ৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৯০ এর শেষের দিকে তা কমে আসে। ম্যাকলেন মনে করেন যে এই আইনজীবি, ডাক্তার, সাংবাদিক ভারতীয়গণ রাজনীতির ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য চেয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রাথমিক দাবী-দাওয়াগুলি এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করবে এতে অবাক হওয়ার মতো কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস Cambridge ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত করেছে ঠিকই। তবে বিপানচন্দ্র ও সুমিত সরকারের মতানুযায়ী এটি জাতীয় স্বার্থ ও সংরক্ষণে তৎপর হয়েছিল। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী স্বার্থ ও সংস্কারের মধ্যে কংগ্রেস সমন্বয় সাধন করেছে। কোন শ্রেণীকে এক্ষেত্রে বর্জন করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে প্রথমযুগের কংগ্রেস শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও সম্পদভোগীদের প্রভাবাধীন থাকার ফলে তাদের পক্ষে বৈপ্লবিক কর্মসূচী বা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রথমযুগের কংগ্রেসের তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রধান মৌলিক দুর্বলতা ছিল তাদের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি। তাদের আন্দোলন শহরের আধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৪.৫.১.৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(২) সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত।

(৩) বিপান চন্দ্র—আধুনিক ভারত।

(৪) J. H. Broomfield - Elite Conflict in a Plural Society: 20th Centrury Bengal

৪.৫.১.৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী আলোচনা কর।

(২) কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের সামাজিক ভিত্তি কিরকম ছিল?

(৩) নরমপন্থী কংগ্রেসের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণ কর।

(৪) নরমপন্থী কংগ্রেসের কার্যাবলীর মূল্যায়ন কর।

(৫) কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গ কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করেছিল?

(৬) কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলন কি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছিল?

৪.৫.১.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতবর্ষে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

(২) নরমপন্থী কংগ্রেসের দুর্বলতা

(৩) অর্থনৈতিক কারণ

(৪) চরমপন্থার ভাবগত কারণ

(৫) রাজনৈতিক কারণ — লর্ড কার্জনের দায়িত্ব

(৬) বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব

৪.৫.১.৪.১ ঃ সূচনা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এর নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল তাঁরা ইতিহাসে 'নরমপন্থী' নামে অভিহিত। এই নরমপন্থীদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাস প্রধানতঃ নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন নিবেদনের রাজনীতি হিসেবেই চিহ্নিত। এই রাজনীতির প্রতিবাদে যে সংগ্রামমুখি আন্দোলন গড়ে উঠল তা সাধারণভাবে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী চিন্তাধারার প্রতিবাদ ঊনিশ শতকের শেষে দুই দশক ধরেই শোনা যাচ্ছিল। এই প্রতিবাদের পেছনে নানাবিধ কারণ ছিল।

৪.৫.১.৪.২ ঃ নরমপন্থী কংগ্রেসের ব্যর্থতা

নরমপন্থী নেতাদের সাবধানী নীতি এবং ভারতীয় জাতির আত্মশক্তির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যের ও সদিচ্ছার উপর অধিক আস্থা স্থাপনের ফলে কংগ্রেসের এক শ্রেণীর মধ্যে বিপুল হতাশা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির (Political mendicancy) কঠোর সমালোচনা করে তারা বিকল্প চরমপন্থা গ্রহণের দাবি জানাতেন। বক্তৃতার বদলে কর্মের মাধ্যমে তাঁরা জাতীয়তাবাদের বিকাশ চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য আদর্শ, ভাবধারা, শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে চরমপন্থী মতবাদের সমর্থক গোষ্ঠী এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বৃটিশ ভাবধারা ও আদর্শকে প্রতিহত করে অনুকরণ প্রিয় নরমপন্থী রাজনীতির পরিবর্তে কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠী ভারতের নিজস্ব ধারা ও আদর্শে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের প্রথম পর্বে আন্দোলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লালা লাজপৎ রায় বলেছিলেন যে, কংগ্রেসী আন্দোলনে জনগণ অংশীদার ছিল না, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সময়োপযোগী রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস ছিল না এবং আত্মত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ ও বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ বর্জিত আবেদন-নিবেদনের নীতি ও ভিক্ষামূলক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন সম্পর্কে কটাক্ষ করে তিলক মন্তব্য করেছিলেন, 'We will not achieve any success in our labours, if we crock once a year like frog'

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের দুর্বল আন্দোলনের ফলে তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি ব্রিটিশ সরকার চরম উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন এবং প্রথম কুড়ি বছরে কংগ্রেসের নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক দাবি আদায়ে চরম ব্যর্থতা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পথ প্রস্তুত করেছিল। সরকারের এই চরম ঔদাসীন্য কংগ্রেসের যুবশক্তিকে প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে কঠোর পন্থা ও কর্মসূচী ছাড়া ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব নয়।

৫.১.৪.৩ ঃ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতে, (Cambridge School of historians) চরমপন্থী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব। ১৮৯০ এর দশকে কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিরোধ ভালভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিচালনায় 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সঙ্গে মোতিলাল ঘোষ কর্তৃক পরিচালিত অমৃতবাজার গোষ্ঠীর বিরোধ, পাঞ্জাবে হরকিষণলাল ও লালা লাজপৎ রায়ের বিরোধ, মাদ্রাজে নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধ, ডেকান শিক্ষা-সমিতি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে তিলকের সঙ্গে আগরকার ও গোখেলের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, কংগ্রেস দখলের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং চরমপন্থী গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এটা বলা সঠিক হবে না। কারণ নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মসূচীগত পার্থক্য বজায় ছিল। এই পার্থক্যই তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল।

৪.৫.১.৪.৪ ঃ অর্থনৈতিক কারণ

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে অর্থনৈতিক কারণ বিশেষভাবে দায়ী ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের একচেটিয়া প্রাধান্য জার্মানী ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শুল্ক সংক্রান্ত আইন ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কার্পাস বস্ত্র বিষয়ক আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতে বস্ত্রশিল্পে তীব্র সংকট দেখা দেয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটেনের সামরিক তৎপরতা হেতু সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি পায় এবং এই অর্থ তারা ভারতবাসীর উপর কর চাপিয়ে আদায় করবার চেষ্টা করে।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দেয়। গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ব্রিটেনের ভারত শোষণ ও অন্যদিকে খাদ্যসঙ্কট ও অনাহারের ফলে ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়ে। অন্ততঃ ৯০ লক্ষ লোক এর ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবাসীর এই জাতীয় সংকটে ইংরেজ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। জাতীয় কংগ্রেসের একদল নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই সব নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। তৎকালীন ভারতের তিনজন

শীর্ষস্থানীয় নেতা, যথা-দাদাভাই নওরোজি তাঁর ‘Poverty and Un-British Rule in India,’ রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ‘Economic Hisotry of India এবং রানাডে তাঁর ‘Economic Essays’ গ্রন্থসমূহে ভারতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক শোষণ ও ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্কটের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরেন এবং ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকেই দায়ী করেন। এইসব নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন (Drain theory) তত্ত্ব ভারতীয়দের মনে সর্বাধিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ডঃ বিপানচন্দ্র তাঁর ‘The Rise and Growth of Economic Nationalism in India’ গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে ‘Drain theory’ বা অর্থ নির্গমন তত্ত্ব রাজনীতির দিক দিয়ে ছিল সবচেয়ে বৈপ্লবিক। এই লুণ্ঠনতত্ত্ব ভারতের জনগণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শুধু ভারতীয়রাই নন, ডিগবি ও জন ম্যাকলেন স্বীকার করেছেন যে সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল বেশ কয়েক কোটি টাকা। ব্রিটিশ লেখক ডিগবি ‘Prosperous British India’ গ্রন্থে ভারতের অর্থনৈতিক অবনতি ও দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে দায়ী করেন। ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের একেবারে সূচনায় ভারতীয়দের নিদারুণ আর্থিক সংকট তাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। দাদাভাই নওরোজী এর প্রতিকার হিসেবে স্বায়ত্বশাসনকেই বেছে নেন।......‘Self government is the only remedy for India’s woes and wrongs.’ ‘ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতীয় জনগণের চরম দারিদ্র্য, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সমস্যা, ভারতের সবশ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষোভ চরমপন্থী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনা করে।

৪.৫.১.৪.৫ ঃ চরমপন্থার ভাবগত কারণ

ভারতে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের পশ্চাতে ভাবগত বা মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশেষ অবদান রেখেছিল। ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের পশ্চাতে যেমন সাহিত্যিক, দার্শনিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেছিলেন ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থার উদ্ভবের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক দার্শনিকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের ভাবগত প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রতিরোধের আন্দোলনের তিনটি ধারার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম ধারায় ধর্মীয় জীবনে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী হিন্দুধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর খ্রীষ্টধর্ম, উপযোগিতাবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাত হেনেছিল, চরমপন্থীরা আধ্যাত্মিকভাবে তাকে প্রতিহত করতে ইচ্ছুক ছিল। দ্বিতীয় ধারায় পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবাদী, যান্ত্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতি ভারতীয় সনাতন সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে যে ধ্বংস করবার অপচেষ্টা করছিল তার প্রসার রোধ করার জন্যই চরমপন্থার অভ্যুদয়। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক ধারায়, চরমপন্থীরা দেখেন যে ভারতের স্বতন্ত্র পরিচিতি ক্রমশঃই বৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোয় অবলুপ্ত হচ্ছে; অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা ভারতীয়দের জাতীয় সত্ত্বার অবলুপ্তি ও বিনাশকে নিশ্চিত করেছে। এই শঙ্কার থেকেই জন্ম নেয় ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং যতই শঙ্কার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ততই চরমপন্থীরা তাদের বিরোধিতাকে তীব্রতর করে তোলে।

চরমপন্থীদের আন্দোলনে যাঁদের রচনা ও কার্যকলাপ আদর্শ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

৭.৫.৯.৪.৫.১ : বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলার চরমপন্থীরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। Charles Himesath 'The Indian Nationalism and Hindu Social Reform' গ্রন্থে এবং আরও অনেক ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক বঙ্কিমের লেখার মধ্যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ এবং চরমপন্থী রাজনৈতিক ধারার উৎস খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের মতে বঙ্কিমের চিন্তাধারা ও লেখা পাশ্চাত্য ধারার প্রত্যাখ্যান করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধ্যানধারণার মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎস অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছে। সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক সোপান হিসেবে ব্যবহার ও দেশমাতৃকার একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রচনাই ছিল তাঁর মূল চিন্তাধারা। বঙ্কিমের মধ্যে যে ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেল তা বেদ, বেদান্ত বা অর্বাচীন স্মৃতির ঐতিহ্য নয়, এর উৎস হল মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। মিল ও কোঁৎ এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা হিন্দু ধর্মের শেষ কথা নয়। 'এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ।' ভক্তিশাস্ত্রই তার শেষ কথা। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ও প্রচার পত্রিকায় 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, বহু দেববাদ ও বিভূতি, দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম নয়। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে ও সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব মানবহিতে উৎসর্গে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। তিনি এর নাম দিলেন 'অনুশীলন ধর্ম'।

অবতারবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা দেন বঙ্কিম যা রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের অবতারবাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর অবতার মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর নন, তাঁর অবতার, সেই অনুশীলিত পুরুষোত্তম যিনি সুকঠিন প্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং মানবহিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বুদ্ধ বা যীশুর মত তিনি সংসার ত্যাগ করেননি, সংসারের সকল দুঃখ বীরের মত বহন করেছেন, সকল কর্ম করেছেন নিরাসক্ত চিত্তে, যে যুদ্ধের তিনি সারথি তা ধর্মযুদ্ধ, তার উদ্দেশ্য ধর্মরাজ্য স্থাপন। গীতার আদর্শ পুরুষকে ভারতীয় জনচিত্তে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে বঙ্কিম ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনদের ডাক দিলেন কর্মফল ত্যাগ করে মহাভারতের স্বপ্ন সফল করার জন্য নতুন এক কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে। তাঁর এই দুঃসাহসিক কল্পনা পরবর্তী যুগকে প্রভাবিত করেছিল। তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ এর মত হিন্দু চরমপন্থীরা তো বটেই, ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল ও ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধবও তার ব্যতিক্রম নন। চরমপন্থীরা ধর্মরাজ্যের তত্ত্বকে তাঁদের স্বরাজ্যের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেন এবং তাঁর রচনা থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা পান।

বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠে' একদল দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রচার করে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপন করে যান। তাঁর 'আনন্দমঠ' সে যুগের যুবসম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে ও নূতন জাতীয়তাবাদের আদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অরবিন্দ ও তাঁর সমসাময়িকদের উপর আনন্দমঠের প্রভাব ছিল অপরিসীম। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত দেশবাসীর মানসে এক নব উন্মাদনার সঞ্চার করল।

তবে দেশকে দুর্গার সঙ্গে একাত্ম করে দেখার ফলে যে প্রবল আবেগ হিন্দু মানসে সঞ্চারিত হল তাই মুসলিম মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে অনেকে বঙ্কিমের চিন্তাধারার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ রয়েছে বলতে চেয়েছেন। অধ্যাপক ক্লার্ক বলেছেন যে চরমপন্থীদের কর্মপন্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন এ ধরনের মন্তব্য খণ্ডিত মূল্যায়নের নিদর্শন। তাঁর মতে বঙ্কিমকে এই অপবাদ দেওয়া অনুচিত। এর সমর্থনে তিনি নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। 'সীতারামে' ফকির ও সীতারামের কথোপকথন পাঠ করলে দেখা যায় বঙ্কিমের মানবপ্রীতিতে মুসলমানের স্থানও আছে, কারণ মুসলমানও জগদীশ্বরের সৃষ্টি। যেখানে শুভবুদ্ধি ও সৎকর্মের মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে হিন্দু-মুসলমান কেউই তাঁর কশাঘাত

থেকে রক্ষা পায়নি। 'রাজসিংহের' আলমগীর চরিত্র বা 'আনন্দমঠের' সন্তানদের কিছু মুসলিম-বিদ্বেষী শব্দ প্রয়োগ দেখে অনেকে তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে। অথচ পশুপতির উচ্চাকাঙ্খা, ভবানন্দের ব্রতচ্যুতি, সীতারামের যৌনমোহ ও গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা তিনি ক্ষমা করেননি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার যে দুর্জয় সাহস মীরকাশিম দেখিয়েছিলেন তা রাজসিংহের বীরত্বের চেয়ে কম প্রশংসা পায়নি। কতলু খাঁ জঘন্য হলেও তার কন্যা আয়েষা 'রমনীরত্ন' জেব উন্নিসার উত্তরণ যত সহানুভূতির সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, শৈবলিনীর প্রতি ততটা নয়।

৭.৫.৯.৪.৫.২ : বিবেকানন্দ

'যত মত তত পথে'র প্রবক্তা রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতি অনুধাবন করে তাদের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমকে দিয়েছিলেন সত্য, ত্যাগ ও প্রেমের অবতার রামকৃষ্ণের অমর বাণী ও জীবনাদর্শ; অদ্বৈত ও যোগের তত্ত্ব। আবার প্রাচ্যে আনতে চেয়েছিলেন পশ্চিমের বীর্য, কর্মোদ্যম, সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে দুঃখমোচনের নিরলস প্রয়াস। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন যার লক্ষ্য বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির জয় এবং আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করা। পূর্ণ মানবগঠনের এই স্বপ্ন শুধু ভারতের জন্যই তিনি দেখেননি, বিশ্বের জন্য দেখেছিলেন। এখানে গোঁড়ামি, শ্রেয়োবোধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। ইউরোপকে সত্ত্বের ও ভারতকে রজের সাধনায় প্রবুদ্ধ করতে পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন প্রয়োজন এ কথা বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। অথচ চরমপন্থীরা তার ভুল ব্যাখ্যা করলেন। পশ্চিমের যে সব দোষ তিনি বন্ধুর মত দেখিয়েছিলেন, সেগুলির উপর জোর দেওয়া হল, অথচ প্রাচ্যের যে সব দোষত্রুটি তিনি তীব্র কশাঘাতে জর্জর করেছিলেন তা চেপে যাওয়া হল। সন্দেহ নেই তিনি আমাদের জাতীয়তাকে দিয়েছেন প্রবল পৌরুষ, অদ্বৈতের অভীঃমন্ত্র, শিখিয়েছেন 'আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।' তার চেয়েও বড় কথা, বঙ্কিমের যে দেশ ছিল কবির কল্পনা, তাকে তিনি দিয়েছিলেন রক্ত, মাংস, মজ্জা। যে দেশ তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী ও মূর্খ অন্ত্যজ, দরিদ্রের দেশ-তাকে অন্নদান, আরোগ্য দান, জ্ঞান দান করতে হবে। তবেই আসবে আত্মজ্ঞান। তখন যে শক্তির সৃষ্টি হবে তার সামনে জাতপাত, শ্রেণী, সাম্রাজ্য, কোন বাধা, বিভেদই টিকবে না।

বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাঁর কাছে দুর্বলতা ছিল দাসত্বের নামান্তর, দুর্বলতা হল মৃত্যু। তিনি ভারতের যুবসমাজকে দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি গীতার আদর্শ প্রচার করে স্বদেশবাসীকে ক্লীবতা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সহায়ক হয়েছিল।

বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে চাননি, নিবেদিতাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। অথচ জনসমর্থন সংগ্রহ করতে অরবিন্দ ও তিলক হিন্দুধর্মকে কাজে লাগালেন এবং অন্য ধর্মের সমর্থন হারালেন। যে কুলি মজুর মেথরকে ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়তে আহ্বান করেছিলেন বিবেকানন্দ, তারা ভদ্রলোক ও উচ্চজাতির (বিশেষত ব্রাহ্মণের) বহু পেছনে আসন নিল।

৭.৫.৯.৪.৫.৩ : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

ইংরেজ জাত্যভিমানের প্রত্যুত্তরে চরমপন্থীরা আর্য শ্রেয়োমন্যতা জাহির করতে চেয়েছিলেন। আর এর জন্য তাঁরা গুরু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীকে। বঙ্কিম বেদকে হিন্দুধর্মের মূল বলে স্বীকার করলেও সর্বোচ্চে স্থান

দেননি। অথচ দয়ানন্দের কাছে বেদ ঈশ্বরের বাণী। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ও শেষ কথা নেই, আছে জড়বিজ্ঞানের সব তথ্য। বৈদিক সভ্যতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে দয়ানন্দ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। বেদ ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ ম্যাক্সমূলারকে তো অবজ্ঞাই করতেন, এমন কি সায়নভাষ্যও সব জায়গায় মানেননি। তাঁর মতে ঋকবেদ আদৌ প্রকৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে ছন্দোবন্ধে নিবেদিত প্রার্থনা নয়, তা একেশ্বরবাদের প্রথম ও পূর্ণ রূপ, এবং তার পরে হিন্দুধর্মের যা কিছু, বিবর্তন হয়েছে — বেদান্ত থেকে শুরু করে পৌরানিক হিন্দু ধর্ম—সবই ভ্রান্ত ও বর্জনীয়। অরবিন্দ এর মধ্যে আর্য পৌরুষের অনমনীয় দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছেন, যা সব চিন্তা ঝটিকার মধ্যে অচল, অটল, কিন্তু 'সত্যার্থপ্রকাশ'—এ আপন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভুল ইতিহাস ও মনগড়া মিথের যে সংমিশ্রণ দয়ানন্দ করেছিলেন তাও কি বৈজ্ঞানিক বলে মানতে হবে? দেবদেবীর মূর্তিপূজা বর্জন করে গোমাতার পূজা ব্যবস্থা করা কতখানি যুক্তিযুক্ত? কতখানি সম্ভব ছিল আধুনিক ভারতে শত শত তপোবন বানিয়ে অহোরাত্র বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান? বা ইংরেজী সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ করে গুরুকুল- সম্মিত সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ? হাজার হাজার বছর ধরে যে ইসলাম ভারতের মাটিতে বাসা বেঁধেছে, হিন্দুদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান করেছে, তাদের বাদ দেওয়া বা তাদের সবাইকে ধর্মান্তরিত করাই কি ধর্ম হত? ইহুদীসুলভ অসহিষ্ণুতার চিহ্ন চরমপন্থীদের চিন্তায় রয়ে গেছে। তবে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শ উত্তর ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

৭.৫.৯.৪.৬ : লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

চিন্তার দিক থেকে চরমপন্থার যতই প্রস্তুতি থাকুক, কার্জনের নীতি তাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল। লর্ড কার্জন জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধী কতকগুলি আইন প্রবর্তন করেন। স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতীক কলকাতা পুরসভার গঠনতন্ত্রের উপর আঘাত হেনে কার্জন তাঁর অভিযান শুরু করলেন। পুরোনো বিল সংশোধন করে কার্জন যে নতুন বিল খাড়া করলেন তাতে পুরসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো একশোর জায়গায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে নির্বাচিত ভারতীয় ও মনোনীত ও নির্বাচিত সবরকমের ইংরেজদের সংখ্যা হবে সমান সমান-পঁচিশ করে। কিন্তু সভাপতি হবেন একজন ইংরেজ। ইনিই আবার পুরসভায় গৃহীত নীতি কার্যে পরিণত করবেন। কাউন্সিল ও সভাপতির মধ্যে থাকবে বারোজনের এক জেনারেল কমিটি, সেখানে নির্বাচিত ভারতীয়দের সংখ্যা মাত্র চার। বলা বাহুল্য, এর মুখ্য উদ্দেশ্য, কলকাতার বহুব্যাপ্ত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ। এর আরেকটা দিক ছিল। ১৮৯৩-৯৯ সালের মধ্যে যাঁরা বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ঘাঁটি ছিল পুরসভা ও মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি।

দ্বিতীয় আঘাত পড়ে শিক্ষার উপর। যে ব্যবস্থা চালু ছিল কেউ তাকে আদর্শ বলবে না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য কার্জন যা নীতি নিলেন তা অত্যন্ত মারাত্মক। সিমলায় তিনি যে শিক্ষা সম্মেলন ডাকলেন তাতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। যে শিক্ষাকমিশন গঠিত হল তাতে প্রথমে কোন হিন্দু প্রতিনিধিও ছিল না। র‍্যালে কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কার অনেকের উদ্বেগ সঞ্চার করল। কমিশন সব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করল। বেসরকারী কলেজে আইন পড়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব হল। কলেজে পড়ার ন্যূনতম বেতনহার নির্ধারিত করে দেওয়ার ফলে গরীব ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের আইন কলেজ টিকে গেল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শাসনতন্ত্র ঠিক হল তাতে ইউরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হল। সেনেটের ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৮০ জনের মনোনয়নের ভার পড়ল বড়লাটের উপর। ইউরোপীয় সদস্যের সংখ্যা হল ৫৪। সিন্ডিকেটকে দেওয়া হল কলেজের স্বীকৃতি দান ও হরণের ক্ষমতা। সর্বোপরি রইলেন সাহেব

অধিকর্তা। বিলের বিরোধিতা করে গোখ্‌লে বললেন, 'এতে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী বিভাগে পরিণত হবে।' ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সমর্থন করেছিলেন।

নরমপন্থীদের সহযোগিতা নীতি আবার লাঞ্ছিত হল Official Secrets Amendments Act-এ। এই আইনের বলে অসামরিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশনার জন্য সংবাদপত্রকে দণ্ডনীয় করা হয়। এ নীতি সংবাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে তুমুল আপত্তি উঠল। চরমপন্থীরা বিনামূল্যে এক বিরাট প্রচারমাধ্যম হাতে পেয়ে গেলেন।

নানাকারণে যে সব অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল তা ফেটে পড়ল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করে। নরমপন্থীদের অবরোধ বিপুল আবেগের বন্যায় ভেসে গেল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' আন্দোলন শুরু হল। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দলের উদ্ভব হল।

৭.৫.৯.৪.৭ : বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব

তদানীন্তনকালে বৈদেশিক নানা ঘটনাও ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারে সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভারতে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া সে সময়কার আন্তর্জাতিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতের চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবে ও প্রসারে সাহায্য করেছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ জাপানের কাছে ইউরোপের শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার পরাজয় ভারতের জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ইউরোপীয়রা যে অপরাজেয় এই ধারণার এখন থেকে অবসান ঘটে। ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যও অনুরূপভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশজনগণের এই বিজয়কে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের জয় বলে মনে করা হয়েছিল এবং এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের সংগ্রাম অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই সময় চীন, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে জাতীয় আন্দোলন চলছিল এবং তাও ভারতীয় রাজনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

অতএব বলা যায়, উনিশ শতকের শেষদিকে উপরি উক্ত একাধিক কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে চরমপন্থার উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের ফলে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল। এই গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতা ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বরাজ অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেল।

৭.৫.৯.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী—ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব-(অনুবাদ-নির্মল দত্ত)

(২) অমলেশ ত্রিপাঠী— The Extremist Challenge.

(৩) সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত।

(৪) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(৫) বিমান বিহারী মজুমদার—Militant Nationalism in India.

চরমপন্থী বা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ (The Origins of Extremism) : ১৮৮৫ খ্রিঃ থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত। কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হয়, তাকে 'মডারেট' বা 'নরমপন্থী' আন্দোলন বলা হয়। নরমপন্থী নেতারা ব্রিটিশ শাসনের নানা জনবিরোধী নীতির চরমপন্থী মতবাদের উত্থানের পটভূমিকা সমালোচনা করলেও তাঁরা ব্রিটিশ জাতির উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও ন্যায়বোধের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের অনুসৃত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও আবেদন-নিবেদনের নরমপন্থী নীতি অনেকের কাছে অযৌক্তিক ও অসার মনে হয়। মডারেট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকারিতা তরুণ নেতাদের বিকল্প আদর্শ ও নীতির প্রতি আকৃষ্ট করে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই-এর প্রতি তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ নেতারা দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য উগ্র ও জঙ্গী আন্দোলনকেই। সঠিক পথ বলে মনে করেন। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 'চরমপন্থী মতবাদ' আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় ব্রিটিশরা ক্রমশই জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। দেশের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ছিল ২,৯৯,০০০। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয় ৮,১৭,০০০। এর ফলে প্রতিবাদী রাজনৈতিক কার্যকলাপের সম্ভাব্য ভিত্তি দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছিল। কিছু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস-সমালোচক পত্রিকা, যেমন–কলিকাতার 'বঙ্গবাসী, মহারাষ্ট্রের পুণায় প্রকাশিত 'কেশরী' , 'কাল' প্রভৃতি মডারেট রাজনীতির নিরন্তর সমালোচনা দ্বারা চরমপন্থার উত্থানের জমি তৈরি করে।

'মডারেট বা নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা' ঊনবিংশ শতকের শেষদিক থেকেই। দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে মডারেট আন্দোলনের অকার্যকারিতা স্পষ্ট হয়। বিপানচন্দ্রের মতে "১৯০৭ খ্রিঃ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার শেষ পর্যায় এসে এই সমালোচনামূলক দৃষ্টি (Critique) চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের প্রধান কারণ। মডারেটপন্থী আন্দোলনের বিকল্প হিসাবে 'নবোদিত চরমপন্থীরা' তিনটি ধারায় আন্দোলন পরিচালনার কথা বলেন, যথা :– (১) আত্মশক্তি বা স্বদেশী। এই আদর্শ অনুসারে ইংরাজের সংস্কারের আশায় বসে না থেকে জাতি গঠন দ্বারা জাতির আত্মশক্তিকে দৃঢ় করার কথা বলা হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, গ্রাম উন্নয়ন, কুটির শিল্প গঠন, চরমপন্থী আন্দোল- মাতৃভাষায় শিক্ষা, শিল্পমেলা, হিন্দু জাগরণবাদ প্রভৃতি আত্মশক্তি নের তিনটি ধারা আন্দোলনের অন্তর্গত। (২) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বয়কট আন্দোলন। সরকারি অফিস, আদালত, স্কুল ও কলেজ বয়কট, বিলাতী কাপড় ও বিলাতী জিনিষ বয়কট প্রভৃতি এই দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত। (৩) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ দ্বারা সরকারকে পঙ্গু করার প্রচেষ্টা, গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী দল গঠন ও সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস পরিচালনা। চরমপন্থী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়, যথা–সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গঠন ও গণ আন্দোলন গঠনের চেষ্টা এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। যে ক্ষেত্রে নরমপন্থীরা 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দাবী করেন, সে ক্ষেত্রে চরমপন্থীরা 'স্বরাজ' দাবীতে দৃঢ় থাকেন।

চরমপন্থী মতবাদ কেবলমাত্র মডারেট আন্দোলনের নিষ্ফলতা, আবেদন নীতির প্রতি অনাস্থার জন্য গড়ে ওঠে নি। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা | প্রচলিত আছে। প্রচলিত ধারণা হল, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে একটি অগ্রবর্তী স্তরের উত্তরণ সূচনা করেছিল এবং জাতীয়তাবাদ আরও গতিশীল ও চরমপন্থী আন্দো লনের

উদ্ভব সম্পর্কে কেমব্রিজ মত উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে কেমব্রিজ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কোনো আদর্শগত ভিত্তি নাই। কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মতে, কংগ্রেসের ভেতর দলীয় কোন্দল এবং ক্ষমতার লড়াই-এর দরুন চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দেয়। কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা প্রখ্যত ঐতিহাসিক 'নেমিয়ারের তত্ব' অনুসরণ করেন। নেমিয়ার বলেন যে, ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিতে আদর্শবাদের তেমন কোন স্থান নেই। বিশেষ এলিটগোষ্ঠী বিশেষত পাতিবুর্জোয়া গোষ্ঠী। নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য জাতীয়তাবাদ প্রচার করে। এই মত অনুসরণ করে কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা, যথা–গ্যালাহার, রবিনসন, অনিল শীল প্রভৃতি বলেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে আদর্শবাদের কোন স্থান নেই'। ব্যক্তি ও স্থানীয় গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই রাজনীতি আবর্তিত হয়। ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমতা দখলের লড়াই থেকেই দল ও উপদল তৈরি হয়। চরমপন্থী দলও এই ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। ডেভিড | ওয়াশরুক প্রভৃতি কেমব্রিজপন্থীরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, কংগ্রেসে এবং রাজনীতির স্তরে ক্ষমতার লড়াই ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ব্যর্থ হয়ে একদল চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে। পড়েন। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকাগোষ্ঠী বনাম মোতিলাল ঘোষ ও অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা না। পাঞ্চাবে ব্রায় গোষ্ঠী বনাম মার্য গোষ্ঠার বিরোধ: লালা হরকিষেণ লাল বনাম লালা লাজপৎ রায়ের কংগ্রেস দখলের পড়াই-এর কথা বলা হয়েছে। মাদ্রাজে মায়লাপুর গোষ্ঠী বনাম এগমোর গোষ্ঠীর বিবাদ। এবং মায়লাপুর গোষ্ঠীর সুব্রহ্মণ্য আইয়ার বনাম এগমোর গোষ্ঠীর কৃষ্ণস্বামী আইয়ারের ক্ষমতার লড়াই। অন্ধ্র অঞ্চল থেকে আগত নবীন টি. প্রকাশন, কৃষ্ণ রাও প্রভৃতির এগমোর গোষ্ঠীতে যোগদানের উল্লেখ করা হয়। মহারাষ্ট্রও এই দ্বন্দ্বের বাইরে ছিল না। গুণায় 'ডেকান সোসাইটির' নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে গোখেল ও আগারকরের সঙ্গে চরমপন্থী ভিলকের বিবাদ হয়। কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা বলেন যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নরমপন্থীদের কাছে পরাজিত হয়ে এঁরা মডারেটপন্থার সমালোচনা এবং চরমপন্থার কথা বলেন।

কেমব্রিজ মতের

সমালোচনা

কেমব্রিজ মতবাদীরা চরমপন্থার উদ্ভবের জন্য উপরোক্ত যে কারণ নির্দেশ করেন, বহু গবেষক তা নস্যাৎ করেছেন। প্রথমত, তখন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা, অর্থ ও চাকুরি দানের অধিকার ছিল না। তখনকার যুগে কংগ্রেস করতে হলে নিজ সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হত। তাহলে কিসের জন্য বিরোধীরা কংগ্রেসের পদ দখলের জন্য এত মরীয়া হয়ে উঠবেন যদি না তাঁরা আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হন? দ্বিতীয়ত, তখন কংগ্রেস ছিল একটি অসংগঠিত দল, যার অধিবেশন বছরে একবার বসত। চরমপন্থীরা কংগ্রেসকে আরও সক্রিয়, সংগঠিত, জনমুখী ও আন্দোলনবাদী করার জন্যই মডারেটদের বিরোধিতা করেন। ১৮৯০-এর দশক থেকেই বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে তাত্বিক ও মতাদর্শের লড়াই শুরু হয়েছিল। কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা এই দিকটি লক্ষ্য করেন নি। তৃতীয়ত, মডারেট আন্দোলনের বিফলতা লক্ষ্য করেই চরমপন্থীরা তাঁদের বিকল্প আন্দোলনের পন্থা

কংগ্রেসে চালু করতে চান। এই উপলক্ষে মডারেটদের সঙ্গে বিবাদ হয়। কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা মডারেট আন্দোলনের বিফলতার দিকটি উপেক্ষা করেছেন। চতুর্থত, চরমপন্থীরা সকলেই সুযোগবাদী এলিট ছিলেন একথা ভাবা কষ্টকর। তাহলে কিসের লোভে বিপ্লবীরা স্বেচ্ছায় ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেন। অরবিন্দ, লাজপৎ ও তিলক এত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেন। লাজপৎ পুলিশের লাঠিতে প্রাণ দেন। নেতারা যদি স্বার্থপর এলিট হন তবে জনগণ কেন তাঁদের কথায় পুলিশের গুলি ও লাঠি বরণ করেন? আদর্শবাদ ছাড়া কোন আন্দোলন এত প্রবল ও শক্তিশালী হতে পারে না। অধ্যাপক সুমিত সরকারও মনে করেন যে, বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও মোতিলাল ঘোষ, পাঞ্জাবে লালা হরকিষেণলাল ও লাজপৎ রায়, পুণাতে গোখেল ও তিলকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত দ্বন্দ্ব। বস্তুতপক্ষে চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে মৌলিক আদর্শগত সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিঃ) রচনাগুলিও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদে উদ্ভবে বিরাট ভূমিকা নেয়। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের আবেদন-নিবেদন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নীতিকে 'ভিক্ষুকের রাজনীতি' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী। পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদের সঙ্গে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের তিনি আশ্চর্য সমন্বয় ঘটান। তাঁর প্রেরণাস্থল ছিল 'মহাভারত ও "ভগবদ্ গীতা' । তিনি বেদ বা বেদান্তে তাঁর চিন্তাধারার উৎস খোঁজেন নি। তাঁর আদর্শ ছিলেন শ্রীকৃ, যিনি ছিলেন পুরুষোত্তম, মানুষের মালের জন্য যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমের চোখে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, অন্যায়ের প্রতিকারক মহাপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রকে ধর্মযুদ্ধে পরিণত করে এক 'ঐঐক্যবদ্ধ মহাভারত' গড়েন। তিনি এজন্য সকল দুঃখ ও অবমাননা বীরের মত সহ্য করেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ধর্মরাজ্য স্থাপন। বঙ্কিমের পরিকল্পিত "ধর্মরাজ্য" চরমপন্থীদের কাছে "স্বরাজে" বা "স্বরাজ্যে" পরিণত হয়। ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে শোক, দুঃখ সকল কিছু পরিত্যাগ করে নিরাসক্ত চিত্তে ফলাফল ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে নিস্কাম কর্মের কথা বলেন। চরমপন্থীরাও এজন্য সকল পিছুটান, মোহ ও ভীতি ত্যাগ করে দেশমাতার মুক্তিযজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাঁরাও নিস্কাম কর্মের সাধনা করেন। সর্বোপরি, বঙ্কিমের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ছিল চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের বাইবেল। আনন্দমঠের সন্তানদল যেমন দেশমাতার উদ্ধারের জন্য আত্মত্যাগে ব্রতী হয়, চরমপন্থীরা দেশকে মাতৃ ও দুর্গারূপে কল্পনা করে তাঁকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্তির ব্রত নেন। বঙ্কিম 'ধর্মতত্ব' গ্রন্থে তাঁর প্রচারিত আদর্শের নাম দেন "অনুশীলন ধর্ম।" বঙ্কিমের আনন্দমঠ উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত চরমপন্থীদের কাছে মুক্তি আন্দোলনের মন্ত্রে পরিণত হয়। মহান বিপ্লবী অরবিন্দ আনন্দমঠের সন্তানদলের আদর্শে বিপ্লবী দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। অরবিন্দ, চরমপন্থী আন্দোলন পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে - অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'স্বাদেশিকতার ধর্মগুরু' বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদ–এই হায় দুই-এর মধ্যে এক আদর্শ সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকায় তাঁর চিন্তাধারাকে ধর্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল বলে অনেকে সমালোচনা এ করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা সঠিক নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য অনুসরণ - করে দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম সঞ্চারে ব্রতী হয়েছিলেন। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সংকীর্ন, প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কার-বিরোধী ছিলেন না।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

একক - ২

উপএকক - ২

স্বদেশী আন্দোলন এবং বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

গঠন (Structure) ঃ

৪.৫.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৫.২.২.১ ঃ সূচনা

৪.৫.২.২.২ ঃ নরমপন্থী চিন্তাধারা

৪.৫.২.২.৩ ঃ গঠনমূলক স্বদেশী

৪.৫.২.২.৪ ঃ চরমপন্থী ধারা—বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)

৪.৫.২.২.৫ ঃ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

৪.৫.২.২.৬ ঃ স্বদেশীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য

৪.৫.২.২.৭ ঃ বাংলায় স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ

৪.৫.২.২.৮ ঃ বয়কট

৪.৫.২.২.৯ ঃ জাতীয় শিক্ষা

৪.৫.২.২.১০ ঃ স্বদেশী সংগঠন

৪.৫.২.২.১১ ঃ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৪.৫.২.২.১২ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৫.২.২.১৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৫.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা

(২) এই আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

(৩) এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৪.৫.২.২.১ ঃ সূচনা

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাংলায় প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল সভা, সমাবেশের মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট টাউন হলে একটি সভায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু করার কথা প্রথমবার ঘোষণা করা হয়। ঊনিশ শতক থেকেই আত্মশক্তি অর্জনের জন্য গঠনমূলক স্বদেশীর আর্দশ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলোচনা হলেও, সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায় বলে মনে করেন সুমিত সরকার–(১) উদার পন্থী চিন্তাধারা বিশ্বাস করতেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া, (২) গঠনমূলক স্বদেশী, (৩) বয়কট এবং Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, (৪) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা।

৪.৫.২.২.২ ঃ নরমপন্থী চিন্তাধারা

প্রথম পর্বে ডিসেম্বর ১৯০৩ থেকে জুলাই ১৯০৫ পর্যন্ত নরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। মার্চ ১৯০৪ এবং জানুয়ারী ১৯০৫ এ টাউন হলে দুটি সভা হয়েছিল এবং বাংলাভাগের বিরোধিতা করে কিছু আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যেও আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ১৯০৫ সালের বেনারস অধিবেশনে গোখলে সরকারি নীতির সমালোচনা করেন। বারাণসী কংগ্রেস থেকেই মহারাষ্ট্র এবং বাংলার চরমপন্থীদের মধ্যে বোঝাপড়া শুরু হয় এবং কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। স্বদেশীর কর্মসূচীও গৃহিত হয়। ১৯০৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে চরমপন্থীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বয়কটের প্রস্তাব রাখেন। নরমপন্থীরা চেয়েছিলেন সীমিত কয়েকটি বৃটিশ পণ্যের বয়কট। কলকাতার পূর্ণ অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী শেষপর্যন্ত উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে স্বরাজ লাভই ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেন। আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধিতা থাকলেও বাংলায় নরমপন্থী নেতৃত্ব তাদের আবেদন নিবেদনের রাজনীতিকে পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সুরেন্দ্রনাথ বাংলার বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমন করেন এবং ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র এবং লিভারপুলের নুন বয়কটের ডাক দেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও তারা যুক্ত ছিলেন।

৪.৫.২.২.৩ ঃ গঠনমূলক স্বদেশী

স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল আত্মশক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাংলায় উদারপন্থী পদ্ধতির সমালোচনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। বৃটিশ শক্তির কাছে ভিক্ষার বদলে, গঠনমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন নতুন যুগের মন্ত্র ছিল। দেশীয় প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক ভাষা, দেশীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রথম প্রয়াস শুরু হয় এই সময় থেকে। স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী ভান্ডার, জাতীয় শিক্ষা এবং গ্রাম উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠাই ছিল মূল লক্ষ্য। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের বহু আগে থেকেই স্বদেশী মেলা, দেশীয় রীতি, ভাষা এবং স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বদেশীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। গঠনমূলক স্বদেশীর মূল চিন্তা ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শও প্রকাশ পেয়েছিল। পুরোনো রাজনৈতিক পদ্ধতি বর্জন করে গ্রামভিত্তিক গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির কথা তিনি বলেছিলেন।

স্বদেশীর আদর্শকে কাজে পরিণত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের নব্বই এর দশক থেকে। বিভিন্ন প্রদর্শনী ও স্বদেশী বিপনী খোলা হয়েছিল যেমন ১৮৯৭ এ খোলা হয় স্বদেশী ভান্ডার, ১৯০১ যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ইন্ডিয়ান স্টোরস্ এবং ১৯০৩ সরলাদেবীর লক্ষ্মী ভান্ডার। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল খোলা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। সতীশচন্দ্র মুখার্জীর ডন পত্রিকায় স্বদেশী শিল্প এবং জাতীয় শিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়। ভাগবত চতুষ্পাঠী (১৮৯৫), ডন সোসাইটির সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, সারস্বত আশ্রম (১৯০২) এবং বোলপুরের আশ্রমের মতো জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯০৪ সালের বর্ধমান প্রাদেশিক সভাতে আশুতোষ চৌধুরী গঠনমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের আহ্বান দেন। সুতরাং ১৯০৫ এ যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হচ্ছে তখন আত্মশক্তি এবং স্বদেশীর আদর্শ বাংলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

৪.৫.২.২.৪ ঃ চরমপন্থী ধারা—বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে চরমপন্থীরা ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি এবং আত্মশক্তির আদর্শের থেকে সরে গিয়ে এরা দাবী তোলে স্বরাজের। স্বরাজ লাভের পদ্ধতি হিসাবে চরমপন্থীরা বেছে নিয়েছিলেন বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

১৯০৫ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় স্বাধীনতার দাবী জানানো হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট পত্রিকায় স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেন। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে বিপিনচন্দ্র পাল বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ভারতের দাবী তোলেন। বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ এবং সরকারী প্রশাসন বয়কট এবং সঙ্গে স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে বৃটিশদের বিরোধিতার কথা বলেন অরবিন্দ। বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে সংগঠনের প্রয়োজন, কলকাতার চরমপন্থী নেতারা সেদিকে ততটা দৃষ্টি দেননি। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির রাজনীতিতেই তারা মগ্ন ছিলেন। সুমিত সরকারের মতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে জেলাগুলিতে যে নতুন সমিতিগুলি গড়ে

উঠেছিল তাদের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। বরিশাল এবং ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশনে সমিতিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং পল্লীউন্নয়ন, স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্বদেশীর আদর্শ প্রচারে সফল হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কলকাতা এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ করে জামালপুর, আসানসোল এবং খড়গপুরে যে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী, প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বোসের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা। যদিও শ্রমিক আন্দোলনের মূল দাবী ছিল অর্থনৈতিক, তথাপি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট যোগ ছিল, বিশেষ করে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত শিল্পে শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমর্থন ছিল সুস্পষ্ট যেমন ১৯০৫-০৬ এর খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলের শ্রমিক আন্দোলন।

৪.৫.২.২.৫ ঃ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

স্বদেশী আন্দোলনকে সামনে রেখে গোপন সমিতিগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের উত্থান ছিল স্বদেশী আন্দোলনের ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯০২ সালের মধ্যে বাংলায় চারটি বিপ্লবী গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল অনুশীলন সমিতি। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী সংগঠনগুলি পুনরায় কার্যকরী হয়ে ওঠে । অনুশীলন সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাদের শাখা বিস্তার করে। ১৯০৬ ডিসেম্বরে প্রথম বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী যুগের বহু বিপ্লবী সংগঠনের শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে।

৪.৫.২.২.৬ ঃ স্বদেশীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য

স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক এবং গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পে এবং উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশে তৈরি সামগ্রী ব্যবহার করা এবং এর জন্যে নতুন শিল্প গড়ে তোলা। দেশপ্রেমের এই আদর্শ বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করেছিল ১৮৭০ এর দশক থেকে এবং বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় তা আরও শক্তি সঞ্চয় করেছিল। স্বদেশী যুগের এই অর্থনৈতিক চিন্তা যদিও নতুন ছিল না কিন্তু ১৯০৫ এর পরে এই চিন্তাভাবনায় কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। নরমপন্থীরা শিল্পায়নকে সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে দেখেছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালের থেকে চরমপন্থী নেতৃত্ব বয়কট এবং স্বদেশীকে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মনে করতেন। বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট করলে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা হবে এবং স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ হবে বলে তারা মনে করতেন। এর ফলে অর্থনীতিতে স্বয়ংভরতার বিকাশ ঘটবে যা ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করবে। সুমিত সরকারের মতে ১৯০৫ এর পরে গঠনমূলক স্বদেশীর বদলে চরমপন্থী নেতৃত্ব Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনীতিকে গ্রহণ করেন যার মধ্যে বয়কট এবং স্বদেশী শিল্প গঠন একটি অংশমাত্র ছিল। স্বদেশী অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সবচেয়ে নতুন দিক ছিল পশ্চিমী ধাঁচে বৃহদাকার শিল্প গঠনের পরিকল্পনা বর্জন। এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মতো স্বদেশী কাপড়ের মিল, চিনেমাটি, চামড়া, দেশলাই বা সাবানের কারখানা গড়ে উঠে। স্বদেশী শিল্প গঠনে তরুণদের উৎসাহ দেওয়া হয়। ১৯০৭ সালে দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সম্ভাব্য উদ্যোগপতিদের জন্য Industrial Guide প্রকাশ করেন। হস্তশিল্প, চরকা ও হাতে বোনা তাঁতের দ্বারা উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাখী বন্ধনের দিনে স্বদেশীর ব্রত হিসাবে চরকা ব্যবহারের প্রস্তাবও রাখা হয়। তবে স্বদেশী শিল্পায়নের প্রকৃতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। একদিকে যেমন ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং

বৃহৎ শিল্পের সামাজিক কুপ্রভাব নিয়ে আপত্তি ছিল, অন্যদিকে স্বদেশী বলতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার বৃহদাকার আধুনিক শিল্পের কথা ভেবেছিলেন। সতীশচন্দ্র মুখার্জী ডন পত্রিকায় "Indian Economic Problem" প্রবন্ধে দ্বৈত অর্থনীতির কথা বলেন অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিল্পায়ন যেমন রেল, খনি, রসায়ন। অন্যত্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন।

৪.৫.২.২.৭ ঃ বাংলায় স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ

উনিশ শতক থেকে বাঙালী উদ্যোগপতিদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এই প্রচেষ্টার পিছনে কোন জাতীয়তাবাদী চেতনা কাজ করেনি। ১৮৮৭ সালে ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের (যারা চাল এবং পাটের ব্যবসা করতেন) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স। চা এবং কয়লার ব্যবসাতে যে ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল সেখানেও জাতীয়তাবাদী আদর্শ কোন ভূমিকা নেয়নি।

জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং দেশপ্রেম থেকে যে দেশীয় শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল সেখানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল কলকাতার কয়েকটি অভিজাত পরিবার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যেমন ১৮৪৭ সালের পর থেকে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রকে হিন্দু মেলা শুরু করতে সাহায্য করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Inland River Steam Navigation Service।

সুমিত সরকারের মতে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে অর্থনৈতিক স্বদেশী ক্রমশঃ একটি সংগঠিত আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত বিদ্যা এবং গবেষণা শুরু হয়েছিল, অন্যদিকে দেশীয় কারিগরি শিল্প এবং আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়াও স্বদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি ব্যবসার শুরু হতে দেখা যায় এই পর্বে।

হিন্দু মেলার অনুকরণে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির জন্য Industrial Association মেলা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করত। মহিলা শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিরন্ময়ী দেবীর উদ্যোগে। এছাড়াও স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির জন্য স্বদেশী দোকান খোলা হয়েছিল। নীলাম্বর মুখার্জী এবং বঙ্গবাসীর কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বদেশী এম্পোরিয়াম। ইন্ডিয়ান স্টোরস্ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০২ সালে। ১৯০৫ সালের পর স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার ফলে নতুন বিপণী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বদেশী বাজার। চিৎপুর রোডে স্বদেশী বস্ত্রালয় বাংলার ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের পুনরুত্থান ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে। ফ্লাই শাটল তাঁতের ব্যবহার জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাঁতের কাপড়ের চাহিদা বেড়েছিল। কিন্তু দেশী কাপড়ের দাম ছিল দ্বিগুণ। ফলে তাঁতীদের লাভ কম হত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুর্শিদাবাদ এবং মালদায় রেশম শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল।

আধুনিক শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের Bengal Chemical and Pharmaceutical Works। রাসায়নিক শিল্পের বিকাশের যে ধারা এই সময় শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত ছিল পরবর্তী পর্বেও। ১৯০৬ সালে বৃটিশ এবং জার্মান মেশিন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুরু হয় Calcutta Pottery Works এর আধুনিক কারখানা। এছাড়াও সত্যচরণ বোসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Bengal Pottery Works। স্বদেশী উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম ছিল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ছিলেন জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা। মোহিনী মোহন চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোহিনী মিলস্ নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়াতে।

এছাড়াও সাবান এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের শিল্পও গড়ে উঠেছিল এই সময়। নীলরতন সরকারের প্রতিষ্ঠিত National Soap Factory, Bengal Soap Factory, রাসবিহারী ঘোষের Bande Mataram Match Factory, স্বদেশী সিগারেট, মনোরমা মোমবাতির কারখানা ইত্যাদি। স্বদেশী প্রসাধনী শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এইচ. বোস।

সুমিত সরকারের মতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে স্বদেশী যুগে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৮৬৭ সালে Shibpur Iron Works প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কাঁচা মালের লোহা এবং স্টীল আমদানী করতে হত। একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিল টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি।

১৯০৭-০৮ থেকে ব্যাঙ্কিং এবং বীমার ব্যবসা, ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে। ১৯০৬ এ শুরু হয় The National Insurance Company। কিন্তু বাংলার অর্থনীতি এবং শিল্পের উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে বাংলার স্বদেশী যুগের উদ্যোগ বিশেষ প্রসার লাভ করেনি।

৪.৫.২.২.৮ ঃ বয়কট

বিদেশী দ্রব্য বর্জন স্বদেশী কর্মসূচীর প্রধান বিষয় হলেও বাস্তবে কিন্তু বয়কট প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। প্রধানত মাঞ্চেস্টারে উৎপাদিত বস্ত্র, লিভারপুলের নুন এবং চিনি, সিগারেট ইত্যাদি দ্রব্য বয়কটের কথা বলা হয়েছিল। কলকাতা বন্দরে আমদানীর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে বিলাতী বস্ত্রের ক্ষেত্রে আমদানী কমেছিল। নুনের ব্যবহার ১৯০৫-০৬ এ ছিল ৫৯ শতাংশ, ১৯০৮-০৯ তা কমে গিয়ে দাড়ায় ২৮ শতাংশ এবং ১৯১১-১২ তে ৩৭ শতাংশ। সরকারী মতে ১৯০৭-০৮ সালের বিশ্বমন্দা এই কমতির জন্যে দায়ী ছিল। এছাড়াও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ও বিদেশী মিলমালিকদের মনোমালিন্যও আমদানী ব্যবসার উপর প্রভাব ফেলেছিল। তবে পূর্ব বাংলার বাখরগঞ্জ, ঢাকা জেলায় সমিতির সদস্যরা পিকেটিং, সামাজিক বহিষ্কার ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বয়কটকে সফল করে তুলেছিল। এর ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশালে বিদেশী বস্ত্র এবং নুনের আমদানী কমে যায়।

৪.৫.২.২.৯ ঃ জাতীয় শিক্ষা

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় স্বাভাবিক ভাবে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে নেতাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা করা হয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরি করছে। এই সময় সব নেতারাই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে সরব হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের থেকেই জাতীয়তাবাদী সচেতনতার প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে গ্রহণ করার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে বিদেশী সভ্যতা আমাদের বোধবুদ্ধিকে অভিভূত করেছে যার ফলে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা অতি সহজেই লুপ্ত হয়েছে। আত্মশক্তি জাগ্রত করে সামাজিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের বাঁচবার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা প্রভাবিত হয়েছিল তার স্বদেশচিন্তার দ্বারা। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার

প্রচার হলে শিক্ষা সর্বব্যাপী হবে। দেশীয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে সাহায্য করবে। শিক্ষা ও স্বদেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার জোরালো বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে পটলডাঙার মল্লিকবাড়ীতে ছাত্রদের সভায় রবীন্দ্রনাথ বললেন "আমাদের সমাজ যদি বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করে, তবে একদিন ঠকিতে হইবে।.........গভর্নমেন্ট এদেশে অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারে না"। ডন সোসাইটির একটি সভায় কার্লাইল সার্কুলার এর কথা উত্থাপন করে তিনি বলেনঃ "আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে"......

জাতীয় শিক্ষার আরেক অন্যতম প্রবক্তা সতীশচন্দ্র মুখার্জীর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল ডন পত্রিকার মাধ্যমে। "An Examination into the Present System of University Education in India and a Scheme for Reform (এপ্রিল-জুন ১৯০২) প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের সমালোচনা করেন। তবে সতীশচন্দ্রের শিক্ষাভাবনার মধ্যে তৎকালীন হিন্দু সংস্কারবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়। ডন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হয় যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। কিন্তু দেশীয় বিশেষ করে হিন্দু জীবন এবং বিশ্বাসের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সতীশচন্দ্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং সতীশচন্দ্রের মতো মানুষের কাছে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জাতি গঠন।

জাতীয় শিক্ষা নিয়ে বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল কার্জনের দমনমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ১৯০৪ এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা উচ্চশিক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় সরকারী স্কুল কলেজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা ভাবা হয়। ১৯০৫ এর ৫ই আগস্ট একটি সভায় ছাত্রদের সাহায্যের জন্যে একটি তহবিল খোলা হয়। সরকারী দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন আরও সংগঠিত হয়। এই পর্বে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯০৫ এর ১০ই ডিসেম্বর Landholders Association এর একটি সভায় National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, সাত বছরের সেকেন্ডারি শিক্ষা এবং চার বছরে কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৬ এর ১৫ই আগস্ট Bengal National College এবং স্কুল গঠন করা হয় এবং অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৮ এর মধ্যে প্রায় চল্লিশটা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারকনাথ পালিত এবং নীলরতন সরকার প্রমুখ শিক্ষাবিদদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় Society for the Promotion of Technical Education. সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় Bengal Technical Institute ১৯০৬ সালের ২৫শে জুলাই। তারকনাথ পালিত ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রমথনাথ বোস Institute এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অর্থনৈতিক স্বদেশীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে বিষয়গুলি পড়ানো হত, তার মধ্যে ছিল সেরামিক প্রযুক্তি, মোমবাতি, সাবান তৈরীর প্রক্রিয়া। ১৯০৭ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েটে ৬৮ এবং সেকেন্ডারীতে ১১৪ জন। কারিগরি এবং প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৪.৫.২.২.১০ ঃ স্বদেশী সংগঠন

স্বদেশী আন্দোলনকে সংগঠিত করতে এবং আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরী করতে বাংলার বিভিন্ন জেলায় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী দল এবং সমিতির মাধ্যমে গঠনমূলক স্বদেশীর কাজ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গঠনের আদর্শ এবং অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনৈতিক মতাদর্শ বাস্তবে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব নেয় এই সমিতি ও সংগঠনগুলি।

১৯০৫ পর্যন্ত উদারপন্থীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সভা সমাবেশ করলেও, নিজেদের স্বেচ্ছাসেবি দল গঠন করেনি। মফস্বলে রিজ্‌লির পরিকল্পনার প্রতিবাদে আন্দোলন গঠন করেছিল ঢাকা পিপলস্ এসোসিয়েশন। কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী জেলার পিপল্‌স এসোসিয়েশন নিজেদের জেলায় প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিল ১৯০৪-০৫ ধরে।

তবে জেলার মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত আন্দোলন হয়েছিল বরিশালে। ১৮৮০ র দশক থেকে বরিশালে পিপল্‌স এসোসিয়েশন (People’s Association) সংগঠিত হয়েছিল আঞ্চলিক মানুষদের উৎসাহে। পরে অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রচেষ্টায় এই সংগঠন আরও প্রসার লাভ করে। বরিশালে যখন বয়কট আন্দোলন শুরু হয় তখন দুটি সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল যার মধ্যে একটি ছিল কর্মী সংঘ। পরবর্তীকালে অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কর্মী সংঘের অন্যান্য সদস্যদের প্রচেষ্টা কর্মী সংঘকে নতুনভাবে সংগঠিত করা হয় এবং জন্ম নেয় স্বদেশ বান্ধব সমিতি। সমিতির সদস্যরা বেশিরভাগই ছিলেন ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশানের ছাত্র এবং শিক্ষক। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে সংগঠন তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করে। জেলা সংগঠন তৈরি হয় ঢাকা, কলকাতা, ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশন টাঙ্গাইল, রামপুরহাট এবং বাগেরহাটে।

১৯০৬ সালের একটি পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় বয়কট আন্দোলনের সময় থেকে। বন্দে মাতরম সম্প্রদায়, ব্রতী, ভারত অনুশীলন সমিতি, শক্তি সমিতি ইত্যাদি অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান এবং সমিতি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রতী সমিতি। Anti Circular Society প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০৫ সালে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে। এটি ছিল ছাত্রদের একটি সংগঠন। উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, হিন্দু মুসমান ঐক্য এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার উপর জোর দিত এই সংগঠনের সদস্যরা।

পূর্ব বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ এবং এই প্রত্যেকটি জেলায় সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার পাঁচটি প্রধান সমিতি ছিল স্বদেশ বান্ধব, ব্রতী, ঢাকা অনুশীলন, সুহৃদ এবং সাধনা। বরিশাল শহরে ১৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল স্বদেশ বান্ধব সমিতি। বিভিন্ন সভার মধ্যে দিয়ে সমিতি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করত। এছাড়া সমিতির নিজস্ব স্বদেশী ভান্ডার এবং তাঁত বোনার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। স্বদেশ বান্ধব সমিতির শাখা ছিল গ্রামস্তরে এবং প্রত্যেকটি সংগঠন নিজেদের স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেছিল। বিভিন্ন গঠনমূলক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের শারীর শিক্ষা দেওয়া হত। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সমিতির দ্বারা

পরিচালিত আন্দোলনের ফলে বরিশালে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানী কমে গিয়েছিল। দেশীয় উৎপাদনের চাহিদা বেড়েছিল।

ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদারের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। অন্যদিকে মাদারীপুর সাবডিভিশনে বিপ্লবী ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল ব্রতী সমিতি। লাঠি চালনা, ছোরা খেলার অনুশীলন এবং সঙ্গে সঙ্গে বয়কট ও স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করা হত।

ঢাকায় বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। এই সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ। বিপ্লবের আদর্শে সংগঠিত এই সমিতি কঠোর অনুশীলন এবং নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিত। ঢাকার চরমপন্থী নেতা এবং উকিল আনন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৮ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় অনুশীলন সমিতির ১১৯টি শাখা স্থাপিত হয়েছিল। সমিতিরা ম্যাজিক লন্ঠন শো, গ্রাম উন্নয়ন, আদালত স্থাপন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রচার করত।

স্বদেশী আন্দোলনকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। গান, নাটক, যাত্রাপালা, স্বদেশী মেলা, নাটক এবং বিভিন্ন উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে স্বদেশী যুগের নেতারা জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা শিক্ষিত জনগণের মধ্যে প্রচার করতেন। ইংরাজি সংবাদপত্রের মধ্যে বেঙ্গলি, অমৃতবাজার পত্রিকা জনপ্রিয় ছিল। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে হিতবাদী, সন্ধ্যা, বসুমতী, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও মফস্বল থেকে বহুসংখ্যক বাংলা কাগজ প্রকাশ করা হত, যেমন বরিশালে দুর্গামোহন সেনের সম্পাদনায় হিতৈষী, ময়মনসিংহ থেকে বৈকুণ্ঠনাথ সোমের মিহির ইত্যাদি। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ভাণ্ডার পত্রিকা হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ, জাতীয় ভাণ্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপে। স্বদেশীর বার্তা প্রচারের আরও একটি মাধ্যম ছিল পুস্তিকা বা Pamphlet।

জনসভায় স্বদেশীর কর্মসূচী এবং আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা সাধারণ মানুষের মনকে নাড়া দিত। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা জেলাগুলিতে পরিভ্রমন করে সভা সমাবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করত।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের এই পদ্ধতি ছাড়াও স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল। গ্রামউন্নয়ন এবং গঠনমূলক কাজকর্ম ছিল তার মধ্যে একটি।

ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ম্যাজিক লন্ঠন বক্তৃতার মাধ্যমে স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করত। স্বদেশ বান্ধব সমিতি ১৯০৬ সালে দুর্ভিক্ষে ত্রাণের কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। ১৯০৭ সালে ত্রাণের জন্য অন্নরক্ষিনী সভা গঠন করা হয় বঙ্গবাসীর উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গ্রামউন্নয়নের এবং সমাজ গঠনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখী বন্ধন দিবস পালন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জনপ্রিয় প্রাচীন এই ভারতীয় ঐতিহ্যকে একদিকে প্রতিবাদ এবং অন্যদিকে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক হিসাবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে মেয়েরা অরন্ধন পালন করত এবং গৃহের আগুন জ্বালাতো না। ১৯০৫ সালের ২৪ আগস্ট মেয়েদের একটি সমাবেশ হয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় মেয়েরা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের অঙ্গীকার নেয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলা কবিতা, গান এবং নাটকের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের শুরু হয়। উনিশ শতক থেকেই জাতীয়তাবাদী গান এবং কবিতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় যা পূর্ণতা পায় স্বদেশী যুগের দেশাত্মবোধক সংগীত এবং কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের গান ছাড়াও, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, মুকুন্দ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদের গান যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করা হয়েছিল গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বদেশীর বার্তা পৌঁছানোর জন্যে। ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি স্বদেশী পল্লী সঙ্গীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিল। বাঁকুড়ায় ভাদু সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশী প্রচার করা হতো বরিশালে জারি গানের শৈলীতে স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন মোফিজউদ্দিন রায়তি।

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের রচিত; বাংলার মাটি, বাংলার জল বাংলার মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক এবং যাত্রার চল হয়েছিল। ১৯০৬ সালে স্টার এবং মিনার্ভায় স্বদেশী নাটক দেখানো হত। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা, মির কাশিম এবং ছত্রপতি শিবাজী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস এবং মেবার পতন। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করা হত। গ্রামাঞ্চলে যাত্রা এবং কথকতার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রচার করা হত। মুকুন্দ দাসের মাতৃপূজা এইসময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

৪.৫.২.২.১১ ঃ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বদেশী আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল। সরকারী অত্যাচার এবং দমননীতির ফলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলেও, সম্পূর্ণভাবে গতিহীন হয়ে পড়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল না বলে মনে করেন সুমিত সরকার। তাঁর মতে স্বদেশী আন্দোলন ভদ্রলোক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষকদের জন্যে নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী না থাকার ফলে, গ্রামাঞ্চলের অগণিত কৃষক এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মবোধ করেনি। আন্দোলনে বয়কট প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও পরে স্তিমিত হয়ে আসে। গ্রামের মানুষের পক্ষে নিম্নমানের স্বদেশী তাঁতের কাপড় বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অতিরিক্ত মূল্যে কেনা সম্ভব ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বয়কট তার তাৎপর্য হারিয়েছিল।

তাছাড়াও স্বদেশী উদ্যোগ, চা, পাটশিল্প, কয়লা ইত্যাদি শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ করতে পারেনি। সরকারি সাহায্য না পাওয়ার ফলে স্বদেশী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পুঁজির অভাবও স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও নানা দুর্বলতা দেখা যায়। গঠনমূলক স্বদেশীর ফলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়ে উপযুক্ত চাকরি পাওয়া কঠিন ছিল বলে ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসত না। বয়কট ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে গিয়েছিল। গণশিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেয়নি জাতীয় শিক্ষা নীতি।

স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে মুসলমানদের প্রতি বৃটিশদের নীতিতে পরিবর্তন এসেছিল। বাংলাভাগের অন্যতম কারণ ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা। ফলে মুসলিমদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতারা সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ছিল প্রকট, যা মুসলমানদের

খানিকটা পরিমাণে আন্দোলনের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ১৯০৩ এ যখন প্রথম বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় তখন উভয় সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু এই ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বৃটিশ নীতি উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী করে তুলেছিল। অভিজাত মুসলিম নেতৃত্ব শহর ও গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সংগঠিত করেছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র মুসলমানদের ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকার ধারণ করেছিল।

বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা কৃষক এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর অভাবের জন্যই কৃষকেরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্নবর্গীয় জাতি সম্প্রদায়ের মানুষও এই আন্দোলনে সামিল হয়নি।

৫.২.২.১২ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

Sumit Sarkar – The Swadeshi Movement in Bengal

Shekhar Bandyopadhyay – From Plassey to Partition–A History of Modern India

Rajat Kanta Ray – Social Conflict and Political Unrest in Bengal.

Amit Bhattacharjee – Swadeshi Enterprise in Bengal 1900-1920

Haridas and Uma Mukherjee – Origins of National Education movement.
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ

J.R. Mc Lane – The 1905 Partition and The New Communalism
Bengal East and West Alenander Lipski (ed.)

গণশক্তি (প্রকাশনা) -- **বজ্রশিখায় বাংলা** (কলকাতা বইমেলা, ২০০৫)
(বঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষে সংকলন)
‘বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসকি সংগ্রাম’
(প্রবন্ধ) অমল দাশ

৫.২.২.১৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Give a brief account of the Swadeshi Movement in Bengal.
2. Analyse the nature and programme of constructive Swadeshi as followed in the wake of the Swadeshi Movement.
3. How far was economic Swadeshi successful in Bengal in this period.
4. Discuss the various trends in the Swadeshi Movement in Bengal.
5. What were the limitations in the Swadeshi Movement in Bengal?

পর্যায় গ্রন্থ্ - ৬

GANDHIAN MOVEMENT AND LEFT MOVEMENT

একক - ১

গান্ধীবাদী আন্দোলন
Gandhian Movements

গঠন (Structure) ঃ

৪.৬.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৬.১.১ ঃ সূচনা

৪.৬.১.২ ঃ গান্ধীজির উত্থান

৪.৬.১.৩ ঃ আঞ্চলিক বা স্থানীয় আন্দোলন

৪.৬.১.৪ ঃ রাওলাট সত্যাগ্রহ

৪.৬.১.৫ ঃ অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন

৪.৬.১.৬ ঃ সরকারী দমননীতি

৪.৬.১.৭ ঃ আন্দোলন প্রত্যাহার

৪.৬.১.৮ ঃ স্বরাজ্য দল (১৯২৩-২৭)

৪.৬.১.৯ ঃ স্বরাজ্য দলের নীতি ও কর্মসূচী

৪.৬.১.১০ ঃ কার্যাবলী

৪.৬.১.১১ ঃ অবদান

৪.৬.১.১২ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৬.১.১৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৬.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে উত্থান

(২) গান্ধীর আঞ্চলিক আন্দোলনে অবদান

(৩) অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন

(৪) আন্দোলনের ফলাফল

(৫) স্বরাজ্য দলের আবির্ভাব এবং কার্যাবলী

(৬) কার্যাবলীর মূল্যায়ন

৪.৬.১.১ ঃ সূচনা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির অবদান নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়। তাঁর আগমনের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন দিকে মোড় নেয়। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে গণআন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনিই ছিলেন এক নতুন মতাদর্শ ও পথের দিশারী। তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সর্বভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ইংরেজ সরকার আন্দোলনের ভয়াবহতায় শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

৪.৬.১.২ ঃ গান্ধীজির উত্থান

১৮৬৯ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোরবন্দর নামক স্থানে এক বনেদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাবা গান্ধী ও মা পুতলিবাঈ। গান্ধীজির মন ও চরিত্র গঠনে তার মায়ের অপরিসীম প্রভাব ছিল। 'The Story of My experiments with Truth' নামক আত্মচরিতে গান্ধীজি একথা লিখেছেন। পোরবন্দরে গান্ধীজির শৈশব ও কিশোরকাল কাটে। ১৮৭৮ খ্রীঃ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ তিনি লন্ডন যান এবং ১৮৯১ খ্রীঃ ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু বোম্বাই-হাইকোর্ট ও রাজকোটে তিনি বিশেষ পশার জমাতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানী নামক এক মুসলিম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তাদের মামলা করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার আমন্ত্রণ পেলে তখন তিনি তা গ্রহণ করেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত তা প্রত্যক্ষ করে গান্ধীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। আইন প্রশাসনের মাধ্যমে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে ভারতীয়দের ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ইউরোপীয়রা কুলি বলে সম্বোধন করতেন। গান্ধীজি ভারতীয় বলে তাকে কুলি ব্যারিস্টার বলে সম্বোধন করা হ়ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে গান্ধীজির তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা ব্যবসা ছাড়াও অন্যান্য কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। গান্ধীজি প্রত্যেকের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হন। এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকেও কিভাবে

ভারতীয়দের জন্য ন্যূনতম মানবিক অধিকার অর্জন করা যায় সেজন্য তিনি প্রয়াসী হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী সকল স্তরের ভারতীয়রা তাকে সাহায্য করতে উদ্যোগী হন। ভারতীয়দের অধিকার অর্জনের জন্য ১৮৯৪ খ্রীঃ ২২ শে মে গান্ধীজি নাটালে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর (Boer) এবং বৃটিশদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে এবং ১৯০৬ খ্রীঃ জুলু বিদ্রোহের সময় গান্ধীজি বৃটিশদের সাহায্য করেন। তিনি ঘোষণা করেন 'The British Empire existed for the welfare of the world'— বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পৃথিবীর কল্যাণের জন্যই রয়েছে।

১৯০৬ খ্রীঃ ট্রান্সভ্যাল (Transval) শহরে একটি আইন পাশ করে তার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয় এবং প্রত্যেক ভারতীয়কে এই সরকারী অনুমোদনপত্র সঙ্গে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গান্ধীজি এই ধরনের অপমানজনক আইনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ সংগঠিত করেন। পরবর্তীকালে এই অহিংস প্রতিরোধই সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত হয়। গান্ধীজি পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গী করে সত্যাগ্রহ শুরু করলে শেতাঙ্গ সরকার ১৮৯৪ খ্রীঃ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট পাশ করে ভারতীয়দের দুর্দশা কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করেন।

১৮৯৩-১৯১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার অর্জনের দাবীতে গান্ধীজির কার্যাবলী তাকে একজন আদর্শবাদী—জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে হিন্দুধর্ম ছাড়াও প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। টলস্টয়ের লেখা 'The Kingdom of God is Within you' গ্রন্থটি গান্ধীজিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। টলস্টয় ফার্ম নামে একটি আশ্রমিক আবাস তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১০ খ্রীঃ টলস্টয়ের মৃত্যু পর্যন্ত গান্ধীজির তার সঙ্গে পত্রালাপ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কারাগারে কাটানোর সময়ে মার্কিন চিন্তাবিদ হেনরি ডেভিড থোরো (Henry David Thoreau (1817-1862) রচিত আইন অমান্য আন্দোলন বিষয়ক (Civil Disobedience,1849) প্রবন্ধ পাঠ করেন। গুজরাটে থাকাকালীনই তিনি প্রচলিত বৈষ্ণব ও জৈনধর্মের মাধ্যমে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করেন। আফ্রিকাতেই গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। সেখানকার হিন্দুদের বিশেষত নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রথম অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শেতাঙ্গদের অসম আচরণ দেখে পশ্চিমী ভাবধারা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তার মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। তবে তখনও তিনি বৃটিশরাজের প্রতি সরাসরি যুদ্ধে যাননি। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পরও তিনি বিনাশর্তে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন। এমনকি আনুগত্যও প্রকাশ করেন। কুড়ি বছর ধরে একটানা সংগ্রামের ফলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপদান করতে সক্ষম হন।

১৯১৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেও তখনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপালকৃষ্ণ গোখলের নির্দেশে ১৯১৩-১৪ গান্ধীজি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে নিজের দেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত হন ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ মে মাসে আমেদাবাদে সবরমতি আশ্রম গঠন করে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ প্রথম পর্যন্ত গান্ধীজি একজন সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু চম্পারণ ও খেদার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

৪.৬.১.৩ ঃ আঞ্চলিক বা স্থানীয় আন্দোলন

চম্পারণ—উত্তর বিহারের তিরহুত ডিভিশনের অন্তর্গত চম্পারণ জেলা। জেলার জনসংখ্যা কম এবং উর্বর কৃষিজমি হওয়ায় গ্রামগুলি ছিল সমৃদ্ধ। চম্পারণে প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই বাস করত। ১৭৯৩ খ্রীঃ চম্পারণ জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। তখন এইসব ছোট রাজারা যাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে বংশপরম্পরায় প্রায় স্বাধীন শাসকের মত নিজ নিজ অঞ্চলে ক্ষমতা ভোগ করতেন তারা বড় জমিদারীর মালিক হয়ে গেলেন। ১৯১৬—১৯১৭ খ্রীঃ বেত্তিয়া, রামনগর ও মধুবন ছিল বড় জমিদারী। তাদের মধ্যে বেত্তিয়ার জমিদারী ছিল সবচেয়ে বড়। দেড় হাজারের বেশী গ্রাম নিয়ে বেতিয়া জমিদারী গঠিত ছিল। বেশিরভাগ গ্রামই ইজারাদাররা ঠিকা নিয়ে পরিচালনা করত। এই ইজারাদারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিলেন ইউরোপীয় নীলকররা। ১৮১৩ খ্রীঃ চম্পারণ জেলায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ পর থেকেই নীলশিল্পের ক্রমশ উন্নতি ঘটে। ১৯১৭ খ্রীঃ গান্ধীজি যখন চম্পারণ জেলায় পৌঁছান তখন চম্পারণ জেলার অর্ধেক ইউরোপীয় নীলকরদের কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় ঠিকাদাররা জোর করে নীলচাষে বাধ্য করত। কিন্তু তারা খাটনির উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না। ফলে কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ গান্ধীজি যখন চম্পারণে যান তিনি বিভিন্ন স্থান ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। গান্ধীজিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। তাদের দুঃখ দুর্দশা রোধ করতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় কৃষকদের সংগঠিত করে গান্ধীজি নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি এখানেই সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। গান্ধীজির আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল তিনকাটিয়া ও অন্যান্য অবৈধ কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা বন্ধ করতে হবে। একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে কৃষকদের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য জেনে তাদের ক্ষোভ দূর করার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তার কারণে তিরহুত ডিভিশন থেকে গান্ধীজিকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিহার সরকার তা অনুমোদন না করায় এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়নি। গান্ধীজিকে বহিষ্কারের খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও বাংলার সমস্ত কাগজে সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এই সময়েই সাধারণ মানুষ তাকে বাপু ও মহাত্মা নামে অভিহিত করেন।

চম্পারণে গান্ধীজি পরিচালিত সত্যাগ্রহ ব্যাপকতর হতে পারে এই আশঙ্কায় গান্ধীজির দাবি মেনে নিয়ে ভারত সরকারের নির্দেশে বিহার সরকার ১৯১৭ খ্রীঃ ১০ই জুন একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। ৩ রা অক্টোবর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট তৈরী হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ চম্পারণ কৃষি আইনে অনুসন্ধান কমিটির প্রধান মুশকিলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গান্ধীজির জন্যই নিপীড়নমূলক তিনকাঠিয়া প্রথার অবসান ঘটে। উচ্চহারে খাজনা আদায় রদ করা হয়। কৃষকদের আরও কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে কৃষকদের সঙ্গে নীলকরদের আপস রক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নীলকরদের সঙ্গে কৃষকদের ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। গান্ধীজির বক্তব্য ছিল চম্পারণের সমস্যাসমূহের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করতে হলে কৃষকদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন এবং উভয়ের বিরোধ মেটাতে নিরন্তর প্রয়াস দরকার। চম্পারণ সত্যাগ্রহের ফলে কৃষকরাও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়। জুডিথ ব্রাউন (Judith Brown) তার "Gandhi's Rise to Power" নামক গ্রন্থে লেখেন-১৯১৭ আগে ভারতবর্ষের সমস্যা গান্ধীজির কাছে ছিল ভাসাভাসা বা তত্ত্বগত। বিহারের কৃষকরাই তাকে ভাবতে শেখায়, সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে। তাই গান্ধীজির জীবনে চম্পারণের গুরুত্ব সর্বাধিক।

গান্ধীজি এরপর আমেদাবাদের সূতাকল শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। জুডিথ ব্রাউন বলেছেন এ পর্যন্ত গুজরাটের রাজনীতিতে তিনি পরিচিত ছিলেন মূলত একজন সমাজসেবী এবং প্রচারক হিসেবে। আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘটে গান্ধীজি নিজস্ব আন্দোলন পদ্ধতির মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেন। শ্রমিকরা তার নির্দেশে অহিংস ধর্মঘট করে (মার্চ ১৯৩৮)। গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। এই ঘটনায় আমেদাবাদ শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ছিলেন গুজরাটের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনায় মিল মালিকরা বিচলিত হন। শেষপর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরী ৩৫% বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি মিল মালিকরা দেবার পর গান্ধীজি অনশন প্রত্যাহার করনে।

চম্পারণ এবং খেদা আন্দোলন ছিল কৃষিজীবি মানুষের সমস্যা নিয়ে। আমেদাবাদে শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে গান্ধীজি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। আমেদাবাদের আন্দোলনের অপর এক গুরুত্ব হল এখানেই গান্ধীজি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনশন ধর্মঘটকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। পরে তিনি এই অস্ত্র বহুবার প্রয়োগ করেছেন এবং সফল হয়েছেন। কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, এ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি দেশের শিল্পমালিকদেরও আস্থা অর্জন করেন।

৪.৬.১.৪ ঃ রাওলাট সত্যাগ্রহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার একদিকে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনের দ্বারা ভারতীয় জনগণকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও গণ-অসন্তোষ দমনের জন্য প্রবর্তন করে রাওলাট আইন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বড়লাটের আইন সচিব সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কতগুলি সুপারিশ করে—

(১) সন্দেহভাজন যে কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার, (২) আটক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী রাখা, (৩) বিশেষ আদালতে তার বিচার, (৪) ঐ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না, (৫) সরকার বিরোধী যে কোন প্রচার দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা।

এই প্রস্তাবগুলি দুটি বিল আকারে সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থিত করে। 'রাওলাট বিল' নামে পরিচিত এই বিলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সমস্ত বেসরকারী সদস্য তীব্র প্রতিবাদ জানান। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং বোম্বাই-এর বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলি বিশেষত, দি ইন্ডিয়ান সোসাল রিফর্মার (The Indian Social Reformer), পাঞ্জাবের দি ট্রিবিউন (The Tribune), বাংলার অমৃতবাজার পত্রিকা (Amrita Bazar Patrika) এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না, মাজাহার উল হক এবং মধ্যপ্রদেশের আইনসভা থেকে বি.ডি. মুকুল পদত্যাগ করেন। তেজবাহাদুর সাপ্রু সরকারের এহেন পদক্ষেপকে নীতিহীনভাবে ভ্রান্ত, অপ্রযোজ্য এবং সামান্যীকরণের দোষে দুষ্ট ("Wrong in Principle, unsound in operation and too sweeping") বলে অভিহিত করেন। এমনকি, ভারতসচিব মন্টেগু তার আপত্তি জানিয়ে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন "পৃথিবীর পেন্টল্যান্ডদের (মাদ্রাজের ছোটলাট পেন্টল্যান্ড অ্যানি বেশান্তকে আটক করার নির্দেশ দেন) বা ও'ডায়ারদের কোন লোককে বিনাবিচারে বন্দীকরার সুবিধা করে দিতে আমি ঘৃণা করি"।

'জাতিরজনক' গান্ধী ব্রিটিশ শাসনকে শয়তানের রাজ্য (Satanic) বলে চিহ্নিত করে রাওলাট বিলকে নির্যাতনের প্রমাণ (evidence of a determined policy of repression) রূপে সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি 'বিল' সম্পর্কিত বিতর্ক প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করেন। আইনসভায় এ সময়ে ভারতীয় সদস্যদের, বিশেষত

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় সরকার কর্ণপাত করেনি। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন—"নিদ্রিত মানুষকে জাগানো যায় কিন্তু যে ঘুমেরভাব করছে, কোন কিছুতেই তার ওপর প্রভাব পড়ে না (You can wake a man only he is really asleep; if he is merely pritending effort will produce no effect upon him")। ১৯১৯ সালের ৯ই-ফেব্রুয়ারী লেখা এক চিঠিতে গান্ধী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে বলেন, "When petitions.....resolution of gigantic mass meeting fail, there are but two courses open......armed rebellion....(or) civil disobedience". এর দিন পনেরো পর, গান্ধী যখন আমেদাবাদে, তার সঙ্গে দেখা করে বি.জি. হোরনিম্যান, শঙ্করলাল বাঙ্কার, উমর শোভানি, সরোজিনী নাইডু, যমুনাদাস দ্বারকাদাস, বল্লভভাই প্যাটেল এবং ইন্দুলাল ইয়াগনিক প্রমুখ রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে তাকে অনুরোধ করেন। ২৩'শে ফেব্রুয়ারী সবরমতি আশ্রমে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থিত ২০ জন নেতা ও নেতৃবর্গের সঙ্গে গান্ধীজি আলোচনায় বসেন এবং তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় রাজি হন। অহিংস পথে অবিচল থাকার জন্য "সত্যাগ্রহ শপথ" নামে এক অঙ্গীকার পত্রে সকলের প্রথমে সই করেন। আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গান্ধীজির নেতৃত্বে একটি সত্যাগ্রহ সভা গঠন করা হয়। বোম্বাই-এ এর সদর কার্যালয় ছিল। প্রচার পত্রিকা প্রকাশ, জনসভা সংগঠন এবং সত্যাগ্রহ শপথনামায় স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। গান্ধী ভাইসরয়কে পত্র দ্বারা সতর্কবাণী পর্যন্ত দেন। কিন্তু কিভাবে আন্দোলন সূচনা করবেন সে সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। এই সময়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে গোপালাচারি-র গৃহে অবস্থানকালে এক রাতে অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় ("The twilight condition between sleep and consciousness----Gandhi") হরতাল পালনের মাধ্যমে আন্দোলন শুরুর কথা তার মানসলোকে উদয় হয়। ইতিমধ্যে ২১শে মার্চ, ১৯১৯ সালে 'ক্রিমিনাল ল এমারজেন্সি পাওয়ারস বিল' পাশ হয়ে যায়। শঙ্কর নায়ার ছাড়া কোন ভারতীয় প্রতিনিধি এতে সম্মতি দেয়নি। এমতাবস্থায় ৩০শে মার্চ শান্তিপূর্ণ হরতাল ও অনশনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ পালনের ডাক দেওয়া হয়। পরে তা পরিবর্তিত করে ৬ই এপ্রিল করা হয়। গান্ধী বলেন "Let the people of India suspend their business on that day (30th April) and observe the day as one of fasting and prayer".

এটি-ই ছিল সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। স্বদেশী আন্দোলনের তুলনায় এর ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশি। ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য সাড়া মেলে অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা, কসুর, আমেদাবাদ, বিরমগাঁও এবং বোম্বাই শহরে। দিল্লী, মুলতান, অমৃতসর এবং লাহোরে পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে মার্চ হরতাল হয়েছিল। দিল্লীতে জনগণের ওপর পুলিশের গুলিতে বহু লোক হতাহত হয়। পাঞ্জাবে যুদ্ধের সময় দমনপীড়ন, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান এবং রোগ-ব্যাধি কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিল। সেখানে পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। অমৃতসর, লাহোর, দিল্লীর পরিস্থিতি বিস্ফোরক আকার ধারণ করায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধীজিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আহ্বান জানান। তাদের আশা ছিল যে গান্ধীজি জনরোষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। গান্ধীজি সেই মতো ৯ই এপ্রিল রাতে দিল্লী ও অমৃতসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু সরকারের আশঙ্কা ছিল যে তার উপস্থিতি অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করবে। তাই দিল্লী থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে সরকার গান্ধীকে পাঞ্জাবে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেয়। তিনি তা অগ্রাহ্য করলে তাকে পালওয়াল স্টেশনে গ্রেপ্তার (১০-ই এপ্রিল) এবং বোম্বাইতে এনে মুক্তি দেওয়া হয়। তার গ্রেপ্তারের সংবাদে বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং গুজরাটের অন্যান্য স্থানে আগুন জ্বলে ওঠে। গান্ধী সেখানে জনগণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও পাঞ্জাবের পরিস্থিতি মর্মান্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। হিংসায় মদত দেওয়ার অপরাধে পাঞ্জাবের জননেতা ডঃ সত্যপাল ও সৈফুদ্দিন কিচলুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১০-ই এপ্রিল। প্রতিবাদে জনগণ মিছিল করলে পুলিশ শোভাযাত্রার

ওপর গুলি চালায় ও কিছু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। অমৃতসরে ক্ষিপ্ত জনতা টাউনহল, পোস্ট অফিসের ওপর আক্রমণ চালায়। টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। আক্রমণ চালানো হয় ইউরোপীয়দের ওপরও।

এহেন অবস্থায় শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল ডায়ার (১২ই এপ্রিল)। তিনি জনসভা, সমাবেশ, নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যদিও তা প্রচারিত হয়নি। ১৯১৯ সালের ১৩-ই এপ্রিল বৈশাখীর দিনে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে প্রায় দশ হাজার মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় যোগ দিতে আসে। এদের অনেকেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল বৈশাখী উৎসবে যোগ দিতে। নিরস্ত্র জনতাকে কোন রকম সতর্ক না করেই ব্রিগেডিয়ার ডায়ার তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। শিশু ও নারী সহ অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। সরকারীভাবে নিহতের সংখ্যা ৩৭৯ এবং আহতের সংখ্যা ১২০০ জন হলেও প্রকৃতপক্ষে সহস্রাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। সান্ধ্য কারফিউ জারি করার ফলে স্থানীয় জনগণ আহত ও নিহতদের কাছে পৌঁছতে পারেনি।

সমগ্র দেশ এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধীজি সরকারকে কাইজার-ই-হিন্দ খেতাব, বুত্তর যুদ্ধ মেডেল ফিরিয়ে দেন। সরকারের নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। অমৃতসর ও পাঞ্জাবের অন্যত্র সামারিক আইন বলবৎ হয়। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত, পায়ে শেকল বেঁধে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো শাস্তি ছাড়াও ইউরোপীয়দের সামনে হামাগুড়ি দেবার মতো মর্যাদা হানিকর কাজ করতে বাধ্য করা হয়। মার্শাল ল কমিশন গঠন করে ৫১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ৪৬ জনকে দ্বিপান্তরিত করা হয়, ২'জনকে ১০ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়, ৮৯ জনকে সাত বছরের জন্য, ১০ জনকে পাঁচ বছরের জন্য ও ১৩ জনকে তিন বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এইরূপ অবস্থায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে গান্ধী ১৮ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

জুডিথ ব্রাউনের মতে রাওলাট সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছিল। (“The Rowlatt Satyagraha .....was a manifest failure”.) আন্দোলন তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। রাওলাট আইন প্রত্যাহৃত হয়নি। গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি। পরে গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছিলেন তার ভুল হয়েছিল (“Himalayan miscalculation”)। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের চাপে সরকার রাওলাট আইন প্রত্যাহার করেনি। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্দোলনের পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ও স্থানীয় সমস্যা কাজ করেছিল, রাজনৈতিক চেতনা বা গান্ধীর আদর্শ নয়। তৎসত্বেও এই আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। রাওলাট সত্যাগ্রহ গান্ধীকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। তৃতীয়ত, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশের নৃশংস মানসিকতাকে প্রমাণ করলো। ফলত নরমপন্থীদের বহু ঘোষিত ব্রিটিশের উদারতা, মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতাঃ স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষকে গান্ধীজি যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আকর্ষণ করতে পারে, রবীন্দ্র কুমারের মতে, তা প্রমাণ হল — (“The Rowlatt Satyagraha vividly illustrates Gandhiji’s ability to drag individuals belonging to different castes, communities and religions into a movement to protest against the British Government”— Ravinder Kumar).

৪.৬.১.৫ ঃ অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত এদেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ না করেই বৃটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল। তৎসত্ত্বেও ভারতীয়রা সরকারকে সমর্থন করে এই আশায় যে যুদ্ধের পর তারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রায় ১২১/২ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে দশ হাজার যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছিল। ভারতীয়রা ৬ কোটি ২১ লক্ষ পাউন্ড সরকারের তহবিলে দান করে। যুদ্ধের পরিণামে ভারতে ঋণের বোঝা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের পর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার ঘোষণা দেশবাসীর আশা পূরণ করেনি। ১৯২০ সালের অমৃতসর কংগ্রেস এই সংস্কারকে প্রয়োজনের তুলনায় কম, অসন্তোষজনক এবং হতাশাজনক (''Unadequate, insatisfactory and disappointing'') বলে মন্তব্য করে।

যুদ্ধের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মূল্যসূচককে ১০০ ধরলে ১৯১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫২। যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পের প্রসার ঘটলেও যুদ্ধের পর মন্দার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৯১৪ সালে ভারতে ৫১০২ মিলিয়ন গজ সূতো বিক্রি হত। ১৯২০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৮৯৯ মিলিয়ন গজ। যুদ্ধের বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি ব্রিটিশপণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশ করে। জাপানী পণ্য সুলভে বিক্রি হতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় শিল্পপতিরা সরকারের কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছিল যুদ্ধের পর তা আর দেখা যায়নি। মহীশূরের দেওয়ান বিশ্বেশ্বরাইয়া ভদ্রাবতী লৌহ প্রকল্প ও কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সরকারের চাপে তাকে পদচ্যুত করা হয়। ভারত-সচিব মর্লির হস্তক্ষেপে এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়। পাউন্ডের তুলনায় টাকার দাম যুদ্ধের বছরগুলি থেকেই হ্রাস পাচ্ছিল। বৃটেন থেকে বিলিতি পণ্য আমদানি তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। গান্ধীজির আন্দোলনে ভারতীয় শিল্পপতিদের একাংশ তাই সাহায্য করে।

শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা ছিল আরও সঙ্গীন। শিল্পে মন্দার ফলে বহু শ্রমিক ছাঁটাই হয়। তাছাড়া যুদ্ধের সময় শিল্পপতিরা লাভবান হলেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তারা আরও বিপাকে পড়ে। ১৯১১ সালে এক জোড়া ধুতির দাম ছিল ১ টাকা ৭৫ পয়সা। ১৯১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ টাকা। আমেদাবাদে ১৯১৪ সালে গমের মূল্যসূচক ছিল ১৬৬। ১৯১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৯। শিল্পপণ্যের দাম যে হারে বেড়েছিল কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সে হারে ঘটেনি। ফলে কৃষকদের অবস্থা ছিল আরও দুর্বিষহ। খাদ্যসংকটের কারণে গ্রামাঞ্চলে দিনমজুররা খাদ্য ও হাটের গোলা লুঠ করে। ১৯১৮-১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার ধারণ করে। সাধারণের মধ্যে এই অসন্তোষ গান্ধী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর অধ্যায়ে ভারতীয় রাজনীতি রাওলাট আইনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য প্রবর্তিত হয় ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (Defence of India Act)। যুদ্ধোত্তরকালে এই ব্যবস্থা রাখার জন্য রাওলাট আইন পাশ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যপী প্রতিবাদের যে ঝড় ওঠে তা অসহযোগ আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রাউলাট আইনকে অসহযোগ আন্দোলনের জনক রূপে চিহ্নিত করেছেন। রাওলাট সত্যাগ্রহ চলাকালে অমৃতসরে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকান্ডে (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯) সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধীজিও ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সমস্ত পদক ফিরিয়ে দেন। পাঞ্জাবে সরকারের দমনপীড়নের তীব্রতায় দেশবাসী অস্থির হয়ে ওঠে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তুরস্কের প্রতি বৃটেনের বিরোধিতা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়াকে নিয়ে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে শক্তিজোট গড়ে উঠেছিল, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল তার বিরোধী। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব পড়ে। বল্কান যুদ্ধের সময় (১৯১২-১৩) ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেন। জাফর আলি খাঁ সম্পাদিত 'জমিদার' পত্রিকায় মুসলমানদের মনোভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মুসলমান সমাজে এই পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। লাহোর থেকে তা প্রকাশ পেত। শিবলী, ইকবাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব উচ্চারিত হয়। মহম্মদ আলি সম্পাদিত ইংরাজী ভাষায় কমরেড এবং উর্দু ভাষায় 'হামদর্দ' পত্রিকা মুসলমানদের এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। কলকাতা থেকে আবুল কালাম আজাদ সম্পাদিত 'আল হিলাল' পত্রিকার নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মুসলিম লীগের রাজভক্ত প্রবীণ নেতৃত্বকে সরিয়ে নতুন এক প্রজন্ম সামনে আসছিল। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তারা মিলিতভাবে আন্দোলনের কথা চিন্তা করে। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মহম্মদ আলি, সৌকত আলি এবং আবুল কালাম আজাদকে সরকার নজরবন্দী করে রাখে। ১৯১৮ সালে সেভরের চুক্তি দ্বারা অটোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ মুসলমানদের মর্মবেদনার কারণ হয়। খলিফার সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি ঘটনাও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উদ্বুদ্ধ করে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, আয়ারল্যান্ডের সিন্‌ফিন্ আন্দোলন, মিশরের জগলুল পাশা এবং তুরস্কে কামাল পাশার আন্দোলন ভারতীয়দের নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রামে ব্রতী হতে উৎসাহিত করেছিল।

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘটনাবলী ভারতে যে রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, তা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তার অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি প্রয়োগে উৎসাহিত করেছিল। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থাশীল গান্ধীর এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও ইংরেজদের সদিচ্ছা ও মহানুভবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ ঘটে। তিনি বলেছিলেন, ''The present representatives of the empire have become dishonest and unscrupulous. They have no real regard for the wishes of the people of India and they count Indian honour as of little consequence. I can no longer retain affection for a Government so evil''.

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। চিত্তরঞ্জন দাস, মহম্মদ আলি জিন্না, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত গান্ধীরই জয় হয়। তার পক্ষে পড়ে ১৮৫৫টি ভোট, বিপক্ষে ৮৭৩ টি। কলকাতার মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী ও মুসলমান সম্প্রদায় তাকে সমর্থন জানায়। গান্ধী স্বরাজের দাবী স্বীকার করে নেন। ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে, অ্যানি বেশান্ত, মালব্য প্রমুখের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর সত্যাগ্রহের লক্ষ্য হিসাবে স্থির হয়— (১) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার (২) খিলাফৎ অন্যায়ের প্রতিবিধান, (৩) স্বরাজ অর্জন, (৪) সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ। গান্ধী সকলকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, তাঁর নির্দেশিত কর্মসূচী অনুসরণ করলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ সম্ভব।

গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল দ্বিবিধ-ইতিবাচক বা গঠনমূলক এবং নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক। গঠনমূলক কর্মসূচীগুলি হল—

(ক) স্বদেশী সূতোর বস্ত্রবয়ন অর্থাৎ চরকা ও তাঁতের ব্যবহার

(খ) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য।

(গ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

(ঘ) জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(ঙ) মাদকদ্রব্য বর্জন।

আর নেতিবাচক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—

(ক) সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করা।

(খ) সরকারি চাকরি ও আইন আদালত বর্জন।

(গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন বয়কট।

(ঘ) সরকারী পদক, খেতাব প্রত্যাখ্যান ও সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন।

(ঙ) বিদেশী পণ্য বর্জন।

(চ) সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন।

অসহযোগ কর্মসূচী গৃহীত হবার পর এই আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে ও তৎপরতায় তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে নিয়ে গান্ধী ভারতের নানা স্থানে সভাসমিতি করে জনমত গঠনে তৎপর হন। আন্দোলনের শুরুতেই ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ও আইনজীবিরা আদালত পরিত্যাগ করে। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯১৯-১৯২০ সালে কলেজগুলিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫২৪৮৬ জন। ১৯২১-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তা কমে দাঁড়ায় ৪৫,৯৩৩ জনে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা ১,২৮১,৮১০ (১৯১৯-১৯২০ খ্রীঃ) থেকে হ্রাস পেয়ে হয় ১,২৩৯,৫২৪। ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে। প্রতিষ্ঠিত আইনজীবিরা আইনব্যবসা ত্যাগ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, জয়াকর, সৈফুদ্দিন কিচলু, বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল নেহেরু, সি. গোপালাচারী প্রমুখ। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১৮০ জন আইনজীবি পদত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে ছিল বাংলা। তারপর যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও পাঞ্জাব। সরকারী আদালত বয়কট করে পঞ্চায়েত ও সালিশী আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলায় এরকম ৮৬৬টি সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ভোটদাতাদের অংশ মাত্র নির্বাচনে অংশ নেয়। তবে সরকারী খেতাব ও চাকরী বর্জনের কর্মসূচী বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। ১৯২১ এর জানুয়ারীর মধ্যে ৫,১৮৬ জন খেতাবধারীর মধ্যে মাত্র ২৪ জন তাদের সরকারী খেতাব পরিত্যাগ করেন। এরমধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত ব্যবসাদার "রায়বাহাদুর" শেঠ যমুনালাল বাজাজ। ১৯২১-সালের মধ্যে ৮৭ জন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের পদ ত্যাগ করেন। তাছাড়া বেশ কিছু মুসলিম পুলিশও পদত্যাগ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন।

বয়কট কর্মসূচীর মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছিল বিদেশী কাপড় বর্জন। ১৯২০-২১ সালে ১০২ কোটি টাকার বিলিতি বস্ত্র আমদানি করা হতো। ১৯২১-২২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৫৭ কোটি টাকা। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, পাউন্ডের তুলনায় টাকার দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা বিলাতী দ্রব্য বয়কটে উৎসাহ লাভ করেছিল।

বয়কটের ফলে দেশী মিলমালিকেরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। স্বেচ্ছাসেবকরা বিলাতী দ্রব্য ও বস্ত্রের দোকানের সামনে পিকেটিং করে। ফলে বিলাতীদ্রব্যের বিক্রয় কম হয়। বিদেশী বস্ত্র বয়কটের এই আন্দোলন সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করে বাংলা মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে। তবে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবসার স্বার্থে বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন নি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, যমুনাদাস ঠাকুরদাস প্রমুখ।

মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন এই সময়ে প্রবল হয়েছিল। ফলে সরকারী আবগারী শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস পায়। সরকার বাধ্য হয় মদ্যপান স্বাস্থ্যকর বলে প্রচার করতে। বিহার ও উড়িষ্যা সরকার মদ্যপানের প্রচারের জন্য ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তি মোজেস, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন, শেক্সপীয়র যারা মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন তাদের তালিকা তৈরী করে প্রচার করেছিলেন। ১৯২১-২২ সালে আবগারি থেকে পঞ্চায়েতের আদায় ৩০ লক্ষ টাকা কমে যায়।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য জাতীয় স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার, খাদি ও চরকার ব্যাপক প্রচার চালায়। কংগ্রেসের বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনের (মার্চ, ১৯২১) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিলক স্বরাজ তহবিল গঠন করে ১ কোটি টাকা সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ ও ২০ লক্ষ চরকা বিলির কর্মসূচি গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৮০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ এবং দিল্লীর জমিয়ামিলিয়া ইসলামিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার ও উড়িষ্যায় শুরু করা হয়েছিল ৪৪২টি প্রতিষ্ঠান, বাংলায় ১৯০টি, বোম্বাই-এ ১৮৯টি ও যুক্তপ্রদেশে ১৩৭টি। আচার্য নরেন্দ্রদেব, জাকির হোসেন, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিরা এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষা বয়কটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বয়কটের এই কর্মসূচীর প্রথমে বিরোধিতা করলেও লাজপৎ রায় পাঞ্জাবে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও বোম্বাইতে এ ব্যাপারে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়, যদিও মাদ্রাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট আন্দোলনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কেবল উত্তর প্রদেশেই ১৩৭টি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ওয়াড়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ কোটি সভ্যসংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা না গেলেও কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষে পৌঁছেছিল। তিলক স্বরাজ তহবিলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এক কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং খাদি জাতীয় আন্দোলনের পোশাকে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাদুরাইতে এক ছাত্রসভায় ভাষণরত অবস্থায় খাদির দাম বেশি বলে অভিযোগ করা হলে গান্ধী স্বল্পবাস পরিধানের উপদেশ দেন। তিনি নিজেও স্বল্পবাস পরিধান করতেন। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারতে এলে গান্ধীর পরামর্শে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। হরতালকে কেন্দ্র করে বোম্বাইতে বয়কট হলে গান্ধী তিনদিন অনশন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

১৯২১ সালের ২৮শে জুলাই বোম্বাইতে সংগঠিত নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন কংগ্রেসের শাখা সমিতিগুলিকে পরবর্তী ৩০শে সেপ্টম্বরের মধ্যে বিদেশী দ্রব্যের সম্পূর্ণ বয়কট সফল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সাথে খদ্দর উৎপাদনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বিদেশীবস্ত্র বয়কটের কর্মসূচী তীব্রভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমালোচিত হয়। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীদ্রব্য বয়কটের কর্মসূচীর সফল রূপায়ন অসম্ভব ছিল। কারণ গান্ধীর প্রস্তাব সমূহ যে কাগজে ছাপা হয়েছিল, তা ছিল বিদেশী, যে মেশিনে ছাপা হয় তাও ছিল বিদেশী, এছাড়া সমস্ত পাক্ষিক বা দৈনিক পত্রিকা সমূহ, এমনকি গান্ধীজির 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাও বিদেশী মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হতো। এমনকি পত্রপত্রিকাগুলি পাঠকের কাছে পৌঁছে

দেবার জন্য যে ডাকটিকিট ব্যবহৃত হতো, তাও বিদেশী যন্ত্রাংশে ছাপা হতো। তাছাড়া সমস্ত দেশ ভারতের শত্রুও ছিলনা। অধিকন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত অপরিহার্য। তাই বিদেশী দ্রব্যের বয়কট কর্মসূচী ছিল এক সভ্যজাতি গোষ্ঠীর কাছে ছিল অসম্ভব ও অনাকাঙ্খিত ("It was impossible and undesirable for a civilised community to boycott all foreign goods''-Ramananda Chattopadhyay) 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ বিদেশী বস্ত্র পোড়াবার বা স্মার্না-র মত দেশে পাঠিয়ে দেবার কংগ্রেসী কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব দেন, বিদেশীবস্ত্র বিদেশে না পাঠিয়ে বা পুড়িয়ে না ফেলে দেশেরই দরিদ্র দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হোক। এই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন সাধারণ মানুষের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেবে বলে তার ধারণা ছিল। কারণ দেশীয় বস্ত্রের দাম বিদেশী মেশিনজাত বস্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া দেশীয় বস্ত্রের সরবরাহও প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। ফলে এই ধরনের কর্মসূচী এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্যের ওপর কশাঘাত স্বরূপ প্রতিভাত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একইরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং তিনিও বয়কট কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

তৎসত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন সমগ্রভারতে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কোলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু, চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রংপুর ও চট্টগ্রামে মুসলিম চাষীরা খাজনা বন্ধ করে। বাংলায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তীদেবী প্রমুখ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। অসমে কনকচন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন প্রসার লাভ করে। পাঞ্জাবে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মোহান্তদের হাত থেকে গুরুদ্বার দখলের আন্দোলন যুক্ত হয়। প্রচণ্ড দমনপীড়নের সম্মুখীন হয়েও আকালিরা অহিংসার নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। উত্তরপ্রদেশে জওহরলাল নেহেরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ নতুন এক প্রজন্মের নেতাদের অবির্ভাব ঘটে।

অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন চটকলে ১৯২০ সালের জুলাই থেকে পরবর্তী ৯ মাসে ১৩৭টি, ১৯২১ এ ১৫০টি এবং ১৯২২ সালে ৯১ টি ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট হয় বার্ণ, জেসপ প্রভৃতি কোম্পানী এবং রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও বরাকরের কয়লা খনিতে। অসমের 'চা' বাগানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। 'বিনা অনুমতিতে 'চা' বাগান ত্যাগী শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে আসাম-বেঙ্গল রেলপথে ও স্টীমারে ধর্মঘট হয়।

৪.৬.১.৬ ঃ সরকারী দমননীতি

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, অসহযোগ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পাশব চরিত্র উদ্ঘাটন করে দেয়। (The non-co-operation movement brought into prominent relief the brute force of the British rule in India.) শুরুতে সরকার আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। নির্যাতনের ফলে জাতীয়তাবাদের সঙ্কল্প আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে বুঝে তারা খিলাফৎপন্থী ও অসহযোগীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। ১৯২১ সালের মে মাসে বড়লাট রীডিং গান্ধীকে বলেন, আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে বক্তৃতায় হিংসার পথ ত্যাগ করতে। এটা ছিল উভয়ের মধ্যে বিরোধ

সৃষ্টির এক প্রয়াস। কিন্তু গান্ধীর অনিচ্ছায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি সরকার কঠোর দমননীতি অনুসরণ করেছিল। কংগ্রেস সেবাদলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এর সদস্যদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশ (২৩শে ডিসেম্বর) ও তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হন। এদের অনুসরণ করে সহস্রাধিক যুবক-যুবতী গ্রেপ্তার বরণ করেন। লাজপৎ রায়কে Seditious Meeting Act-এ গ্রেপ্তার করা হয়। জওহরলাল নেহেরুকে বিদেশী দোকানে পিকেটিং করার ঘোষণা করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় ও ১৮ মাসের জেল দেওয়া হয়। গান্ধী ব্যতীত অধিকাংশ নেতাই প্রেপ্তার হন। পত্রপত্রিকা এবং জনসভা ও সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কংগ্রেস ও খিলাফৎ দপ্তরে মধ্যরাতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অসংখ্য ব্যক্তিকে। উত্তরপ্রদেশে সরকার অসহযোগ আন্দোলনকে বৈপ্লবিক (revolutionary) ও নৈরাজ্যবাদী (anarchical) বলে অভিহিত করে সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রতিআক্রমণে যেতে বলে। সরকারী অফিসারদের ইতিপূর্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে যে বিধিনিষেধ ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য এ 'Reform League ও 'Liberal League' -এ অংশ নিয়ে আন্দোলন বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়। সত্যাগ্রহী ও পিকেটিংকারীদের ওপর লাঠিপ্রয়োগ ও গুলিবর্ষণ স্বভাবিক ঘটনা হয়ে দাড়ায়। বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়।

৪.৬.১.৭ ঃ আন্দোলন প্রত্যাহার

১৯২১ সাল শেষ হবার আগেই গান্ধীজি ছাড়া বাকি সব প্রধান নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি প্রদেশকে কতগুলি শর্তসাপেক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দিয়েছিল। তবে মোপলা বিদ্রোহ ও বোম্বাই দাঙ্গা শুরু হবার পর গান্ধীজি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলেন। তিনি চাইলেন 'মন্থরতার মধ্যদিয়ে গতিবেগ আনতে'। তাই তিনি ঠিক করলেন শহর থেকে আন্দোলনের কেন্দ্র গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে ব্যক্তিগত ও গণঅসহযোগ অন্দোলনের সম্মতি দেওয়া হয়। ১৯২২-এর ১লা ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়ের কাছে গান্ধীজি পাঠালেন তার বিখ্যাত চরমপত্র ঃ বাক্-স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রাথমিক দাবীগুলিকে আদায় করার জন্য কোন অহিংসা উপায় অবলম্বন ছাড়া এ দেশের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই'। গুজরাটের বরদৌলি তালুকে গান্ধীজি অহিংস পথের পরীক্ষায় ব্রতী হবেন বলে ঠিক করেন। গান্ধীজি এই চিঠিতে ঘোষণা করেছিলেন সরকার যদি নাগরিক অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করে এবং বন্দীদের মুক্তি না দেয় তাহলে তিনি গণ আইন অমান্য করতে বাধ্য হবেন। ভাইসরয়ের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকে গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর ডাক দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে দেশের সব অংশের সহযোগিতা চাওয়া হয়।

এই সময়ে চৌরীচৌরা-র ঘটনা গান্ধীকে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে এক বিশাল জনতা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ভগবান আহীরের ওপর পুলিশের বেত্রাঘাত ও অকথ্য নির্যাতনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশের এই বর্বর আচরণের প্রতিবাদে জনতা অহিংসভাবে থানার সামনে জমায়েত হয়। ১৯২২-এর ৫-ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ও খিলাফতীদের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ক্ষিপ্ত জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ কর্মীরা পালাবার চেষ্টা করলে তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে আগুণে ফেলে দেওয়া হয়। বাইশজন পুলিশকর্মী নিহত হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা ডেকে গান্ধী তার মনোবেদনা ব্যক্ত করেন এবং অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১৯২২-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বরদৌলী প্রস্তাব অনুয়ায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণসত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নেয়। এই ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

৪.৬.১.৮ ঃ স্বরাজ্য-দল (১৯২৩-২৭)

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গান্ধীজি কারারুদ্ধ হওয়ায় যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বাভাবিক পথে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় স্বরাজ্য দল।

চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯২৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ, জহরলাল নেহেরু, আজমল খাঁ, সত্যমূর্ত্তি প্রমুখরা কংগ্রেস কর্মপন্থার দাবী পরিবর্তন করেন। অপরদিকে মিঃ রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, কে. আর. আয়েঙ্গার প্রমুখরা এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন। প্রথম গোষ্ঠীটি পরিবর্তনপন্থী এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি পরিবর্তন বিরোধী নামে পরিচিত হয়। জহরলাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখরা প্রস্তাব করেন যে, — (১) অসহযোগ আন্দোলনের নীতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। (২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় আরও বেশী ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। (৩) একমাত্র আইনসভার মাধ্যমেই সরকারের কাজ ও নীতির বিরোধিতা করা সম্ভব। তাছাড়া তাঁরা গান্ধীজি অনুসৃত বিদেশী বস্ত্র, আইন আদালত, স্কুল-কলেজ, উপাধি ও আইনসভা বর্জন এই পাঁচটি নীতিকেই সমর্থন করেননি। কিন্তু রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে পরিবর্তনবিরোধীরা পুরনো কর্মসূচী অনুসরণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে গয়া অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলালের প্রস্তাব গুলো গোঁড়া নেতাদের ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ফলে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল তখন কংগ্রেসের মধ্য থেকেই স্বরাজ্য দল গঠন করেন। অবশ্য ১৯২৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দুই গোষ্ঠীর মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হয়। মৌলানা আজাদ বিশেষ আপোষ প্রস্তাব পেশ করলে তা পরিবর্তন বিরোধীদের সহযোগিতায় গৃহীত হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ গান্ধীজি অসুস্থতার জন্য কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় যে স্বরাজ্য দল আইন সভার কার্যকলাপ পরিচালনা করবে আর কংগ্রেসকর্মীরা গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকবে। ১৯২৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও-এ যে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সমঝোতাসূত্র গৃহীত হয় ও জাতীয় কংগ্রেস স্বরাজ্য দলকে নিজস্ব কর্মসূচী রূপায়ণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়।

পরিবর্তনপন্থীরা স্বরাজ্য দল গঠনের জন্য কতগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেন। (১) আইনসভাই একমাত্র বক্তব্য প্রকাশের জায়গা হিসেবে গৃহীত হবে। (২) সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক নীতিগুলি বিরোধিতার জন্য আইন সভাতে বিভিন্ন প্রস্তাব আনা যাবে। (৩) আইনসভায় সরকারের সমালোচনার ফলে জনগণ রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। (৪) সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া যাবে ও দ্বৈতশাসনকে অকার্যকর করা সম্ভব হবে।

৪.৬.১.৯ ঃ স্বরাজ্য দলের নীতি ও কর্মসূচী

১৯২৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এলাহাবাদের স্বরাজ্যদলের যে প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতেই দলের গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য, নীতি ও আন্দোলনের রূপরেখা রচিত হয়। স্বরাজ্য দলটির প্রধান প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে ছিল (ক) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্জন (খ) আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ও নির্বাচনে জয়ী হয়ে আইনসভার ভিতর থেকেই সরকারের কাজে বাধাদান করা। (গ) সরকারী বাজেট প্রত্যাখ্যান করা, (ঙ) নানরকম ভাবে জাতীয়তাবাদীদের অগ্রগতিতে সাহায্য করা, (চ) সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতিগ্রহণ করা, (ছ) সংবিধান রাখার অধিকার। এই কার্যাবলীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ খ্রীঃ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকে অকার্যকর করাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য। স্বরাজ্যদলের নেতা মূলত কংগ্রেসী হলেও তারা গান্ধীজির সঙ্গে মতৈক্যয় আসতে পারেননি বেশ কিছু বিষয়ে।

৪.৬.১.১০ ঃ কার্যাবলী

১৯২২ খ্রীঃ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নির্বাচনে স্বরাজ্য দল অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণিত হয়। মতিলাল নেহেরু বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান। এছাড়াও স্বরাজ্যদল মধ্যপ্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, বাংলাদেশে গরিষ্ঠতা এবং উত্তরপ্রদেশ ও আসামে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল সংখ্যাগরিষ্ঠা অর্জন করে ও দলনেতা চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়রপদে নির্বাচিত হন।

স্বরাজ্য দলের আন্দোলনের ফলেই ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দেওয়ার জন্য সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন বৃটিশ সরকার। রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও স্বরাজ্য দলের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। স্বরাজ্যদলের বাধার ফলেই বাংলায় নতুন আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতশাসন ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯২৬ খ্রীঃ ১৩ই জুন থেকে ১৯২৭খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলায় দ্বৈতশাসন স্থগিত হয়ে যায়। স্বরাজ্য দলের জনপ্রিয়তা রোখার জন্যই বৃটিশ সরকার গান্ধীজিকে ১৯২৪ খ্রীঃ মুক্তি দেন। ১৯২৫ খ্রীঃ দার্জিলিঙের বাড়িতে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলে স্বরাজ্যদলের পতন ঘটে। **ব্যর্থতার কারণ**— চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্যাটেল সকলেই কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলের উত্থান ও পতন খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ঘটে। প্রধানত চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতেই এই দলের পতন হয়। কারণ চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ গণসংগঠনের ক্ষমতা, তার ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমই স্বরাজ্য দলকে জাতীয় রাজনীতিতে তুলে আনতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া দলের অন্যান্য নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন শাসমল ও তুলসী গোস্বামী এই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এছাড়াও স্বরাজ্য দল বিত্তবান ভারতীয়দের প্রতিনিধি ছিল। বৃটিশদের সঙ্গে তারা অনেক সময় আপোষও করতেন। ফলে গণসংযোগ ও গণসমর্থন হারান।

৪.৬.১.১১ ঃ অবদান

বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের রাজনীতি ও জাতীয় দলের আন্দোলনে স্বরাজ্য দলের অবদান অনস্বীকার্য, কারণ গান্ধীজি যে সময় আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন সেই সময় স্বরাজ্য দলের প্রাণবন্ত কর্মসূচী সাধারণের সামনে আশার আলো জাগিয়েছিল। তারাই প্রথম জনগণের মনে পরিষদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করে। সরকারী কাজে স্বরাজ্য দলের বিরোধিতার জন্যই বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন। স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপই বুঝিয়ে দেয় ভারতে দ্বৈতশাসন অচল।

৪.৬.১.১২ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান

(২) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭

(৩) Judith Brown –Gandhi’s Rise to power

(৪) G. Tendulkar– Mahatma Vol, I, II

(৫) Sumit Sarkar–Modern India

(৬) Bipan Chandra–India’s Struggle for Independence

(৭) P.C. Bamford–History of the Non-cooperation and khilafat Movement

৪.৬.১.১৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির উত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

(২) আঞ্চলিক বা স্থানীয় আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা আলোচনা কর।

(৩) রাওলাট আইন কিভাবে গান্ধীবাদী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল?

(৪) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ও সাফল্য-ব্যর্থতা আলোচনা কর।

(৫) গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে কেন খিলাফৎ আন্দোলনকে সংযুক্ত করেছিলেন?

(৬) স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

ভারতীয় রাজনীতিতে এই দলের অবদান কি ?

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

GANDHIAN MOVEMENT AND LEFT MOVEMENT

একক - ৩

আইন অমান্য আন্দোলন
ও
ভারত ছাড়ো আন্দোলন

গঠন (Structure) ঃ

৪.৬.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৬.৩.১ ঃ আইন অমান্য আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট

৪.৬.৩.২ ঃ গান্ধী-আরউইন চুক্তি

৪.৬.৩.৩ ঃ আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

৪.৬.৩.৪ ঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলন

৪.৬.৩.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৬.৩.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৬.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

(২) গান্ধী-আরউইন চুক্তি

(৩) আইন অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

(৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

(৫) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপ্তি

(৬) এই আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা

৪.৬.৩.১ ঃ আইন অমান্য আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট

আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিকা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। ১৯২০-র দশক থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৯৩০ এর মধ্যেই তা মর্মান্তিক অবস্থা গ্রহণ করে। বৃটিশ সরকারের আমদানি নীতি, শুল্কনীতি কোন কিছুই ভারতীয় শিল্পপতিদের পছন্দ ছিল না। এমনকি পাউন্ডের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার জন্যেও তারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিও ভারতবাসীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে নতুনভাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময়েই রাজস্বের হারও যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এজন্য পশ্চিমভারতে কৃষকদের অবস্থার অবনতি হয়। তাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে। অন্ধ্রের গোদাবরী জেলায় আল্লুবি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে রম্পা উপজাতি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও ভূমিবন্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিদ্রোহ করেন। পুলিশ বিদ্রোহীদের নির্বিচারে হত্যা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পমালিকেরা মাল বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা বাড়ালেও শ্রমিকদের কোন মজুরি বাড়েনি। তাদের কোনও আর্থিক নিরাপত্তাও ছিল না। ১৯২৪ খ্রীঃ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে বোনাসের দাবীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলে সরকার বস্ত্রশিল্পের ওপর $৩\frac{১}{২}\%$ শুল্ক হ্রাস করলে মালিকরা সেই অর্থ শ্রমিকদের বোনাস হিসেবে দেয়। ১৯২৮ খ্রীঃ গিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে টানা ছয় মাস ধর্মঘট চলে। ধর্মঘট চলাকালীন ১৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সরকার এই ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করার জন্য কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতাদের দমনের উদ্দেশ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৯ খ্রীঃ বহু নেতাকে দণ্ডিত করেন। সরকার যাতে বাড়তি শুল্ক রদ করেন তার জন্য বারদৌলীতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দাতে ভারতীয়রা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতের মধ্যবিত্ত কৃষক ও শ্রমিকের দুর্দশার সীমা ছিল না। ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ আর্থিক মন্দায় ধানের দাম শতকরা ১০০ ভাগ থেকে শতকরা ৪৬.৯ ভাগে নেমে যায়। পাটের দামও শতকরা ১০০ ভাগ থেকে শতকরা ৪৩.৫ ভাগে নেমে আসে। এর ফলে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা বেড়েই চলে। মন্দার দরুন কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। ভূমিহীন মজুররা বেকার হয়ে পড়ে। সরকার ভারতীয়দের এই দুর্দশার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে হোমচার্জ, ভারতে মূলধন লগ্নীর মুনাফা, ব্যাঙ্কের মুনাফা, রয়্যালটি প্রভৃতি খাতে পাওয়া প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ ভারত থেকে নিজদেশে নিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি বাজেটে ঘাটতি দেখা গেলে তাও আদায় করা হত ভারতবাসীর

ওপর দিয়েই। বৃটিশ সরকারের এই শোষণ নীতি ও ভারতবাসীর আর্থিক দুর্দশার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসী স্বায়ত্ত্ব শাসন পেতে পারে কিন্তু সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন নিযুক্ত করেন। সাইমন কমিশনই ভারতীয়দের স্বদেশীবোধকে জাগ্রত করে। প্রথমত কোন ভারতীয় এই কমিশনের সদস্য ছিল না। তাই কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলি আশঙ্কা করে যে কমিশনের রায় কখনো পুরোপুরি ভারতীয়দের অনুকূলে যাবে না। দ্বিতীয়ত কোন ভারতীয় এই কমিশনের সদস্য না হওয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়দের অপমান করা হয়। তৃতীয়ত ভারতবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী জানিয়ে আসছিল। ইংলন্ডের রক্ষণশীল সরকার এই দাবী পূরণের পূর্বে সাইমন কমিশন দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করে যে ভারতীয়রা স্বায়ত্ত্বশাসন লাভের যোগ্য কিনা। ফলে ভারতীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সকল দলই সাইমন কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের সর্বত্র সাইমন কমিশনকে 'go back' ধ্বনি দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন প্রধানত ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়। এই উপলক্ষ্যে ভারতের বামপন্থী ছাত্র স্টুডেন্টস ফেডারেশনের জন্ম হয়। গান্ধীজি বুঝতে পারেন অবিলম্বে কোন বৃহত্তর আন্দোলন শুরু না করলে আপোষ বিরোধী যুবক নেতারা (জহরলাল, সুভাষ প্রভৃতি) ও কিষাণ ও শ্রমিক নেতারা হয়ত কংগ্রেস ছেড়ে স্বাধীনভাবে আন্দোলন শুরু করবেন। যদি এই নেতারা আন্দোলন শুরু করে তাহলে তা অহিংসপন্থী নাও হতে পারে। এবং এই যুবকনেতারা আন্দোলনে না থাকলে আন্দোলন বিশেষত কংগ্রেসীদের আন্দোলন একেবারেই অক্ষম প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হবে।

ভারতীয়রা এই সময় সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিলে ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল দলের ভারতসচিব লর্ড বাকেনহেড ভারতবাসীদের এই উদ্যোগ নস্যাৎ করে দেন। কিন্তু ভারতীয়রা তার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অপমানজনক আখ্যা দেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর উদ্যোগে ও মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে গঠিত একটি সর্বদলীয় কমিটি একটি খসড়া সংবিধান রচনার ভার নেন। ১৯২৮ খ্রীঃ নেহেরু রিপোর্ট বা সংবিধান তৈরী হয়। ডোমিনিয়ান স্টেটাস অর্থাৎ বৃটিশ ডোমিনিয়ান বা সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে ভারতবাসীর নিজস্ব সাংবিধানিক স্বায়ত্ত্ব শাসন লাভকেই সংবিধানের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়। মুসলিমরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করে। শুধু যে প্রদেশে তারা সংখ্যালঘু আইনসভায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সিন্ধুপ্রদেশকে পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাব রাখা হয়।

১৯২৮ খ্রীঃ কলকাতায় যে সর্বদলীয় সম্মেলন শুরু হয় তাতে নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণের জন্য আলোচনা আরম্ভ হলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ সেই সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১/৩ আসন সংরক্ষণ বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিমদের সংখ্যার ভিত্তিতে আসনবন্টন, সিন্ধুপ্রদেশ গঠনের জন্য দাবী উত্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি কেন্দ্রের ক্ষমতা কমিয়ে প্রদেশের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্যও নতুন দাবী পেশ করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভাপন্থী এম.আর. জয়াকর জিন্নাহর এই দাবী বিরোধিতা করেন। ফলে নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয়নি। জিন্নাহ এবার কট্টর লীগপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন।

১৯২৮ খ্রীঃ সর্বদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হয়। এরপর জাতীয় কংগ্রেস ডোমিনিয়ান স্টেটাস দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। কংগ্রেসের মডারেট নেতারা অবশ্য তখনও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেননি। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যুব বাম শক্তির উদ্ভব হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের ভেতরও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কেও মতভেদ দেখা দেয়। সুভাষ ও নেহেরু পূর্ণ স্বরাজকেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। মুসলিম নেতারাও অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবেননি। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীঃ কানপুরে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে মুসলিম নারীরা পর্দার ভেতর থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানালে মুসলিম পুরুষরাও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। ১৯২৮ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে ১০ হাজার শ্রমিক শোভাযাত্রা করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। মহাত্মা গান্ধীও এই ধরনের পরিস্থিতিতে হতচকিত হয়ে যান। তার মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে যদি একবছরের মধ্যে বৃটিশ সরকার নেহেরু রিপোর্ট অনুযায়ী ডোমিনিয়ান স্টেটাস ভারতবাসীকে দেন তবে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবে নচেৎ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গ্রহণ করবে। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীঃ বিপ্লবী ভগৎ সিং ও অন্যান্য রাজবন্দীরা জেলে রাজবন্দীদের প্রতি কদর্য ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ করলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা জনসমাজে আলোড়ন তোলে। শেষ পর্যন্ত ভগৎ সিং অনশন ত্যাগ করলেও বিপ্লবী যতীন দাশ ৬৩ দিন অনশনে থেকে লাহোর জেলে প্রাণত্যাগ করলে সারা ভারতের যুবসমাজ উদ্বেল হয়ে ওঠে।

বড়লাট লর্ড আরউইন অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ১৯২৯ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণার দ্বারা ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দানের প্রতিশ্রুতি দিলে সাধারণ মানুষ গভীর আশায় বুক বাধেন। কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দল এজন্য বড়লাটের তীব্র সমালোচনা করায় লর্ড আরউইন তার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গেন। ডোমিনিয়ান স্টেটাস দানের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষিত একবছরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে এবং সরকার কোন সংস্কার দান না করায় কংগ্রেসের পক্ষে ১৯২৯ খ্রীঃ সক্রিয় আন্দোলনে নেমে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। এদিকে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে লালা লাজপৎ রায় লাঠির আঘাতে আহত হন। সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য কংগ্রেসের রক্ষণশীলরাও পূর্ণস্বরাজের পক্ষে সওয়াল শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রীঃ লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ দাবীকেই কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। জওহরলাল লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন। আন্দোলন পরিচালনার কর্মসূচী রচনার দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই কমিটিতে অবশ্য সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হলে কংগ্রেস গণ আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯২৯ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেস সভাপতি ইরাবতী তীরে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে আন্দোলনের সূচনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার প্রাথমিক বাধাবিপত্তি পার হয়ে পূর্ণস্বরাজের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজির নির্দেশেই ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে যতদিন না স্বাধীনতা লাভ হয় ২৬শে জানুয়ারী জাতি তা উচ্চারণ করে শপথ নেয়।

মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য সরকারী আইনগুলিকে অহিংসভাবে ভেঙে ফেলার জন্য জনগণকে ডাক দেন। তবে আইন অমান্য সম্পর্কে কোন নেতারই কোন ধারণা ছিল না। গান্ধীজি সাধারণকে সম্যক ধারণা দেবার জন্যই লবণ তৈরী করে আইন অমান্য করেন। লবণ আইন ভঙ্গ ছিল একটি প্রতীকি আন্দোলন মাত্র। কারণ লবণের জন্য বৃটিশ সরকারকে কর দিতে হত। অথচ শতকরা ৭০ ভাগ কৃষকই এত দরিদ্র যে, তারা শুধুমাত্র লবণ দিয়েই ভাত খায়। লবণ আইন ভেঙ্গে দেশের মাটি ও জল থেকে লবণ ছেঁকে লবণ তৈরী করলে সাধারণ দেশবাসীর সাড়া পাওয়া যাবে বলে গান্ধীজি বুঝেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে দুই শত মাইল পদযাত্রা করে গুজরাটের ডান্ডি নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যাত্রা করেন। এই ঘটনাকে 'ডান্ডি অভিযান' বলা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ৬ ই এপ্রিল ডান্ডিতে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন।

মহাত্মা শীর্ণ শরীরে সন্ত-সুলভ আচরণে ভারতীয় কৃষকদের প্রতিনিধি হিসেবে অর্ধনগ্ন গাত্রে লাঠির ওপর ভর করে ডান্ডি পর্যন্ত যে যাত্রা করেন তা ভারতের আপামর জনসাধারণকে আলোড়িত করে। গান্ধীজি চরকায় সুতা কাটা ও বিলিতী মালের দোকানে পিকেটিংয়ে যোগ দিতে বলেন। মহিলারা দলে দলে এগিয়ে আসেন ও কারাবরণ করেন। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রায়তওয়ারি এলাকায় সরকারী খাজনা বন্ধ ও জমিদারী এলাকায় খাজনা ও চৌকিদারী কর প্রদান রদ ঘোষণা করে। মধ্যপ্রদেশে অরণ্য আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পর আইন অমান্য আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচল ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং চলে। গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় লবণ আইন আন্দোলন। তামিলনাড়ুতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। মালাবারে লবণ আইন পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন কে. কোলাপ্পান। আসামের শ্রীহট্ট থেকে সত্যাগ্রহীরা পায়ে হেঁটে বাংলার নোয়াখালির সমুদ্রোপকূলের কাছে লবণ আইন অমান্য করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে লবণ সত্যাগ্রহ করা হয়। লবণ আইন অমান্য করার জন্য ১৪ই এপ্রিল জহরলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ্যে পাঠ করে আইনভঙ্গ করেন। মহিষবাথানে লবণ আইন অমান্য করা হয়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারে সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আবদুল গফফর খান ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যোগদানের পর গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ও প্রতিষ্ঠা করেন খোদাই খিদমদগার বা লালকুর্তা। এই সংগঠনটি অহিংস আন্দোলনে যোগ দেয়। এদের কার্যকলাপে পেশোয়ার এক সপ্তাহের বেশি সময়কাল পর্যন্ত জনতার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। শঙ্কিত বৃটিশ সরকার সীমান্তগান্ধীকে গ্রেপ্তার করলে পেশোয়ারে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেলের দুদল পদাতিক সৈন্যদের যখন হুকুম দেওয়া হয় খোদাই খিদমদগারদের ওপর গুলি চালাতে তখন তারা গুলি না করে সীমান্ত গান্ধীর অনুচরদের সঙ্গে মিশে যান। পরে এই কাজের জন্য অধিকাংশ সেনাকে গুলি করা হয়। নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়।

দিল্লীতে প্রায় দেড় হাজার নরনারী কারাবরণ করেন। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা, পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জ, বেরারে কৃষকরা খাজনা প্রদানে বিরত থাকেন।

মহাত্মা গান্ধী এরপর মনস্থ করেন যে ২৮শে এপ্রিল সরকারি লবণগোলা দখলের জন্য ধারসানায় অহিংস অভিযান করবেন। এই সত্যাগ্রহ বন্ধ করার জন্য লর্ড আরউইন গান্ধীকে ৫ই মে গ্রেপ্তার করেন। এরপর ধারসানায় নেতৃত্ব দেন শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হলে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে ক্রুদ্ধ জনতা, থানা, আদালত, সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। কয়েকদিনের জন্য শোলাপুর কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অধীনে চলে যায়।

কলকাতা, মেদিনীপুর, হুগলী, বালুরঘাট, বিক্রমপুরে ব্যাপক পিকেটিং চলে। চৌকিদার, দফাদার ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করলে তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সুতাহাটার কুমারচন্দ্র দাস, বর্ধমানে যাদবেন্দ্র পাঁজা, আরামবাগে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রফুল্ল সেন আরামবাগের গান্ধী নামে সুখ্যাত হন। উত্তরপ্রদেশে খাজনা পীড়িত কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাজনা বন্ধ ও আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। আগ্রা ও রায়বেরিলীতে খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলে। বিহারের চম্পারণ, সারণ, মুঙ্গেরে বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং চলে। উড়িষ্যায় গোপবন্ধু চৌধুরীর পরিচালনায় বালাসোর, কটক ও পুরী জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ খুবই কার্যকর হয়।

৪.৬.৩.২ ঃ গান্ধী-আরউইন চুক্তি

১৯৩০ খ্রীঃ মধ্যভাগে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পাবার পর ইংরেজ সরকার ভারতের শাসনসংস্কার আলোচনার জন্য প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে অংশ নিলেও কংগ্রেস তা বয়কট করে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ভারতবর্ষ সম্পর্কিত কোন আলোচনা সফল হবে না বুঝে পরবর্তী বৈঠকে যাতে কংগ্রেস যোগদান করে সেজন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভাইসরয় লর্ড আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী হন। এমতাবস্থায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে তেজবাহাদুর সাপ্রু, জয়াকর প্রমুখ নেতারা গান্ধীজিকে বোঝান যে গোলটেবিল বৈঠকেই অংশ নিলে সুফল মিলবে। দিল্লীতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে ভাইসরয়ের আলোচনা চলে। ৫ই মার্চ স্বাক্ষরিত হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এতে বলা হয় (১) কংগ্রেস আপাততঃ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবে। (২) এছাড়াও কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করবে। (৩) সরকার আইন অমান্যকারী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়। (৪) লবণ সত্যাগ্রহকে আইনসঙ্গত বলে সরকার মেনে নেয়। (৫) যে সব জরিমানা তখনও আদায় হয়নি সেগুলি মুকুব করতে হবে। (৬) বাজেয়াপ্ত করা জমি যা তখনও বিক্রি হয়নি সেগুলি ফেরত দিতে হবে। (৭) পদচ্যুত সরকারী কর্মীদের প্রতি ক্ষমাশীল মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। (৮) শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করার অধিকারও সরকার অনুমোদন করে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি দেশে বিজাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব কার্যকর না হওয়া এবং বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেওর মৃত্যুর আদেশ ও কংগ্রেসের এই পশ্চাদপসারণে জনসাধারণ, বিশেষত; যুবসম্প্রদায়, গান্ধীজির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। এই চুক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতা, ভারতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার নিদর্শন এবং গান্ধীর নতিস্বীকারের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষোভ এতই তীব্র ছিল যে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে যাওয়ার পথে গান্ধীজিকে কালো পতাকা দেখানো হয়।

গান্ধীজির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন— এই আন্দোলনের তিনটি দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ ১৯৩০ এর শরৎকালের পর শহরাঞ্চলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। যদিও তা গ্রামাঞ্চলে প্রবল হয়। দ্বিতীয়তঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বাইরে মুসলিমরা কখনই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তৃতীয়তঃ ১৯২৭ ও ১৯২৮-এ শ্রমিক আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করলেও ঠিক আন্দোলনের সময় ১৯৩০-৩১ তা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। অধ্যাপক বিপানচন্দ্র মনে করেন গান্ধী- আরউইন চুক্তির আগেই আন্দোলনে ভাঁটার টান দেখা যাচ্ছিল। সরকারের দমননীতি এর জন্য কিছুটা দায়ী। বণিক এবং শিল্পপতিরাও আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল বৃটিশ সরকার তা উপেক্ষা করতে পারেনি। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যে ভারতের শাসনসংস্কার সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না, গান্ধী-আরউইন চুক্তির মাধ্যমে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এতে কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জেল ফেরৎ রাজবন্দীরা বীরের স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তর প্রদেশের কৃষকদের বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করে খাজনা দানের নির্দেশ পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পশ্চাদপসারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু অমলেশ

ত্রিপাঠীর মতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে গান্ধীজি এ বিষয়ে কোনও জেদ করেননি। আইন অমান্য অন্দোলন চলাকালে গুজরাটে সত্যাগ্রহীদের যেসব জমি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল কংগ্রেস সরকার ১৯৩৭ সালে সে রাজ্যে সরকার গঠনের পর সেগুলি প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেয়। সবমিলিয়ে অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিলে কংগ্রেস জাতীয় ভূমিকা পালন করত না। বৈঠক প্রত্যাখ্যান করলে ভারত বৈদেশিক সহানুভূতি হারাত।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি। সরোজিনী নাইডু ভারতীয় নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। গোলটেবিল বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী, রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি ও সরকারের অনুগত সম্প্রদায়। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ বৈঠকে গান্ধী দাবী করেন যে কেন্দ্র ও প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে দায়িত্বশীল সরকার। এক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার কোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কিন্তু বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তীব্র আকার নেয়। 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' ও 'সংখ্যালঘু' সমস্যা বিষয় দুটিকে কেন্দ্র করে প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা যায়। মুসলিমরা হিন্দু প্রাধান্যের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা ডোমিনিয়ান স্টেটাসের দাবীও অস্বীকার করে। গান্ধীজি চেষ্টা করেও সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। এহেন অবস্থায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের যে প্রস্তাব দেন সদস্যরা তা মানতে অস্বীকার করেন। গোলটেবিল বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হয়। গান্ধীজি শূন্য হাতে দেশে ফেরেন।

ইতিমধ্যে লর্ড উইলিংডন ভারতের পরবর্তী ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন (১৯৩১-৩৬)। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দমনমূলক অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নিতে ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর গান্ধীজি ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করেন। কিন্তু সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন হয় না । কংগ্রেস নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। গান্ধীজি ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে, সরকার দমন নীতি পরিহার করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর জন্য কংগ্রেসকে যদি আলোচনার সুযোগ দেয় এবং স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে তবেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। অন্যথা কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলনও শুরু করবে। এইভাবে ১৯৩১ এর ২৯ শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩২ এর ৩ রা জানুয়ারী পর্যন্ত গান্ধীজি ও ভাইসরয় পত্রালাপ চলে। ৪ঠা জানুয়ারী সরকার চারটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করে। গান্ধীজিসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি ও গুলি চালনা করা হয়। জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাও কম ঘটেনি। ১৯৩২ থেকেই ভারতে ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য অন্দোলন শুরু হওয়ার চার মাসের মধ্যেই ৮০,০০০ ব্যক্তির কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ এর মার্চ মাসের শেষে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,২০,০০০। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সাহায্য গ্রহণ করে সরকার আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করেন। ১৯৩২ সালে 'সাম্প্রদায়িক পুণা চুক্তি বাঁটোয়ারার প্রস্তাব' ঘোষণার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে ভেদ টানার চেষ্টা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, মুসলিম, শিখ এবং ইউরোপীয় নির্বাচকরা আইনসভার নির্বাচনে সম্প্রদায়গতভাবে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করবে এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ভোট দেবে। অনুন্নত সংরক্ষিত আসনে কেবল মুসলিম নির্বাচকরাই নির্বাচিত হবে। শিখদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী হতে এবং অন্যান্য ভোটারদের মত ভোট দিতে পারবে। যে সব অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে। এই সমস্ত সংরক্ষিত কেন্দ্রে অনুন্নত শ্রেণীর প্রার্থীরা কেবল তাদের সম্প্রদায় নির্বাচকদের ভোটে নির্বাচিত হবে। এই নির্বাচকরা সংরক্ষিত কেন্দ্রে ভোটদানের যেমন অধিকারী সেরকম সাধারণ কেন্দ্রের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ কিনা তারা দুবার ভোট দিতে পারবে।

গান্ধীজি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ স্বরূপ ইয়ারওয়াদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত দলিত নেতা বি.আর. আম্বেদকর জেলে তার সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনার ফলে উভয় নেতার মধ্যে পুণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন। হিন্দুদের একত্রে বেঁধে ফেলার নীতি গৃহীত হলেও তপশীলি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধাগুলি এই চুক্তিতে দ্বিগুনিত হয়।

১৯৩৩ সালের মে মাসে গান্ধীজি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর আগে তিনি জেলের ভেতর হরিজনদের মঙ্গলের জন্য অনশনও করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে তিনি গণ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। গান্ধীজি স্বয়ং ঐ বছরের ১লা আগস্ট অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ১৬ই আগস্ট সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। ১৬ ই আগস্ট গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২৩শে আগস্ট তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করেন। সক্রিয় রাজনীতি থেকে এই সময় অবসর নিয়ে গান্ধীজি হরিজন উন্নয়ন ও সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিহারে ব্যাপক ভূমিকম্পের (জানুয়ারী ১৯৩৪) পরিপ্রেক্ষিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ মে মাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি দলের বাইরে থাকলেও তার উপদেশ থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি কংগ্রেস দল।

৪.৬.৩.৩ ঃ আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

আইন অমান্য আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়েছিল এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বি. আর টমলিনসন মনে করেন যে কংগ্রেস নৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই আন্দোলন পরিচালনার উপযুক্ত ছিল না। জুডিথ ব্রাউনের মতে কংগ্রেস কোন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী ছাড়াই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিল। গান্ধীজি নিজেই কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের আগে গান্ধীজি বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন সত্যাগ্রহী জীবিত থাকবেন ততদিন আইন অমান্য চলবে। অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—কিন্তু দেখা গেল সৈনিকরা সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত অথচ সেনানায়ক যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। সুমিত সরকার লিখেছেন গান্ধীর মনোভাবে কেন যে পরিবর্তন হল তা এক ঐতিহাসিক প্রহেলিকা।

অসহযোগ আন্দোলন জাতীয়তাবাদে অভিষিক্ত থাকলেও আইন অমান্য আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা পায়নি। মুসলিম সম্প্রদায় ও কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। মালব্য সর্বদলীয় সভার পক্ষপাতী ছিলেন। অ্যানি বেশান্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

অবশ্য সরকারের দমননীতি এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়। বহু সংখ্যক মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। এমন কি খবরের কাগজে কোন রকম কংগ্রেসী প্রচার নিষিদ্ধ হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় টাকাকড়ির প্রচণ্ড টানাটানি শুরু হয়। আমেদাবাদের শিল্পপতি দেশপাণ্ডে জোগলেকার, রণদিভে প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং গিরনি কামগার ইউনিয়নের নেতৃত্ব এই আন্দোলন থেকে দূরে সরেছিলেন। এছাড়াও সংহতির অভাব ছিল যথেষ্ট, — হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলিম ও নমঃশূদ্রদের বিরোধ এবং মালাবারে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এই আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। **গুরুত্ব** — এই আন্দোলনই সর্বপ্রথম ভারতীয়দের সমস্যার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আর সহানুভূতি আকর্ষণ করে। ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়।

এই আন্দোলন বৃটিশ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন ১৯২৯ খ্রীঃ ২৬০ লক্ষ পাউন্ডে মূল্যের কাপড় ইংল্যান্ড থেকে ভারতে রপ্তানী হত কিন্তু ১৯৩০ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ১৩৭ লক্ষ পাউন্ডে। ইংল্যান্ডে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এই অসন্তোষ থেকেই জন্ম নেয় অখিল ভারতীয় কিষাণ সভা। কৃষকরাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে, সত্যাগ্রহীদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও গান্ধীজির প্রতি জনগণের আস্থায় ফাটল ধরেনি। কংগ্রেসও শক্তি না হারিয়ে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতীয়দের বিপ্লবী মন সুদৃঢ় হয়।

৪.৬.৩.৪ ঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃটিশ সরকারের ভিতকেও নড়িয়ে দিয়েছিল। স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপসে্র মিশন ব্যর্থ হলে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সব রকমের সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যা ভারতবাসীর মনে প্রবল হতাশা ও নিরাশার জন্ম দেয়। অন্যদিকে ১৯৪২ খ্রীঃ প্রথম থেকেই জাপান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অগ্রসর হতে থাকে এবং তারা মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নেয়। এই উভয়সংকট পরিস্থিতিতে গান্ধীজির মনে হয় ভারতের হয়ে শেষ কথা বলার অধিকারী হবে ভারতীয়রাই। কিন্তু তা নিয়েও কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। জাপানী আক্রমণের মোকাবিলার জন্য ভারতবাসীর শক্তিকে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে আহ্বান করেন জহওরলাল নেহেরু ও মৌলানা আজাদ। অন্যদিকে গান্ধীজি, সর্দার প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ জাপানীদের স্বপক্ষে ছিলেন। এই অবস্থায় ২৯শে এপ্রিল ১৯৪২ গান্ধীজি **হরিজন** পত্রিকায় বৃটিশ সরকারকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে হরিজন পত্রিকায় একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে গান্ধীজির এই প্রস্তাবে ভারতীয় নেতাদের অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হন। তা লক্ষ্য করে গান্ধীজি প্রস্তাব দেন যে ভারতের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে বৃটিশ সেনানিবাস ও সেনাবাহিনী থাকতে পারে কিন্তু ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা চাই। আর যদি এই প্রস্তাব অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা মেনে না নেন তবে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে আরও ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

১৯৪২ খ্রীঃ ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ঐতিহাসিক **'ভারতছাড়'** প্রস্তাব অনুমোদন করল। এই প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদের অবসানের জন্য ভারতের বৃটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। এবং বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সামরিক সরকার গঠন করবেন ও সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা হবে। প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার পরেই গান্ধীজি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজির আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ ৯ই আগস্ট আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৯৪৪ সালের ৫ই মে গান্ধীজিকে কারামুক্ত করা হলে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই আন্দোলনের শুরুতেই গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে (৯ই আগস্ট, ১৯৪২) পুণায় আটক রাখা হয়। এরপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেহেরু, আজাদ, কৃপালনী ও অন্যান্য নেতারাও কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে হরতাল পালন করা হয়।

ভারত ছাড় আন্দোলন অনতিকালের মধ্যেই ব্যাপক আকার লাভ করে। প্রথমদিকে ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় এই আন্দোলনে অংশ নিলেও পরবর্তী সময়ে বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর, দিল্লী ও জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বিহারে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রকৃতি ছিল মারাত্মক। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে, ডাকঘর পুড়িয়ে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। সরকারী কার্যালয় ও আদালতে ইউনিয়ন জ্যাক সরিয়ে ফেলে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করে। বোম্বাই, নাগপুর, কলকাতা, পাটনা প্রভৃতি শহরে কিছু স্বেচ্ছাসেবী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। ক্রমেই গণবিক্ষোভ কংগ্রেসের অহিংস আদর্শ লঙ্ঘন করে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলন এক মারাত্মক গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় গণবিক্ষোভের গভীরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরা। তমলুক মহকুমায় সমস্ত সরকারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সেখানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করা হয়। এই সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের পরিচালিত সামরিক বাহিনী বিদ্যুৎ বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। প্রশাসন, বিচার, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সরকারের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। বাংলার বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় আন্দোলন গণমুখী চরিত্রের রূপ নেয়। বীরভূম জেলার কয়েক হাজার সাঁওতাল আদিবাসী ও মুসলিম কৃষিজীবি রেলস্টেশন ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলে। ১৯৪২ ও '৪৩ আগস্ট আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষের সময়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য।

আগস্ট আন্দোলন যে পরিমাণ ব্যাপকতা অর্জন করেছিল সেই তুলনায় তা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বহীন ও অস্ত্রবিহীন জনগণের পক্ষে বেশিদিন বৃটিশের মত এক প্রবল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে

যাওয়া সম্ভব ছিল না। সরকারী দমননীতি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হলেও আন্দোলনের চরিত্রের মধ্যেও এই ব্যর্থতা নিহিত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল ও সেগুলির মধ্যে কোন সংহতিও গড়ে ওঠেনি।

৪.৬.৩.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান

(২) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭

(৩) সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত

(৪) Bipan Chandra-India’s Struggle For Independence

(৫) প্রবণ কুমার চট্টোপাধ্যায়—আধুনিক ভারত (দ্বিতীয় খন্ড)

৪.৬.৩.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) আইন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

(২) গান্ধী আরউইন চুক্তির প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৩) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কি কি?

(৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ব্যাপ্তি আলোচনা কর।

(৫) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ কর।

____

Unit-9

কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ও কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক (Socialistic Principles in the Congress and Congress Socialistic Party) : দাদাভাই নৌরজীর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে ভারতে 'সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায়। দাদাভাই নৌরজী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Un British Rule in India' গ্রন্থে বলেছেন–' শোষণ বন্ধ না হলে ভারতের দারিদ্র মোচন সম্ভব নয়। অপর কংগ্রেস নেতা রমেশচন্দ্র দত্তও ভারতে দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে বিদেশি শোষণকেই চিহ্নিত করেছেন। রু বিপ্লবের প্রভাবে ভারতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বীজ বপন হয়েছিল। চরমপন্থী নেতা লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পালকে রুশ বিপ্লব নাড়া দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১৯-এ লিখেছেন– "আজ জার্মান সমরবাদের পরাজয়ের পর, জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর সারা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে, জনগণের শক্তি। এই শক্তি নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার–সম্পত্তিবানদের ও তথাকথিত উচ্চ শ্রেণিগুলির দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে স্বাধীনতার সুখে বাস করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" । ২ অসহযোগ আন্দোলনে যে সকল তরুণ অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রসার ঘটে ও অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী গোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটে। তবে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসেছিলেন মূলত জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। সর্বত্র আন্দোলনের অগ্রগতি, ১৯৩৫-১৯৪১ খ্রিঃ সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সমর্থনে জোর প্রচারকার্য চালান। ১৯২৭ খ্রিঃ জওহরলাল নেহেরু সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার শাসনব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। ১৯২৭ খ্রিঃ জওহরলাল ব্রাসেলস্ এ ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট ঔপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। এই সংযোগের ফলে তিনি মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। দেশে ফিরে নেহেরু সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেন। জওহরলালের জীবনীকার এস. গোপালের ভাষায়, জওহরলাল ভারতে ফিরেছিলেন 'এক আত্মসচেতন বিপ্লবী র‍্যাডিকাল হিসাবে।' ১৯২৮ খ্রিঃ জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসু মিলিতভাবে 'স্বাধীনতার জন্য ইণ্ডিয়া লীগ' (Independance for India League) গঠন করেন। এর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠন করা। ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে জওহরলাল বলেন "আমি একজন সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী, আমি রাজা ও রাজপুত্রে বিশ্বাসী নই।" ১৯৩৩ খ্রিঃ 'ভারত কোন পথে' নামক প্রবন্ধে জওহরলাল সকল কায়েমি স্বার্থ ও শ্রেণিগত সুবিধা . সমূলে বিনষ্ট করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হলেও জওহরলাল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে কোন সংগঠন গড়তে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে সমাজতন্ত্রবাদের পথে নিয়ে যেতে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের বৃহত্তর ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নেহেরুর মত জাতীয়তাবাদী হলেও বাম দিকে সুভাষচন্দ্রের একটা ঝোঁক ছিল। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক সাম্যের সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সম্মেলনে তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচনে কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থী মনোভাবের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ঝোঁক কিছুটা প্রতিহত করতে সমর্থ হন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নেহেরু সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জোট গঠন করে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার আহ্বান জানান এবং শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রিত করা, জমিদারী ও তালুকদারী প্রথার বিলোপ সাধন এবং প্রগতিশীল ভূমিসংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় নেহেরু শ্রেণি-সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্ব সমস্যাবলী ও ভারতের সমস্যাবলীর সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে সমাজতন্ত্রের মধ্যে। সমাজতন্ত্র ছাড়া ব্যাপক বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মর্যাদাহীনতা ও ভারতীয় জনগণের নিপীড়ন অবসানের অন্য কোনো পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এর জন্য আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক কাঠামোতে বিপুল পরিবর্তন ঘটান প্রয়োজন।" নেহেরুর সমাজতন্ত্র ভাবনার প্রতি সে যুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব আস্থা রাখতে পারেন নি। কংগ্রেস দলে মতাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনা প্রমুখের সঙ্গে নেহেরুর মতপার্থক্য তীব্র হয়ে উঠেছিল। আধুনিকতা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন, অর্থনৈতিক সাম্য ও সমানাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে জওহরলাল নেহেরুর প্রগতিশীল সমাজ তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের মতপার্থক্য দেখা দিত। তিনি সবক্ষেত্রে ছিলেন আধুনিক, প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী গান্ধীজির মতাদর্শকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি গান্ধীজির সঙ্গে নেহেরুর শোষণ সম্পর্কিত প্রশ্নে মতান্তর হয়েছিল। এবং সেটি ধরা পড়েছে তাঁর আত্মজীবনীতে'। গান্ধীজি শ্রেণিগুলির মধ্যে সংঘাতের অস্তিত্ব মানতে রাজি হন নি বলে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা এবং পুঁজিপতি ও ভূস্বামীরা অছি ও তাদের মানসিক রূপান্তর ঘটান সম্ভব এমন ধারণা প্রচার করছিলেন বলে নেহেরু তার সমালোচনা করেছিলেন। তবে তিনি গান্ধীজির ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে র‍্যাডিক্যাল ভাবনার প্রশংসা করেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হলেও জওহরলাল সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামপন্থী বিকল্প গড়তে চেষ্টা করেন নি। কারণ আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও তিনি গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। এবং কংগ্রেসের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থেই তিনি গান্ধীজির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নেহের কংগ্রেস দলকে প্রভাবিত করে সমাজতন্ত্রমুখী আন্দোলনকে জোরদার করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের পতাকাতলে তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের আনতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বামপন্থীরা যদি জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত রাখে তাহলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন– "কংগ্রেসে গান্ধীজির নেতৃত্বে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারত যদি জওহরলাল সে নেতৃত্ব দিতেন। .... কিন্তু কার্য তিনি এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন।" নেহেরুর

সুভাষচন্দ্র বসুর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের নীতি

সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেও বামপন্থার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকেই 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অপোষহীন সংগ্রামের' পক্ষপাতি ছিলেন। গান্ধীজির আপোষমুখী মনোভাবেরঃ তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে নিজস্ব সমাজতন্ত্র গড়ে উঠুক তার নিজের ভূগোল ও ইতিহাসের ভিত্তি করেই। তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে সংস্কারকামী নীতি গ্রহণের কথা বলেন। তিনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দাবীকে তিনি তুলে ধরেন। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পর সুভাষচন্দ্র জওহরলালের নেতৃত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ গড়েন। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যার ফলে ভারতীয় জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ গান্ধীজি সহ্য করতে

পারেন নি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "জওহরলাল নেহেরুর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ (১৯০৬ খ্রিঃ) ও সুভাষ বসুর হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ (১৯৩৮ খ্রিঃ) তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকেই বেশি স্পষ্টভাবে বামপন্থী বলতে হবে।" রাশিয়ার অনুকরণে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করার পদক্ষেপও গান্ধীজির ভাল লাগে নি। বৈদেশিক ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার পথ অনুসরণের কথা বলেন। তবে সুভাষচন্দ্র কতটা সমাজতন্ত্রী ছিলেন সে বিষয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন । সুভাষচন্দ্র নিজের সম্পর্কে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ইু জানুয়ারি ভারত সচিব জেটল্যাণ্ডকে বলেন – "He was himself a socialist, but that was a very different thing from being a communist" যাই হোক, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ঝোঁক কিছুটা প্রতিহত করতে সমর্থ হন।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠনের প্রথম প্রয়াস শুরু হয়। ১৯৩৩ খ্রিঃ নাসিক জেলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের প্রকৃত সংগঠনে পরিণত করার জন্য একটি বামপন্থী দল গঠনের কথা চিন্তা করেন। এই নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জয় প্রকাশ নারায়ণ, জি সোসালিস্ট পার্টির অচ্যুত পটবর্ধন, অশোক মেহতা, ইউসুফ মেহের আলি, এম. আর প্রতিষ্ঠা মাসানি, এন. জি. গোরে, এস. এম. জোশী প্রমুখ। গান্ধীজি যেভাবে মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে দেন, তা তাঁদের মনঃপূত হয় নি। তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৩৪ খ্রিঃ পাটনায় তাঁরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'সোসালিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য নরেন্দ্রদেব সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস সোসালিস্টরা কংগ্রেসের ভিতরে থেকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা করেন এবং বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে কমিউনিস্টদের সমর্থন করেন। কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রীরা আদর্শগত দিক থেকে ছিলেন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী, যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষের বিরোধী ছিলেন। এই সঙ্গে তাঁরা বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী ভাবধারা গ্রহণ করেন। তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও শ্রেণি-সংগ্রামের কথাও বলতেন। মার্কসবাদী চিন্তা যেমন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমনি গান্ধীজির ভাবনাও তাঁদের প্রভাবিত করে। জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের দায়বদ্ধতা ছিল লক্ষনীয়। তাঁরা জওহরলাল প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন। কিন্তু জওহরলাল আমন্ত্রিত হলেও তাঁদের দলে যোগ দিতে রাজি হন নি। জওহরলালের উদ্যোগে আচার্য নরেন্দ্রদেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পট্টবর্ধন—এই তিনজন সমাজতন্ত্রী নেতা কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য মনোনীত হন। এই পার্টির লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করা, ও কৃষকদের সংগঠন করা, তাদের অর্থনৈতিক দাবী তুলে ধরা এ জয়ের জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের সামাজিক ভিত হিসাবে গড়ে তোলা। প্রথমদিকে সোসালিস্ট পারি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু এই ঐক্য অচিন্তে ভেঙ্গে যায়। সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবে কংগ্রেস কৃষি সংস্কার, ভূমি সংস্কার, শিক্ষা-বিরোধ সমস্যা, দেশিয় রাজ্যের প্রজাদের সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়। কা সমাজবাদীদের চেষ্টায় বিহার ও অন্ধ্রের কিষাণ সভাগুলি গঠিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিঃ কংগ্রেস যখন কয়েকটি প্রদেশে সরকার গঠন করে তখন সোসালিস্ট পার্টি তার বিরোধিতা করে। কারণ এর ফলে কংগ্রেসের সংগ্রামী চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। দেশের বিভিন্ন অংশে সোসালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জঙ্গী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শ্রমিক আন্দোলনেও সোসালিস্টরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস সোসালিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অনুগামীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় কংগ্রেস দলের ভেতরে বাম প্রগতিশীল শক্তিগুলির প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। সমাজতন্ত্রী নেতারা ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

GANDHIAN MOVEMENT AND LEFT MOVEMENT

একক - ২

ভারতে বামপন্থী আন্দোলন (১৯১৯-১৯৬৪)

Left Movement in India (1919-1964)

গঠন (Structure) ঃ

৪.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৪.৬.২.১ ঃ ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

৪.৬.২.২ ঃ শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনে বামপন্থীরা

৪.৬.২.৩ ঃ বামপন্থীদের দুর্বলতা

৪.৬.২.৪ ঃ নীতির পরিবর্তন, পরিস্থিতির পরিবর্তন

৪.৬.২.৫ ঃ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (C.S.P.)

৪.৬.২.৬ ঃ আরও অন্য বামপন্থী দল/গোষ্ঠী

৪.৬.২.৭ ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার একটি মূল্যায়ন

৪.৬.২.৮ ঃ স্বাধীনতার পর বামপন্থী আন্দোলন

৪.৬.২.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৬.২.১০ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ

(২) শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে বামপন্থীদের অবদান

(৩) বামপন্থী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

(৪) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ভূমিকা

(৫) স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার মূল্যায়ন

(৬) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি

৪.৬.২.১ ঃ ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ দেশের জাতীয় আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এর আগে জাতীয় আন্দোলন ছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই। বামপন্থী চিন্তাধারা বিকাশের ফলে সামাজিক স্বাধীনতার বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই নয়, সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বামপন্থীরাই প্রথম বলেন। গান্ধী অবশ্য এক ধরনের সমাজবাদের কথা ভেবেছিলেন তবে তা গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা ভারতবর্ষে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী সেই পরিমণ্ডলে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০) মধ্যে দিয়ে, প্রথম জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতবর্ষের যুবসমাজকে হতাশ করে তুলেছিল। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরাতে ১৯২২ সালের ৫ফেব্রুয়ারি পুলিশকর্মীদের, আন্দোলনকারীরা হত্যা করলে গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে গান্ধী রুদ্ধ করায় গান্ধীর প্রতি একধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। গান্ধীর প্রতি এই ধরনের নেতিবাচক মনোভাব বামপন্থা প্রসারের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

দেশের এই অবস্থার পাশাপাশি বিদেশের ঘটনাও বামপন্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বামপন্থী বলশেভিক বিপ্লবের বিরাট সাফল্য এদেশে বামপন্থার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বামপন্থীদের এই সাফল্য ছিল সাম্যবাদের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রেরও সাফল্য। রুশ বিপ্লব শিক্ষা দিয়েছিলঃ সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত জার সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেখানে একদল মানুষ আর একদল মানুষকে শোষণ করবে না, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণও তা করতে পারে। বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১৯এ লিখেছিলেনঃ 'আজ জার্মান সমরবাদের পরাজয়ের পর, জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর সারা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে, জনগণের শক্তি। এই শক্তি নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-সম্পত্তিবানদের ও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলোর দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত না হয়ে স্বাধীনভাবে সুখে বাস করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ', এক কথায় বলা যায়, গান্ধীর আন্দোলনের নেতিবাচক দিক, রুশ-বিপ্লবের সদর্থক দিক এবং ভারতবর্ষের আন্দোলনের উপযুক্ত পরিস্থিতিই বিকল্প চিন্তা হিসেবে বামপন্থীদের উত্থানের পটভূমি তৈরি করেছিল।

১৯২০-র গোড়া থেকেই ভারতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা প্রকাশিত হতে থাকে। বোম্বাইতে এস.এ. ডাঙ্গে 'Gandhi and Lenin' (গান্ধী অ্যান্ড লেনিন) নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। তিনি *The Socialist* (দ্য সোশালিস্ট) নামে এদেশে প্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। বাংলায় মুজফ্‌ফর আহমেদ প্রকাশ করেন 'নবযুগ' পত্রিকা এবং পরে কবি নজরুল ইসলামের সহযোগিতায় প্রকাশ করেন 'লাঙল'। পাঞ্জাবে গুলাম হোসেন ও অন্যান্যরা প্রকাশ করেন 'ইনকিলাব'। আর মাদ্রাজে এম. সিঙ্গারভেলু প্রতিষ্ঠা করেন 'লেবার-কিষান গেজেট'-এর।

দেশের বাইরেও বামপন্থী ভাবধারার আন্দোলনের সঙ্গে এ দেশের মানুষ যুক্ত হচ্ছিলেন। তাঁরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেখানকার রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। উপনিবেশগুলো সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন)-এর নীতি কি হবে, তা ঠিক করার ক্ষেত্রে তিনি লেনিনকে সহযোগিতা করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ওখানে কার্যরত সাতজন ভারতীয় (মহম্মদ আলি, মহম্মদ সফিক প্রমুখ) ১৯২০-র অক্টোবরে তাসখন্দে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রয়াস থেকে আলাদা ভাবে, ১৯২০-র পর থেকে ভারতে বেশ কয়েকটি বামপন্থী ও কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীগুলো মূলতঃ কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সংগঠিত হতে থাকে।

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয় ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে। এই মামলার বিচারে এস.এ. ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শওকৎ উসমানি, নলিনী গুপ্ত প্রমুখের চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে তাদের আপিল নাকচ হয়ে যায়। পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ বছর ৯ মাস আগে ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি পান। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হওয়ার আগে সত্য ভক্ত নামে এক ব্যক্তি কানপুরে একটি কমিউনিস্ট সম্মেলনের পরিকল্পনা করেন। তিনি ছিলেন একজন গান্ধীপন্থী কংগ্রেস কর্মী। তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জানকী প্রসাদ বাগেরহোট্টা নামে আর একজন যুব কংগ্রেস নেতা।

১৯২৫ সালের ১২ অক্টোবর সত্য ভক্ত এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। নিজেকে তিনি 'ভরতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র (ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি) সম্পাদক বলে পরিচয় দেন। ঐ প্রচারপত্রে লেখা হয়, আগামী ডিসেম্বর মাসে কানপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি একটি কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। মৌলানা হজরৎ মোহানি এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ইংলন্ডের পার্লামেন্টের সদস্য সাকলাতওয়ালা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

এই সত্য ভক্তের প্রকৃত নাম ছিল চকনলাল। তিনি ভরতপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯১৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে ছিলেন। ১৯২৩ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন কানপুরে আসেন এবং কলকাতার এক যুবক অবনী চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন। এই অবনী চৌধুরী কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। তিনি সত্য ভক্তকে কানপুর মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অর্থাদি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই মামলার সংস্পর্শে এসে, মামলার সওয়াল-জবাব শুনে ও পড়ে সত্য ভক্ত উপলব্ধি করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি আইনত সংগঠিত ও পরিচালিত হতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ১৯২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় এর

প্রচার হয় এবং তিনি দাবি করেন ১৯২৫ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন সদস্যকে তিনি তালিকাভুক্ত করে ফেলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খোলাখুলিভাবে ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করা।

১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, এস.বি. (সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু) ঘাটে, নিম্বকার, কে.এন. যোগলেকর প্রমুখ যোগদান করেন এবং নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে পার্টির কোনও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়নি। পার্টি সংগঠনও ছিল অস্থায়ী। সম্মেলন থেকে চারজন প্রাদেশিক সংগঠক নির্বাচিত হন যাঁরা নিজেদের প্রদেশে পার্টি গড়ে তোলার কাজের দায়িত্ব পান। দিল্লীতে পার্টির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপিত হয়। প্রথমে বাগেরহোট্টা এবং পরে ঘাটে অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

এই সময় সি.পি. আই-এর বক্তব্য ছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পার্টি তার সব সদস্যকে কংগ্রেসের সদস্য হতে, এর সমস্ত সংগঠনে একটি শক্তিশালী বামপন্থী শাখা গড়ে তুলতে, অন্যান্য র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং কংগ্রেসকে আরও বেশি করে র‍্যাডিকাল গণসংগঠনে রূপান্তরিত করতে আহ্বান জানায়।

১৯২০-র দশকে মানবেন্দ্রনাথ রায় লেনিনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক জগতে কমিউনিস্টদের রণকৌশল সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত ও তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্কে অবতীর্ন হন। লেনিন জোর দেন উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে প্রধানত বুর্জোয়া--পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনকে বিস্তৃতভাবে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ যুক্তি দেন যে, গান্ধীর মতো বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্পর্কে ভারতীয় জনগণ ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত হয়ে গেছেন আর 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন'-নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় জনগণ এগিয়ে চলেছেন বিপ্লবের দিকে। ১৯২২-এ বার্লিনে মানবেন্দ্রনাথ 'ভ্যানগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্টস্' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। একই সময়ে অবনী মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রকাশ করেন India in Transition যা ছিল ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের অগ্রণী প্রয়াস। এই সময়ে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় গোষ্ঠীগুলোও মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বরকাতুল্লার নেতৃত্বে পুরোন বার্লিন গোষ্ঠী।

মানবেন্দ্রনাথ রায় দুটি ভাগে বামপন্থী আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন- (১) মার্কসবাদী পন্থায় বিশ্বাসী গুপ্ত সংগঠন স্থাপন এবং (২) কৃষক, শ্রমিক, পাতি বুর্জোয়াদের সঙ্গে একসাথে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলোতে প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে কমিউনিস্ট কর্মসূচী ভিত্তিক বিবৃত্তি তৈরি করতেন, 'ভ্যানগার্ড-এর গোড়ার দিকের সংখ্যাগুলোতে (মে--জুন ১৯২২) গান্ধী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হলেও ১৯২৮ পরবর্তী পর্যায়ে গান্ধীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুর অনেকটা নরম করা হয়েছিল। এতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল 'নিপীড়িত স্বদেশবাসীর জন্য গান্ধীর গভীর ভালবাসাকে, কৌশলগত বড় বড় ভুল করলেও সে ভালবাসা মহান'।

৪.৬.২.২ ঃ শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনে বামপন্থীরা

ভারতে আদি কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রধান ধরন ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের পার্টি গঠন করে সেগুলোর মাধ্যমে কাজ করা। এই ধরনের প্রথম সংগঠন ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'শ্রমিক স্বরাজ পার্টি

(১৯২৫) যা মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দিন আহ্‌মেদ, হেমন্ত কুমার সরকার প্রমুখ গড়ে তোলেন বাংলাতে। এদের পত্রিকা ছিল লাঙ্গল, গণবাণী। ১৯২৬-এর শেষ দিকে বোম্বেতে যোগলেকর, ঘাটের নেতৃত্বে 'কংগ্রেস শ্রমিক পার্টি' (পত্রিকা ঃ ক্রান্তি) এবং পাঞ্জাবে সোহন সিং জোশের নেতৃত্বে 'কীর্তি কিষাণ পার্টি' (পত্রিকা ঃ কীর্তি) গড়ে ওঠে। ১৯২৩ সাল থেকেই মাদ্রাজে কাজ করছিল 'হিন্দুস্থান শ্রমিক কৃষক পার্টি' (Labour Kisan Party of Hindustan)। ১৯২৭-এ এই প্রাদেশিক সংগঠন Workers and Peasants Party নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলে। এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীতে। W.P.P চেয়েছিল কংগ্রেসকে 'জনগণের পার্টি' করে তুলতে, স্বাধীনভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়ে তুলতে এবং প্রথমে স্বাধীনতা ও শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র অর্জন করতে। W.P.P-র সংগঠন দ্রুত বাড়তে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের ভেতরেও বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য র‍্যাডিকাল কংগ্রেসীরা কংগ্রেসকে বামপন্থী আদর্শে প্রভাবিত করার জন্য W.P.P-র প্রয়াসকে স্বাগত জানান। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ছিলেন নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বসু। যুব লীগ- এর কর্মীরাও বামপন্থা বিকাশের কাজে সক্রিয় ছিলেন। W.P.P শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; ১৯২৭-২৯ পর্বে শ্রমিক সংগ্রাম পুণরুজ্জীবনে W.P.P-র বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জাতীয় আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকায় সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বামপন্থীদের ওপর দমন-পীড়ন চলতে থাকে। (আগে উল্লেখিত কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা দ্রষ্টব্য) ১৯২৯-এ বাণিজ্য বিরোধ বিল (Trade Disputes Bill) এবং জন নিরাপত্তা বিল (Public Safety Bill) নামে দুটি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন জারি হয়; মার্চ মাসে আচমকা হানা দিয়ে ৩২ জন র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন Communist Party of Great Britain-এর তিনজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্রাডলি ও লেস্টার হাচিনসন সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করে দেওয়া এবং জাতীয় আন্দোলন থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এই ৩২ জনের বিচার শুরু হয়। এই বিচার জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার ঘটায় বন্দীদের হয়ে সওয়াল করেন জহরলাল নেহরু, এম.এ. আনসারি, এম.সি. চাগলার মতো জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। মীরাট বন্দীদের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য এবং আসন্ন আন্দোলনে তাদের সহযোগিতা চাওয়ার জন্য গান্ধী জেলে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বন্দীরা যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলো সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; এর ফলে ভারতের বহু মানুষ কমিউনিস্ট চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ পান। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বামপন্থীদের বিযুক্ত করার সরকারি ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, বরং তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে শ্রমিক আন্দোলন এই দমন নীতির ফলে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। শ্রমিক আন্দোলনের এই গড়ে ওঠার কালে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠা সহজ ছিল না।

৪.৬.২.৩ ঃ বামপন্থীদের দুর্বলতা

সাংগঠনিক নীতির কারণে বামপন্থী গোষ্ঠী এই সময়ে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়ে এদেশের কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরা কংগ্রেসকে 'বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি' বলে চিহ্নিত করেন। জহরলাল নেহরু এবং

সুভাষ বসুর মত কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের বর্ণনা করা হয় 'জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়াদের দালাল' হিসেবে। অভিযোগ করা হয় তাঁরা শ্রমিকদের ব্যাপকতম অংশকে ধোঁকা দিচ্ছেন এবং জনসাধারণকে বুর্জোয়া প্রভাবে রাখার চেষ্টা করছেন। ১৯৩১-এ স্বাক্ষরিত গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে জাতীয়তাবাদের প্রতি কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ বলে চিহ্নিত করা হয়। আবার শ্রমিক ও কৃষকের পার্টি পেটি বুর্জোয়াদের খপ্পরে পড়তে পারে এই যুক্তিতে W.P.P. ভেঙে দেওয়া হয়।

বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন, রাজনৈতিক মনোভাবের হঠাৎ এই পরিবর্তনের ফলে তারা জাতীয় আন্দোলন থেকে এমন এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন যখন এই আন্দোলন বৃহত্তর গণসংগ্রামের জন্য নিজেকে তৈরি করছিল এবং এর উপর বামপন্থীদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তার ওপর কমিউনিস্টরা এই সময় অনেকগুলো ছোট ছোট দল ছুট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। তার উপর সরকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৩৪-এ C.P.I. কে বেআইনি ঘোষণা করে।

কংগ্রেসের সংস্কারবাদী আপসমুখী নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টরা গণ-আন্দোলন থেকে নিজেদের পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে, ১৯৩৪-এর মার্চে কমিউনিস্ট পার্টি তার 'Draft of Political Thesis' বা রাজনৈতিক তত্ত্বের খসড়ায় স্বীকার করে, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১) থেকে বিরত থাকার ফল ভাল হয়নি। এই প্রতিবেদনে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তার আপসমুখী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর আহ্বান জানানো হয়।

৪.৬.২.৪ ঃ নীতির পরিবর্তন, পরিস্থিতির পরিবর্তন

১৯৩৫-এ পি.সি. যোশীর (পূরণ চাঁদ যোশী) নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠিত হয়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের বিপদের মুখে, ১৯৩৫-এর আগস্টে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস। কমিন্টার্ন এই অধিবেশনে তাদের আগের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কমিন্টার্ন পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির সঙ্গে এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায়। এই সময় রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্র্যাডলি লিখিত একটি দলিল কংগ্রেসের কাজকর্মে বামপন্থীদের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত প্রদান করে।

'দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিস' নামে পরিচিত এই দলিলের মূল্য বক্তব্য ছিল—

(১) জাতীয় মুক্তিপ্রয়াসী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণমোর্চা গঠনের কাজে কংগ্রেস বড় ভূমিকা নিতে পারে।

(২) কংগ্রেস নেতৃত্ব বুর্জোয়া ধরনের এবং তার সঙ্গে জনসাধারণ-এর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

(৩) কংগ্রেসের বাইরে যে সব শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন আছে সেগুলিকে কংগ্রেসের মধ্যে আনতে হবে যৌথ সংযুক্তির মাধ্যমে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণমোর্চা শক্তিশালী হবে।

(৪) বামপন্থীরা একটি গণ পরিষদ গঠনের দাবি তুলবেন যে দাবিকে কেন্দ্র করে সকল শক্তিকে সমবেত করা সম্ভব হবে।

(৫) সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভেতরের সমস্ত বামপন্থী শক্তির সঙ্গে 'ঐক্য প্রতিষ্ঠা' করা প্রয়োজন। এভাবেই গড়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির যুক্ত মোর্চা।

১৯৩৮-এ কংগ্রেসকে 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণের কেন্দ্রীয় গণ রাজনৈতিক সংগঠন' বলে স্বীকার করা হয়। ১৯৩৯এ পি.সি. যোশী, পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট '-এ লেখেন—'আমাদের জাতীয় সংগ্রামই আজকের দিনে সবচেয়ে বড় শ্রেণী সংগ্রাম আর কংগ্রেস তার প্রধান হাতিয়ার'।

তবে একই সঙ্গে পার্টি জাতীয় আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণীর এবং বামপন্থীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার লক্ষ্যেও অবিচল থাকে। কংগ্রেসের মধ্যেই বামপন্থীরা কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। ১৯৩৬ থেকে '৪২-এর মধ্যে কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বাংলা ও পাঞ্জাবে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে এন.জি. রঙ্গার নেতৃত্বে সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস গঠিত হয়। সংগঠনের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৩৮ সালে এই সংগঠনের নতুন নামকরণ হয় সারা ভারত কিষাণ সভা; পতাকার রং হয় লাল।

শ্রমিক সংগঠনেও বামপন্থী প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ২৭১ থেকে বেড়ে হয় ৫৬২। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' আখ্যা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন/প্রভাবাধীন বম্বের শ্রমিকরা ৩ নভেম্বর যুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘট পালন করেন। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'India Today' বইতে মন্তব্য করেছেন, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘট। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বামপন্থীরা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময়কার আন্তর্জাতিক রাজনীতি বামপন্থীদের অবস্থান বদলাতে বাধ্য করে। ১৯৪১ সালের জুনে নাৎসী জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মহাজোট গঠিত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ', 'জনযুদ্ধ'-এ রূপান্তরিত হয়।

১৯৪২-এর আগস্টে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A.I.C.C.) কমিউনিস্ট সদস্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সি. পি. আই তার গৃহীত একটি প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির নিন্দা করে এবং মুক্তিসংগ্রামীদের 'উন্মাদ দেশপ্রেমিক' রূপে আখ্যায়িত করে। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা অবশ্য স্বীকার করেন যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে তাঁদের অবস্থান সঠিক ছিল না।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে গণ-আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আর সেই গণ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বামপন্থীরা। এই গণবিস্ফোরণের সূচনা ঘটেছিল কলকাতায়, ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর। লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারের প্রহসন বন্ধ করা ও সকলের মুক্তির দাবিতে ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছিল ছাত্রদের এই সাধারণ ধর্মঘটকে। ঐদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণবিদ্রোহের তিনিই ছিলেন প্রথম শহীদ।

১৯৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পিপলস্ এজ' (Peoples Age) -এ সম্পাদকীয় লেখা হয়; 'দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের যে অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠেছে, সে আগুনকে জাগ্রত রাখতে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলিকে বিচারে দণ্ডিত করা হলে কলকাতা প্রতিবাদী হয়। ১১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী কমিউনিস্ট পার্টি 'রশিদ আলি দিবস' পালন করে, কমিউনিস্ট পার্টির দুই শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই গণবিক্ষোভের ওপর সেনাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানো হয়।

১৯৪৬-এর ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে নৌসেনাদের বিদ্রোহ হয়। এই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে গণবিস্ফোরণ দেখা দেয়। বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন বামপন্থীরা।

আরও উল্লেখ্য যে শিল্প সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রে চল্লিশের দশকে লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল যাকে বলা হয় বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনে মার্কসীয় চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। যেসব সংগঠনের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল সেগুলো হল সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ (প্রতিষ্ঠা চল্লিশের দশকের আগেই, ১৯৩৬ সালে), ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪২), সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (১৯৪২) এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩)। এগুলো ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট। এর পাশাপাশি চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক কিষাণ সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, কিশোর বাহিনীর মত সংগঠনও অল্পবিস্তর সংস্কৃতিচর্চায় যুক্ত ছিল। কাজেই বলা যায়, চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

৪.৬.২.৫ ঃ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (C.S.P)

ভারতে বামপন্থী আন্দোলন শুধু যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তা নয়। বামপন্থী আন্দোলনের আর একটি ধারার বিকাশ ঘটে তিরিশের দশকে। ১৯৩৪-এর অক্টোবরে বোম্বেতে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, মিনু মাসানি প্রমুখর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, C.S.P) এই দলের বক্তব্য ছিলঃ স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় সংগ্রামই ভারতে প্রাথমিক সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের পথে একটা প্রয়োজনীয় পর্যায়, সমাজতন্ত্রীদের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে কেননা এটাই জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী প্রাথমিক সংগঠন, এরই প্রমাণ মেলে এই দলের নেতাদের বক্তব্যে।

১৯৩৪এ আচার্য নরেন্দ্র দেব বলেন—'কংগ্রেস নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধি। এই আন্দোলন থেকে আমরা যদি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করি, তবে তা হবে আত্মহত্যার নীতি। আমাদের চেষ্টা করতেই হবে কংগ্রেসকে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা দেওয়ার জন্যে; আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে শ্রমিক ও কৃষকদের নিজ নিজ শ্রেণী সংগঠনে সংগঠিত করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে এবং তাদেরকে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত করতে হবে।

ঐ বছরই জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন—'আমরা কংগ্রেসের সামনে একটা কর্মসূচী (বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে শ্রমিকদের ও কৃষকদের স্বার্থে আরও বেশি সংস্কারকামী নীতি এবং স্বাধীন ভারত সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করার কথা) উপস্থিত করছি। আমরা চাই কংগ্রেস তা গ্রহণ করুক। কংগ্রেস যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে (আমরা) বলব না যে আমরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমরা যদি আজ ব্যর্থ হই কাল চেষ্টা করব, কাল ব্যর্থ হলে পরের দিন'।

১৯৩৫এ সি.এস.পি (C.S.P)-র মীরাট থিসিসে বলা হয়েছিল কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে বর্তমান বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসাই সি.এস.পি-র কর্তব্য।

তবে ১৯৩৯-এ জয়প্রকাশ বসেছিলেন-'আমরা, সোশালিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে একটা উপদল সৃষ্টি করতে কিংবা কংগ্রেসের পুরোনো নেতৃত্বকে সরিয়ে একটা বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আমরা শুধু কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে ভাবিত।.......পুরোনো নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, আমরা তা নিয়ে বিবাদ করতে চাই না। আমরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাই। আমরা সবাই চাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে'।

যখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কথা বলেছিল তখন জয়প্রকাশ সমস্ত বামপন্থী দলের ঐক্যর কথা ভেবেছিলেন। তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সি.এস.পি আদর্শগতভাবে কংগ্রেসকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পাশাপাশি চেয়েছিল সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেসে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে। তবে ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী অধিবেশনে গান্ধীর প্রার্থী সীতারামাইয়াকে হারিয়ে (ব্যবধান ১৫৮০-১৩৭৭=২০৩) সুভাষচন্দ্রের জয়ের পরে ১৯৪০-এ রামগড় অধিবেশনে যখন কংগ্রেসে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী বিভাজনের সম্ভাবনা দেখা দিল তখন সি.এস.পি বামপন্থীদের পাশে দাঁড়াল না। এই দলের নেতারা মনে করেছিলেন, এই প্রয়াস জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবে এবং বামপন্থীদের আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই দলে নানান মতাবলম্বীর অবস্থান দলকে এবং সামগ্রিকভাবে বামপন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।

৪.৬.২.৬ ঃ আরও অন্য বামপন্থী দল/গোষ্ঠী

সি.পি.আই এবং সি.এস.পি ছাড়াও নানান বামপন্থী সংগঠন/দল/গোষ্ঠী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের Royist, সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক (১৯৩৯), বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (Revolutionary Socialist Party, R.S.P), ট্রটস্কির মতাবলম্বী গোষ্ঠী। এছাড়া স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন.জি. রঙ্গ ও ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের মত বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা কোন সংগঠিত বামপন্থী পার্টির কাঠামোর বাইরে থেকে কাজ করতেন।

৪.৬.২.৭ ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার একটি মূল্যায়ন

বামপন্থী কর্মীরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, লড়াকু ও আত্মত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও তারা জাতীয় আন্দোলনের উপর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হননি। এর একটা বড় কারণ ভারতের মূলধারার

জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক। বামপন্থীরা অনেক সময়ই ভুল বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন। যখন তা চরম সীমায় পৌঁছেছে তখন হয় তারা এই মূলস্রোতের নেতৃত্বের পেছনে যেতে বাধ্য হয়েছেন আর নয়তো জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

ভারতীয় বাস্তবতাকে উপলব্ধি না করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে গিয়ে ভারতের বামপন্থীদের 'ভারতীয়ত্ব' কিছুটা ক্ষুন্ন হয়। ভারতের সামাজিক শ্রেণীগুলোর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা সরলীকৃত একটা মডেল গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই অমলেশ ত্রিপাঠী এদের 'যান্ত্রিক মার্কসবাদী' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

বামপন্থীদের পারস্পরিক অসদ্ভাব আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। বিভিন্ন বামপন্থী দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি এজন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারেননি। তাত্ত্বিক বিরোধ, মতপার্থক্য, অহং এবং মেজাজের পার্থক্য ঐক্যকে বিঘ্নিত করেছিল। ১৯৩৯-এ সুভাষ ও সোশালিস্টদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ অবধি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোশালিস্ট পার্টি একসঙ্গে কাজ করলেও পরে একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়।

১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান দেশের মানুষ ভাল চোখে দেখেনি। ১৯৪৮-এ সি.পি.আই -এর সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদিভে স্বীকার করেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ভ্রান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

সুনীতি কুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণসংগ্রামের ঢেউ সমগ্র ভারতে আছড়ে পড়েছিল তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল বিহ্বল এবং তারা উল্টোপাল্টা বুঝেছিল। গৌতম চট্টোপাধ্যায় পার্টি নেতৃত্বের কিছুটা বিহ্বলতার কথা মেনে নিলেও স্পষ্ট বলেছেন, পার্টি কোন সময়েই গণসংগ্রামের বিরোধিতা করেনি।

সত্যি কথা বলতে কি এদেশে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে গণসংগ্রাম সংগঠিত করতে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল বিরাট। বহু বিভাজন ও দুর্বলতা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ১৯২০-এর দশকের কৃষক আন্দোলন, তিরিশের দশকে বামপন্থার প্রভাবে নতুন চরিত্র লাভ করে।

জাতীয় কংগ্রেসেও বামপন্থীদের প্রভাব বাড়ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে বামপন্থী সুভাষচন্দ্রের বিজয়। এর আগে বামপন্থীদের প্রভাবেই ১৯৩১-এ করাচী অধিবেশনে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। বামপন্থীদের প্রভাবেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন, ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা শুধু ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফল নয়, ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ ও সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিণাম। সুতরাং জনগণের দুর্দশা দূর করতে গেলে এই কাঠামোও আমূল বদলাতে হবে।

৪.৬.২.৮ ঃ স্বাধীনতার পর বামপন্থী আন্দোলন

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়, এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের প্রধান বামপন্থী রাজনৈতিক দল 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকল প্রগতিশীল শক্তিকে নেহেরুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। পরে অবশ্য পার্টি তার মত বদলে বলে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'।

কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে দেশে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বহাল, তাই পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার ডাক দেয়। ১৯৪৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে বলা হয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য জনগণ কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে চায়। পার্টি ১৯৪৯-এর ৯মার্চ রেল ধর্মঘট ডাকে। তা সফল হয়নি। পার্টির সরকার বিরোধী লড়াইয়ের ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্যে সি.পি.আই-কে নিষিদ্ধ করা হয়। পার্টির শক্তিও কমতে থাকে; নব্বই হাজার থেকে সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় আঠারো হাজারে।

১৯৫১ সালের শেষ দিকে অজয় ঘোষের নেতৃত্বে স্তালিনের নির্দেশনায় নতুন এক কর্মসূচী ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে পার্টি সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। বলা হয়, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলগতভাবে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। অতএব বামপন্থীদের কর্তব্য হল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের পতন ঘাটানো।

এই মনোভাব মুলতুবি রেখে সি.পি.আই ১৯৫২তে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ৬১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪.৬% পেয়ে ২৩টি আসন জিতে তারা লোকসভায় বৃহত্তম বিরোধী দলের তকমা পায়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর সি.পি.আই তার নীতিগত অবস্থানও পুনর্বিবেচনা করতে থাকে। যেমন ১৯৫৩ সালের মাদুরাই কংগ্রেস পার্টি স্বীকার করে যে ভারত সরকার স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলেছে যদিও অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে তা এখনও স্বাধীন নয়। এরপরে ১৯৫৬ সালে পার্টির পালঘাট কংগ্রেসে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব স্বীকার করেন যে ভারত ১৯৪৭ সালে সত্যিই স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং আলোচ্য সময়ে তা প্রকৃতই এক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের রূপ পেয়েছে। এই পর্যায়ে পার্টির বক্তব্য ছিল, সরকারের নীতিগুলো পুঁজিবাদের পক্ষে, তা জনবিরোধী, কাজেই মূলগত বিচারে এই সরকার প্রতিক্রিয়াশীল। তাই পার্টির লক্ষ্য হল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে এক গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলা। ১৯৫৭র নির্বাচনে পার্টি আরও ভাল ফল করল, ৮.৯২% ভোট পেয়ে ২৭টি আসন জিতল। কেরালায় ক্ষমতায় এল।

১৯৫৮ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে পার্টি ঘোষণা করে শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছোনো সম্ভব। পার্টি বলে, তারা ক্ষমতায় এলে পূর্ণ পৌর অধিকার বহাল করবে। সংসদীয় পথে সমাজতান্ত্রিক সরকার আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতার অধিকারও বিরোধীপক্ষের থাকবে। ১৯৬১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিজওয়াড়া কংগ্রেসে কংগ্রেসের সঙ্গে যুগপৎ সংগ্রাম এবং ঐক্যের নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয়, পার্টি কংগ্রেসের প্রগতিশীল নীতিগুলিকে সমর্থন করবে। আশা ছিল, এর ফলে কংগ্রেস প্রগতি-প্রতিক্রিয়া দুই শিবিরে ভেঙে যাবে, তখন পার্টি প্রগতি শিবিরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। ১৯৬২তে পার্টি নির্বাচনে তার সাফল্য আরও বাড়িয়েছিল, এবার ৯.৯৪% ভোট পেয়ে সি.পি.আই লোকসভায় ২৯টি আসন পেল। ইতিমধ্যে কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পার্টি যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেছিল।

তবে পার্টির মধ্যে মতানৈক্য বাড়ছিল। বিরোধের বিষয়ের মধ্যে ছিল স্তালিন সম্পর্কে সোভিয়েত মূল্যায়ন, রুশ-চীন বিরোধ এবং ১৯৬২র ভারত-চীন যুদ্ধ। ১৯৬২র এই ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 'মডারেট' বনাম 'র‍্যাডিকাল'-দের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে সি.পি.আই

দু'টুকরো হয়ে যায়। আগেকার 'দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী' প্রবণতা-যুক্ত অংশটি সি.পি.আই নামে পরিচিত হয়। আর আগেকার 'বামপন্থী' প্রবণতা যুক্ত অংশটি অল্পকাল পরে পরিচিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি.পি.আই (এম) নামে।

বামপন্থী আন্দোলনের একটা ধারা যদি হয় কমিউনিস্ট পার্টি-কেন্দ্রিক, তবে অন্য ধারা ছিল সোশালিস্ট পার্টি-কেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের মার্চে সোশালিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঘোষণা করে তাদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আসলে কংগ্রেস ১৯৪৮-এর গোড়ায় নিয়ম চালু করে যে নিজস্ব সংবিধান ও নিয়মকানুন-যুক্ত অন্য কোনও পার্টির সদস্য, কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবে না। স্বভাবতই সোশালিস্টরা তাদের নিজেদের পার্টি তুলে দিতে রাজি হয়নি। তারা মনে করছিল, কংগ্রেস একটি দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

সোশালিস্টদের কংগ্রেস ত্যাগ কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের রীতিমতো দুর্বল করে দেয়। এর ফলে নেহরু তাঁর নিজের পার্টির মধ্যেই রক্ষণশীল শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যান। অন্যদিকে সোশালিস্টরা যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারল-এমনও নয়। ১৯৫২র নির্বাচনে সোশালিস্টরা বিশেষ সাফল্য পায়নি। তারা বহু আসনে দাঁড়িয়ে মাত্র ১২টি আসন লাভ করে যদিও প্রাপ্ত ভোট ছিল প্রদত্ত ভোটের ১০.৬%।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে সোশালিস্ট পার্টি এবং জে. বি. কৃপালনির নেতৃত্বাধীন মজদুর প্রজা পার্টি এক হয়ে গিয়ে তৈরী হয় প্রজা সোশালিস্ট পার্টি। এর সভাপতি হন কৃপালনি, সম্পাদক অশোক মেহ্‌তা। প্রথম থেকেই মতাদর্শগত বিরোধ আর গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার হয়ে পড়ে এই পার্টি।

একদিকে অশোক মেহ্‌তা গোষ্ঠী ছিলেন শাসক দলের সঙ্গে সহযোগিতামূলক নীতি গ্রহণের পক্ষে আর অন্যদিকে রামমনোহর লোহিয়া গোষ্ঠী ছিলেন কংগ্রেস বিরোধিতায় দৃঢ়সংকল্প। লোহিয়া পন্থীরা কংগ্রেস কমিউনিস্ট উভয়ের থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। ১৯৫৩য় পার্টি তার বেতাল অধিবেশনে লোহিয়াপন্থী নীতি গ্রহণ করে। তবে অন্তর্বিরোধ কমেনি। ১৯৫৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে ভূদান প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেন। ১৯৫৫র শেষাশেষি লোহিয়া ও তাঁর অনুগামীরা পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে নতুন সোশালিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই পার্টি ছিল রাজনৈতিকভাবে জঙ্গি ধরনের। বিক্ষোভ, আইন অমান্য আন্দোলন, রাজ্য বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে এসে তার কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা--এইসব নিয়মিত চালিয়ে যেতেন তাঁরা। এরা ছিলেন কংগ্রেস এবং নেহরু বিরোধী। এদের দাবি ছিলঃ যোগাযোগ-ভাষা হিসেবে হিন্দী চালু করা এবং পিছিয়ে-থাকা জাতি, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য ৬০% চাকরি সংরক্ষণ করা।

১৯৫৬ সালে আচার্য নরেন্দ্র দেব মারা যান। ১৯৫৭র নির্বাচনে প্রজা সোশালিস্ট পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১০.৪% পেয়ে লোকসভায় ১৯টি আসন পায়। ১৯৫৭ সালের এই সাধারণ নির্বাচনের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ রাজনীতি ছেড়ে দেন। বলেন, দলীয় রাজনীতি ভারতের পক্ষে উপযোগী নয়। তার বদলে 'দলবিহীন গণতন্ত্র'-র পথে চলাই ভাল। ১৯৬০ সালে কৃপালনি পার্টি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ১৯৬২র নির্বাচনে প্রজা সোশালিস্ট পার্টি ৬.৮% ভোট পেয়ে ১২টি আসন পায়। ১৯৬৩ সালে অশোক মেহ্‌তা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হতে রাজি হয়ে যান। পার্টি যখন তাঁকে বহিষ্কার করে তখন ১৯৬৪তে তিনি কংগ্রেসে ফিরে যান। বহু সোশালিস্ট কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেন।

আসলে কংগ্রেসের সঙ্গে সোশালিস্টদের মতাদর্শগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না। উভয়েই ছিল জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতন্ত্র, পৌর অধিকার ভিত্তিক রাষ্ট্রসমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। কংগ্রেস আবাদি প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের দায়বদ্ধতা ঘোষণা করার পর থেকে সোশালিস্টদের সঙ্গে তাদের আর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কংগ্রেসের এই ঘোষণার ফলে সোশালিস্টরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস যখন তার ক্ষমতা সংহত করছিল তখন বামপন্থীদের অন্তর্বিরোধ সামগ্রিকভাবে দেশের বামপন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করছিল। 'নেহরু যুগ'-এ (১৯৪৭-১৯৬৪) বামপন্থী আন্দোলন মূলত নানান ভাঙনের সাক্ষী। তবে এটাও সত্যি, আদর্শ হিসেবে বামপন্থা, ভারতীয় জনসাধারণের একাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে এই সময়ে।

৪.৬.২.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) সুমিত সরকার, Modern India

(বঙ্গানুবাদ ঃ আধুনিক ভারত, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী)

(২) বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য, India's Struggle for Independence

(বঙ্গানুবাদ ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী)

(৩) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, From Plassey to Partition

(বঙ্গানুবাদ ঃ পলাশি থেকে পার্টিশান, ওরিয়েন্ট লংম্যান)

(৪) বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য, India After Independece

(বঙ্গানুবাদ ঃ ভারতবর্ষ-স্বাধীনতার পরে, আনন্দ)

(৫) K.N. Panikkar, National and Left Movements in India

(৬) Gautam Chattopadhyay, Communism and Bengal's Freedom Movement.

(৭) রজনী পাম দত্ত, India Today

(বঙ্গানুবাদ ঃ আজিকার ভারত)

(৮) Sudhi Pradhan, Marxist Cultural Movement in India

(৯) Girija Shankar, Socialist Trends in Indian National Movement

(১০) Suniti Kumar Ghosh, India and the Raj

৪.৬.২.১০ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতে বামপন্থী আন্দোলন বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান কর।

(২) ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

(৩) ভারতের বামপন্থী রাজনীতিতে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির ভূমিকাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

(৪) শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা কি ছিল?

(৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের অবদানের মূল্যায়ন কর।

(৬) আন্তর্জাতিক বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের নীতি নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা কর।

(৭) স্বাধীনতা-পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের মূল ধারাগুলো ব্যাখ্যা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

WORKING OF CONGRESS COMMUNAL POLITICS AND SUBHAS CHANDRA BOSE

একক - ৩

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

Subhas Chandra Bose and INA and Telengana

গঠন (Structure) ঃ

৪.৭.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৭.৩.১ ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

৪.৭.৩.২ ঃ আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের গুরুত্ব

৪.৭.৩.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৭.৩.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৭.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অবদান।

২। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান এবং এর গুরুত্ব।

৪.৭.৩.১ ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের আপোষনীতির সমালোচনা করতে থাকেন। যুদ্ধকে সুভাষচন্দ্র এক বিরাট সুযোগ বলে ধরে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যুদ্ধ ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা ও সাফল্যের সুযোগ এনে দিয়েছে। বস্তুতঃ ১৯৩৫ থেকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর সুভাষচন্দ্র তীক্ষ্ন নজর রাখছিলেন এবং ১৯৩৮'এ হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের কথা বলেন এবং প্রয়োজনে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা ব্রিটিশ যুদ্ধনীতিকে সমর্থন না করলেও অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোকে সুস্থিরভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত বলে মনে করতেন। আসলে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিলেও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সকল পদক্ষেপ সুভাষচন্দ্র সমর্থন করতেন না। সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী যোগাযোগ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী, ফেডারেশন সম্পর্কে কঠোর মনোভাব, প্রজা আন্দোলনকে সমর্থন, বৃহত্তর আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকি, সর্বোপরি গান্ধীর অনিচ্ছাসত্ত্বে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জয়লাভ তাকে কংগ্রেসের দক্ষিনপন্থীদের এমনকি গান্ধীজীরও, প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন করে। ক্ষুব্ধ সুভাষ ১৯৩৯'এর এপ্রিলের শেষদিকে কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেন ও ফরোয়ার্ড ব্লক নামে আলাদা সংগঠন তৈরী করে জাতীয় সংগ্রামের জন্য ভারতবাসীকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে প্রাচ্য ও ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ব্রিটিশ শক্তি দারুণ সংকটের মধ্যে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় যুদ্ধবিরোধী মনোভাবে উৎকণ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০'এর ২রা জুলাই Defence of India আইনে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে। জেলে অনশনে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাকে তার এলগিন রোডের বাড়ীতে নজরবন্দী রাখা হয়।

বন্দী অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত হন যে ব্রিটিশ সরকার কোন অবস্থাতেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এরজন্য ভারতবাসীকে গণআন্দোলনে নামতে হবে। তিনি আরও নিশ্চিত হন যে যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় অনিবার্য। জাতীয় কংগ্রেস যেহেতু সেই মুহূর্তে গণআন্দোলনের পক্ষে ছিল না, সেহেতু ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিগুলির সহায়তায় ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনাই একমাত্র বিকল্প। এই পটভূমিতেই তিনি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৪১'এর ১৭ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে তিনি ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে কাবুল এবং রাশিয়া হয়ে বার্লিনে উপস্থিত হন

(মার্চ ২৮, ১৯৪১)। তার দেশত্যাগের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কীর্তি দলের সদস্যরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। জার্মানীতে তিনি জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করে ইউরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা পেশ করেন। ২৯ মে, ১৯৪১ সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু জার্মান সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারে রাজী ছিল না এবং মধ্য এশিয়া দিয়ে ভারত অভিযান বিষয়েও আদৌ আগ্রহী ছিল না। জুন মাসে জার্মানী অতর্কিতে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করায় সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন ইউরোপ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব। ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১) এবং বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। ১৯৪২'এর ফেব্রুয়ারীতে সিঙ্গাপুর ও মার্চে রেঙ্গুন জাপানী অধিকারে আসে। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন ইউরোপ নয়, দূর প্রাচ্যই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ বিষয়ে তিনি বার্লিনে জাপানী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন।

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানের অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। দীর্ঘকাল জাপান প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করায় উদ্যোগী হন। সৃষ্টি হয় 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স লীগ।' ১৯৪২'এর মার্চে টোকিও'তে এক সম্মেলনে ভারতের জন্য এক জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জুন মাসে ব্যাঙ্কক'এ রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে এক সমাবেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় এবং যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪২'এর ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন মোহন সিং। কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ আশানুরূপ হচ্ছিল না। জাপানী কর্তৃপক্ষ এই বাহিনীর অগ্রসরে উৎসাহী ছিল না। অন্যদিকে মোহন সিং'এর সঙ্গে জাপানী কর্তৃপক্ষ এবং রাসবিহারী বসুর মনোমালিন্য শুরু হল। মোহন সিং পদচ্যুত হন।

ইতিমধ্যে ১৯৪২'এর জুন মাসের ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সুভাষচন্দ্র সাগ্রহে তা গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া প্রায় দুরূহ ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এক দুঃসাহসিক সাবমেরিন অভিযানে ১৯৪৩'এর ১৬ই মে টোকিও পৌছান। ২রা জুলাই, ১৯৪৩ তিনি সিঙ্গাপুর পৌছান এবং রাসবিহারী বসু তার হাতে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' নামে অভিনন্দিত হন।

এরপর সুভাষচন্দ্র একটি অস্থায়ী সরকার গঠনে অগ্রসর হন। সিঙ্গাপুরে ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩'এ তিনি আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। শীঘ্রই জাপান, জার্মানী, ইটালী, বার্মা, থাইল্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩'এর ২৬'এ অক্টোবর ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৩'এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র Greater East Asia Conference'এ যোগদান করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তিসংগ্রামে জাপানের সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেন এবং জাপানী সহযোগিতার নিদর্শন

হিসাবে আন্দামান ও নিকোবর আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে প্রত্যার্পণ করেন। আজাদ হিন্দ সরকার এভাবে প্রথম বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতীয় অঞ্চল লাভ করে।

এরপর নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনে চুড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ১৯৪৩'এর ২৫শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৈন্যবাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট নেতাজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় শীঘ্রই সৈন্যসংখ্যা ১৩,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছল — ২০,০০০ সৈন্য এবং ২৩,০০০ স্বেচ্ছাসেবক। নারী সৈনিকদের জন্য 'ঝাঁসীর রাণী' নামে একটি ব্রিগেড গঠিত হল। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আয়ের একটি অংশ অনুদান দিতে আহ্বান জানালেন।

১৯৪৪'এর জানুয়ারীতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হল। কারণ ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করেই ভারত অভিযান অধিকতর সফল হবার সম্ভাবনা ছিল। সুভাষচন্দ্র সম্মিলিত (জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর) বাহিনীর চট্টগ্রাম আক্রমণের পক্ষপাতী হলেও জাপান সম্মিলিত মার্কিন-ব্রিটিশ নৌ ও বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় চট্টগ্রাম আক্রমণের পক্ষপাতী ছিল না। সুভাষচন্দ্র জাপানী বাহিনীর সহায়ক হিসাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র ও জাপানী সেনাধ্যক্ষ কাওয়ারের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয় যে — আজাদ হিন্দ বাহিনী জাপানী বাহিনীর সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে ; আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের নিজস্ব সামরিক আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ভারতের যে সব অঞ্চল মুক্ত হবে তার দায়িত্ব আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

১৯৪৪'এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে অভিযান শুরু হল এবং মার্চের শেষে ইম্ফল অধিকৃত হল। এপ্রিলের ৮ তারিখে কোহিমা অবরুদ্ধ হল। ১৯৪৪'এর মে মাস নাগাদ আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় উপস্থিত হল তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন চাপ বাড়ায় জাপান ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে বিমানবাহিনী সরিয়ে ফেলেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইম্ফল রণাঙ্গনে ব্রিটিশরা ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল। বর্ষা শুরু হওয়ায় খাদ্য ও রসদ সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও আজাদ হিন্দ বাহিনী বীর বিক্রমে কোহিমা দখলে রাখতে প্রয়াসী হয়। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে আজাদ হিন্দ বাহিনী রণাঙ্গন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ৫ই জুলাই ভারত অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ও জাপানী বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য সামরিক সাহায্য ও রসদের অপ্রতুলতা, নিম্নমানের সামরিক কৌশল এবং সর্বোপরি যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন যা ক্রমশ অক্ষবাহিনীর প্রতিকূল হয়ে পড়ছিল তা দায়ী ছিল। এই পরাজয় ও ব্যর্থতা নেতাজীকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। ১৯৪৪'এর ১৪ই আগষ্ট একটি ঘোষণায় তিনি জানান যে 'যুদ্ধ স্থগিত হয়েছে, উপযুক্ত সময়ে পুনরায় আক্রমণ শুরু হবে'। এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ জাপানের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছিল। মে মাসে ব্রিটিশরা রেঙ্গুন পুনর্দখল করেছিল। বাধ্য হয়ে আজাদ হিন্দ সদর দফতর ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হল। ১০ই আগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পন করে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাকা নিরাপদ হবে না মনে করে সুভাষচন্দ্র একটি জাপানী সামরিক

বিমানে সায়গন থেকে টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮ই আগস্ট তাই-হো-কু বিমানবন্দরে বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং কথিত আছে যে এই দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সামরিক কারণে অবধারিত ছিল। ১৯৪৪'এ ব্রহ্মদেশ থেকে ভারত অভিযান সময়োপযোগী ছিল না। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রণাঙ্গনে ব্রিটিশ-মার্কিন সেনাবাহিনী প্রত্যাঘাত শুরু করেছিল। মিত্রশক্তির অপর্যাপ্ত সামরিক ও আর্থিক শক্তির তুলনায় ব্রহ্ম রণাঙ্গনে জাপানের শক্তি ও সামর্থ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আরও দু'বছর আগে ১৯৪২'এ ব্রিটিশ বাহিনী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপর্যস্ত, ভারতের অভ্যন্তরেও যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন'এ মথিত, সে সময় ভারত অভিযানের কর্মসূচী গৃহীত হলে ব্রিটিশদের পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল হত। আসলে নেতাজী ১৯৪৩'এ যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করলেন তখন থেকেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে শুরু হয়েছে। তাই ভারত অভিযানের ক্ষেত্রে নেতাজীর কর্মসূচী ও রণকৌশল ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

৪.৭.৩.২ ঃ আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের গুরুত্ব

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যার্থতা সত্ত্বেও জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও তার বাহিনীর গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তিসংগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের প্রতি মোহে নয়, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে তিনি অক্ষ-শক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তার কর্মপ্রয়াসে তিনি কখনই স্বাধীনতার আদর্শকে বিসর্জন দেননি। আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল অসাম্প্রদায়িকতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। ঝাঁসী রানী বাহিনী নারী ক্ষমতার উপর অটুট অবস্থার উদাহরণ।

আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভাঙনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধৃত সৈনিকদের মুক্তির দাবীতে সারা ভারতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা ব্রিটিশ শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তীব্র জনমতের চাপে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল, যার পরিণতি ১৯৪৬'এর নৌ-বিদ্রোহ। ডঃ সুমিত সরকারের মতে "...the wave of disaffection in the British Indian Army during the winter of 1945-46 which culminated in the great Bombay Naval Strike of February 1946 and was quite possibly the single most decisive reason behind the British decision to make a quick withdrawal." নেতাজী এবং তার আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক পটভূমিতে উপস্থাপিত করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিদায় ও পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি লাভই প্রমাণ করে যুদ্ধকালীন সংকটকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্বপক্ষে ব্যবহার করার যে নীতি নেতাজী গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থই ছিল।

৪.৭.৩.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Netaji Research Bureau — Netaji and India's Freedom.

(২) সুমিত সরকার — আধুনিক ভারত।

(৩) তারাচাঁদ — History of the Freedom Movement in India – Vol-IV.

(৪) প্রণব চট্টোপাধ্যায় — আধুনিক ভারত ।

(৫) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় — পলাশী থেকে পার্টিশান

৪.৭.৩.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদানের মূল্যায়ন কর।

(২) কোন পরিস্থিতিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল? আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

(৩) আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পর্যায়- ৫

প্রান্তিক স্বর

একক- ১২

উদ্দেশ্য

সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় জাতি, বর্ণ, সমাজ, শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশই বাড়ছে। আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে দলিত শ্রেনীর অনুন্নয়নের রূপরেখা, তাদের প্রতি বঞ্চনা ও দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে আগ্রহের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। দলিত ইতিহাসচর্চার এই আঙ্গিক সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ইতিহাস পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কারনে আলোচ্য পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা 'দলিত' নামক পিছিয়ে পড়া একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব, তাদের সামাজিক বিবর্তন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবীতে তাদের আন্দোলন এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সর্বোপরি, দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনধারা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ইতিহাস চর্চার গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থী ও পাঠকগন বিশেষ ভাবে অবহিত হবে।

জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরেকটি গুরুত্ব ছিল। যেসব আন্দোলনে জাতপাতের বিরোধিতা করা ছিল প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুরা এসময়ে অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত ছিল। যে জাতিতে কোন একজন জন্মাতো তার জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জাত-ই নির্ধারণ করতো। সেই জাত-ই ঠিক করতো কাকে সে বিয়ে করবে, কার সাথে বসে সে খাবে। সেই হাত-ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পেশাও ঠিক করে দিত। সামাজিক ক্ষেত্রে আনুগত্যের বিষয়টি সেই হাত-ই ঠিক করে দিত। জাতগুলির মধ্যে মর্যাদার প্লাবক ক্রম খুব সতর্কতার সাথ সৃষ্টি করা হয়। মইয়ে শেষ ধাপে এসেছিল অস্পৃশারা যাদেরকে পরে বলা হয় মিডিউলড কাস্ট। হিন্দুদের মধ্যে এরা ছিল ২০ শতাংশ। অস্পৃশ্যরা নানা বাধানিষেধের মধ্যে দিন কাটাতো। জায়গায় জায়গায় সেসব বাধানিষেধও হত বিচিত্র। তাদের স্পর্শ অশুদ্ধ মনে করা হত। তাদের স্পর্শকে দূষণের উৎস মনে করা হত। দেশের কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যদের ছায়াও এড়িয়ে যেতে হত। কাজেই তারা যদি ব্রাহ্মণকে আসতে দেখতো কিংবা ব্রাহ্মণের আসার খবর শুনতো, তবে তাদেরকে দূর দিয়ে হেঁটে যেতে হত কিংবা দূরে সরে যেতে হত। একজন অস্পৃশ্যের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান খুব সতর্কতার সন্দে নিয়ন্ত্রণ করা হত। সে কুয়ো থেকে জল তুলতে পারতো না। যেসব পুকুর উচ্চজাতির মানুষজন ব্যবহার করতো, সেসব পুকুর অস্পৃশ্যরা ব্যবহার করতে পারতো না। কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট কুঁয়ো ও পুকুর তারা ব্যবহার করতে পারতো। যেখানে নর্দমার বা জলাশয়ের নোংরা জল খেয়ে জীবন ধারণ করতে হত। সে হিন্দু মন্দিরে ঢুকতে পেতো না বা হিন্দু শাস্ত্রও পাঠ করতে পারতো না। প্রায়শই যেসব বিদ্যালয়ে উচ্চজাতির ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতো, সেখানে অস্পৃশ্যদের ছেলেমেয়েরা পড়তে পেতো না। পুলিশ ও ফোবাহিনীর মতো সরকারী বিভাগেও তার কোন চাকরী ছিল না। অস্পৃশ্যদের বাধ্য করা হত অপরিচ্ছন্ন কাজ করতে যেমন আবর্জনা পরিস্কার করা, জুতো তৈরী করা, শব দেহ সরানো, মৃত প্রাণীর চামড়া ছাড়ান ইত্যাদি।

আরেকটি ক্ষেত্রে জাতপাত খুবই খারাপ ছিল। জাত পাত শুধুমাত্র লজ্জাকর ও কি ছিল না, এর ভিত্তিই ছিল অগণতান্ত্রিক, জন্মগত বৈষম্য ছিল সক্রিয়া। সামাজিক অনেকের কারণও ছিল এটি। এই কারণে এদেশের মানুষ অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আধুনিককালে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়ভাব জাগরণের ক্ষেত্রে এই জাতপাতের বিচার ভয়ানক বাধা হয়ে উঠেছিল। গণতন্ত্রের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই জাতপাতের বাধা ছিল। এটি উল্লেখ্য যে বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলমান খৃষ্টান, শিখদের মধ্যে জাতপাতের বিচার করা হত। এরাও অস্পৃশ্যতা মেনে চলতো তবে ততটা ভয়ানক ভাবে নয়।

ব্রিটিশ শাসনে অনেক শক্তি জেগে ওঠে যেগুলি জাতপাতের বিষয়টির গুরুত্বকে কমিয়ে দেয়। আধুনিক শিল্প, রেলপথ, বাস, চালু হওয়ার ফলে এবং ক্রমবর্ধমান জাগরণের কারণে বিভিন্নজাতির মানুষের মধ্যে মেলামেশা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শহর এলাকায়। আধুনিক ব্যবসা ও শিল্প চালু হওয়ার ফলে সকলের কাজের জন্য নতুন অনেক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে যায়। যেমন একজন ব্রাহ্মণ বা উচ্চজাতির কোন লোক বা ব্যবসায়ী চামড়ার ব্যবসা করার সুযোগ পোতো। আবার মেয়াদি ডাক্তাররা যদি সৈন্য হতে চাইতো তাও সে হতে পারতো। অবাধে জমি বিক্রির বিষয়টি চালু হওয়ার ফলে গ্রামে গ্রামে জাত পাতের ভারসাম্য যাহত হয়। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে পেশা স্বার্থে জাতপাতের নিকট সম্পর্ক আর চলেনি। লাভ করার উদ্দেশ্যটাই ক্রমে প্রাধান্য পেতে থাকে।

প্রশাসনের বিষয়ে ব্রিটিশ আইনের চোখে সমতার বিষয়টি চালু করে। জাতি পঞ্চায়েতের হাত থেকে বিচার বিভাগীয় দায় দায়িত্ব সরিয়ে দেয়। ক্রমেই সবজাতির উদ্দেশ্যেই প্রশাসনিক চাকরির দরজা খুলে দেয়। অধিকন্তু নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল। কাজেই মূলত ছিল জাতপাতের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। জাতিগত দৃষ্টিভদীরও বিরুদ্ধে ছিল সে শিক্ষা ব্যবস্থা।

ভারতীয়দের মধ্যে যত আধুনিক গণতান্ত্রিক ও যৌক্তিক ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, ততই জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হতে শুরু করে। ব্রাহ্মসমাজ, প্রর্থনাসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণমিশন, হিওসোফিস্টরা সোসাল কনফারেন্স এবং উনবিংশ শতকের প্রায় সব মহান সংস্কারকেরছি জাতপাতের বিষয়টিকে আক্রমণ করেন। এমনকি যদিও তাদের অনেকেই চতুর্থ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন, কিন্তু তারা জাতিপ্রথার সমালোচনা করতেন। বিশেষ করে তারা অস্পৃশ্যতা চর্চা করাটাকে নিন্দা করতেন। তারা উপলব্ধি করেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায় তবে দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতি ঘটানো যাবে না। জাতিপ্রধাকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ তৈরী করতো,জাতীয় আন্দোলন সেসবের বিরুদ্ধে ছিল। জনসভায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহ গণবিক্ষোভ সকলের অংশগ্রহণ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন জাতপাতের চেতনাকে দুর্বল করে দেয়। যাই হোক যারাই বিদেশী শাসন থেকে দেশের মুক্তির জন্য লড়তি করেছে, সাম্য ও মৈত্রীর নামে দেশের হয়ে লড়াই করেছে, তারা জাতিপ্রথাকে সমর্থন করতে পারে নি। কারণ জাতিপ্রথা এইসব আদর্শ বিরোধী হয়ে থাকে। এইভাবে প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন জাতিগত সুযোগ সুবিধার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে লড়াই করেছে। জাতপাত, লিন্দ্ব বা ধর্মনির্বিশেষে ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেছে।

মানুষের হয়ে কাজ করতে গিয়ে সারা জীবন ধরে গান্ধী অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। ১৯৩২ সালে এই উদ্দেশ্যে তিনি অল ইণ্ডিয়া হরিজন সংঘ স্থাপন করেন। অস্পৃশ্যতার মূল উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর অভিযান ছিল। মানবতা ও যুক্তিভিত্তিক। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝান যে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে কোথাও অস্পৃশ্যতার অনুমোদন নেই। কিন্তু তবুও যদি কোন শাস্ত্রে থেকে থাকে তবে সেই শাস্ত্র উপেক্ষণীয় কারণ তা মানুষের মর্যাদার বিরোধী। তিনি বলেন যে সত্যকে কখনো বইয়ের মলাটের মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী কাল থেকে অসংখ্য ব্যক্তি ও সাধীন অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিক্ষা ছড়ানোর কাজে হাত দেয়। পরবর্তীকালে এই সব অস্পৃশ্যরাই ছিল নিষ্পীড়িত শ্রেণী ও সিসিউলস কাষ্ট। তাদের জন্য মন্দিরের দরজা, বিদ্যালয়ের দরজা খোলার চেষ্টা হয়। তারাও যাতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খোঁড়া কুঁয়ো ও জলাশয় ব্যবহার করতে পারে সেই চেষ্টা হয়। তাঁদের জীবন থেকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা হয়। শিক্ষা ও জাগরণের ভাব যত ছড়িয়ে পড়ে নিম্নতর শ্রেণীর মানুষেরা ততই নড়ে চড়ে বসতে শুরু করে। তারা তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সেইসব অধিকার রক্ষায় তারা তৎপর হয়ে ওঠে। পরম্পরাগত উচ্চবর্ণীয় মানুষের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা এবারে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে নিম্নজাতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সারা জীবন ধরে উচ্চজাতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসাবে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। তিনি মনে করতেন নিম্নজাতির মানুষের মুক্তির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হল আধুনিক শিক্ষা লাভ। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি আর. আম্বেদকর একজন সিডিউল কাষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ছিলেন। সারা জীবন ধরে জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অল ইণ্ডিয়া সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন সংগঠিত করেন। আরো অনেক নিপীড়িত সিডিউল কার নেতারা 'অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনারায়ণ শুরু জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তিনি সেই বিখ্যাত স্লোগান তুলেছিলেন "মানবজাতির হোক এক জাতি, একধর্ম ও এক ঈশ্বর।" দক্ষিণভারতে অব্রাহ্মণরা ১৯২০-র দশকে সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্ট শুরু করে। উদ্দেশ্য, তাদের ওপরে ব্রাহ্মণেরা যেসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিল সেসবের বিরোধিতা

করা। উচ্চ ও নিপীড়িত জাতির মানুষেরা একত্র হয়ে অসংখ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করে। উদ্দেশ্য, নিপীড়িতদের ওপরে যেসব বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ওপরে মন্দিরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল সেসবের বিরোধিতা করা।

তবে বিদেশী শাসনের আমলে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পুরোপুরি সফল হতে পারে নি। কেননা বিদেশী সরকারের এদেশের সমাজের গোঁড়াদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় ছিল। কেবলমাত্র স্বাধীন ভারতের সরকারের পক্ষেই সমাজের আমূল সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব ছিল। অধিকন্তু সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টির সন্দে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের বিষয়। উদাহরণ, নিপীড়িত জাতির মানুষদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য একান্তই জরুরী ছিল অর্থনৈতিক প্রগতি। তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার জরুরী ছিল। জরুরী ছিল তাদেরকে রাজনৈতিক অধিকার দান। ভারতীয় নেতারা এই বিষয়গুলি পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন।

১৯৫০ সালের সংবিধানে আইন করে অস্পৃশ্যতার চূড়ান্ত উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থা করা হয়। ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'অস্পৃশ্যতার মূলচ্ছেদ হল। বাস্তবিক ক্ষেত্রে কোনভাবেই এর চর্চা নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতাজনিত কোনধরণের প্রতিবন্ধকতাকে অনুমোদন করলে আইনের চোখে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।" কুঁয়ো, জলাশয়, স্নানের ঘাট ব্যবহার অথবা দোকানে, রেস্তরায়, প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন নীতি হল, যা কিনা সরকার পরিচালনায় পথপ্রদর্শক, "রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণকে রকম বাধা নিষেধকে সংবিধান নিষিদ্ধ করেছে।

<u>দলিত ইতিহাসচর্চা</u>

<u>কাদের বলা হয় দলিত</u>

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতে আসে। এই সময় আর্যরা ভারতীয় জনসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র -- এই চারটি বর্ণে ভাগ করেন। প্রথম তিন বর্ণের মানুষকে সেবা করতে বাধ্য হত শূদ্ররা। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে এরা ছিল অস্পৃশ্য। পরবর্তীকালে (বৃটিশ শাসনকালে) এরাই 'দলিত' নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, দলিতরা নানা দিক থেকেই উচ্চবর্ণের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।

'দলিত' শব্দটি 1930 এর দশকে প্রথম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই আবার বর্তমান প্রশাসনিক পরিভাষায় তপশিলিজাতি ও তপ শিলি উপজাতি ভুক্ত সকলকেই**'দলিত'** বলে আখ্যায়িত করতে চান।
ভারতের এই তথাকথিত দলিত বা অনুন্নতশ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে অনাচার,বিভিন্ন মানবিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা বা অস্পৃশ্যতা দেশের সব মানুষ মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ উঠেছে এবং ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক গোষ্ঠী অস্পৃশ্যতা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দলিত মতাদর্শ ও অধিকার নিয়ে ভারতীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ গান্ধীজী এবং দলিত আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড. বি. আর. আম্বেদকর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বৈদিক যুগ থেকে কতকগুলি পীড়নমূলক ও অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের একটা গোষ্ঠীকে 'অস্পৃশ্য' বলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। হিন্দু সমাজের অংশ হয়েও তারা ছিল হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত। এ আর দেশাই-এর মতে, 'অস্পৃশ্যতা হল ভারতবর্ষে আর্য অধিকারের সামাজিক পরিনাম'। সামাজিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় বিজিত ভারতীয়দের একাংশ আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে যারা সব থেকে অনুন্নত তারাই বংশানুক্রমিক অস্পৃশ্যজাতে পরিণত হয়েছিল। বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে অস্পৃশ্যরা 'দলিত' বা নিপীড়িত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। গান্ধী এই শ্রেনীকে 'হরিজন' নামে অভিহিত করেছেন। Louis Dumont- এর মতে, ভারতে সামাজিক মর্যাদাগত স্থান নির্ধারণের বিষয়টি মুলত ছিল ধর্মীয়। শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মাপকাঠিতে স্থির করা হত সামাজিক পদমর্যাদা ও স্থান। ব্রাহ্মণ পূর্ণ শুদ্ধ হওয়ায় তার স্থান ছিল সবার উপরে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ হিসেবে অস্পৃশ্যদের সবার নিচে স্থান দেওয়া হতো।

ধর্মীয় বিধান বা অনুশাসন দ্বারা অস্পৃশ্য বা দলিত শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হবার ফলে এই শ্রেনীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন সামাজিক স্বীকৃতি পায়। হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমিক অস্পৃশ্যদের হীন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে হতো। সামাজিক বা বিধিগত কোন বৃত্তি

অবলম্বনের অধিকার দলিতদের থাকতো না। মন্দিরে প্রবেশ করা, একই পঙক্তিতে বসে ভোজন করা, উচ্চবর্ণের পাশাপাশি বসবাস করা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মানবিক অধিকার ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত থেকেই দলিতদের বাঁচা ছিল সামাজিক বিধান।

ধর্মের বিধান থেকেই অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক রূপ দেওয়া হলেও মাঝে মাঝে ধর্মের বিচার থেকেই এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়েছে। ধর্মভাবনা সর্বদা সর্বজনীন ছিল না। বিভিন্ন সময় ধর্মের ভিতর থেকেই ধর্মের প্রাধান্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। মধ্যযুগের ভক্তিবাদী আন্দোলন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মসংস্কারক ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। তারা ধর্মাচার ভিত্তিক জাতি ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিশুদ্ধ ভক্তির নিরিখে সকল সামাজিক মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। এই আন্দোলন সামাজিক গতিশীলতা বা social mobility র সম্ভাবনা দৃঢ় করেছিল।

জাতি ব্যবস্থার উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিকরা দলিত ইতিহাস চর্চায় লিপ্ত হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের উত্থান ঘটে। এগুলি হল-

১) দলিত বিষয় নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলি কিভাবে ইতিহাসচর্চার একটি কার্যকর মডেল গড়ে তুলেছে?

২) তারা কি আদৌ কোন বিকল্প ইতিহাস চর্চা গড়ে তোলে?

৩) এই ধরনের ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি কি হতে পারে?

৪) Elite colonialist, জাতীয়তাবাদী এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার বিকল্প হিসাবে এই ধরনের ইতিহাস চর্চাকে কি প্রতিপন্ন করা উচিত?

উল্লেখ্য, দলিত activists এবং লেখকরা দলিত ইতিহাস চর্চার আলচনা প্রসঙ্গে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের ভুমিকার সমালোচনা করেছেন। তাদের প্রধান বক্তব্য হল নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত পার্থ চ্যাটার্জীর ন্যায় অন্যান্য ঐতিহাসিক ও গবেষকরা কেন আম্বেদকরের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন? এছাড়াও বলা হয় যে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা মুলত Dumont এবং Dirks দের সম্পর্কে যতটা আলোচনা করেছেন, Periyar, Phule, অথবা Ambedkar সম্পর্কে তারা ততটাই নীরব থেকেছেন।

প্রসঙ্গত একথা বলা যায় যে, নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের কাজের পরিধি বিশ্লেষণ করলে দলিত গবেষকদের উপরিউক্ত সমালোচনাকে গ্রহন করা যায় না। যেমন নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক জ্ঞ্যানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর ‘ A History of Prejudice: Race, Caste and Difference in India and the United States’ নামক গ্রন্থে আম্বেদকর, দলিত আত্মচরিত, ১৯৫৬ সালের দলিত ধারনার রূপান্তর, দলিত রাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। একই ভাবে পার্থ চ্যাটার্জী ২০০৪ সালে প্রকাশিত ‘The Politics of the Governed’ নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তথা ‘The Nation in Heterogeneous Time’-এ আম্বেদকরের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের রাজনৈতিক গঠনে তার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্গীয় চর্চার সাথে যুক্ত গবেষকরা জ্ঞানদীপ্তোর যুগের নৈতিক গুণসমূহ যথা স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ইত্যাদির সাথে ‘দলিত’ এর যুগপৎ আলোচনায় সমস্যা অনুভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক গবেষক ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, ‘the problem is so haunting in this case that Chakravorty and Pandey find it difficult to have intellectual alignment with either of those two diametrically opposite personalities and their philosophies that are situated at the two ends of India’s political spectrum — Gandhian village life of *Ram rajya* on the one hand, and an “Ambedkarite modernity” on the other। দীপেশ চক্রবর্তী এবং জ্ঞ্যানেন্দ্র পাণ্ডে উভয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বি আর আম্বেদকর দলিত এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রেরনা। কিন্তু যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সমস্ত শোষিত ও পরাধীন মানুষদের মাঝে নিখুঁত বেশভূষা, দ্ব্যর্থহীনভাবে যুক্তিসংগত ও জ্ঞানী, শিক্ষিত, শান্ত ও অবিচল এবং একজন বলিষ্ঠ আধুনিক নেতা হিসাবে আম্বেদকরের ভাবমূর্তি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা দলিত কথন কে আধুনিকতার অভিব্যক্তি হিসাবে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। ঐতিহাসিক Gail Omvedt তাঁর ‘Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial

India' গ্রন্থে উনিশ শতকের সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সালে আম্বেদকরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দলিত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগুলি তুলে ধরেছেন। মুলত অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে Dr. Omvedt একদিকে যেমন দলিত আন্দোলনের আদর্শ এবং সাংগঠনিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন (বিশেষ করে গান্ধী তথা গান্ধীবাদ) এবং মার্কসবাদের প্রেক্ষাপটে কৃষক-শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের সাথে এর বোঝাপড়া তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি জাতিভেদ ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং বিকাশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে ভারতীয় দলিত সাহিত্য মূলত জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত। মনুষ্য সমাজের এই প্রক্রিয়া ভাঙার চেষ্টা বহুবার বহু সময়ে হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে একে ভাঙার যে শক্তি, একে টিকিয়ে রাখার শক্তি তার থেকে অনেকগুণ বেশি। বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য দখল এবং হিন্দু স্ক্রিপচারগুলিকে পুনর্লিখনের ভিতর দিয়ে সেই শক্তি প্রথমে সংহত হয়। তারপর, সেন রাজাদের প্রয়াস এবং শঙ্করাচার্যের প্রচারে সেই ভিত অনেক মজবুত হয়। মধ্যযুগের প্রায় ৬০০ বছরের মুসলমান রাজত্বে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বে এদেশে বর্ণবিভাজন, পুরোহিততন্ত্র ও মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে স্বাধীনোত্তরকালেও দলিতদের অবস্থান, তাঁদের উপর শোষণ, নির্যাতন, গণনিধন, দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এদেশে 'ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম' তার সঠিক উদ্দেশ্য লাভে আদৌ সফল হতে পারবে কিনা !

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে যেমন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজে বিষের মতো ছড়িয়ে ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালেও চরিত্রগত কিছু হেরফের হলেও তার মূল কাঠামো অপরিবর্তনীয় আছে। তবে আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের ইতিকথা ইতিমধ্যেই অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিশ শতকের ষাটের দশকের দলিত আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখন ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দি ভাষাভাষী প্রদেশগুলির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলিও পিছিয়ে নেই এই মুহূর্তে।

<u>ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন</u>

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার-এর সূত্রে ভারতে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাঁরা মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, সোশাল রিফর্ম কনফারেন্স প্রভৃতি সংগঠনসহ মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত হরিজন সংঘ'-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন দলিত বা হরিজনদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালান। দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুত্রেই এই শ্রেনী থেকে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হয়। তিনি দলিত শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'All India Depressed Classes Federation'। এছাড়াও দলিত শ্রেনীভুক্ত বিভিন্ন জাতীর অসংখ্য স্থানীয় ও গোষ্ঠীগত সংগঠন ছিল। এইসব সংগঠনের নেতৃত্বে দলিতদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ শুরু হয়।

ভারতে দলিত শ্রেনীর জাগরণে খ্রিস্টান মিশনারিদের পরোক্ষ অবদান উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টান মিশনারীরা দলিতদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের খ্রিস্টধর্মের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে দলিতরাও ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আগ্রহ বোধ করেন। একইসঙ্গে মিশনারিরা দলিতদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ চেষ্টা চালান। নতুন শিক্ষা প্রসারের ফলে দলিতদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগরিত হয়। গবেষক পি. কনস্টেবল তাঁর 'Modern Asian Studies' গ্রন্থে *'দলিত শ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি'* বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আত্মসম্মানের এই বানীকে দলিতদের মধ্যে কিছু সুসংবদ্ধ মানুষ ভক্তিবাদী আদর্শের সাথে যুক্ত করে নেন এবং জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাবাদর্শ গড়ে তোলে'।

জাতিগত আত্মসম্মানবোধ এবং জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে দলিতদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী জাগরণের ঘটনা সামনে আসে। কেরলে 'পুনারা', তামিলনাড়ুতে 'নাদার', মহারাষ্ট্রে 'মাহার', বাংলার 'নমঃশূদ্র', দিল্লি, ছত্রিশগড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন শ্রেনীর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়। দলিত শ্রেণী প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতি হিসেবে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতি পদ্ধতি অমান্য বা ভঙ্গ করার

পথ বেছে নেয়। যেমন অস্পৃশ্যরা হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতো না। তাই প্রতিবাদ হিসাবে তারা জোটবদ্ধ হয়ে মন্দিরে প্রবেশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতকের গোড়ায় এমনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল- ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ভাইকম সত্যাগ্রহ, গুরুভায়ু সত্যাগ্রহ (১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দ), ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কালী মন্দির সত্যাগ্রহ (মুন্সিগঞ্জ), ১৯৩০-৩৫ খ্রিস্টাব্দে কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহ (নাসিক) ইত্যাদি।

ধর্মীয় অধিকারের দাবির পাশাপাশি দলিত শ্রেনী সামাজিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনমুখী হয়। দলিতরা দাবি করে যে, তারাই ভারতের আদি অধিবাসী, যারা বহিরাগত আর্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এখন তারা পূর্বের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে সোচ্চার হয়। দলিত শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে পোশাক বিধির নানান কঠোরতা সামাজিক ভাবে চালু ছিল। উচ্চবর্ণের মহিলাদের অনুরূপ পোশাক নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এজভ এবং নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাতেও ১৮৭০-এর দশকে নমঃশূদ্র শ্রেনী উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চালায়। পানীয় জলের কূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দলিতদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ ছিল। এই কূপের জল ব্যবহারের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবিতে মহারাষ্ট্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে চামারদের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়।

দলিতদের জাগরনবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রীঃ) দেশে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মুক্তি ছাড়া ভারত শক্তিশালী জাতি রূপে গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি ‘দলিত’ শ্রেনীকে (Depressed Class) ‘হরিজন’ নামকরনের বিরোধিতা করেন। আম্বেদকর এর মতে, সামাজিক পার্থক্য থাকার জন্য হিন্দুদের মধ্যে কোন জাতিয়তাবাদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতার ধারনা লুকিয়ে আছে। অবশ্য তাঁর সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক আছে। যাইহোক একাধিক দলিত সংগঠন তৈরি করে তিনি দলিত-মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাহার এলাকার (মহারাষ্ট্র) স্থানীয় পুরসভার নিয়ন্ত্রণভুক্ত পানীয় জলের কূপ ব্যবহারের দাবীতে কয়েক হাজার দলিতের সমন্বয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। একই বছরে মনুস্মৃতি আগুনে পুড়িয়ে তিনি অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, এই গ্রন্থটি অস্পৃশ্যতার ধারণা বিষয়ক আদি গ্রন্থ।

জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে জাতি ভেদাভেদ বা অস্পৃশ্যতার বিষয়গুলিকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। গান্ধীই প্রথম অস্পৃশ্যতার কুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করেন। অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২ খ্রিঃ) প্রস্তাবে স্বরাজ অর্জনের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়ে জোর দেন। কিন্তু গান্ধী হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার না করেই হরিজন শ্রেনীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণ হিন্দুদের কাছে নিপীড়িত শ্রেণিকে আপন করে নেবার পরামর্শ দেন। ডঃ আম্বেদকর জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচিকে দলিত শ্রেনীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সহায়ক বলে মনে করতেন না। তাই তিনি গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩১ খ্রিঃ) দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। ‘সর্বভারতীয় নিপীড়িত শ্রেনীর সমিতি’র সভাপতি এম সি রাজা স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষয়ে আম্বেদকরের বিরোধিতা করেন। তবে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের ঐক্যে ভাঙন ধরানোর লক্ষ্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ‘সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ’ (Communal Award)-এ দলিতদের ‘তপশিলি জাতি’ (Scheduled Caste) হিসেবে পৃথক নির্বাচনে অধিকার প্রদান করে। গান্ধী এর বিরুদ্ধে আমরন অনশন শুরু করেন। এমতাবস্থায় আম্বেদকর ‘পুনাচুক্তি’ স্বাক্ষর করে একটা সমঝোতায় আসেন। এই চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকে এবং তপশিলি জাতির জন্য 151 টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

দলিতদের সংগঠিত করার বিষয়ে গান্ধীর সাথে কংগ্রেসের মতান্তর ঘটে। গান্ধী ‘হরিজন সেবক সঙ্ঘ’-এর মাধ্যমে দলিতদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কাজ শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা জগজীবন রামের নেতৃত্বে ‘সর্বভারতীয় নিপীড়িত শ্রেণীর লিগ’ গঠন করে (১৯৩৫ খ্রিঃ) সংরক্ষিত আসনগুলি দখলের উদ্যোগ নেন। তবে ১৯৩৭-এর নির্বাচন সফল হয়নি। অন্যদিকে আম্বেদকরের ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি’ বোম্বাইয়ে বিপুল সাফল্য পায়। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে দলিত শ্রেণীর মানুষেরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় রাজনীতির মুল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও আম্বেদকর পরিস্থিতির দাবি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি পদে আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে কংগ্রেস তাদের সদিচ্ছা প্রকাশ করে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ‘তপশিলি জাতি’ ও ‘তপশিলি উপজাতি’-এই পর্যায়ে দলিত ও নিপীড়িত শ্রেনীর জন্য বহুমুখী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

১. ‘Dalit Studies’---- Ramnarayan S. Rawat

2. ‘Dalits and the Democratic Revolution: Dr Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India’---- Gail Omvedt.

৩. ‘Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956’----Ramacandra Kshirasagara

সংগৃহীত ঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

SOCIETY IN COLONIAL INDIA

ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)

একক - ২

ভারতের ইতিহাসে নারী

উপএকক - ১

অবস্থা, সম্পত্তির অধিকার, সংস্কারমূলক আইন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

গঠন (Structure) ঃ

৪.৪.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৪.২.১.১ ঃ ভূমিকা

৪.৪.২.১.২ ঃ নারীদের অবস্থা

৪.৪.২.১.৩ ঃ নারী শিক্ষাব্যবস্থা

৪.৪.২.১.৪ ঃ নারী সংগঠন

৪.৪.২.১.৫ ঃ নারীদের আইনী অধিকার ও সংস্কারমূলক আইন সমূহ

৪.৪.২.১.৬ ঃ ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় নারীর ভূমিকা

৪.৪.২.১.৭ ঃ উপসংহার

৪.৪.২.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৪.২.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৪.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা

(২) নারীজাতির শিক্ষাব্যবস্থা

(৩) নারীজাতির নিজস্ব সংগঠন

(৪) নারাদের আইনী অধিকার

(৫) ঔপনিবেশিকতাবিরোধী অন্দোলনে ভারতীয় নারীর ভূমিকা

(৬) ভারতীয় নারীর রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা

৪.৪.২.১.১ ঃ ভূমিকা

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থাকে প্রান্তিক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীর আইনী অধিকার ছিল না বললেই চলে। আইনী কাঠামোর বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পুরুষতন্ত্রের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে পুরুষদের অবস্থান ছিল মেয়েদের তুলনায় উঁচুতে।

ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ইংরেজী শিক্ষার সূচনা, rule of law বা আইনের শাসনের ধারণা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ— এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে সীমাবদ্ধ আকারে হলেও কিছু পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথম পরিবর্তন আসে বর্ণ ব্যবস্থায় সচলতা সৃষ্টির মধ্যে। দ্বিতীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে নারীদের অবস্থার ক্ষেত্রে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নারীদের অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা উপস্থিত করা।

৪.৪.২.১.২ ঃ নারীদের অবস্থা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে নারীরা ছিল সমাজের প্রান্তিক শক্তি। প্রথমতঃ ইতিহাস চর্চাতেও নারীদের অবস্থার উল্লেখ খুব বেশি থাকত না। ভারতী রায় মন্তব্য করেছেন, “women have long been pushed to the seams of history. The marginalization of women, both in mainstream history and in society, has been a political act.” এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন জানিয়ে বলা যায় নারীদের প্রান্তিকতা কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়াও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঔপনিবেশিক ভারতে নারী প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করবো।

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার এবং আধুনিকতার ধারণা আসার পর থেকে নারী প্রশ্ন ভারতীয় চিন্তায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারী প্রশ্ন কিভাবে ‘আধুনিকতার’ ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের নারীর প্রান্তিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা দরকার। ভারতীয় সমাজ মুখ্যত পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ সমাজে পুরুষদের অবস্থান, মর্যাদা

ও অধিকার নারীদের তুলনায় উঁচুতে। সনাতন ভারতীয় সমাজে নারী তাই সম্পূর্ণ অর্থে অধিকারশূন্য। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার উদাহরণ খুব কম। রাজনৈতিক জীবনে নারীদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনজন মাত্র মহিলা আসীন হয়েছেন— প্রথমজন অ্যানি বেশান্ত (১৯১৭), দ্বিতীয়জন সরোজিনী নাইডু (১৯২৫), তৃতীয়জন নেলী সেনগুপ্ত। এই রাজনৈতিক প্রান্তিকতা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত ছিল। পরিবারের কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও সচরাচর মহিলাদের মতামত নেওয়া হত না। সম্পত্তির অধিকার মেয়েদের ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে নাবালিকা অবস্থায় মেয়েদের বিবাহ না হলে জাতিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে সতী প্রথার প্রচলন ছিল। পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে পারতো। শিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র পুরুষদের ছিল, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন সংগঠিত উদ্যোগ প্রাক-ঔপনিবেশিক সনাতন ভারতীয় সমাজে দেখতে পাওয়া যায় না। এক কথায় বলতে গেলে নারীরা বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দু নারীরা এক অস্বাভাবিক প্রান্তিক অবস্থায় দিনযাপন করতে বাধ্য হত। নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে মেয়েদের অবস্থা অনেকটাই অন্যরকম ইতিবাচক ছিল। অর্থনৈতিক কারণেই নিম্নবর্ণের মেয়েরা 'বাইরের' কাজে অংশগ্রহণ করত। উচ্চবর্ণের মেয়েদের মতন তাদের 'ঘরে' আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার ফলে যখন তথাকথিত নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে লাগলো তখন কিন্তু এদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের রক্ষণশীলতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। বস্তুত এগুলি ছিল নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা উচ্চবর্ণের মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার আচরণকে অনুকরণ করা মাত্র। নিম্নবর্ণের মানুষদের মনে হত মেয়েদের প্রান্তিকতায় রাখতে পারলে বোধহয় উচ্চবর্ণের মতন সামাজিক মর্যাদা লাভ করা সম্ভব। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনে আধুনিকতার ভূমিকা আদৌ কোন একমাত্রিক ও জটিলতাহীন প্রক্রিয়া ছিল না। নারী প্রশ্ন ও নারীর সমতায়নকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা' বা 'colonial modernity' র প্রেক্ষিতে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কোন বুর্জোয়া রূপান্তর ঊনিশ শতকে ঘটেনি। বরং ঔপনিবেশিকতাবাদের মাধ্যমে এক ধরনের সীমাবদ্ধ আধুনিকতা বাংলা, তথা ভারতবর্ষে আসে। ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক নানা উপাদান যেমন বর্ণগত, লিঙ্গগত প্রভৃতি বৈষম্য ভারতীয় সমাজে টিকে ছিল। অর্থাৎ ঊনিশ শতকের ভারতবর্ষে আধুনিকতার বিস্তার ছিল বহুলাংশে খণ্ডিত ও খর্বিত। এই খণ্ডিত, খর্বিত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্য দিয়েই নারী প্রশ্ন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উঠে আসে।

তাত্ত্বিকভাবে চিরাচরিত ভারতীয় শাস্ত্র বা ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে নারীদের অবস্থা সুনির্দিষ্ট। Geraldine Forbes এর ভাষায়, "Indian texts essentialized women as devoted and self sacrificing, yet occasionally rebellious and dangerous. Texts on religion, law, politics and education carried different pronouncements for men depending on caste, class, age and religious sect. In contrast, women's differences were overshadowed by their biological characteristics and the subordinate, supportive role they were destined to play". অর্থাৎ নারীর ভূমিকা অধীনস্ত— সহযোগীর, ভারতীয় সমাজে কখনো কখনো নারীর ভূমিকাকে গৌরবান্বিত করে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণভাবে সমাজে নারীর ভূমিকা অবদমিত।

ঊনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ আধুনিক ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার জন্য উচ্চবর্ণের

ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরা প্রথম এগিয়ে আসে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ রোধ, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধিত ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন খাজা আলতাফ হুসেন হালি এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। এরা দুজনেই মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। পশ্চিম ভারতে মেয়েদের উন্নতির জন্য এগিয়ে আসেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, বেহরামজী মালাবারী, ধুন্দু কেশব প্রমুখরা। দক্ষিণ ভারতে আর. ভেঙ্কট রত্নম নাইডু দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। ভীরাসালিঙ্কম লন্টুলু বিবাহ সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হন।

সুমিত সরকার এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে "সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত" বলে অভিহিত করেছেন, কারণ মেয়েরা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সমান সহযোগী শক্তি হিসেবে ছিল না। সংস্কার প্রক্রিয়া যেন উপর থেকে পুরুষরা মেয়েদের উপর আরোপ করেছিল। এই সমালোচনার যাথার্থ স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় ১৯ শতকের ভারতীয় নারীর পরিবর্তন কিন্তু এই সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়া থেকেই শুরু হয়েছিল।

৪.৪.২.১.৩ ঃ নারী শিক্ষাব্যবস্থা

নারী শিক্ষার প্রসার ছিল ১৯ শতকের নারীর সামাজিক - সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রথম সোপান। ১৯ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে Calcutta School Society নারী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮১৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা Calcutta Female Juvenile Society গঠন করে। এরপর Church Missionary Society নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। এদের লক্ষ্য ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। কিন্তু প্রথম দিকে এই প্রয়াস খুব বেশি সাফল্য পায়নি। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারতে Church Missionary Society সাফল্য অর্জন করে। বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল-সদস্য বেথুন। তার উদ্যোগে ১৮৪৯ সালে তৈরী হয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই স্কুলের সেক্রেটারি। ১৮৬৩ সালে এই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩; এর মধ্যে তিন চতুর্থাংশই ছিল নিম্নবর্ণের। এর থেকে স্পষ্ট যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তখন পর্যন্ত নারী শিক্ষা প্রসারে তাদের রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

স্যার চার্লস উডের পেশ করা প্রতিবেদনেও (১৮৫৪) নারী শিক্ষার বিস্তারে জোর দেওয়া হয়। শিক্ষিত সংস্কারমুখী ভারতীয়রাও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নারী শিক্ষার বিস্তারে তুলনামূলকভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে শিক্ষিত ব্রাহ্মরা নারী শিক্ষা বিস্তারে সংগঠিত ভূমিকা নেয়। ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু ভারতে প্রথম মহিলা হিসেবে বি. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।

দক্ষিণ ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি। বেসান্ত মনে করতেন শুধুমাত্র নারী শিক্ষার বিস্তারই যথেষ্ট নয়। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের জায়গায় দরকার সঠিক ভারতীয় মননশীলতার উজ্জীবন। উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দের নেতৃত্বে আর্য সমাজ নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়। ১৮৯০ সালে নারী শিক্ষার জন্য আর্যকন্যা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের রিপোর্টে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য একাধিক পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়। যেমন উদার গ্রান্ট-ইন-এড এর ব্যবস্থা করা ও যোগ্য মেয়েদের জন্য বৃত্তি পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। পশ্চিম ভারতে বম্বে ও পুনাতে পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর উদ্যোগে গঠিত হয় সারদা সদন (১৮৮৯) এবং ডি. কে. কার্ভের উদ্যোগে পুনাতে

বিধবাদের জন্য বিদ্যালয় (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। রমাবাই সরস্বতীর লেখা ‘The High Caste Hindu Woman’ প্রায় দশ হাজার কপি বিক্রি হয়। ১৮৯৭ সালে পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টির নাম ছিল মুক্তি।

রমাবাই এর চিন্তার দুটি দিক লক্ষ্যণীয়। এক বর্ণ প্রথাকে তিনি হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড় ত্রুটি বলে মনে করতেন। বর্ণপ্রথা হিন্দু সমাজের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা। দ্বিতীয়ত, রমাবাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে পাঠক্রমের কথা ভেবেছিলেন তাতে একদিকে যেমন শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ছিল অন্যদিকে তেমনি মুদ্রণবিদ্যা, কাঠের কাজ, সেলাই প্রভৃতি প্রায়োগিক বিদ্যাও শেখানো হত।

১৮৯৩ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মহাকালী পাঠশালা, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারণী তপস্বিনী। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষিত করা যাতে হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণ হয়। মহাকালী পাঠশালায় সহ-শিক্ষার প্রথাও অনুমোদন করা হয়নি। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ও দেশজ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ছিল সনাতন হিন্দু সমাজের অনুসারী। অচিরেই কোলকাতার হিন্দু ভদ্রসমাজে মহাকালী পাঠশালা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। ১৯১১ সালে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল উর্দু। রোকেয়া রচিত তিনটি প্রবন্ধ — অর্ধাঙ্গিনী, গৃহ এবং বোরখা — থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার প্রকাশ ঘটে। ‘সুগৃহিনী’ নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন একমাত্র শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়েই মেয়েদের অবস্থা পাল্টাতে পারে। বেগম রোকেয়ার বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত।

দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের জন্য শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন সিস্টার শুভলক্ষ্মী (১৮৮৬-১৯৬৯)। শুভলক্ষ্মী প্রথম হিন্দু বিধবা হিসেবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯১১)। ১৯১২ সালে সরকার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। নতুন বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সরকার ঠিক করে দেয়। এই প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ ১৯১৪ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় কুইন মেরী কলেজ। শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য মাদ্রাজে ১৯২২ সালে লেডি উইলিংডন ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রথম অধ্যক্ষা ছিলেন শুভলক্ষ্মী। বাল্যবিবাহের মতন কুপ্রথার বিরুদ্ধেও শুভলক্ষ্মী বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে উনিশ শতক এক অর্থে মেয়েদের শিক্ষা লাভের অধিকার অর্জনের শতক। শিক্ষার অধিকার আর ছেলেদের একচেটিয়া অধিকার হিসেবে রইল না। মেয়েরা আপন প্রচেষ্টায় তাদের স্বাধিকার অর্জন করে। বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং সর্বোপরি এমনভাবে পাঠক্রম তৈরী করে যাতে মেয়েদের বাস্তব জীবনে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। মেয়েদের আত্মপরিচয় অর্জনের এই প্রক্রিয়া দুটি ধাপে হয়। প্রথম ধাপ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ভারতীয় শিক্ষিত পুরুষসমাজ নারী শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসে। দ্বিতীয় ধাপে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেয়েরাই শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসে এই উত্তরণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নারী সংগঠনের বিস্তার ও নারীদের বিভিন্ন আইনী অধিকার অর্জনের লড়াই। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় ভারতীয় নারীরা তাদের পৃথক সামাজিক সাংস্কৃতিক সত্ত্বা অর্জন করেছে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। বিংশ শতকের সূচনায়, Geraldine Forbes এর ভাষায়, “Indian women were full participants in the redefinition of their futures”.

৪.৪.২.১.৪ ঃ নারী সংগঠন

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং এক্ষেত্রে মেয়েদের স্বউদ্যোগের স্বাভাবিক পরিণাম ছিল মহিলা সংগঠন বা women organization এর বিকাশ। শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে মেয়েরা পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করে এবং স্বকর্তৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে ব্রতী হয়। ভারতীয় নারীদের শিক্ষিত ও অগ্রণী অংশ উপলব্ধি করে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করতে না পারলে একদিকে যেমন মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না অন্যদিকে তেমনি মেয়েদের মতামত প্রকাশের কোনো জায়গা থাকবে না।

মেয়েদের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রথম এগিয়ে আসে কোলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ। প্রার্থনা সমাজের প্রাণপুরুষ রাণাডে পণ্ডিতা রমাবাইকে আর্য মহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। রাণাডের স্ত্রীও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর উল্লেখযোগ্য সংগঠন হিসেবে ভারত মহিলা পরিষদের কথা বলা যায়। ভারত মহিলা পরিষদের প্রথম সভানেত্রী ছিলেন লেডি ভালচন্দ্র ; প্রথম সভায় অন্তত ২০০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় রমাবাই রাণাডে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও সমানভাবে সমস্ত কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েদের মধ্যে তৈরী হয় স্ত্রী জারোষ্টি মণ্ডল (Parsee Women's Circle) এর প্রথম সভাপতি ছিলেন Miss Serenmai M. Cursetjee। এই প্রক্রিয়ার ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় নারীদের জন্য একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে সরলাদেবী চৌধুরাণী ভারতীয় নারীদের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন তৈরীর কথা বলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ভারতীয় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন দরকার। তাঁর নিজস্ব সংগঠন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রথম সভা ১৯১০ খ্রীঃ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সরলাদেবীর সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন শহর যেমন লাহোর, দিল্লী, করাচী, অমৃতসর, কানপুর প্রভৃতি শহরে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল জাতি, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে মেয়েদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা এবং মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। পুরুষ প্রভাবিত সংগঠনের বাইরে গিয়ে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন নির্মাণ ও চেতনা বৃদ্ধির কথা প্রথম সরলাদেবীই এত জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। ভারত স্ত্রী মণ্ডল অনুধাবন করে যে মেয়েদের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক পাল্টে গিয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সবচেয়ে জরুরী কাজ। নারী শিক্ষার বিস্তার ছাড়া পুরুষ শাসিত সমাজের রক্ষণশীলতা থেকে মেয়েদের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একাধিক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গণ জাতীয়তাবাদ বা mass nationalism -এর বিকাশ। এই একই সময়ে নারী আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। এই পর্বে অন্তত তিনটি সর্বভারতীয় নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলি হল Women's Indian Association (WIA), National Council of Women in India (NCWI) এবং All-India Women's Conference (AIWC)। Women's Indian Association -এ ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় মহিলারাই সদস্য হতে পারতেন। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন এ্যানি বেসান্ত। সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন Margarate Cousins, Dorothy Jinarajadase, Malati Patwardhan, Ammu Swaminathan প্রমুখরা। WIA ধর্ম, বর্ণ, এবং সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করত। চারটি মূল জায়গার উপর জোর দেওয়া হত — ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, এবং সমাজসেবা। শিক্ষার প্রসারেও এই সংগঠন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ১৯১৭ সালে WIA

ভারতসচিব মন্টেগুকে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার আর্জি জানায়। এই সংগঠনটি 'স্ত্রী ধর্ম' নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করত যেখানে মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে নানান তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হত।

National Council of Women in India (NCWI) ছিল বিংশ শতকের অন্যতম প্রধান সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠন। ১৯২৫ সালে 'International Council of Women' এর জাতীয় শাখা হিসেবে NCWI প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার দোরাব টাটার স্ত্রী মেহরিবাই টাটা এই প্রচেষ্টায় বিশেষ উদ্যোগী হন। লেডি টাটা মনে করতেন পর্দাপ্রথা, বর্ণপ্রথা ও শিক্ষার অভাব মেয়েদের পিছিয়ে থাকা ও সামাজিক পরিবর্তনহীনতার সবচেয়ে বড়ো কারণ। NCWI এর বার্ষিক চাঁদা ছিল ১৫ টাকা, ফলে সাধারণ মহিলাদের পাশে এর সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল না। জেরালডিন ফোর্বসের মতে এই সংগঠনটি বহুলাংশে রক্ষণশীল চরিত্রের ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও NCWI-র কোন যোগাযোগ ছিল না।

ভারতীয় নারীদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন ছিল All India Women's Conference বা AIWC। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে পুনা শহরে এই সংগঠনটি প্রথম মিলিত হয়। AIWC -এর প্রথম সমাবেশে ৮৭ জন স্থানীয় সদস্য, ৫৮ জন প্রতিনিধি এবং ২০০০ জন পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্রাগলির রাণীসাহেব এবং প্রথম সভাপতি হন বরোদার মহারাণী চিমনাবাই সাহেব গাইকোয়াড। মহারাণী চিমনবাই মনে করতেন পর্দা প্রথা ও বাল্য বিবাহ মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। প্রথম সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এই সম্মেলন থেকে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসে। একদিকে যেমন মেয়েদের মধ্যে পেশাদারি শিক্ষার প্রসারে কথা বলা হয় অন্যদিকে তেমনি মেয়েদের মধ্যে 'নারী ধর্মের' উপযোগী শিক্ষার প্রসারের কথাও বলা হয়। AIWC মনে করত গ্রামীণ ভারতে নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার পুরুষদের মতই ছিল। এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা দরকার। ১৯২৮ সালের সম্মেলনে AIWC এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সামাজিক কুপ্রথা দূর করতে না পারলে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে মেয়েদের সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন AIWC -র মূল এ্যাজেণ্ডায় পরিণত হয়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলেও এই সংগঠন তাতে অংশগ্রহণ করেনি এবং রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু এই সময় থেকেই সংগঠনের প্রসার ঘটতে থাকে। নারী শ্রম, গ্রামোন্নয়ন, দেশজ শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে AIWC চিন্তাভাবনা শুরু করে এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে।

১৯৩০-এর দশকের শেষ ও ১৯৪০ এর দশকের শুরুতে AIWC -এর সামনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অমৃত কাউর AIWC -এর রাজনীতিকরণের উপর জোরালো সওয়াল করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি ভোটে খারিজ হয়ে যায়। AIWC মেয়েদের অধিকার সুনির্দিষ্ট করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা বিলের পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু মুসলিম সমাজে এই বিল জনপ্রিয় হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৪০-এর দশকে AIWC মহিলাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪১ সালে 'রশ্মি' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা AIWC প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালে এর স্থায়ী কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.৪.২.১.৫ ঃ নারীদের আইনী অধিকার ও সংস্কারমূলক আইন সমূহ

ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে একাধিক নারী সংগঠন তৈরী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের আইনী অধিকার প্রথম পর্যায়ে ছিল না বললেই হয়। বস্তুত দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নারীরা কিছু পরিমাণে হলেও আইনী অধিকার অর্জন করে। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার না থাকায় তারা ঔপনিবেশিক পর্বে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাতে অংশগ্রহণ করতে

পারছিল না। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় মেয়েদের অবহেলিত-অবদমিত অবস্থা আইনী অধিকার না থাকার মধ্য দিয়ে বেশি করে পরিস্ফুট হয়। ১৯৩৪ সালে AIWC সরকারের কাছে একটি কমিশন নিয়োগের আবেদন জানায়। বলা হয় এই কমিশনের লক্ষ্য হবে মেয়েদের আইনী অধিকার কিভাবে সুনিশ্চিত করা যায় তা খতিয়ে দেখা। তিনটি ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হয়—উত্তরাধিকার, বিবাহ ও শিশুর অভিভাবকত্ব। AIWC মনে করত প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরী করা উচিত। AIWC-র লিগাল সেক্রেটারী রেণুকা রায় বলেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেয়েদের জন্য আইন তৈরী করা প্রয়োজন। রেণুকা রায়ের মতে এমন আইন প্রয়োজন যাতে মেয়েদের পারিবারিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং মেয়েরা পুরুষদের সাথে সমানভাবে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক সরকার মেয়েদের জন্য আইন করার কথা ভাবে। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রণীত হয় ‘Hindu Woman’s Right to Property Bill’. বাল্যবিবাহ নিরোধক আইনটিতে কিছু পরিবর্তন-সংশোধন আনা হয়। অসবর্ণ বিবাহকে আইনী সিদ্ধতা দান করা হয়। এছাড়াও সরকার কর্তৃক ‘Hindu Woman’s Right to Divorce Act’, ‘The Muslim Personal Law Bill’, ‘The Prevention of Polygamy Bill’ এবং ‘Muslim Women’s Right to Divorce Bill’ প্রণয়ন করা হয়। এই প্রসঙ্গে মাথায় রাখা দরকার যে ভারতীয় নারীদের বিভিন্ন সংগঠনগুলি কিন্তু সব সময়তেই মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে কোন আইনী সুরক্ষাই খুব বেশি কার্যকরী হতে পারে না। Geraldine Forbes মন্তব্য করেছেন, ‘There reform minded women were not satisfied with piecemeal acts; they wanted comprehensive legislation accompanied by social and economic change.’

গান্ধী মনে করতেন শিক্ষিত মেয়েদের গ্রামে অনেক বেশি সময় কাটানো উচিত। কারণ ভারতীয় নারীদের প্রকৃত অবস্থাকে জানতে গেলে গ্রামে যাওয়া প্রয়োজন। জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় নারীদের বিভিন্ন প্রগতিশীল দাবীকে সমর্থন করলেও এই দাবীগুলি আদায় করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি বর্জনীয় বলে মনে করতেন।

এই অবস্থায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে স্যার বি. এন. রাউকে সভাপতি করে মেয়েদের আইনী অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক এই কমিটি খতিয়ে দেখবে বলে ঠিক হয়। মহিলা সংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানালে ঠিক হয় সাধারণ ভাবে নারীদের সম্পত্তির অধিকার খতিয়ে দেখা হবে। মহিলা সমিতিগুলি এই কমিটিতে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে। কিন্তু এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয়নি। মেয়েদের ভোটাধিকার-এর অধিকার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলি Rau Committee-র কাছে পাঠায়। ১৯৪১ সালে Rau Committee-র চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে নারীদের আইনী অধিকার সুরক্ষিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৪১ সালের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। কংগ্রেস সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। একই সময়ে কংগ্রেস National Planning Committee গঠন করে। এর অঙ্গ হিসেবে একটি মহিলা উপসমিতি গঠন করা হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে এই উপসমিতিকে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কংগ্রেসের মহিলা নেতৃবৃন্দ যেমন সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং অমৃত কাউর মেয়েদের জন্য আরো বেশি করে আইনী সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। ১৯৪২ সালে সরকার দুটি খসড়া বিল প্রকাশ

করে। কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জনের পর ১৯৪৩ সালে বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুটি বিল চূড়ান্ত হয়। ১৯৪৪ সালে সরকার একটি নতুন কমিটি তৈরী করে। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু আইনী-বিধি প্রস্তুত করা।

এই আইনী সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষিত ভারতীয় মেয়েরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে ছিল। এই আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিক সরকার মেয়েদের আইনী বিধি সুরক্ষিত করার জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু সমাজের গভীরে এই আইন বিধিগুলি কতখানি প্রভাব ফেলতে পেরেছিল তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় সমাজ কাঠামো মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও আদৌ কোন মৌলিক পরিবর্তনে রাজী ছিল না। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ছিল খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ। ফলে ঔপনিবেশিক সরকার প্রণীত আইনী সংস্কারের প্রক্রিয়া কিছু আপাত পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিল মাত্র। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নারী আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল জটিল ও বহুমাত্রিক। Rosalind O'Hanlon-এর মতে মেয়েদের অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উভয়েই রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর ভাষায়, 'broad degree of consensus'. Geraldine Forbes এই প্রক্রিয়াকে 'social feminist ideolgy-র কাঠামোর মধ্যে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই কাঠামোতে মেয়েদের 'public role' বা 'বাইরের ভূমিকা' কে কিছু পরিমাণে স্বীকার করে নেওয়া হলেও নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিভাজনকে বাস্তবতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একদিকে যেমন নারী আন্দোলনকে স্বীকার করছিল অন্যদিকে তেমনি নারী আন্দোলনকে ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী কাঠামোর মধ্যে আত্মস্থ করেও নিতে সচেষ্ট ছিল।

৪.৪.২.১.৬ ঃ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় নারীর ভূমিকা

ভারতীয় নারী ও রাজনীতির প্রশ্নে একথা সাধারণভাবে স্বীকার্য যে ১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ (১৯১৮) হওয়ার পর শুধুমাত্র ভারতীয় রাজনীতি নয়, অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। যুদ্ধের ফলে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বেকার সমস্যা। পুরোনো রক্ষণশীল সামাজিক কাঠামোতে এই তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ভাঙন ধরে। এই একই সময়ে রাজনৈতিক ভাবে গান্ধীর উত্থান ঘটে এবং এই প্রথম ভারতে গণ জাতীয়তাবাদ বা mass nationalism-এর বিকাশ ঘটে।

১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংঘটিত করার জন্য গান্ধী সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতি আহ্বান জানান। গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে (রাওলাট, অসহযোগ বা আইন অমান্য) ভারতীয় মহিলারা বিপুলভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই মেয়েরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে। গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে আগমনের পর এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়।

গান্ধী মনে করতেন প্রতিটি ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনে মেয়েদের নিজস্ব জায়গা আছে; অস্তিত্ব আছে এবং মেয়েরা বলিষ্ঠ ভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেই ভারতীয় মেয়েরা

তাদের উপর ন্যস্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুচেতা কৃপালিনী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'Gandhi's personality was much that it inspired confidence not only in women but in guardians of women, their husbands, fathers and brothers'.

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ভারতীয় নারীরা সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এগিয়ে আসে। রাজনীতি সচেতন মেয়েরা একাধিক সভায় অংশগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ নামক একটি স্বাধীন নারী সমিতি গঠিত হয়। কংগ্রেসের জেলা কমিটিগুলিতে মেয়েরা এগিয়ে আসে। বাংলায় উর্মিলা দেবী (চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী) মেয়েদের দেশের কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস ভারতে এলে বোম্বেতে অন্তত এক হাজার জন ভারতীয় মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। বাংলায় বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী প্রমুখর নেতৃত্বে বাঙালী মেয়েরা বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলনে এগিয়ে আসে। গান্ধী Young India তে প্রকাশিত একটি লেখায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের বাংলার মেয়েদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আহ্বান জানান। গান্ধীর আহ্বান সংক্রান্ত পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের প্রান্তিক অংশের মহিলাদের কাছেও পৌঁছায়। পূর্ব গোদাবরী জেলায় দুর্গাবাই এর নেতৃত্বে দেবদাসী মহিলারা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলনের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধী ভারতীয় মেয়েদের একদিকে বিদেশী পণ্য বর্জন করার কথা বলেন, অন্য দিকে চরকা কাটা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। গান্ধী মনে করতেন ভারতীয় নারীদের আদর্শ হচ্ছে সীতা। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হলে গান্ধী মেয়েদের সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। গান্ধী নিজেও এই সময় সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে গ্রামোন্নয়নের মতন সামাজিক পুনগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২০-র দশকের শেষ থেকে ভারতীয় রাজনীতি পুনরায় অশান্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশ ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯২৯ সালের গোড়া থেকেই গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো শুরু হয়। সরকার কঠোর ভাবে দমননীতি আন্দোলনকারীদের উপর প্রয়োগ করে। তীব্র সরকারী দমননীতি সত্ত্বেও ভারতীয় মেয়েরা ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসে। গেরালডিন ফোর্বস দেখেছেন ১৯২০-এর দশকের সঙ্গে ১৯৩০-এর দশক তুলনা করলে দেখা যায় পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় মহিলাদের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এই অগ্রগতি মহারাষ্ট্রে, বিশেষত বোম্বে শহরে, বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সুশৃংখল ও সুসংগঠিত ভাবে মেয়েরা গান্ধী প্রদর্শিত পথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ স্বরাজকে তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। এই সময় দেশ সেবিকা সংঘ নামক আরো একটি মহিলা সংগঠন জন্ম নেয়। ১৯৩০ সালের মে মাসে সরোজিনী নাইডু সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেপ্তার হন। ২১শে মে পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং সরকার তাকে এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

বাংলার মেয়েরা দ্রুত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এগিয়ে আসে। ১৯২৮ সালে তৈরী হয় মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লতিকা ঘোষ। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বাঙালী মেয়েরা তীব্র বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘের মতন মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘও স্বরাজকে তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করে। এই সংগঠনটি

বিশ্বাস করতো শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হবে না। মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের আদর্শবোধের মধ্যে চরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ধর্মীয় অনুভূতি একই সঙ্গে ছিল। ১৯২৯ সালে বাংলায় গঠিত হয় নারী সত্যাগ্রহ সমিতি। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন উর্মিলা দেবী। এদের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের ভাবাদর্শ ও আন্দোলনকে সাধারণ মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বোম্বের মতন বাংলাতেও মেয়েরা সরকার বিরোধী অবস্থান, ধর্না ও আইন অমান্য আন্দোলনে এগিয়ে আসে। গান্ধী পরিচালিত অহিংস আন্দোলনের বাইরেও বাঙালী মেয়েদের রাজনীতিকরণের ঘটনা বাংলায় ঘটেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব পড়ে বীণা দাস ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের উপর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীণা দাস বাংলার গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বীণা দাস সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান ছিলেন, যে পরিবারে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব পড়ার কথা নয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রামের স্কুল শিক্ষিকা। এই উদাহরণগুলি সাধারণভাবে মেয়েদের চেতনা পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ।

১৯৩১ সালে বাংলার শিক্ষিত সচেতন মেয়েরা অনুধাবন করে মেয়েদের জন্য পৃথক কংগ্রেস দরকার। ঐ বছরের মে মাসে শান্তি দাস জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির কাছে দশজন করে মহিলা প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মূল ভাষণ দেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি তাঁর ভাষণে শৈশব থেকে পরিবারের মধ্যে মেয়েদের উপর যে বঞ্চনা করা হয়—যার কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা—তার দীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরেন। মেয়েদের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেলে ও মেয়েরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও তা তাদের ক্ষমতায়নকে কতখানি সাহায্য করবে তা নিয়ে সরলাদেবী সন্দেহ প্রকাশ করেন। গেরালডিন ফোর্বস স্বীকার করেছেন মাদ্রাজে মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা কম ছিল। কোলকাতা বা বোম্বেতে মেয়েরা যেভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা মাদ্রাজে দেখতে পাওয়া যায় নি। উত্তরভারতে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহরে মেয়েরা কংগ্রেস পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ভারতীয় মহিলাদের সক্রিয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামে নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ অগ্রগতি। এই অগ্রগতি একদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ অন্যদিকে পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা ভারতীয় নারীরা আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদও এই প্রথম শক্ত চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে। যে উন্নয়নকামী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে ব্রিটিশরা তাদের শাসনকে ন্যায্যতা দান করত ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সেই ন্যায্যতাকেই প্রশ্ন করে। গেরলিডিন ফোর্বসের ভাষায়, "The role of women in the non-cooperation movement of the 1920s and the civil disobedience movement of the 1930s called into questions Britain's civilizing mission in India.....The involvement of women in the nationalist struggle severely challenged the notion that the Britain were the legitimate rulers at India, and at the same time lent full support to the congress as the rightful heirs to political power." ভারতীয় নারীদের জাতীয়তাবাদী প্রকরণে ব্রিটিশ শক্তিকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বরাজের শাসনতান্ত্রিকতায় ভারতীয় নারীদের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হলে শ্রেণী, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় মেয়েরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিভিন্ন শহরে ধর্মঘট, মিছিল প্রভৃতি সংঘটিত করতে মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভারত ছাড় আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষক রমণীদের স্বতস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে যোগদান। ১৯৪২ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন মাতঙ্গিনী হাজরা। অরুণা আসফ আলি গোপনভাবে আন্দোলন সংঘটিত করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে হিংসার প্রকাশ ঘটায় জাতীয় কংগ্রেস তাকে সমালোচনাও করে। সুচেতা কৃপালিনী উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষ ও কংগ্রেস কর্মীদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সংঘটিত করে। ১৯৪৪ সালে তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে 'dangerous prisoner' হিসেবে লাহোর জেলে বন্দী করা হয়।

১৯৩০-এর দশকের সঙ্গে ১৯৪০ এর দশকের ভারতীয় মেয়েদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ১৯৩০-এর দশকে জাতীয়তাবাদে উদ্দীপিত ভারতীয় মেয়েরা মুখ্যতঃ পুরুষদের অনুসরণ করত। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় মেয়েরা অনেক বেশি সংগঠিত ভাবে আন্দোলন করে তাই নয়; একই সঙ্গে মেয়েদের আন্দোলনে পুরুষ-নির্ভরতা হ্রাস পায়। তারা স্বাধীনভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঘটনা যেমন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন বৈশিষ্ট্য, একই সঙ্গে তেমনি নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নতুন ইতিবাচক দিক।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকরণের বাইরে বামপন্থী কৃষক আন্দোলনেও মেয়েরা ১৯৪০-এর দশকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। তেভাগা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভাবে অংশ নেন রাণী মিত্র দাশগুপ্ত, মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী প্রমুখরা। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে পৃথক 'নারীবাহিনী'। তেভাগা আন্দোলনের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে কৃষকদের দাবীর পাশাপাশি মেয়েদের নিজস্ব দাবীসমূহ পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। চিরাচরিত ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থাতে ভারতীয় নারীদের উপর যে ধরনের প্রাত্যহিক শোষণ ও পীড়ন হয়, তার বিরুদ্ধেও তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের অগ্রণী অংশ প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি (CPI) এই প্রতিবাদকে খুব বেশি আমল দেয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে কমিউনিষ্ট পার্টি বা কৃষক সভা মহিলাদের আন্দোলনকে মূল চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তেভাগার মতন তেলেঙ্গানা আন্দোলনেও কৃষক রমণীরা আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন হায়দ্রাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল নিজামশাহী সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো। নিজামশাহী হায়দ্রাবাদ ছিল ভারতের অন্যতম পিছিয়ে পড়া রাজ্য। সাধারণভাবেই শিক্ষার প্রসার হয়নি। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ছিল প্রশ্নাতীত। এই প্রবল রক্ষণশীলতার অস্তিত্ব সত্ত্বেও হায়দ্রাবাদে মেয়েদের চেতনা বৃদ্ধি ও নারী সংগঠনের বিকাশকে স্তিমিত রাখা যায়নি। নিজামশাহী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের জমে থাকা ক্ষোভকে সংগঠিত করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (CPI)। কমিউনিষ্ট পার্টিকে সহায়তা করে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC), নিখিল হায়দ্রাবাদ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (AHSU) এবং নারী সমিতিগুলি। নিজাম বিরোধী এই আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে অন্ধ্র মহাসভা। তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে নিজাম বিরোধী এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে অসাধারণ সক্রিয় ভূমিকা ধারণ করে মেয়েদের প্রতিবাদী রাজনীতি। সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মেয়েদের প্রতিবাদী রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, একই সঙ্গে অর্থনীতি অতিরিক্ত শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলন বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। এককথায় বলতে গেলে, মেয়েরা একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তারা পুরুষতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায়। কৃষক রমণীদের তীব্র সংগ্রাম ছাড়া তেলেঙ্গানা আন্দোলনের এই বিশাল ব্যাপ্তি ও আদর্শগত উত্তরণ ঘটতে পারতো না।

৪.৪.২.১.৭ ঃ উপসংহার

এই আলোচনা থেকে এই সত্যটি স্পষ্ট যে উনিশ ও বিংশ শতকে ভারতীয় নারীর আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়া নানা জটিল পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে। নারী আন্দোলনের ইতিহাস লেখা আসলে নারী চেতনার ইতিহাস লেখা। এই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলি উপাদান বিভিন্ন ভাবে কাজ করেছে। প্রথমত, ভারতীয় নারী আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক রাজনীতি-অর্থনৈতিক (Political Economy) কাঠামোর মধ্যে। ভারতীয় আধুনিকতা ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সঙ্গে সমার্থক নয়। উনিশ শতকের ভারতীয় আধুনিকতা আসলে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা। উনিশ শতকের নবজাগরণ এই ঔপনিবেশিক আধুনিকতা থেকে জাত। প্রাথমিকভাবে নারী আন্দোলনের উপর ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ছাপ পড়ে। নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রথম এগিয়ে আসেন রামমোহন রায় বা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন পুরুষ সমাজ সংস্কারকগণ। দ্বিতীয়তঃ নারী আন্দোলনে প্রথম পর্যায়ে এলিট বা উচ্চবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের প্রাধান্য ছিল। চরিত্রগতভাবে এই পর্যায়টি ছিল সমাজসংস্কারমূলক। এর ফলে মূল বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ বা বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। এই পর্যায়ে মেয়েদের নিজেদের বক্তব্য কম বা নেই বললেই চলে। তৃতীয়তঃ এর পরের পর্ব থেকে মেয়েদের নিজেদের কথা আমরা পাই। এই সময় থেকে মেয়েরা নিজেরা সমাজ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের অভিযোগ, তাদের অগ্রাধিকারের জায়গা উপস্থিত করে। এটি ছিল মেয়েদের স্বকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। চতুর্থতঃ এর পরের ধাপে ভারতীয় নারীরা নিজস্ব সংগঠন নির্মাণ করে ও রাজনীতিতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। এলিটিষ্ট ঘেরাটোপ থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ভারতীয় নারীদের উত্তরণ ঘটে। নারীদের অংশগ্রহণ যেমন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গভীরতা সামাজিকভাবে বৃদ্ধি করেছে; একই সঙ্গে তেমনি রাজনীতির প্রভাবে ভারতীয় নারীদের আত্মসচেতনতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চমতঃ নারী আন্দোলন ও নারীর আত্মশক্তি অর্জনের প্রক্রিয়া গুণগতভাবে পৃথক মাত্রায় পৌঁছয় যখন তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রভাবে, বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবে কৃষক রমণীরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। অন্যভাবে বললে বামপন্থী রাজনীতি নারী চেতনার উদ্বোধনে সক্রিয় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীদের একটি বড় অংশ অনুধাবন করে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন না ঘটলে ও রাজনীতির পরিবর্তন না আনলে নারী মুক্তি অধরাই থেকে যাবে। উনিশ শতকের শুরুতে নারী আন্দোলন যেখানে পুরুষ সংস্কারকগণের উপর নির্ভরশীল ছিল, বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তা বামপন্থী চেতনার আলোকে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শেখে। নারী চেতনার এই পর্বান্তরই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়।

৪.৪.২.১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Geraldine Forbes : Women in Modern India

(2) Kalpana Dasgupta : Women on the Indian Scene

(3) Neera Desai : Women in Modern India

(4) B. R. Nanda (ed) : Indian Women From Purdah to Modernity.

(5) Kumkum Sangari & Sudesh Vaid (ed) : Recasting Women : Essays in Colonial History.

(6) Sumit Sarkar : Modern India

(7) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পলাশী থেকে পার্টিশন।

৪.৪.২.১.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) উনিশ শতকের সূচনায় ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

(২) তুমি কি মনে কর যে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন নির্মাণ ভারতীয় মেয়েদের আত্মচেতনা বিকাশের মৌলিক ধাপ?

(৩) ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা আলোচনা করো।

(৪) বামপন্থী আন্দোলন কিভাবে ভারতীয় নারীর স্বকর্তৃত্ব অর্জনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তা আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

WORKING OF CONGRESS COMMUNAL POLITICS AND SUBHAS CHANDRA BOSE

একক - ২

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দেশভাগ (১৮৫৮-১৯৪৭)

Communal Politics and Partition (1858-1947)

গঠন (Structure) ঃ

৪.৭.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৭.২.১ ঃ ভূমিকা

৪.৭.২.২ ঃ সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

৪.৭.২.৩ ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন

৪.৭.২.৪ ঃ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

৪.৭.২.৫ ঃ মর্লে-মিন্টো সংস্কার

৪.৭.২.৬ ঃ লক্ষ্ণৌ চুক্তি

৪.৭.২.৭ ঃ পাকিস্তান আন্দোলন

৪.৭.২.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৭.২.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৭.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ।

২। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন।

৩। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট।

৪। মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রতিক্রিয়া।

৫। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব।

৬। পাকিস্তান আন্দোলন এবং তার ফলাফল

৪.৭.২.১ ঃ ভূমিকা

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা নিছক সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য মুসলিম উচ্চাশা ও আকাঙ্খার ফসল ছিল না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভাবের প্রতি একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভীতির মধ্যেই মুসলিম লীগের উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিহিত আছে। এই ভীতিবোধ লালন করেছিল সাম্প্রদায়িকতাকে, যাকে সমর্থন জুগিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারী ভেদনীতি, এবং নেতিবাচক প্রভাবে পুষ্ট করেছিল হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ ও ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল উপরোক্ত তিন উপাদানের মিলিত ফসল। এই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির অন্তিম ও অবধারিত ফল ছিল ১৯৪৭ সালের ১৪-ই অগাষ্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের জন্ম।

৪.৭.২.২ ঃ সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

ভারতীয় মুসলমানদের অর্ধাংশ বসবাস করত বাংলায়, এবং বাংলায় মুসলমানদের সিংহভাগই পূর্ব বাংলায় বাস করত। পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর বাংলা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। এই তিন অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৬০% এবং সমগ্র বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৮% ছিল মুসলমান। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ অবিভক্ত বাংলায় ভাগীরথী নদী যেন সাংস্কৃতিক জলবিভাজিকা রূপে প্রবাহিত ছিল। এর পূর্ব তীর মুসলিম এবং পশ্চিম তীর ছিল হিন্দু অধ্যুষিত।

বাংলার মুসলমান জনসাধারণ ছিল মূলতঃ গ্রামীণ। ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী, বাংলার শহুরে জনসাধারণের ৬৭.০১% ছিল হিন্দু, এবং মাত্র ৩.০৮% মুসলমান। এই গ্রামীণ মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবি, এবং কৃষিজীবিদের সিংহভাগই ছিল ভাগচাষী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাখরগঞ্জ জেলায় মোট জনসাধারণের ৬৪.০৮% মুসলমান হলেও জেলার মাত্র ১০% জমি তাদের মালিকানায় ছিল, যা থেকে জেলার মোট ভূমিরাজস্বের মাত্র ৯% আদায় হতো। পূর্ব বাংলায় ভূমি মালিকানা ছিল হিন্দুকবলিত, বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু জেন্ট্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কার্যতঃ শ্রেণীগত পার্থক্যে পরিণত হয়েছিল। রফিউদ্দিন আহমেদের মতে বাংলায় মুসলমানদের পরিচিতির স্তর ছিল দ্বিবিধ, — (১) ভাষাভিত্তিক বাঙালী পরিচিতি, এবং (২) ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক মুসলমান পরিচিতি। দ্বিতীয় পরিচিতিটি আরো

দৃঢ় হয়েছিল ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের ফলে। আহমেদ দেখিয়েছেন, বাংলার মুসলমান সমাজ আনুভূমিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। বৈদেশিক সংস্কৃতির ধারক, অবাঙালী উর্দুভাষী শহুরে আশরফ এলিট মুসলমানরা কলকাতা ও ঢাকায় বাস করতেন। অন্যদিকে সিংহভাগ মুসলমান ছিল আত্রপ বা আজলফ গোষ্ঠীভুক্ত, গ্রামের বাসিন্দা, যারা বাংলার মূল হিন্দু জনগোষ্ঠীরই ধর্মান্তরিত অংশ ছিল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলত মোল্লা ও উলেমা সম্প্রদায়। বাংলা মুসলিম সংহতিবোধ গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় ভিত্তিতে সংগঠিত অঞ্জুমন্দ্গুলিকে আশ্রয় করে। জওহরলাল নেহরু তাঁর Discovery of India গ্রন্থে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একধরণের ভীতি মনস্তত্ত্বের কথা তুলেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সূচিত হবার পরে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের শতাব্দী লালিত পদমর্যাদা ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার দরুণ তাদের মধ্যে যে বঞ্চনাবোধের জন্ম হয়েছিল, হান্টার তার সবিস্তার আলোচনা করেছেন। অনিল শীল দেখিয়েছেন যে কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল থেকে নূতন আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রচলনের ফলে মুসলমানরা সরকারী পেশা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সরকারী কাজকর্মে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজীর ব্যবহার শুরু হলে মুসলমানদের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়া আর সম্ভব হয় নি। ১৮৬৭ সালেও বাংলায় সরকারী চাকুরীরত ভারতীয়দের ১১.০৭% ছিলেন মুসলমান, যা ১৮৮৭ সালে হ্রাস পেয়ে ৭% -এ এসে দাঁড়ায়। ১৮৭১ সালে গেজেটেড ভারতীয় কর্মচারীদের ১২% ছিলেন মুসলমান, যা মাত্র ১০ বৎসর পরে ৮ শতাংশে নেমে আসে। ইতিপূর্বেই সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগে মুসলমান আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল। পেশাগত ক্ষেত্রে এই ক্রমিক ব্যর্থতা মুসলমানদের মধ্যে ভীতিবোধ ও নিরাপত্তাহীনতার সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

উত্তর ভারতে মুসলমানদের অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন। উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের দুই প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং অযোধ্যা। উত্তর ভারতে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩% ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘুত্ব তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি, প্রভাব বা শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসনকালেও ভূস্বামী, শাসনকর্তা ও পেশাদার শ্রেণী হিসাবে সমাজে নিজেদের স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একাধিক নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রচলন সত্ত্বেও উত্তর ভারতে মুসলমানদের ভূম্যধিকারে বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। ক্রেতাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, এবং অযোধ্যার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুনর্বাসিত তালুকদারদেরও অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। উত্তর ভারতে সরকারী চাকুরীতে ও বিচার বিভাগে মুসলমানরা যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োজিত ছিলেন।

কিন্তু ক্রমেই উত্তর ভারতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৮৮০-র দশক থেকে উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা শিক্ষিত হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে উত্তর ভারতে অধস্তন শাসন ও বিচার বিভাগীয় পদগুলির ৬৩.০৯% ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। এই শতকরা হার ১৮৮৬-'৮৭ সালে ৪৫.০১% এবং ১৯১৩ সালে ৩৪.০৭ -এ নেমে আসে। অন্যদিকে একই ক্ষেত্রে হিন্দু অংশগ্রহণের মাত্রা ১৮৫৭ সালে ২৪.০১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৬-'৮৭ সালে ৫০.০৩% এবং ১৯১৩ সালে ৬০% -এ গিয়ে পৌঁছয়। এই নির্দিষ্ট ঘটনা উত্তর ভারতের মুসলমানদের রাজনীতিতে টেনে আনে। উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পেশাদার গোষ্ঠীটিই রাজনৈতিকভাবে সব থেকে বেশী সচেতন ছিল, এবং ভূস্বামী মুসলমানরা এই গোষ্ঠীটির নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই পেশাদার গোষ্ঠীটিই ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আনুগত্যমূলক রাজনীতির এক নূতন নীতি অনুকরণ করেছিল। এক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় পরিস্থিতির এক মৌলিক পার্থক্য ছিল। বাংলায় কোনও মুসলমান পেশাদার শ্রেণী ছিল না। অন্যদিকে, উত্তর ভারতে উলেমাদের সঙ্গে পেশাদার মুসলিম গোষ্ঠীটির সম্পর্ক ভালো ছিল না। কারণ উত্তর ভারতীয় উলেমারা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী।

৪.৭.২.৩ ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে যে নূতন 'কসমোপলিটান' জনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার বাস্তব অভিজ্ঞতার এক প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠা আলিগড় আন্দোলন উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটি 'কসমোপলিটান' সাম্রাজ্য হিসাবে গণ্য না ক'রে গণ্য করতেন বরং মুঘল সাম্রাজ্যেরই একটি প্রলম্বিত ও ধারাবাহিক রূপ হিসাবে। তিনি যুক্তি দেখান যে প্রাক্তন শাসক শ্রেণী হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। লেলিভেল্ড লিখেছেন, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই পরিচিতি - সচেতনতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল স্বাজাত্যবোধ ('কায়ুম' -এর অঙ্গীভূত, এই বোধ)। এই নূতন পরিচিতির উদ্ভব ও বিস্তারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বাধীন আলিগড় আন্দোলন।

ফ্রান্সিস রবিনসন মন্তব্য করেছেন, সৈয়দ আহমদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত পেশাদার হিন্দুদের প্রতি মুসলিম আশরফদের ক্ষোভ মূর্তল রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিশেষতঃ কাশ্মিরী পণ্ডিত, উত্তর প্রদেশের কায়স্থ এবং উচ্চবর্ণীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দুদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে তিক্ততা ও বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতিবোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষার মেল বন্ধন ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে আলিগড় কলেজ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সৈয়দ আহমদ প্রচার করেন যে কংগ্রেস একটি হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এবং কংগ্রেসের উত্থানের ফলে একটি স্থায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। মুসলিম জনমত সংহত করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ ১৮৮৬ সালে এ্যানুয়াল মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স স্থাপন করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ স্যার সৈয়দের মীরাট ভাষণে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যাতে তিনি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত সংখ্যালঘু মুসলিম ভীতির প্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে এক নূতন মোড় এনেছিল আর্য সমাজের নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ এবং গো-হত্যা বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জ্ঞান পাণ্ডে দেখিয়েছেন যে, উত্তর প্রদেশের ভোজপুরী ভাষাভাষি অঞ্চলে গোহত্যাকে কেন্দ্র ক'রে কীভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গড়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল মহারাষ্ট্রে শিবাজী ও গণপতি উৎসব এবং বাংলায় অরবিন্দ কর্তৃক ভবানীর মাতৃরূপ চিত্রায়নের ফলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নাগরী প্রচারিণী সভার উর্দু বিরোধী অভিযান। এছাড়া চরমপন্থীদের প্রাচীন আর্য তথা হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী মনস্তত্ত্বকে আরোই দৃঢ় করে তুলেছিল।

লেলিভেল্ড লিখেছেন, ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি উত্তর ভারতের মুসলমানদের একাংশের মধ্যে আলিগড় কলেজের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল, যার প্রমাণ মিলেছিল কলেজের ছাত্র সংখ্যার অবনতির মধ্যে। লেলিভেল্ড

লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে কলেজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ এক নূতন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই আলিগড় কলেজের ইওরোপীয় অধ্যক্ষ থিওডর বেকের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৯৩ সালে গড়ে ওঠে মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা রোধ করা এবং মুসলমানদের স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী সংগঠিত করা।

কিন্তু ১৮৯৮ সালে সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর পরে তরুণ মুসলিম প্রজন্ম ক্রমেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে অনাস্থা পোষণ করতে থাকে। এই অনাস্থার কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, সৈয়দ আহমদ উলেমাদের নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান ক'রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে তুলে এনেছিলেন। এই 'এলিট' নেতৃত্ব নূতন প্রজন্মের পছন্দ ছিল না, তারা বরং ইসলামকে প্রধান সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত করার পক্ষপাতি ছিল, এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব তারা দিতে চেয়েছিল উলেমাদের হাতে। এর ফলে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজনীতির ইসলামীকরণ শুরু হয়। এই প্রবণতার প্রধান মুখপাত্র ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং লক্ষ্ণৌ-এর উলেমা আবদুল বারি। দ্বিতীয়তঃ, নূতন প্রজন্মের সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক রাজনীতিতে কোনও আস্থা ছিল না। এই আনুগত্যমূলক রাজনীতির প্রতি তাদের অনাস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল লেফটেন্যান্ট গভর্নর ম্যাকডোনাল্ডের মুসলমান বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি হিন্দুপন্থী নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনই হিন্দী-উর্দু বিতর্ক কালে প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে ১৯০০ সালে ১৪ই এপ্রিল 'নাগরী প্রস্তাব' বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট পদক্ষেপ মুসলমানদের নিকট তাদের সংস্কৃতিবোধের উপর একটি আক্রমণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় তারা 'উর্দু ডিফেন্স্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে। ম্যাকডোনাল্ড আলিগড়মূলক নীতির দেউলিয়ানা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠে যখন বাংলার কিছু প্রভাবশালী মুসলমান নেতা জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করার হুমকি দেন। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ও নবীন মুসলিম নেতৃবর্গ ভারতীয় মুসলমানদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেন।

৪.৭.২.৪ ঃ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৮৯৯ সালেই লক্ষ্ণৌয়ে একটি কংগ্রেসবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছিল, এবং তার দুই বৎসর পরে ১৯০১ সালে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯০৩ সালে আলিগড় কলেজের এক প্রভাবশালী সদস্য ডিকার উল্-মুল্কের নেতৃত্বে একটি সরকারপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে, যদিও সংগঠনটি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। এ'কথা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বাংলার মুসলমানদের সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র আলিগড় গোষ্ঠীর পক্ষে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

আলিগড় ও বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে কলকাতায় মহম্যাডান এডুকেশন কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে। কিন্তু এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মূলতঃ দুটি কারণে নেতৃত্বের সংকট দেখা গিয়েছিল, — ১৮৯৩ সালে আব্দুল লতিফের মৃত্যুর দরুণ, এবং আমীর আলি বিলাতে গিয়ে বসবাস করতে থাকার কারণে। বঙ্গভঙ্গের আগে বাংলার মুসলমানদের কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। বঙ্গভঙ্গের পরে ঢাকা নূতন শক্তিকেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার মুসলমানদের নূতন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন ঢাকার নবাব সালিমুল্লাহ। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মহমেডান পলিটিকাল ইউনিয়ান।

১৯০৬ সালে নির্দিষ্ট তিনটি ঘটনা মুসলিম লীগের (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল, — ফুলারের পদত্যাগ, মর্লের বাজেট বক্তৃতা এবং সিমলা দৌত্য। বঙ্গভঙ্গের ফলে গড়ে ওঠা নূতন প্রদেশটির প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রতি ফুলারের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের চাপে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ফুলারের পদত্যাগ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের যৎপরোনাস্তি আতঙ্কিত করে তোলে। মুসলমানরা এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে অতঃপর সরকার হয়ত' স্বদেশী চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে, বঙ্গভঙ্গ রদ হবে এবং বাংলায় মুসলিম রাজনীতির পথ রুদ্ধ হবে। ফুলারের পদত্যাগ বাংলার মুসলমান সমাজকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৎক্ষণাৎ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি, অর্থাৎ মর্লের বাজেট বক্তৃতায় মর্লে ইঙ্গিত দেন যে প্রদেশগুলিতে এবং কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার নির্বাচন আহ্বান করার কথা বিবেচনা করছে। বস্তুতঃ মর্লের এই বাজেট ভাষণ ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ ছিল। মর্লের এই বক্তৃতা উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। তারা এই কথা ভেবে ভীত হয়ে পড়ে যে ১৮৯২ সাল থেকে ভোগ করে আসা বিশেষ সাম্প্রদায়িক সুযোগ-সুবিধা থেকে এর ফলে তারা বঞ্চিত হবে। এই পরিস্থিতিতে আলিগড় কলেজের সচিব মহসিন-উল্-মুলক্ কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডকে এই মর্মে পত্র দেন যে বিক্ষুব্ধ তরুণতর নেতৃবর্গের আক্রমণে প্রবীণতর নেতারা বিব্রত বোধ করছেন, এবং সেই কারণেই প্রস্তাবিত আইন সভাগুলিকে সম্ভাব্য হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভাইসরয়ের নিকট থেকে মুসলমানদের উপযুক্ত আশ্বাস অর্জন করা আশু প্রয়োজন। এরই ফল ছিল ১৯০৬ সালে ১লা অক্টোবরে সিমলা দৌত্য।

মুসলিম স্বতন্ত্রীকরণে ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বও কিছু কম ছিল না। বহুপূর্বে ১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্স্ বিল সংক্রান্ত বিতর্কে চার্লস্ উড ভারতীয় জনসাধারণের ভাষাভিত্তিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত বিবিধতার কথা তুলে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কলভিন এবং হান্টারের মতো ব্রিটিশ বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরাও মুসলিমপন্থী সরকারীনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল সংক্রান্ত লর্ড ডাফরিনের কমিটি ১৮৮৮ সালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্য দূর করার জন্য সরকারকে মনোনয়ন পদ্ধতির উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল। ডাফরিন কংগ্রেসকে একটি 'আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু' প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, ডাফরিনের এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত 'ইণ্ডিয়া অফিস' অথবা ভারতীয় মুসলমানরা উপলব্ধি করতে ভুল করে নি, ১৮৯২ সালে বিধিবদ্ধ লর্ড ক্রসের আইনে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রারম্ভিক চিহ্ন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সন্তুষ্ট ল্যান্সডাউন মন্তব্য করেছিলেন, এই নূতন আইনের ফলে কাউন্সিলাররা /অঞ্চল অথবা সংখ্যা অপেক্ষা সামাজিক শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করবেন বেশী। কার্জনও এই সরকারী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ত্রিপাঠী লিখেছেন, বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনা ছিল একটি দ্বিমুখী অস্ত্র, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি ক'রে ভাষাগত ও ধর্মীয় দিক থেকে বাঙালী হিন্দুদের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত ক'রে কার্জন কংগ্রেসী আন্দোলনকে দুর্বল ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশ, মুসলমানদের পৃথক সরকার, বিচার ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে কার্জন হিন্দু মধ্যবিত্তদের আর্থিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের অংশ গ্রহণের মাত্রা কিছু কম ছিল না। আব্দুল রসুল এবং লিয়াকৎ হোসেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বিপিন চন্দ্র পালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গজনভির 'বেঙ্গল হোসিয়ারী' মুসলিম স্বদেশী উদ্যোগের এক মহৎ দৃষ্টান্ত

ছিল। এমনকী রাখীবন্ধন দিবসেও মুসলমানরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আলিগড় কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ থিওডর মরিসন এবং রাষ্ট্রসচিব মর্লে স্বদেশী আন্দোলনে এই মুসলিম অংশগ্রহণে তাঁদের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মিন্টো আন্দোলনকারীদের জাতীয়তাবাদী পরিচিতি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তাদের হিন্দু পরিচিতি তুলে ধরতে থাকেন। অতঃপর ব্যামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ পত্র পেশ করলে ও মর্লে বাজেট ভাষণ প্রদান করলে সিমলা দৌত্যের পথ সুগম হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় ভাইসরয়ের আশ্বাস মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ফুলারের উত্তরসূরী, পূর্ব বাংলা ও আসামের নূতন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হেয়ার, ভাইসরয়কে সিমলা দৌত্যের মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। দুই ব্রিটিশ আমলার সহায়তায়, আলিগড় কলেজের সচিব মহসিন-উল্-মুল্কের আগ্রহে এবং কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডের উদ্যোগে ভাইসরয় মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তারিখ স্থির হয় ১লা অক্টোবর, ১৯০৬। স্থির হয় যে আইনসভার পরিকাঠামো সম্পর্কে সরকার কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বেই মুসলমানরা ভাইসরয়ের নিকট তাদের 'ন্যায্য দাবী' উত্থাপন করবে। সিমলা দৌত্যের দুই প্রধান নেতা আগা খান এবং মহসিন-উল্-মুল্ক ভাইসরয়ের নিকট থেকে ভারতীয় মুসলমান সমাজ সম্পর্কে 'nation within the nation' এই পরিচিতি ও স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিলেন, যে পরিচিতিকে ভিত্তি করে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সিমলায় মিন্টো সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ও বঙ্গভঙ্গ এবং ফুলার প্রসঙ্গ তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। সিমলায় মিন্টো মাথাপিছু ভোটের অধিকার প্রদান না করলেও মুসলমানদের সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বার্থের সংরক্ষণের পূর্ণ আশ্বাস দেন। শুধু তাই নয়, ভাইসরয় মহসিন-উল-মুল্ক্কে ব্যক্তিগতভাবে জানান যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা অর্জন করার জন্য মুসলমানদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন যে সিমলা দৌত্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের হাত মজবুত করে তুলেছিল এবং অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরাল একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তাৎক্ষণিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্ত কিছুর ফলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খানের উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মুসলিম অল ইণ্ডিয়া কনফেডারেসি' স্থাপিত হয়, যার নাম অচিরেই পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'মুসলিম লীগ'।

জয়ন্তী মৈত্র মুসলিম পৃথকীকরণের রাজনীতি গড়ে ওঠার পিছনে বাংলার মুসলমান সমাজের ভূমিকাকে বড় করে দেখেছেন। সিমলা দৌত্যকালে যে স্মারক লিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাতে বাংলার মুসলমানদের দুই কেন্দ্রীয় দাবি অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ এবং ফুলারের পদত্যাগ সংক্রান্ত দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আগা খান বিশ্বাস করতেন যে এই দুই দাবি যথেষ্ট স্পর্শকাতর হবার কারণে দাবিপত্রে এ'দুটির অন্তর্ভুক্তি অনুচিত হবে। এর ফলে বাংলার মুসলমানদের একাংশের ধারণা হয় যে আগা খান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, যে কারণে স্বাস্থ্য হানির অজুহাতে নবাব সলিমুল্লাহ সিমলা দৌত্যে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। সিমলা দৌত্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি। দৌত্যে পূর্ব বাংলার এই অকিঞ্চিৎকর প্রতিনিধিত্বের কারণে ফ্রান্সিস রবিনসন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দৌত্যের প্রকৃত উদ্যোগ এসেছিল বরং আলিগড় নেতৃবর্গের তরফ থেকে। অন্যদিকে জয়ন্তী মৈত্র দেখিয়েছেন যে ভাইসরয় সমবেত প্রতিনিধিদের জানান যে পরবর্তী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকালে তাদের বিশেষ দাবি বিবেচনা করা হবে। ভাইসরয়ের এই আশ্বাসে উদ্দীপ্ত বাংলার মুসলমান নেতৃবর্গ ১৯০৬ সালে মহম্যাডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনকালে মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে মৈত্র মন্তব্য করেছেন যে বাংলার মুসলমানদেরই উদ্যোগের ফলে ঢাকা সম্মেলনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তাঁর মতে, সিমলায় এবং ঢাকা অধিবেশনে বাংলার

মুসলমানরা উত্তরভারতীয় মুসলমানদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লীগ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্যোগ আলিগড়ের পক্ষ থেকে এসেছিল।

যাই হোক, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে, — ১) বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা; ২) ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি করা ও সেই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে তাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করা; এবং (৩) মুসলমানদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাবের উদ্ভব প্রতিরোধ করা। ত্রিপাঠীর মতে, তৃতীয় লক্ষ্যটি ছিল সর্বতোভাবে অসার, কারণ লীগের উৎপত্তিই ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে গড়ে ওঠা মুসলমান উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে।

৪.৭.২.৫ ঃ মর্লে-মিন্টো সংস্কার

ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সচিব লর্ড মর্লে ও বড়লাট মিন্টো কিছু সংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। তদনুযায়ী, ১৯০৯ সালে মর্লে-মির্ন্টে সংস্কার যখন প্রবর্তিত হয় তা কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে ছাড়া আর কাউকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

মর্লে-মিন্টো সংস্কারে স্থির হয় যে গর্ভনর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক কাউন্সিলে একজন করে ভারতীয় সদস্যকে নিয়োগ করা হবে। এই দুই কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলেও সে দুটির মূলগত চরিত্রে কিন্তু কোনও পরিবর্তন করা হয় নি। কেন্দ্রীয় কউন্সিলে সরকারী সদস্যরা আগেরই মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ রইলেন। স্থির হয়, ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হবেন। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই গরিষ্ঠতা ছিল ময়ামাত্র, কারণ তার মধ্যে কিছু মনোনীত সদস্য থাকতেন।

আলোচ্য সংস্কার আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভার জন্য নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে (১) সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলী, যার অন্তভুক্ত ছিলেন প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যবর্গ, (২) শ্রেণী ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলী যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুসলমান ও ভূস্বামী সম্প্রদায়, এবং (৩) বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী যা গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয় চেম্বার অফ কর্মাস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের অধিকাংশই নির্বাচিত হয়ে আসবেন নানা সমিতি, ভূস্বামী ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা। এই ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে থেকেও প্রদেশিক গর্ভনর বা ভাইসরয় নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও সদস্যকে রাজনৈতিক ভাবে অবাঞ্জিত বলে বাদ দিতে পারতেন বলে স্থির হয়।

আইন সভাগুলির ক্ষমতাকে সীমায়িত রাখা হয়। প্রশ্নের উত্থাপক সদস্যেরই কেবল অধিকার ছিল সম্পূরক প্রশ্ন তোলার। উল্লেখযোগ্য, সেনাবাহিনী বা দেশীয় রাজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কের কিংবা প্রস্তাব গ্রহণের কোনও অধিকার আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয় নি। সামগ্রিক বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার বা ভোট গ্রহণের কোনও অধিকারও আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয় নি। কেবল বাজেটের আংশিক আলোচনার মধ্যে এই অধিকারকে সীমিত রাখা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার আগেও কংগ্রেসের নেতৃবর্গ সরকারের সঙ্গে আপস-মীমাংসায় রাজী ছিলেন। কিন্তু আইন প্রবর্তিত হলে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটে। বস্তুতঃ সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সদিচ্ছাই সরকারের ছিল না, যে কারণে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিল মুষ্টিমেয় মানুষকে। বস্তুতঃ মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার ভারতের জাতীয়

সংহতির পথে বিপুল অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল। এই সংস্কার আইনে মুসলমানদের আইনসভায় পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করে সরকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। ভোটদানের যোগ্যতার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে। তবে মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্তে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে।

মর্লে-মিন্টো সংস্কার ভারতীয়দের মধ্যে যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, তাকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। নূতন বন্দোবস্ত অনুযায়ী বিহার ও উড়িষ্যাকে আর বাংলাদেশের অংশ রাখা হল না, এবং আসামকে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হল। তার সঙ্গে ভারতের রাজধানীকেও কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল।

৪.৭.২.৬ ঃ লক্ষ্ণৌ চুক্তি

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার সিদ্ধান্ত বাংলার মুসলিম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই ক্ষোভ ক্রমে সর্বভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নবিউল্লাহ মুসলমানদের আত্মশক্তির আদর্শ অনুসরণের পরামর্শ দেন। এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় মুসলিম সমাজে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তুরস্ককে কেন্দ্র করে। বল্কান যুদ্ধ ও তুরস্কের প্রতি অনুসৃত ব্রিটিশ নীতি ভারতীয় মুসলমানদের ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। ইসলাম জগতের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে তুরস্কের বিদ্রোহী অমুসলমান প্রজাদের ইংল্যাণ্ড সাহায্য করায় ভারতের মুসলমানরা ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই নূতন পরিস্থিতিতে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বিবেচনা করতে থাকে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ নাগাদ লীগের নেতৃত্বে ও সংগঠনে কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রসারিত হয়। 'এলিট' নেতৃত্বের অবসান ঘটে, এবং লীগ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল এবং ডঃ আনসারির মতো মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হন। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান এবং মজহর-উল-হক এই সময়ে যে আহরার আন্দোলন শুরু করেন, তা' কংগ্রেসের চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে একই ক্ষুরে বাঁধা ছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বেছে নিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথ। এই সময়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মহম্মদ আলির মতো নেতৃবর্গ লীগের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মুশিরুল হাসান দেখিয়েছেন যে এই সময়ে হালি, শিবলি, নোমানি এবং মহম্মদ ইকবালের রচিত কবিতার অন্তর্নিহিত ব্রিটিশ বিরোধিতা কীভাবে মুসলিম নবীন প্রজন্মকে উদীপ্ত করেছিল।

১৯১২ সালে মুসলিম লীগ কাউন্সিল লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯১৩ সালে লীগের নূতন সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯১৩ সালেই লীগ স্বায়ত্ত শাসনের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং হিন্দু-মুসলিম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব রাখে। কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে একই স্থানে দুই দলেরই অধিবেশন আহুত হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ব্রিটেনের

তুরস্ক বিরোধী নীতি ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরূপতা আরো বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক, এলিট নেতৃত্বও আলিগড়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ফলে লীগের দৃষ্টিভঙ্গীও চরমপন্থী হয়ে ওঠে। এই সময়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার আগ্রহ দেখা দেয়। এই আগ্রহেরই ফল ছিল লক্ষ্ণৌ চুক্তি।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদনে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য একান্ত আবশ্যক। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেতার আগ্রহ এতোই আন্তরিক ছিল যে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও রয়তি সুবিধার দাবি মেনে নিতেও তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল শর্তগুলি নিম্নরূপ। প্রথমতঃ, প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার মুসলিম সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। দ্বিতীয়তঃ স্থির হয়, কেন্দ্রীয় আইন সভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। আরো স্থির হয়, কংগ্রেস এবং লীগ যৌথভাবে সরকারের কাছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের বিলুপ্তি ও সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি জানাবে। সর্বোপরি, লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ সংক্রান্ত আদর্শে সম্মতি জানায়।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ চুক্তি এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত। কারণ এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যবর্তী ব্যবধান অলঙ্ঘনীয় নয়। কিন্তু গান্ধী এই চুক্তি সম্পর্কে বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে, লক্ষ্ণৌ চুক্তি ছিল ধনী শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে ধনী শিক্ষিত মুসলমানের সমঝোতা বিশেষ। সাধারণ হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে এই চুক্তির কোনও সম্পর্ক ছিল না। শুধু তাই নয়, এই চুক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র স্বার্থের উপর। রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধার আশায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বকে পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর ফলে বরং ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ আরো প্রশস্ত হয়েছিল। জুডিথ ব্রাউন লিখেছেন, মুসলিম লীগ সকল স্তরের ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে নি। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে লীগকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিহার ও উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত ব্যারিস্টার ও বুদ্ধিজীবি মহল। ফলে মুসলিম অভিজাত সমাজ লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু তা হলেও এই ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে গান্ধীর হাতে নূতন হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকেই আশ্রয় করে গান্ধী অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

৪.৭.২.৭ ঃ পাকিস্তান আন্দোলন

কিন্তু অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের হিন্দু-মুসলিম সংহতি স্থায়ী হয় নি। কামাল পাশা খিলাফৎ পদ লোপ করলে খিলাফৎ আন্দোলনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে আবার নূতন করে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

খিলাফৎ আন্দোলনের অবসানের পরে অভিজাত ও বিত্তবান মুসলিম নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন করে মুসলমানদের সংহত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। আগা খান, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, আবদুর রহিম প্রমুখ নেতৃবর্গ এখন মুসলমান রাজনীতির শীর্ষনেতারূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৪ সালে মুসলিম লীগকে পুণরুজ্জীবিত করা হয়, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভাও শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে

ভারতে সর্বমোট ৬২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্বে মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত উর্দু লেখক ও দার্শনিক স্যার মহম্মদ ইকবাল। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে আয়োজিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনি ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলির সমন্বয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রস্তাবও দেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৮ সালে জিন্নাহ কলকাতায় নিখিল ভারত সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের যে সমস্ত দাবি উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি আগা খানের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলান। নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে যোগ দিয়ে অতঃপর জিন্নাহ ১৯২৯ সালে মার্চ মাসে তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবি নেহরু রিপোর্টের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁর চৌদ্দ দফা দাবির মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল।

মহম্মদ আলি ১৯৩০ সালে ঘোষণা করেন যে গান্ধীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু মহাসভার উপর নির্ভরশীল করে তোলা। কংগ্রেসের পরিচালিত আন্দোলনকে তিনি 'হিন্দু আন্দোলন' অ্যাখ্যা দেন। গোল টেবিল বৈঠকের সময়ে মহম্মদ আলি স্পষ্টতঃ বলেন যে ভারতীয় মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না, কারণ তাঁরা কেবলমাত্র ভারতীয় আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নন। ভারতীয় মুসলমানরা অখণ্ড ঐস্লামিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এর মধ্যে ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামধাজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেবার প্রস্তাব দেন।

'পাকিস্তান' শব্দটির প্রস্তাবক ছিলেন কেমব্রিজে পাঠরত জনৈক পাঞ্জাবী মুসলিম ছাত্র চৌধুরী রহমৎ আলি। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'এখন, অথবা কখনও নয়' শীর্ষক এক ইস্তাহারে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে এক নূতন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান।

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে লীগ রাজনীতির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। ১৯৩৪ সালে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। অথচ প্রথম জীবনে জিন্নাহ একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তিনি কংগ্রেস বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ সালে চৌদ্দদফা দাবি পেশ করার পরে তাঁর রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটে এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক নেতারূপে ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হন।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনগুলিতেও লীগ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ১১টি প্রদেশে মোট ৪৮৫টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে লীগ সামান্য আসল দখল করতে পেরেছিল। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলেও লীগ একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি, পাঞ্জাবে ৪৮টি সংরক্ষিত আসনের মাত্র একটি এবং বাংলায় ১১৭টি সংরক্ষিত আসনের মাত্র একটি এবং বাংলায় ১১৭টি সংরক্ষিত আসনের মাত্র ৪৯টি লীগ জয়লাভ করেছিল। ফলে উপরোক্ত চারটি প্রদেশের কোনটিতেই লীগ সরকার গঠন করতে পারে নি, ১৯৩৭ সালে নির্বাচন কংগ্রেসের প্রতি লীগের বিদ্বেষ আরোই বৃদ্ধি করেছিল।

কংগ্রেস এই সময়ে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশে জনসংযোগের আন্দোলন শুরু করলে জিন্নার উদ্যোগে লীগও জাতীয় স্তরে মুসলমান সংহতি বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। এর ফলে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার

হায়াৎ খান, বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও আসামের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শায়াদুল্লাহ্ লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে লীগের বার্ষিক অধিবেশনে জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদের সমস্ত বিভেদ ভুলে লীগের অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন জানান। তিনি ঘোষণা করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনে ভারতীয় মুসলমানদের কোনরূপ আশ্চর্যজনক অগ্রগতি ঘটা সম্ভব নয়। জিন্নাহ্-র এই উগ্র মনোভাব প্রশমিত করতে ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু এবং ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালান। এর প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ্ কংগ্রেসের কাছে দুটি দাবি রাখেন, — ১) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসকে এ'কথা মেনে নিতে হবে, এবং ২) কংগ্রেসকে এ'কথাও স্বীকার করতে হবে যে কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান, কাজেই ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার কংগ্রেসের নেই। সহজবোধ্য কারণেই কংগ্রেসের পক্ষে জিন্নাহ্-র এই দুই প্রস্তাবের কোনটিই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

অতঃপর জিন্নাহ্ কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচারের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। এই অত্যাচারের তদন্ত করার জন্য লীগ পীরপুরের রাজার সভাপতিত্বে যে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করে তার রির্পোট প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯৩৯ সালে বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, শরিফ রিপোর্টে মুসলিমদের উপর হিন্দু অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে। ঐ বছরেই শেষ দিকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুর্দশা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লীগ এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ভারতের মতো বহুজাতিক দেশে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা অন্যায় ও অযৌক্তিক।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সরকার কংগ্রেস-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। অতঃপর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করলে জিন্নাহ্ 'কংগ্রেসী অত্যাচার' থেকে মুক্তিলাভ করায় মুসলমানদের 'মুক্তিদিবস' পালন করতে আহ্বান জানান।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ লাহোরে আহুত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ফজলুল হকের উথাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে প্রস্তাবটিতে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানানো হলেও 'পাকিস্তান' শব্দটি কিন্তু ব্যবহৃত হয় নি। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে মুসলিম লীগের উদ্যোগে পাকিস্তান প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটে। এই সময়ে 'পাকিস্তান' গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লীগের যাবতীয় কর্মসূচী পরিকল্পিত হয়েছিল। আলোচ্য সাত বৎসরে জিন্নাহ তথা লীগের ভূমিকাকে দুইটি কালানুক্রমিক পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে (১৯৪০-'৪৫) জিন্নাহ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৪৫-'৪৭) তিনি সাংবিধানিক পথ পরিহার ক'রে পাকিস্তানের দাবিতে অনমনীয় সংঘর্ষের পথ অবলম্বন করেন।

প্রথম পর্যায়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সরকারী দমননীতির ফলে কংগ্রেসের সক্রিয়তা স্তিমিত হয়ে পড়লে লীগ প্রদেশে-প্রদেশে ক্ষমতা দখল করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সরকারও লীগকে বাড়তি মর্যাদা দিতে শুরু করে। এ'ক্ষেত্রে দুই বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ও লর্ড ওয়াভেলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থায় রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে সমঝোতাসূত্র উত্থাপন করেন তা জিন্নাহ-র বিরোধিতায় বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্নাহ্ বৈঠকেও জিন্নাহ্ পাকিস্তানের ও দেশভাগের দাবিতে অটল রইলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটনার দ্রুত পালা বদল ঘটেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে ব্রিটেনের নবনির্বাচিত শ্রমিক দলের সরকারের উদ্যোগে লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জিন্নাহ্ লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসাবে গণ্য করার দাবি জানালে ১৯৪৫ সালের জুন মাসের সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়। অতঃপর মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবও লীগ প্রত্যাখান করে। ১৯৪৬ সালের ২৯-শে জুলাই লীগ কাউন্সিল ঘোষণা করে যে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের কম কিছু তারা মানতে রাজী নয়। এর পরে ৩১শে জুলাই ১৯৪৬ লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা সাংবিধানিক রাজনীতি থেকে স্পষ্টতই একটি বিচ্যুতি ছিল। জিন্নাহ্ সম্ভবতঃ লীগের উগ্র গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে ১৬-ই আগষ্ট কলকাতায় রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। শীঘ্রই পাঞ্জাবও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং কংগ্রেস ভারত বিভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। স্থির হয় যে পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পূর্ব বাংলা এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্ট স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করে।

খলিদ বিন সৈয়দের মতে, জিন্নাহ তাঁর প্রতিপক্ষের ভুলভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। বি. আর. নন্দের মতে, ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সংঘর্ষের পরিণতি পাকিস্তান। তিনি লিখেছেন, অন্যেরা জিন্নাহ্-র জন্য দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, এবং জিন্নাহ্ সহজেই তাঁর অভীষ্টে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু আয়েষা জালালের মতে জিন্নাহ্ আদৌ ভারত বিভাগ চান নি, কংগ্রেস নেতৃত্বই বরং ভারত বিভাগের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। জালালের বক্তব্য হল হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে জিন্নাহ্ একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের পরে কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব তাঁকে হতাশ করে তোলে ও স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু অমলেন্দু দে আয়েষা জালালের বিরোধিতা করে দেখিয়েছেন যে ১৯৩৭ সাল থেকেই জিন্নাহ্ কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের শরিক হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকেই তিনি লীগকে সাম্প্রদায়িক 'ক্ষমতার নীতি' অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন।

৭.২.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Peter Hardy, The Muslims of British India.
2. Mushirul Hasan, Nationalism and Communal Politics in India, 1916-'28
3. D. Page, Prelude to Partition : All India Muslims Politics, 1921-'32
4. Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims.
5. Aysha Jalal, The sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan.
6. Bipan Chandra, Amales Tripathi, Barun De, Freedom Struggle.
7. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত, খণ্ড ১,২

৭.২.৯ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. How Would you explain the emergence of separatist politics in India?
2. What part did syed Ahmed khan play in the growth of a separate political identity among the Indian Muslims?
3. Assess the role of the Aligarh Movement in the history of Muslim separatism in India.
4. Trace the circumstances leading to the formation of the Muslim League.
5. How did the Morley-Minto Reforms foster separatist tendencies in Indian Politics?
6. Did the Lucknow Pact (1916) bring new grounds in Hindu-Muslim relations in India?
7. Trace the course of the Pakistan Movement.

ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -**৫**

Society and Culture in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

COR-205 (CBCS)

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখার্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ ২০২২ ।
- গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকেও সংগৃহীত হয়েছে।
- সংগৃহীত অংশের কোন মৌলিকত্ব নেই।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to

promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-205(CBCS Paper): Society and Culture in India- (Credit-4)

BLOCK 1: Fundamentals of Indian Tradition

Unit-1: Rural communities of Modern India.

Unit-2: Social changes through the ages.

Unit-3: Caste and Social mobility

BLOCK 2: Philosophy and theology in India.

Unit-4: The Upanishads, the sharadarshana(Six School).

Unit-5: Charvaka and Lokayata Darshan, *Buddhism, Jainism, Vaishnavism,*

Unit-6: The Bhakti and Sufi movement, Sikh Philosophy.

BLOCK 3: Displaying Indian heritage in art and architecture.

Unit-7: Temple, Mosque, Dargah.

Unit-8: Some case studies.

BLOCK 4: Elite culture.

Unit-9: Folk tradition

Unit-10: Their regional variety.

Unit-11: Development of Language and Literature.

BLOCK 5: Education and press in India.

Unit-12: Decline of traditional education and its regional variations.

Unit-13: Spread of western education,its role in socio-religious reforms and growth of nationalism.

Unit-14: Journey from colonial to post-colonial India.

BLOCK 6: Evolution of different forms of performing art

Unit-15: Music - North and South Indian varieties.

Unit-16: Dance and Drama: North, South and North- Eastern varieties.

পর্যায়- ১

একক-১,২,৩

৫-১-১-১ সূচনাঃ-

৫-১-১-২ আধুনিক ভারতবর্ষের গ্রামীন সম্প্রদায় (একক-১)

৫-১-১-৩ গ্রাম- সমাজ বা সম্প্রদায় -এর পরিবর্তন (Change in Village- Community)

৫-১-১-৪ চিরস্থায়ী,রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ব্যবস্থা

৫-১-২-৫ সামাজিক পরিবর্তনঃ গ্রাম সমাজ সম্পর্কে মার্ক্স (একক-২)

৫-১-২-৬ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও বিতর্ক

৫-১-২-৭ মধ্যযুগের গ্রামসমাজ

৫-১-৩-৮ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব (একক-৩)

৫-১-৩-৯ নিম্নবর্ণের বিভিন্ন আন্দোলন

৫-১-৩-১০ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫-১-৩-১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫-১-১-১ সূচনাঃ-

বর্তমান পর্যায়ে ভারতীয় গ্রাম সমাজের প্রাচীন থেকে আধুনিক বিভিন্ন সময়ের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হবে। গ্রাম সমাজের আর্থসামাজিক পরিবর্তন তুলে ধরা হবে এই পর্যায়ে।

৫-১-১-২ আধুনিক ভারতবর্ষের গ্রামীন সম্প্রদায়ঃ

সাধারণভাবে গ্রাম (Village) বলতে বোঝায় সেই ছোট নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলকে যেখানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম এবং তাঁদের কাছে কৃষি (Agriculture) শুধুমাত্র পেশা (Occupation) নয়,বরং কৃষি তাঁদের জীবনধারা (way of life)। একসাথে বসবাসকারী এই জনসমষ্টির মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা (Community sentiment) বিদ্যমান, তাঁরা সাধারণত একই জীবন শৈলী অনুসরণ করে। বিভিন্ন বিষয়ে এঁদের মধ্যেকার সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (interaction) খুব গভীর। ম্যান্ডেলবাম (Mandelbaum) মনে করেন, গ্রামবাসীর কাছে তাঁর গ্রাম শুধুমাত্র কিছু বসতবাড়ি, কিছু রাস্তাঘাট বা চাষের জমির যোগফল নয়, এ হলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে সামাজিক বাস্তবতা (prime social reality)। ম্যান্ডেলবাম-এর পর্যবেক্ষনে, গ্রাম তার অধিবাসীদের কাছে স্পষ্টত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সজীব সামাজিক অস্তিত্ব। নগরের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় গ্রাম -এর ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষে গ্রাম-এর পারে পরিণত হওয়ার অন্যতম সূচক হলো জনগণনার হিসেবে অতন্ত পাঁচ হাজার মানুষের বসবাস। অর্থাৎ সাধারণত একটি ভারতীয় গ্রামের আধিবাসীদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের চেয়েকম। ভারতবর্ষে ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামের জনসংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। সমভূমি অঞ্চলের গ্রামের চেয়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলের গ্রামের জনসংখ্যা খুবই কম। গ্রাম এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি এ বিষয়ে সবাই একমত যে গ্রামই হলো সব থেকে পুরোনো ও স্থায়ী জনসমষ্টি। কিন্তু,বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা গ্রাম কে চিহ্নিত করতে পারি, এগুলি হলো, কম জনসংখ্যা, কৃষিই হচ্ছে মূল পেশা, সামাজিক ও ভৌগলিক ক্ষেত্রে গতিশীলতার অভাব, সামাজিক একপতা সমষ্টিগত মানসিকতা, প্রকৃতি-নির্ভর জীবনযাত্রা, ইত্যাদি।

গ্রাম সম্প্রদায়-এর বৈশিষ্ট্য (Features of village community) : গ্রামীন ভারতই হলো ভারতবর্ষের আসল পরিচয়। মহাত্মা গান্ধী বলতেন, তারা করে তার গ্রামে। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ভারতের প্রতিটি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা দরকার। ভারতের গ্রাম সমাজ বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

(১) সমষ্টিগত মানসিকতা (community sentiment) - গ্রাম সমষ্টি বা সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা দেখা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে আমরা মনোভাব (we-feeling) গড়ে ওঠে। ব্যাক্তিগত স্বার্থের চেয়ে তাঁদের কাছে সামাজিক স্বার্থ বেশ গুরুত্ব লাভ করে। জীবনের সার্বিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর লক্ষ্যে তারা যৌথভাবে এক সামগ্রিক জীবনধারার অংশীদার হত। আমোদ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন তাঁরা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতো আবার একসাথে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন খরা, বন্যা, আকাল, মহামারীর সময় গ্রামের মানুষ একসাথে মোকাবিলা করতো।

(২) প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক (contact with nature) জীবনে প্রকৃতি নির্ভরতা। গ্রামের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে। বৃষ্টি (rainfed Irrigation) এবং ঋতু বৈচিত্র্যের উপরই তাদের কৃষিকাজ আল নির্ভরশীল। এছাড়াও আছে পশুপালন, মাছধরা, পশুশিকার, ফলমূল সংগ্রহ ইত্যাদি। সার্বিক অর্থে গ্রামের মানুষের জীবন যাপন অনেকাংশেই প্রকৃতি নির্ভর।

(৩) সংখ্যা (Thin population) গ্রামে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। গ্রামে জনগনর (population density) শহরের তুলনায় কম। জীবনধারণের জন্য কৃষি কাজ ও পশুপালনের জন্য অনেক বেশি জমি দরকার। সেই কারণে শহরের তুলনায় বসতবাড়ির সংখ্যা গ্রামে অনেক কম।

(৪) কৃষি ভিত্তিক পেশা (Agro based occupation) - ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে মানুষের প্রধান বৃত্তিই হলো কৃষি কাজ। প্রায় সব অধিবাসীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি অথবা কৃষিভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া তাঁতি, কামার, কুমোর, মুচি প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষ গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। সনাতন ভারতের গ্রামে পেশা মূলত জাতভিত্তিক ছিল। কারো কারো মতে, সে সময় ভূসম্পত্তিতে ব্যাপ্তি মানি ছিল না।

(৫) মুখোমুখি সম্পর্ক (face to face relation)- গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম বলে তাদের সবার সঙ্গে মুখোমুখি প্রাথমিক সম্পর্ক বিদ্যামান। প্রত্যেকটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে্য অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের পরিচয় আছে। অন-আনুষ্ঠানিক (informal), অকৃত্রিম এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়-কুটুম্বকে ভিত্তি করে।

(৬) স্বয়ংসম্পূর্ণতা (self sufficiency) স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভারতের সনাতন সমাজের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অনেকের মতে, মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই গ্রাম সম্প্রদায়গুলি তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ বজার রাখতে সক্ষম হয়। এই স্বনির্ভরতা শুধুমাত্র গ্রামগুলির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়। পাশাপাশি সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হতো। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় খুব দ্রুত লয়ে পরিবর্তন দেখা যায়। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় গ্রামসমাজ গুলোর সংগঠন গুলিতেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, গ্রামীন শিল্প ইত্যাদির ফলে গ্রামীন সমাজ বা সম্প্রদায়গুলির স্বয়ং-সম্পূর্ণতা (caste system) গ্রামীন সম্প্রদায় বা সমাজের অধিবাসীদের জীবনধারা জাতিব্যবস্থার ভিত্তিতেই পরিচালিত হতো। এখনো ভারতবর্ষের অধিকাংশ সমাজ জীবনে জাতি ব্যবস্থার প্রভাব যথেষ্ট। জাতির ভিত্তিতে গ্রামসমাজ স্তরবিন্যস্ত। এর ভিত্তিতে গ্রামের মানুষের মর্যাদা স্থিরীকৃত হতো, প্রতি মর্যাদা আরোপিত (ascribed), জন্ম থেকেই তা ঠিক হয়ে যায়। প্রত্যেক জাতির পরম্পরাগত নিজস্ব বৃত্তি আছে, তাও পূর্বনির্ধারিত। জাত-পঞ্চায়েত (caste panchayat) জাতিভুক্ত সদস্যদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে।

(৮) রক্ষণশীলতা (conservetism) ভারতের গ্রামসমাজ বা সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো রক্ষণশীলতা। সনাতন ধর্ম, প্রথা, লোকনীতি, ইত্যাদি গ্রামের মানুষের সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলস্বরূপ তাঁদের আচার আচরণে রক্ষণশীলতা দেখা যায়। প্রচলিত গতানুগতিক জীবনধারাই তাদের কাছে অধিকতর শ্রেয় বিবেচিত হয়, কোনো ধরণের সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিবর্তন তাদের কাম্য হয় না। (৯) যজমানিপ্রথা (Jajmani system) এ হলো সনাতন ভারতীয় গ্রাম সমাজে পরিবারভিত্তিক পারস্পরিক আদান-প্রদান বা বিনিময় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মূলত ভারতীয় সমাজের জাতব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। জাতগোষ্ঠীর সদস্যদের বৃত্তি বা পেশা পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ছিল। গ্রামীন সমাজের মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর তাগিদে জাতগোষ্ঠীগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতা ও আদান-প্রদানই যজমানি ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গ্রামীন সম্প্রদায় বা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে যজমানি প্রথার কথা উল্লেখ করা যায়।

(১০) পঞ্চায়েত (panchayat) - ভারতবর্ষের সনাতন গ্রামসমাজ বা সম্প্রদায়গুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। গ্রামের প্রভাবশালী মানুষেরাই পঞ্চায়েত পরিচালনা করতো। গ্রামের যাবতীয় কাজকর্ম এরই মাধ্যমে পরিচালিত হতো। চাষের জমি বিতরণ ও নির্ধারণ করা, গ্রাম্য বিবাদ মীমাংসা করা, অভ্যন্তরীন বিধিব্যবস্থার রূপায়ন ও নজরদারী করা, ইত্যাদি সব কাজই হতো গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সম্রাট, রাজা বা অন্য কোনো শাসক গ্রামের রাজস্ব পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতো, পঞ্চায়েতের কাজে তারা সাধারণত হস্তক্ষেপ করতো না।

(১১) পরিবার ও আত্মীয়তা (Family and kinship) — ভারতবর্ষের সনাতন গ্রাম সমাজে যৌথ পরিবার ও আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গ্রামীন সমাজে যৌথ পরিবারের ভূমিকা উল্লেখ করে অধ্যাপক এস.সি. দুবে বলেছেন, ভারতবর্ষকে অনেক সময়ই 'যৌথ পরিবারের দেশ' বলে

অভিহিত করা হয়। সেই পরিবারকেই যৌথ পরিবার বলা যায়, যখন তা বাবা-মা, ভাই-বোন, তাঁদের সন্তান-সন্ততি কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, শুধু মাত্র দম্পতিকে কেন্দ্র করে নয়। যার সদস্যরা সম্পত্তি, আয়, অধিকার ও দায়দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তারা একই ছাদের নীচে বাস করে, একই হাড়ির অন্ন খায়। কৃষিপ্রধান গ্রাম সমাজের স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা যৌথ পরিবারের অনুকূল ছিল। রক্তের সম্পর্ক ও বিবাহসূত্রে পরিবারগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে সহজ কথায় বলে। গ্রাম সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রাম- সমাজ বা সম্প্রদায় -এর পরিবর্তন (Change in Village- Community)

ইংরেজ প্রশাসক চার্লস মেটকাফ ভারতবর্ষের গ্রাম সম্প্রদায় বা গ্রামসমাজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে, যেখানে কোনো কিছুই টিকে থাকেনা, সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজের জোরে টিকে গেছে। একের পর এক রাজবংশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ সবাই ক্রমান্বয়ে শাসন করেছে, কিন্তু গ্রাম সমাজ মূলত একই রকম থেকে গেছে।

মেটকাফ ছাড়াও সেই সময়কার অনেক উপনিবেশবাদী সমাজবিদ এক 'স্থবির ও পরিবর্তনহীন' গ্রাম সমাজের চিত্র উপস্থাপন করলেও অনেকেই তা মেনে নেননা। গ্রাম সমাজের এই ধরনের উপস্থাপন তাঁদের কাছে অতিরঞ্জিত। বস্তুত, গ্রাম সম্প্রদায় এর পরিবর্তনের গতি ছিল খুবই মন্থর। গতানুগতিক কৃষি ও গ্রামীন শিল্পের ঐক্য এবং গ্রামীন মানুষের রক্ষণাশীলতা পরিবর্তনের গতি মন্থর করতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু, পরিবর্তনশীলতার অমোঘ নিয়ম এই গ্রাম সমাজগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। গতি মন্থর হলেও সনাতন গ্রাম সমাজেও পরিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে ভারতবর্ষের গ্রাম সম্প্রদায় গুলির পরিবর্তন তুলনামূলক ভাবে গতি লাভ করে—

(১) সমষ্টিগত মানসিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন— গ্রামমুখী উৎপাদনব্যবস্থা থেকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অন্তর্গত হয়ে বাজারমুখী উৎপাদনব্যবস্থা গ্রাম সমাজের সমষ্টিগত মানসিকতায় চিড় ধরায়। তাদের মধ্যেকার 'আমরা-বোধ' দুর্বল হয়ে পড়ে। বাজার কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বেশি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসকদের 'বিভাজন এবং শাসন'-এর নীতি গ্রামের যৌথ কর্মোদ্যগেও প্রভাব সৃষ্টি করে। গ্রাম পরিচিতি'র পরিবর্তে জাত-ধর্ম- পরিচিতি বেশি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।

(২) গ্রামীন স্বয়ংসম্পূর্নতা হ্রাস – ঔপনিবেশিক কাল থেকেই গ্রাম ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে কৃষি ও শিল্পের পরস্পরাগত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ভিত্তি করেই গ্রামের কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমোর, কারিগররা ন্যূনতম পর্যায়ের হলেও তাদের আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা গড়ে তুলেছিল। এছাড়াও বন্দর, রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি তৈরি হওয়ায় গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। এসবেরই মিলিত ফল হিসেবে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। যা গ্রামসমাজের সামাগ্রিক জীবনে পরিবর্তন 368 বয়ে আনে।

(৩) সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি--- জাতপ্রথা অনুসারে গ্রাম সমাজের সদস্যদের বৃত্তি বা পেশা জন্মসূত্রেই আরোপিত হতো। প্রাকৃতিক আইনের অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্বের ফলে বৃত্তি বংশগত হয়ে উঠেছিল। এর অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল অপরিবর্তনশীল বাজার; ফলে প্রাক ঔপনিবেশিক কালে ভারতের গ্রাম গুলিতে সামাজিক সচলতার একান্তই অভাব ছিল। গ্রাম সমাজগুলি ছিল অনেকাংশেই নিশ্চল ও 'বদ্ধ'। গ্রাম সমাজগুলি এই গতিহীনতার কারনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল এবং নিজ কক্ষপথে আপনগতিতে আবর্তিত হতো। ব্রিটিশ যুগ থেকেই ভারতের গ্রাম সমাজে কিছুটা হলেও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। কৃষির বানিজ্যিকীকরণ, বাজারমূখী উৎপাদন, যোগাযোগ বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারনে বদ্ধ (closed) গ্রাম সমাজ ধীরে ধীরে মুক্ত (open) হতে শুরু করে। আরোপিত (ascribed) সমাজব্যবস্থা অর্জিত (achieved) সমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। গ্রামের জাতগুলির মধ্যে সামান্য হলেও উল্লম্বী সচলতার সূত্রপাত হয়।

(৪) যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন - ভারতবর্ষের সনাতন গ্রাম সমাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। কিন্তু সেই ব্যবস্থায় ক্রমশই অবক্ষয় দেখা দেয়। গতানুগতিক কৃষি ও শিল্পের ঐক্যে ভাঙ্গন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, গ্রাম ভিত্তিক আঞ্চলিক কৃষি থেকে বাজারমুখী জাতীয় কৃষি অর্থনীতিতে রূপান্তর, নগরায়ন, সামাজিক সচলতা ইত্যাদি যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরায়। গ্রাম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারগুলির ক্ষমতা কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একনায়কতান্ত্রিক (অথরিটারিয়ান) যৌথ পরিবারগুলির অনুশাসন এখন অনেক দুর্বল। এর জায়গায় ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক একক পরিবারগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৫) জাতির ভূমিকায় পরিবর্তন— সনাতন গ্রাম সমাজের মূল ভিত্তি ছিল জাতিব্যবস্থা (caste system)। সনাতন স্তরবিন্যস্ত গ্রামসমাজে মানুষের মর্যাদা, বৃত্তি বা পেশা সবই জাতি হিসেবে আরোপিত বা জন্মসূত্রেই নির্ধারিত হয়ে যেত। ভারতের গ্রামগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত জাতি ব্যবস্থায় নানা দিক

থেকে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, এই ব্যবস্থা টিকে থাকার ও নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত যত আঘাত এসেছে জাতিব্যবস্থা তা সামলে নিয়েছে এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত করে তুলেছে। যেমন, ছোঁয়াছুয়ির বাধা নিষেধ এখন অনেকটাই শিথিল হয়েছে। পংক্তিভোজন এবং জাতপেশা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা এখন অনেক কম। অন্তগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের লোকনীতি এখন আগের মতো কঠোর নয়। অন্যদিকে, রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জাতি ব্যবস্থা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। জ পরিষদের (caste council) ক্ষমতা ও প্রভাবেও পরিবর্তন দেখা গেছে।

(৬) ধর্ম-ব্যবস্থায় পরিবর্তন - সনাতন গ্রাম ভারতে জনসমাজের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ধর্মের প্রভূত গুরুত্ব ছিল। সেই সময় কর্তৃত্বমূলক ধর্মীয় অনুশাসনের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন গ্রামীন ধর্মীয়ব্যবস্থাতেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনের 'বিভাজন ও শাসনের' নীতি ধর্মীয় বিভাজনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মীয় সমন্বয়বাদের ধারার ঐতিহ্য থেকে ভারতের গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের উন্মেষ হতে দেখা যায়। আবার অন্যদিকে, ভারতের গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার মানুষের মানসিকতা উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশও ঘটতে দেখা যায়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্তৃত্ব কায়েম হতে থাকে। ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গুরুত্ব ক্রমেই বেশি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। তবে ভারতের গ্রামীন জন মানসে ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার কর্তৃত্ব এখনো যথেষ্ট মাত্রায় শক্তিশালী রয়েছে।

(৭) শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন— গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ পরম্পরাগত ভাবে জাত-পেশায় প্রশিক্ষিত হতো। এদের প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন হতো না। সনাতন গ্রাম সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এর গঠন প্রকৃতি ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের চেয়ে ধর্মীয় প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর ছিল। শিক্ষা ধর্মপ্রসারের মাধ্যম হিসেবেই বিবেচিত হতো। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজে শিক্ষাদান উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীন জনসমষ্টির প্রায় সবাই নিরক্ষর ছিল। মধ্যযুগের থেকেই ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মক্তব ও মাদ্রাসা-এই দুই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে তৎকালীন গ্রামগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জনসমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশভারতে মেকলের মতকে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতের শিক্ষা নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাথে সাথে গ্রামীন ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্প (Rural Functional Literacy programme) চালু করা হয়। গ্রামের মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মানব সম্পদের বিকাশই হলো এই শিক্ষানীতির ঘোষিত লক্ষ্য। বর্তমানে শিক্ষালাভ মানুষের মৌলিক অধিকার। ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে আধুনিক ও প্রয়োজন-ভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের গ্রামগুলির সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের এক সমন্বিত রূপ হিসেবে বর্ণনা করা যায় কথা বলতে গিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানী গ্রামকে একটি জীবনধারা (Rural way of life) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামকে তাঁরা এক্ষেত্রে একটি একক এবং সমগ্র হিসেবে ধারণা করেছেন। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব পরম্পরা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি আছে। এই কারণে অনেকেই গ্রামকে একটা পৃথক একক হিসেবে গণ্য করেন। এরই ফলে গ্রামীন জীবনে ধর্ম, লোকাচার, লোকনীতি, প্রথার প্রভাব বেশি যা গতানুগতিকতাকে প্রাধান্য দেয়। এই কারণেই গ্রামসমাজে পরিবর্তনের গতি অতি মন্থর। গ্রামের মানুষ পরিবর্তনের প্রতি তুলনায় উদাসীন থাকে। গ্রামীন জীবনধারার (Rural way of life) সঙ্গে শহুরে জীবনধারার (Urban way of life) সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধগত পার্থক্য স্পষ্ট। গ্রামীন ও নগরীয় জীবনধারার মধ্যেকার এই পার্থক্যই গ্রামীন জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

তবে, পরিশেষে একথা বলা যায় পশ্চিমীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তির প্রভাব কম মাত্রায় হলেও ভারতবর্ষের পরম্পরাগত গ্রামীন সমাজ কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন গ্রামীন জীবনের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিতেও পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক কৃষি, প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প, উদারনৈতিক অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পরিকল্পিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, নিকট শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি নানাবিধ কারনে গ্রামজীবনে ধারাবাহিকতার পাশাপাশি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এনেছে।

এ-প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীন প্রশাসন পরিচালনা গ্রামভারতে ক্ষমতা-কাঠামোতে (Rural power. structure) বেশ কিছুটা পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জাতভিত্তির এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ গ্রামীন ক্ষমতা-কাঠামোতেও পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নীচের সারিতে অবস্থিত জাতি-উপজাতির প্রতিনিধিরা এর ফলে গ্রামীন প্রশাসন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষন সীমিত অর্থে হলেও এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজেও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদায় পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে ভারতের গ্রামগুলিতে পরিবর্তন এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

ভারতের গ্রামসমাজের পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা আমরা অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংয়ের মতামত উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করতে পারি। এই বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক সিং মনে করেন যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন গ্রামজীবনে মুখ্য পরিবর্তন এনেছে। মূল্যবোধ এবং চেতনার পরিবর্তন গ্রামবাসীদের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আশা-আকাঙ্খাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। ভোটাধিকার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার গ্রামজীবনের শাসন প্রনালীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গ্রামে ভূমিসংস্কার মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে কিছুটা সমতা আনতে চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন মূলক প্রকল্প তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক গুলির নতুন দিশা দেখিয়েছে। গ্রামের জাতি প্রথার কঠোরতা হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সনাতন পারিবারিক সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ও প্রয়োগ ঘটেছে। সনাতন ধ্যানধারণা বা বিশ্বাস, এক কথায় সাবেকী মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নিয়তিবাদের বদলে গ্রামের মানুষের বাস্তববাদী প্রবনতা বেড়েছে। মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষি ক্ষেত্রে জ বিপ্লব দেখা দিয়েছে। গ্রামে বাজার, ব্যাংক, বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। সরকারী বা বেসরকারী সবুজ। কল্যানমূলক কাজকর্মের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কথায় গ্রামে থেকেও শহরের অনেক সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

তবে একথাও সবাই স্বীকার করেন যে গ্রামের পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নের সুবাতাস সব গ্রামবাসীর জীবনে সমানভাবে পৌঁছয় নি। বিরাট সংখ্যক দরিদ্র্য গ্রামবাসী এখনো উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাইরে নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই সব দরিদ্র্য ও প্রান্তিক গ্রামীন মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে নানা ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। তবে এই সব দারিদ্য মানুষের কাছে কর্মসূচিগুলির সুফল ঠিক ভাবে পৌঁছতে পারছেনা। তাঁরা মূলত সামাজিক বহিষ্করণের (social exclusion) মধ্যেই দিন অতিবাহিত করছে।

৫.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকার ভেদ

(২) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

(৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত -- উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

(৪) রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫.৩.১.১ : কৃষির অবস্থা ও আঞ্চলিক প্রকারভেদ

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। জমির ক্ষেত্রে মালিকানা সম্পর্ক, ভূমি রাজস্বের প্রথাগত ধরন, রাজস্বনীতি, রাজস্ব সংগ্রাহকদের প্রকারভেদ, কৃষকদের স্তর বিন্যাস, উৎপাদনের ধরন ইত্যাদির কোনটিই অনড় ছিল না এবং অঞ্চলভেদে এগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন ছিল। মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন বিবর্তিত হয় তেমনি আবার এই বিবর্তন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। মুঘল ভারতে কৃষকরা ছিল মূলতঃ উৎপাদক সম্প্রদায় ও মোঘল শাসকদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল কৃষি থেকে আহরিত উদ্বৃত্ত সম্পদ। স্বভাবতই কৃষির অবস্থার ওপরই নির্ভর করত সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান, কৃষির অবস্থার উন্নতি হলে উদ্বৃত্ত আহরণের পরিমাণ বাড়ত। মুঘল আমলে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, যা কৃষি সমাজ ও উৎপাদনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসনভার গ্রহণ করার পর কৃষির যে দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা হল ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা তথা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। জমি কার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বা জমির মালিক কে, প্রকৃত উৎপাদক কারা এবং উৎপাদিত ফসলের কে কতটা কিভাবে পায় এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে ভূমিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক ভারতে, বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশরা তিন ধরনের ভূমি ব্যবস্থা চালু করেছিল - জমিদারি ব্যবস্থা, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা এবং মহলওয়ারি ব্যবস্থা। এই প্রত্যেক ধরনের মধ্যে আবার প্রভেদ ছিল। যেমন জমিদারি ব্যবস্থায় কোথাও রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হতো, আবার কোথাও অস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব কিছুদিন পর পর নূতন করে নির্ধারিত হতো। মহলওয়ারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থাতেও বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তিতে বিভিন্নতা ছিল। এক কথায় আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংরেজ সরকার যে ভূমিব্যবস্থা সৃষ্টি করে তা যথেষ্ট জটিল ছিল, যা বিভিন্ন প্রদেশের ভূমি ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের

মতে, এই জটিলতা ইংরেজরা স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেনি। প্রায় একশ বছর ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভুল ও তা সংশোধন করতে করতে, প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামীণ শ্রেণী সমাবেশ ও কৃষির অগ্রগতি বিচার করে, সবচেয়ে কম সমস্যায় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব কিভাবে আহরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজরা নানা ধরনের ভূমি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। প্রথমে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করব।

৫.৩.১.২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, প্রভাব ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ :

১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু এদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল নগণ্য। ফলে কোম্পানি আপাতত প্রচলিত রীতি অনুসারে পরোক্ষভাবে রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে মনস্থ করে। ১৭৬৫-১৭৭২ সময়কালে নায়েব-নাজিম (দেওয়ান) রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়কে ২৪টি জেলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। এদেরকে সামনে রেখে কোম্পানি রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের জন্য 'আমিলদার' নিযুক্ত করেন। সাধারণত সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত ব্যক্তিকেই আমিলদারী দেওয়া হতো। কিন্তু এতে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের পরিমান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন যে, আলিবর্দী খাঁ-র সময়ে পূর্ণিয়া থেকে চার লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতো। রেজা খাঁ-র আমলে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫ লক্ষ টাকা। এর পরেও কোম্পানি আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য রেজা খাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায়, জেলায় রাজস্ব পরিদর্শক নিয়োগ (১৭৭০), মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় রেভিনিউ কাউন্সিল আর কলকাতায় কন্ট্রোলিং কমিটি নিয়োগ (১৭৭১) ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু সুপারভাইজররা রাজস্ব ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন। আর রেজা খাঁ রাজস্ব প্রশাসনে কোম্পানির অধিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে নানাভাবে অসহযোগিতা শুরু করেন। এসবের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে অরাজকতা দেখা দেয়। ১৭৭০-র দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তোলে। ঐ দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেলেও কিন্তু রাজস্ব আদায় কমেনি।

যাইহোক, কোম্পানি এরপর ঠিক করে যে রাজস্ব আদায়ের ভার সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নেবে। ১৭৭২ সালে গভর্নর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেই ওয়ারেন হেস্টিংস রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করেন এবং নায়েব নাজিম পদ বিলোপ করেন। গভর্নর ও তার কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে 'Board of Revenue' গঠন করে তার উপর রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দু-এক বছরের ইজারাদারির জায়গায় পাঁচশালা ব্যবস্থা চালু হয়। পুরাতন জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে গুরুত্ব পেতে থাকেন। তবে নিলামী ব্যবস্থা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে, তা বজায়

রাখা হয়। পাঁচ-সালা বন্দোবস্ত শেষ হলে (১৭৭৭), বাৎসরিক বন্দোবস্ত শুরু হয়; অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের সাথে চুক্তি করে, বিগত তিন বছরের রাজস্বের ভিত্তিতে। ১৭৮৯ পর্যন্ত এই এক-সালা বন্দোবস্ত চালু থাকে। কিন্তু এ সব কোন বন্দোবস্তই ত্রুটিমুক্ত ছিল না। বিলাতের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিল। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হলে ভূমি রাজস্বের আদায়ের ক্ষেত্রে নূতন পর্যায় শুরু হয়। এতদিন ধরে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তার অবসান ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (১৭৯৩) করে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন, লর্ড কর্ণওয়ালিস।

তবে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উদ্ভাবক ছিলেন না। ১৭৭০ সালে Alexander Dow চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাসী Dow মনে করেন রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কৃষির উন্নতি হবে, যার ফলে বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাবে। ফিজিওক্র্যাটিক মতবাদের অনুরাগী Henry Pattullo, (হেনরি পাতুল্ল) ১৭৭২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন। তাঁর মতে, এতে বাংলার কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে, কৃষির সাথে শিল্পের প্রসার ঘটবে। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সবথেকে বেশি সোচ্চার হন ফিজিওক্র্যাটিক মতবাদের অনুরাগী ফিলিপ ফ্রান্সিস, যাকে জেমস মিল এই বন্দোবস্তের প্রকৃত সংগঠক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে এই বন্দোবস্তের অনুকূলে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী পিট ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরি ডাণ্ডাস তাঁর প্রস্তাব (Philip Francis's Minute, 1776) দ্বারা প্রভাবিত হন। Pitt's India Act (1784) -এ অস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করা হয়। ১৭৮৬ সালে কোম্পানির পরিচালক সভা একটি ডেসপ্যাচ দ্বারা জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সুপরিশ করেন। ফলে কর্ণওয়ালিস যখন ভারতে আসেন (১৭৮৬) তখন নানা মহলে স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে যে ভাবে ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে কর্ণওয়ালিসের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যে কার্যকারি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কর্ণওয়ালিস নিজে ছিলেন ইংলণ্ডের বনেদী জমিদার বংশের সন্তান। প্রশাসন ও অর্থনীতিতে জমিদার শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জেমস মিলের মতে কর্ণওয়ালিসের 'অভিজাততান্ত্রিক সংস্কার' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য দায়ী ছিল।

১৭৮৬-১৭৮৯ সময়কালে সম্ভাব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন দিক-নিয়ে কোম্পানির উপর মহলে বিতর্ক চলেছিল। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস; বোর্ড অব রেভেন্যুর সভাপতি জন শোর ও কোম্পানির প্রধান সেরিস্তাদার জেমস গ্রান্ট। এই বিতর্কের বিষয়গুলি ছিল, জমির মালিকানা, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি বছর ও পরিমাণ বন্দোবস্তের মেয়াদ এবং রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে জমিদারদের প্রয়োজনীয়তা। জমির মালিকানা বিষয়ে শোরের বক্তব্য ছিল জমিদাররাই জমির মালিক, যা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করেন। মালিক হিসাবে তাদের জমি বিক্রি, দান ও বন্ধক রাখার অধিকার আছে। অন্যদিকে গ্রান্ট সরকারকে জমির মালিক মনে করেন—

জমিদার একজন রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র। এই বিতর্কে শোরকে সমর্থন করেন কর্ণওয়ালিস। ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের ভিত্তি বছর ও রাজস্বের পরিমাণ নিয়েও শোর ও গ্রান্টের মধ্যে বিতর্ক চলে। এখানেও শোরের বক্তব্যকে কর্ণওয়ালিস সমর্থন করেন ও ১৭৮৮-৮৯ এবং ১৭৮৯-৯০ সালের রাজস্বের ভিত্তিতে নূতন বন্দোবস্তের কথা বলেন। তবে কর্ণওয়ালিস বন্দোবস্তের মেয়াদ সম্পর্কে শোরের সাথে একমত ছিলেন না। শোর আপাতত জমিদারদের সাথে কোন দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন — কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। শোরের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে লোকালয় ও চাষ বাড়লেও সরকার তা থেকে আয়বৃদ্ধি করতে পারবে না। তাছাড়া ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য নেই — এ অবস্থায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। কর্ণওয়ালিস অন্যদিকে মনে করতেন কোম্পানির হাতে যথেষ্ট তথ্য আছে এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলার কৃষিব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছিল, তা সামাল দিতে একটি স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে জমিদাররা জমিতে স্থায়ী স্বত্ব পেলে কৃষির পুনর্গঠনে যত্নবান হবেন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটবে, যাতে সামগ্রিকভাবে কোম্পানির লাভ হবে।

বস্তুত একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই ধরনের বন্দোবস্তই কর্ণওয়ালিস ও কোম্পানির কর্তাদের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল। প্রথমত, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করতে কোম্পানি ১৭৬৫ সাল থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু এতে সাফল্য না আসায় একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের কথা ভাবা হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করে জমিদার নিজ এলাকায় কৃষি উৎপাদন প্রসারে উদ্যোগী হবেন বলে আশা করা হয়েছিল। সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডে এমন অনেক জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষী 'কৃষি বিপ্লব'-র দ্বারা শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। কর্ণওয়ালিস মনে করেছিলেন জমিদারদের জমিতে স্থায়ী স্বার্থ তৈরি হলে, কৃষির উন্নতি হবে এবং যেহেতু বাংলায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কৃষির উন্নতি হলে শিল্পের উন্নতি হবে— সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। আর এর পরোক্ষ ফল হবে কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার কথা কর্ণওয়ালিস অবশ্যই ভেবেছিলেন। ডিরেক্টর সভাকে তিনি জানিয়েছিলেন যে জমিতে লাভের সুযোগ থাকলে কলকাতার ধনী বণিক ও মহাজনরা নিশ্চিতভাবে জমিতে বিনিয়োগ করবেন। তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্বের পরিমাণ বেঁধে রাখলে, ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়াবার ক্ষমতা কোম্পানি হারাবে ঠিকই, কিন্তু আপাতত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এটা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ ঐ রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকেই কোম্পানি এদেশের দ্রব্যাদি কিনে ইংলণ্ডে বেচে লাভ করতো। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয়, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির ঘাটতি মেটানো এবং চীনের বাণিজ্য বাবদও কোম্পানির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। কিন্তু প্রাক ১৭৯৩ সময়ে বাংলার রাজস্ব থেকে আয় ছিল অনিশ্চিত। ফলে বাজেট তৈরি করতে অসুবিধা হতো। কোম্পানির আয়কে সুনিশ্চিত করাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্থত, কোম্পানি একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত জমিদারদের রাজনৈতিক বন্ধু হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। যেহেতু সামাজিকভাবে

প্রভাবশালী এই জমিদাররা তাদের আর্থিক লাভের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল থাকবেন, কোম্পানি আশা করেছিল যে, জমিদাররা অন্তত শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ রাজের সমর্থকে পরিণত হবে। পঞ্চমত, কোন সামাজিক শ্রেণী বা গোষ্ঠী জমিদারি পেলে তা নিয়ে কর্ণওয়ালিসের কোন মাথাব্যথা ছিল না। সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমিদার কোম্পানির নির্ধারিত রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলামের মাধ্যমে হাত বদল হয়ে যেত। এর ফলে আরও উদ্যোগী ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ জমিদারি ভোগ করবে, যারা রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হয়েছিল। সর্বোপরি, ১৭৭০-র কুখ্যাত মন্বন্তরে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে। আশা ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষবাসের প্রসার ঘটবে - ফলে রাজস্বও বাড়বে।

কর্ণওয়ালিসের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার সাথে পিটের ভারত-আইন ও পরিচালক সভার নির্দেশনামার (১৭৮৬) সাদৃশ্য থাকায়, এ ব্যাপারে সত্বর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৭৮৯ সালে বাংলা ও বিহারে এবং ১৭৯০ সালে উড়িষ্যায় দশ বছরের জন্য জমিদারদের জমি বন্দোবস্ত দেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ডিরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে এই 'দশসালা' বন্দোবস্তই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে বিবেচিত হবে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরী ডাণ্ডাস ও প্রধানমন্ত্রী পিটের অনুমোদনক্রমে পরিচালক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন। এরপর ১৯৯৩-র ২২ শে মার্চ কর্ণওয়ালিস এক 'রেগুলেশন' জারী করে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করেন। এই নির্দেশনামায় বলা হয় যে জমিদারগণ বংশানুক্রমিকভাবে জমির স্বত্ব ভোগদখল, দান বন্ধক বা বিক্রী করতে পারবেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি করে সরকারি প্রাপ্য আদায় করা হবে। মোট ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ পাবেন সরকার ও ১০ শতাংশ পাবেন জমিদারবর্গ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ও মূল্যায়ন ঃ

ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এর প্রভাবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, যেসব আশা করে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধারণভাবে পরিপূরিত হয় — জমিদারদের আনুগত্য, রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি উৎপাদনের প্রসার। কিন্তু অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হয়। Baden Powell-র মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের বহু প্রত্যাশাকে মিথ্যা করে এমন কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, যা অকল্পনীয়।

আপাতদৃষ্টিতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার ও সরকার উভয়ের কাছেই শুভ হয়েছিল। সরকার বার্ষিক ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হওয়ায় বার্ষিক বাজেট করা সম্ভব হয় ও তার অন্যান্য কার্যাবলীতে মনোনিবেশ করতে পারে। অন্যদিকে জমিদাররা দুভাবে লাভবান হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস জমিদারদের সাথে নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তি করে জমিদাররা কতটা রাজস্ব দেবেন তা স্থির করলেও রায়তরা কতটা পরিমাণ রাজস্ব জমিদারদের দেবেন, তা স্থির করেননি। ফলে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে

বেশি পরিমাণে অর্থ আদায় করতে থাকেন। তাছাড়া জমি থেকে রাষ্ট্রের আয় নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, পরবর্তীকালে জমির উৎপাদন ও দাম কয়েকগুণ বাড়া সত্ত্বেও সরকার এই বর্ধিত আয়ের ভাগ পায়নি। জমিদাররা এই বর্ধিত, অনার্জিত আয় বৃদ্ধির (unearned increment of income) সুবিধা লাভ করেছিল। কর্ণওয়ালিস ধরে নিয়েছিলেন যে জমিদার স্থায়ী স্বত্ব পেলে, তারাও রায়তদের স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করবে। কিন্তু তা হয়নি। ১৭৯৩-র অষ্টম রেগুলেশনে কৃষকদের পাট্টা প্রদানের নির্দেশ থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। জমিদাররা পাট্টা প্রদান করে রায়তদের স্বত্বদানে ইচ্ছুক ছিলেন না। আবার রায়তরাও পাট্টা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না কারণ পাট্টা নিলে জমি জরিপ করতে হবে — সেক্ষেত্রে তাদের যে কিছু অতিরিক্ত জমি দখলে আছে তা ধরা পড়ে যাবে এবং হস্তচ্যুত হবে। এতে কৃষকরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Peter J. Marshall রায়তদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতাকে সমালোচনা করেছেন।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথম দিকের জমিদারদের পক্ষে শুভ হয়নি। কঠোর সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিদার ঠিক সময়ে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত। ফলে ১৭৯৩-১৮১৫ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশ জমিদারি হাত বদল হয়। পরবর্তীকালে জমির উৎপাদন ও দাম বৃদ্ধির ফলে জমিদারি অধিক লাভজনক হয়ে ওঠে এবং জমিদারির হাত বদলের হার কমে যায়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, জমিদারির আয় বাড়ার সাথে কৃষিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের হারের উন্নতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে দক্ষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কৃষির উন্নতিতে কমই মনোযোগ দিতেন বা বিনিয়োগ করতেন। অনেক সময় জমিদাররা নিজের জমিদারিতে উপস্থিতও থাকতেন না (absentee landlord), এই অবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হলে, কৃষকদের দুর্গতি আরও বাড়তে থাকে। Floud Commission-র মতে, চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় খাজনার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে যে ব্যবধান, এই দুই-র মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে- তারই ফলস্বরূপ জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হয়। অনেক সময় জমিদাররা নিজে দায়িত্ব না নিয়ে, খাজনা আদায়ের জন্য নিজ জমিদারিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একজন ব্যক্তির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছেড়ে দিতেন। এই খণ্ডিত অংশকে বলা হত 'পত্তনি' ও 'পত্তনি'-র অধিকারীকে 'পত্তনিদার'। জমিদারদের মতো এরাও বংশানুক্রমিকভাবে পত্তনি থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। পত্তনিগুলি আবার আরও খণ্ডিত হয়ে 'দর-পত্তনি', যেগুলি পুনরায় খণ্ডিত হয়ে 'দর-দর-পত্তনি' - তে পরিণত হতো। ১৮১৯ সালে সরকার আইন পাশ করে পত্তনি ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। পত্তনি ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়ে উনিশ শতকে চরম আকার নিয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে উত্তরোত্তর বিভিন্ন স্তরে, উপস্তরে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়, যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কৃষক-শোষণ করে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করা। আর যেহেতু সরকারকে দেয় রাজস্ব স্থির হয়ে গিয়েছিল, বর্ধিত খাজনার অংশ সরকার পেত না, যা বন্টিত হতো বিভিন্ন স্তর, উপস্তরে অবস্থিত মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে। বস্তুত চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের এই পরিণতি উনবিংশ শতকের

প্রথমেই বোঝা গিয়েছিল। ফলে জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে কোম্পানি অন্য ভূমিব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকার ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ গ্রহণ করেছিল, উনিশ শতকে আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের মাত্র ২৮ শতাংশ সরকার পেত। ১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারের প্রাপ্য ১৮.৫ শতাংশে নেমে যায়। ভূমি থেকে আয় সরকারি কোষাগারকে নয়, জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সমৃদ্ধ করেছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, সরকারের রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আর্থিক প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। ভূমি থেকে বর্ধিত আয়ের ভাগ সরকার পায়নি, সেজন্য সরকার এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ভারতে অন্যত্র করতে চায়নি।

তবে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করতে, সরকার জমিদারদের এ ব্যাপারে অবাধ কর্তৃত্ব দিতে দ্বিধা করেনি। ১৭৯৩ সালে ১৭ নং রেগুলেশন এবং ১৭৯৫ সালে ৩৫ নং রেগুলেশন জারী করে সরকার অনাদায়ী রায়তের সম্পত্তি দখল করার অধিকার জমিদারের হাতে তুলে দেয়। ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন (Regulation VII) দ্বারা জমিদারদের হাতে অনাদায়ী রায়তের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ এই আইনকে 'a blank cheque to the Zemindar' বলে বর্ণনা করেছেন। অনেক পরে ১৮৫৯ সালের দশম রেগুলেশন ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন জারী করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যাইহোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক নূতন জমিদারি ও জমিদারের আবির্ভাব হয়। এই নূতন জমিদারদের অনেকে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারি ও জমিদারি আমলা। আর্থিক লাভ ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য এরা ভূমিব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন—কৃষিতে বিনিয়োগ বা পুঁজিবাদী পরিবর্তন ঘটানো এদের উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও এদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালের বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, গ্রামীণ বাংলার আর্থিক পুনরুজ্জীবনে এরা উৎসাহী ছিলেন না। বাংলার কৃষকরা ক্রমবর্ধমান মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের শোষণের শিকার হয়েছিলন।

৫.৩.১.৩ : রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থা

পটভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ :

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমন কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল, যা এই ব্যবস্থার প্রবক্তাদের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারেনি, তবে এই বন্দোবস্তের রূপায়ণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোম্পানি ভারতের অন্যান্য অংশের ভূমি বন্দোবস্তে স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবর্তী শ্রেণী বাদ দিয়ে সরাসরি রায়তের সাথে রাজস্ব চুক্তি ও স্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে ২০ বা ৩০ বছর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ, যাতে কৃষির প্রসার ও বাজার বৃদ্ধি পেলে সরকার বর্ধিত আয়ের একটা অংশ পেতে পারে। তবে এই নতুন চিন্তার পেছনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলির

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছাড়াও ছিল ইংল্যাণ্ডের উপযোগবাদী (utilitarian) অর্থনীতি ও শাসননীতির প্রভাব—অন্যভাবে বলতে গেলে ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) ও জন বেন্থাম (John Bentham)-র চিন্তাধারার প্রভাব। Eric Stokes তাঁর 'The English Utilitarians and India' গ্রন্থে এই দুই মনীষীর ভারতের সরকারি নীতির উপর প্রভাব আলোচনা করেছেন। বেন্থামের প্রভাব পড়েছিল মূলতঃ আইন ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণে, আর রিকার্ডোর প্রভাব ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ে। ১৮২১ প্রকাশিত Principles of Political Economy গ্রন্থে রিকার্ডো বলেন যে জমিদাররা খাজনা পায় জমির উপর মালিকানা স্বত্বের কারণে। জমিদাররা খাজনা সংগ্রহ করে, কিন্তু কৃষি উৎপাদনে তাদের ভূমিকা নগণ্য। রিকার্ডোর মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, পুঁজিপতি পুঁজি দেয়, উদ্যোগী ব্যবসাদার বা শিল্পপতি দেয় উদ্যোগ, শ্রমিক দেয় শ্রম। সুতরাং এইসব উৎপাদক শ্রেণীর উপর কর বসালে তাদের বিকাশ ব্যাহত হয় বা উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যেহেতু জমিদার উৎপাদনের জন্য কিছু করে না, জমির উপর মালিকানা স্বত্বের কারণে অনার্জিত আয় (Unearned income) গ্রহণ করে, তাই জমিদারের আয়ের উপর কর স্থাপন ভাল—কারণ এতে সরকারের আয় হয় ও অন্যদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরও চাপ পড়ে না। সুতরাং জমিদারের আয়ের উপর যতটা সম্ভব কর চাপানো ভাল-জমিদারি ব্যাপারটাই পুরো তুলে দেওয়াও যেতে পারে, কেননা এতে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় না। এই রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতি ভারতে ইংরেজ প্রশাসকদের প্রভাবিত করেছিল, যারা জমিদারদের বাদ দিয়ে ভূমি বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন।

ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের অনুগামীদের মতে, ভারতে রায়তদের উপর জমির স্বত্বাধিকার দিলে, রায়তরা নিজ স্বার্থেই উৎপাদন প্রসারে উদ্যোগী হবে — জমিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হলে ব্রিটেনে এর রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এ সবের ফলে একদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, ভারত থেকে শিল্প সমৃদ্ধ ব্রিটেনে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত হবে ও অন্যদিকে কৃষকদেরও ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, যা ব্রিটিশদের বাজার দখলের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবে। সুতরাং রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে জমিদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের সরিয়ে দিয়ে রায়তদের সাথেই সরাসরি চুক্তি তথা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত-র ধারণা সরকারি মহলে গুরুত্ব লাভ করে।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার জনক ছিলেন Thomas Munro. তিনি ও জেমস মিল, দুজনেই ছিলেন রিকার্ডো পন্থী। এরা ভারতের ভূমিব্যবস্থা থেকে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অপসারণ চেয়েছিলেন। কিন্তু, জমির মালিকানা রায়তদের হাতে থাকা উচিত না রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত। তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মুনরো রায়তদের স্বত্বাধিকার স্বীকার করতেন; কিন্তু জেমস মিল রাষ্ট্রের হাতে জমির মালিকানা রাখার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৮২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে মুনরো রায়তকেই প্রকৃত জমির মালিক বলে মনে করেন। জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রতি আস্থাই মুনরোকে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার প্রতি অনুগত করে তুলেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারলাভ করলে, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনার কথা ভাবা হয়। ১৭৯২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজের বড়ামহল অধিগ্রহণ করে। নব অধিকৃত অঞ্চলের শাসনদায়িত্ব গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্মচারী আলেকজাণ্ডার রীড, টমাস মুনরো প্রমুখ বড়মহল অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। এখানে সরাসরি রায়তদের সাথে বন্দোবস্ত প্রথা চালু ছিল। ক্যাপ্টেন রাও এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে বড়ামহল অঞ্চলে, ১৭৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে রায়তওয়ারি প্রথা চালু করেন। এরপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এই ব্যবস্থা কিছুটা পরিপূর্ণতা পায়। ১৮২০-২৭ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজের গভর্নর থাকাকালীন মুনরো ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল না, সেখানে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু করেন। দক্ষিণী ভূস্বামীশ্রেণী পলিগারদের ক্ষমতাচ্যুত করে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরাসরি কৃষকদের সাথে বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় রায়তগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে জমির উপর মালিকানা স্বত্ব পায়। সাধারণত ২০ বা ৩০ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হত। নির্দিষ্ট সময়ের পরে সরকার নূতন করে বন্দোবস্ত দিতে পারত। নূতন বন্দোবস্তের সময় সরকার রাজস্বের হারও বৃদ্ধি করতে পারত। রীডের ঘোষণাপত্রে নীট আয়ের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে ধরা হয়। তবে নীট আয়ের পরিমাণ জানা সহজ ছিল না। মুনরোর মতে, প্রথম দিকে রাজস্ব বড় উঁচু হারে ধরা হয়েছিল, বিশেষত, যেহেতু ফসল ও তার দামের বাড়া-কমার সাথে রাজস্বের তারতম্য হতো না। মুনরোর নিজের সুপারিশ ছিল রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। ১৮৬১ সালে ৩০ বছরের জন্য নয়া বন্দোবস্ত শুরু হয়। এখানে মোট কৃষিজ আয় থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে, যা থাকে তার অর্ধাংশকে রাজস্ব হিসাবে ধরা হয়।

মাদ্রাজের মতো বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথমে আর. কে. প্রিংগল ও পরে গোল্ড স্মিথ, জর্জ উইনগেট প্রমুখ বোম্বাইয়ে এই ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এখানে একই রাজস্ব তত্ত্ব গৃহীত হলেও প্রয়োগের সময় একটু অন্যভাবে হিসাবটা করা হয়। ১৮২৪-২৮ ও ১৮৩৫-৭২ সালে বিভিন্ন পর্যায়ে যে বন্দোবস্ত করা হয় তার মূল সূত্র উৎপাদন ও খরচের হিসাব নয়,— বিভিন্ন জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও পূর্বতন বন্দোবস্তে রাজস্ব হারকে ভিত্তি করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়। মাদ্রাজের মতো বোম্বাই-তেও বন্দোবস্ত ছিল অস্থায়ী—সাধারণত ৩০ বছরের জন্য।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের মতন অঞ্চলগুলিতে গ্রাম সংগঠনের অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মাদ্রাজে মুনরো কিংবা বোম্বাই-এ এলফিনস্টোন তৎকালীন গ্রাম সমাজের প্রশাসনিক কার্যকারিতার উপর জোর দিলেও, এগুলিকে এড়িয়ে রায়তের সাথে সরাসরি চুক্তির কথা বলেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনে গ্রাম সমাজের কোন জায়গাই থাকেনি। কিন্তু

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সমালোচিত হতে শুরু করলে, সরকার সনাতনী গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবনের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে। অযোধ্যার কিছু অংশ, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা এবং পাঞ্জাবে গ্রামীণ সমাজ সংহতি ও প্রশাসনিক ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে সরকার মনে করে। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ছোট বড় বিভিন্ন মহলে বিভক্ত ছিল। এখানে সরকার সরাসরি রায়তের সাথে চুক্তি না করে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে মহলের বা গ্রামের কর্তৃপক্ষের সাথে অস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করতে মনস্থ করে। অর্থাৎ গ্রাম বা মহালভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থার সাথে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের কিছু নীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মহলওয়ারি ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়, সেখানে রায়তের পরিবর্তে মহল বা গ্রাম বা গ্রাম সমষ্টিকে রাজস্বের জন্য দায়ী ধরে নিয়ে, তার সাথে ভূমিবন্দোবস্ত করা হবে।

মহলওয়ারি ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করেন হোলট্ ম্যাকেনজী, ১৮১৯ সালে তিনি একটি প্রতিবেদনে এই নুতন ধরনের মহলওয়ারি ভূমি ব্যবস্থার সুত্রপাত করেন। ১৮২২ সালে এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় ও পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল বেন্টিংকের সমর্থন ও রবার্ট বার্ড এবং জেমস টমসনের ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই বন্দোবস্ত চূড়ান্তরূপ পায়। উত্তর ভারতে ভূমিবন্দোবস্ত বোম্বাই-র তুলনায় অনেক বেশি জমি জরিপ, পরিসংখ্যান ও হিসাবের ভিত্তিতে রূপায়িত হয়েছিল। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট রাজস্ব মহলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ করে আদায় করা হত। Holt Mackenzie-র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৮২২ সালের যে রেগুলেশন (Regulation VII) জারী করে 'মহলওয়ারি' বন্দোবস্তকে বাস্তবায়িত করা হয়, তাতে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের সুপারিশ ছিল। স্থির হয়, ২০/৩০ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। এই সময়সীমার পরে আবার পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করা হবে। রাজস্ব হিসাবে নিট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ নেবার কথা বলা হয়। কিন্তু এটা খুব বেশি মনে হওয়ায় ১৮৫৫ সালে ঠিক করা হয় যে যেখানে ভূস্বামী খাজনা পায়, সেখানে খাজনার অর্ধেক এবং অন্যত্র নিট উৎপাদন মূল্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো, এখানেও নিট উৎপাদন মূল্য হিসাব করা সহজ ছিল না। ফলে পূর্বতন রাজস্বের হার, উৎপন্নের দাম, পার্শ্ববর্তী এলাকায় খাজনার হার ইত্যাদির সমন্বয়ে রাজস্ব নির্ধারিত হতে থাকে।

৫.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Kumar, Dharma ঃ The Cambridge Economic History of India, Vol II (Delhi, 1982)
2. Sinha, N. K.ঃ Economic History of Bengal Vol-II (Calcutta, 1965)
3. Mukherjee, Nilmoni ঃ The Ryotwari System in Madras, 1792-1827 (Calcutta, 1962)
4. ভট্টাচার্য সব্যসাচী ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৯৮৭)

৫.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss the background of the introduction of the Permanent Settlement in Bengal.
2. Why did Lord Cornwallis introduce the Permanent Settlement? How far were his expectations fulfilled ?
3. Discuss the effects of the Permanent Settlement on different social classes of agrarian Bengal.
4. Analyse the circumstances leading to the introduction of the Ryotwari settlements.
5. What are the specific features of the Ryotwari and Mahalwari Settlements ?

সামন্তপ্রথা সম্পর্কে ধারণা জনপ্রিয় হয়েছে। এর একটা কারণ এই যে এই ধারনার অস্পষ্টতার ফলে সাধারণভাবে নানান অবস্থা বুঝতে এটি প্রয়োগ করা যায়। আবার কেউ কেউ একটু অন্যভাব্যে শব্দটি ব্যবহার করেন, যেমন আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা প্রোটো সামন্ততন্ত্র বা 'সামন্তপ্রথা'।

৩.৫.৪ : ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

জাতি ও যৌথ পরিবার ভারতের গ্রামীণ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্যের আলোকে বিভিন্ন দিক নিয়ে ভারতের গ্রাম ও গ্রামের সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। গ্রামের সেবা ব্যবস্থার কার্যকরী গোষ্ঠী যেমন বিভিন্ন কারিগর, কর্মকর্তা এবং গ্রামের চাষের জনগোষ্ঠীর সহায়তায় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সহায়ক উপাদান গঠিত হয়। ভারতে মানব বসতির মৌলিক একক হিসেবে গ্রামে থাকে বাসস্থান, চাষের জন্য আবাসস্থল এবং কৃষি জমি। উল্লেখ্য, 'সমাজতান্ত্রিক গ্রাম' একটি সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাস্তবে এলাকার আশেপাশের কৃষি এলাকা বিবেচনা করাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। এবং এটি কেবল প্রশাসনিক উদ্দেশ্য নয়, বরং গ্রামের সমস্ত জনসংখ্যাতে তথ্যও এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। একটি 'সমাজতান্ত্রিক গ্রাম' প্রায়শই 'প্রশাসনিক গ্রাম' হিসাবে একই রকম থাকে। যাইহোক, গ্রামের এই প্রক্রিয়া দেশের সমগ্র অংশে দেখা যায় না, কারণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভৌগলিক, পরিবেশগত ও ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রয়েছে।

প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে গ্রাম সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করেন। স্বনির্ভরতা বোঝাতে অনেক সময় এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো সমাজই পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক্ষেত্রেও শব্দটি তুলনামূলকভাবে সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ বলতে এমন গ্রাম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয় যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা বিদ্যমান এবং জীবন ধারণের মৌলিকপ্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য তাদের গ্রামের বাইরের কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। এই সীমিত অর্থেও প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' ছিল কিনা সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা একমত নন।

সমাজতান্ত্রিক এ. আর. দেশাই-এর মতে, প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মতে, সামান্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে শতাব্দীকাল ধরে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজই ছিল প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক চাষাবাদ এবং হস্তচালিত শিল্পের উপর ভিত্তি করে গ্রাম সমাজগুলি যুগ যুগ ধরে টিকে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারতে কর্মরত ইংরেজ প্রশাসক চার্লস মেটকাফের বক্তব্য তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররূপে বিরাজ করত। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরাই জোগাড় করতে পারত। বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন হতো না। যেখানে কোন কিছুই টিকে থাকে না। সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজের জোরে টিকে গেছে। একের পর এক রাজংবশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব। হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ সবাই ক্রমান্বয়ে শাসন করেছে, কিন্তু গ্রাম সমাজ মূলতঃ একই রকম থেকে গেছে।

এইচ. এস. মেইনের মতে, গ্রাম সমাজ হল একটি সংগঠিত ও স্বয়ংক্রিয় পরিবার গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের উপর যৌথ মালিকানার অধিকারী। এলফিনস্টোন, ডেনজিল, ইবেটসনের মত ব্রিটিশ প্রশাসকরাও প্রাক-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের অস্তিত্বের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এই গ্রাম সমাজগুলিতে ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যেত। বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই এই গ্রাম সমাজগুলি তার সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্য, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী নিজেরাই তৈরি করত।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই-এর মতে, গ্রামের সমগ্র ভূমি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতের অধিকারে ছিল। পঞ্চায়েত ছিল গ্রামসমাজের প্রতিনিধি। পঞ্চায়েতই কর্ষণোপযোগী ভূমি বিলি-বন্দোবস্ত করত। গ্রামের রিবারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক এ. আর. দেশাই শেলভাঙ্কারের এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন—এরা একদিকে বিভিন্ন প্রকার যৌথ বাধা-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো আবার অন্যদিকে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল’। গ্রাম সমাজে কৃষক ছাড়া মুচি, কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, তেলি, নাপিত ও অন্যান্য কারিগররা বাস করত। তারা সবাই গ্রামের জনগণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উৎপাদন করত। গ্রামগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে মোটামুটি স্ব-নির্ভর ছিল বলা চলে। গ্রামের প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি উৎপাদনের চেষ্টা দেখা যেত না, কারণ এতে কোনো লাভ হচ্ছিল না। বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষেত্রে বাড়তি ফসল থেকে রাজস্ব আদায়কারীরা বেশি অংশ দাবী করবে—এই আশঙ্কায় শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজনমাফিক উৎপাদনকেই তারা স্বাভাবিক লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করত। গবেষক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিমের সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেশ কিছু আধিকারিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থার কার্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তারই ভিত্তিতে ১৮১২ সালে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবরণী প্রকাশিত হয়। তবে, অধ্যাপক মুখার্জির মতে, এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতের গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে কার্ল মার্কসের রচনা থেকে আমরা সব চেয়ে ভাল ধারণা লাভ করতে পারি।

সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত:** ব্যক্তি মালিকানার অনুপস্থিতি। মার্কসের মতে, ভারতের গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছিল ভূমিতে যৌথ মালিকানার উপর ভিত্তি করে। **দ্বিতীয়ত:** কৃষিজাত ও হস্তচালিত শিল্পের ঐক্যবন্ধনকে প্রাক-বৃটিশ গ্রাম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা যায়। মার্কস মন্তব্য করেন যে, কৃষি ও শিল্পের মিলনের ফলে ক্ষুদ্র সমাজ সম্পূর্ণ রূপে স্বয়ংভর হয় এবং নিজের মধ্যেই উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের শর্ত পূরণ করে। অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান তৈরি হয়নি। পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে গ্রাম সমাজেই কৃষি ও শিল্পের জন্য যৌথভাবে নিয়োজিত হত। **তৃতীয়ত-**গ্রাম সমাজের বিচ্ছিন্নতা। বাইরের সমাজের সঙ্গে অর্থনীতিক সংযোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রাক ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজ গুলি বহুকাল ধরে নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ. আর. দেশাই-এর মতে স্বনির্ভর গ্রাম সমাজগুলি বহির্জগৎ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ইরফান হাবিবও মনে করেন যে, প্রতিটি গ্রাম আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বতন্ত্র এককে পরিণত হয়েছিল। **চতুর্থত-**প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজে সামাজিক সচলতার একান্ত অভাব ছিল। মার্কসের মতে, গ্রাম সমাজগুলির গতিহীনতার কারণে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং নিজ কক্ষপথে আপন গতিতে আবর্তিত হয়েছে। এ. আর. দেশাই-এর মতে, মার্কস এই অপরিবর্তনশীল গ্রাম সমাজের চিত্র খুবই সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ প্রশাসকদের বর্ণনা করা 'গ্রাম সমাজ' এবং মার্কস বর্ণিত 'এশিয়াটিক' সমাজের ধারণাগত সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক গৌতম ভদ্র বলেন যে, এই দুটি ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশি। মূল পার্থক্য হল দৃষ্টিভঙ্গিগত। কারণ মার্কস যৌথ মালিকানার ধারনাকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখেছেন। এই দ্বান্দ্বিক দিক এবং ভূমিতে বিভিন্ন রকম অধিকারের স্বীকৃতি ইংরেজ প্রশাসকদের রচনায় ছিল না।

ভারতের গ্রামসমাজে ভূ-সম্পত্তির যৌথ মালিকানা ছাড়া আরও দুটি প্রক্রিয়া মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী। একদিকে ছিল শ্রমবিভাজনের বিকাশের অভাব। এর কারণেই কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের সংযোগ ঘটেছিল। অপরদিকে ছিল অপরিবর্তনযোগ্য শ্রম বিভাজনের প্রতিষ্ঠা। এটি জাত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। জাত প্রথা অনুসারে গ্রাম সমাজের সদস্যদের বৃত্তি জন্মসূত্রেই আরোপিত হত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব-এর মতে, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের মিলন এবং অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাজন—ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির এই দুই যুগ্ম অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে কার্লমার্কস-এর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। কার্লমার্কস-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ বিজ্ঞানী কে. এম. আশরাফ প্রাক-ব্রিটিশ যুগের গ্রাম সমাজ সম্পর্কে বলেন যে, এখানে স্থানীয় চাহিদার কথা মনে রেখেই উৎপাদন করা হত। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা নিজে নিজে পেশায় নিযুক্ত থেকে তাদের কাজ করতো। ঐতিহাসিক ডি ডি কোশাম্বিও ভারতীয় গ্রাম সমাজ সম্পর্কে মার্কসের মতকে সমর্থন করেছেন। তার মতে, সামান্য প্রয়োজনে সীমিত অর্থে পণ্য উৎপাদন ছিল। তবে উৎপাদন রাষ্ট্রের হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা কখনোই বাজার পণ্যের রূপ নেয় নি।

[redacted]

[redacted] ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সংক্রান্ত বিতর্কটি আলোচনা কর।

ভারতের আদি-মধ্যযুগে (গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময়ে) আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ ছিল কি না, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সামন্ত ব্যবস্থার উত্থান, প্রসার ও পতন নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিশেষকরে ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা বা রামশরণ শর্মা ও ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব কতখানি ছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

প্রথমেই দেখা যাক সামন্তব্যবস্থার উৎপত্তির কথা – ঐতিহাসিকদের মতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায় মূলত ইউরোপে। সেটাও সময়ের নিরিখে মধ্যযুগে। ইউরোপের মধ্যযুগ শুরু হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে। বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যদিয়ে ইউরোপে মধ্যযুগের সূত্রপাত। দীর্ঘ সময়ে (প্রায় হাজার বছর) পরে ইউরোপে কেন্দ্রীয় শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে। নগরের অবক্ষয় ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের আবণতি হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গ্রামব্যবস্থা। ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। এখানে রাজা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সামন্তরা হয়ে ওঠে ক্ষমতাশালী। গ্রামীন অর্থনীতি আবর্তিত হয় ভূমি ও ভূ-স্বামীকে (সামন্ত) কেন্দ্র করে। উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সামন্ত হয়ে ওঠে রাজার সৈন্যবলের নিয়ন্ত্রক। রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করে সামন্তরা। ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় এইভাবে সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠে।

এটা গেল ইউরোপের সমাজে সামন্তব্যবস্থার গড়ে ওঠা কথা। এই সামন্তব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতেও বিশেষ করে গুপ্তযুগের শেষ পর্যায় থেকে (৬৫০ খ্রি-১২০০খ্রি:) সামন্তব্যবস্থার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও মার্কসীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় এদেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রের কথা । 'এশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধে, বলা হয় – 'প্রাচীন ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল, সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়'। তবে ইউরোপে সামন্তব্যবস্থার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল দাস প্রথা। তবে ভারতে বেদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বা জাতকের কাহিনিতে দাস ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা ইউরোপীয় ঢাঁচে নয় অনেকে বলে অনেকে মনে করেন। এখানেই, ভারতে সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ঐতিহাসিক ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এর হাত ধরে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ও বিকাশের তত্ত্বের উত্থাপন হয়। এই মতকে আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন অধ্যাপক রামশরণ শর্মা। এই চিন্তাকে সমর্থন করে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এম.এ.ডাঙ্গে মনে করিয়ে দেন বৈদিক যুগের 'দাস ব্যবস্থার' কথা। অন্যদিকে ভারতের সামন্ততন্ত্রের উপস্থিতির বিপক্ষে জোরালো মত দিয়েছেন বি.এন.যাদব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা ও এস. গোপাল প্রমুখ ঐতিহাসিকরা।

প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় সামন্তন্ত্রের উপস্থিতি নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করেন ডি.ডি.কোশাম্বি। তিনি তাঁর 'An Introduction to the Study of Indian History' গ্রন্থে বলেন – গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের

প্রথমার্ধে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে সামন্তদের অধীনে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব হয়। উত্তর ভারতে ছোট ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আবার দক্ষিণ ভারতেও সামন্ত ব্যবস্থার লক্ষণ দেখা দেয় বলে স্বীকার করেন ঐতিহাসিক কেশবন ভালুটাট ও আর.এন.নন্দী মত ব্যক্তিরা। রাজাদের দূর্বলতার সুযোগে সামন্তদের ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। সামন্তদের নিয়ন্ত্রিত সমাজই পরিচিত হয় 'সামন্ততন্ত্র' বলে। ঐতিহাসিক কোশাম্বী, ভারতে দুই প্রকার সামন্তব্যবস্থা উদ্ভবের কথা বলেন – প্রথমত: ওপট থেকে সামন্ততন্ত্র ও দ্বিতীয়ত : নীচুতলা থেকে সামন্ততন্ত্র।

ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা। তিনি তাঁর 'Indian Feudalism' গ্রন্থে বিশদে ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান ও বিকাশ কালকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন –

প্রথমস্তরটি হল : ৩০০-৬০০ খ্রী: সময়কাল - উন্মেষকাল , দ্বিতীয় স্তর : ৬০০-৯০০খ্রী:- বিকাশ কাল ও তৃতীয় স্তরটির সময়কাল হল – ৯০০ – ১২০০ খ্রী:, এই পর্বকে চূড়ান্তপর্ব বলা হয়।

সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ স্পষ্ট করতে গিয়ে জোর দেন গুপ্তযুগে লিখিত পুরাণ সাহিত্যের ওপর। আবার তিনি রাজশক্তির আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার সময়কালকে কলিযুগ বলে চিহ্নিত করেন। এই সময়ে সামাজিক অবক্ষয় – বর্ণাশ্রম প্রথায় বিপর্যয়- বহিরাক্রমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজস্ব সংগ্রহের ব্যর্থতা বা রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের ছবি ফুটে ওঠে। রাজ শক্তির দূর্বলতার সুযোগে ভূমিকেন্দ্রিক সামন্তব্যবস্থা সক্রীয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে ভূমি ব্যবস্থা যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা জানান দেয় 'অগ্রহার' এর মত ভূমিদান ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রাজার দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর ভূমিদান করার কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে যোদ্ধাদেরও ভূমিদান করার কথা উল্লেখ করা হয়। এই তিনটি স্তর হল – মহীপতি (স্বয়ং রাজা), স্বামী (জমির প্রাপক) ও কর্ষক (কৃষককুল)। ভূমিদান ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে এইভাবে ভূস্বামী ও শোষিত কৃষক শ্রেণীর উৎপত্তি হয় – যা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এই কৃষি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে সামন্তব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক শর্মা মনে করিয়ে দেন যে – মুদ্রার স্বল্পতা ও নগরের অবক্ষয়ের কথা। যার ফলে রাষ্ট্র অর্থনীতিতে ভূমির নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার, হরবনস্ মুখিয়া ও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

অগ্রহার বা ভূমিদান ব্যবস্থার ফলে রাজার ক্ষমতা হ্রাস বা মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতি ব্যবস্থার মন্দা দেখে দিয়েছিলো তেমনটা নয়, বলে মনে করিয়ে দেন ড.রণবীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন – " অগ্রহার নীতিতে অন্তবর্তী ভূম্যাধিকারীর উত্থান মেনে নিলেও তার দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক ও সার্বভৌম অধিকার সঙ্কুচিত বা বিপন্ন হত কিনা বলা কঠিন"।

আবার দীনেশচন্দ্র সরকার, তৎকালীন সময়ের তাম্রশাসন পাঠ করে দেখান – অগ্রহার ব্যবস্থা ফলে উদ্ভুত নতুন শ্রেণী কখনওই কেন্দ্রীয় শক্তির বিকল্প শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। আবার ভূমিদান ব্যবস্থা রাজস্ব ব্যবস্থাকে দূর্বল করেছিল তেমন প্রমান পাওয়া যায় না, বলে উল্লেখ করেন দীনেশচন্দ্র সরকার।

এই মতের অনুসারী ছিলেন হরবনস্ মুখিয়া। তিনি তাঁর Was There Feudalism in Indian History নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন – উৎপাদনের উপকরণের ওপর ভূ-স্বামীর অধিকার বা মালিকানার প্রমান না থাকার দরুন এখানে সামন্ততন্ত্র

ছিল বলা যাবে না। ইউরোপীয় ঢাঁচে ভারতে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক তেমন পাওয়া যায় না। আবার স্পষ্ট করে বলেন, - এখানে ভূমিদাস শ্রেণীর অনুপস্থিত। তাই ভারতে সামন্তব্যবস্থা ছিল তা স্পষ্টভাবে বলা যাবে না বলে উল্লেখ করেন।

আভন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সচলতা ছিল বলে গবেষণা করে দেখান ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই মত সমর্থন করেন কীর্তিনারায়ন চৌধুরি। তিনি বলেন – ইসলামের অভিযানের ফলে ভারতে বাণিজ্যের ধারাটাও পাল্টে যায়। বৈদিশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ছোট-বড় নগরের যে অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রমান দেন ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। হরিয়ানার-পেহোয়া, গোয়লিয়রের-গোপাদ্রি, বুলন্দসরের-তত্তানন্দপুর ও দক্ষিণ ভারতের কাবেরীপত্তনম। তিনি এই সময়ের নগরের উত্থানকে ভারতের ‘তৃতীয় নগরায়ন’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ভারতে সজীব নগরের অস্তিত্বের প্রমান দিয়ে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্বের মত কে খন্ডন করেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়।

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আদলে ভারতের সামন্তব্যবস্থার চরিত্র কখনওই গড়ে ওঠেনি। ভারতের আদি-মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলা যায়, ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তবে সম্পূর্ণরুপে নয়, তাই ভারতের সামন্তব্যবস্থাকে অনেকেই ‘আধা সামন্ততন্ত্র’ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগে গ্রামসমাজঃ

সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজ

সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—রাজস্ব সংগ্রহকারী শ্রেণী ও রাজস্ব প্রদানকারী কৃষক শ্রেণী। রাজস্ব আদায়ের জন্য ছিল রায়, রানা, রাবাতরা। তুর্কি শাসকগোষ্ঠী উত্তর ভারত জয় করে নিজেদের রাজস্বব্যবস্থা স্থাপন করেনি। তারা রাজস্ব সংগ্রহকারী রায়, রায়ানদের কাছ থেকে থোক অর্থ নিত, তারা কৃষকদের কাছ থেকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করত। মিনহাজ সিরাজ রায় ও রায়ানদের কথা উল্লেখ করেছেন। আলাউদ্দিন জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করলেও অনেক অঞ্চলে পুরনো রাজস্ব সংগ্রাহকরা ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিক থেকে এই শ্রেণীর গঠনে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পুরনো রায়, রায়ান, রাবাতরা সরে যায়, তাদের স্থান নিয়েছিল। চৌধুরী, খুত ও মুকাদ্দমরা। এরাই ছিল তুর্কি ও আফগান আমলের কর সংগ্রাহক শ্রেণী। এদের মধ্যে আবার চৌধুরীরা ছিল প্রধান (The Chaudhuri seems to have been the first and possibly the foremost representative of this new emerging class)। মিনহাজ এই চৌধুরীদের কথা উল্লেখ করেননি। প্রথমদিককার ফার্সি আকরগুলিতে এদের কথা নেই। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে বারানি চৌধুরীদের রাজস্ব সংগ্রাহকদের মধ্যে প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন বতুতা চৌধুরীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে চৌধুরী ও মুতাশরিফ রাজস্ব আদায়ের কাজ করে থাকে।

চতুর্দশ শতকে রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণীকে জমিদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমীর খসরু 'জমিদার' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে চৌধুরী হলো বংশানুক্রমিক জমিদার, পুরনো অভিজাততন্ত্রের স্থান নিয়েছিল জমিদাররা। এরা গ্রামীণ উদ্বৃত্তের একাংশ ভোগ করত। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজ তুঘলক একটি ঘোষণায় মুকাদ্দম, মাফরোজি ও মালিকদের কথা উল্লেখ করেন। মুকাদ্দম ও খুতরা ছিল একই শ্রেণীভূক্ত, এরা সকলে ছিল। রাজস্ব সংগ্রাহক এবং গ্রামীণ উদ্বৃত্তের অংশীদার। ভূমির ওপর অধিকার আছে এমন ব্যক্তিদের মালিক বলা হতো।। ইরফান হাবিব জানিয়েছেন যে জমির ওপর বহুধরনের অধিকার আছে এমনসব ব্যক্তিকে জমিদার বলা হতো (Zamindars tended to form a comprehensive category embracing all kinds of superior right holders.)। চতুর্দশ শতকের রাজস্ব সংগ্রাহক শ্রেণীর এই চরিত্র পঞ্চদশ শতকে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুলতানি ভাঙতে শুরু করে, প্রাদেশিক শাসকরা অনেকে স্বাধীন হয়ে যায়। সুলতানি রাজ্যের মধ্যে বংশানুক্রমিক কর সংগ্রাহক শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পাঞ্জাবে খোক্কররা, মেবাতে খানজাদারা এবং গোয়ালিয়রে প্রধানরা শক্তিশালী হয়ে বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্ভবত তুর্কি আগমনের আগেকার অভিজাততন্ত্র অনেকখানি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

সুলতানি যুগে কৃষক হল মুজারি। কৃষক জমির মালিক ছিল কিনা প্রশ্নটি অবান্তর কারণ জমি ছিল অঢেল, কৃষক ছিল কম। বীজ, বলদ ও যন্ত্রপাতির ওপর কৃষকের মালিকানা ছিল। কর সংগ্রাহক শ্রেণী তার উৎপন্ন ফসল ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করত। ইরফান হাবিব সুলতানি যুগের কৃষকদের ভূমিদাসদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন (They were no better than semi-serfs.)। তবে কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের ওপর অধিকার ছিল, নগদ মুদ্রায় তারা রাজস্ব দিত। এসব কারণে কৃষকদের মধ্যে নানাস্তর তৈরি হয়েছিল। সতীশচন্দ্র সুলতানি যুগের কৃষকদের চারভাগে ভাগ করেছেন—কর্ষক হলো বর্গাদার (অর্ধিক), কৃষি শ্রমিক হালবাহক (কিনস), জমির মালিক কৃষক হলো মালিক-ই-জমিন (খুদকস্ত) এবং গ্রামের কারিগর-কৃষক (চর্মকার,

কর্মকার, কুম্ভকার), এদের একাংশ ছিল অস্পৃশ্য (স্বপচ)। ধর্মশাস্ত্র ও পদ্ম পুরাণ-এ কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষকদের ওপর শাসকগোষ্ঠী এত উৎপীড়ন চালাত যে তাদের জীবিকানির্বাহ করা শক্ত হতো। অপরদিকে গ্রামীণ অভিজাতরা খোত, মুকাদ্দম, চৌধুরী অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান ও শাসকগোষ্ঠী গ্রামীণ উদ্বৃত্তের অধিকাংশ অধিকারের প্রয়াস চালালে গ্রামীণ সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়ছিল। ইরফান হাবিব পুরনো আকর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, খুৎ ও মুকাদ্দম শ্রেণী গ্রামীণ রাজস্বের প্রায় অর্ধেক আত্মসাৎ করত।

মুঘল যুগে সাধারণ কৃষক

গ্রামীণ ভারত গড়ে উঠেছিল জাতভিত্তিক গ্রামগুলিকে নিয়ে, যেখানে জনির স্বত্ব সমস্ত শ্রেণীর মানুষের হাতে ছিল না। যদিও কৃষিজমির অভাব ছিল না তথাপি সামাজিক বিধিনিয়মের বেড়াজালের ফলে গ্রামের সব শ্রেণীর মানুষ জমি চাষের অধিকার ভোগ করত না। ড. সতীশচন্দ্রের ভাষায় গ্রামীণ সমাজ গঠিত ছিল মোটামুটি তিন ধরনের মানুষকে নিয়ে যেমন, জমির মালিক, যাদের সরকারিভাবে বলা হত খুদকাস্ত। রাজস্থানে এদের বলা হত খারুহালা বা গাবেতি, মহারাষ্ট্রে মিরাসী বা থল্বাহিক ইত্যাদি। যেসব কৃষকের গ্রামেই বাস এবং চাষ করত তারাই এই ধরনের শ্রেণীভূক্ত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল পাহিকাস্ত বা পাহি বা 'উপরী' অর্থাৎ বহিরাগত। অন্য এলাকা থেকে এসে এই ধরনের কৃষক নতুন জমিতে চাষাবাদ করত। কিন্তু খুদকাস্ত-এর মতো সামাজিক মর্যাদা এরা ভোগ করত না। তৃতীয় শ্রেণী-তে ছিল মুজারিয়ান বা ভাগচাষী। এরা খুদকাস্ত বা জমিন্দার-দের কাছ থেকে জমি ভাগে নিয়ে চাষ করত। এদের অতিরিক্ত ছিল ভূমিহীন কৃষক, সাধারণ শ্রমিক, কামার, কুমোর, চামার ইত্যাদির মতো জাতভিত্তিক পেশার মানুষ। এরা কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করার বিনিময়ে ক্ষেতে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ লাভ করত।

উৎপাদনের ১/৩ থেকে ১/২ ভাগ ছিল ভূমিরাজস্ব। রাজস্ব নির্ধারণের সময়ে জমির অবস্থা, উৎপাদনের পরিমাণ এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হত। অনেক সময়ের সুবিধাভোগী শ্রেণী যারা ছিল উচ্চবর্গের তারা। সাধারণ কৃষক যে হারে রাজস্ব দিত তার অনুপাতে কম রাজস্ব দিত। এভাবেই গ্রামের মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল। যাবর তাই লিখেছিলেন যে সাধারণভাবে ভারতীয়রা জুতো পরিধান করে না। একইভাবে আকবরের সময়ে বাংলা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আবুল ফজল বলেছেন যে এখানকার অধিকাংশ মানুষ শুধুমাত্র দেহের নিম্নাংশ আবৃত করে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ন্যূনতম পরিধেয় বলতে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। বিদেশি পর্যটকদের অধিকাংশই ভারতীয়দের পরিধানে বস্ত্রের স্বল্পতা নিয়ে লিখেছেন। এর কারণ যে শুধুমাত্র আর্থিক ছিল তা নয়। ভারতীয় জলবায়ু ও আর কারণ। ইউরোপীয়রা এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেনি।

মোরল্যান্ডের মতো ঐতিহাসিকও মহিলাদের পরিধান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা কেবলমাত্র শাড়ি পরে, জামা পরার মতো অর্থ তাদের নেই। তিনি ভারতীয় সমাজজীবন ভালোমতো পর্যবেক্ষণ না করেই এমন কথা লিখেছিলেন বলে মনে হয়। ভারতে মহিলারা জামা কখনো কখনো পরিধান করত। ঘাগরার সঙ্গে জামা

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে মহিলারা অবশ্য পরিধান করত।বাসস্থান সম্পর্কে বলা যায় যে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে মাটির ঘর ও ঘড়ের ছাদই ছিল ভারতীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষের বাসগৃহ। বাংলায় বাঁশের ব্যবহার ছিল যেমন আসামে ছিল কাঠের ব্যবহার। কাশ্মীরেও কাঠের ঘর তৈরি হত। গুজরাটে অবশ্য ইটের বা টালির ছাদ দেখা যেত। একমাত্র কুঁড়েতে সাধারণভাবে গবাদিপশু ও মানুষ একত্রেই বাস করত। কুণ্ডেগুলি ছিল অপরিসর, কিন্তু নিয়মিত গোবর ও মাটির প্রলেপ দিয়ে তাদের পরিচ্ছন্ন রাখারচেষ্টা হত। তৈজসপত্র বলতে তেমন কিছু এইসব কুঁড়েতে পাওয়া যেত না। পিতল, তামা-সাধারণ কৃষকের কাছে ছিল অভাবনীয়। তবে লোহার চাটু ব্যবহৃত হত, রুটি তৈরির প্রয়োজন তা মেটাত। দড়ি বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ দিয়েই তৈরি ছিল বিছানা। কৃষকদের মধ্যে সম্পন্ন কেউ থাকলে তার একটা পিতল বা তামার জলপানের পাত্র থাকত। সাধারণ মানুষের খাদ্যও ছিল সাধারণ। বাংলাসহ পূর্ব ভারত, দক্ষিণ ভারত, সিন্ধু ও কাশ্মীরে চাল ছিল প্রধান। ভোজ্য। উত্তর ও পশ্চিম ভারত জুড়ে জোয়ার, বাজরা প্রভৃতির রুটি খাওয়া হত। এমনকি গম পর্যন্ত খাওয়ার ইতিহাস নেই। সম্ভবত উচ্চবিত্তের মানুষরা গমের তৈরি রুটি খেত। খাদ্যাভ্যাসের এই চিত্র তেকেই ড. ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, উৎপন্ন ফসলের সব থেকে নিকৃষ্ট অংশটি কৃষকের খাদ্য হিসাবে গৃহীত হত। তবে আনাজপাতির ব্যবহার ছিল ব্যাপক এবং এ প্রসঙ্গে বিদেশিদের প্রচুর রচনাও আছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত সমেত সিন্ধুতে মাছ খাওয়ার প্রথা ছিল। অবশ্য গরিব কৃষক কত পরিমাণে তা খেতে পারত এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ওলন্দাজ পর্যটক পেনসার্ট লিখেছেন যে সাধারণ মানুষ মাংসের স্বাদ কেমন, তা জানত না। দিনের আহার হিসাবে তারা গ্রহণ করত মুড়ি বা ছাতু এবং রাতে 'সবুজ' ডাল (সম্ভবত গোটা মুগ) ও চাল মিশ্রিত খিচুড়ি। দিনের পর দিন এই একই খাদ্য তালিকা। অতি দরিদ্ররা এই আহারও সংগ্রহ করতে পারত না। খুব নিম্নমানের চাল সেদ্ধ, কিছু গাছের মূল, শাকপাতা ইত্যাদি ছিল তাদের খাদ্য।

উত্তর ভারতের ব্যাপক এলাকায় নিত্য খাদ্যের সঙ্গে ঘি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বাংলা সহ পূর্ব ভারতে সরষের তেলের ব্যবহার ছিল। বাংলা ও উত্তর ভারতে দই ও ক্ষীরের কথা জানা যায়। বাংলায় কয়েক ধরনের মিষ্টান্ন জনপ্রিয় ছিল। সাধারণ মানুষ সাদা চিনির ব্যবহার বিশেষ জানত না। গুড়ই ছিল তাদের খাদ্য। অবশ্য ট্যাভারনিয়ের এক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দিয়োছেন। যে-কোনও গ্রামেই তিনি নানা জাতের মিষ্টান্ন ও গুড়ের সন্ধান দিয়েছেন। লবণে ছিল সরকারি একচেটিয়া অধিকার। ড. সতীশচন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী গমের বাজারদর অপেক্ষা লবণের দর প্রায় দ্বিগুণ ছিল। আদা, ধনে, জিরে ইত্যাদি মশলার ব্যবহার জানা থাকলেও লঙ্কার অস্তিত্ব ছিল না। ড. ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ প্রভৃতির দর এতই বেশি ছিল যে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তবে ফলের যোগান ছিল ভালো। আম, তরমুজ, নারকেল, কলা, জাম ইত্যাদি সাধারণ মানুষের খাদ্য তালিকাতে পাওয়া যেত। সাধারণ কৃষকের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকা পর্যালোচনা করে ড. হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, মুঘল রাজত্বে ঘি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে ছিল যা আধুনিককালে নেই। আবার ড. এ. ভি. দেশাই আকবরের রাজত্বে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, সে সময়ে কৃষিজমির বিপুল যোগান লক্ষ্য করা যায়।

৫-১-৩-৮ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব (একক-৩)

ঋগ্বেদে চতুবর্ণ ব্যবস্থা কোন স্তরীকৃত সমাজব্যবস্থাকে নির্দেশ করেনি। সবর্ণ বিবাহের বাধ্যবাধকতা ঋগ্বেদের যুগে ছিল না ঋগ্বেদের একটি সূক্তে একজন শসাপেষণকারিনী বলেছেন। যা থেকে মনে হয় বৃত্তিঅনুসরণের প্রথাও বংশাক্রমিক ছিল না। এমনকি মহাকাব্যের প্রাচীনতর অংশেও এই রূপ সামাজিক কঠোরতা ছিল না। ব্রাহ্মণ পরশুরাম বা দ্রোণ যুদ্ধবিদ্যাকে পেশা রূপে গ্রহণ করেন অন্যদিকে অসবর্ণ বিবাহের ফলে জাত ব্যাসদেব বা বিচিত্রবীর্য কে সামাজিক মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

পরবর্তী বৈদিকযুগ থেকে বর্ণব্যবস্থা কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গণ দ্বিজ নামে অভিহিত হন এবং শূদ্রের অবস্থার অবনতি হয়। পরবর্তী বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের প্রক্রিয়া জটিলতর হবার সাথে সাথে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বৈদিক সাহিত্য ব্রাহ্মণদের দ্বারাই প্রণীত হয় সেক্ষেত্রে বৈদিকজ্ঞানের ধারক রূপে তারা শ্রেষ্ঠবর্ণ রূপে চিহ্নিত হয়। ব্রাহ্মণদের পর ক্ষত্রিয়দের স্থান। ঋগ্বেদের রাজন্য পরবর্তীতে ক্ষত্রিয়তে পরিণত হয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই সমমর্যাদা দাবি করছেন। অভিষেক কার্যের জন্য যেমন ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণগণের ওপর নির্ভর করতে হয়। তেমনিই ব্রাহ্মণরাও দান-দক্ষিণার জন্য ক্ষত্রিয়ের ওপর নির্ভয়শীল শতপথ ব্রাহ্মণরাও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা বা ক্ষত্রিয়কে পুরোহিতের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের স্থান ব্রাহ্মণদের উপরে নির্দেশা করেছেন। রামশরণ শর্মা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে দেখিয়েছেন যে ক্ষত্রিয় রাজা এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সরিয়ে অনুগত ব্রাহ্মণকে পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

বৈশ্যবর্ণ দ্বিজ পর্যায়ভুক্ত হলেও বৈদিক সাহিত্য থেকে তাদের প্রতি হেয় মনোভাব প্রকট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মন অনুসারে বৈশ্য হল বলিকৃৎ (উৎপাদক) এবং তাকে উৎখাত বা অত্যাচার করা যায় অন্যদিকে শূদ্রদের অবস্থান ছিল শোচনীয়। তাদের একমাত্র কাজ উচ্চতর তিনবর্ণের সেবা করা (দ্বিজাতি শুশ্রূষা), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী তাদের যথেচ্ছভাবে উৎখাত বা হত্যা করা যায়। রামশরণ শর্মার মতে, সমাজের ধনোৎপাদক শ্রেণী বৈশ্যদের অবদমিত করে উচ্চতর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণ সামাজিক ধণ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্রমদানকারী শুদ্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শ্রম আদায় করে উৎপাদন ব্যবস্থায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ বিশেষভাবে বিচার্য। সবর্ণে কিন্তু গোত্রন্তরে বিবাহ এই আমলে। প্রকট হতে শুরু করে। এই ব্যবস্থাকে বিশুদ্ধ বিবাহ ব্যবস্থা বলা যায়। তবে বৈদিকযুগের অন্তিম পর্ব থেকে অসবর্ণ বিবাহের কথা জানা যায়। উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী বিবাহ প্রতিলোম। অসবর্ণবিবাহ মধ্যে অনুলোম শাস্ত্রের অনুমোদন পেলেও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্র দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের ফলে জাতি বা মিশ্রজাতির ধারণা তৈরী হতে দেখা গিয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য বর্ণব্যবস্থার বিকাশ :

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সময়কাল থেকে সূত্র সমূহ রচনা শুরু হয়। ধর্ম সূত্র সমূহের চতুবন সংক্রান্ত ধারণা আরো কঠোর রূপ পরিগ্রহ করে। ধর্ম সূত্রও ধর্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ব্রাহ্মণদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে শূদ্রদের সম্পূর্ণভাবে বেদপাঠ বা শ্রবণের অধিকার ও অন্য সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্ণ ব্যবস্থা ছাড়াও জাতিসমূহের উল্লেখ প্রথম সূত্রসাহিত্য থেকেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সমাজ মাত্রচারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল না। বাস্তবে সমাজে ছিল

অসংখ্য জাতি। সাধাণত জাতি বলতে জন্ম দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভূক্ত মানুষকে বোঝায় তারা নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং পেশা তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক হয়।

ধর্মশাস্ত্রকারগণ সমাজের অসংখ্য পেশা ভিত্তিক জাতিকে চতুকণ কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করনের প্রচেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে বিভিন্ন উপজাতিদের সংস্পর্শে এসেছে এবং সেই উপজাতিদের জাতিকাঠামোয় অর্ন্তভূক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধানের জন্য বর্ণসংকর তত্ত্বের অবতারণা করা হয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে অসংখ্য জাতিকে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের ফল বলে চিহ্নিত করা হয়। এই বর্ণসংকর জাত সন্তান। তার পিতা বা মাতার বৃত্তিগ্রহণ অপারগ এবং তাদের জন্য পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার মিশ্রজাতির সঙ্গে বর্ণভুক্ত বা অন্য জাতির বিবাহে নতুন বর্ণ উৎপত্তি হয়। এইভাবে বর্ণসংখ্যা চার থাকলেও জাতির সংখ্যা কার্যত অসংখ্য। জাতি তত্ত্বের সূচনা ধর্মসূত্রে প্রথমদেখন গেলেও মনুও যাজ্ঞবক্ষ্যের ধর্মশাস্ত্রে এর তত্ত্বগত ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। শাস্ত্রে বৈদিক চতুবর্ণ প্রথার অলঙ্ঘনীয়তার কথা বলা হলেও সেখানেই বহুজাতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আবার মনুসংহিতাতেই বলা হয় যে সমাজ কেবলমাত্র চারভাগে বিভক্ত, পঞ্চম বর্ণ বলে কিছু নেই। এই রূপ মত প্রকাশের কারণ এই যে, যেহেতু মিশ্রজাতিগুলি চতুর্বর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট তাই এর মধ্যে চতুবর্ণের সংশ্লেষ থাকতে বাধ্য। মিশ্রজাতির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণপিতা ও বিশ্যমাতার সন্তান হল অম্বষ্ঠ যার শাস্ত্র নির্ধারিত বৃত্তি হল বৈদ্যের কাজ করা। আবার ক্ষত্রিয় পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সন্তান সুত নামে পরিচিত তাদের কাজ রথ চালানো। কৃষিজীবী মহিষ্যদের ক্ষত্রিয়পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তান বলা হয়েছে। তবে জাতি কাঠামোয় সবচেয়ে নিম্নস্তরীয় স্থান পেয়েছে। চন্ডালরা, তারা শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাত্রার প্রতিলোম সংকর বলে বর্ণিত হয়েছে। তার বৃত্তি হল শবদাহ বা ঘাতকের কাজ করা।

গুপ্তযুগের বর্ণজাতি ব্যবস্থা সুপ্রচলিত ছিল। শূদ্রের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। একই অপরাধে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের শাক্তির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যে অপরাধে শূদ্রের মৃত্যুদন্ড হতে পারত, সেখানে ব্রাহ্মণদের জন্য বরাদ্ধ ছিল নির্বাসন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন। বর্ণজাতি ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম স্বরূপ অস্পৃশ্যতার বিষয়টি এই সময় থেকে ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল। অস্পৃশ্যতার শিকার ছিলেন অন্ত্যজ গোষ্ঠী। পূর্বোক্ত চন্ডালরাও অন্ত্যজশ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তারা নগরের বাইরে থাকতন এবং নগর প্রবেশের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ পালন করতে হত।

তবে শাস্ত্র বর্ণিত নিয়ম সর্বদা মেনে চলা হত তা নয়। মৌষোত্তর যুগে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে একঅদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ (এক বক্তা) বলা হলেও এবং তিনি চতুবর্ণের সাংকর্য রোধ করেছিলেন বলা হলেও সাতবাহণ রাজাদের মধ্য শক পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নজির পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে ও এরূপ ব্যতিক্রমের নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীগুপ্তের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বাকাটক বংশীয় রুদ্রসেনের বিবাহ এবং কদম্ব বংশীয় ব্রাহ্মণ কন্যাদের। সঙ্গে গুপ্ত রাজাদের বিবাহের নজির পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন বিবরণে ক্ষত্রিয় ব্যাতীত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্তোত্তর যুগের জাতিবর্ণ কাঠামোতেও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও গুণাগুণের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগের প্রবণতা দেখা যায়। এই যুগের বর্ণ ব্যবস্থায় দুটি বর্ণের উপস্থিতি দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ ব্যাতীত সকল কর্ণই শূদ্র পর্যায়ভূক্ত। শূদ্রের অন্নগ্রহণ, একাসনে উপবেশন, সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আবার মেধাতিথির ভাষ্য থেকে শূদ্রকে স্বাধীন, এবং অর্থও সম্পত্তির মালিক হবার অধিকারী বলা হয়েছে যজ্ঞো তার অধিকার না থাকলেও অন্য ধর্মাচরণে তার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সংকর কর্ণগুলি সংখ্যা ৪১টি। এর মধ্যে উত্তম সংকর ২০টি, মধ্যম সংকর ১২টি এবং অধম সংকর ৯টি। এই পর্যায়ের অনেক সময় রদবদল লক্ষ্য করা যেত। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই সময় উপজাতিরা কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করছিল ফলে নিম্নতর বর্ণের

মানুষ উচ্চতর বর্গে আরোহণের সুযোগ পেয়েছিল। রামশরণ শর্মা এই সময় বৈশ্যদের অবস্থার অবনতিও শূদ্রের উন্নতির কথা। উল্লেখ করেছেন।

ব্রাহ্মণ্য ধারা ব্যাতীতও প্রতিবাদীধর্মের মধ্যে জাতিবর্ণ প্রথার আভাস লক্ষও করা যায়। এখানে চিরাচরিত বৌদ্ধসংঘে বর্ণের তারতম্য থাকত না। বুদ্ধের মতে কেবল জন্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ হয়না, তা হয় শীল (আচরণ) দিয়ে। সামাজিক চতুবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বুদ্ধ সেখানে ক্ষত্রিয় (খতিয়) দের সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। পালিসাহিত্যে সামাজিক স্তর ভেদকে কুল (পারিবারিক মর্যাদা), কর্ম্ম (পেশা), সিপ্প (শিল্প বা বৃত্তি) অনুসারে উকণ্ঠ (উৎকৃষ্ট) ও হীন এই দুভাগে ভাগা করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে গৃহপতি ও সেঠি নামক শ্রেণী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন, যারা মূলত কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যে রত এবং ধনীশ্রেণী। ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শে এরা বৈশ্য শ্রেণীভূক্ত হলেও বৌদ্ধসমাজে এরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সমমর্যাদাভূক্ত। আবার মৌর্যত্তর যুগে বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন দান লেখতে অসংখ্য বনিক, কৃষক, ও বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের দানের কথা উৎকীর্ণ আছে।

বর্ণসংকরের মাধ্যমে জাতি সমূহের যে উৎপত্তির কাহিনী ব্রাহ্মাণ্য গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বাস্তবতার। সম্পর্ক নিতান্তই অল্প। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বর্হিভূত উপজাতি ও ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আজও জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোয় স্থান দেওয়ার জন্যই তারা এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। তবে পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে সাধারণত পুত্রেরজাতি, পিতার জাতি দ্বারাই নির্ধারিত হয়। রিচার্ড ফিকের মতে, বর্ণসংকর বলে চিহ্নিত যে সকল জাতির সম্পর্কে বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, সেই সকল অধিকাংশ জাতি নামই স্থান বাচক বা উপজাতি বাচক।

ঐতিহাসিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে জাতিপ্রথা আসলে উপজাতিয় সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিনাম। ভারতবর্ষে সর্বত্র উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে উপজাতি সমাজের পরিবর্তন হয়নি। এখানে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়েছিল এবং তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকা উপজাতি সমাজগুলিকে ধ্বংস করে এই রাষ্ট্রশক্তি গ্রামনিবেশ করেছিল। ফলে সেই গ্রামজীবনে উপজাতিয় সমাজে অনেক চিহ্ন যথা- জাতিভেদ, গ্রাম সমবায়, লোকায়তিক ধর্ম প্রভৃতির বিলোপ ঘটেনি। ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের বাদ দিলে এবং অবশিষ্ট উপজাতি সমাজকে বাদদিলে যে বিপুল জনসমাজ পাওয়া যায় তারা প্রকৃত পক্ষে উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে কোন বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করে এবং সেই বৃত্তি গুরুত্ব অনুযায়ী হিন্দুসমাজ স্থান পেয়েছে। স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থগুলি এই সংমিশ্রণকে বৈধতা প্রদান করতে গিয়ে বর্ণসাংকর্যের তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পূর্বোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি আসলে পাঞ্জাব অঞ্চলের উপজাতি যারা আলোকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। মূলঅঞ্চল থেকে সরে আসার পরে তারা নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বণ করে এবং ধর্মশাস্ত্রকারগণ তাদের অনুলোম সংকরজাতি রূপে চিহ্নিত করেন। এই ধরণের উৎস অন্য জাতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কেবলমাত্র উপজাতিগোষ্ঠীই নয় ভারতে আগত বহিরাগত জনগোষ্ঠী ও জাতিকাঠামো গঠনে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময়কাল থেকে গ্রীক বা যবনদের আগমন শুরু হয়। পরবর্তীকালে উত্তর পশ্চিমভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের রাজত্বের কথাও জানা যায়, এমনকি ভারতের অভ্যন্তরে যবণ আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যবণদের গৌতম ধর্মসূত্র সূত্র পিতা ও ক্ষত্রিয়মাতার প্রতিলোম সংকররূপে জাতি কাঠামোর স্থানদেয়। মনুর মতে যবনরা পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে শূদ্রত্বে পর্যবসিত হয়।

পাশাপাশি শক, পহ্লব, কুষাণগণ ভারতে আগমন ও রাজ্যস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ সমাজের বর্হিভূত হলেও শাসকগোষ্ঠী রূপে অবতীর্ণ হলে তাদের সমাজকাঠামোতে স্থান দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শক, পহ্লব, কুষাণদের অধঃপতিত ক্ষত্রিয় বলে স্থান দেওয়া হয়। আভীরদের ব্রাহ্মণও অম্বষ্ঠদের অনুলোম সংকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবার হুণজাতির ভারতীয়করণ একদশকের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল তারা ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এই ধরণের প্রক্রিয়া পৌরাণিক আত্তীকরণ (Puranic Acculturation) এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনা থেকে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট হয়। প্রাচীনযুগ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে জাতি প্রথার বিবর্তন হয়েছে। বিদেশী পর্যটক যথা-ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখের বিবরণেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ প্রথার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে ভারতীয় সমাজ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর রূপধারণ করেছে এবং বর্ণ জাতি ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের একটি প্রধানতম গঠনগত উপাদান হিসাবে আজও বর্তমান আছে।

<u>নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চা</u>

<u>কাদের বলা হয় নিম্নবর্গীয়</u>

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতে আসে। এই সময় আর্যরা ভারতীয় জনসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র -- এই চারটি বর্ণে ভাগ করেন। প্রথম তিন বর্ণের মানুষকে সেবা করতে বাধ্য হত শূদ্ররা। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে এরা ছিল অস্পৃশ্য। পরবর্তীকালে (বৃটিশ শাসনকালে) এরাই 'দলিত' নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, দলিতরা নানা দিক থেকেই উচ্চবর্ণের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।

‘দলিত’ শব্দটি 1930 এর দশকে প্রথম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই আবার বর্তমান প্রশাসনিক পরিভাষায় তপশিলিজাতি ও তপ শিলি উপজাতি ভুক্ত সকলকেই'**দলিত'** বলে আখ্যায়িত করতে চান।
ভারতের এই তথাকথিত দলিত বা অনুন্নতশ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে অনাচার,বিভিন্ন মানবিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা বা অস্পৃশ্যতা দেশের সব মানুষ মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ উঠেছে এবং ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক গোষ্ঠী অস্পৃশ্যতা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নবর্গীয় মতাদর্শ ও অধিকার নিয়ে ভারতীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ গান্ধীজী এবং নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড. বি. আর. আম্বেদকর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বৈদিক যুগ থেকে কতকগুলি পীড়নমূলক ও অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের একটা গোষ্ঠীকে ‘অস্পৃশ্য’ বলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। হিন্দু সমাজের অংশ হয়েও তারা ছিল হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত। এ আর দেশাই-এর মতে, ‘অস্পৃশ্যতা হল ভারতবর্ষে আর্য অধিকারের সামাজিক পরিনাম’। সামাজিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় বিজিত ভারতীয়দের একাংশ আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে যারা সব থেকে অনুন্নত তারাই বংশানুক্রমিক অস্পৃশ্যজাতে পরিণত হয়েছিল। বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে অস্পৃশ্যরা ‘দলিত’ বা নিপীড়িত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। গান্ধী এই শ্রেনীকে ‘হরিজন’ নামে অভিহিত করেছেন। Louis Dumont- এর মতে, ভারতে সামাজিক মর্যাদাগত স্থান নির্ধারণের বিষয়টি মুলত ছিল ধর্মীয়। শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মাপকাঠিতে স্থির করা হত সামাজিক পদমর্যাদা ও স্থান। ব্রাহ্মণ পূর্ণ শুদ্ধ হওয়ায় তার স্থান ছিল সবার উপরে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ হিসেবে অস্পৃশ্যদের সবার নিচে স্থান দেওয়া হতো।

ধর্মীয় বিধান বা অনুশাসন দ্বারা অস্পৃশ্য বা নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হবার ফলে এই শ্রেনীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন সামাজিক স্বীকৃতি পায়। হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমিক অস্পৃশ্যদের হীন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে হতো। সামাজিক বা বিধিগত কোন বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার নিম্নবর্গীয়দের থাকতো না। মন্দিরে প্রবেশ করা, একই পঙক্তিতে বসে ভোজন করা, উচ্চবর্ণের পাশাপাশি বসবাস করা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মানবিক অধিকার ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত থেকেই নিম্নবর্গীয়দের বাঁচা ছিল সামাজিক বিধান।

ধর্মের বিধান থেকেই অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক রূপ দেওয়া হলেও মাঝে মাঝে ধর্মের বিচার থেকেই এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়েছে। ধর্মভাবনা সর্বদা সর্বজনীন ছিল না। বিভিন্ন সময় ধর্মের ভিতর থেকেই ধর্মের প্রাধান্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। মধ্যযুগের ভক্তিবাদী আন্দোলন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মসংস্কারক ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। তারা ধর্মাচার ভিত্তিক জাতি ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিশুদ্ধ ভক্তির নিরিখে সকল সামাজিক মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। এই আন্দোলন সামাজিক গতিশীলতা বা social mobility র সম্ভাবনা দৃঢ় করেছিল।

জাতি ব্যবস্থার উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিকরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চায় লিপ্ত হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের উত্থান ঘটে। এগুলি হল-

১) নিম্নবর্গীয় বিষয় নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলি কিভাবে ইতিহাসচর্চার একটি কার্যকর মডেল গড়ে তুলেছে?

২) তারা কি আদৌ কোন বিকল্প ইতিহাস চর্চা গড়ে তোলে?

৩) এই ধরনের ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি কি হতে পারে?

৪) Elite colonialist, জাতীয়তাবাদী এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার বিকল্প হিসাবে এই ধরনের ইতিহাস চর্চাকে কি প্রতিপন্ন করা উচিত?

উল্লেখ্য, নিম্নবর্গীয় activists এবং লেখকরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার আলচনা প্রসঙ্গে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের ভুমিকার সমালোচনা করেছেন। তাদের প্রধান বক্তব্য হল নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত পার্থ চ্যাটার্জীর ন্যায় অন্যান্য ঐতিহাসিক ও গবেষকরা কেন আম্বেদকরের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন? এছাড়াও বলা হয় যে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা মুলত Dumont এবং Dirks দের সম্পর্কে যতটা আলোচনা করেছেন, Periyar, Phule, অথবা Ambedkar সম্পর্কে তারা ততটাই নীরব থেকেছেন।

প্রসঙ্গত একথা বলা যায় যে, নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের কাজের পরিধি বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্গীয় গবেষকদের উপরিউক্ত সমালোচনাকে গ্রহন করা যায় না। যেমন নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক জ্ঞ্যানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর ‘ A History of Prejudice: Race, Caste and Difference in India and the United States’ নামক গ্রন্থে আম্বেদকর, নিম্নবর্গীয় আত্মচরিত, ১৯৫৬ সালের নিম্নবর্গীয় ধারনার রূপান্তর, নিম্নবর্গীয় রাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। একই ভাবে পার্থ চ্যাটার্জী ২০০৪ সালে প্রকাশিত ‘The Politics of the Governed’ নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তথা ‘The Nation in Heterogeneous Time’-এ আম্বেদকরের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের রাজনৈতিক গঠনে তার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্গীয় চর্চার সাথে যুক্ত গবেষকরা জ্ঞানদীপ্তোর যুগের নৈতিক গুণসমূহ যথা স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ইত্যাদির সাথে ‘দলিত’ এর যুগপৎ আলোচনায় সমস্যা অনুভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক গবেষক ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, ‘the problem is so haunting in this case that Chakravorty and Pandey find it difficult to have intellectual alignment with either of those two diametrically opposite personalities and their philosophies that are situated at the two ends of India’s political spectrum — Gandhian village life of *Ram rajya* on the one hand, and an “Ambedkarite modernity” on the other। দীপেশ চক্রবর্তী এবং জ্ঞ্যানেন্দ্র পাণ্ডে উভয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বি আর আম্বেদকর নিম্নবর্গীয় এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রেরনা। কিন্তু যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সমস্ত শোষিত ও পরাধীন মানুষদের মাঝে নিখুঁত বেশভূষা, দ্ব্যর্থহীনভাবে যুক্তিসংগত ও জ্ঞানী, শিক্ষিত, শান্ত ও অবিচল এবং একজন বলিষ্ঠ আধুনিক নেতা হিসাবে আম্বেদকরের ভাবমূর্তি অনেক

বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা নিম্নবর্গীয় কথন কে আধুনিকতার অভিব্যক্তি হিসাবে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। ঐতিহাসিক Gail Omvedt তাঁর 'Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India' গ্রন্থে উনিশ শতকের সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সালে আম্বেদকরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগুলি তুলে ধরেছেন। মুলত অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে Dr. Omvedt একদিকে যেমন নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের আদর্শ এবং সাংগঠনিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন (বিশেষ করে গান্ধী তথা গান্ধীবাদ) এবং মার্কসবাদের প্রেক্ষাপটে কৃষক-শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের সাথে এর বোঝাপড়া তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি জাতিভেদ ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং বিকাশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে ভারতীয় নিম্নবর্গীয় সাহিত্য মূলত জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত। মনুষ্য সমাজের এই প্রক্রিয়া ভাঙার চেষ্টা বহুবার বহু সময়ে হয়েছে । কিন্তু ভারতবর্ষে একে ভাঙার যে শক্তি, একে টিকিয়ে রাখার শক্তি তার থেকে অনেকগুণ বেশি । বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য দখল এবং হিন্দু স্ক্রিপচারগুলিকে পুনর্লিখনের ভিতর দিয়ে সেই শক্তি প্রথমে সংহত হয় । তারপর, সেন রাজাদের প্রয়াস এবং শঙ্করাচার্যের প্রচারে সেই ভিত অনেক মজবুত হয় । মধ্যযুগের প্রায় ৬০০ বছরের মুসলমান রাজত্বে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বে এদেশে বর্ণবিভাজন, পুরোহিততন্ত্র ও মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে স্বাধীনোত্তরকালেও নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান, তাঁদের উপর শোষণ, নির্যাতন, গণনিধন, দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এদেশে 'ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম' তার সঠিক উদ্দেশ্য লাভে আদৌ সফল হতে পারবে কিনা !

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে যেমন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজে বিষের মতো ছড়িয়ে ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালেও চরিত্রগত কিছু হেরফের হলেও তার মূল কাঠামো অপরিবর্তনীয় আছে । তবে আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নিম্নবর্গীয় সাহিত্য আন্দোলনের ইতিকথা ইতিমধ্যেই অন্য মাত্রা পেয়েছে । বিশ শতকের ষাটের দশকের নিম্নবর্গীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখন ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । হিন্দি ভাষাভাষী প্রদেশগুলির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলিও পিছিয়ে নেই এই মুহূর্তে।

৫-১-৩-৯ নিম্নবর্ণের বিভিন্ন আন্দোলন

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার-এর সূত্রে ভারতে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাঁরা মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, সোশাল রিফর্ম কনফারেন্স প্রভৃতি সংগঠনসহ মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত হরিজন সংঘ'-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন নিম্নবর্গীয় বা হরিজনদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালান। নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুত্রেই এই শ্রেনী থেকে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হয়। তিনি নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'All India Depressed Classes Federation'। এছাড়াও নিম্নবর্গীয় শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন জাতীর অসংখ্য স্থানীয় ও গোষ্ঠীগত সংগঠন ছিল। এইসব সংগঠনের নেতৃত্বে নিম্নবর্গীয়দের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ শুরু হয় ।

ভারতে নিম্নবর্গীয় শ্রেনীর জাগরণে খ্রিস্টান মিশনারিদের পরোক্ষ অবদান উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টান মিশনারীরা নিম্নবর্গীয়দের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের খ্রিস্টধর্মের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে দলিতরাও ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আগ্রহ বোধ করেন। একইসঙ্গে মিশনারিরা নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ চেষ্টা চালান। নতুন শিক্ষা প্রসারের ফলে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগরিত হয়। গবেষক পি. কনস্টেবল তাঁর 'Modern Asian Studies' গ্রন্থে *'নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি'* বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আত্মসম্মানের এই বানীকে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে কিছু সুসংবদ্ধ মানুষ ভক্তিবাদী আদর্শের সাথে যুক্ত করে নেন এবং জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাবাদর্শ গড়ে তোলে'।

জাতিগত আত্মসম্মানবোধ এবং জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী জাগরণের ঘটনা সামনে আসে। কেরলে 'পুনারা', তামিলনাড়ুতে 'নাদার', মহারাষ্ট্রে 'মাহার', বাংলার 'নমঃশূদ্র', দিল্লি, ছত্রিশগড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন শ্রেনীর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়। নিম্নবর্গীয় শ্রেণী প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতি হিসেবে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতি পদ্ধতি অমান্য বা ভঙ্গ করার পথ বেছে নেয়। যেমন অস্পৃশ্যরা হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতো না। তাই প্রতিবাদ হিসাবে তারা জোটবদ্ধ হয়ে মন্দিরে প্রবেশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতকের গোড়ায় এমনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল- ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ভাইকম সত্যাগ্রহ, গুরুভায়ু সত্যাগ্রহ (১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দ), ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কালী মন্দির সত্যাগ্রহ (মুন্সিগঞ্জ), ১৯৩০-৩৫ খ্রিস্টাব্দে কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহ (নাসিক) ইত্যাদি।

ধর্মীয় অধিকারের দাবির পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় শ্রেনী সামাজিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনমুখী হয়। দলিতরা দাবি করে যে, তারাই ভারতের আদি অধিবাসী, যারা বহিরাগত আর্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এখন তারা পূর্বের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে সোচ্চার হয়। নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে পোশাক বিধির নানান কঠোরতা সামাজিক ভাবে চালু ছিল। উচ্চবর্ণের মহিলাদের অনুরূপ পোশাক নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এজভ এবং নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাতেও ১৮৭০-এর দশকে নমঃশূদ্র শ্রেনী উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চালায়। পানীয় জলের কূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গীয়দের উপর কঠোর বিধিনিষেধ ছিল। এই কূপের জল ব্যবহারের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবিতে মহারাষ্ট্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে চামারদের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়।

নিম্নবর্গীয়দের জাগরনবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রীঃ) দেশে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মুক্তি ছাড়া ভারত শক্তিশালী জাতি রূপে গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি 'দলিত' শ্রেনীকে (Depressed Class) 'হরিজন' নামকরনের বিরোধিতা করেন। আম্বেদকর এর মতে, সামাজিক পার্থক্য থাকার জন্য হিন্দুদের মধ্যে কোন জাতিয়তাবাদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতার ধারনা লুকিয়ে আছে। অবশ্য তাঁর সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক আছে। যাইহোক একাধিক নিম্নবর্গীয় সংগঠন তৈরি করে তিনি দলিত-মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাহার এলাকার (মহারাষ্ট্র) স্থানীয় পুরসভার নিয়ন্ত্রণভুক্ত পানীয় জলের কূপ ব্যবহারের দাবীতে কয়েক হাজার দলিতের সমন্বয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। একই বছরে মনুস্মৃতি আগুনে পুড়িয়ে তিনি অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, এই গ্রন্থটি অস্পৃশ্যতার ধারণা বিষয়ক আদি গ্রন্থ।

জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে জাতি ভেদাভেদ বা অস্পৃশ্যতার বিষয়গুলিকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। গান্ধীই প্রথম অস্পৃশ্যতার কুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করেন। অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২ খ্রিঃ) প্রস্তাবে স্বরাজ অর্জনের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়ে জোর দেন। কিন্তু গান্ধী হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার না করেই হরিজন শ্রেনীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণ হিন্দুদের কাছে নিপীড়িত শ্রেণিকে আপন করে নেবার পরামর্শ দেন। ডঃ আম্বেদকর জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচিকে নিম্নবর্গীয় শ্রেনীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সহায়ক বলে মনে করতেন না। তাই তিনি গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩১ খ্রিঃ) নিম্নবর্গীয়দের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। 'সর্বভারতীয় নিপীড়িত শ্রেনীর সমিতি'র সভাপতি এম সি রাজা স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষয়ে আম্বেদকরের বিরোধিতা করেন। তবে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের ঐক্যে ভাঙন ধরানোর লক্ষ্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award)-এ নিম্নবর্গীয়দের 'তপশিলি জাতি' (Scheduled Caste) হিসেবে পৃথক নির্বাচনে অধিকার প্রদান করে। গান্ধী এর বিরুদ্ধে আমরন অনশন শুরু করেন। এমতাবস্থায় আম্বেদকর 'পুনাচুক্তি' স্বাক্ষর করে একটা সমঝোতায় আসেন। এই চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকে এবং তপশিলি জাতির জন্য 151 টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

নিম্নবর্গীয়দের সংগঠিত করার বিষয়ে গান্ধীর সাথে কংগ্রেসের মতান্তর ঘটে। গান্ধী 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ'-এর মাধ্যমে নিম্নবর্গীয়দের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কাজ শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা জগজীবন রামের নেতৃত্বে 'সর্বভারতীয় নিপীড়িত শ্রেনীর লিগ' গঠন করে (১৯৩৫ খ্রিঃ) সংরক্ষিত আসনগুলি দখলের উদ্যোগ নেন। তবে ১৯৩৭-এর নির্বাচন সফল হয়নি। অন্যদিকে আম্বেদকরের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' বোম্বাইয়ে বিপুল সাফল্য পায়। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় রাজনীতির মুল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও আম্বেদকর পরিস্থিতির দাবি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি পদে আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে কংগ্রেস তাদের সদিচ্ছা

প্রকাশ করে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে 'তপশিলি জাতি' ও 'তপশিলি উপজাতি'-এই পর্যায়ে নিম্নবর্গীয় ও নিপীড়িত শ্রেনীর জন্য বহুমুখী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

৫-১-৩-১০ সহায়ক গ্রন্থ

১. 'Dalit Studies'---- Ramnarayan S. Rawat

2. **'**Dalits and the Democratic Revolution: Dr Ambedkar and the Dalit

Movement in Colonial India'---- Gail Omvedt.

৩. 'Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956'----Ramacandra Kshirasagara

৪) আধুনিক ভারতের ইতিহাস- বিপান চন্দ্র।

৫) Modern India- Sumit Sarkar.

৬) Indian Society- SC Dube.

৫-১-৩-১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1) What is the Marxist view of Indian Village community?

2) What do you know about Indian Feudalism?

3) Discuss different caste movement in India.

4) What are the impact of different land system in Colonial India?

পর্যায়গ্রন্থ -২

একক ৩/৪

পঞ্চম পত্র (পছন্দসই পত্র)

৫.২.৩.১ সূচনা

৫.২.৩.২ ভারতীয় ধর্মে চিরাচরিত ধারা

৫.২.৩.৩ ভারতীয় ধর্মে চিন্তায় আদিমতম বস্তবাদীধারা

৫.২.৩.৪ বুদ্ধের সমসাময়িক বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব

৫.২.৩.৫ আজীবক ধর্মমত

৫.২.৩.৬ জৈন ধর্ম

৫.২.৩. ৭ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

৫.২.৩.৮ বৈষ্ণবধর্ম

৫.২.৩.৯ সুফীবাদ

৫.২.৩.১০ উপসংহার

৫.২.৩.১১ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.২.৩.১২ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.২.৩.১ বর্তমান পর্যায়টি ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিবিধতার সম্পর্কে অবগত করাবে। ভারতীয় ধর্মীয় তত্ত্বের মধ্যে ভিন্ন মতে প্রাচুর্য্য এবং সেই সংক্রান্ত চিন্তাধারা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাশাপাশি বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির সমান্তরাল চিন্তাধারা রূপে বৌদ্ধ, জৈন,আজীবক ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২.৩.২ ভারতীয় ধর্মে চিরাচরিত ধারা - ভারতীয় ধর্মীয় বিস্তার চিরাচরিত ধারার বৈদিক যজ্ঞ কেন্দ্রিক ধর্মের উদ্ভব ও তৎ সংক্রান্ত বিষয় সমূহের গভীর উপস্থিতি দেখা যায়। ঋদ্বৈদিক সময়কাল থেকে বিমূর্ত প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে দেবতাভজনে পূজা এবং এই সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ করে সরল যজ্ঞানুষ্ঠানের উপস্থিতি ঋগবৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। এমন সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে যজ্ঞানুষ্ঠান জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করে। সেখানে গৃহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের তুলনায় শ্রৌতযজ্ঞ গুলি অর্থাৎ বৃহৎ আকারে যজ্ঞানুষ্ঠান বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যজ্ঞের নিয়মাবলীকে সুসংহত করবার জন্য নতুন ধর্মীয় শাস্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এর ফলে ক্রমশ রচনা হয় সামবেদ, যর্জুবেদ ও ব্রাহ্মন গুলি। যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বানের রীতি প্রচলিত হতে থাকে।

নতুন যজ্ঞকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতদের গুরুত্ব পরবর্তী বৈদিক সময় থেকে বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়। ‘প্রার্থনা’ র ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তাঁকে ‘বাচ’, ‘বাচী’, ‘ব্রহ্মণসূতি’ নামে উপাসনা করা হয়। পাশাপাশি যজ্ঞের কার্যের বিভাগ হেতু চারধরনের পুরোহিতের অবতারনা হয়। যথা- (১) হোতৃ (যিনি স্তুতির মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করতেন (২) উদগানী (যিনি সামগান করতেন) (৩) অধ্বযু’ (যিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদনা করতেন) (৪) ব্রাহ্মন (যিনি যজ্ঞের নিয়মাবলীর ওপর নজর রাখতেন) এছাড়া স্বত্বিজ শ্রেণীর পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য। যজ্ঞের এই জটিলতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে A.L. Basam বলেছেন 'Performance of rituals itself acuqired greater prominance than the ideas behind them. The priests made it so in order to establish their prominance in the Aryan Social order"

এইভাবে যজ্ঞের অর্ন্তনিহিত অর্থ প্রাধান্য হারিয়ে যজ্ঞ কেন্দ্রিক আচার বড় হয়ে দাঁড়াতে থাকে। এর সাথে সাথে যজ্ঞে পদ্ধতি বিধি

নিষেধের কড়াকড়ি দেখা যায়। যর্জুবেদ সংহিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ঋষিদের যজ্ঞ পদ্ধতির বিভিন্নতাকে কাটিয়ে ওঠে। এই সংকলন গুলির মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি যজ্ঞগুলির রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হতে শুরু করে। রাজসূয়, অশ্বমেধ, রাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞগুলি রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীকরূপে পরিগণিত হতে শুরু করে। পাশাপাশি দার্শনিক ক্ষেত্রে পরজন্ম ও কর্মফলবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত বিষয়ের পাশাপাসি মানবজীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ চতুবর্গের কথা উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এই চতুবর্গ ছিল ১) ধর্ম ২) অর্থ ৩) কাম ৪) মোক্ষ। অর্থাৎ ধর্মপালন শক্তভাবে/সদুপায়ে অর্থ উপার্জন, নিজের জাগতিক কামনা পূরণ ও ঈশ্বরসাধনার মাধ্যমে মুক্তিলাভ। কিন্তু চিরাচরিত উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের বিপরীতে ক্রমশ দার্শনিক চিন্তাভাবনার উন্মেশ দেখা দিতে থাকে।

সামাজিক পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল ও কঠোর আকার ধারণ করে। চতুবর্ণ প্রথা কঠোরতর হয়। ব্রাহ্মণ চরিত্রদের মর্যাদা বৃদ্ধিপায়। বৈশ্যরা দ্বিজ পর্যায়ভুক্ত হলেও তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনমন হয়েছিল। অন্যদিকে শূদ্রদের অবস্থান ছিল নিম্নতম। তাদের প্রতি উচ্চবর্নের অবহেলা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনে বৈশ্য ও শূদ্র সমাজে একটা বড় অংশ সামিল হয়েছিল।

এমত পরিস্থিতিতে চিরাচরিত ভাববাদী এবং ঈশ্বর উপাসক ধর্মীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিপরীতধর্মী চিন্তাভাবনার ক্রমশ উদ্ভব ও বিকাশ লক্ষ্য করা যেতে থাকে। ঔপনিষদিকে চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে বৈদ বিরোধী না হলেও এর মধ্যে কিন্তু চিরাচরিত যজ্ঞকেন্দ্রিক আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মের বিপরীতে প্রকেশ্বরবাদী দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ লক্ষ্য করা যেতে থাকে। এইভাবেই চিরাচরিত ধারা বর্তমান থেকে ও সমান্তরালভাবে contradiction এবং conflict এর ধারা দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভূত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫.২.৩.৩ ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় আদিতম বাস্তুবাদী ধারনার বিবরণ-

চিন্তায় শক্তি ও অনুসন্ধানের প্রকৃতি এই দুটি বিশেষগুন মানব সমাজকে প্রাণীকুলের মধ্যে অনন্য স্থান প্রদান করেছে। প্রাচীনতম যুগ থেকে যে চিন্তা মানবসমাজকে ভাবিত করেছে তা হল এই জগতের উৎপত্ত্রির কারণ কি? এই কারণ সন্ধানে যে দুটি দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে ভাববাদ যেখানে একজন পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তিনি সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে এই চিন্তার বিপরীতে চিন্তা করে বস্তুবাদ মনে করে সমস্তু কিছুর উদ্ভব বস্তু থেকেই হয়েছে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যা কিছু তাই সত্য এবং বাস্তব। তারা আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক জনের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হল ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন মূলত ভাববাদ কেন্দ্রিক কিন্তু সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে বস্তুবাদে একটি প্রাগ ইতিহাস আছে। বিভিন্ন সাহিত্য সূত্র অনুসন্ধান করতে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার মধ্যে চিরাচরিত চিন্তাধারা বিপরীতে বেশ কিছু বস্তুবাদী চিন্তার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মূলত ভারতীয় ভাববাদ, অর্থাৎ যাগজজ্ঞ, দান, প্রভৃতির মাধ্যমে সঞ্চিত পুন্য আত্মাকে মোক্ষ প্রদান করে এই রূপ ধারনার প্রতিপক্ষ হিসাবে ভারতে আদি বস্তুবাদী ধারনার উদ্ভ হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে আদিমতম সাহিত্যিক উপাদান থেকে সংশয়বাদের ধারনা পাওয়া যায়। সংশয়বাদ সর্বময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। এর মধ্যে চিরাচরিত শিক্ষা ও বেদের অভ্রান্ততার বিষয়ে সংশয়ের প্রকাশ ঘটেছে। ঋগ্বেদের মধ্যে এর প্রাথমিক আভাস লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎস, প্রাণের উৎস নিয়ে সন্দেহের বর্ণনা আছে। দশম মন্ডলের ১২৯ সুক্ত প্রশ্ন তুলেছে সৃষ্টির পূর্বে কি অবস্থা ছিল তা কে জানে? এবং কে বলতে পারে? আরো বলা হয়েছে যিনি পরমধানে প্রভুস্বরূপ আছেন তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন আবার না ও পারেন। এই সূক্ত অনুযায়ী দেবতার সৃষ্টির পরে এসেছেন। এবং এই সুক্তে অবিদ্যমান বস্তু থেকে বিদ্যমান বস্তুর উদ্ভবের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। আবার একই মন্ডলে ৬৪ সূক্তে বলা হয়েছে কে আমাদের কৃপা করেন? কে

সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করতে আমাদের কাছে আসেন। এই সমস্ত সূক্ত গুলিকে আদি সংশয়বাদ প্রকাশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে বাস্তবধর্মী উপায়ে চিন্তার প্রয়াস করেছে।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি হল উপনিষদ। উপনিষদে মূলত ভাববাদী চিন্তার প্রতিফলন নক্ষ্য করা যায়। বৃহপারন্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন দেবতারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা গঢ়ূর পছন্দ করেন। উপনিষদের প্রকৃত জ্ঞান হল আত্মন ও ব্রহ্মন এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা, এর মধ্যে ভাববাদী চিন্তার প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপনিষদের চিন্তার মধ্যে ফল্গুধারার ন্যায় বস্তুবাদী চিন্তা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় উদ্দালক আরুনির কাহিনী থেকে যাকে Herman Jacolei আদিমবস্তুবাদ (arehaic materilism) বলে অভিহিত করেছেন। P.C. Chatterjee মনে করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা জড়বাদী চিন্তা উদ্দালক আরুনীর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তাঁর মতবাদের মধ্যে একধরনের প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরোধী মতাদর্শ পাওয়া যায়। উদ্দালক আরনী জড়বাদী চিন্তার সূত্রপাত করেন। মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি নির্দিষ্ট তার্কিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। সেই পদ্ধতির প্রাথমিক শর্তছিল প্রত্যক্ষণ (direct observation) কার্য কারণ সম্পর্ক (notion of causality) , পরীক্ষণ (exmination)। উপনিষদের যুগে অবস্থান করে উদ্দালক সৃষ্টির প্রথম কারণটিকে নির্দেশ করেছেন। 'সৎ' (বিশুদ্ধ বস্তু) হিসাবে। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এই সৎ হল অবিকশিত পদার্থ। উদ্দালক আরুনির মতে এই সৎ থেকে তিনটি মৌলিক পদার্থ বিকশিত হয়। এই তিনটি মৌলিক পদার্থ হল উত্তাপ, জল ও খাদ্যবস্তু। এই তিনটি বস্তু থেকে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। মনের ও উদ্ভব বস্তুতেই নিহিত। তাঁর মধ্যে তাপ বা উত্তাপ জল ও খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে। জল থেকে আসে প্রাণ এবং খাদ্য থেকে আসে মন। এই তিনটি বিষয় প্রমান করতে তার বেদজ্ঞ পুত্র শ্বেতকেতুর এপর একটি পরীক্ষণ করেন। সেখানে কিছুদিন পুত্রকে খাদ্য বা জলপান করতে না দিয়ে বেদপাঠ করতে নির্দেশ দিলে শ্বেতকেতু বেদপাঠে অসমর্থ হন। যা দ্বারা উদ্দালক প্রমান করে খাদ্য ও জল ব্যতীত মনও প্রাণ ধারণ করা সম্ভব নয়। আবার একটি বটগাছের বীজের ক্ষুদ্রতম কনার মধ্যে সমগ্র গাছের গুন লুকিয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করার মধ্যে বস্তু জগতে পরমানুর ধারণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষণের মধ্যে নতুন ধারনা।

তবে উদ্দালক আরুনির মত আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত নিজত্ব চিন্তাভাবনার কিছু অভিন্ন প্রদান করলেও সরাসরি উপনিষদের বিরুদ্ধাচারণ করেননি। এই সময়ে প্রধানত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম -সপ্তম শতাব্দীতে রাজতন্ত্র শক্তিশালী ফলে কুরু পাঞ্চল রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই রাজ্যগুলি পূর্বে পুরোহিতদের উপর নির্ভরশীল হলেও পরে ব্রাহ্মনদরে থেকে স্বতন্ত্র হতে চায় এর ফলে তাদের মধ্যে কিছু বস্তুবাদী চিন্তাধারার উদ্বব হয়। আবার উপনষিদে কিছু অংশে বলা হয়েছে যে উপনিষদে সূর্য দর্শন ব্রাহ্মনের পূর্বে রাজারা জানত। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন দ্বিতীয় নগরায়নের সময় ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে বিভাজন বা বিলম্বিত হয়। এবং অনেক আদিম বস্তুবাদী ধারনা ব্রাহ্মন্যদর্শনে স্থান পায়। উদ্দালক আরুনির সৎ পদার্থ ব্রহ্মনের একটি রূপ হিসাবে পরিগণিত হয়।

এছাড়াও অন্য উপনিষদের মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তাধারারও প্রকাশ পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে জগৎকারণ হিসাবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দী ধারনারূপে কাল, স্বভাব, নিয়তি, সদৃচ্ছা ও ভূতালি এই সাতটি বিত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার উপনিষদের যুগে পরলোক অবিশ্বাসী মানুষজনের অস্তি্ত্বের প্রমান উপ নিষদের যমের উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থ দীর্ঘনিকায়েব সামঞ্জস্যফল সুত্তে বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন দার্শনিকের মধ্যে অন্যতম অজিত কেশকম্বলী মতবাদ পর্যালোচনা করলে তার মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই তাঁর মতবাদ বেদবিরোধিতা করে। সমস্ত ভাববাদী দর্শনের মূল কেন্দ্র পরজন্ম এবং কর্মফলবাদকে অজিত কেশকম্বলী নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তার মতে এই জগৎ থেকে

পরলোকে যাওয়া ঘটে না কারণ পরলোক বলে কিছু নেই। আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব নেই। তেমনি যাগজজ্ঞ, দান, পিতামাতার সেবা করলে কোন পারলৌকিক পুন্য হয়না। তিনি মনে করেন কোন শ্রমন বা ব্রাহ্মন সঠিক পথ অনুসরণ করেননি। যারা পরলোক বিষয়ে অবহিত দাবী করেন তাদের কোন জ্ঞান নেই। মানুষ ৪টি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত। যে মারা গেলে শরীর এবং মন এই উপাদান সমূহ অর্থাৎ ভূমি, জল, বায়ু ও অগ্নিতে বিলীন হয়ে যায়, তবে উল্লেখ্য এই যে ব্রাহ্মন্যধারা পঞ্চম মহাভূত ব্যোম এখানে অনুপস্থিত হয় শরীর মরে গেলে জ্ঞানী অজ্ঞানীর একই গতি হয়। অজিত কেশকম্বলীর বক্তব্য থেকে ধর্মীয় পরিসরের বাইরে কিছু বক্তব্য পাওয়া গেল যাকে বস্তুবাদের স্তম্ভ রূপে গ্রহণ করা হয়। যেমন (১) বেদঅপ্রামান্যবাদ অর্থাৎ বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করা (২) ...... (৩) পরলোক বিলোপবাদ - অর্থাৎ পরলোকে অবিশ্বাস (৪) ভূতচৈতন্যবাদ অর্থাৎ ভূত ও পদার্থ থেকেই প্রাণ ও চেতনার উৎপত্তি পরে যা লোকায়েতের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। (৫) প্রত্যক্ষ প্রমানবাদ - অর্থাৎ যে কোন তত্ত্বকে প্রত্যয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা। তবে এক্ষেত্রেত্রে যুক্তিপূর্ণ অনুমান গ্রহণযোগ্য হবে।

বস্তুবাদীদের উদ্দেশ্য বহুল ব্যবহৃত 'চার্বাক' বা 'লোকায়াত' নামটির উল্লেখ পালি ও জৈনসূত্রে এবং মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতে চা র্বাক দুর্যোধনের মিত্র ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষস তিনি যুধিষ্ঠিরকে জগতি হত্যার জন্য অপমান করেন বেং এতঃপর ব্রহ্মশাপে নিহত হন। এখানে চার্বাক বা বস্তুবাদী এরুপ কোন অভিমত প্রদান করা হয়নি। পালি সাহিত্যও জৈনসূত্রে লোকায়ত শব্দটি বেদ বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মহাভারতে কণ্বমুনির আশ্রমের উপাখ্যানে 'লোকায়তিক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তারা বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে এখানেও তাদের বস্তুবাদী বলা হয়নি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মনে করেন মহাভারত ও 'লোকায়তিক' বা 'লোকায়ত' বলছে ন্যায়শাস্ত্রকে ধরা হয়েছে। একদম স্বাধীনতম পর্যায়ে বস্তুবাদের পৃথক বিকাশ হয়নি। ব্রাহ্মন্য পরিসরের অর্ন্তগত নৈয়ানিক শাখা। কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রেও লোকায়ত দের বস্তুবাদী অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। একথা মনে করা যায় যে ন্যায়শাস্ত্র ও বস্তুবাদ উভয়েই । Logic বা যুক্তিনির্ভর তাই ন্যায়শাস্ত্র থেকে বস্তুবাদের পৃথকীকরণ হওয়া সম্ভব।

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের অভিধান ও অট্ত কথায় লোকায়ত শব্দের অর্থ হল 'বিতন্তাশাস্ত্র' তাই মনে করা হয় লোকায়তে আদিতে ব্রাহ্মন্য শাস্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বৈসায়িকদের মধ্যে এরধরনের কার্য কারণ সম্পর্ক ধারনা ছিল। তাদের উদ্দেশ্যেই লোকায়ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর যেখান থেকে একটি শাখা তর্ক সর্বস্ব বা pure logic আশ্রয় করে ন্যায় শাখায় পরিনত হয় এবং অপর একটি ধারা লোকায়ত নামে বস্তু, বর্হিজগৎ এবং পদার্থ নিয়ে যুক্ত হয়ে পড়ে। তবে উভয়ই যুক্তির ওপর বিশ্বাস করতেন। এ থেকে দেখা যায় যে সরাসরি বস্তুবাদ বলতে যা বোঝায় তার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া গেল না।

রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডে জাবালি উপাখ্যানে কিছু বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। রামের বনে প্রাক্কালে জাবালি রামকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন পা প পূন্য বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পর কেই অবশিষ্ট থাকে না। রামায়নের গৌড়ীয় পাঠে এই উপাখ্যান বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। জাবালি বলেছেন দশরথ ও রাম পৃথক, মৃত দশরথ রামকে তিরস্কার করতে অসমর্থ। পিতৃপুরুষ মারা গেলে শ্রাদ্ধ করা হলে তাতে অন্নের অপচয় হয়। কারণ মৃত্যুর পর কিছু অবশিষ্ট থাকে নায় অন্যের ভূক্ত দ্রব্য কখনোই পিতৃশরীরে যেতে পারে নায় দেবপূজা, দান, দীক্ষা, ব্রত, গৃহত্যাগ পন্ডিতদের প্রবর্তিত। প্রত্যক্ষই প্রমান, পরলোকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তাই পরলোক নেই। তবে রাম ও অন্য ব্রাহ্মনরা তাকে তিরস্কার করেন। তবে এথেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেই সময়ে এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল যার ফলে রামায়ণে এই উপাখ্যানের উপস্থাপনা করে সেটিকে নস্যাৎ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

উপরোক্ত বিভিন্ন সাহিত্য সূত্রের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে এই ধারণা করা যায় যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় দীর্ঘদিন ধরেই বস্তুবাদী চিন্তার বিক্ষিপ্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুসংহত প্রতিষ্ঠিত না হলেও মূল দার্শনিক চিন্তার সমান্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রাথমিক চিন্তা থেকে বিভিন্ন প্রতিবাদী ধর্ম সমূহ তাদের কিছু উপাদান গ্রহণ করে।

বৌদ্ধ ও জৈনরা যেমন বেদ অমান্যবাদে বিশ্বাস করতেন। তবে এইভাবে আদিবস্তুবাদী চিন্তা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত ও গৃহীত হয়।

৩.২.৩.৪ বুদ্ধের আর্বিভাবের পূর্ববর্তী সময়ে দার্শনিক তত্ত্ব

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্ব ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। তার মধ্যে যেমন বৈদিক যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মতত্ত্বছিল। তেমনি ছিল উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, যেখানে এক ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে কল্পনার প্রবনতা দেখা যায়। তেমনই চিরাচরিত চিন্তাভাবনার বিপরীতে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ রয়েছে।

জৈন গ্রন্থ সমূহে মহাবীরের সমকালীন ৩৬৩টি দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে। যে গুলিকে চারটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১) ক্রিয়াবাদ ২) অক্রিয়াবাদ (৩) অজ্ঞানবাদ ও (৪) বিনয়বাদ।

<u>ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব</u> মনে করে দুঃ ব্যক্তির নিজেরে সৃষ্ট, সেখানে বাইরের শক্তির কোনরকম ভূমিকা নেই। মূর্খব্যক্তিরা অসৎ কর্মের সংক্রমন আটকাতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানীরা সেটা পারে, ক্রিয়াবাদ ১৮০ রকম প্রকার ভেদের হয়।

<u>অক্রিয়াবাদী তত্ত্ব</u> অনুসারে কর্মের কোন ফল নেই, যাবতীয় মানবিক প্রচেষ্টাই নিস্ফল। এরা প্রায় ৮৪ প্রকার।

<u>অজ্ঞানবাদী</u> তত্ত্ব অনুসারে তারা কোন প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকত। ৬৭ প্রকারের অজ্ঞানবাদী পাওয়া যায়।

<u>বিষয়বাদী</u> গণ কিছু নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতেন, যদিও যেগুলির তাৎপর্য বুঝত না। বিনয়বাদ ৩২ রকম ছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থ সাম্ঞ্জফল সূত্তে বুদ্ধের সমসাময়িক সময় কিছু দার্শনিক তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যায়। মহারাজ অজাতশত্রুর দরবারে তাত্ত্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই তাত্ত্বিকদের অবতারনা হয়েছে। তাদের মধ্যে অজিত কেশকম্বলীর উল্লেখ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ব্যাতীত আরো কয়েকজন দার্শনিকের কথা এই গ্রন্থ সমূহে প্রাপ্ত হয়।

<u>পূরণকশ্যপ</u> ঃ আচার্য পূরণ কাশ্যপ ছিলেন অক্রিয়াবাদী দার্শনিক। তিনি মনে করতেন চুরি, হত্যা, অঙ্গহানি, মিথ্যা ভাষণ, প্রাণী হত্যা প্রভৃতি নেতিবাচক কর্মে কোনরূপ পাপ হয়না। আবার দান, যজ্ঞ দম, সংযম, সত্যবাক্য প্রভৃতি কোন রকম পুন্য প্রাপ্ত হয়না। অনেকে তাকে আজীবিকদের একজন প্রথম দিকে আচার্য ও গোশালের পূর্বসূরী মনে করেন।

পকুধ কচ্চয়েন ঃ পকুধ কচ্চয়েন নির্ধারনবাদী দার্শনিক। তার মতে সাতটি বস্তুদ্বারা জগৎ নির্মিত হয়েছে। এই সাত বস্তু গতিহীন, বিকারহীন, বিরোধশূণ্য, পরস্পরের সুখ বা দুঃখ বিধানে পর্যাপ্ত নয়। এই সাতবস্তু হল ক্ষিতি, অপ, জেত, বানু, সুখ, দুঃখ, এবং জীব। তাই কেউ কাউকে হত্যা করে পারেনা, কারণ মৃত্যু এই সাতটি উপাদানের রূপ পরিবর্তন মাত্র। তাই হন্তানাই, খাতুয়িতা নাই, শ্রাবক নাই, শ্রাবয়িতা নেই। হত্যা করলে একটা উপাদানকে অন্য উপাদান রূপান্তর করা হয় মাত্র।

সঞ্জয় বেলট্‌টিপুও ঃ অজ্ঞানবাদ ছিল সঞ্জয়ের দর্শনের বিষয়বস্তু তার মধ্যে পরম সত্য কোন দিনও জানা যাবে না। এমনকি এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত দেওয়া যাবে না। সঞ্জয়ের মতবাদকে ইংরাজীতে secptism বা gnosticism বলে মনে করা হয়। সঞ্জয়কে পরলোক সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পরলোক আছে তিনি সেটাও বলেন না, আবার নেই সেটাও তিনি বলেন না। অর্থাৎ এই রকম বলা যেতে পারে যে প্রত্যক্ষণের বাইরে অথবা প্রমানিত সত্যের বাইরে কোন দার্শনিক প্রশ্নকে সঞ্জয় জানি না বলার পক্ষপাতী ছিলেন। সেক্ষেত্রে সেটা থাকলেও থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

এছাড়া উল্লিখিত অজিত কেশকম্বলী (অশ্বের লোম যার একমাত্র বস্ত্র) বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছেন, যা পূর্বেই উল্লিখিত। এছাড়া মংখ লিপুও গোশাল এবং নিগ্রন্থ নামপুও (মহাবীর) এর কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এদের সম্পর্কিত আলোচনা যথাক্রমে আজীবিক ও জৈন ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হবে। তবে উক্ত আলোতনায় এই বিষয়টি দেখাগেল যে প্রতিবাদী ধর্ম সম্প্রদায় সমূহ হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়নি। ঈশ্বরবাদ এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মের সমান্তরালে ভিন্ন দার্শনিক চিন্তার অবস্থান ছিল, যা গোশাল, মহাবীর এবং সর্বপরি গৌতমবুদ্ধের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছিল।

উপনিষদ :- হিন্দুধর্মের এক বিশেষ ধরনের ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি । এই বইগুলিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি আলোচিত হয়েছে । উপনিষদের অপর নাম *বেদান্ত*। উপনিষদ্‌গুলিতে সর্বোচ্চ সত্য স্রষ্টা বা ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং মানুষের মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে । উপনিষদ্‌গুলি মূলত *বেদ*-পরবর্তী *ব্রাহ্মণ* ও *আরণ্যক* অংশের শেষ অংশে পাওয়া যায় । এগুলি প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

"ব্রহ্ম" ও "আত্মা" শব্দদুটি উপনিষদে ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ।ব্রহ্ম হলেন বিশ্বের সত্ত্বা আর আত্মা হলেন ব্যক্তিগত সত্ত্বা।এই শব্দদুটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। ব্রহ্ম শব্দটি সম্ভবত "ব্র" শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ "বৃহত্তম"। ব্রহ্ম হলেন "স্থান, কাল ও কার্য-কারণের অতীত এক অখণ্ড সত্ত্বা। তিনি অব্যয়, অনন্ত, চিরমুক্ত, শাশ্বত, অতীন্দ্রিয়।" আত্মা বলতে বোঝায়, জীবের অন্তর্নিহিত অমর সত্ত্বাটিকে। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের মতে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। এটিই উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ।

বেদান্তের পরবর্তীকালের ভক্তিপন্থী দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত বেদান্তের জন্ম এই দুটি ধারণার পার্থক্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বেদান্তের তিনটি প্রধান শাখা সম্প্রদায় হল অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত। বেদান্তের অন্যান্য উপনিষদ্-কেন্দ্রিক শাখাসম্প্রদায়গুলি হল নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ। আদি শঙ্কর ১১টি মুখ্য উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন।হিন্দু দর্শনের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাখাসম্প্রদায় হল অদ্বৈত বেদান্ত শাখা. অদ্বৈত বেদান্ত একটি একেশ্বরবাদী মতবাদ।অদ্বৈতবাদ ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতার কথা বলে। গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবক্তা হলেও এই মত বিস্তারলাভ করে আদি শঙ্করের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন গৌড়পাদের জনৈক শিষ্যের শিষ্য। রাধাকৃষ্ণন মনে করেন, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ উপনিষদ্ ও *ব্রহ্মসূত্র*-এর প্রত্যক্ষ বিকাশের ফলশ্রুতি। তিনি নতুন কিছুই বলেননি। যদিও অন্যান্য গবেষকেরা শঙ্করের রচনা *ব্রহ্মসূত্র*-এর বক্তব্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক খুঁজে পান।বেদান্তের অপর প্রধান শাখা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন রামানুজ। তিনি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। আধুনিক গবেষকদের মতে, রামানুজের বেদান্তভাষ্য শঙ্করের ভাষ্যের তুলনায় অনেক বেশি মূলানুগ। তাছাড়া রামানুজের মত হিন্দুদের সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের অনেক কাছাকাছি। রামানুজ শঙ্করের মত অস্বীকার করেছিলেন। বেদান্তের এই শাখায় অপর দুটি শাখাকে ভক্তি ও প্রেমের পথে এক করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।উপনিষদের দ্বৈতবাদী শাখার প্রবর্তক হলেন মধ্ব। অনেকে দ্বৈতবাদকে আস্তিক্যবাদী শাখাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। দ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও আত্মার পৃথক সত্ত্বা স্বীকৃত।

ষড়দর্শনঃ-

ষড়দর্শন বেদভিত্তিক ছয়টি ভারতীয় দর্শন। ভারতবর্ষে উদ্ভূত দর্শনসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় আস্তিক ও নাস্তিক। যে দর্শন বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে তা আস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন এবং এগুলিকেই একত্রে বলা হয় ষড়দর্শন। আর চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদে বিশ্বাসী নয় বলে এগুলি নাস্তিক দর্শন হিসেবে পরিচিত। উলেখ্য যে, আস্তিক-নাস্তিকের ক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনো কারণ নয়, যেমন ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথচ উভয়ই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। বৈশেষিক দর্শনেও সরাসরি ঈশ্বরের কথা নেই। সাংখ্য ও যোগ জগতের স্রষ্টা হিসেবে পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করলেও যোগ ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাসী। ন্যায় আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও জগতের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করে এবং বেদান্ত ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) তথা ব্রহ্মে (নির্গুণ) বিশ্বাসী; বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা। ফলে দেখা যায় যে, একই উৎস থেকে জন্ম হলেও আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে অমিল রয়েছে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করে।

নাস্তিক দর্শনগুলি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; সেগুলি অনাত্মবাদী ও জড়বাদী। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় এবং যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষযোগ্য নন, সেহেতু তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধদর্শনের আলোচ্য বিষয় মানবজীবন; মানুষের দুঃখমোচনই এ দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। বৌদ্ধমতে জগতের সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য; যেহেতু কোনো কিছুই শাশ্বত নয়, সেহেতু নিত্য আত্মা বলতেও কিছু থাকতে পারে না। জৈনরা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। এ দর্শনে দ্রব্যসমূহকে 'অস্তিকায়' ও 'নাস্তিকায়' নামে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যার বিস্তৃতি ও কায় (দেহ) আছে তা অস্তিকায়, যথা জীব ও অজীব (জড়) এবং যার বিস্তৃতি ও কায় নেই তা নাস্তিকায়, যথা কাল (time)। বঙ্গদেশে উপরিউক্ত দর্শনসমূহের প্রত্যেকটিরই কম-বেশি চর্চা হয়েছে এবং এখনও গুরুপরম্পরা ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হচ্ছে; তবে ন্যায়, বিশেষত নব্যন্যায়ের চর্চার জন্য এক সময় এদেশ সমগ্র ভারতে বিখ্যাত ছিল।

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল মুনি। ভারতীয় দর্শনসূহের মধ্যে একে প্রাচীনতম মনে করা হয়। এ দর্শনের উদ্ভবকাল গৌতম বুদ্ধের পূর্বে খ্রি.পূ অষ্টম শতক বলে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। মহাভারত, পুরাণ, চরকসংহিতা, মনুসংহিতা, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি গ্রন্থে এর বিশেষ উলেখ থেকে অনুমিত হয়, এক সময় ভারতীয় সমাজে এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে কালক্রমে তা হ্রাস পায়।

সাংখ্য দর্শনের নামকরণ নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে এ দর্শনে সংখ্যা (২৫) নির্দেশপূর্বক তত্ত্বগুলি বলা হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে সাংখ্য। মতান্তরে সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জিত হলে জগৎ থেকে মুক্তিলাভ ঘটে এরূপ মতবাদ প্রচার করার জন্যই এর নাম হয়েছে সাংখ্য।

সাংখ্যের গ্রন্থাবলি ও আচার্য-পরম্পরা সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। কপিলের প্রথম শিষ্য আসুরি, তাঁর শিষ্য পঞ্চশিখ। তিনি সাংখ্যদর্শনকে বহু বিস্তৃত করেন। বর্তমানে এর সুলভ প্রামাণিক গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণের (৪র্থ/৫ম খ্রি.) সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি। এটি প্রাচীনকালেই চীনদেশে প্রচারিত হয়। এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে যুক্তিদীপিকা ও তত্ত্বকৌমুদী উল্লেখযোগ্য। সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তবে এর প্রাচীনতা নিয়ে সংশয় আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু এর বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেন। তিনি পুরাণ থেকে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করে সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধ মতগুলির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি সাংখ্যসার নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন।

সাংখ্যমতে মূল তত্ত্ব দুটি চেতন পুরুষ ও জড় প্রকৃতি বা অব্যক্ত। প্রকৃতি (যার পরিণাম এই জগৎ) ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ)। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হলে নির্দিষ্টক্রমে সৃষ্টি শুরু হয়। প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে মন, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্) এবং পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ)। অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্র থেকে উদ্ভূত হয় পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)।

সাংখ্যমতে দুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক (শরীরগত রোগাদি), আধিভৌতিক (পশু, পাখি ইত্যাদি দ্বারা উৎপন্ন) এবং আধিদৈবিক (যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট)। দুঃখ থেকে চিরতরে পরিত্রাণই মুক্তি। এই মুক্তির কারণ যে বিবেকজ্ঞান তা লাভ হয় একমাত্র শাস্ত্রপাঠের দ্বারা। অজ্ঞানবশত মানুষ আত্মা (পুরুষ) ও অনাত্মাকে (প্রকৃতি) অভিন্ন বলে মনে করে। আত্মা সুখদুঃখের অনাশ্রয়, চৈতন্যস্বরূপ, অপরিণামী, অকর্তা এবং নির্লিপ্ত। ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বুদ্ধির ধর্ম, পুরুষের নয়; কিন্তু অজ্ঞানবশত মানুষ তা আরোপ করে পুরুষে। ফলে মানুষকে সংসার ও দুঃখভোগ করতে হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হলে আত্মা-অনাত্মার ভেদজ্ঞান জন্মে এবং তখনই মুক্তি হয়। জীবাত্মার বহুত্ববাদ, সৎকার্যবাদ, পরিণামবাদ ইত্যাদি সাংখ্যদর্শনের বিশিষ্ট সিদ্ধান্তরূপে পরিচিত।

যোগ দর্শনের প্রবর্তক পতঞ্জলি (খ্রি.পূ ২য় শতক), এজন্য এর অপর নাম 'পাতঞ্জল দর্শন'। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের চারটি পাদ। প্রথম পাদে আলোচিত হয়েছে যোগের লক্ষণ ও সমাধি। দ্বিতীয় পাদে সমাধি লাভের পূর্বে অনুসরণীয় ব্যবহারিক যোগ এবং যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি যোগাঙ্গের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাদে ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও এসবের ফল এবং বিভূতি বা ঐশ্বর্য আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ পাদে পাঁচ প্রকার সিদ্ধি ও পরা প্রয়োজন কৈবল্যের আলোচনা করা হয়েছে।

যোগমতে পরমেশ্বর ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল, সংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত পুরুষ বিশেষ। তিনি লীলাবশে বহু দেহ ধারণ করে লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন এবং দুঃখদগ্ধ সংসারী জীবগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।

যোগের আটটি অঙ্গ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদিকে বলা হয় যম। শৌচ, সন্তোষ ইত্যাদিকে বলা হয় নিয়ম। দেহকে স্থির ও সুখকর রাখার উপায় হচ্ছে আসন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে বলা হয় প্রাণায়াম। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে জাগতিক সকল বস্ত থেকে মুক্ত করে কেবল পরমাত্মায় লীনপ্রাপ্ত চিত্তের অভিমুখী করে তোলাই হলো প্রত্যাহার। কোনো কিছুর প্রতি চিত্তের স্থিরতা হচ্ছে ধারণা। ধ্যেয় বিষয়ে জ্ঞানকে নিরন্তর প্রবাহিত করাকে বলে ধ্যান, আর চিত্তের সকল বৃত্তির নিরোধকে বলা হয় সমাধি।

যোগের এই দার্শনিক দিকের চেয়ে বর্তমানে এর লৌকিক অর্থাৎ অষ্টাঙ্গের তৃতীয় অঙ্গ আসনের চর্চা গুরুত্ব পাচ্ছে। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যোগব্যায়াম চর্চা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। বিভিন্ন সংস্থা যোগব্যায়াম চর্চার সময় ও নিয়ম-নীতি ছবিসহ উল্লেখ করে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। লোকজনকে যোগব্যায়াম চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন রকম প্রচার চলছে। কলকাতায় যোগব্যায়াম চর্চার একাধিক কেন্দ্র রয়েছে (আয়রনম্যান হেলথ হোম ইত্যাদি) এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৭৬ সাল থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যোগব্যায়ামকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ যোগব্যায়াম চর্চা করেন। এভাবে যোগব্যায়ামকে এখন একটি কার্যকর চিকিৎসাপদ্ধতিতে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।

ন্যায় দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি গৌতম। তাঁর ন্যায়সূত্রের (খ্রি.পূ ৩য় শতক) ওপর এ দর্শন প্রতিষ্ঠিত। জীবের মোক্ষলাভের হেতু তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের তিনটি প্রক্রিয়া হলো শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন; এর মধ্যে মননের সাধনই হলো ন্যায়দর্শন। আত্মতত্ত্ব শ্রবণের পর যুক্তির দ্বারা তার স্বরূপ আলোচনা করার প্রধান উপায় ন্যায়।

বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক কণাদ বা উলূক। এর নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রচলিত মত হলো: এই দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত, তাই এর নাম হয়েছে 'বৈশেষিক'। আরেকটি মত হলো: ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে চীনদেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়েছিল সাংখ্য, পরে বৈশেষিক এবং চীনাদের নিকট এই দর্শন সাংখ্য থেকে বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায় এর নাম হয় বৈশেষিক। নামকরণ সম্পর্কে এছাড়া আরও মতবাদ প্রচলিত আছে। বৈশেষিক দর্শনের উদ্ভবকাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বলে মনে করা হয়।

বৈশেষিক দর্শনকে এক সময় সকল শাস্ত্রের উপকারক মনে করা হতো (কাণাদং পাণিনীয়ং চ সর্বশাস্ত্রোপকারকম্)। এর আদিগ্রন্থ কণাদ রচিত বৈশেষিকসূত্র, তাই এর নামান্তর কাণাদ বা ঔলূক্য দর্শন। বৈশেষিকসূত্রের রচনাকাল গৌতমের ন্যায়সূত্রের কিছু পূর্বে।

বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্রগুলির সঠিক পাঠ, পৌর্বাপর্য, সংখ্যা এবং তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুরূহ। বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মান্যগ্রন্থ প্রশস্তপাদভাষ্য বা পদার্থধর্মসংগ্রহ (৬ষ্ঠ খ্রি.)। এর বেশ কয়েকটি বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ টীকা আছে, যেমন ব্যোমবতী, ন্যায়কন্দলী ও কিরণাবলী। এছাড়া আরও অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল বলে অনুমান করা হয়, কিন্তু সেগুলির মধ্যে বর্তমানে উপলব্ধ মাত্র দুটি চন্দ্রানন্দের প্রাচীন বৃত্তি ও শঙ্কর মিশ্রের অর্বাচীন উপস্কার (১৫শ খ্রি.)।

বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থ স্বীকৃত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। জগতের সব কিছুই এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের জ্ঞানের মাধ্যমে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। বৈশেষিকরা পরমাণুকারণবাদী বলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

মীমাংসা দর্শন মহর্ষি জৈমিনি (খ্রি.পূ ৪র্থ শতকের পূর্বে/খ্রি.পূ ২য় শতক) প্রবর্তিত এবং তাঁর মীমাংসাসূত্র এ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এ দর্শন সম্পূর্ণই বেদনির্ভর এবং আকারে সর্ববৃহৎ। এটি 'পূর্বমীমাংসা' নামেও পরিচিত, কারণ এর বিষয়বস্তু বেদের কর্মকান্ডভিত্তিক। কর্ম বলতে এখানে বৈদিক যাগ-যজ্ঞকে বোঝায় এবং সেগুলি বেদের পূর্ব বা প্রথমভাগের অন্তর্ভুক্ত; কিংবা বলা হয় যে, কর্ম আগে ও জ্ঞান পরে, তাই কর্মভিত্তিক দর্শন পূর্বমীমাংসা; আর বেদের উত্তর বা শেষভাগ হচ্ছে জ্ঞানকান্ড, যা বেদান্ত নামে পরিচিত; এজন্য বেদান্তের এক নাম 'উত্তরমীমাংসা'।

মীমাংসা দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করা একথা জৈমিনিগ্রন্থের প্রথম সূত্রেই উল্লিখিত হয়েছে: 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা।' এখানে ধর্মের অর্থ বেদোপদিষ্ট কর্তব্যকর্ম। বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদির যৌক্তিকতা প্রদর্শন মীমাংসা দর্শনের কাজ। মীমাংসামতে যজ্ঞই মানুষের প্রধান কর্তব্য। যজ্ঞের সুষ্ঠু নিয়মাবলি, যজ্ঞের ফলস্বরূপ স্বর্গসুখ লাভ ও মুক্তিপ্রাপ্তির কথা এতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় এবং সে ধীরে ধীরে আনন্দময় মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়।

মীমাংসা দর্শন বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী। প্রত্যক্ষজ্ঞানে যার অস্তিত্ব অনুভূত হয়, মীমাংসামতে তা সত্য; তবে প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতীত আত্মা, দেবতা, স্বর্গ, নরক ইত্যাদিও সত্য; জগতের উপাদানসমূহ নিত্য এবং জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৌদ্ধধর্মএর শূন্যবাদ ও বেদান্তের মায়াবাদ এতে স্বীকৃত নয়। এতে জ্ঞানলাভের উপায় হিসেবে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকৃত।

মীমাংসা দর্শনের প্রধান ভাষ্যকার শবর স্বামী (খ্রি.পূ ৫৭ অব্দ)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকজন হলেন: কুমারিল ভট্ট (খ্রি. ৭ম শতক, বার্তিক)), তাঁর শিষ্য মন্ডনমিশ্র (বিধিবিবেক ও মীমাংসানুক্রমণি) ও প্রভাকর (বৃহতী), পার্থসারথি মিশ্র (খ্রি. ৯ম শতক, শাস্ত্রদীপিকা, তন্ত্ররত্ন ও ন্যায়রত্নাকর), আপদেব (খ্রি. ১৭শ শতক, মীমাংসান্যায়প্রকাশ), খন্ডদেব (খ্রি. ১৭শ শতক, ভাট্টদীপিকা ও মীমাংসাকৌস্তভ) প্রমুখ।

বেদান্ত দর্শনও সম্পূর্ণ বেদনির্ভর। 'বেদান্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ বেদের অন্ত বা শেষভাগ। কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসমতে অপৌরুষেয় নিত্য বেদের আদি-অন্ত নেই। তাই বেদান্ত বলতে প্রকৃতপক্ষে বেদের শ্রেষ্ঠভাগকেই বোঝায় এবং তা হলো ব্রহ্মতত্ত্ব। বেদে এই তত্ত্বসম্পর্কিত আলোচনাংশকে বলা হয় জ্ঞানকান্ড, যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে। উপনিষদ ও বেদান্ত সমার্থক; বেদান্তদর্শনে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাই ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্তদর্শনের তিনটি প্রস্থান শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষদ), স্মৃতিপ্রস্থান (ভগবদ্গীতা) ও ন্যায়প্রস্থান (বেদান্তসূত্র)।

মহর্ষি বাদরায়ণ (আনু. ৫০০ খ্রি.পূ) প্রণীত বেদান্তসূত্রে (৫৫৫টি সূত্র) ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে বলে একে ব্রহ্মসূত্র বলে; আবার জীবের স্বরূপ বর্ণিত হওয়ায় একে শারীরকসূত্রও বলা হয়। ব্রহ্মসূত্রের সাতটি ভাষ্য আছে, যেমন: শঙ্করের শঙ্করভাষ্য, রামানুজের শ্রীভাষ্য, বল্লভের অণুভাষ্য, মাধ্বের পূর্ণপ্রজ্ঞাভাষ্য, নিম্বার্কের বেদান্তপারিজাতসৌরভ, ভাস্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এবং বলদেবের গোবিন্দভাষ্য। এই সাতটি ভাষ্যে যথাক্রমে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ এই সাত প্রকার মতবাদ প্রতিপাদিত

হয়েছে। এ থেকেই বেদান্তের সাতটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়; কারণ এখানে অদ্বৈততত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ আছে; অদ্বৈতবোধ ছাড়া ধর্মবোধ জন্মায় না।

অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্ত্ত; জাগতিক বস্ত্তর কোনো তাত্ত্বিক সত্তা নেই। সত্তা তিন প্রকার পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। প্রাতিভাসিক বস্ত্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা এবং ব্যবহারিক বস্ত্ত পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য বস্ত্ত, যাঁর কোনো স্থানকাল ভেদ নেই। নাম-রূপাত্মক জাগতিক বস্ত্ত মিথ্যা, যেহেতু সেগুলি দৃশ্য, বাধ্য এবং বিশেষ কালে ও বিশেষ স্থানে অবস্থান করে। মিথ্যা বস্ত্ত সৎ, অসৎ বা সদসৎ কোনোটিই নয়, তা অনির্বাচ্য, কেবল প্রতীতিকালেই থাকে; মিথ্যা বস্ত্ত কেবল নিজস্তরে সত্য, কিন্তু উচ্চতর সত্তায় মিথ্যা।

দৃশ্য জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত ও অজ্ঞানের পরিণাম। তাত্ত্বিক অবস্থান্তরকে ‘পরিণাম’ ও অতাত্ত্বিক অবস্থান্তরকে ‘বিবর্ত’ বলে। অজ্ঞানী জীব এক ব্রহ্মকে বহু বলে ভুল করে। বিষমসত্তাবিশিষ্ট বস্ত্তদ্বয়ের সমসত্তাবিশিষ্টরূপে প্রতীতিকে অধ্যাস বলে। অজ্ঞান অধ্যাসের পরিণামী উপাদান কারণ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উদিত হলে অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই অজ্ঞাননিবৃত্তিই হচ্ছে ‘মুক্তি’। মিথ্যা বস্ত্ত ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়।

বেদান্তমতে জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায় এবং এ ক্ষেত্রে কর্মের কোনো উপযোগিতা নেই। তবে চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম ও প্রায়শ্চিত্তকর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। শঙ্করের মতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ; পরবর্তীকালে উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই তিনটি যুক্ত হয়েছে। তবে শ্রুতিবাক্যই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। জ্ঞানের অন্য কোনো উৎস শ্রুতির অবিরোধী হলে তাও প্রমাণরূপে গণ্য হয়।

অদ্বৈতবেদান্ত সম্পর্কে নানা টীকা, ভাষ্য ও প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রকাশাত্মার পঞ্চপাদিকাবিবরণ, বাচস্পতির ভামতী, শ্রীহর্ষের খন্ডনখন্ডখাদ্য, চিৎসুখাচার্যের প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী এবং মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়; নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী এবং অমরনাথ ভট্টাচার্য]

গ্রন্থপঞ্জি শ্রীতারকচন্দ্র রায়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৬০; প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পা.), কলকাতা, ১৯৬৭; শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য, ভারতীয় দর্শন (চতুর্দশ সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৯৬।

৫.২.৩.৫ আজীবিক ধর্মঃ- আজীবিক একটি অন্যতম মুখ্য ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্ম ২০০০ বছর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। মকখলি গোসালা এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

এই ধর্মের মূল বিষয় ছিল *নিয়তি* অর্থাৎ *ভাগ্য* এই ধর্ম মতানুসারে নিয়তি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রন করে এবং কোনো পৌরুষাকার একে পরিবর্তন করতে পারে না।

আজীবিক ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। ছোট ছোট গোষ্ঠী হিসাবে এই ধর্ম অনেক আগে থেকে গাঙ্গেয় মধ্য অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মকখালি গোসল এদের একত্রিত করে একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত করেন। গোসালের আগে দুজন আজীবিক গুরু নন্দ বচ্চ আর কিস সনকিচ্চ নাম পাওয়া যায় । এবং গোসাল পরবর্তী যুগে পূরণ কাশ্যপ নাম পাওয়া যায় । রাজা বিম্বীসার আজীবিক ছিলেন। বাংলায় তাম্রলিপ্তে প্রচুর আজীবিক ছিলেন তা হিউয়েন সাং এর বিবরনে পাওয়া যায় ।

মৌর্য যুগে আজীবিক সারা ভারতে ও সিংহলে প্রচার পায়।নাগার্জুন গুহায় প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি এই কথার ও সমাজে আজীবিকদের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ ।চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতে প্রতিবাদী ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ পর আজীবকদের উল্ল্যেখ আছে । এতেই বোঝা যায় তখন এই ধর্মের কিরকম বিস্তার ছিল। বরাহ মিহির তার গ্রন্থে আজীবিকদের জ্যোতিষ চর্চার উল্ল্যেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে আজীবিকরা প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী অবধি ছিল এর উল্ল্যখ মনিমেখলাই নামক তামিল পুস্তকে পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থে সর্বশেষ 1292 এ আজীবিকদের উল্ল্যেখ পাওয়া যায় । তখন উত্তর ভারতে তারা গুপ্ত সংস্থা তৈরী করে কোন রকমে টিকে ছিল । এবং ধর্মে তখন সম্পূন রূপে বিকৃত তন্ত্র কবলে চলে গেছিল।

৫.২.৩.৬ জৈনধর্মঃ- জৈনধর্ম হল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রাচীন ধর্ম। জৈনরা চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের জীবনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন করেন। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, বর্তমান কালচক্রার্ধের (অবসর্পিণী যুগ) প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভনাথ।

সর্বশেষ দুই তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ (২৩শ তীর্থঙ্কর, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮৭২-৭৭২ অব্দ) ও মহাবীর (২৪শ তীর্থঙ্কর, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭ অব্দ) ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ সম্পর্কে সীমিত ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। কিংবদন্তি অনুসারে, তিনি ছিলেন কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা। জৈনধর্ম হল চিরস্থায়িত্বের দর্শন। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের ধর্ম হল একটি চিরস্থায়ী ধর্ম। হেইনরিক জিমারের মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ সহস্রাব্দেও জৈনধর্মের অস্তিত্ব ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় পরবর্তী প্রস্তরযুগীয় একাধিক বৃহদাকার শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ড. বিলাস এ. সাংভি, চম্পৎ রাই জৈন, অধ্যাপক জর্জ বুলার, হারমান জেকবি, ড. হরনেল, পণ্ডিত সুখলাল সাংভি, অধ্যাপক বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্যরা বিশ্বাস করেন যে, জৈনধর্মই ভারতের প্রাচীনতম বিদিত ধর্মবিশ্বাস এবং সিন্ধু উপত্যকায় এই ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাঁদের মতে, হরপ্পায় খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত ‘কায়োৎসর্গ’ ভঙ্গিমার নগ্ন পুরুষমূর্তি, ‘পদ্মাসন’ ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট মূর্তি, সর্পমস্তক মূর্তি এবং ঋষভনাথের বৃষ প্রতীক জৈনধর্মের পরিচায়ক।

মহাবীর (Mahāvīra) হলেন ২৪শ তথা সর্বশেষ জৈন তীর্থঙ্কর (শিক্ষক দেবতা)। তিনি **বর্ধমান** নামেও পরিচিত। মহাবীরকেই সাধারণত জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। যদিও ২৩শ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে অধুনা ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন এবং বস্ত্র সহ যাবতীয় জাগতিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী সাড়ে বারো বছর মহাবীর গভীর ধ্যান অনুশীলন করেন এবং কঠোর তপস্যা করেন। এরপর তিনি ‘কেবলী’ (সর্বজ্ঞ) হন।

পরবর্তী ৩০ বছর তিনি জৈন দর্শন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া পরিভ্রমণ করেন। মহাবীর জীবনের মান উন্নত করার জন্য ‘অহিংসা’ (প্রত্যেক জীবের প্রতি কায়মনোবাক্যে হিংসা বর্জন), ‘সত্য’ (কার্যে ও বাক্যে সত্যাচরণ), ‘অস্তেয়’ (চুরি না করা), ‘ব্রহ্মচর্য’ (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও ‘অপরিগ্রহ’ (সংসারে অনাসক্তি) – এই পাঁচটী ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষা দেন। মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী (ইন্দ্রভূতি গৌতম) তাঁর উপদেশগুলি সংকলিত করেন। এগুলিকে *আগম* বলা হয়। এই *আগম*গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না। জৈনরা বিশ্বাস করেন, মহাবীর ৭২ বছর বয়সে মোক্ষ (জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি) লাভ করেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে এক দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই সময় আচার্য ভদ্রবাহু দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কর্ণাটক অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। ভদ্রবাহুর শিষ্য স্থূলভদ্র মগধে থেকে যান। ভদ্রবাহুর অনুগামীরা মগধে প্রত্যাবর্তন করলে *অঙ্গ* শাস্ত্রের প্রামাণিকতাকে কেন্দ্র করে স্থূলভদ্র ও তাঁদের মধ্যে বিবাদ বাধে। এছাড়া মগধবাসী জৈনেরা সেই সময় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছিলেন। ভদ্রবাহুর অনুগামীদের কাছে এটি গ্রহণীয় ছিল না। তাঁদের মতে, নগ্ন থাকাই ছিল জৈন শাস্ত্রানুমোদিত বিধি। এইভাবে জৈন সমাজ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দিগম্বর জৈনরা নগ্ন অবস্থায় থাকতেন এবং শ্বেতাম্বর জৈনরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন। দিগম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করাকে জৈন মতবিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করতেন। তাঁদের মতে, জৈন মতবাদ অনুসারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় জীবনযাপন করতে হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের দাবি, তাঁরাই প্রাচীন শ্রমণপ্রথাটিকে সংরক্ষণ করছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর গ্রিক নথিতে যে ‘জিমনোসোফিস্ট’দের (নগ্ন দার্শনিক) উপস্থিতির কথা জানা যায়, তার থেকে দিগম্বর সম্প্রদায়ের এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রথাগত বিশ্বাস অনুসারে, জৈনধর্মের মূল মতবাদ *পূর্ব* নামক শাস্ত্রে লিখিত ছিল। মোট চোদ্দোটি *পূর্ব* শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। জৈনদের বিশ্বাস, এই *পূর্ব* শাস্ত্রগুলির উৎস প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। মহাবীরের মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে একটি দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় মগধের শাসক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং জৈন সমাজের প্রধান ছিলেন ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহু তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দক্ষিণে কর্ণাটক অঞ্চলে চলে যান। স্থূলভদ্র নামে অপর এক জৈন প্রধান মগধে থেকে যান। এই সময় জৈন মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। তখন পাটলীপুত্রে এক সভার আয়োজন করা হয় এবং সেই সভায় *অঙ্গ* নামে পরিচিত ১১টি শাস্ত্র রচনা করা হয়। স্থূলভদ্রের অনুগামীরা দ্বাদশ অঙ্গ *দিট্‌ঠিবায়* গ্রন্থে চোদ্দোটি *পূর্ব* শাস্ত্রের অবশিষ্টাংশ সংকলিত করেন। দিগম্বর সম্প্রদায় স্থূলভদ্র কর্তৃক সংকলিত জৈন আগমের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ইন্দ্রভূতি গৌতমের পর ২৩শ শিক্ষক ধরাসেনের সময় মাত্র একটি *অঙ্গ* শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল। এটি ছিল মহাবীরের নির্বাণের ৬৮৩ বছর পরে। ধরাসেনের শিষ্য পুষ্পদন্ত ও ভূতবলীর সময়কালে তাও হারিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য শাস্ত্রগুলিও হারিয়ে যেতে শুরু করে। মহাবীরের নির্বাণের ৯৮০ থেকে ৯৯৩ বছর পরে গুজরাতের বল্লভীতে একটা সভা আয়োজন করা হয়। এই সভার নেতৃত্ব দেন দেবার্ধী ক্ষমাশ্রমণ। সেই সময় জানা যায় দ্বাদশ অঙ্গ *দিট্‌ঠিবায়* গ্রন্থটিও হারিয়ে গিয়েছে। অপর দুটি *অঙ্গ* রচিত হয়। এই হল জৈনধর্মের সম্প্রদায় বিভাজনের প্রথাগত কাহিনি। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে, আটবার ‘নিহ্নব’ বা বিভাজন ঘটেছিল।

দিগম্বর প্রথা অনুসারে, গণধর চোদ্দোটি *পূর্ব* ও এগারোটি *অঙ্গ* জানতেন। মহাবীরের নির্বাণের প্রায় ৪৩৬ বছর পরে *পূর্ব* শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ৬৮৩ বছর পরে *অঙ্গ* শাস্ত্রের জ্ঞান লুপ্ত হয়। যে গ্রন্থগুলি *অঙ্গ* শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়, তাকে বলা হত *অঙ্গবাহ্য* চোদ্দোটি *অঙ্গবাহ্য* ছিল। প্রথম চারটি *অঙ্গবাহ্য* শাস্ত্রের নাম *সাময়িক, চতুর্বিমাস্থিক, বন্দন* ও *প্রতিক্রমণ* এগুলি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় *মূলসূত্র* গ্রন্থের কিছু অংশের অনুরূপ। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের *অঙ্গবাহ্য* শাস্ত্রগুলি হল *দশবৈকালিক, উত্তরাধ্যয়ন* ও *কল্পব্যবহার.*

পার্শ্বনাথের নির্বাণের পর তাঁর শিষ্য শুভদত্ত সন্ন্যাসীদের প্রধান হয়েছিলেন। শুভদত্তের পর যথাক্রমে হরিদত্ত, আর্যসমুদ্র, প্রভা ও কেশী সন্ন্যাসীদের প্রধান হন। *উত্তরাধ্যয়ন*নামক শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থে মহাবীরের শিষ্য ও কেশীর মধ্যে একটি কথোপকথনের বিবৃতি ধৃত রয়েছে। কেশী ও তাঁর অনুগামীরা মহাবীরকে তীর্থঙ্কর হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং মহাবীরের সঙ্গে যোগ দেন।

কথিত আছে, তীর্থঙ্করগণ 'কেবল জ্ঞান' (অনন্ত শুদ্ধ জ্ঞান) অর্জন করেছিলেন। মহাবীরের পর তাঁর শিষ্য সুধর্ম স্বামী জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান হন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫১৫ অব্দ পর্যন্ত তিনি জৈন সমাজের প্রধান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য জম্বুস্বামী সন্ন্যাসীদের প্রধান হন। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৩ অব্দ পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের প্রধান ছিলেন। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, সুধর্ম স্বামী ও জম্বুস্বামী 'কেবল জ্ঞান' অর্জন করেছিলেন এবং জম্বুস্বামীর পর অদ্যাবধি কেউ তা অর্জন করেননি।

সুধর্ম স্বামীর পর পাঁচ জন 'সূত্রকেবলী' (যাঁরা শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ) জৈন সমাজকে নেতৃত্ব দেন। ভদ্রবাহু ছিলেন সর্বশেষ সূত্রকেবলী। ভদ্রবাহুর পরে সাত জন (মতান্তরে এগারো জন) জৈন সমাজকে নেতৃত্ব দেন। এরপর শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান একে একে লুপ্ত হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্য

প্রথাগত বিশ্বাস অনুসারে, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮ অব্দ) শেষ জীবনে ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) বৌদ্ধ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। অশোকের শিলালিপিগুলিতে জৈনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপিগুলিতে 'ধম্মমহামাত্য'দের (সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ধর্মপ্রচারক) কর্তব্য বর্ণিত আছে। একটি শিলালিপিতে রয়েছে:

দেবতাদের প্রিয় পিয়দসি এই কথা বলেছেন: আমার ধর্মমহামাত্যগণ দয়ালু ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এছাড়া তাঁরা তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোর রাখেন যাঁরা সন্ন্যাসীদের কথা চিন্তা করেন এবং যাঁরা গৃহস্থদের কথা চিন্তা করেন। তাঁরা ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁরা (বৌদ্ধ) সংঘের ব্যাপারেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। একই ভাবে, আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ এবং আজীবকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। আমি এমন ব্যবস্থাও করেছি, যাতে তাঁরা নিগন্থদের (জৈন) সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁরা (সকল) ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন।

কথিত আছে, অশোকের পৌত্র সম্প্রতি (খ্রিস্টপূর্ব ২২৪-২১৫ অব্দ) সুহস্তী নামক এক জৈন সন্ন্যাসী কর্তৃক জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তিনি উজ্জয়িনীতে বাস করতেন। মনে করা হয়, তিনি অনেক জৈন মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে যে সকল মন্দিরের উৎস বিস্মৃত হয়েছিল, সেগুলিকে তাঁর নির্মিত মন্দির বলে উল্লেখ করা হত।

অন্যান্য রাজবংশ

মহামেঘবাহন রাজবংশের সম্রাট খারবেল ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু রাজা। তিনি জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। উদয়গিরির উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের একটি মূর্তি নির্মাণ করান এবং সন্ন্যাসীদের জন্য গুহানিবাস তৈরি করে দেন।

অন্য একটি কিংবদন্তি অনুসারে, উজ্জয়িনীর শক্তিশালী রাজা গর্দভিল্ল (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) কলক নামে এক জৈন সন্ন্যাসীর ভগিনী সন্ন্যাসিনী সরস্বতীকে অপহরণ করেছিলেন। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী ইন্দো-সিথিয়ান শাসক শক শাহির সাহায্য প্রার্থনা করেন। শক শাহি গর্দভিল্লকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। সরস্বতীকে উদ্ধার করা হয়। যদিও গর্দভিল্লকে ক্ষমা করা হয়। গর্দভিল্লর পুত্র বিক্রমাদিত্য শক শাসককে বিতাড়িত করেন। জৈনরা তাঁকে তাঁদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষক মনে করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট জৈন সন্ন্যাসী সিদ্ধসেন দিবাকরের শিষ্য। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের শাসনের অবসান ঘটান। তিনিও ছিলেন জৈনধর্মের এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত মথুরা ছিল জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। খ্রিস্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, তার আগেই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্মের বিভাজন ঘটে গিয়েছিল।

৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে জৈন শাস্ত্র রচনার জন্য বল্লভী সভার আয়োজন করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায় এই শাস্ত্রগুলিকে অপ্রামানিক বলে প্রত্যাখ্যান করে। জৈন সন্ন্যাসী সিলুঙ্গ সূরি যাদব রাজবংশের রাজা বনরাজকে (৭২০-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) লালনপালন করেছিলেন। চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ নিজে জৈন না হলেও একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করান। ভীমের (১০২২-১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে বিমল নামে এক জৈন গৃহস্থ আবু পর্বতের চূড়ায় অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। জৈন সন্ন্যাসী হেমচন্দ্র (জন্ম১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ) আট বছর বয়সে সন্ন্যাসী দেবচন্দ্র কর্তৃক দীক্ষিত হন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গুজরাতে জৈনধর্মের প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্র সোলাঙ্কিরাজবংশের রাজা কুমারপালকে জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। যদিও কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা উত্তরাধিকারী অজয়পাল ছিলেন শৈব। তিনি জৈনদের দমন করেন।

৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মিহিরকুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। জৈনরা তাঁকে জৈনধর্মের শত্রু মনে করেন। কারণ, তিনি জৈনদের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন যে, রাজগৃহের কাছে বৈশালী, নালন্দা ও পুণ্ড্রবর্ধনে অসংখ্য জৈন বাস করতেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক কালে কলিঙ্গকে জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র মনে করতেন।

সিদ্ধসেন দিবাকরের শিষ্য বাপ্পাভট্টি কনৌজের রাজা অমকে (খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী) জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। বাপ্পাভট্টি অমের বন্ধু বাকপতিকেও ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই বাকপতি ছিলেন বিখ্যাত প্রাকৃত *গৌড়বাহ* কাব্যের রচয়িতা।

৫.২.৩.৭ বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশঃ- বৌদ্ধধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবন দর্শন। অনুসারীদের সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশ সহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত। প্রধান অংশটি হচ্ছে হীনযান বা থেরবাদ (সংস্কৃত: স্থবিরবাদ)। দ্বিতীয়টি মহাযান নামে পরিচিত। বজ্রযান বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান, নেপাল, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ও কোরিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাস করেন চীনে। বাংলাদেশের উপজাতীদের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি শাক্য রাজবংশের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে এখনও অনেক ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ৪০০ খৃষ্টপূর্বের কিছু দশক আগে বুদ্ধ মারা গিয়েছিলেন। তাঁর শাক্য-ক্ষত্রিয় বংশের পরিবারগণ ব্রাহ্মণ গোত্রের ছিল, যা তাঁর পরিবার কর্তৃক প্রদানকৃত নাম "গৌতম" দ্বারা নির্দেশিত। উনবিংশ শতাব্দির পন্ডিত এইতেল-এর মতে, সিদ্ধার্থ গৌতমের নাম গৌতম শব্দটি এক ব্রহ্মর্ষি গৌতম থেকে অনুপ্রাণীত। অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, বৌদ্ধ ছিলেন ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরসের বংশধর। উদাহরণস্বরূপঃ পালি মহাভাগ্য অঙ্গিরস গ্রন্থে বুদ্ধকে অঙ্গিরস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যা মূলত গৌতম বুদ্ধ-কে অঙ্গিরস-সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। লেখক এবং ইতিহাসবেত্তা এডওয়ার্ড জে. থমাসও বুদ্ধকে ব্রহ্মর্ষি গৌতম এবং অঙ্গিরসের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধ পরম্পরাগত মতবাদানুযায়ী, সন্ন্যাসী জীবনযাপন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম ভোগপরায়ণতা এবং স্ব-রিপুদমনের একটি সংযমী পথ আবিষ্কার করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মূলত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে যেটি বর্তমানে ভারতের বুদ্ধ গয়ায় বোধি বৃক্ষ হিসেবে পরিচিত। সিদ্ধিলাভের পর থেকে গৌতম বুদ্ধ "সম্যকসমবুদ্ধ" বা "আলোকিত ব্যক্তিত্ব" হিসেবে পরিচয় লাভ করেছিল।

তৎকালীন মগধ রাজ্যের সম্রাট বিম্বিসারের শাসনামলে বৌদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। সম্রাট বিম্বিসার তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয়-বিশ্বাস হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যে অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের আদেশ প্রদান করেছিলেন। আর এই বিহারগুলোই বর্তমান ভারতের বিহার অঙ্গ-রাজ্যের নামকরণে ভূমিকা রেখেছিল।

উত্তর ভারতের বারাণসীর বর্তমান হরিণ-পার্ক নামক জায়গাটিতে বৌদ্ধ তাঁর পাঁচ-সঙ্গীকে প্রথম ধর্মদেশনা প্রদান করেছিল। বুদ্ধ সহ তাঁর এই পাঁচ সন্ন্যাস সহচর মিলে প্রথম সংঘ (ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়) গঠন করেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ-গ্রন্থ অনুযায়ী, প্রাথমিক অনিচ্ছা থাকার সত্ত্বেও গৌতম বুদ্ধ পরে সন্ন্যাসীনিদেরও সংঘের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনিদের "ভিক্ষুণী" হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধের মাসী এবং তাঁর সৎ-মা মহাপজাপতি গোতমী ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম ভিক্ষুণী। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে তিনি ভিক্ষুণী হিসেবে সন্ন্যাস পদ গ্রহণ করেন।

জানা যায়, বুদ্ধ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের বছরগুলোতে ভারতের উত্তরাঞ্চল ও অন্যান্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলগুলোতে পরিভ্রমণ করেন।

বুদ্ধ কুশীনগরের পরিত্যাক্ত এক জঙ্গলে দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

জনশ্রুতিতে শোনা যায় যে, মারা যাওয়ার পূর্বে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রচার করা ধর্মীয়দেশনাই হবে তাদের নেতা যা তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। পূর্ববর্তী অড়হৎরা গৌতমের মুখ-নিঃসৃত বাণীকেই ধর্ম এবং বিনয়ের (শৃঙ্খলা ও সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিয়ম) প্রাথমিক উৎস হিসেবে অভিহিত করেছিল। কিন্তু বাস্তবে বুদ্ধের কোন মুখ-নিঃসৃত বাণীরই হদিস মিলে নি। পালি, সংস্কৃত, চৈনিক ভাষা ও তিব্বতি ভাষায় যে ত্রিপিটক ও ধর্মীয়গ্রন্থগুলো পাওয়া যায় তা মূলত স্থানীয় মানুষদের মৌখিক বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রারম্ভিক সময়

বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত থাকলেও পরে এই প্রাচীন ভূ-খন্ড থেকে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যত্র ছড়িয়ে পরে। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় শাস্ত্রের উৎসগুলো দুইটি ধর্মীয় মহাসঙ্গীতি সংরক্ষণ করেন, যার একটি হলো বুদ্ধের পাঠগত শিক্ষা সংরক্ষণের জন্য সন্ন্যাসী সংঘ ও আরেকটি হলো সংঘের অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতামুলক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ।

১ম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দি)

প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি গঠিত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর অর্থাৎ বুদ্ধের দেহত্যাগের পর। খৃষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে মহাকাশ্যপ নামক বুদ্ধের একজন কাছের শিষ্যের তত্ত্বাবধানে এবং রাজা অজাতশত্রুর সমর্থনে এই প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি গঠিত হয়। এই মহাসঙ্গীতি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণীগুলোকে মতবাদ-সংক্রান্ত শিক্ষায় (তথা সূত্রে) এবং অভিধর্মে রূপান্তরিত করা এবং বৌদ্ধের সন্ন্যাসগত নিয়ামাবলীকে লিপিবদ্ধ করা। এই মহাসঙ্গীতি বৌদ্ধের খুড়তুতো ভাই এবং তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডাকা হয় বুদ্ধের উপদেশ এবং অভিধর্ম আবৃত্তি করার জন্য এবং বুদ্ধের আরেক প্রধান শিষ্য উপালি কে বলা হয় বিনয়ের সূত্রসমূহ পাঠ করার জন্য। এগুলোই মূলত ত্রিপিটকের মূল ভিত্তি হিসেবে পরিচয় লাভ পায় যেগুলো পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়।

তবে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে অভিধর্মের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ নেই। এটি শুধুমাত্র দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির পরই অস্তিত্ব লাভ করে।

২য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (খৃষ্ট-পূর্ব ৪র্থ শতাব্দি)

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বৈশালিতে যেটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম-শৃংখলার বিভিন্ন বিষয়ের শিথিলকরণের বিতর্ক থেকে উত্থান হয়েছিল। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে মূল বিনয় গ্রন্থের সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শিথিলকরণসমূহের কারণগুলো বুদ্ধের শিক্ষার পরিপন্থী হওয়ায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আবির্ভাবের কারণ হয়ে উঠে।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সম্রাট অশোক (২৭৩ - ২৩২ খৃষ্ট-পূর্ব) প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কলিঙ্গ রাজ্যের (বর্তমান ভারতের ওড়িশা প্রদেশ) রক্তাক্ত বিজয়ের পর বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। ভয়াবহ কলিঙ্গ যুদ্ধ যে আতংক ও দুর্বিপাক সৃষ্টি করেছিল, সেইসব বিষয় নিয়ে অনুতপ্ত হয়ে সম্রাট অশোক সহিংসতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং মহানুভবতার সাথে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট কলিঙ্গ রাজ্যের জনগণের দুঃখ দূর্দশাকে সম্মান এবং যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেন। সম্রাট স্তুপ এবং স্তম্ভ নির্মাণের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকার্য শুরু করেন এবং পশু-পাখিদের প্রতি দয়াশীল এবং মানুষের জীবনযাপনকে ধর্মমুখী করার জন্য তাঁর ধর্ম-প্রচারের মাধ্যমে আহ্বান করতে থাকেন। তাঁর নির্মাণকৃত স্তুপগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের অঙ্গরাজ্যে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে অবস্থিত সাঁচী স্তুপ। এটার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল খৃষ্ট-পূর্ব ৩য় শতাব্দীতে এবং পরবর্তীতে এটার নির্মাণ কাজ আরো সম্প্রসারণ করা হয়। এই স্তুপের উৎকীর্ণ ফটক যেটি তোরণ নামে পরিচিত, মূলত ভারতে বৌদ্ধ শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সম্রাট এছাড়াও পুরো দেশ জুড়ে অনেক রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, পান্থশালা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, রাজনীতি নির্বিশেষে সমান আচরণ করতেন।

সম্রাট অশোকের আমলেই বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে ছড়িয়ে পরে । অশোকের স্তম্ভ ও স্তুপ থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্যে সম্রাট তাঁর প্রতিনিধিদের ভারতের দক্ষিণের দিকে শ্রীলংকা পর্যন্ত, পশ্চিমের গ্রীক-সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে প্রতিবেশী গ্রিক-ব্যাক্ট্রিয় রাজ্য এবং সম্ভবত ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

৩য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (খৃষ্ট-পূর্ব ২৫০ অব্দে)

সম্রাট অশোক খৃষ্ট-পূর্ব ২৫০ অব্দে পাটালিপুত্রে (বর্তমান ভারতের বিহার অঙ্গরারাজ্যের রাজধানী পাটনায়) ৩য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আহ্বান করেন। এই ৩য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির তত্ত্বাবধান করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মোগ্গালিপুত্ততিসসা। এই মহাসঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল সংঘের

শুদ্ধিকরণ, বিশেষ করে অ-বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যারা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আকৃষ্ট ছিল। ৩য় মহাসঙ্গীতির মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ মিশনারী পৃথিবীর অন্যত্র প্রচার হতে থাকে।

হেলেনিস্টিক বিশ্ব

অশোকের কিছু স্তম্ভ থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধ বিশ্বাস হেলেনিস্টিক বিশ্বে প্রচারের জন্য তিনি যে কার্য-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা ভারতের সীমানা পেড়িয়ে সুদূর গ্রীস অব্দি ছড়িয়ে পরেছিল। পাশাপাশি অশোকের স্তম্ভ থেকে হেলেনিস্টিক অঞ্চলের তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রাচীন গ্রীকের রাজাদের নাম এবং তাদের রাজ্যের অবস্থান এবং এমনকি কিছু গ্রীক সম্রাট যেমনঃ সেল্যুসিড সাম্রাজ্যের "এন্টিওকাস ২য় থিউওস" (২৬১-২৪৬ খৃষ্ট-পূর্ব), মিশর সাম্রাজ্যের তৎকালীন অধিপতী "টলেমি ২য় ফিলাডেলফোস" (২৮৫-২৪৭ খৃষ্ট-পূর্ব), ম্যাকাডোনিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট "অ্যান্টিগোনাস গোনাটাস" (২৭৬-২৩৯ খৃষ্ট-পূর্ব), সিরেনেইকা (বর্তমান লিবিয়া) সাম্রাজ্যের "মাগাস" (২৮৮-২৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব) এবং এপিরাস (বর্তমান গ্রীসের উত্তর-পশ্চিমাংশ) সাম্রাজ্যের "অ্যালেক্সান্ডার ২য়" (২৭২-২৫৫ খৃষ্ট-পূর্ব) প্রমুখ সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে দাবী করা হয়।

"সীমানা পেরিয়ে, ছয়শত যোজন দূরে (৫,৪০০-৯৬০০ কি.মি.) সেখানেই ধর্মের বিজয় সাধিত হয়েছে যেখানে গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিওকোস, টলেমি, অ্যান্টিগোনোস, মাগাস এবং অ্যালেক্সান্ডার এবং দক্ষিণে চোল সাম্রাজ্য, পান্ড রাজবংশ, তাম্রপার্নি (বর্তমান শ্রী-লঙ্কা) শাসন বিস্তৃত"। (ত্রয়োদশ শতাব্দির শিলালিপিতে পাওয়া অশোকের অনুশাসন)

পালি সূত্র থেকে আরো জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের কিছু প্রতিনিধিরা গ্রীক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন যারা দুই উপমহাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখতেনঃ

অশোক এছাড়াও গ্রীক এবং আর্মাইক ভাষায় তাঁর ধর্ম-স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন যেগুলো আফগানিস্তানের কান্দাহারে পাওয়া গিয়েছিল। গ্রীক সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য তিনি গ্রীক শব্দ "eusebeia" কে ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেনঃ

শ্রীলংকা ও বার্মায় বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ

শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারিত হয়েছিল খৃষ্ট-পূর্ব ৩য় অব্দে, সম্রাট অশোক পুত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু মাহিন্দ ও তাঁর ছয় সহচরের সহায়তায়। তাঁরা শ্রীলংকার তৎকালীন রাজা দেবানাপিয়া টিস্সা ও রাজ্যের আরো অভিজাত শ্রেণীর লোকদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাশাপাশি সম্রাট অশোকের মেয়ে সংঘমিত্রাও শ্রীলংকায় মেয়ে-সন্ন্যাসীন্নিদের প্রথা চালু করেন। এছাড়াও অশোক তনয়া তাঁর সাথে একটি বোধি বৃক্ষের চারা গাছও নিয়ে এসেছিলেন এবং সেটি শ্রীলঙ্কা অনুরাধাপুরাতে রোপণ করেছিলেন। সেখানেই মূলত মহাবিহার নামক সিংহলিদের প্রাচীন মঠ অবস্থিত। মূলত শ্রীলংকায় পালি ভাষায় ধর্ম-সূত্রগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল রাজা ভট্টগমনীর শাসনামলে (২৯-১৭ খৃষ্ট-পূর্ব) এবং থেরবাদ ভক্তি আন্দোলন মূলত সেখানে থেকেই বিকশিত হয়েছিল। বুদ্ধঘোষ (৪র্থ ও ৫ম শতাব্দি) ও ধর্মপালের (৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দি) মতো অনেক প্রখ্যাত বুদ্ধ সন্ন্যাসী থেরবাদ ভক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল এবং তারা এই মতাদর্শের অনেক নিয়মাবলীও প্রণয়ন করেছিল। যদিও মহাযান বৌদ্ধ শাখা শ্রীলংকায় বেশ অনেক সময় অব্দি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তথাপি শ্রীলংকায় পরবর্তীতে থেরবাদ-ই স্থায়ী হয় এবং এটি এখনও পালন করা হয়। শ্রীলংকা থেকে পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম একাদশ শতাব্দিতে ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাকি দেশগুলোতে প্রচার হতে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের একেবারে পূর্বে বার্মা ও থাইল্যান্ডের মানুষজনদের মাঝেও বৌদ্ধ ধর্মের দরুণ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বৌদ্ধ ধর্মের দুই শাখা মহাযান ও হীনযান বিভক্তির পূর্বে খৃষ্ট-পূর্ব ৪র্থ শতাব্দিতে থাইল্যান্ড ও বার্মার লোকেরা সম্রাট অশোকের শাসনামলে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। খৃষ্ট-পূর্ব ১ম থেকে ৫ম শতাব্দিতে নির্মিত মধ্য মিয়ানমারে অবস্থিত প্রাচীন বার্মিজ বুদ্ধ মন্দির "পেইকথানো" হলো মিয়ানমারে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন।

থাইল্যান্ড ও বার্মায় যে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় তা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের গুপ্ত সাম্রাজ্যের চিত্র শিল্প কর্তৃক প্রভাবিত। পাশাপাশি তাদের বিশেষ শিল্প ধারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আরো ছড়িয়ে পরে যখন ৫ম থেকে ৮ম শতাব্দিতে মোন গোত্রের লোকদের (থাইল্যান্ড ও বার্মিজ মানুষ) সাম্রাজ্য আরো বিস্তার লাভ করে। খৃষ্ট-পরবর্তী ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে মহাযান শাখা প্রভাব বিস্তারের পূর্বে থেরবাদ বিশ্বাস মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তরাংশে মোন জাতিগোষ্ঠীর কারণেই আরো বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। অশোকাবদান(খৃষ্টপরবর্তী ২য় শতাব্দি) থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক উত্তরে হিমালয়ের দিকেও একটি বৌদ্ধ মিশনারী প্রেরণ করেন যারা খোতান, তারিম বাসিন, ইন্দো ইউরোপীয়ভাষাভাষি তুষারি লোকদের মাঝেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন।

শুঙ্গ রাজবংশের উত্থান (খৃষ্টপূর্ব ২য় - ১ম অব্দ)

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর ৫০ বছর পর শুঙ্গ রাজবংশ (১৮৫-৭৩ খৃষ্টপূর্ব) ১৮৫ খৃষ্টপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ মৌর্য্য কে হত্যার মধ্য দিয়ে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসন আরোহণ করেন। অশোকাবদানের মতো বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন এবং বৌদ্ধ-বিশ্বাসীরা তাঁর শাসনামলে নির্যাতিত হয়েছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে আরো উল্লেখ আছে যে, তিনি শত শত বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছিলেন এবং হাজারের উপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছিলেন। ৮,৪০,০০০ বুদ্ধ-স্তুপ যা সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল, তা রাজা পুষ্যমিত্র ধ্বংস করে ফেলেন এবং প্রত্যকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাথার বিনিময়ে তিনি ১০০টি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের পুরষ্কার ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি অন্যান্য বৌদ্ধ সূত্রগুলো আরো দাবী করে যে, রাজা পুষ্যমিত্র নালন্দা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও মথুরার মতো স্থানগুলোতে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারগুলোকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমানের নিরিখে উপরিউক্ত তথ্যগুলোর সাথে তাদের মতবিরোধ প্রকাশ করেন। তাদের মতামত অনুযায়ী, অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার দরুণ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-প্রসারে ভাটা পরেছিল ঠিক, কিন্তু পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সক্রিয় নির্যাতনের প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া যায় নি।

সেই সময় পুষ্যমিত্রের শাসনামলে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গাঙ্গেয় উপত্যকা ছেড়ে কেউ কেউ উত্তরের দিকে আর কেউ বা দক্ষিণের দিকে যাত্রা করেন। বিপরীতক্রমে, বৌদ্ধ শিল্প মগধ রাজ্যে বিকশিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং মগধ ছেড়ে তা উত্তর পশ্চিমাংশের গান্ধার ও মথুরাতে এবং দক্ষিণ-পূর্বের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অমরাবতীতে বিকাশ লাভ করে। এছাড়াও কিছু বৌদ্ধ শিল্প পুষ্যমিত্রের শাসনামলে মধ্য ভারতের ভারহুত অঞ্চলেও বিকশিত হয়েছিল।

গ্রেকো-বৌদ্ধ আন্তঃক্রিয়া (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দি - খৃষ্টপরবর্তী ১ম শতাব্দি)

রেশম পথ (সিল্ক রোড) সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে গঠিত আন্তঃসড়ক মূলত আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে সম্রাট আলেক্সান্ডারের বিজয়ের পর থেকেই গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। প্রথমে ছিল সেল্যুসিড সাম্রাজ্যযার আনুমানিক সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে, তারপর গ্রিক-ব্যাক্ট্রিয় রাজ্য যার সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দ, এবং সর্বশেষে ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্য যা খৃষ্টপূর্ব ১০ শতাব্দির আগ পর্যন্ত টিকে ছিল।

গ্রিক-ব্যাক্ট্রিয় রাজ্যের রাজা ব্যাক্ট্রিয়ার প্রথম দেমেত্রিওস ১৮০ খৃষ্টপূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ করে ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আক্রমণের পরেই ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম আবার বিকশিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে কারণ হিসেবে পাওয়া যায় যে, মৌর্য্য সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং শুঙ্গ রাজবংশের নির্যাতন থেকে বৌদ্ধদের রক্ষার জন্যই এই আক্রমণ করা হয়। ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজা ছিল প্রথম মেনান্দ্রোস সোতের (১৬০-১৩৫ খৃষ্টপূর্ব) যিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মহাযান বৌদ্ধ শাখায় তাকে বৌদ্ধ ধর্মের হিতকারি হিসেবে সম্রাট অশোক ও সম্রাট কণিষ্কের সমতুল্য হিসেবে অভিহিত করেন। মেনাদ্রোসের শাসনামলে তার রাজ্যের মুদ্রায় তাকে "পরিত্রাণকারি রাজা" হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং কিছু মুদ্রায় আটটি কাঁটা বিশিষ্ট ধর্ম-চক্রেরও হদিস পাওয়া যায়। এছাড়া মিলিন্দপঞ্হ এর মতো বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থেও সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়ার হদিস পাওয়া যায় যেখানে মহারাজ মেনান্দ্রোস ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের (যিনি ছিলেন গ্রীক বৌদ্ধ-ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিতার শিষ্য) মধ্যে কথোপকথনের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা মেনান্দ্রোসের মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ তাঁর শাসনকৃত শহরে অবস্থিত স্তুপগুলোতে তাঁর সম্মানার্থে সংরক্ষণ করা হয়। মেনান্দ্রোসের অন্যান্য উত্তরসূরীগণ তাদের শাসনামলে মূদ্রায় খরোষ্ঠী লিপিতে ধর্মদেশনা লিপিবদ্ধ করেন এবং মুদ্রা সঙ্গীতে তাদের নিজ নিজ গুণাবলী বর্ণনা করেন।

বুদ্ধের প্রথম নরত্বারোপমূলক উপস্থাপনার বা মূর্তির হদিস পাওয়া যায় গ্রীক-বৌদ্ধ শাসনামলে। বুদ্ধের নরত্বারোপমূলক উপস্থাপনার প্রতি অনীহা মূলত বুদ্ধের বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত যেটি দিঘা নিকায়ার মতো বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে, যেখানে বুদ্ধ বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাকে যেন কোন রূপ মূর্তি বানিয়ে বা চিত্র এঁকে উপস্থাপন করা না হয়। এসব বিধি-নিষেধে পালনে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না করে এবং সম্ভবত তাদের পূর্ববর্তী সংস্কৃতির প্রভাবের বশীভূত হয়েই গ্রীকরা প্রথম বৌদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রীকরা বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে দেব-দেবী সমূহের রূপায়ন করেছিলেন তা কালক্রমে বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষদের মাঝে সাধারণ ধর্মীয় অনুশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠে। এটির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বিভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা দেবতা স্যারাপিসের রূপায়ণ যা টলেমি প্রথম এর শাসনামলে মিশরে পরিচয় লাভ পায় যা মূলত গ্রীক ও মিশরীয়, উভয় ঈশ্বরদেরই সমন্বয়ের ফলস্বরূপ। তাই ভারতের মতো স্থানে গ্রীকদের একটি মহাপুরুষের রূপায়ণ প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার যা তাঁরা করেছিল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের সূর্য দেবতা অ্যাপোলো অথবা ইন্দো--গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাক্ট্রিয়ার প্রথম দেমেত্রিওস এর শারীরিক গঠন থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে, যা পরবর্তীতে গ্রীকরা বুদ্ধের ভৌত-বৈশিষ্ট্য গঠনে প্রতিফলন করেন। মূলত দুই কাঁধ ঢেকে বুদ্ধের কাপড়ের পরিহিত অবস্থায় যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই তা প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাম্রাজ্যে পরিহিত এক ধরনের গ্রীক ঐতিহ্যগত পোশাক

টোগা ও হিমাশনের সমতুল্য বলে অনেক ইতিহাসবেত্তাগণ মনে করেন। এছাড়া বুদ্ধের কোঁকাড়ানো চুল এবং উষ্ণীষ (মাথার উপর ডিম্বাকৃতি চুলের ঝুঁটি) মূলত ভাস্কর্য বেলভেদের অ্যাপোলো এর অনুকরণে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভারত ও হেলেনিস্টিক শাসনামলে নির্মিত বুদ্ধের ভাস্কর্য সমূহের একটি বড় অংশই আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের গান্ধার অঞ্চলের হাড্ডা নামক জায়গাটিতে মাটি খুঁড়ে ভাস্কর্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

এছাড়াও গ্রীক-বৌদ্ধ শাসনামলে আন্তঃসাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয় গ্রীক ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিত কে যিনি জাতিতে ছিলেন গ্রীক এবং মহাবংশ গ্রন্থের ২৯তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে রাজা মেনান্দ্রোস প্রথমের শাসনামলে (খৃষ্টপূর্ব ১৬৫-খৃষ্টপূর্ব ১৩৫) ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিতের অধীনে গ্রীক ঔপনিবেশিক শহর আলাসান্দ্রা (যা বর্তমানে ১৫০ কি.মি. জায়গা জুড়ে কাবুলের উত্তরে অবস্থিত) থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ এর মতো তাঁর বৌদ্ধ শিষ্য ছিল, যা ছিল মূলত সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের অবদান হিসেবে দেখা হয়।

মহাযানের উত্থান (খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দি - খৃষ্ট-পরবর্তী ২য় শতাব্দি)

বেশ কয়েকজন পন্ডিতদের মতে, ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় বসবাসরত মহাসাংঘিক নামক এক প্রাচীন আদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের আবির্ভাব হয়েছিল যা প্রাচীন মহাযানের সূত্রগুলোর মধ্যে একটি।

প্রাচীন মহাযান সূত্র হতে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের প্রথম দিককার সংস্করণের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে অক্ষোভ্য বুদ্ধের পরিচয় মিলে, যেটি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই রচিত হয়েছিল। এছাড়া বিখ্যাত ভারতবিদ্যা-বিশারদ এ.কে. ওয়ার্ডও এই অভিমত ব্যাক্ত করেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখার উত্থান দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের তৎকালীন অন্ধ্রদেশেই উত্থান ঘটেছিল। পন্ডিত অ্যান্থোনি বার্বার ও শ্রী পদ্মও একই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নাগার্জুন, দিগ্নাগ, চন্দ্রকীর্তি, আর্যদেব, ভাববিবেক-এর মতো যেসব বৌদ্ধ পন্ডিতরা মহাযানশাখায় ভূমিকা রেখেছিল, তাদের সবারই বসবাস ছিল বর্তমান দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে। আর মহাযান শাখার উত্থানের জায়গাগুলো মূলত অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা উপত্যকার নিচু ভূমি সম্বলিত গুন্টুর জেলার অমরাবতী, নাগার্জুনকোন্ডা, জগ্গয়াপেতা-এর মতো অঞ্চলে অবস্থিত।

কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্রাট কণিষ্কের তত্ত্বাবধানে চতুর্থ মহাসঙ্গীতির আয়জন হয়, সেটি বর্তমানে কাশ্মীরের জলান্ধার নামক জায়গা। থেরবাদ বৌদ্ধ শাখা প্রায় ৪০০ বছর আগে শ্রীলঙ্কাতে পালি ভাষায় তাদের চতুর্থ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেছিল। তাই চতুর্থ মহাসঙ্গীতি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যার চারভাগের দুই ভাগ শ্রীলংকাতে আর বাকি দুই ভাগ কাশ্মীরে।

অভিধর্ম নামক বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে এটা জানা যায় যে, সম্রাট কণিষ্ক বসুমিত্রের নেতৃত্বে ৫০০ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা এই চতুর্থ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেন। সেখান থেকে জানা যায় যে, সেই মহাসঙ্গীতিতে তিন লক্ষ শ্লোক এবং নয় মিলিয়ন বক্তব্য সংরক্ষণ করা হয়। এই মহাসঙ্গীতির ফলে সবচেয়ে যে বড় ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো, "মহা-বিভাষা" নামক গ্রন্থের সংকলন এবং "সর্বাস্তিবধিন অভিধর্মের" সারসংক্ষেপণ রচনা।

বিভিন্ন ভাষাবিদরা এটাও অভিমত করেন যে, এই মহাসঙ্গীতির ফলে "সর্বাস্তিবধিন অভিধর্ম" গ্রন্থের ভাষারূপের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যেখানে প্রাকৃত ভাষা থেকে এটিকে সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছিল। ভাষারূপের পরিবর্তন সাধিত হলেও ধর্মীয়-গ্রন্থটির মূল উপজীব্য হারিয়ে যায় নি। এছাড়াও তৎকালীন ভারতে উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ভাষা সংস্কৃত হওয়ায়, সর্বাস্তিবধিন অভিধর্ম গ্রন্থটি ভাষা রূপান্তরে আলাদা তাৎপর্য পায়। আর এইভাবে ভাষারূপের পরিবর্তন সাধন করে সর্বাস্তিবধিন অভিধর্ম গ্রন্থটি ভারতের বহু চিন্তাবিদ ও মানুষদের মধ্যে পাঠক-প্রিয়তা অর্জন করে। আর ঠিক এই কারণেই বহু বৌদ্ধ পন্ডিতদের মধ্যে তাদের অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থের শ্লোক ও বক্তব্যগুলো সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার ঝোঁক বেড়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের অন্যান্য শাখা ধর্মী-গ্রন্থ অনুবাদে ব্যস্থ হয় পরলেও থেরবাদ শাখা কিন্তু সে দিকে পা বাড়ায় নি। কারণ জীবিত অবস্থায় বৌদ্ধ স্পষ্টভাবে বারণ করে গিয়েছিল, তার দেয়া বাণীসমূহ কোন বিশেষ ধর্মের উচ্চমার্গের ভাষায় যেন লিপিবদ্ধ করা না হয়; বরং তা যেন কোন স্থানীয় নিচুমার্গের ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এতো কিছুর পরেও থেরবাদ শাখায় ধর্মীয়-গ্রন্থগুলো যে নিচু-শ্রেণীর যে পালি ভাষায়রচিত হয়েছিল, সেই পালি ভাষা কালক্রমে উচ্চ-শ্রেণীর মানুষের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মহাযান শাখার পরিব্যপ্তি (খৃষ্টপরবর্তী ১ম থেকে ১১শ শতাব্দি)

কিছু শতাব্দির মধ্যেই, বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা বিকশিত হতে থাকে এবং তা ভারত থেকে ছাড়িয়ে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়াএবং সর্বশেষ খৃষ্ট-পরবর্তী ৫৩৮ সালে জাপানে এবং ৭ম শতাব্দিতে তিব্বতে প্রচারিত হতে থাকে।

কুষাণ সাম্রাজ্যের সমাপ্তির পর বৌদ্ধ ধর্ম গুপ্ত সাম্রাজ্যে (খৃষ্ট-পরবর্তী ৪র্থ থেকে - ৫ম শতাব্দি) বিকশিত হতে থাকে। সেই সময় ভারতের বর্তমান বিহার প্রদেশের নালন্দায় মহাযান শাখার অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত মহাযান শাখার এই বৌদ্ধ-অধ্যয়ন

কেন্দ্রটি বহু শতাব্দি ধরে বৃহত্তর ও প্রভাবশালী বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত ছিল এবং নাগার্জুনের মতো বৌদ্ধ পন্ডিত ছিল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। গুপ্ত সাম্রাজ্যে বিকশিত বৌদ্ধ-শিল্পকলা পরবর্তীতে সুদূর চীন দেশেকেও প্রভাবিত করেছিল।

হুন জাতির আক্রমণ এবং মিহিরকূলের অত্যাচারের পর থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দূর্বল হয়ে পড়ে।সপ্তমশতাব্দীতে ভারত ভ্রমণের সময় বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক ও অনুবাদক হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম সেই সময় অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, বিজয়ওয়াড়া তথা সমস্ত দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তিনি নেপালে জনমানবশূণ্য বৌদ্ধ-স্তুপের বর্ণনা ও গৌড় রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ নিপীড়নের কথা উল্লেখ করলেও, সেই একই সময়কালীন সময়ে রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ভূয়শী প্রশংসা করেন। হর্ষবর্ধনের শাসনামলের সমাপ্তির পর অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান ঘটে যা পরবর্তীতে গাঙ্গেয়ত্রেয় উপত্যকায় রাজপুত জাতির উত্থান ঘটায় এবং বৌদ্ধ-রাজবংশেরও সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্যের উত্থানের পর থেকে বৌদ্ধ-রাজবংশ পুনরায় তাদের গৌরব ফিরে পায়। হিন্দু সেন রাজবংশ কর্তৃক পাল রাজ্য আক্রমণের আগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম পাল সাম্রাজ্যের অধীনে বিকশিত হয়ে বাংলা অঞ্চল হতে ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দি পর্যন্ত সিক্কিম, ভূটান এবং তিব্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে। পাল রাজবংশের শাসনামলে বহু মন্দির ও বৌদ্ধ-শিল্পকলা বিকশিত হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ্গ আরও উল্লেখ করেন যে, তার পরিভ্রমণের সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্ম ও জৈন ধর্মে ধর্মান্তরীত হতে দেখেছেন। কেননা দশম শতাব্দিতে পাল রাজবংশের পরাজয় ও বৈষ্ণবীয় মতবাদ উত্থানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হতে থাকে।

উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটেছিল, যখন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কি আক্রমণকারি ও মুসলিম যোদ্ধা বখতিয়ার খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিকে বিহারে মুসলিম শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পর থেকে মধ্য ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হতে থাকে এবং অনেক বৌদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসীরা সেই সময় ভারতের একেবারে উত্তরের দিকে অর্থাৎ হিমালয়ার অঞ্চলগুলোতে এবং একেবারে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কার দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে। পাশাপাশি ভারতবর্ষে সেই সময় অদ্বৈত মতবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের পুনরুত্থানের এবং সুফিবাদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়।

৫.২.৩.৮ বৈষ্ণবধর্মঃ- বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখাসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে বিষ্ণু বা তাঁর অবতারগণ (মুখ্যত রাম ও কৃষ্ণ) আদি তথা সর্বোচ্চ ঈশ্বর রূপে পূজিত হন। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে, বিশেষত ভক্তি ও ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে, বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি উপনিষদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বেদ ও অন্যান্য পৌরাণিক শাস্ত্র। যথা – ভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ।

বৈষ্ণবধর্মের অনুগামীদের *বৈষ্ণব* নামে অভিহিত করা হয়। বৈষ্ণবরা হিন্দু সমাজের অন্যতম বৃহৎ অংশ। এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস ভারতে। তবে সাম্প্রতিককালে ধর্মসচেতনতা, স্বীকৃতি ও ধর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরেও বৈষ্ণবদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখাটি। মুখ্যত ইসকন হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের প্রচারগত ও ভৌগোলিক প্রসার ঘটিয়ে এই কাজটি সম্পাদন করছে। এছাড়াও অতি সম্প্রতি অন্যান্য বৈষ্ণব সংগঠনও পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেছে।

ভাগবতধর্ম, আদি রামধর্ম ও কৃষ্ণধর্মের মিলন ঘটেছে ঐতিহাসিক বিষ্ণুধর্মে। ঐতিহাসিক বিষ্ণুধর্ম আবার ঐতিহাসিক বৈদিকধর্মের একটি অঙ্গ। বিষ্ণু পূজার প্রাধান্য অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলি থেকে পৃথক করেছিল ঐতিহাসিক বিষ্ণুধর্মকে। বিষ্ণুধর্মের আকারেই ভারতে সর্বপ্রথম বৈষ্ণব ধর্মমতের চর্চা শুরু হয়। এককথায় বিষ্ণুধর্ম ছিল ভারতের প্রথম দেশজ সম্প্রদায়গত ধর্মমত। এই ধর্মমতে বিষ্ণুকে সকল অবতারের উৎসস্বরূপ বলে স্বীকার করে নেওয়া হলেও, বিষ্ণু নামটি কেবলমাত্র সর্বোচ্চ দেবতা অনেকগুলি নামের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। তাঁর অন্যান্য নামগুলি হল নারায়ণ, বাসুদেব ও কৃষ্ণ। প্রত্যেকটি নামের সঙ্গে স্বকীয় দিব্য বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হয়; যেগুলিকে বৈষ্ণব ধর্মের সংশ্লিষ্ট উপসম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষ্ণধর্ম বৈষ্ণবধর্মেরই একটি শাখা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য সম্প্রদায় কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বা স্বয়ং ভগবান মনে করে। কিন্তু বিষ্ণু মতের অনুগামীরা তা স্বীকার করেন না।

বৈষ্ণবধর্মের বিষ্ণুকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলি বিষ্ণু বা নারায়ণকে সর্বোচ্চ দেবতা মনে করে। আবার বল্লভ সম্প্রদায় বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো কৃষ্ণকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলি কৃষ্ণকেই সর্বোচ্চ দেবতা তথা সকল অবতারের উৎস মনে করে। বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসটির মূল ভিত্তি পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর নানা অবতারের উপাখ্যান। এই সকল উপাখ্যানে তাঁর সঙ্গে গণেশ, সূর্য, দুর্গা প্রমুখ দেবতার পার্থক্য প্রতিপাদন করে তাঁদের উপদেবতার পর্যায়ে পর্যবসিত করা হয়েছে। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুসারে, হিন্দু ত্রিমূর্তিরঅন্যতম

দেবতা শিব হলেন বিষ্ণুর অনুগত ভক্ত এবং স্বয়ং এক বৈষ্ণব। স্বামীনারায়ণ হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীনারায়ণ এই মতের বিরোধী। তাঁর মতে, শিব ও বিষ্ণু একই ঈশ্বরের দুই পৃথক সত্ত্বা। তবে উল্লেখ্য, স্বামীনারায়ণের মতবাদ বৈষ্ণবদের একটি সংখ্যালঘু অংশের মত।

বৈষ্ণব দর্শনের মূলভিত্তি হিন্দুধর্মের কয়েকটি কেন্দ্রীয় ধর্মমত; যথা: বহুদেববাদ, পুনর্জন্ম, সংসার, কর্ম এবং বিভিন্ন যোগশাস্ত্র। তবে ভক্তিযোগের পথে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির প্রতিই এই ধর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ভক্তির অঙ্গ হল বিষ্ণুর নামগান (ভজন ও কীর্তন), তাঁর রূপচিন্তন (ধারণা) এবং দেবপূজা। দেবপূজার তত্ত্ব ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে পঞ্চরাত্র ও বিভিন্ন সংহিতায়।

পূজার মাধ্যমে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে তাঁদের অন্তরে অধিষ্ঠিতরূপে কল্পনা করেন। এই রূপে তাঁরা তাঁদের সত্তার উৎস ঈশ্বরকে অন্তর্যামী নামে অভিহিত করেন। এই নামটি নারায়ণনামের সংজ্ঞার একটি অংশ। হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখাসম্প্রদায়ের জীবনের উদ্দেশ্য যেখানে মোক্ষ লাভ বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে মিলন, সেখানে বৈষ্ণবদের জীবনের উদ্দেশ্য বিষ্ণু বা তাঁর কোনো অবতারের সেবায় মায়াময় জগতের বাইরে 'বৈকুণ্ঠধামে' অনন্ত আনন্দময় এক জীবনযাপন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে বৈষ্ণবদের সর্বোচ্চ সত্ত্বার তিন বৈশিষ্ট্য – ব্রহ্মণ, পরমাত্মা ও ভগবান – অর্থাৎ, যথাক্রমে, *বিশ্বময় বিষ্ণু*, *হৃদয়যামী বিষ্ণু* ও *ব্যক্তিরূপী বিষ্ণু*।

৫.২.৩.৯ ভক্তিবাদের সূচনা ও বিকাশ

প্রেক্ষাপট:- ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রসারের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয় । হিন্দুরা অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । ধর্মান্তরকরণের কাজ অবশ্য ধীরে ধীরে চলছিল । তবুও ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান । এই ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া হয়তো হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন করেনি, তবুও এই প্রক্রিয়া হিন্দুদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । আত্মরক্ষা ও সমালোচনার প্রযোজন অনুভূত হয়েছিল । হিন্দুধর্ম ও সমাজের কিছু কুপ্রথা ও রীতিনীতি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল । অন্যদিকে ইসলামের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রাতৃত্ববোধ হিন্দুদের গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল । ফলে হিন্দুদের মধ্যে এক উদারনৈতিক ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হয় । বিভিন্ন ধর্ম প্রচারক জনগণের মধ্যে প্রেম, মৈত্রী, ভালোবাসা ও ভক্তির বাণী প্রচার করতে থাকেন । এই ধর্ম আন্দোলনই ভক্তিবাদ নামে পরিচিত । এইসব ধর্মপ্রচারক প্রচার করেন যে, সমস্ত ধর্মই সমান ও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । অত্যধিক প্রথা সর্বস্ব আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জীবে প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি অখন্ড ভক্তি ও শ্রদ্ধাই মুক্তির পথ বলে তাঁরা মনে করতেন । তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে তার কাজের উপর, জন্মের উপর নয় ।

ভক্তিবাদের লক্ষ্য ও আদর্শ:- ভক্তিবাদের মূল কথা হল ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির মিলন ও অধ্যাত্মবাদ । মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেও ঈশ্বর বা বুদ্ধ-আরাধনার আদর্শ উচ্চারিত হয়েছে । গুপ্ত যুগে রামায়ণ ও মহাভারত নতুন করে রচিত হওয়ায় তখন জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে ভক্তিকেও আত্মার মুক্তির পথ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল । সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ভক্তিবাদের পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল । সেখানে বলা হয়েছিল ঈশ্বর ভক্তিই মুক্তির পথ । জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা দূর করে ঈশ্বরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল । কাজেই ভক্তিবাদের আদর্শ সুলতানি সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের আগেই প্রচলিত ছিল । তবে ইসলামের সংস্পর্শে আসার ফলে ভক্তিবাদ এক নতুন মাত্রা পায় । চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভক্তিবাদের প্রসার তার সাক্ষ্য দেয় । ইসলামের মানবতাবাদ, সুফি মতাদর্শ ও ভ্রাতৃত্ববোধ হিন্দুদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল । বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক এই সময়ে ভক্তিবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিল ।

ভক্তি আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব:-

(১) ভক্তিবাদের প্রবক্তারা উঠে এসেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে । এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কারিগর সম্প্রদায়ের মানুষ অথবা মাঝারি শ্রেণির কৃষক পরিবারের সন্তান । কোনো কোনো ব্রাহ্মণ ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাধারণভাবে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ।

(২) ভক্তিবাদ হিন্দু ও মুসলমান জনগণকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে । অনেকে মনে করেন, এর প্রভাব ছিল সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ । হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যথেষ্ট গোঁড়ামি ছিল । এর ফলে জাতিভেদ প্রথায় কোনো বড় ধরনের ফাটল দেখা দেয়নি । কালক্রমে কবিরের অনুগামীরা কবিরপন্থী নামে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয় । নানকের আদর্শ শিখ ধর্মের জন্ম দেয় । কাজেই ভক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতেই হবে ।

(৩) কিন্তু এর সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়নি । এর প্রবক্তাগণ যে মানবতাবোধ ও ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, তা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামির উপর একটা বড় আঘাত হেনেছিল । পরবর্তী কয়েক শতকেও এর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল ।

সূফী মতবাদ

খ্রীস্টীয় নবম–দশম শতকে ইসলাম ধর্মের মধ্যে একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন ‘সুফি আন্দোলন’ নামে পরিচিত। যারা সুফ বা পশমের বস্ত্র পরিধান করে তাদেরকেই সুফি বলা হয়। অর্থাৎ, সুফি কথাটির সঙ্গে ‘সাফা’ বা পবিত্রতা ও ‘সাফ’ বা অবস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। সুফি মতাদর্শের উদ্ভবের পিছনে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বগুলির মধ্যেও আবার স্ববিরোধ আছে। সুফি মতাদর্শের উপর যোগ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। সুলতানি সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যের উন্মাদনা এবং তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন লক্ষ্য করে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান মর্মাহত হন। তাঁরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে মনস্থ করেন। এঁদের অনেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার বন্ধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁদের চিন্তাধারা গোঁড়া মুসলমানদের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা সুফিদের ইসলাম বিরোধী বলে মনে করেন। ফলে সুফিরা ক্রমশ নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নির্জনে ধর্মচর্চা করতে শুরু করেন। এঁরা একজন পীর বা শেখের অধীনে একটি ধর্ম সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের সদস্যদের বলা হত **ফকির** বা **দরবেশ**। এঁরা ঈশ্বরে একাত্ম হয়ে নিভৃতে ধর্ম সাধনা করতেন।

সুফিদের মূলতত্ত্ব:- সুফিরা মনে করতেন প্রেম ও ভক্তিই ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র পথ। এর জন্য কোনো আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুশাসন অপরিহার্য নয়। তাঁদের মতে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যই হল মুক্তির একমাত্র পথ। আসক্তি থেকে আসে পাপ এবং পাপের অর্থ ক্লেশ। আত্মার শুদ্ধিকরণের জন্য সাধনা ও ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সর্বধর্মসমন্বয়, জীবে প্রেম ও সম্প্রীতি ছিল সুফিদের আদর্শ। ভারতবর্ষে সুফিরা ইসলামের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাঁরা মনে করতেন, উলেমারা কোরানের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন এবং ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাছেন। উলেমারাও সুফিদের উদার আদর্শবাদ সহ্য করতে পারতেন না। সুফিরা কিন্তু কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেননি। বরং তাঁরা আশা করতেন একদিন সেইদিন আসবে, যেদিন আল্লাহ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ইসলামের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

বিভিন্ন সুফি সম্প্রদায়:- ভারতবর্ষে সুফিদের প্রধানত তিনটি সম্প্রদায় প্রভাবশালী ছিল– দিল্লী ও দোয়াব অঞ্চলে **চিশতি** ; সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে **সুরাবর্দি** এবং বিহারে **ফিরদৌসি**।

(১) চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা মইনউদ্দিন চিশতি। তিনি মহম্মদ ঘুরির সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আসেন ও আজমিরে বসবাস করতেন। চিশতি সাধকদের মধ্যে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নাম সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবি আমির খসরু ও ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরানি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

(২) সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের সুফিরা পাঞ্জাব, মুলতান ও বাংলায় প্রভাবশালী ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে শেখ শিহাবউদ্দিন সুরাবর্দি ও হামিদউদ্দিন নাগরি ছিলেন প্রধান। এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা চিশতিদের মতো দারিদ্র ও কৃচ্ছ সাধনের জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। সন্ন্যাসীর জীবনও এদের লক্ষ্য ছিল না। এঁরা রাষ্ট্রের অধীনে ধর্মীয় উচ্চপদ গ্রহণ করতেন।

সুফিদের প্রভাব:- সুফিদের ধার্মিক ও অনাড়ম্বর জীবন, ঈশ্বর ভক্তি এবং নির্জনে সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগত ব্যবধান কিছুটা লুপ্ত করতে এরা সক্ষম হয়েছিল। ইসলামের সাম্যের আদর্শে উলেমাদের চেয়ে সুফিরা বেশী জোর দিতেন বলে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ বিশেষত কৃষক ও কারিগরেরা সুফিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা সমাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতেন বলে সমাজে তাঁদের কোন প্রভাব পড়েনি।

সুফিবাদ ও ভক্তিবাদের মিল ও অমিল;- সুফি মতবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে অনেক বিষয়েই মিল ছিল।

(১) ঈশ্বরের আত্মনিবেদন ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন উভয় আদর্শেই স্বীকৃত ছিল।

(২) উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করত যে গুরু অথবা পিরের সাহচর্য আত্মার মুক্তির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক।

এই মিলের পাশাপাশি কিছু অমিলও এদের মধ্যে ছিল।

(১) সুফিদের ‘মিস্টিক’ বা মরমিয়া আদর্শ ভক্তিবাদী সাধকদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করতে পারেনি।

(২) ভক্তিবাদী সাধকেরা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। বরং তারা চেয়েছিলেন সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁদের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে।

শিখধর্ম

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের কাছে তালবন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষরী পরিবারের সন্তান নানক ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী, চিন্তাশীল এবং সাধু ও সন্তদের কাছ উপদেশ নিতে ভালোবাসতেন। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে গৃহত্যাগ করেন, প্রিয় শিষ্য মর্দনকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ও বিদেশে যান, সিংহল, মক্কা ও মদিনায় তিনি গিয়েছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর বহু শিষ্য হয়েছিল। কবীরের মতো নানক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে। তবে ঈশ্বর পেতে হলে চারিত্রিক শুদ্ধির প্রয়োজন, গুরু শিষ্যকে পথ দেখাবেন। তিনি কবীরের মতো মূর্তিপূজা, তীর্থভ্রমণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করেননি। তিনি মনে করেন যে গৃহীধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো বিরোধ নেই।

নানক নতুন ধর্মমত স্থাপন করতে চাননি, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। শান্তি, শুভেচ্ছা, মিলন হলো তাঁর ধর্মীয় আদর্শ। তিনি কবীরের মতো মানুষের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। শাসকদের তিনি মনে করেন অধার্মিক অপশাসক। তিনি যে রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন তার শীর্ষে থাকবেন একজন দার্শনিক রাজা, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সাম্য হবে তাঁর রাষ্ট্রনীতি।

সংস্কৃত ভাষায় 'গুরু' শব্দের অর্থ শিক্ষক, সহায়ক বা উপদেশদাতা। ১৪৬৯ থেকে ১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দশ জন নির্দিষ্ট শিখ গুরু শিখধর্মের প্রথা ও দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক গুরু পূর্বতন গুরুর শিক্ষার সঙ্গে নতুন কথা যোগ করেন এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করেন। এর ফলে শিখধর্মের জন্ম হয়। গুরু নানক ছিলেন শিখধর্মের প্রথম গুরু এবং তিনি তার এক শিষ্যকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিং সর্বশেষ মানব গুরু। মৃত্যুর পূর্বে তিনি গুরু গ্রন্থ সাহিবকে শিখদের সর্বশেষ এবং চিরকালীন গুরু ঘোষণা করে যান।

৫.২.৩.১০ উপসংহার ঃ- এই ভাবে দেখা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। সেই সমস্ত সম্প্রদায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমান ভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

৫.২.৩.১১ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল।

২) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি।

৩) "Buddhism Foundations, History, Systems, Mythology, & Practice"। Encyclopedia Britannica

৪) ত্রিপিটক পরিচিতি - ডঃ সুকোমল বরুয়া ও সুমন কান্তি বরুয়া

৫.২.৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) ভারতীয় ধর্মে আদিতম বস্তুবাদী চিন্তা সম্পর্কে লেখ।

২) বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করো।

৩) জৈনদের সম্পর্কে কী জানো।

পর্যায় গ্রন্থ- **৩**

একক- **৭,৮**

৫৩.৭.০ ভূমিকা

৫.৩.৭.১ হিন্দু মন্দির ,দরগা, মসজিদ

৫.৩.৭.২ মন্দিরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

৫.৩.৮.৩ কিছু নমুনা আলোচনা

৫.৩.৮.৪ উপসংহার

৫.৩.৮.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৩.৮.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৫৩.৭.০ ভূমিকা

বর্তমান পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে, এবং তার সাথে ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হবে তারা। এর মাধ্যমে সমাজের নানা দিক ফুটে উঠবে।

৫.৩.৭.১ হিন্দু মন্দির ঃ- হিন্দুদের দেব-উপাসনার স্থান হল হিন্দু মন্দির। 'মন্দির' বা 'দেবালয়' বলতে বোঝায় 'দেবতার গৃহ'। মানুষ ও দেবতাকে একত্রে নিয়ে আসার জন্য হিন্দুধর্মের আদর্শ ও ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত প্রতীকগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত ভবন বা স্থানকেই 'মন্দির' বলা হয়। জর্জ মিশেলের মতে, হিন্দু মন্দির এমন একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যেখানে মায়ার জগৎ থেকে মানুষ তীর্থযাত্রী বা পূণ্যার্থীর বেশে জ্ঞান ও সত্যের জগতের সন্ধানে আসেন। গুপ্তযুগ থেকে মূলত মন্দির কেন্দ্রিক আরাধনা শুরু হয়।

স্টেলা ক্র্যামরিসচের মতে, হিন্দু মন্দিরের প্রতীকতত্ত্ব ও গঠনভঙ্গিমা বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত আছে। একটি মন্দিরের মধ্যে হিন্দু বিশ্বতত্ত্বের সকল ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। এরমধ্যে ভাল, মন্দ ও মানবিক দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর কালচক্র ধারণা এবং পুরুষার্থ ধারণার সব কিছুই প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ধর্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ, কর্ম ও ভক্তির দার্শনিক ধারণাগুলিও প্রতীকের মাধ্যমে মন্দিরে উপস্থিত থাকে।

ভারতে প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে মন্দির স্থাপত্যের সূচনা হয়। ইট ও কাঠের নির্মিত প্রাচীনতম মন্দিরের অস্তিত্ব এখন আর টিকে না থাকলেও পরবর্তীকালের পাথর নির্মিত মন্দিরগুলো অনেকাংশেই টিকে আছে। কাঠামোগত ভাবে কোন একটি মন্দির বৈদিক নৈবেদ্যতা থেকে ভক্তি বা ভালোবাসার ধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং তা থেকে একটি সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে দক্ষিণ এশীয় মন্দির ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে চমৎকার অভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের পাথরের স্বল্পতার কারণে এ অঞ্চলের মন্দির নির্মাতাদের পাথর ব্যাতীত অন্যান্য নির্মাণ উপকরণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে পোড়ামাটির ইটের গাঁথুনীতে গড়া মন্দিরের দেয়াল অলংকরণে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহারও হয়েছে যা বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনন্য বৈচিত্র্য দান করেছে।

হিন্দু মন্দিরে প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থিত আধ্যাত্মিক আদর্শগুলির কথা পাওয়া যায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থগুলিতে (যেমন, বেদ, উপনিষদ্ ইত্যাদি)। অন্যদিকে মন্দিরের গঠনভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তা বর্ণিত হয়েছে স্থাপত্য-সংক্রান্ত সংস্কৃত প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে (যেমন, বৃহৎসংহিতা, বাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদি)। মন্দিরের নকশা, অলংকরণ, পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীর মধ্যে প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতি, জ্যামিতিক প্রতীকতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। হিন্দু মন্দিরগুলি হিন্দুদের আধ্যাত্মিক গন্তব্য। সেই সঙ্গে মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন শিল্পকলা, সম্প্রদায়গত উৎসব ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

হিন্দু মন্দিরগুলি শিল্পকলা, ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও হিন্দু জীবনদর্শনের এক সংমিশ্রণ। এগুলি হল একটি পবিত্র ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষ, দেবতা ও পুরুষের (ব্রহ্ম) মিলনকেন্দ্র।

'পরম সায়িক' নকশা দেখা যায় বৃহদাকার প্রথাগত হিন্দু মন্দিরগুলিতে। হিন্দু মন্দির নির্মাণে যে বিভিন্ন প্রকার গ্রিড ব্যবহৃত হয়, এটি তার মধ্যে অন্যতম। এই ধরনের মন্দির হল সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতির মন্দির। এখানে প্রত্যেকটি সমকেন্দ্রিক নকশার বিশেষ গুরুত্ব আছে। 'পৈশাচিক পাদ' নামে পরিচিত বাহ্যিক নকশাটি অসুর বা অশুভের প্রতীক। অন্যদিকে ভিতরের 'দৈবিক পাদ' নকশাটি দেবতা বা শুভের প্রতীক। শুভ ও অশুভের মধ্যে এককেন্দ্রিক 'মানুষ পাদ' মানবজীবনের প্রতীক। প্রতিটি নকশা 'ব্রহ্মপাদ'কে ঘিরে থাকে। ব্রহ্মপাদ সৃষ্টিশক্তির প্রতীক। এখানেই মন্দিরের প্রধান দেবতার মূর্তি থাকে। ব্রহ্মপাদের একেবারে কেন্দ্রস্থলটি হল 'গর্ভগৃহ'। এটি সবকিছু ও সবার মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মের প্রতীক।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলিতে মন্দিরকে বলা হয়েছে 'তীর্থ'। এটি একটি পবিত্র ক্ষেত্র যার পরিবেশ ও নকশা হিন্দু জীবনদর্শনের প্রতিটি ধারণাকে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। জীবন সৃষ্টি ও রক্ষার প্রতিটি বিশ্বজনীন উপাদান হিন্দু মন্দিরে উপস্থিত – আগুন থেকে জল, দেবতার মূর্তি থেকে প্রকৃতি, পুরুষ থেকে নারীসত্ত্বা, অস্ফুট শব্দ ও ধূপের গন্ধের থেকে অনন্ত শূন্যতা ও বিশ্বজনীনতা – সবই মন্দিরের মূল আদর্শের অন্তর্গত।

সুজান লেওয়াণ্ডোস্কি বলেছেন, সবকিছুই এক এবং সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত – এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই হিন্দু মন্দির নির্মাণের মূল নকশাটি প্রস্তুত করা হয়। ৬৪-গ্রিড বা ৮১-গ্রিড গাণিতিকভাবে নির্মিত স্থান ও শিল্পকলায় মণ্ডিত স্তম্ভের মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি – যেমন অর্থ (উন্নতি, সম্পদ), কাম (বিনোদন, যৌনতা), পুরুষার্থ (সদ্গুণ ও নৈতিক জীবন) ও মোক্ষ (জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি, আত্মজ্ঞান) – এগুলির অনুসন্ধানে মানুষকে প্রবুদ্ধ করার জন্য স্তম্ভগুলি খোদাইচিত্র বা মূর্তিতে শোভিত থাকে।

মন্দিরের কেন্দ্রে, সাধারণত দেবতার নিচে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপরে বা পাশে, খানিকটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। এখানে কোনো অলংকরণ থাকে না। এটি সর্বোচ্চ উপাস্য ব্রহ্ম বা পুরুষের প্রতীক। ব্রহ্ম নিরাকার, সর্বত্রব্যাপী, সবকিছুর মধ্যে যোগসূত্ররূপী ও সবকিছুর সারবস্তু। হিন্দু মন্দিরের উদ্দেশ্য ব্যক্তির মনকে পবিত্র করা ও ভক্তের আত্মজ্ঞান জাগরিত করা। বিশেষ পদ্ধতিগুলি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরের প্রধান দেবতা এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

হিন্দুধর্মে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে কোনো বিভাজনরেখা নেই। সেই অর্থে, হিন্দু মন্দিরগুলি শুধু পবিত্র স্থানই নয়, ধর্মনিরপেক্ষ স্থানও বটে। এগুলির অর্থ ও উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জীবনের বাইরে সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনিক জীবনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়ে এগুলিকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে। কোনো কোনো মন্দির বিশেষ বিশেষ উৎসবের জন্য বিখ্যাত। সেখানে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে শিল্পের চর্চা করা হয়। আবার হয় বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানও পালিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও হিন্দু মন্দিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক হিন্দু রাজবংশের বংশপরম্পরার সঙ্গে হিন্দু মন্দিরের যোগাযোগ আছে। আবার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গেও অনেক হিন্দু মন্দির অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

মন্দির স্থাপত্য

গুপ্তযুগে একটি স্তম্ভযুক্ত বারান্দা এবং বর্গাকার গর্ভগৃহের সহিত মন্দির স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ লাভ ঘটেছিল । এই যুগের প্রথম পর্যায়ে মন্দিরগুলি একশিলা ও সমতল ছাদ বিশিষ্ট এবং ক্রমান্বয়ে তা ' শিখর ' - এ রূপান্তরিত হয় । মন্দিরের এই অগ্রগতিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে । পর্যায় গুলি হলো -

■ **প্রথম পর্যায় :**

(১) মন্দিরগুলো সমতল ছাদ বিশিষ্ট।

(২) মন্দিরগুলি ছিল বর্গাকার।

(৩) বারান্দাগুলো অগভীর স্তম্ভের উপর নির্মিত।

(৪) সমগ্র কাঠামোটি নিম্ন প্লাটফর্মের উপর নির্মিত।

উদাহরণ : এই ধরনের মন্দির হল- সাঁচি'র ১৭ নং মন্দির।

■ **দ্বিতীয় পর্যায় :**

(১) সমগ্র কাঠামোটি উচ্চতর বা উন্নীত প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত।

(২) অধিকাংশ মন্দিরগুলো দ্বিতল বিশিষ্ট।

(৩) আচ্ছাদিত গর্ভগৃহের চারপাশে চলাচলের পথ রয়েছে।

(৪) প্রদক্ষিণ পথ হিসাবে গিরিপথ ব্যবহার করা হত।

উদাহরণ : মধ্যপ্রদেশের নাচনা কুঠারাতে অবস্থিত পার্বতী মন্দির।

■ **তৃতীয় পর্যায় :**

(১) মন্দিরগুলোতে সমতল ছাদের পরিবর্তে শিখর লক্ষ্য করা যায়।

(২) পঞ্চায়তন শৈলী লক্ষ্য করা যায়।

(৩) মূল মন্দিরের দু'পাশে সহকারী মন্দির স্থাপন করা হয় , যা কুশবিদ্ধ আকৃতি নেয়।

উদাহরণ : দশাবতার মন্দির (দেওগড় , উত্তরপ্রদেশ) , দুর্গামন্দির (আইহোল , কর্ণাটক)।

■ **চতুর্থ পর্যায় :**

এই পর্যায়ের মন্দিরগুলো প্রায় একইরকম ছিল , তবে মূল মন্দিরটি আরও বেশি আয়তাকার হয়ে ওঠে।

উদাহরণ : তের মন্দির (শোলাপুর)।

■ **পঞ্চম পর্যায় :**

(১) মন্দিরগুলো বৃত্তাকার বিশিষ্ট হয় তবে সঙ্গে অগভীর আয়তক্ষেত্রাকার অভিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

(২) অন্যান্য বৈশিষ্টগুলো পূর্বের মতোই।

উদাহরণ : মনিয়ার মঠ (রাজগীর)।

বিভিন্ন মন্দির স্থাপত্য শৈলী ঃ-

ভারতের যে যে ধরনের মন্দির স্থাপত্য শৈলী লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল-

(১) নাগারা শৈলী

(২) দ্রাবিড় শৈলী

(৩) ভেসারা শৈলী

(৪) হোয়সালা শৈলী

(৫) বিজয়নগর শিল্প শৈলী

(৬) নায়কা শৈলী

(৭) পাল এবং সেন স্কুল শৈলী।

হিন্দু মন্দিরের মৌলিক রূপটি যে যে বিষয় নিয়ে গঠিত হয় সেগুলি হল -

(১) গর্ভগৃহ : এটি একটি বর্গাকার ছোট ঘর যেখানে মন্দিরের প্রধান দেবতা বিরাজ করেন।

(২) মণ্ডপ : এটি মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এটি সাধারণত উপাসকদের বসার কিংবা উপাসনার জন্য তৈরি করা হয়।

(৩) শিখর : এটি একটি চূড়ার মতো। কখনো কখনো এর আকার পিরামিডের মতো হয়ে থাকে।

(৪) বাহন : এটি মন্দিরের প্রধান দেবতার বাহন যেটি গর্ভগৃহের ঠিক সামনে প্রতিস্থাপন করা হয়।

নাগারা শৈলী :-

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতে যে স্বতন্ত্র মন্দির শৈলীর বিকাশ লাভ ঘটেছিল তাকে নাগারা স্থাপত্য শৈলী বলে। নাগারা শৈলীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হলো -

- মন্দিরগুলো সাধারণত পঞ্চায়তন শৈলীতে তৈরি।
- মূল মন্দিরের সামনে প্রধান উপাসনা হল লক্ষ্য করা যায়।
- গর্ভগৃহের বাইরে নদী দেবীর ছবি স্থাপন করা হয়ে থাকে।
- মন্দির চত্বরে কোনো জলাধার থাকে না।
- মন্দিরগুলো সাধারণত উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত হয়েছিল।
- বারান্দাগুলো স্তম্ভযুক্ত হয়।
- মন্দিরগুলোতে শিখর লক্ষ্য করা যায়।

দ্রাবিড় মন্দির শৈলী :–

চোল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে শত শত মন্দিয় তৈরি হয়েছিল। এটি পূর্ববর্তী পল্লব স্থাপত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্যই দ্রাবিড় মন্দির শৈলীর পরিচায়ক। দ্রাবিড় মন্দির শৈলীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল -

- মন্দিরগুলো উঁচু সীমানা প্রাচীর দ্বারা ঘেরা।
- সামনের দেওয়ালে একটি সুউচ্চ প্রবেশদ্বার আছে যা ' গোপুরম ' নামে পরিচিত।
- মন্দির চত্বরটি একটি প্রধান মন্দির এবং চারটি সহায়ক মন্দির - সহ পঞ্চায়তন শৈলীতে সজ্জিত।
- মন্দিরের চূড়াটি পিরামিডের ধাপের আকারে রয়েছে যেটি বাঁক না হয়ে রৈখিকভাবে উপরে উঠে। এটি ' বিমানা ' নামে পরিচিত।
- মুকুটটি অষ্টভূজাকার আকৃতির হয় যা শিখর নামে পরিচিত।
- ' বিমানা ' কেবলমাত্র মূল মন্দিরে লক্ষ্য করা যায় , সহকারী মন্দিরগুলোতে থাকে না।
- সভাকক্ষ হল গর্ভগৃহের সাথে সংযুক্ত থাকে। ভেস্টিবুলার টানেল দ্বারা যেটি ' অন্তরালা ' নামে পরিচিত।
- আবদ্ধ মন্দির চত্বরে একটি জলাধার লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ : বৃহদেশ্বর মন্দির (তাঞ্জোর) , গঙ্গাইকোণ্ডচোলাপুরম প্রভৃতি।

ভেসারা শৈলী :-

ভেসারা হল ভারতীয় হিন্দু মন্দিরের একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী শৈলী। এই শৈলীটি উত্তর ভারতের কিছু অংশ , দাক্ষিণাত্য এবং এ মধ্যভারতে অনুসৃত হয়। মূলত , চালুক্য রাজবংশ , রাষ্ট্রকূট এবং হোসালা রাজবংশের নরপতিগণ এই শৈলী ব্যবহার করে মন্দির তৈরি করতেন। এই মন্দির শৈলীর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল -

- এটি সাধারণত নাগারা এবং দ্রাবিড়িয়ান শৈলীর মিলিত শৈলী।
- এটিতে বিমানা এবং মণ্ডপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- উন্মুক্ত ভ্রাম্যমান পথ পরিলক্ষিত হয়।
- স্তম্ভ , দরজা এবং ছাদগুলি দুর্বোধ্য খোদাই করা নকশা খচিত।

উদাহরণ : দোদাবাসাপ্পা মন্দির (দাম্বাল) , লাদাখান মন্দির (আইহোল)

প্রাচীন ভারতে গুপ্ত-পূর্ব যুগের মন্দির স্থাপত্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। জয়পুরের নিকট বৈরাটে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার গৃহের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এটি হয়তো খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর। একমাত্র ভিত ভিন্ন এর আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এর কোন উত্তরসূরী ছিল বলেও জানা যায়। না। বরং তক্ষশিলার আন্দিয়ালে আবিষ্কৃত মন্দিরটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায়। এই মন্দিরের গুস্ত দুইটিতে গ্রীক স্থাপত্যের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতীয় শিল্পে, প্রত্যক্ষভাবে, এরও কোন উত্তরসূরী ছিল না। তবে কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য হয়তো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে (অষ্টম শতাব্দী) গ্রীক প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

শক্ত কৃষাণ যুগের এক ধরনের মন্দির পাওয়া গেছে, যার গর্ভগৃহের একাংশে অর্ধবৃত্তাকার (apsidal)। তক্ষশিলায়, মথুরার কাছে শঙ্খে এবং সাঁচিতে এই ধরনের মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

গুপ্ত যুগে ভারতের স্থাপত্য ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। ইতিপূর্বে দেবকুলগুলি বাঁশ এবং কাঠের তৈরি হওয়ায় তারা দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। ভাষাড়া সেগুলির আকারে এবং গঠনে স্থাপত্য শিল্পের নীতি প্রয়োগ করাও সম্ভব ছিল না। গুপ্ত যুগে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নৃতন শিল্পীরা নূতন উপকরণের সাহায্যে নূতন স্থাপত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের শিল্পের উপকরণ হিসাবে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ইট এবং প্রস্তর যত গ্রহণ করেছিলেন। একথা ঠিক যে তাদের সমগ্র সৃষ্টির অতি অল্পভাগই আজ টিকে আছে। তবে সমকালীন লেখ এবং বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁদের সৃষ্টির পরিমাণ মোটেই কম ছিল না। ভারতের বিভিন্ন নগর তখন উচ্চ মন্দির দ্বারা সজ্জিত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অট্টালিকায় ছেয়ে গিয়েছিল। সে যুগের যে অল্প সংখ্যক মন্দির আছে, তাদের শিল্পোৎকর্ষ খুব বেশি নয়। সেগুলিতে আনিতা এবং প্রকরণের অসচ্ছলতার চিহ্ন অত্যন্ত পরে স্থাপত্য প্রভাবিত করেছিল বলে, গুপ্ত যুগের মন্দির স্থাপত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুহাগুলি মূর্তিপূজার পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় এ যুগে মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। আকারে এবং নির্মাণ শৈলীতে এই মন্দিরগুলি ছিল বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের জন্যই এগুলি বিশেষ মূল্যবান। এ যুগের শিল্পীরা প্রারম্ভিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাদের পছন্দমতো শিল্পরূপ বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই নির্দিষ্ট শিল্পরূপকেই ব্যাপক আকার দান করা হয়েছিল।

অধ্যাপক সরস্বতী এই যুগের মন্দিরগুলিকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ভাগগুলি হল : (১) সমতল ছাদযুক্ত বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির। এর সামনে একটা হালকা ধরনের মণ্ডপ থাকত। (২) সমতল ছাদবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির। এখানে গর্ভগৃহের চারদিকে পরিক্রমার জন্য ঢাকা জায়গা থাকত। এরও সামনে একটি মণ্ডপ থাকত। (৩) বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির, যার উপরে একটি নিচু শিখর' থাকত। (৪) ধনুকাকৃতি স্থানযুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার মন্দির যার পিছনের দিকটা হত অর্ধবৃত্তাকার। (৫) মন্দির, যার চার কোণায় কিছুটা অংশ বেরিয়ে থাকত। এদের মধ্যে চতুর্থ ভাগের মন্দিরগুলিকে পূর্বের চৈত্যের এবং পঞ্চম ভাগের মন্দিরগুলিকে অন্ধের স্তূপের পরিবর্তিত রূপ বলা যায়। সোলাপুর জেলার তের মন্দির এবং কৃষ্ণা জেলার চাজারলার কপোতেশ্বর মন্দিরকে (৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দী) চতুর্থ শ্রেণীভূক্ত বলা যায়। এই মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট। এদের শিল্প-সৌন্দর্যও অকিঞ্চিৎকর। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই চৈত্যগৃহগুলিকে ব্রাহ্মণগণ তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন। আইহোলের দুর্গা মন্দিরও এই পর্যায়ভুক্ত। রাজগৃহের বেলনাকার মনিয়ার মঠকে (মণিনাগের মন্দির) পঞ্চম ভাগের একক দৃষ্টান্ত বলা যায়। বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরটির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। গুপ্ত যুগেও করা হয়েছিল। চতুর্থ এবং পঞ্চম ভাগের এই মন্দিরগুলি পরবর্তী ভারতীয় স্থাপত্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি।

অবশিষ্ট তিন ভাগের মন্দির মধ্য যুগের ভারতীয় স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। এদের মধ্যে প্রথম ভাগের মন্দিরই প্রধান। বাকি দুই ভাগের মন্দিরগুলিকে তারই পরিবর্ধিত রূপ বলা যায়। সাঁচির বিষ্ণু মন্দিরকে প্রথম ভাগের মন্দিরের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় বলা চলে। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন যে, আকারে ছোট হলেও, অন্যান্য গুণের জন্য (যেমন গঠনসংক্রান্ত যথার্থতা, প্রতিসাম্য, অনুপাত, অলঙ্কার, পরিমিতি ইত্যাদি) এর সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্যকীর্তির তুলনা করা চলে। তিগাওয়ার মন্দির এবং এরাণের বরাহ মন্দির এই পর্যায়ভুক্ত। তিগাওয়ার মন্দির সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে নির্মিত হয়েছিল। তবে সাঁচির বিষ্ণু মন্দির নিঃসন্দেহে অনেক পরবর্তীকালের। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে আলো ছায়ার সুষম বন্টনের জন্য মন্দি গাত্রে যে বিচিত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন যে তা পরবর্তীকালে শুধু ভারতের নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মন্দির স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। মন্দির বলতে মূলত যা বোঝায় (যেমন গর্ভগৃহ, একটিমাত্র প্রবেশ পথ এবং একটি মণ্ডপ) তা সর্বপ্রথম এই প্রথম ভাগের মন্দিরগুলিতেই চোখে পড়ে। একই ধরনের মন্দির উদয়গিরিতে পাওয়া গেছে। উদয়গিরির মন্দির অংশত পাহাড় কেটে এবং অংশত ইঁট নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এই মন্দিরটি এই ভাগের অন্য তিনটি মন্দিরের সমকালীন এবং শিল্পরীতিতেও এটি তাদেরই সহোদর।

দ্বিতীয় ভাগভুক্ত মন্দিরের দৃষ্টান্তস্বরূপ নাচনা কুঠারার পার্বতী মন্দির, ভূমারার শিবমন্দির এবং আইহোলের তিনটি মন্দিরের লাড়খার, কোন্টগুড়ির এবং মেগুভির) উল্লেখ করা যায়। প্রথম দুইটি মন্দির মধ্য ভারতের এবং অন্য তিনটি দক্ষিণাত্যের। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বৈগ্রামের ইটের তৈরি মন্দির এবং প্রভু গোবিন্দস্বামিনের মন্দিরও পরিকল্পনার দিক থেকে সমপর্যায়ভুক্ত। শেষের মন্দিরটির জন্য ৪৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভূমি দান করা হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ভূমারার শিব মন্দির উচ্চ অলঙ্করণের জন্য উল্লেখযোগ্য। অন্য একটি কারণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে নালন্দায় মন্দির সংস্থানের যে চিহ্ন পাওয়া গেছে, ভূমারার মন্দিরে তার পূর্বাভাস ছিল বলে মনে করা হয়। এই সংস্থানে মূল মন্দিরের চার কোণে চারটি ছোট মন্দির আছে। ভারতীয় শাস্ত্রে এই সংস্থান পদ্ধতিকে 'পঞ্চায়তন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালের যে কোন ধরনের ভারতীয় মন্দিরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এই মন্দিরের

ভাস্কর্য এবং নির্মাণ নৈপুণ্য সর্বোত্তম গুপ্ত ঐতিহ্যের ধারক। মেগুতির জৈন মন্দির এই পর্যায়ের শেষ (৬৩৪ খৃষ্টাব্দ) এবং শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরবর্তীকালের দক্ষিণ ভারতের রথসমূহের সঙ্গে গুপ্ত যুগের একাধিক তল মন্দিরগুলির সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এই পর্যায়ে কয়েকটি মন্দিরে (যেমন পার্বতী মন্দির এবং শিব মন্দির) হয় সিঁড়ির ব্যবহারে কিংবা অন্যভাবে, একাধিক তলার অথবা সেজন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনের আভাস পাওয়া যায়।
তবে একদিক থেকে এই মন্দিরগুলি প্রথম ভাগের মন্দির থেকে স্বতন্ত্র। ধর্মীয় স্থাপত্যের অন্যতম ছিল ভাগের মন্দিরের শিখর' গুলির মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছিল। ভারতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন শিখরযুক্ত মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। এই ধরনের মন্দিরের দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওগড়ের (বাসি) দশাবতার মন্দির, নাচনা কুঠারের মহাদেবের মন্দির, ভিটারগাওয়ের (জানপুর) ইটের মন্দির এবং হিউয়েন সাঙ বর্ণিত বুদ্ধগয়ার মহাবোধির উল্লেখ করা যায়। আইহোলের দুর্গা মন্দিরও শিখরযুক্ত। কিন্তু পরিকল্পনা এবং সংস্থানের দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দেওগড় এবং ভিটারগাঁওয়ের মন্দির দুইটিকে এ বিষয়ে প্রতিনিধি স্থানীয় বলা চলে। এদের মধ্যে প্রথমটি পাথরের এবং দ্বিতীয়টি ইটের তৈরি। দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরটি একটি সিঁড়ি যুক্ত উচ্চ এবং প্রশস্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিটারগাঁওয়ের মন্দিরের বর্গক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের সংলগ্ন একটি অনুরূপ কিন্তু ক্ষুদ্রতর পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ এবং উভয়ের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটি পথও আছে। দেওগড়ের মন্দির হয়তো খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর। কিন্তু ভিটারগাওয়ের মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে এটিকে পৃষ্টীয় সপ্তম রচনা বলে মনে করেন। অনেকের মতে, এটি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। আবার অনেকে বলেন যে, মধ্য যুগের পূর্বে এটিকে স্থান দেওয়া যায় না। অধ্যাপক সরস্বতী একে গুপ্ত যুগের সৃষ্টি বলে মনে করেন। বুদ্ধগয়ার মহাবোধির বারংবার সংস্কারের ফলে, এর আদি আকৃতি কী ছিল, বলা যায় না। হিউয়েন সাঙ একে 'মহাবোধিবিহার' বলেছেন। ভিটারগাঁওয়ের মন্দিরের সঙ্গে মহাবোধির বিশেষ সাদৃশ্য থাকায়, এই দুইটি মন্দিরকে সমকালীন বলে মনে হয়। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় ৩০০ ফুট উঁচু একটি মন্দিরের কথা বলেছেন। কিন্তু একমাত্র প্রশস্ত ভিত ভিন্ন এই মন্দিরের অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।পিরামিড আকারের এই মন্দিরগুলির অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'শিখর'। কোন কোন মন্দিরের উচ্চতা তাদের গ্রন্থের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। মনে হয় এ বিষয়ে বরাহমিহিরের নির্দেশ মেনে চলা হয়েছিল। সিরপুর গ্রামে লক্ষ্মণ নির্মিত ইটের মন্দির শিখরযুক্ত মন্দিরের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গতি, অলঙ্করণের ঐশ্বর্য এবং পরিমিতি প্রভৃতি গুণের জন্য একে শিখরযুক্ত মন্দিরের মধ্যে অনন্য মনে করা হয়।

উপরে বর্ণিত মন্দিরগুলি ভারতের মন্দির স্থাপতো দুইটি নূতন রীতির সূচনা করেছিল। এদের নাগর রীতি এবং দ্রাবিড় রীতি বলা হয়। এই দুইটি রীতিই ছিল মধ্য যুগের ভারতের মন্দির শিল্পের বৈশিষ্ট্য। ক্রুশাকায় পরিকল্পনা এবং উচ্চ অট্টালিকা নাগর স্থাপত্য রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেওগড়ের এবং ভিটারগাঁওয়ের মন্দির দুইটিতে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। দ্বিতীয় ভাগের মন্দিরগুলি আবার আনকাংশে দ্রাবিড় রীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই মন্দিরগুলির গর্ভগৃহের উপরের তলায় দ্রাবিড় রীতিতে নির্মিত উপরের দিকে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ মন্দিরের আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া এই মন্দিরগুলির ভাস্কর্য মণ্ডিত রিলিফগুলির সঙ্গে দ্রাবিড় রীতিতে নির্মিত মন্দিরের নিকট সম্পর্ক দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায় যে গুপ্ত যুগে ভারতের ভবিষ্যৎ মন্দির স্থাপত্যের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করলে, এ যুগের স্থাপত্যের ভূমিকার পার্থক্য বোঝা যায়। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যে, পূর্বতন ভাস্কর্য শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল। কিন্তু এ যুগের স্থাপত্য ভারতীয় স্থাপত্যে নূতন সম্ভাবনার দ্বারা উন্মুক্ত করেছিল।

মসজিদ

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপাসনা স্থান হল মসজিদ। ভারতবর্ষে ইসলামী সভ্যতার আগমনের পর তাদের উপাসনাস্থল নির্মাণ ও ইসলামীয় স্থাপত্যের প্রবেশ ভারতবর্ষে দেখা যায়। তার সাথে সাথে নতুন নতুন শৈলীর উপস্থাপনা দেখা যায়। ভারতে 300,000-এরও বেশি সক্রিয় মসজিদ রয়েছে, যা ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি । মসজিদ বা মসজিদ হল ইসলামী শিল্পের সহজতম রূপ। মসজিদটি মূলত একটি স্তম্ভবিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, যা একটি গম্বুজ দ্বারা মুকুটযুক্ত। একটি *মিহরাব* দিক নির্দেশ করে *ক্বিবলা* প্রার্থনা জন্য। *মিহরাবের* ডানদিকে *মিম্বর* বা *মিম্বর* দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে *ইমাম* কার্যধারার সভাপতিত্ব করেন। একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম, সাধারণত একটি মিনার যেখান থেকে বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় যোগদানের জন্য ডাকা হয় একটি মসজিদের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। বড় মসজিদ যেখানে জুমার নামাজের জন্য বিশ্বস্তরা একত্রিত হয় তাদের জামে মসজিদ বলা হয়।

সমাধি এবং সমাধি

সমাধি বা মাকবারা একটি সাধারণ সমাধিক্ষেত্র (আওরঙ্গজেবের কবর) থেকে শুরু করে জাঁকজমকপূর্ণ (তাজমহল) হতে পারে। সমাধিটি সাধারণত একটি নির্জন কম্পার্টমেন্ট বা সমাধি কক্ষ নিয়ে গঠিত যা *হুজরা* নামে পরিচিত যার কেন্দ্রে রয়েছে সেনোটাফ বা *জরিহ*। এই পুরো কাঠামোটি একটি বিস্তৃত গম্বুজ দ্বারা আবৃত। ভূগর্ভস্থ কক্ষে সমাধিসংক্রান্ত বা এই ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ *maqbara* , যা মৃতদেহ একটি সমাধি বা সমাহিত করা *qabr*। ছোট সমাধিতে একটি *মিহরাব* থাকতে পারে , যদিও বড় সমাধিতে একটি পৃথক মসজিদ রয়েছে যা মূল সমাধি থেকে দূরে অবস্থিত। সাধারণত পুরো সমাধি কমপ্লেক্স বা *রওজা*একটি ঘের দ্বারা বেষ্টিত হয়. একজন মুসলিম সাধকের সমাধিকে দরগাহ বলা হয় । প্রায় সমস্ত ইসলামিক স্মৃতিস্তম্ভে কুরআনের আয়াতের বিনামূল্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং দেয়াল, ছাদ, স্তম্ভ এবং গম্বুজে মিনিটের বিবরণ খোদাই করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করা হয়েছিল।

ভারতে ইসলামিক স্থাপত্যের শৈলী

ভারতে ইসলামিক স্থাপত্যকে তিনটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে: দিল্লি বা সাম্রাজ্যের শৈলী (1191 থেকে 1557 CE); প্রাদেশিক শৈলী, আহমেদাবাদ , জৌনপুর এবং দাক্ষিণাত্যের মতো আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে ঘিরে ; এবং মুঘল স্থাপত্য শৈলী (1526 থেকে 1707 CE)।

৫.৩.৭.২ মন্দিরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মন্দিরকে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রনে মন্দিরের বড় ভূমিকা থাকে তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মন্দিরের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গরে ওঠে। গুপ্তযুগে(আনুঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতক) অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে মঠ, মন্দির এবং সঙ্ঘকে ভূমিদান করা হতে থাকে।এই ভূমিদান আবার ব্রাহ্মণদের করা হত,জাকে বলা হত ব্রহ্মদেয়। দেবতার উদ্দেশে মন্দিরে জমিদান করা হলে তাকে বলা হত দেবদান। এই দেবদান পদ্ধতির ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্দির গুলি ভূ সম্পদের মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই উপরিউক্ত দানের বিষয়টি গুপ্তযুগে আরম্ভ হলেও পরবর্তী আদিমধ্য যুগেও এর ধারা অব্যাহত ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির গুলির কথা বলতে পারি, যেগুলি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চান্দেল্ল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। পাশাপাশি বলা যায় যে এই দান কিন্তু কেবল রাজা দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই পৃষ্ঠপোষকতায় অংশ নিয়েছিল। বিশেষত বনিকদের মধ্যে এরকম দানের প্রবনতা লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে শিব ও বিষ্ণু উপাসনার কেন্দ্র রূপে মন্দির গুলি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেবতাদের সমন্নয়বাদী উপাসনা পদ্ধতি গড়ে ওঠার ফলে ধ্রুপদী সংস্ক্রিত গড়ে ওঠে।

আদি মধ্যযুগে সামাজিক ও আর্থিক দিকে মন্দিরগুলি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

১) কৃষি উদ্বৃত্ত গ্রহণ ও কৃষির বিস্তারে মন্দিরের বড় ভুমিকা ছিল। ভূমি দানের ফলে উপজাতি অঞ্চলে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়েছিল।

২) উপরিউক্ত কারণে উপজাতি সমাজে ভাঙন দেখা দেয়, এবং তারা ব্রাহ্মণ্য জাতি-বর্ণ সমন্বিত সমাজ কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

৩) নবগঠিত সমাজ কাঠামোতে মন্দির একটি সংযোগের কাজ করত, যেখানে উচ্চ ও নিম্ন উভয়বর্ণ তাদের সেবা দান করত। তাই নানা জাতির মানুষকে মন্দির আকর্ষণ করতে পারত।

৪) এই ধরনের সমন্বয়বাদী ভাবমূর্তি ব্রাহ্মণ্য মদতপুষ্ট রাজশক্তির উত্থানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মন্দির রাজশক্তিকে বৈধতা দান করত, যাতে মনে করা হয় ওই রাজশক্তি ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

৫) ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম সমাজের বাঁধন মজবুত করেছিল। পাশাপাশি ভক্তি আন্দোলনে মন্দিরের একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ছিল।

৬) এর সাথেই মন্দিরগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে, জমিকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সম্পদ ক্রমশ রত্নভাণ্ডারে পরিণত হয়। তার সঙ্গে অভিজাত মানুষদের আনাগোনা ও দান মন্দিরগুলির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৭) ক্রমশ এইভাবে মন্দিরগুলি এক একটি সুরক্ষিত নগরীতে পরিনত হয়েছিল, যেখানে নিজস্ব বাজার, পথঘাট, এমনকি স্বাধীন সুরক্ষা বাহিনী পর্যন্ত ছিল।

৮) পাশাপাশি সাংস্কৃতিক একীকরণে মন্দিরের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল।

এই ভাবে দেখা যায় যে ভারতে মন্দির গুলি আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আজও তার ব্যাতিক্রম নয়। উদাহরন স্বরূপ তিরুপতি মন্দিরের কথা বলা যায়, যেটি অন্যতম ধনী মন্দিরের একটি। বিভিন্ন প্রথা পালনের মাধ্যমে এটি সমাজে একটি বিশেষ অবদান রেখেছে।

৫.৩.৮.৩ কিছু নমুনা আলোচনা

পাহাড়পুরের মন্দির

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ উন্মোচন করিয়া একটি বিপুলকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিদিকে কক্ষসারি লইয়া সুবিস্তৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ, তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের চাল নাই, চুড়া নাই; চারিদিকের প্রাচীর পড়িয়াছে ভাঙিয়া; প্রদক্ষিণ পথ, পূজাকক্ষ, সমস্তই ইটে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তবু এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার গঠনরেখা ও রীতি ধীরে ধীরে অনুসরণ করিলে ইহার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। তখন স্বীকার করিতে বাধা থাকে না, এই মন্দির প্রাচীন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মন্দির গরিমায় উজ্জ্বল এবং রূপে ও রীতিতে তুলনাহীন না হইলেও এই জাতীয় আপাতজ্ঞাত সকল সর্বতোভদ্র মন্দিরের পুরোভাগে ইহার স্থান।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোণ এবং চতুঃশালগুহ, অর্থৎ ইহার চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং সেই গৃহে প্রবেশের জন্য চারিদিকে চারিটি তোরণ। শাস্ত্রানুযায়ী এই ধরনের মন্দির হইত। পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের ষোলোটি কোণ অর্থাৎ চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি বাহু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারিটি (চারিদিকে ষোলোটি) কোণ রচনা, প্রত্যেক তল ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ পথ এবং প্রাচীর; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত। অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ায়। পাহাড়পুরের সুবিস্তৃত মন্দিরটি এই সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজজুল নিদর্শন। এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দির ভারতের নানাস্থানে নিশ্চয়ই নির্মিত হইয়াছিল, নহিলে বাস্তুশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা নয়; কিন্তু এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দির আজ আর দৃষ্টিগোচর নয়, আর কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় মন্দির-স্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অন্তত প্রাচিন যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন পাগান নগরের চতঃশাল থাˆটবিএঃ বা সর্বজ্ঞ, শোয়েগু-জ্যি, টিহু-লো-মিনহ-লো প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। যবিদ্বীপে প্রাম্বনাম নগরীর প্রাচীন লোরো-জোংরাং মন্দির, শিব-মন্দির প্রভৃতিও একই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে।

স্বর্গত কাশীনাথ দীক্ষিত ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা-গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক রূপ-প্রকৃতি ও গঠন আজি ধরিতে পারা সহজ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬.৫ ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪.২৫ ফিট বিস্তৃত। মূলত মন্দিরটির ভূমি-নকশা চতুষ্কোণ; প্রত্যেক দিকের বাহু সম্মুখ দিকে একাধিকবার (তিনবার) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোণের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সমগ্র নকশাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে। মূল চতুষ্কোণ নকশাটির সমগ্র ভূমির উপর একটি শূন্যগর্ভ বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; ইহারই সর্বোচ্চ স্থাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ, কিন্তু সে-শীর্ষ এবং স্তম্ভটিরও উপরের অংশ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কাজেই শীর্ষটি কি শিখরাকৃতি ছিল, না ছিল স্তুপাকৃতি তাহা নির্ণয়ের কোনও উপায় আজ আর নাই। শূন্যগর্ভ দৈত্যকায় স্তম্ভটির দেয়াল অতি প্রশস্ত, কারণ চারিদিকের সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভারের অনেকাংশ পড়িত এই দেয়ালের

উপর। এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত স্তম্ভটিই সমগ্র মন্দিরটির কেন্দ্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেকটি ক্রমহ্রাস্বায়মান স্তর এবং স্তরোপরি প্রদক্ষিণ পথ ও প্রাচীর চতুঃশালগুহ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত, রচিত ও প্রসারিত। ভিত্তিস্তর বাদ দিলে মন্দিরটির সর্বসুদ্ধ ক'টি ক্রমহ্রস্বয়মান স্তর ছিল, বলা কঠিন। শাস্ত্রানুযায়ী সর্বসুদ্ধ পাচটি স্তর বা তল থাকিবার কথা; হয়তো তাহাই ছিল, কিন্তু আপাতত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ভিত্তিস্তরসহ মাত্র তিনটি। মন্দিরটি চতুর্মুখ, অর্থাৎ "সর্বতোভদ্র হওয়া সত্ত্বেও ইহার প্রবেশ তোরণ উত্তর দিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই ভিত্তিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর; এই চত্বর অতিক্রম করিলেই দক্ষিণতম প্রান্তে বেষ্টনী প্রাচীরের তোরণ ভেদ করিয়া ভিত্তিস্তরের সর্বতোভদ্র প্রদক্ষিণ-পথে প্রবেশ। প্রদক্ষিণ-পথটি ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের চারিদিকে এবং পথটির প্রান্ত বাহিয়া বেষ্টনী-প্রাচীর। এই প্রদক্ষিণ-পথের যে কোনও দিক হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া হ্রস্বায়িত প্রথম তলে বা স্তরে আরোহণ করা যায়। এই স্তরেও একই প্রকারের প্রদক্ষিণ-পথ, বেষ্টনী-প্রাচীর, তদুপরি এক একদিকে এক একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রথম তল হইতে সোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেই স্পষ্টত বুঝা যায়, এই তলই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্দ্রস্থিত শূন্যগর্ভ স্তম্ভটি চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক একটি করিয়া বৃহৎ মণ্ডপ। সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ছিল প্রধান দেবগৃহ বা পূজাগৃহ এবং ইহাদেরই সম্মুখের মণ্ডপে পূজারীরা নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া সমবেত হইতেন। মণ্ডপ ও দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়া চারদিক ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ-পথ এবং বেষ্টনী-প্রাচীর। এই তলের উপরে আর কোনও তল ছিল। কিনা এবং সেই তলে কোনও পূজাগৃহ ছিল। কিনা, বলা কঠিন। ইহার উপর আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভাঙিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই মন্দিরের উপরিভাগের আকৃতি-প্রকৃতি কী ছিল তাহা লইয়া কল্পনা-জল্পনা করা চলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি চতুর্মুখ জৈন-মন্দির ছিল এবং এই চতুর্মুখ জৈন-মন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর-মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা। এ-অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের চতুর্মুখ বা সর্বতোভদ্র মন্দির ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নির্মিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ বিদ্যমান। আনন্দ, সর্বজ্ঞ, টিহ্-লো-মিনহ্-লো প্রভৃতি মন্দিরেও দেখা যায়, কেন্দ্রে একটি বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উঠিয়া গিয়াছে উপরের দিকে এবং তাহার শীর্ষে শিখর বা স্তূপ। এই স্তম্ভটির চারিদিকের চারিমুখে প্রত্যেক তলে চারিটি সুউচ্চ সুবৃহৎ কুলুঙ্গি কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে; প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে বুদ্ধ-প্রতিমা। প্রত্যেক দিকের তোরণদ্বার হইতে একটি সুদীর্ঘ অলিন্দ পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে প্রতিমার সম্মুখ পর্যন্ত; দুই দিকে সমান্তরালে আরো দুইটি অলিন্দ এবং এই অলিন্দ রেখাশ্রেণী ভেদ করিয়া কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির চারদিক ঘিরিয়া একাধিক প্রদক্ষিণ-পথ চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর-মন্দিরের বিন্যাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মন্দিরগুলির বিন্যাসের সমগোত্রীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এ-কথা সত্য যে, পাহাড়পুর-মন্দিরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভে কোনও কুলুঙ্গি কাটা নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে চারিদিকের দেয়ালের সম্মুখেই স্থাপনা করা হইয়াছে চারিটি গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ। আসল কথা হইল কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি এবং তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকের পূজাস্থান ও প্রদক্ষিণ-পথ। এই রূপ চতুর্মুখ সর্বতোভদ্র মন্দিরের রূপ এবং এই রূপই পাহাড়পুর, পাগানে এবং লোরো-জোংরাং—এ দৃষ্টিগোচর।

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাঁথুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরি। বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোনও চেষ্টা নাই। মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভিটার স্তূপেও কিছু কিছু এই ধরনের অলংকরণ ও মৃৎফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরের ভিত্তিপ্রাচীরগাত্রে প্রস্তরফলক।-নিদর্শনও অপ্রচুর নয়। এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হয় নাই, বলাই বাহুল্য; বহুদিনের অনবসর চেষ্টায় এত বড় মন্দির নির্মাণ সম্ভব। পরবর্তীকালে নানা সময়ে নানা সংযোজনাও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সংহত সমগ্রতা আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ভাবনা-কল্পনার সৃষ্টি এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, নরপতি ধর্মপোলই ইহার পোষক এবং তাঁহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাঙলার গৌরব।

পল্লব স্থাপত্য

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লব আমলের মন্দিরসমূহ থেকে শুরু হয়েছে। এই মন্দিরগুলিতে আমরা সর্বপ্রথম দ্রাবিড় শিল্পরীতির সাক্ষাৎ পাই। শিল্প শাস্ত্রে দ্রাবিড় প্রাসাদের উপরিভাগকে, কখনও বা সমগ্র প্রাসাদকে, অষ্টভুজ অথবা ষড়ভুজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা অস্পষ্ট এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির সঙ্গে সর্বদা এই বর্ণনার মিল পাওয়া যায় না। প্রথমে দ্রাবিড় মন্দিরগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়। বিমানের পিরামিডের মতো উচ্চতা এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিমান বহুতল। প্রতিটি তল গর্ভগৃহের প্রতিরূপ এবং নীচের তলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এর শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি, শিল্পশাস্ত্রে যাকে স্তূপ অথবা স্তূপিকা বলা হয়। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে এই তলগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট, এবং সেগুলিতে আনুষঙ্গিকের বাহুল্য এত বেশি যে, এই তলগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকে একটি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ এবং একে ঘিরে থাকে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ

আচ্ছাদিত বেষ্টনী, যাকে ‘প্রদক্ষিণ’ বলা হয়। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে,আয়তাকার গুপ্ত দ্বারা কতকগুলি কুলুঙ্গী তৈরি করা হয়। চৈত্য বাতায়নসহ বেলনাকার কার্নিস এবং উপরের তলগুলিকে ঘিরে অপরিসর অলিন্দ, এই মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে এই মন্দিরগুলিতে গুপ্তযুক্ত হলঘর, বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপক পথ এবং বৃহদাকার গোপুরমগুলি (তারণ) নির্মিত হয়েছিল।

পল্লব আমলে মন্দিরগুলি যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে নবীন আগন্তুক ছিলেন না। তাঁদের পিছনে নিশ্চয়ই বংশপরম্পরায় বহু যুগের শিল্পসাধনা এবং ঐতিহ্য কাজ করেছিল। তবে পূর্ববর্তী এই শিল্পীরাশিল্পের উপাদান হিসাবে কাঠ এবং অন্যান্য বিনাশশীল দ্রব্য ব্যবহার করেছিলেন

বলে সেগুলি পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই মন্দিরগুলির প্রাথমিক পর্যায়ে দারু শিল্পের চিহ্ন পাওয়া গেছে। শিল্পরীতির দিক থেকেও এই মন্দিরগুলিকে আকস্মিক সৃষ্টি বলা যায় না। এগুলিকে গুপ্ত যুগের তলবিশিষ্ট মন্দিরের অভিযোজন বলা যায়। অবশ্য এই অভিযোজনের সময় শিল্পীগণ মন্দিরগুলিতে পূর্ববর্ণিত কিছু নতুন অংশ যোগ করেছিলেন। এই অংশগুলিই এই মন্দিরসমূহের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। পল্লব যুগের একদিকে পাহাড়-কাটা মন্দির এবং অন্য দিকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র মন্দির। বলা যায় এই যুগে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। পল্লব শিল্পীগণ ধীরে ধীরে দারুশিল্প এবং গুহাস্থাপত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। পল্লব যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সবই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল। এই নিদর্শনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে আমরা প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালে নির্মিত সাধারণ স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপগুলিকে স্থান দিতে পারি। অনেকাংশে অনুরূপ, কিন্তু ব্যাপকতর মণ্ডপ, এবং একশিলা মন্দিরসমূহ, যেগুলিকে রথ বলা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত হতে পারে। এগুলি প্রথম নরসিংহ বর্মন মহালগ্ন এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী শাসকদের সময় নির্মিত হয়েছিল।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্ব কালে নির্মিত সবগুলি পাহাড়-কাটা মন্দিরই যে এক ধরনের ছিল, এমন নয়। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে তৈরি মন্দিরগুলির সঙ্গে শেষ দিকে তৈরি উত্তবল্লি (গুন্টুর জেলা) অনন্তশায়ন মন্দির এবং ভৈরবকোণ্ডের (উত্তর আর্কট জেলা) মন্দিরগুলির তুলনা করলে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য চোখে পড়ে। পূর্বতন মন্দিরগুলি সহজ সরল। অনন্তশায়ন মন্দিরটি কিন্তু ঠিক তা নয়। মনে হয় এটি বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ দ্বারা নির্মিত চারতলা এই মন্দিরের উচ্চতা ৫০ ফুট। ভৈরবকোণ্ডের মন্দিরের ব্যাপকাকার এবং অলঙ্কৃত স্তম্ভগুলিতে নিশ্চিতভাবে পল্লব যুগের শিল্প বৈশিষ্ট্যের সূচনা চোখে পড়ে। এই স্তম্ভগুলির নিম্নভাগে এবং শীর্ষদেশে সর্বপ্রথম সিংহ মূর্তি যোগ করা হয়। এই স্তম্ভগুলি পরে আরও পরিশীলিত হয়ে, মহামন্নগোষ্ঠীর মন্দিরগুলিতে উজ্জ্বল শিল্প নিদর্শনরূপে বিবেচিত হয়।

মহামল্ল গোষ্ঠীর রাজাদের সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন সবগুলি মাদ্রাজ্যের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, সমুদ্র তীরে, মামল্লপুরমে (মহাবলিপুরমে) পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত মণ্ডপ দশটি এবং রথ আটটি। মহেন্দ্রবর্মনের মণ্ডপগুলির তুলনায়, এই মণ্ডপগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত, তবে তাদের আয়তন এবং সাধারণ চরিত্র মোটামুটি একই রকমের। কোন রথই আয়তনে খুব বড় নয়। সর্ববৃহৎ রথটির দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪০ ফুট। রথগুলিকে সাধারণত 'সপ্ত প্যাগোডা' বলা হয়। এগুলির শিল্পরীতি অনেকটা মণ্ডপগুলির মতো, তবে তাদের মধ্যে পূর্বতন দারুশিল্পের চিহ্ন অতিশয় স্পষ্ট। এই রথগুলির অভ্যন্তর ভাগ অসম্পূর্ণ, তাই মনে হয় এগুলি কখনও ব্যবহার করা হয়নি। এই রথগুলির কয়েকটির সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর নাম জড়িত। কয়েকটি রথকে বিহার অথবা চৈত্যের অনুলিপি বলে মনে হয়। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় যে, ভীম, সহদেব এবং গণেশের নামাঙ্কিত রথগুলি চৈত্য ধরনের। সম্ভবত মামল্লপুরমের সবগুলি রথই শৈবধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই রথগুলির মধ্য দিয়ে পল্লব স্থাপত্যের এক অধ্যায় শেষ হয়ে আর এক অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই নূতন অধ্যায়ের মন্দিরগুলি আর আগের মতো পাহাড়ে উৎকীর্ণ নয়, সেগুলি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। এই অধ্যায়ের মন্দিরগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি রাজসিংহ গোষ্ঠীর রাজত্ব কালে (৭০০-৮০০ খৃষ্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলির নির্মাণ কাল নন্দিবর্মন গোষ্ঠীর রাজত্ব (৮০০-৯০০ খৃষ্টাব্দ)। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের সংখ্যা ছয়। এদের মধ্যে তিনটি, তীর মন্দির, ঈশ্বর মন্দির এবং মুকুন্দ মন্দির আছে মামল্লপুরমে। একটি মন্দির আছে দক্ষিণ আর্কটের পনমলইয়ে। অন্য দুইটি মন্দির হল কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট। এগুলিতে পূর্ব যুগের তুলনায় কোন অগ্রগতির লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই মন্দিরগুলিতে পল্লবদের অবনতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এদের মধ্যে কাঞ্চীপুরমের মুক্তেশ্বর এবং মতদেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

পল্লবগণ এই মন্দিরগুলির মধ্য দিয়ে অমরাবতীর শিল্প ঐতিহ্যকে লালন এবং বর্ধন করেছিলেন। কালক্রমে পল্লব-শিল্প ঐতিহ্য ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদি হিন্দু উপনিবেশসমূহের স্থাপত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাজসিংহ গোষ্ঠীর মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লপুরমের

তীর মন্দির এবং কাজীপুরমের কৈলাসনাথ এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। পাহাড় উৎকীর্ণ না হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত হওয়ায় এই মন্দিরগুলিতে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশি ছিল।

এই মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লাপুরমের মন্দির প্রাচীনতম। একেবারে সমুদ্রের উপরে অবস্থিত হওয়ায় একে তীর মন্দির বলা হয়। বৃহৎ প্রাচীন বেষ্টিত চতুর্ভুজাকার প্রাঙ্গণে মন্দিরটি অবস্থিত। এ থেকে মনে হয় যে মন্দিরটি যখন নির্মিত হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে মন্দির পরিকল্পনা তখন নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল। এই পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে পাশাপাশি দুইটি মন্দির অসমঞ্জস ভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে। প্রতিটি মন্দিরের একটি নিজস্ব পিরামিডাকার বিমান আছে এবং সেই বিমানটি একটি গম্বুজাকার স্তূপিক এবং কারুকার্য মণ্ডিত সুক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ। পূর্বদিকের সমুদ্রের মুখোমুখি মন্দিরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দুইটি মন্দিরের মধ্যে এই শিব মন্দিরটিই প্রধান। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় মন্দিরটি বিষ্ণুর। আকারে ও প্রকারে মামল্লপুরমের তীর মন্দির চতুষ্কোণ ধর্মরাজা রথের আদলে তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সুউচ্চ অথচ ক্ষীণ প্রতিটি বিমান এই মন্দিরকে বিশেষ ভাবে ছন্দোময় এবং প্রাণবন্ত করেছে। শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্যই এই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আংশিক সহায়তা করেছে। কিন্তু তার দ্বারা এই সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন যে, এক নূতন আকাঙ্ক্ষা এই শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁরা তাঁদের মনশ্চক্ষুতে একটি সুসমন্বিত মন্দিরের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তীর মন্দিরের অল্পকাল পরে রাজসিংহ পল্লব কর্তৃক নির্মিত কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরকে সুসমন্বিত রূপ কল্পনার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যায়। রাজসিংহ এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন এবং তাঁর পুত্র মহেন্দ্রবর্মন এটি শেষ করেন। এই মন্দির সংলগ্ন সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির সমগ্র মন্দির পরিকল্পনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। এখানে মণ্ডপের বলিষ্ঠ স্তম্ভ এবং সিংহমূর্তিগুলি সমগ্র পরিকল্পনার সঙ্গে বিস্ময়কর ভাবে মানিয়ে গেছে। তীর মন্দিরের বিমানের তুলনায় এই মন্দিরের বিমান অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং সুপরিমিত। এই মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখে মনে হয় যে, এতে গোপুরমের সূচনা হয়েছিল। উপরের ভার বহন করার জন্য এই মন্দিরের ভিত গ্রানাইট পাথরে তৈরি করা হয়েছিল। দুই প্রস্থ খিলানের উপর তৈরি এই মন্দিরের পিরামিড-প্রায় বিমান এবং তার উপরের গম্বুজ দেখলে একে বৌদ্ধস্তূপ বলে মনে হয়। বহুতল যুক্ত সুউচ্চ বিমান এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মরাজ রথের একশিলা বিমানের তুলনায় এটি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। এই মন্দিরে প্রাচীন বেষ্টিত চত্বর, গোপুরম, স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ এবং বিমান সবই যথাস্থানে উত্তমরূপে সংস্থাপিত হওয়ায় অধ্যাপক সরস্বতী একে দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম প্রধান নিদর্শন বলে মনে করেন।

কাঞ্চীপুরমের বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরটি বিষ্ণুর। কৈলাসনাথ মন্দিরের অল্পকাল পরে রাজসিংহ এটি নির্মাণ করেন। একে পল্লব স্থাপত্যের সবচেয়ে পরিণত নিদর্শন মনে করা হয়। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অংশগুলি ঘনসংবদ্ধ। শিল্পীরা এখানে শুধু ঐক্যবোধের পরিচয় দেননি, তারা অকারণ বাহুল্য বর্জন করেছেন। এক কথায় এই মন্দিরে দ্রাবিড় শিল্পরীতি আরও বেশি পরিশীলিত।

পরিশেষে বলা যায় যে পল্লব রাজাগণ উপরে বর্ণিত বিভিন্ন মন্দিরের মধ্য দিয়ে যে শিল্প ঐতিহ্য স্থাপন করেন, তাঁদের পরবর্তী চোল রাজাগণ তা ধারণ এবং বহন করেছিলেন।

চোল স্থাপত্য

চোল রাজাদের সময় মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় শৈলী একটি বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিল। প্রথম দিকের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলি সাধারণত আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও, সেগুলি গঠনরীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ। তাদের সঙ্গে পল্লব যুগের মন্দিরগুলির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক অতিশয় স্পষ্ট। পল্লব আমলের শেষ পর্বের মন্দিরগুলিতে যে পড়তা এসেছিল, চোলদের আদি পর্বের মন্দিরগুলি তা থেকে অনেকটা মুক্ত। এই মন্দিরগুলিতে সজীব শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। চোল রাজাদের এই প্রারম্ভিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পল্লব যুগের মন্দির স্থাপত্য চোল আমলের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

প্রথম পর্বের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে দুইটি, বিজয়ালয়চোলেশ্বর মন্দির এবং করঙ্গনাথের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন প্রথম চোল সম্রাট বিজয়ালয় এবং দ্বিতীয়টি, প্রথম পরান্তক। প্রথম মন্দিরটি বৃত্তাকার এবং তাই কিছুটা অস্বাভাবিক। কিন্তু এর স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ, তলযুক্ত বিমান শিখর এবং শীর্ষস্থ স্তূপিকা, সবই পল্লব ঐতিহ্যের স্মারক। করঙ্গনাথের মন্দির এই পর্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। একটি উপাসনাগৃহ এবং তৎসংলগ্ন মণ্ডপ দ্বারা গঠিত এই মন্দির সম্পূর্ণভাবে আধিক্য বর্জিত। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫০ ফুট। এই মন্দিরের পরিকল্পনা একান্তভাবে পল্লব যুগের। তবে এর অংশগুলির সরলীকরণের মধ্যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়

পাওয়া যায়। এর স্তম্ভগুলির আকারে ও পরিকল্পনায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়ে। তাছাড়া এই মন্দিরের সামান্য অলঙ্করণের মধ্যে পরবর্তী চোল রাজাদের অতি অলঙ্কৃত মন্দির স্থাপত্যের পূর্বাভাস দেখা যায়।

রাজরাজ চোল এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রচোল দ্রাবিড় মন্দির শিল্পে মহত্তন কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের অপ্রতিহত আধিপত্য এবং বিপুল সম্পদ সম্পর্কে সচেতন এই দুইজন চোল সম্রাট যে বিরাট মন্দির দুইটি নির্মাণ করেছিলেন তাকে তাদের ধর্ম ও সম্ভ্রমবোধের যোগ্য প্রস্তর নিদর্শন বলা যায়। প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তাঞ্জোরে। তাঞ্জোরের এই শিব মন্দির বৃহদীশ্বর অথবা রাজরাজ্যেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। এর নির্মাণ কার্য ১০০৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১০১০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। চোলদের নূতন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ড চোল পুরমে।

শুধুমাত্র আয়তনের জন্য তাঞ্জোরের মন্দিরকে দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের বলিষ্ঠতম নিদর্শন বলা যায়। তৎকালীন ভারতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে এটি বৃহত্তম এবং উচ্চতম। এই মন্দিরের বিমান, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং সম্মুখস্থ বৃহৎ নন্দি চত্বর, সবই একটি প্রশস্ত (৫০০ ফুট x ২৫০ ফুট) প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি ক্রমশ পাঁচিল দিয়ে কেন ঘেরা হয়েছিল, বলা যায় না। এই মন্দিরগুলিতে আক্রমণজনিত ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন একেবারে ছিল না, এমন নয়। তবে বাসাম মনে করেন যে, এটি প্রকৃত কারণ নয়। তাঁর মতে প্রকৃত কারণ হয়তো এই যে, মন্দিরগুলি রাজপ্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এই মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি গোপুরম। মন্দির প্রাঙ্গণে অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার মন্দিরও আছে। কিন্তু সবার উপরে মাথা তুলে আছে একটি সুবৃহৎ বিমান বা শিখর। চোদ্দতল, শীর্ষ দেশে একটি মাত্র প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত বৃহৎ গম্বুজ সমন্বিত এই বিমানের উচ্চতা ২০০ ফুট। এই মন্দির পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এর প্রকাণ্ড বিমান। বিমানের বিভিন্ন অংশের সরলতা একে একটি অপরূপ গাম্ভীর্য দান করেছে। এই বিমানকে তাই সমগ্র ভারতীয় স্থাপত্যের 'কষ্টিপাথর' বলা হয়েছে। সমগ্র মন্দিরের স্থাপত্যও কম আকর্ষণীয় নয়। পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত এর বিভিন্ন অংশের সংস্থান পরিচ্ছন্ন এবং অলঙ্করণ পদ্ধতি নিখুঁত। এই সব গুণের জন্য ছন্দোময়, সমভার এবং সম্ভ্রান্ত এই মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে বিবেচিত হয়।

তাঞ্জোর মন্দিরের প্রায় দুই দশক পরে রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমে তাঁর সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। একই মহতী পরিকল্পনা পিতা এবং পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করলেও, দ্বিতীয় মন্দিরের বিশদ ও জটিল চরিত্র দেখে মনে হয় যে, এর মধ্য দিয়ে পুত্র তাঁর পিতার গৌরবকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। এই মন্দিরটি নিঃসন্দেহে রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকালে চোল সাম্রাজ্যের অধিকতর সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

প্রাচীন বেষ্টিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের (৩৪০ ফুট × ১০০ ফুট) মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। এর মণ্ডপের আয়তন ১৭৫ ফুট × ১৫ ফুট। প্রকাণ্ড বিমান এবং এই মণ্ডপ একটি গলিপথ দ্বারা যুক্ত। মণ্ডপটি অপেক্ষাকৃত নিচু। এর সমতল ছাদ ১৫০টির বেশি সারিবদ্ধ স্তম্ভের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন, এই মণ্ডপের মধ্যে পরবর্তী কালের সহস্রস্তম্ভ দ্রাবিড় মণ্ডপের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

তাঞ্জোরের বিমানের তুলনায় গঙ্গাইকোণ্ড চালপুরমের বিমানের উচ্চতা কম (১৬০ ফুট)। প্রথম বিমানের বলিষ্ঠ সরল রেখাগুলি একে একটি পুরুষোচিত গাম্ভীর্য দান করেছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিমানের বক্ররেখাগুলি একে নারীসুলভ কমনীয়তায় মণ্ডিত করেছে। অনেকে বলেছেন যে, মহাকাব্য এবং গীতি কবিতায় যে পার্থক্য, দুইটি বিমানের পার্থক্য মোটামুটি তাই। অন্য ভাবে বলা যায় যে, একটি বিমান শক্তির প্রতীক এবং অপরটি সৌন্দর্যের। দুইটি মন্দিরেই স্থাপত্যের স্থান মুখ্য এবং অলঙ্করণের স্থান গৌণ। তবে রাজেন্দ্রচোলের মন্দির অলঙ্করণে কিছুটা অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে যে মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণ চোখে পড়ে, মনে হয় এই মন্দিরে তার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। চোল মন্দির দুইটির বিরাট আয়তন এবং সূক্ষ্ম অলঙ্করণের দিকে লক্ষ রেখে বলা হয়েছে যে, চোল শিল্পীরা পরিকল্পনা রচনা করতেন দৈত্যদের মতো, কিন্তু তাঁদের নির্মাণ কার্য শেষ করতেন মণিকারদের মতো।

রাজেন্দ্রচোলের পরে চোলদের সাম্রাজ্য মহিমা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তেমন স্থাপত্য শিল্পেও তাঁরা তাঁদের পূর্ব গৌরব হারিয়েছিলেন। মন্দির নির্মাণ এই পর্বেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু এই মন্দিরগুলি ছিল একান্তভাবে সাধারণ পর্যায়ের। একমাত্র অলঙ্কার বাহুল্য ভিন্ন তাঁদের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অন্য দিকে একটি অশুভ প্রবণতা এই পর্বে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে গোপুরমের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এই পর্বে সেগুলি ধীরে ধীরে আয়তনে, সংখ্যায় এবং জাঁকজমকে মূল মন্দিরকে আচ্ছন্ন, কখনও বা অতিক্রম করেছিল। কুম্ভকোনমের গোপুরম এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আদিনা মসজিদ

আদিনা মসজিদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হযরত পান্ডুয়া বা ফিরুজাবাদে অবস্থিত। এটি কেবল বাংলায়ই নয়, গোটা উপমহাদেশের মধ্যে বৃহত্তম মসজিদ। এর পেছনের দেয়ালে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে এটি ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ কর্তৃক নির্মিত। সিকান্দর শাহের মতো সুলতানের পক্ষে, যিনি ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে আরব ও পারস্যের সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম এবং পরে 'বিশ্বাসীদের খলিফা' বলে ঘোষণা করেছিলেন, এ ধরনের একটি মসজিদ নির্মাণ ছিল তাঁর সম্পদ ও প্রতিপত্তির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, একজন সুলতান যিনি নিজেকে দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা অথবা কায়রোর খলিফাদের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি ওই সকল রাজধানী শহরের মসজিদগুলির আকার ও আড়ম্বরের সঙ্গে তুলনীয় একটি মসজিদই নির্মাণ করবেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ যে, শুধু আকার-আয়তনেই আদিনা মসজিদ ওই নগরীসমূহের মসজিদগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়, নকশা ও গুণগত দিকেও এটি বিশ্বের সেরা মসজিদগুলির সমকক্ষ। 'আদর্শ' মসজিদ পরিকল্পনায় থাকে তিনদিকে খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথ এবং কিবলামুখী বিশাল প্রার্থনা কক্ষের মাঝখানে মুক্ত প্রাঙ্গন। এ বৈশিষ্ট্যগুলি আদিনা মসজিদে রয়েছে, তাই এটি একটি 'আদর্শ' মসজিদ।

মসজিদটির দেয়ালগুলির নিচের অংশ পাথর বাঁধানো ইট ও অন্য অংশগুলি কেবল ইটের। এর আয়তন এখনও যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি, তবে কোণের পলকাটা স্তম্ভসমূহসহ বাইরের দিকে প্রায় ১৫৫ মি × ৮৭ মি এবং ভেতরের দিকে খিলান আচ্ছাদিত পথসহ ১২২ মি × ৪৬ মি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ১২ মিটার প্রশস্ত খিলানপথে তিনটি 'আইল' এবং ২৪ মিটার প্রশস্ত প্রার্থনাকক্ষে পাঁচটি 'আইল' আছে, প্রার্থনা কক্ষকে বিভক্ত করেছে একটি প্রশস্ত খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় 'নেভ'।

এর আয়তন ২১১০ মিটার এবং এক সময় উচ্চতা প্রায় ১৮ মিটার, বর্তমানে এটি পতিত। এর বিস্তারিত সমীক্ষার অনুপস্থিতিতে, প্রস্তর স্তম্ভসমূহের দ্বারা গঠিত বর্গক্ষেত্রগুলির উপর নির্মিত মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ৩০৬ এবং ৩৭০ বলে অনেকের ধারণা। ক্রো-এর মতানুসারে, এ সংখ্যা ২৬০। স্তম্ভগুলি ভিত্তিমূলে বর্গাকার, মধ্যস্থলে গোলাকার এবং উপরে শীর্ষস্থানের দিকে বাঁকা। প্রার্থনা কক্ষের উত্তরে খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথের উপরের কয়েকটি ছাড়া গম্বুজগুলি ত্রিকোণবিশিষ্ট পেন্ডেন্টিভের উপর সংস্থাপিত। বর্তমানে পতিত গম্বুজগুলি, উল্টানো পানপাত্র আকারের ছিল যা সুলতানি আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় 'নেভ' খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথ অপেক্ষা অনেক উঁচু এবং পিপাকৃতি 'ভল্ট' দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, যা এর উচ্চতার জন্য গোটা কাঠামোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং অনেক দূর থেকে দেখা যেত। 'ভল্ট'-এর সম্মুখভাগ নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে; হয়ত এটা পারস্যদেশীয় 'আইওয়ান' (Iwan)-এর মতো আয়তাকার কাঠামো ছিল, অথবা এর শীর্ষদেশ উন্মুক্ত বা আচ্ছাদিত ছিল। পার্শ্বস্থ অবলম্বনসমূহ ও কার্নিশসহ খিলান আচ্ছাদিত পথের খিলানগুলির নকশা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খিলান-ছাদে অবশ্যই একটি ঈওয়ান-দ্বারপথ ছিল যা নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে সম্মুখভাগের নকশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, এবং সে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অব্যাহত রাখতে উপরে একটি উন্মুক্ত খিলানেরও প্রয়োজন ছিল। এরকম একটি উন্মুক্ত ও উচ্চ খিলান আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে নিশ্চয়ই উপযোগী ছিলনা, তবুও স্থাপত্য শিল্পের নিয়মনীতি অব্যাহত রাখতে গিয়ে স্থপতি অন্যরকম কিছু করতে পারেন নি। এ অসুবিধা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে স্থপতিগণ পরবর্তী কাজকর্মে, গৌড়-লখেনৌতির গুণমন্ত মসজিদ (পনেরো শতকের শেষার্ধ), পুরাতন মালদা জামে মসজিদ (১৫৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং এর সমকালীন রাজমহলের জামে মসজিদের 'ভল্টের' খিলানের উপর পর্দা সৃষ্টির চেষ্টা করে কেবল স্থাপত্য শৈলীকেই ধ্বংস করেছেন।

কিবলা দেয়ালের সন্নিকটে কেন্দ্রীয় 'নেভ'-এর উত্তর পাশে তিন 'আইল' জুড়ে একটি এলাকা এক সারিতে সাতটি মজবুত স্তম্ভের উপর পাথরের প্লাটফরম (মাকছুরা) সুলতান ও তার সঙ্গীদের প্রার্থনার স্থান হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্লাটফরমটির পশ্চিম দেয়ালের উত্তর পাশে সুলতান ও তার সঙ্গী-সাথীদের প্রবেশের জন্য দুটি দেউড়ি রয়েছে। গ্যালারির প্লাটফরমটির অবশ্যই পর্দা-পাঁচিল ছিল, যা বর্তমানে বিলুপ্ত। গ্যালারিটির বর্তমান সৌন্দর্য অভ্যন্তরস্থ দশটি পলকাটা স্তম্ভ এবং সামনের দিকে খোদাইকর্ম অলঙ্কৃত, টাইলস ও 'সুলস' রীতির হস্তলিখন পদ্ধতিতে শিলালেখ দ্বারা সজ্জিত তিনটি মিহরাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন নকশায় বিভাজিত চিকন স্তম্ভসমূহের উপর মিহরাবগুলির খিলানসমূহ মসজিদের নিচতলার মিহরাবগুলির মতো পলকাটা। প্লাটফরমটি মসজিদের একটি উপর তলা হওয়ায় এ অংশের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্যালারির উপর নির্মিত গম্বুজগুলির উচ্চতা বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

কেন্দ্রীয় 'নেভ'-এর উত্তর পশ্চিম কোণ এবং প্রধান মিহরাবের ডানদিকে রয়েছে এক অনিন্দ্য নিদর্শন চাঁদোয়া শোভিত মিম্বর। ধাপগুলির মধ্যে প্রায় আটটি বর্তমানে বিলুপ্ত, কিন্তু চাঁদোয়া-আচ্ছাদিত অংশের ছোট মিহরাবসহ এর পার্শ্ব দেয়ালে স্বল্পোৎকীর্ণ বিমূর্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী নকশাসমূহ শিল্পীদের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। পববর্তী কিছু কাজেও এ মিম্বরের প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, লখেনৌতির দরসবাড়ি মসজিদ এবং ছোট পান্ডুয়ার বরী মসজিদ (স্থাপত্য আদর্শের ভিত্তিতে নির্ণীত সময়কাল পনেরো শতকের শেষার্ধ)।

আদিনা মসজিদের একটি বহুল আলোচিত অনুষঙ্গ হচ্ছে মসজিদের পেছনে সিকান্দর শাহ-এর তথাকথিত সমাধি কক্ষ। সম্ভবত পরবর্তী সময়ের একটি পাথরের শবাধার সমাধি কক্ষের মেঝেতে আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে এ কাহিনী গড়ে ওঠে। কিন্তু এ

শবাধার সিকান্দার শাহ-এর সমাধি প্রস্তর হতে পারে না। এর সহজ যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ হলো প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে বিরাট প্রস্তর স্তম্ভের অবস্থান এবং শবাধারটির অবস্থান প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানে নয়, মেঝের পশ্চিম প্রান্তে। বাদশাহদের কবর সাধারণত এক গম্বুজ বিশিষ্ট দালানে হয়ে থাকে এবং শাসকের দেহটি থাকে প্রকোষ্ঠের মাঝখানে এবং গম্বুজটি তার উপরে স্বর্গীয় খিলান ছাদের (vault) নিদর্শন। বর্তমান ক্ষেত্রে মধ্যস্থানে একটি গম্বুজের পরিবর্তে দালানটির উপর নয়টি সম-আকারের গম্বুজ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজকীয় গ্যালারির একই উচ্চতায় দালানটির স্তম্ভগুলির উপর একটি প্ল্যাটফরম রয়েছে এবং এতে প্রবেশের জন্য দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্লাটফরমটির উত্তরপাশের পশ্চিম দিক হতে একটি সংযোগ-স্থাপক ঢালু পথ উপরে এসে মিলেছে। নিশ্চিতভাবে এটা ছিল প্রার্থনার জন্য গ্যালারিতে প্রবেশের পূর্বে রাজকীয় সহচরদের বিশ্রামস্থান। সুতরাং তথাকথিত সমাধি প্রকোষ্ঠটি মসজিদের রাজকীয় গ্যালারির একটি 'অ্যান্টি চেম্বার' বা দেউড়ি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পরবর্তীকালের মসজিদগুলিতে এ ধরনের বিস্তীর্ণ কক্ষ দেখা না গেলেও, গ্যালারিতে উঠার সিড়ির ধাপসমূহে ছোট ছোট প্লাটফরম দেখা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে ভূ-সমতলে বেষ্টনকৃত পেছনের দরজা দুটি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সুলতানের জন্য নয়, মসজিদের নিচতলায় অবস্থান গ্রহণকারী রক্ষীদল বা সাধারণ অনুচরদের জন্য করা হয়েছিল। পশ্চিমদিকে গম্বুজাকৃতি প্লাটফরমের কাঠামো এবং এতে আরোহণের জন্য সংযোগ-স্থাপক ঢালু পথ ও এর নিকটস্থ একটি মিনার মসজিদের এদিকটিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ফলে পূর্বদিকে আকর্ষক প্রবেশপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি।

মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কালের চাপ উপেক্ষা করে খিলান ছাদযুক্ত প্রবেশদ্বারসহ পশ্চিম দেয়ালের অংশবিশেষ মাত্র টিকে আছে। মসজিদটির অলঙ্করণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি, স্তম্ভসমূহের কাঠামোগত নকশা, পেন্ডেন্টিভ, মিহরাব, সম্মুখ ভাগের টেরাকোটা, টালির অলঙ্করণ এবং হস্তলেখ শিল্পসমৃদ্ধ শিলালেখসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়। উপরিভাগের অন্যান্য অ-লেখ অলংকরণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় উদ্ভিজ নকশা, গোলাপ সদৃশ ফুলের নকশা, বিমূর্ত 'অ্যারাবেস্ক' নকশা, জ্যামিতিক নকশা, বর্ণনাতীত জটিল নকশাসমূহ। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। যদিও অবস্থান ও নকশাগত দিক থেকে আলঙ্কারিক বিষয়বস্তুর কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তবে কোনো একটি বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপর একটির সদৃশ নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃজনশীলতা। মসজিদ অলংকরণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত এবং বহির্ভাগ, উভয় দিক হতেই, আদিনা মসজিদ একটি উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছে, যার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা থেকে পরবর্তীকালে সুলতানি আমলের বাংলার স্থাপত্যশিল্পে বেশ কিছু অনন্য সাধারণ ইমারত নির্মিত হয়েছে। [এ.বি.এম হোসাইন]

তিরুপতি মন্দিরের নানান প্রথা

'প্রসাদম্'

তিরুমালার বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে 'প্রসাদম্' বা প্রসাদ হিসেবে দেবতাকে নিবেদন করা হয় বিখ্যাত 'তিরুপতি লাড্ডু'। এই লাড্ডুর জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ রয়েছে। কেবলমাত্র তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম্ই এই লাড্ডু তৈরি বা বিক্রি করতে পারে।

এই মন্দিরে নিবেদিত অন্যান্য প্রসাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দদ্দোজনম্' (দই-বরফ), 'পুলিওহোরা' (তেঁতুল-ভাত), 'বাদা' ও 'চক্কেরা-পোঙ্গালি' (মিষ্টি পোঙ্গল), 'নির্যালা-পোঙ্গালি', 'আপ্পাম', পায়স, জিলিপি, 'মুরকু', দোসা, 'সিরা' (কেশরী) ও 'মালহোরা'। তীর্থযাত্রীদের রোজ বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার 'তিরুপাবদ সেবা'য় নানারকম খাদ্যসামগ্রী নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করা হয়।

মস্তক মুণ্ডন

তিরুমালা বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের একটি বিশেষ প্রথা হল 'মোক্কু' (মাথার চুল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন)। প্রতিদিন প্রায় এক টন চুল মন্দিরে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত চুল বছরে কয়েক বার আন্তর্জাতিক বিক্রেতাদের কাছে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এগুলি কৃত্রিম চুল রোপণ, ও সজ্জাদ্রব্য হিসেবে তারা কিনে নেয়। চুল বিক্রি করে মন্দিরের কোষাগারে বছরে ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সঞ্চিত হয়। হুন্ডি সঞ্চয়ের পরই এটি মন্দিরের দ্বিতীয় বৃহত্তম আয়ের উৎস।

কথিত আছে, রাখাল যখন বেঙ্কটেশ্বরের মাথায় আঘাত করেছিল, তখন তাঁর মাথার একটি অংশের চুল পড়ে গিয়েছিল। নীলাদেবী নামে এক গন্ধর্ব রাজকুমারী সেটি দেখতে পান। তাঁর মনে হয়, বেঙ্কটেশ্বরের এত সুন্দর মুখে কোনো খুঁত থাকা উচিত নয়। তিনি নিজের চুলের একটু অংশ কেটে নিয়ে তাঁর জাদুশক্তির সাহায্যে সেটি বেঙ্কটেশ্বরের মাথায় প্রতিস্থাপন করে দেন। নারীশরীরে চুল একটি সুন্দর সম্পদ। তাই বেঙ্কটেশ্বর নীলাদেবীর এই আত্মত্যাগ দেখে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর মন্দিরে আগত প্রত্যেক ভক্ত বেঙ্কটেশ্বরকে নিজেদের মাথার চুল অর্পণ করবেন এবং সেই চুল নীলাদেবী পাবেন। তাই ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা নীলাদেবীকেই চুল নিবেদন করছেন। উল্লেখ্য, তিরুমালার সাতটি পর্বতের অন্যতম নীলাদ্রি এই নীলাদেবীর নামেই উৎসর্গিত।

'হুন্ডি' (দানপাত্র)

কথিত আছে, বেঙ্কটেশ্বরকে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়েছিল। শেষাদ্রি পর্বতে দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বেঙ্কটেশ্বর কুবের ও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার কাছ থেকে ১১,৪০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এই কথা স্মরণ করে ভক্তেরা তিরুপতি বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের 'হুন্ডি'তে (দানপাত্র) অর্থ দান করেন। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, ভক্তদের দানের অর্থ দিয়ে বেঙ্কটেশ্বর কুবেরের ঋণ পরিশোধ করছেন। ২২৫,০০০,০০০ টাকা হুন্ডিতে সঞ্চিত হয়। মন্দিরে সোনা দান করেও ভক্তেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মন্দির সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে, ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে হুন্ডিতে প্রদত্ত দানের থেকে ৩,০০০ কিলোগ্রাম সোনা ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে সঞ্চিত হয়েছে। পূর্বের কয়েক বছরে এই সোনা হুন্ডিতে জমেছিল।

'তুলাভারম্'

'তুলাভারম্' তিরুমালা বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। এই প্রথায় একটি তুলাদণ্ডের একদিকে ভক্ত নিজে বসেন এবং অন্যদিকে তাঁর সমান ওজনের চিনি, তালমিছরি, তুলসীপাতা, কলা, সোনা বা মুদ্রা রাখেন। সেই সব দ্রব্যসামগ্রী বেঙ্কটেশ্বরকে দান করা হয়। 'তুলাভারম্' প্রথায় সাধারণত সদ্যোজাত শিশুদেরই ওজন করা হয়ে থাকে।

জগন্নাথ মন্দির

আবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রথ যাত্রা উপলক্ষে অনেক মানুষের সমাগম হয়। এখানেও দেবতার ধন ভাণ্ডার নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই। মন্দিরের গোপন কক্ষে সাতটি ঘর আছে। সেই ঘরগুলিই হল রত্নভাণ্ডার। ৩৪ বছর আগে মাত্র তিনটি ঘরের তালা খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন কর্মকর্তারা। বাকি ঘরগুলিতে কী আছে, তা আজও রহস্যই রয়ে গিয়েছে। শ্রীজগন্নাথের 'ব্রহ্মবস্তু'র মতোই রত্নভাণ্ডারের রহস্য অধরাই রয়ে গিয়েছে। যে কক্ষগুলি খোলা সম্ভব হয়েছিল, সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১৮০ রকমের মণিমুক্তো খচিত স্বর্ণ অলঙ্কার। যার মধ্যে আছে মুক্তো, প্রবালের মতো অত্যন্ত দামী পাথর। এছাড়া, ১৪৬ রকমের রৌপ্য অলঙ্কার। তবে, এই সবই 'ভিতর রত্নভাণ্ডার'-এর কথা। 'বাহার ভাণ্ডার'-এর চিত্র কিছুটা অন্যরকম। পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দির আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী রেকর্ড জানার অধিকারে ১৯৭৮ সালে তালিকা তৈরি হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী, বাহার ভাণ্ডারে ১৫০ রকমের স্বর্ণ অলঙ্কার আছে। যার মধ্যে তিনটি স্বর্ণহার আছে। যার এক একটির ওজন প্রায় দেড় কেজি। শ্রীজগন্নাথ এবং বলভদ্রের স্বর্ণ শ্রীভুজ ও শ্রীপায়রের ওজন যথাক্রমে সাড়ে ৯ কেজি এবং সাড়ে ৮ কেজি। জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার স্বর্ণ মুকুটের ওজন ৭ কেজি, ৫ কেজি এবং ৩ কেজি। ১৯৭৮ সালের ১৩ থেকে ২৩ মে'র মধ্যে পুরী মন্দির প্রশাসনের তৈরি হিসেব অনুযায়ী, মণিমুক্তো খচিত ১২০ কেজি ৮৩১ গ্রাম স্বর্ণ অলঙ্কার, ২২০ কেজি ১৫৩ গ্রাম রৌপ্য অলঙ্কার, রুপোর বাসনপত্র সহ বিভিন্ন দামী বস্তু রত্নভাণ্ডারে পাওয়া গিয়েছে। প্রতি বিজয়াদশমী, কার্তিক পূর্ণিমা, পৌষ পূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমার দিন শ্রীক্ষেত্রে ভক্তদের সামনে রাজবেশে দর্শন দেন মহাপ্রভু। তাঁর সেই সজ্জা দেখে ভক্তরা ধন্য ধন্য করেন। যে সব অলঙ্কারে জগন্নাথদেবকে সাজানো হয়, সেগুলি হল, শ্রীচরণে শ্রীপায়র, হাতে শ্রীভুজ, কর্ণে কীরিটি, ওড়না, সূর্যচন্দ্র, কানা, আড়াকানি, ঘাগরা, মালি, কদম্বমালি, তালিকচন্দ্রিকা, অলকাতিলকা, ঘোবা কণ্ঠী, স্বর্ণচন্দ্র, রৌপ্য শঙ্খ, হরিদা, সেবতী মালি। দাদা বলভদ্রের অঙ্গে থাকে শ্রীপায়র, শ্রীভুজ, শ্রীকীরিটি, অধ্যয়নী কুণ্ডর, সূর্যচন্দ্র, আড়াকানি, কদম্বমালি, তিলক চন্দ্রিকা, হল, মুষল, বহড়া মালি। সুভদ্রার অঙ্গে থাকে শ্রীপায়র, শ্রীভুজ, কীরিটি, ওড়না মালি, ঘাগরা মালি, কানা মালি, সূর্যচন্দ্র, আদাকানি, সেবতী মালি তড়াগি ইত্যাদি।

৫.৩.৮.৪ উপসংহার

এই ভাবে দেখা গেল ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন জনপ্রিয় ও প্রধান প্রথার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে,লোক সংস্কৃতির যেমন তাতে অবদান আছে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সেখানে সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

৫.৩.৮.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) Discuss different temple styles with special reference to Gupta Temples.

২) Discuss any one south Indian Temple Style.

৩) Discuss the features of Islamic architecture with special reference to Adina Mosque.

8) What are the socio-economic importance of Temples?

৫.৩.৮.৬ সহায়ক গ্রন্থ

George Michell (1988), The Hindu Temple: An Introduction to Its Meaning and Forms, University of Chicago Press

Stella Kramrisch, *The Hindu Temple*, Vol 2, Motilal Banarsidass

Susan Lewandowski, The Hindu Temple in South India, in Buildings and Society: Essays on the Social Development of the Built Environment, Anthony D. King (Editor)

Abid Ali and HE Stapleton, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1931;

AH Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, 1961;

George Michell ed, *The Islamic Heritage of Bengal*, Paris, 1984.

পর্যায় গ্রন্থ- ৪

একক- ৯,১০,১১

৫.৪.৯.০ ভূমিকা

৫.৪.৯.১ বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ

৫.৪.১০.২ বাংলার লোকসংস্কৃতি

৫.৪.১১.৩ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য

৫.৪.১১.৪ উপসংহার

৫.৪.১১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৫.৪.৮.০ ভূমিকাঃ

বর্তমান পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে, এবং তার সাথে ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হবে তারা। এর মাধ্যমে সমাজের নানা দিক ফুটে উঠবে।

৫.৪.৮.১ **বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশঃ**

আসামঃ

বিহু অসমের জাতীয় উৎসব। বিহুর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই উৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসঙ্গে উদযাপন করেন। বিহু মূলতঃ এক কৃষি ভিত্তিক উৎসব। মূলতঃ তিন প্রকার বিহু উৎসব পালিত হয়, এগুলি হল ব'হাগ বিহু বা রঙ্গালী বিহু, কাতি বিহু বা কঙ্গালী বিহু এবং মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু।

বিহু শব্দের উৎপত্তি

'বিহু' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মতবাদ আছে, কিন্তু কোনো মতই সর্বসম্মত নয়। কোনো পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত 'বিষুবত' শব্দ থেকে বিহু শব্দের উদ্ভৱব হয়েছে।বৈদিক 'বিষুবন' শব্দের অর্থ বছরের যে সময়ে দিন এবং রাত সমান হয়। অনেকের মতে, বিহু শব্দটি বৈ (উপাসনা) এবং হু (গরু) এই শব্দ দুটি থেকে এসেছে। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার মতে বিহু শব্দটি কৃষিজীবী ডিমাসা জনজাতির মধ্যে প্রচলিত শব্দ। তাঁরা তাঁদের দেবতা ব্রাই শিবরাইকে শস্য উৎসর্গ করে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্ররার্থনা করেন। বি শব্দটির অর্থ প্রার্থনা করা এবং শু শব্দের অর্থ শান্তি ও সমৃদ্ধি। বিশু শব্দ থেকে বিহু শব্দের উৎপত্তি। অন্যমতে হু শব্দটির অর্থ দান করা।

বহাগ বিহু বা রঙ্গালী বিহু

অসমর মূল বিহু উৎসব বসন্তের শুরুতে উদযাপন করা হয়। রঙ্গালী বিহু যৌবনের উৎসব। বহাগ বা রঙ্গালী বিহু সাতদিন ধরে উদযাপন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে পরের মাসে ৬ তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব হয়ে থাকে। এই সাত দিনে প্রত্যেক দিনে বিহুর পৃথক নাম রয়েছে। একে সাত বিহু বলে জনা যায়। এই উৎসবে কৃষকেরা ধান উতপাদনের জন্য জমি প্রস্তুত করেন এবং মহিলারা পিঠা, নাড়ু প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এই বিহুর প্রথম দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন গরু বিহু নামে পরিচিত। এই দিন গরুদের পরিষ্কার করিয়ে পূজা করা হয়।পরের দিন মআনুহ বিহু বা মানুষ বিহু পালন করা হয়। এই দিন নতুন বস্ত্র পরিধান করে নতুন বছর উদযাপন করা হয়। পরের দিন দেবতার মূর্তিকে স্নান করিয়ে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে 'গোঁসাই বিহু বলে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বিহুগীত সহযোগে বিহু নৃত্যের মাধ্যমে যুবক যুবতীরা উৎসব পালন করে থাকেন।

রঙ্গালী বা বহাগ বিহু অনুষ্ঠান

রঙ্গালী বা বহাগ বিহু হচ্ছে আনন্দের বিহু। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকেই গান-বাজনা ও বিহু নৃত্যের মাধ্যমে রঙ্গালী বিহু অনুষ্ঠান পালন করা হয়। রঙ্গালী বিহু মূঃলত অসমিয়া জাতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিন্তু এখানে অসমের বিভিন্ন জনজাতি যেমন: বড়ো, তিবা, কছাড়ি ইত্যাদি জনজাতিরা নিজেদের সাংস্কৃতি প্রকাশ করার সুযোগ পায়। অসমীয়া সংস্কৃতির বাদ্যযন্ত্র ঢোল, পেপা, বাশি ব্যবহার করে গাওয়া গান ও বিহু নর্তকদের নাচ বিহু মঞ্চকে সুমধুর করে তোলে।

উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানটি বিনামুল্যে উপভোগ করার সুবিধা দেওয়া হয় । এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট- বড় সবাই নিজের প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সাধারনতঃ এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যাকাল থেকে আরম্ভ হয় ও পরদিন সূর্য উদয় হওয়ার ঠিক পুর্বে সমাপ্ত করা হয়। আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী দ্বারা গানের অনুষ্ঠান করা হয়। আগেকার বিহু অনুষ্ঠানে কেবল বিহু ও অসমীয়া গান গাওয়ার অনুমতি ছিল কিন্তু বর্ত্তমান দিনে স্থানভেদে হিন্দী, বাঙ্গালী ও নেপালী গান গাওয়ার প্রচলন হয়েছে।

কাতি বিহু বা কঙ্গালী বিহু

কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কাতি বিহু উদযাপিত হয়৷ এইসময় আঊশ ধানের চাষ শেষ হয়। এই বিহুকে কঙ্গালী বিহুও বলা হয়ে থাকে। এই সময় কৃষকদের শস্যভান্ডার প্রায় শূন্য থাকে এবং শস্য মাঠে ফলনশীল অবস্থায় থাকে। এই বিহুতে তুলসী রোপন করে তার সামনে, ক্ষেতে, শস্য ভান্ডারে ও বাড়িতে মাটির তৈরী প্রদীপ বা সাকি জ্বালানো হয়। ফলনশীল ধানকে রক্ষা করার জন্য কৃষক একটি বাঁশদন্ড ঘুরিয়ে *রোয়া-খোয়া* নামক মন্ত্র উচ্চারণ করে অশুভ শক্তি ও পোকামাকড়কে দূরে সরানোর চেষ্টা করেন। বিকেলবেলায় গৃহপালিত পশুদের পিঠা খাওয়ানো হয়। এই বিহুতে লম্বা বাঁশদন্ডের ডগায় আকাশ বন্তি বা আকাশি গঙ্গা নামক প্রদীপ জ্বালিয়ে মৃতদের আত্মার স্বর্গের রাস্তা দেখানোর রীতিও প্রচলিত।কাতি বিহুতে তুলসী গাছের সামনে আর ক্ষেতে প্রদীপ জ্বালানো হয়

মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু

মাঘ মাসে ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু পালন করা হয়। ভোগালী শব্দটি ভোগ বা খাদ্য থেকে এসেছে।এই বিহু তিন দিন ধরে পালন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনের বিকেলবেলায়, যা উরুকা নামেও পরিচিত, যুবকেরা নদীর তীরে মাঠে উৎপাদিত শস্যের খড় দিয়ে ভেলাঘর নামক কুটীর নির্মাণ করেন এবং তা দিয়ে রাত্রে মেজি নামক আগুন জ্বালিয়ে উৎসব পালন করেন। রাত্রিবেলায় তাঁরা মেজির চারপাশে জড়ো হয়ে বিহুগীতের গান করেন, ঢোল আদি বাদ্যযন্ত্র বাজান এবং সমবেত ভাবে খাবার খান। পরের দিন সকালে তাঁরা স্নান করে মূল মাজিতে আগুন জ্বালান এবং ঐ আগুনে পিঠা ও সুপুরি ছুঁড়ে দেন। এরপর তাঁরা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করেন। এরপর এলাকার ফলগাছগুলিতে শস্য বেঁধে দেওয়া হয়। এই দিন সারাদিন ধরে মোষের লড়াই, মোরগের লড়াই প্রভৃতি ক্রীড়া চলতে থাকে। আহোম রাজত্বকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিহু পালন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। বিহুর সময় রংঘড় প্রাঙ্গনে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হত। আহোম রাজার সেখানে উপস্থিত থেকে এই উৎসব উপভোগ করিতেন। সেই সময় থেকে অসমে মহিষের যুদ্ধ, মোরগের যুদ্ধ ইত্যাদির প্রচলন হয়েছে বলে জানা যায়। বিহুর উরুকা দিনে নির্দিষ্ট পুকুর, খাল বা অন্য কোন জলাশয় থেকে সবাই একত্রে মাছ ধরেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মাছ ধরে আনন্দ উপভোগ করেন। এই প্রথার মাধ্যমে সকলেরা পুকুর, খাল বা অন্য জলাশয় থেকে আহরণ করা মৎস দ্বারা রাত্রের ভোজন করেন। উরুকার রাত্রে যুবকেরা অন্যের গৃহ থেকে শস্য, ক্ষেত থেকে ফসল চুরি করার পরম্পরা রয়েছে। চুরি করার প্রথা থাকার জন্য এই বিহুকে চোর বিহু নামেও জানা যায়।

অম্বুবাচী

অম্বুবাচী মেলা হিন্দু ধর্মের বাৎসরিক উৎসব। লোকবিশ্বাস মতে আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা ঋতুময়ী হয়। এই সময়টিতে অম্বুবাচী পালন করা হয়। অম্বুবাচীর দিন থেকে পরর্বতী তিন দিন পর্যন্ত কামাখ্য দেবীর দুয়ার বন্ধ থাকে ও এই সময়ে কোনো ধরনের মাংগলিক কার্য করা যায়না। চতুর্থ দিন থেকে মঙ্গলিক কাজে কোনো বাধা থাকেনা। অম্বুবাচীর সময় লাঙ্গল ধরা, গৃহ প্রবেশ, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজ করা নিষিদ্ধ থাকে ও এই সময়ে মঠ-মন্দিরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে।

অম্বুবাচী মেলা

অম্বুবাচীর সময় হিন্দু ধর্মীয় লোকেরা শক্তি পূজার স্থানগুলোতে আয়োজন করা উৎসবকে অম্বুবাচী মেলা বলা হয়। ভারতের অসম রাজ্যের গুয়াহাটি শহরের কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে প্রতি বৎসর অম্বুবাচী মেলার আয়োজন করা হয়। আম্বুবাচী আরম্ভের প্রথম দিন থেকে কামাখ্যা দেবীর দ্বার বন্ধ রাখা হয় ফলে আম্বুবাচীর সময় দেবী দর্শন নিষিদ্ধ থাকে। চতুর্থ দিন দেবীর স্নান ও পূজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর কামাখ্যা মাতার দর্শন করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আসা লক্ষ লক্ষ ভক্তেরা (বর্তমান দিনে বিদেশ থেকে আসে) কামাখ্যা মন্দিরের চতুর্দিকে বসে কীর্ত্তন করেন। মন্দিরের বাহিরে প্রদীপ ও ধূপকাঠী জ্বালিয়ে দেবীকে প্রনাম করেন। অম্বুবাচী নিবৃত্তির দিন পান্ডারা ভক্তদের রক্তবস্ত্র উপহার দেন। দেবী পীঠের এই রক্তবস্ত্র ধারণ করিলে মনোকামনা পূর্ণ হয় বলে ভক্তেরা বিশ্বাস করেন। এই রক্তবস্ত্র পুরুষেরা ডানহাত বা গলায় ও মহিলারা এই বস্ত্র বাওহাত বা গলায় পরিধান করেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করে শ্মশান বা মৃতের ঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ। কামাখ্যা ধামের অম্বুবাচী মেলা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সংস্কৃতি

উৎসব

মিজোদের তিনটি বড় উৎসব রয়েছে: মিম কুট (গরস কঁঃ) ছাপচার কুট (ঈযধঢ়পযধৎ কঁঃ) এবং পাউল কুট(চধষি কঁঃ)। এ তিনটি উৎসব কোন না কোন ভাবে কৃষিকর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

মিম কুট

এ উৎসবটি সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভুট্টা ফসল ঘরে তোলার সময় অনুষ্ঠিত হয়। মৃত আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণে উৎসর্গীকৃত এ উৎসবটির মূলে রয়েছে কালের স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেতনা। মৃতদের স্মরণে তৈরী একটি উঁচু মাচানের উপর প্রথম ফসল উৎসর্গ করা হয়।

ছাপচার কুট

বসন্তকালে জুম কাটা শেষ হলে এ উৎসবটি পালন করা হয়। মিজোদের সব চাইতে আনন্দময় উৎসব এটি। ঋতুটিও খুবই উপযোগী। বসন্ত ঋতুকে জায়গা করে দিয়ে শীত ধীরে ধীরে বিদায় নেয়। এ সময় প্রকৃতি পুনরুজ্জীবন লাভ করে ও মানুষের জীবনে সজীবতা বয়ে নিয়ে আসে।

বয়স ও লিঙ্গ ভেদে মিজোরা এ উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত হয়ে ছেলেমেয়েরা নাচের উৎসবে মেতে উঠে যা অনেক সময় সারা রাত ধরে চলতে থাকে।

পাউল কুট

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফসল কাটার পরে এ উৎসবটি উদ্যাপিত হয়। এখানেও ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয় কারণ জমি কর্ষণ ও ফসল কাটার মত কঠিন কাজটি এখন শেষ হয়েছে। সমবেত ভুরি ভোজন ও নাচের আয়োজন হয়। স্মারক মাচানের উপর মায়েরা বসে তাদের শিশু সন্তানদের খাওয়ায়। ঈযধঢ়পযধৎ কঁঃ উৎসব উদ্যাপনকালে যে সামাজিক প্রথাটি পালন করা হয় তা ঈযযধহিমযহধঃি নামে পরিচিত। তঁভধহম বা ধেনো মদ পানও এ উৎসবের একটি অংশ। দু'দিন ধরে উদ্যাপিত এ উৎসবের পরের পুরো একটি দিন বিশ্রামের দিন। এ দিন কেউই কাজে বেরোয় না।

নৃত্য[

মনোরম পরিবেশ ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ মিজোরা জাতি হিসেবে প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত মিশুক। গান করতে যেমন, নাচতেও মিজোরা ভালবাসে। তারা এমন কিছু লোকজ ও সমবেত নৃত্যের জন্য গর্ব করতে পারে যা তারা কালের ধারায় বংশানুক্রমে ধারণ করে আসছে। মিজোদের নাচগুলো তাদের উচ্ছল ও নিরুদ্বেগ প্রাণসত্তার প্রকাশ । এটি এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মিজোদের নাচগুলো মঞ্চের উপর অনুষ্ঠানযোগ্য কোন কর্ম নয়। এটি তারা স্বভাবগত ভাবে বিকশিত করেছে সমবেত ভাবে সম্পৃক্ত হ'তে ও অংশগ্রহণ করতে।

চিরাউ

মিজো নাচের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণিল এ ঈযবৎধি নৃত্য। এ নাচে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশগুলো ঠুকলে যে শব্দ বেরোয়, সেই শব্দই এ নাচের তাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নৃত্যশিল্পীরা সমান্তরাল একজোড়া বাঁশের মধ্যে পরিবর্তন সাপেক্ষে একবার লাফিয়ে ঢুকে আবার বোরয়ে এসে এবং জোড়া বাঁশের একদিক থেকে অন্যদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ করতে থাকে। কিছু ব্যক্তি উভয় পার্শ্বে মুখোমুখি বসে বাঁশগুলোকে মাটি বরাবর ধরে রাখে। ছন্দোময় তালে তারা বাঁশগুলোকে ঠুকে পর্যায়ক্রমে একবার ফাঁক ও একবার সংযুক্ত কারে। এটি নাচের গতিকেও নির্দেশ করে। এ নাচে পা ফেলা ও তার ধরনের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে এবং তা অঞ্চলভেদে ভিন্নও। আজকাল চিরাউ নাচটি যে কোন সময়ে করা হয়। কিন্তু আগেকার দিনে সন্তান প্রসবের সময় মরে যাওয়া মায়ের আত্মার নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য এ নাচ করা হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে অনুরূপ তাদের নিজস্ব বাঁশনৃত্য রয়েছে। মিজোরাম, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ১০ হাজার নৃত্যশিল্পীর অংশগ্রহণে ঈযবৎধি নাচের অনুষ্ঠানটি করে বৃহত্তম গণ-বাঁশ নৃত্য হিসেবে ''গিনেস বুক''-এর রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে।

কোনো দেশকে জানতে চাইলে সেই দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুধু তা-ই নয়, সেখানকার উৎসবগুলোও দেশটিকে জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎসবের মধ্য দিয়ে একটি জাতির স্বকীয়তা, নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্খা ও আনন্দ-উদ্দীপনার এক উজ্জ্বল রূপ প্রকাশিত হয়।

কেরালার জাতীয় উৎসব ‘ওনাম’ সেখানকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানার এক প্রধান উৎস। কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যে ভাষা ও জাতিগত মিল যেমন আছে, তেমনি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অমিলও প্রচুর। সময় ও উৎসব পালনের রীতিনীতির দিক থেকে কেরালার জাতীয় উৎসব ওনামের সাথে প্রতিবেশী তামিলনাড়ুর পঙ্গল বা কর্ণাটকের দশেরার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

সার্বজনীন ও ধর্ম নিরপেক্ষ এক উৎসব ওনাম

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে কেরালার ওনাম উৎসবটি পালিত হয়। এটি সেখানকার সবচেয়ে বড় এবং ঐ অঞ্চলের সবার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক উৎসব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উৎসবের সাথে ওনামের পার্থক্য আছে। এই উৎসব সার্বজনীন ও ধর্ম নিরপেক্ষ।

ওনামের উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু পুরাণের এক কাহিনী। তা সত্ত্বেও কেরালার সব ধর্মাবলম্বী মানুষষের কাছে ওনাম বেশ তাৎপর্যবাহী এক উৎসব হিসেবে বিবেচিত। এর পেছনে কারণও রয়েছে। খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান কেরালার এক ঐতিহাসিক সত্য। সমাজ জীবন, পোশাক-আশাক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে কেরালার হিন্দু, খ্রিস্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কেরালার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক মুহম্মদ বশির, কমলা সুরাইয়া এবং জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা মামুট্টি ছিলেন মুসলমান। একসময়ের জনপ্রিয় গায়ক যিশু দাস ছিলেন খ্রিস্টান। এমনকি হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যমন্ডিত বিখ্যাত কথাকলি নৃত্যের আবহসঙ্গীতের নামকরা একজন জনপ্রিয় গায়কের নাম হায়দার আলী। শুধু তা-ই নয়, সামাজিক অনাচার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সব সম্প্রদায়ের যুবকরা সমানে উৎসাহী। বহু বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক কেরালার জনগণ তাই এই ওনাম উৎসবকে নিজেদের জীবনের সাথে একাত্ম করে নিয়েছে। সব ধর্মের মানুষের এক মিলন মেলা এই উৎসব। রাজ্যের সমস্ত ধর্মের, জাতের মানুষ একত্রিত হন এই উৎসবে।

ওনাম উৎসবের সাথে সম্পর্কিত পৌরাণিক গল্পগাঁথা

পুরাণের যে চরিত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই উৎসব পালিত হয়, তিনি কোনো দেবতা নন, তিনি একজন অসুর। তার নাম মহাবলী। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, পুরাকালে এই অসুররাজ কেরালায় রাজত্ব করতেন। তখন কেরালার স্বর্ণযুগ। অসুর হয়েও রাজ্যের সকল প্রজার প্রতি ছিল তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি। রাজ্যে ছিল না কোনো অভাব, ছিল না ঐশ্বর্যের কমতি।

সেই সাথে মহাবলী ছিলেন তেজস্বীও। তার দাপটে দেবতারা সর্বদা থাকতেন তটস্থ। দেবতাদের আসন তখন টলমল অবস্থায়। ফলে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। অসুররাজকে দমন করার জন্য ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার রূপে কেরালায় অবতীর্ণ হলেন। মহাবলী যেমন বীর, তেমনি দানশীল। সাহায্যপ্রার্থী কাউকে তিনি ফেরাতেন না। এই সুযোগটি নিলেন বিষ্ণু। তিনি সাহায্যপ্রার্থী হয়ে মহাবলীর কাছে উপস্থিত হলেন।

বামন দেব মহাবলীর কাছে বসবাসের জন্য তিন পদক্ষেপ মাপের জমি চাইলেন। মহাবলি বামনরূপী বিষ্ণুকে চিনতে পারলেন না। তাই বামনের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। প্রথমবার পা

রাখতেই বিষ্ণু গোটা পৃথিবী অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়বার শেষ করেন স্বর্গ ও পাতাল। তৃতীয়বার পা তুলে মহাবলিকে প্রশ্ন করেন, "কই? আর একবার পা রাখার জায়গা কোথায়? স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যে শেষ।"

মহাবলি সবই বুঝলেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মাথা নিচু করে মহাবলী বামন দেবকে তার মাথায় পা রাখতে বললেন। বামন তখন মহাবলির মাথায় পা রেখে এত জোরে চেপে দেন যে মহাবলী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। শেষ মুহূর্তে মহাবলি কাতর কন্ঠে বিষ্ণুর কাছে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন তার প্রিয় রাজ্যে প্রতিবছর একবার এসে প্রিয় প্রজাদের দেখে যেতে পারেন। বিষ্ণু মহাবলীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। বামন দেবের আশীর্বাদে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন মহাবলী। ধারণা করা হয়, ওনাম উৎসবের মাধ্যমে অসুররাজ মহাবলী তার প্রিয় কেরালায় ফিরে আসেন। তার আগমন উপলক্ষে পালিত হয়ে থাকে এই ওনাম উৎসব।

দশ দিনের আয়োজন

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে দশ দিনব্যাপী চলে এই ওনাম উৎসব। এই দশ দিন নানা আচার ও আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। তবে উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১ম দিন: আত্তম

ওনামের দশদিন আগে হলো 'আত্তম' নক্ষত্র। সকালে স্থানীয় মন্দিরে দেবতার কাছে প্রসাদ নিবেদন করে ওনাম উৎসবের আয়োজন শুরু হয়। সেদিন প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে ফুলের এক বৃত্ত এঁকে ওনাম উৎসবের সূচনা হয়। এই আল্পনাকে বলা হয় পোক্কালম। প্রতিদিন এই বৃত্তের সংখ্যা বাড়ে একটি করে। অর্থাৎ, ওনাম দিনের সকালে বৃত্তের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটি। সেদিন সকালে ছেলেমেয়েরা শেষ বৃত্ত রচনা করে নানা বর্ণের ফুল দিয়ে। তবে প্রথমদিন হলুদ ফুলের প্রাধান্য থাকে। উৎসবের পরের দিনগুলোয় বিভিন্ন ফুল আল্পনাতে যুক্ত হতে থাকে।

২য় দিন: চিথিরা

উৎসবের দ্বিতীয় দিন সকলে তাদের বড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। স্থানীয়রা উৎসব উপলক্ষে ঘর-বাড়িতে রং করে, আলোকসজ্জা দিয়ে বাড়ির চারপাশ সাজিয়ে তোলে। বাড়ির সদর দরজায় আল্পনা আঁকা হয়।

৩য় দিন: চোধি

উৎসবের তৃতীয় দিন যেন কেনাকাটার উৎসব। উৎসব উপলক্ষে সকলেই তাদের সাধ্যমতো নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনদনের জন্য উপহার সামগ্রী, উৎসবের পোশাক কিনে থাকেন।

৪র্থ দিন: ভিসাকাম

উৎসবের এই দিন দুপুরে আয়োজন করা হয় মহাভোজের। স্থানীয় মালয়ালম ভাষায় তাকে বলা হয় সাদ্য। কেরালার প্রতিটি বাড়িতেই তা বানানো হয়। একেবারে যাকে বলে পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে রান্না। ২৬ এর অধিক পদ থাকে খাবারের তালিকায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিনরকম কলা ভাজা, পাঁপড়, থোরান, মেজহুক্কুপুরাত্তি, কালান, ওলান, আভিয়াল, সাম্বার, ভাত, ডাল, চার রকম আচার, দুই-তিন পদের পায়েস- সে এক এলাহি ব্যাপার।

৫ম দিন: আনিঝাম

ওনামে নৌকা বাইচ নিয়ে প্রচুর হইচই হয়। কেরালা হলো নদীনালা ও হ্রদের দেশ। সমুদ্রের সমান্তরালে যে লবণ হ্রদমালা রয়েছে, সেসব এলাকা এই নৌকা বাইচের উত্তম স্থান। আর উৎসবের পঞ্চম দিন সারা রাজ্য জুড়ে আয়োজিত হয়ে থাকে নৌকা বাইচ। বড়-বড় নৌকার সত্তর-আশিজন লোক গান করতে করতে মহা উৎসাহে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। যে নৌকা প্রথম হয়, তার চালকরা পুরস্কৃত হন। এই প্রতিযোগিতায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পর্যন্ত নৌকা থাকে, যা দেখার জন্য হ্রদ বা নদীর ধারে লোকেরা ভিড় করে নিজ নিজ গ্রামের দলকে উৎসাহ দেন।

৬ষ্ঠ দিন: থিরিকেটা

উৎসবের এই দিনে পোক্কলমের আকার বাড়তে থাকে। অনেকে এই দিনটিতে প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যান। অনেকে আবার পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতে তাদের ভিটেমাটি থেকে ঘুরে আসেন।

৭ম দিন: মুলাম

উৎসবের সপ্তম দিনে উৎসব যেন আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে। মন্দিরগুলোতে বিশেষ প্রসাদ সাদ্যর আয়োজন করা হয়। বাড়িতে, উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েরা কেরালার বিখ্যাত লোকনৃত্য কায়কোট্টিকলির আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও থিরুভাতিরাকলি, পুলিকলি, থুম্বি থুল্লাল ও কথাকলির মতো নৃত্যকলা পেশ করা হয়। শুধু নারীরাই নন, পুরুষরাও এতে অংশ নেয়। প্রতিটি নৃত্যই একে অপরের চেয়ে আলাদা।

৮ম দিন: পুরাদম

উৎসবের অষ্টম দিনে মহাবলী ও বামন দেবতার ছোট মূর্তি এনে ফুলের সাজানোর আল্পনার মাঝে স্থাপন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে মহাবলীকে রাজ্যবাসী তাদের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানায়। পোক্কালমের কারুকাজ যেন আরও আকর্ষণীয় ও বর্ণিল হয়ে ওঠে।

৯ম দিন: উথরাদম

ওনাম সন্ধ্যা হিসেবে দিনটি পালিত হয়। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, উৎসবের শেষ চারদিন রাজা মহাবলী রাজ্য ভ্রমণে বের হয়ে প্রজাদের আশীর্বাদ করেন। তাই উৎসবের শেষ দিনগুলো শুভদিন হিসেবে মানা হয়। নানা উপাদেয় খাবার-দাবার, নানা আনন্দ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের এই দিনটি পালিত হয়।

১০ম দিন: থিরুভুনাম

ওনাম উৎসবের শেষ দিন হলো থিরুভুনাম। সকালে স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে ঘরবাড়িতে নতুন করে আল্পনা দেয়া হয়। সরকারিভাবে সারা রাজ্যে আলোকসজ্জা ও আতশবাজির ব্যবস্থা করা হয়। শহরজুড়ে বের হয় বর্ণিল শোভাযাত্রা। এসব শোভাযাত্রায় থাকে কেরালার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নৃত্য। উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের গ্রামগুলোতে স্থানীয় নানা ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

এভাবে বেশ জাঁকজমক আর ধুমধামের সাথে উৎসবের শেষ দিনের সমাপ্তি ঘটে। আর উৎসবের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে বছরব্যাপী সুদীর্ঘ অপেক্ষায় বসে থাকেন কেরালাবাসী, কবে তিনি আসবেন।

৫.৪.৯.২ বাংলার লোকসংস্কৃতিঃ

লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হল লোকসংস্কৃতি। এটা সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি তাদের প্রকৃত পরিচয় বহন করে।

কোনো দেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রধানত দুটি: নগরসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি। বঙ্গসংস্কৃতির ধারা মূলত তিনটি: নগরসংস্কৃতি, গ্রামসংস্কৃতি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি। বাংলা একটি গ্রামপ্রধান অঞ্চল। গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবনপ্রণালীর মাধ্যমে শতকের পর শতক ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তা-ই বাংলার লোকসংস্কৃতি নামে অভিহিত। আধুনিক রাজনৈতিক মানচিত্র ব্যাতিরেকে বঙ্গ-সংস্কৃতির ব্যাপ্তি পরিদৃশ্যমান। যা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ এই দুই অংশের সংস্কৃতির রূপ।

নগরের স্বল্প পরিসরে ঘন বসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসায়, বৃত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আনন্দোৎসব, যাতায়াত ও উৎপাদন পদ্ধতির সংমিশ্রণে নগরসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ সংস্কৃতি সূক্ষ্ম, জটিল, বৈচিত্র্যময়, গতিশীল ও জাঁকজমকপূর্ণ। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নগরসংস্কৃতি পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতিনির্ভর গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা প্রধানত ঐতিহ্যমুখী, গতানুগতিক ও মন্থর।

গ্রামবাসীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। তারা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে উৎপাদন, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মকর্ম, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সরলতা, সজীবতা ও অকৃত্রিমতা লোকসংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

বাংলায় অনেক উপজাতি রয়েছে। উপজাতীয় সংস্কৃতি এক অর্থে লোকসংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, তবে বেশকিছু বিষয়ে পার্থক্য থাকায় তা পৃথক সংস্কৃতি রূপে বিবেচিত হয়। উপজাতীয় সংস্কৃতি অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল, পরিবর্তনবিমুখ ও ঐতিহ্যপন্থী। বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের অপরিবর্তনীয় অর্থনীতি ও অন্তর্মুখী মানসিকতার কারণে যে প্রাচীন পরিস্থিতি থেকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল, বর্তমানেও প্রায় অনেকটাই সেখানেই রয়ে গেছে। একই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বসবাস করেও তারা বৃহত্তর লোকসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে এগিয়ে না এসে বরং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নামে প্রাচীন সংস্কার, প্রথা ও অব্যাহত রাখছে। সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা না থাকায় তাদের সংস্কৃতিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো পরিবর্তনও লক্ষ করা যায় না।

প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসরত অক্ষরজ্ঞানহীন ও ঐতিহ্যানুসারী বৃহত্তর গ্রামীণ জনসমষ্টিকে ‘লোক’ বলে অভিহিত করা হয়। এই অভিধাভুক্ত বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিকশিত সংস্কৃতিতে বিস্ময়কর মিল আছে। লোককলাবিদ স্টিথ থমসন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোককাহিনী ও পুরাণকে অবলম্বন করে ৬ খন্ডে যে মোটিফ ইন্ডেক্স রচনা করেছেন, তা থেকেই বিশ্বের এই লোক-মানসিকতার অভিন্ন গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বাংলার কৃষক ফসল তোলার সময় এক গোছা ধান মাঠ থেকে এনে ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে। একে বলা হয় ‘লক্ষ্মীর ছড়’। বিশ্বের নানা দেশের কৃষকসমাজেও একই প্রথা চালু আছে; কোথাও তা ‘শস্যরাণী’, কোথাও ‘শস্যপুতুল’, কোথাও বা ‘শস্যমাতা’ নামে অভিহিত। বিষয়, চিন্তা-ভাবনা ও আবেদনের দিক থেকে লোকসংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন রূপ আছে।

লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদানের রূপ-প্রকৃতির বিচার করে একে চারটি প্রধান ধারায় ভাগ করা হয়: বস্তুতগত (material), মানসজাত (formalised), অনুষ্ঠানমূলক (functional) এবং প্রদর্শনমূলক (performing)। লোকসমাজ জীবনধারণের জন্য যেসব দ্রব্য ব্যবহার করে সেসব বস্তুতগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, যেমন: বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, যানবাহন, সকল পেশার যন্ত্রপাতি, কুটিরশিল্প, সৌখিন দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির আবার বহুবিধ প্রকারভেদ আছে। যেমন কৃষক প্রায় সব ধরনের ফসল উৎপাদন করে, তাঁতি সব ধরণের বস্ত্র, কুমার সব ধরনের হাঁড়ি-পাতিল, ছুতার কাঠের যাবতীয় আসবাবপত্র, কামার লোহার বিবিধ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্মাণ করে। ধোপা, নাপিত, সোনারু, কাঁসারু, শাঁখারি, ময়রা,চর্মকার, ঘরামি, জেলে, কাহার প্রভৃতি বৃত্তিধারী শ্রমজীবী মানুষ পেশাগত কাজে নানারকম হাতিয়ার ব্যবহার করে। গ্রামের মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য নিজেরাই উৎপাদন ও বিতরণ করে; এজন্য তাদের অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। স্যার মেটকাফ তাই বাংলার স্বল্পতুষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন। পর্ণকুটিরে বসবাস গ্রামের একটি সাধারণ দৃশ্য। পাশাপাশি আবার একচালা থেকে

আটচালা ঘরও নির্মিত হয়। সৌখিন ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা আটচালা গৃহ নির্মাণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয়তা নয়, নান্দনিকতারও ব্যাপার আছে। বাংলার লোকসংস্কৃতি এখানে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

বাংলার তাঁতিরা মসলিন তৈরি করে এককালে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। জামদানি বস্ত্রের সুনাম এখনও আছে। কুমার নির্মিত মাটির দেবদেবীর মূর্তি এখনও মৃৎশিল্পের অনন্য নিদর্শন। তারা সখের হাঁড়ি, মনসার ঘট, লক্ষ্মীর সরা ইত্যাদি তৈরি করে অনন্য শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছে। ছুতার প্রাচীন কাল থেকেই কাঠের খাট-পালঙ্ক, দরজা, চৌকাঠ, নৌকা ইত্যাদি দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করে আসছে। এক সময় বাংলার ময়ূরপঙ্খি, সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গা প্রভৃতি সমুদ্রগামী নৌকার সুনাম ছিল। বাঁশ, বেত, কাঠ, পাট ও শোলা দিয়ে নানারকমের নিত্য ব্যবহার্য ও সৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। সিলেটের নকশি পাটির সুনাম দীর্ঘকালের।

পাটের তৈরি নকশি শিকা আন্তর্জাতিক বাজারে সৌখিন পণ্যরূপে সমাদর পাচ্ছে। নকশি পাখা, শিকা ইত্যাদি পল্লীর রমণীরাই তৈরি করে। তারা বিচিত্র ধরণের ও বিচিত্র স্বাদের রন্ধনশিল্পেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। বাঙালির রন্ধন-তালিকায় বত্রিশ ব্যঞ্জনের উল্লেখ আছে। রন্ধনকর্মে নারী কীরূপ পারদর্শিনী তা বিচার করে এক সময় বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করা হতো। বিচিত্র ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন তৈরিতে বাঙালি ময়রার দক্ষতা এখনও তুলনাহীন। দুধ, চিনি, আটা ও ময়দা দ্বারা শতাধিক ধরণের মিষ্টান্নের নাম পাওয়া যায়। এতে ভোজনরসিক বাঙালির পরিচয় ফুটে ওঠে। এখানে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদানের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি ধারার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

মৌখিক ধারার লোকসাহিত্যকে মানসজাত লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর সঙ্গে কিছু চিত্রকর্মকেও যুক্ত করা যায়। অনুমান হলেও সত্য যে, মানুষ যখন থেকে ভাষা পেয়েছে তখন থেকেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করে আসছে।এ অর্থে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের লোকসাহিত্যও বেশ প্রাচীন।বিশ্বের প্রায় সব ধারার লোকসাহিত্যের উপাদানই বাংলা ভাষায় বিদ্যমান। বাংলায় লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, লোকগাথা, লোকনাট্য, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি গদ্যে-পদ্যে রচিত মৌখিক ধারার সাহিত্যের প্রচলন আছে। বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি। পলি দ্বারা গঠিত বাংলার নরম মাটি, শ্যামল প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য, কৃষি-অর্থনীতি, দীর্ঘস্থায়ী সামন্ত সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে বাংলা লোকসাহিত্যের ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখ্যত কৃষকসমাজই লোকসাহিত্যের স্রষ্টা ও ধারক-বাহক। এর সঙ্গে গো-মহিষের রাখাল, নৌকার মাঝি-মাল্লা, গায়ক সম্প্রদায় বাউল, ভিক্ষোপজীবী ফকির-বৈরাগী ও পেশাজীবী বেদে-বেদেনিরা লোকসঙ্গীতের চর্চা করে থাকে। লোকচিকিৎসার সঙ্গে জড়িত ওঝা ও মন্ত্রগুপ্তিরা মন্ত্রের চর্চা করে। সাপের ওঝা সর্পবিষের ও ভূতের ওঝা তথাকথিত ভূত-প্রেতাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করে। শিরালি মন্ত্রগুণে আকাশের মেঘ-শিলাবৃষ্টি পর্যন্ত বিতাড়িত করতে পারে বলে লোকসমাজ বিশ্বাস করে।

বিগত একশ বছর ধরে লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও তা নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। সব ধরনের উপাদান একত্র করলে এ সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করবে। লোককথা, রূপকথা, ব্রতকথা, কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ মিলে লোককাহিনীর এক বিশাল

ভান্ডার গড়ে উঠেছে। স্বপ্ন, কল্পনা, আবেগ ও চিন্তা মিশ্রিত এসব রচনায় জাতির অতীতের অনেক কিছুই নিহিত আছে। বাংলার রূপকথায় ড্রাগন নেই, আছে রাক্ষস-খোক্কস ও ভূত-প্রেত। এসব অলৌকিক জীবের প্রতীকে মূলত অত্যাচারী কোনো প্রবল শক্তিকেই রূপায়িত করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধে রূপকথার রাজপুত্রকে জয়ী করা হয়েছে। সে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে আগামী দিনগুলিতে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে। কাহিনী-নির্মাতা রাজপুত্রের নিরাপদ ও দ্রুততম বাহন হিসেবে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার পরিকল্পনা করেছে; অসহায়ের বন্ধু হিসেবে সাহায্যকারী ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির চিন্তা করেছে। এগুলি প্রতীক চরিত্র, যা লোকমনের ইচ্ছাপূরণ করে থাকে। ব্রতকথায় হিন্দু রমণীর ধর্মবোধের অন্তরালে বৈষয়িক ও জাগতিক কামনা-বাসনা নিহিত থাকে। কিংবদন্তিতে আছে লুপ্ত ইতিহাসের খন্ড ক্ষুদ্র উপাদান।

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশত প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, গম্ভীরা, কীর্তন, ঘাটু, ঝুমুর, বোলান, আলকাপ, লেটো, গাজন, বারমাসি, ধামালি, পটুয়া, সাপুড়ে, খেমটা প্রভৃতি ধারার শতশত গান আজও প্রচলিত আছে। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ এসব গানের বাণীতে জাতির অন্তর্জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কতক গানে ধর্মীয় আবেগ জড়িত আছে; তবে অধিকাংশ গানই চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গীত হয়। খেমটা, পটুয়া ও সাপুড়ে গানগুলি জীবিকার সঙ্গে জড়িত। মেয়েলি গীত, সহেলি গীত, হুদমা গীত ইত্যাদিতে নারীসমাজের কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে।

বাউল একটি বিশেষ লোকাচার ও ধর্মমত। এই মতের সৃষ্টি হয়েছে বাংলার মাটিতে। বাউলকূল শিরোমণি লালন সাঁইয়ের গানের মধ্য দিয়ে বাউল মত পরিচিতি লাভ করে। বাউল গান যেমন জীবন দর্শনে সম্পর্কিত তেমনি সুর সমৃদ্ধ। বাউলদের সাদামাটা কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন আর একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোই তাদের অভ্যাস। ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মাঝে বাউল গানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষনা করে।

বাউল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতান্তর রয়েছে। অতিপ্রাচীনকাল হতে বাউল শব্দটির প্রচলন লক্ষ করা যায়।আনুমানিক সপ্তদশ শতক হতে বাউল নাম এর ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়,চৈতন্যচরিতামৃত গৃন্থের আদিলীলা অংশে এর ব্যবহার লক্ষ করা করা যায়,চৈতন্যচরিতামৃত গৃন্থে মহাপ্রভু, রামানন্দদ রায় ও সনাতন গোস্বামীর নিকট কৃষ্ণ বিরহ বিধুর নিজেকে মহাবাউল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সেই থেকে অনুমান করা হয়,বাউল শব্দের উৎপত্তির কথা।বাউলের রয়েছে নানাবিধ শাখা প্রশাখা,একেক সম্প্রদায়ের বাউলেরা একেক মত অনুসারী,সেগুলো তাদের সম্প্রদায়ভেদে ধর্মীয় উপাসনার একটি অংশ।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-পাবনা এলাকা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-বোলপুর-জয়দেবকেন্দুলি পর্যন্ত বাউলদের বিস্তৃতি। বাউলদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই প্রকারই রয়েছে। বাউলরা তাদের গুরুর আখড়ায় সাধনা করে। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলিতে বাউলদের একটি মেলা শুরু হয়, যা "জয়দেব বাউলমেলা" নামে বিখ্যাত।

বাউলেরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মসাধক। তারা মানবতার বাণী প্রচার করে। বাউল মতে বৈষ্ণবধর্ম এবং সূফীবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাউলরা সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় আত্মাকে। তাদের মতে আত্মাকে জানলেই পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। আত্মা দেহে বাস করে তাই তারা দেহকে পবিত্র জ্ঞান করে। সাধারণত প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও বাউলরা জীবনদর্শন সম্পর্কে অনেক গভীর কথা বলেছেন।

বাউল সাধকদের সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছেন জগন্মোহন গোসাঁই ও লালন সাঁই। লালন তার বিপুল সংখ্যক গানের মাধ্যমে বাউল মতের দর্শন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেছিলেন। এছাড়াও বাউল কবিদের মধ্যে জালাল খাঁ, রশিদ উদ্দিন, হাছন রাজা, রাধারমণ, সিরাজ সাঁই, পাঞ্জু সাঁই, পাগলা কানাই, শীতলং সাঁই, দ্বিজদাস, হরিচরণ আচার্য, মনোমোহন দত্ত, লাল মাসুদ, সুলা গাইন, বিজয় নারায়ণ আচার্য, দীন শরৎ (শরৎচন্দ্র নাথ), রামু মালি, রামগতি শীল, মুকুন্দ দাস, আরকুন শাহ্, সিতালং ফকির, সৈয়দ শাহ্ নূর, শাহ আব্দুল করিম, উকিল মুন্সি, চান খাঁ পাঠান, তৈয়ব আলী, মিরাজ আলী, দুলু খাঁ, আবেদ আলী, উমেদ আলী, আবদুল মজিদ তালুকদার, আবদুস সাত্তার, খেলু মিয়া, ইদ্রিস মিয়া, আলী হোসেন সরকার, চান মিয়া, জামসেদ উদ্দিন, গুল মাহমুদ, প্রভাত সূত্রধর, আবদুল হেকিম সরকার, ক্বারী আমীর উদ্দিন আহমেদ, ফকির দুর্বিন শাহ, শেখ মদন, দুদ্দু সাঁই,কবি জয়দেব, কবিয়াল বিজয়সরকার, ভবা পাগলা, নীলকণ্ঠ, দ্বিজ মহিন, পূর্ণদাস বাউল, খোরশেদ মিয়া, মিরাজ উদ্দিন পাঠান, আব্দুল হাকিম, মহিলা কবি আনোয়ারা বেগম এবং দলিল উদ্দিন বয়াতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ছৌ নাচ বা **ছো নাচ** বা **ছ নাচ** একপ্রকার ভারতীয় আদিবাসী যুদ্ধনৃত্য। এই নাচ ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় জনপ্রিয়। ছৌ নাচের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা। উৎপত্তি ও বিকাশের স্থল অনুযায়ী ছৌ নাচের তিনটি উপবর্গ রয়েছে। যথা– পুরুলিয়া ছৌ সরাইকেল্লা ছৌ ও ময়ূরভঞ্জ ছৌ।

সরাইকেল্লা ছৌ-এর উৎপত্তি অধুনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সরাইকেল্লা খরসাওয়াঁ জেলার সদর সরাইকেল্লায়। পুরুলিয়া ছৌ-এর উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা এবং ময়ূরভঞ্জ ছৌ-এর উৎপত্তিস্থল ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা। এই তিনটি উপবর্গের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি দেখা যায় মুখোশের ব্যবহারে। সরাইকেল্লা ও পুরুলিয়া ছৌ-তে মুখোশ ব্যবহৃত হলেও, ময়ূরভঞ্জ ছৌ-তে হয় না।

ছৌ নাচের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের মত রয়েছে। ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ও ডঃ সুধীর করণের মতে এই নাচের নাম ছো, আবার বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে এই নাচের নাম ছ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম ছ বা ছো নাচের পরিবর্তে ছৌ নামে অভিহিত করেন এবং বিদেশে এই নাচের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার পরে এই নাচ ছৌ নাচ নামে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।
রাজেশ্বর মিত্রের মতে, তিব্বতী সংস্কৃতির ছাম নৃত্য থেকে ছৌ নাচ উদ্ভূত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শৌভিক বা মুখোশ থেকে নাচটির নামকরণ ছৌ হয়েছে। কুর্মালী ও ওড়িয়া ভাষায় ছুয়া বা ছেলে থেকে এই নাচের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, কারণ ছৌ প্রধানতঃ ছেলেদের নাচ। ডঃ সুধীর করণের মতে ছু-অ শব্দের অর্থ ছলনা ও সং। কোনো কোনো

আধুনিক গবেষক মনে করেন, ছৌ শব্দটি সংস্কৃত ছায়া থেকে এসেছে ।তবে সীতাকান্ত মহাপাত্র মনে করেন, ছাউনি শব্দটি থেকে এই শব্দটি এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রচলিত ছৌ নাচের ধারাটি পুরুলিয়া ছৌ নামে পরিচিত। এই ধারার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুলিয়া ছৌ-এর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য এটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ট্যাবলোর থিমই ছিল ছৌ নাচ। ছৌ মূলত উৎসব নৃত্য। পুরুলিয়ার ছৌ নাচে বান্দোয়ান ও বাঘমুন্ডির দুটি পৃথক ধারা লক্ষ করা যায়। বান্দোয়ানের নাচে পালাগুলি ভাব গম্ভীর এবং বাগমুন্ডির নাচে পালাগুলি হয় বীরত্ব ব্যঞ্জক। জেলায় ছৌ নাচের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভূমিজ মুন্ডারা। পরে এই নাচে মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা নর্তক হিসেবে ও ডোম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাদক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কুপল্যান্ডের ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার মানভূম গ্রন্থে ছৌ নাচের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন ১৯১১-এর পরে ছৌ নাচের উদ্ভব হয়েছে। মানভূম গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামীর মতে শিবের গাজনে মুখে কালি মেখে বা মুহা বা মুখোশ পরে নাচকেই ছৌ নাচের আদি রূপ বলে মনে করেছেন। এরপর অনাড়ম্বর মুখোশ সহকারে একক ছৌ বা 'এ কৈড়া ছো' নাচের উদ্ভব হয়। এ কৈড়া ছো নাচের পরে 'আলাপ ছো' বা 'মেল ছো' নাচের উদ্ভব হয়, যেখানে মুখোশ ছাড়া দুইজন বা চারজন নর্তক নাচ করতেন। এছাড়া সম্ভ্রান্ত বাড়ির নর্তকরা আড়ম্বরপূর্ণ সাজপোশাক পরে 'বাবু ছো' নামক একপ্রকার নাচের প্রচলন করেন। এই নাচে ধুয়া নামক ছোট ঝুমুর গান গাওয়া হয়ে থাকে। ১৯৩০-এর দশকে 'পালা ছো' নাচের সৃষ্টি হয়।

ছৌ শিল্পীরা সারা চৈত্র মাস ধরে অনুশীলন করে থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ও জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত রহিন উৎসব পর্যন্ত ছৌ নাচ নাচা হয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলায় শিবের গাজন উপলক্ষে ছৌ নাচের আসর বসে।

ছৌ নাচ বিষয়গতভাবে মহাকাব্যিক। এই নাচে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। কখনও কখনও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিও অভিনীত হয়। ছৌ নাচের মূল রস হল বীর ও রুদ্র। নাচের শেষে দুষ্টের দমন ও ধর্মের জয় দেখানো হয়। গ্রামাঞ্চলে এই নাচের আসর কোনো মঞ্চে হয় না; খোলা মাঠেই আসর বসে, লোকজন চারিদিকে জড়ো হয়ে নাচ দেখে। তবে শহরাঞ্চলে সাধারণত মঞ্চেই ছৌ নাচ দেখানো হয়। নাচের শুরু হয় ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে। এরপর একজন গায়ক গণেশের বন্দনা করেন। গান শেষ হলে বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে নাচের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। প্রথমে গণেশের বেশধারী নর্তক নাচ শুরু করেন। তারপর অন্যান্য দেবতা, অসুর, পশু ও পাখির বেশধারী নর্তকেরা নাচের আসরে প্রবেশ করেন। প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে ঝুমুর গানের মাধ্যমে পালার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেন।

ছৌ নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় না বলে শিল্পী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন ও সঙ্কোচন - প্রসারণের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ নাচের অঙ্গসঞ্চালনকে মস্তক সঞ্চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন, বক্ষ সঞ্চালন, উল্লম্ফন এবং পদক্ষেপ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। বাজনার তালে হাত ও পায়ের সঞ্চালনকে চাল বলা হয়ে থাকে। ছৌ নাচে দেবচাল, বীরচাল, রাক্ষসচাল, পশুচাল প্রভৃতি

বিভিন্ন রকমের চাল রয়েছে। চালগুলি ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, উলফা, বাঁহি মলকা, মাটি দলখা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত।

মুখোশ

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি থানার চড়িদা গ্রামের চল্লিশটি সূত্রধর পরিবার এবং জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের পাঁচটি পরিবার ছৌ নাচের মুখোশ তৈরী করেন। এছাড়া পুরুলিয়া মফস্বল থানার গেঙ্গাড়া, ডিমডিহা ও কালীদাসডিহি গ্রামে, পুঞ্চা থানার জামবাদ গ্রামে এবং কেন্দা থানার কোনাপাড়া গ্রামেও এই মুখোশ তৈরী হয়ে থাকে।

মুখোশ তৈরীর জন্য প্রথমে নদীর দোয়াশ মাটি দিয়ে একটি কাঠের ওপর ছাঁচ তৈরী করে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট রৌদ্রে শুকিয়ে ছাঁচের নাক, মুখ, চোখ বানানো হয়। এরপর কাপড়ে ছাই রেখে তাতে ফুটো করে মুখোশের ওপর ঝেড়ে ঝেড়ে ছাই দেওয়া হয়, এতে পরে ছাঁচ থেকে মুখোশকে পৃথক করা সহজে সম্ভব হয়। এরপর জলে ময়দা ও তুঁত মিশিয়ে আঠা তৈরী করে মুখোশের ছাঁচে তিন থেকে চার স্তরে কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়। একদিন পরে কাগজের স্তরগুলি শুকিয়ে গেলে আট-দশটি স্তরে কাগজ লাগাতে হয়। এঁটেল মাটি জল দিয়ে ঘোলা করে আট দশ দিন রেখে দেওয়া হয়, যাকে কাবিজ বলা হয়। এরপর আট থেকে দশটি স্তরে সুতীর কাপড় কাবিজের সাথে লাগিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখা হয়। মুখোশের নাক, মুখ, চোখ, কান পালিশ করে রৌদ্রে রেখে দেওয়া হয় ও দুই দিন পরে মুখোশের অবয়ব এবং মাটির ছাঁচটি পৃথক করা হয়। এরপর মুখোশের কিনারার কাগজ ও কাপড় কেটে ভেতরের দিকে মুড়ে মুখোশটিকে দুই-আড়াই ঘন্টা উল্টো করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সারারাত ভিজিয়ে আঠা তৈরী করে তার সাথে খড়িমাটি মিশিয়ে মুখোশের ওপর বার বার লাগিয়ে মুখোশের রঙ সাদা করা হয়। এরপর বিভিন্ন মূর্তিতে পৃথক পৃথক রঙ লাগিয়ে মুখোশের বিভিন্ন অংশ এঁকে সবশেষে চোখের মণি এঁকে রঙের কাজ শেষ করা হয়। এরপর মুখোশের কাঠামোর কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে তার দিয়ে বাইরের কাঠামো তৈরী করে পুঁতি, মালা, কানপাশা, কলগা, পালক প্রভৃতি লাগিয়ে কাঠামোর সাজসজ্জা সম্পন্ন করা হয়। মুখোশ তৈরী হয়ে গেলে লোহার রড গরম করে চোখের ফুটো তৈরি করা হয় এবং কানের পাশে দুইটি ফুটো করে তাতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, যার সাহায্যে নর্তক মুখোশটি মুখের সাথে বেঁধে নিতে পারেন। এরপর মুখোশে সাবুর মিশ্রণ লাগিয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে বার্ণিশ লাগিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা হয়।

গম্ভীরা বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। গম্ভীরা দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। এটি বর্ণনামূলক গান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুব জনপ্রিয়।

ধারণা করা হয় যে, গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন হয়েছে শিবপূজাকে কেন্দ্র করে। শিবের এক নাম 'গম্ভীর', তাই শিবের উৎসব গম্ভীরা উৎসব এবং শিবের বন্দনাগীতিই হলো গম্ভীরা গান। মালদহে মূলত চৈত্রসংক্রান্তির শিবপূজা উপলক্ষে বিগত বছরের প্রধান-প্রধান ঘটনাবলি নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে সমালোচিত হয়; অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট তামাশা, বড় তামাশা ও ফুলভাঙ্গা অনুষ্ঠানের গম্ভীরা মুখোশনৃত্য পরিবেশিত হয়। গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে এ সঙ্গীতের ব্যবহারের পেছনে জাতিগত ও পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবই *গম্ভীরা পূজা ও উৎসব*নামে পরিচিত (উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে এটি *গমীরা*নামে খ্যাত)। চৈত্রের শেষ চারদিনে মূল অনুষ্ঠান হয়, তবে অঞ্চলভেদে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এমনকি শ্রাবণ মাসেও শিবমূর্তি স্থাপন করে গম্ভীরা পূজা হয়। বর্তমানে মূলত শিবপূজা নামে খ্যাত হলেও প্রাচীনকালে এটি সূর্যের উৎসব ছিল বলে মনে করা হয়।

মালদহে নিম্নবর্ণের হিন্দু, কোচ-রাজবংশী, পোলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমদিন 'ঘটভরা' অনুষ্ঠান; গম্ভীরা মণ্ডপে ঘট স্থাপন করে শিবপূজার উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে হয় 'ছোট তামাশা'; ঢাক-ঢোল বাদ্য সহযোগে মণ্ডপে নানা নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যাবস্থা করা হয়। তৃতীয় দিনে 'বড়ো তামাশা'র সন্ন্যাসীরা শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাচারে কাঁটা-ভাঙ্গা, ফুল-ভাঙ্গা ও বাণফোঁড়ায় অংশ নেয়। এদিন মালদহে বিভিন্ন সঙের দল ঘোরে; রাতে গম্ভীরা মণ্ডপে মুখোশনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ দিনে মণ্ডপে শিবের সঙ্গে নীলপূজাও হয়, সঙ্গে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে।

গম্ভীরা গান সাধারণত দুপ্রকার — আদ্যের গম্ভীরা এবং পালা-গম্ভীরা। প্রথমত, দেবদেবীকে সম্বোধন করে মানুষ তাঁর সুখ-দুঃখ পরিবেশন করলে তাকে আদ্যের গম্ভীরা বলা হয়। দ্বিতীয়ত, পালা-গম্ভীরায় নানা-নাতির ভূমিকায় দুজন ব্যক্তির অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হয়।

নাতন ধর্মালম্বীদের অন্যতম দেবতা শিব। শিবের অপর এক নাম‘গম্ভীর’। শিবের উৎসবে শিবের বন্দনা করে যে গান গাওয়া হত- সেই গানের নামই কালক্রমে হয়ে যায় ‘গম্ভীরা’।

পরবর্তী সময়ে গম্ভীরা গানের ধরন অনেকাংশে বদলে গেছে। গানের সুরে দেবদেবীকে সম্বোধন করে বলা হয় গ্রামীণ দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের সুখ-দুঃখ। কখনও সারা বছরের প্রধান ঘটনা এ গানের মাধ্যমে আলোচিত হয়। পালা-গম্ভীরায় অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে বছরের সালতামামি উপলক্ষে পালা-গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে ‘গম্ভীরা’ বলতে বিশেষ একটি অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে বোঝায়।

গম্ভীরা গানের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় হিন্দুসমাজে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মালদহ থেকে গম্ভীরা গান রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলে আসে। ওই সময় থেকে এখানে এ গানের পৃষ্ঠপোষক হয় মুসলিম সমাজ। তখন স্বাভাবিকভাবে গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্রমে রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে এ গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পূর্বে গম্ভীরা গানের আসরে শিবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হত। বর্তমানে বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের আসরে শিবের পরিবর্তে ‘নানা-নাতি’র ভূমিকায় দুজন অভিনয় করে। নানার মুখে পাকা দাঁড়ি, মাথায় মাথাল, পরনে লুঙ্গি; হাতে লাঠি। আর নাতির পোশাক ছেঁড়া গেঞ্জি, কোমরে গামছা ইত্যাদি। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ‘নানা-নাতি’র সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে দ্বৈতভাবে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়।এক সময় গম্ভীরা গান একতাল, ত্রিতাল, দাদরা, খেমটা, কাহারবা প্রভৃতি সুরে গাওয়া হতো। বর্তমানে সুরের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাতে হিন্দি ও বাংলা ছায়াছবির গানের সুর প্রাধান্য পাচ্ছে। এ ছাড়া লোকনাট্যের বহু বিষয়, চরিত্র ও সংলাপও গম্ভীরা গানে সংযুক্ত হয়েছে। নবাবগঞ্জের কুতুবুল আলম, রকিবউদ্দীন,

বীরেন ঘোষ, মাহবুবুল আলম প্রমুখ গম্ভীরা গানের বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁরা নতুন নতুন সুর সৃষ্টির মাধ্যমে গম্ভীরা গানকে সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

লোকগাথার মতো দীর্ঘ পালাগানএ সমাজজীবনের বাস্তব চিত্রটি ধরা পড়েছে। প্রেমই গাথাগুলির মুখ্য বিষয়; তবে কিছু বীরত্ব ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্রও আছে। ছড়ায় আছে কল্পনা ও বাস্তবতার মিশ্রণজাত বিচিত্র বিষয়। শিশুতোষ রচনা হিসেবে ছড়া সুদূর অতীত থেকে শিশুর সরস চিত্তকে অভিষিক্ত করে আসছে। মন্ত্র ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম, কেননা এতে জাদুশক্তি আছে। বাঙালি তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী; তারা বাহুবল অপেক্ষা মন্ত্রবলে বৈরি ও অপশক্তিকে দমন করার বাসনা পোষণ করে। মারণ, উচাটন ও বশীকরণ মন্ত্রও জাদুবিশ্বাসের ফল। বুদ্ধি ও মননপ্রসূত ধাঁধা, প্রবাদ ও প্রবচনগুলি জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। প্রবাদ-প্রবচন সব দেশের ভাষার এক অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হয়।

চিত্রকলাকে বলা যায় বস্তুত-আশ্রিত মানস ফসল। আলপনা, পটচিত্র, ঘটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, অঙ্গচিত্র প্রভৃতিতে রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। ঘরের মেঝে, খুঁটি, দেওয়াল, কুলা, ডালা ইত্যাদিতে আলপনা দেওয়া হয়। ব্রতপূজা উপলক্ষে ব্রতের আলপনা দেওয়ার রীতি আছে। বর্তমানে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এমনকি জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষেও পথে-প্রাঙ্গণে আলপনা দেওয়া হয়। এই আলপনা বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা। পটুয়ার পটচিত্র ও পটগীত বাঙালির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। কালীঘাটের পটচিত্র এর রূপান্তরিত ও অবক্ষয়িত রূপ। কালীঘাটের পট লোপ পেয়েছে, কিন্তু পটুয়ার পটচিত্রের প্রচলন আজও আছে।

নকশি কাঁথা সূচিশিল্পের মধ্যে পড়ে। এটি একান্তভাবে পল্লিরমণীর নিজস্ব সম্পদ। বিছানার চাদর এবং লেপ ও বালিশের কভার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও নানা চিত্রকর্মে শোভিত এসব কাঁথা নান্দনিকতা গুণে দেশ-বিদেশের শিক্ষিত সমাজেও সমাদৃত হয়েছে। শহরে এখন নকশি কাঁথা সৌখিন পণ্য হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয়।

অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনমূলক লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকনাট্য, যাত্রা, নৃত্য ও খেলাধুলা প্রধান। অভিনয় ও অঙ্গক্রিয়া দ্বারা এসব রূপায়িত হয়। বাউল, গম্ভীরা প্রভৃতি গান, নাচ ও অভিনয় ত্রি-অঙ্গের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়। জারি গানের সঙ্গে জারি নাচ, সারি গানের সঙ্গে সারি নাচ, লাঠি খেলার সঙ্গে লাঠি নাচ, খেমটা গানের সঙ্গে খেমটা নাচ এবং ঘাটু গানের সঙ্গে ঘাটু নাচ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলি সকল শ্রেণির মানুষের চিত্তবিনোদনের উৎস। হোলির গীত, গাজীর গীত, মাগনের গীত, বিবাহের গীত, হুদমার গীত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে নিজস্ব কিছু আচারসহ পরিবেশিত হয়। কতক গান পেশাজীবী গায়েন, বয়াতি ও গীদালরা পরিবেশন করে; আর বাকিগুলি বাড়ি-ঘরে, মাঠে-ঘাটে ও খেতে-খামারে নানা শ্রেণির মানুষ কাজ করতে করতে বা কাজের অবসরে গেয়ে শ্রান্তি দূর ও আনন্দ উপভোগ করে।

প্রথম জমি চাষ থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত নানা ধরনের লোকাচার আছে। এর কতগুলি প্রাকফসল, আর কতকগুলি ফসলোত্তর আচার। বৃষ্টির জন্য মেঘারাণী, হুদমা দেওয়া,

বেঙ বিয়া, ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেতবন্ধন, কাকতাড়ুয়া, গাস্বি উৎসব প্রভৃতি প্রাকফসল আচার; আর লক্ষ্মীর ছড়, নবান্ন, মাগন প্রভৃতি ফসলোত্তর অনুষ্ঠান। এসব আচার-অনুষ্ঠান পালনে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই; তবে টুসু, ভাদু, করম, বসুধারা প্রভৃতি ব্রতাচার হিন্দু রমণীরাই পালন করে থাকে।

শরীরচর্চা, আমোদ-প্রমোদ ও অবসরযাপনের জন্য লোকসমাজে খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষভেদে তিন ধরনের লোকক্রীড়া আছে। শ্রমসাপেক্ষ শরীরচর্চার খেলা ও শ্রমহীন আনন্দের খেলা হিসেবে অন্তরঙ্গন ও বহিরঙ্গনের খেলারূপেও এগুলিকে ভাগ করা যায়। হাডুডু একটি জনপ্রিয় খেলা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে হাডুডু স্বীকৃতি লাভ করেছে। বলীখেলা, নৌকা বাইচ, বউছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, নুনতা, চিক্কা, ডাংগুলি, ষোলোঘুঁটি, মোগল-পাঠান, এক্কাদোক্কা, বউরাণী, কড়িখেলা, ঘুঁটিখেলা, কানামছি, ঘুড়ি উড়ানো, কবুতর উড়ানো, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি খেলায় সকল স্তরের লোকজন অংশগ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে কতক অঞ্চলে নৌকা বাইচ, বলীখেলা ও ষাঁড়ের লড়াই বাদ্যযন্ত্রসহ বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় উৎসবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কতক খেলাধুলা শরীরচর্চা ও শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে স্কুলের বালক-বালিকারাও অনুশীলন করে।

'বার মাসে তের পার্বণ' প্রবাদ দ্বারা উৎসবমুখর বাঙালি জাতির মৌলিক পরিচয় ফুটে ওঠে। হিন্দুদের ব্রতাদি আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্যের কথা বিবেচনা করেই এরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বার, তিথি, মাস ও ঋতুভিত্তিক এসব পার্বণের উদ্ভবের পেছনে প্রাকৃতিক ও দৈব শক্তির কল্পনা আছে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশাপাশি হিন্দুরা লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ওলাদেবী, বনদুর্গা, দক্ষিণরায়, সত্যনারায়ণ, পাঁচু ঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাচার পালন করে থাকে। দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের ওপরেও এসবের প্রভাব পড়েছে। তারা সত্যপীর, গাজীপীর, মানিকপীর, মাদারপীর, খোয়াজ খিজির, ঘোড়াপীর, বনবিবি, ওলাবিবি, হাওয়া বিবি প্রভৃতি কাল্পনিক, লৌকিক ও ঐতিহাসিক পীর-পীরানিকে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে পূজা-মানত করে থাকে। এসবের পেছনে অসহায় মানুষের রোগ-ব্যাধি ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কামনা-বাসনা নিহিত রয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কতক পূজা-মানত পৃথকভাবে করে, আবার কতক ক্ষেত্রে উভয়ে পরস্পরের অংশীদার হয়। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর, বনদুর্গা ও বনবিবি যে একই ভাবনার ভিন্ন রূপ তাতে সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে অসংখ্য মেলা আছে যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগদান ও আনন্দোপভোগ করে। হিন্দুর রথযাত্রার মেলায় মুসলমান এবং মুসলমানের মুহররমএর মেলায় হিন্দুর অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই। বৈশাখী মেলা এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। হিন্দুরা দেওয়ালি উৎসবে প্রদীপ ভাসায়, মুসলমানরা মুহররম অনুষ্ঠানে বেরা ভাসায়। শুভ অনুষ্ঠানে মঙ্গলঘট স্থাপন ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো আগে শুধু হিন্দু সমাজেই প্রচলিত ছিল, এখন মুসলমানের অনুষ্ঠানেও মঙ্গল কামনায় ওইরূপ করা হয়। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু আচার-অনুষ্ঠান আছে। গায়ে হলুদ, ডালা, বর-কনে স্নান, মাড়োয়া সাজানো, আয়নামুখ, কড়ি খেলা, বরবধূ বরণ, ফিরানি ইত্যাদি আচার কমবেশি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পালিত হয়।

নৃতত্ত্বের বিচারে বাঙালির দেহে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রক্তধারা প্রবাহিত; এর সঙ্গে পরবর্তীকালে অ্যালপানীয়, পলিনীয়, সেমিটিক প্রভৃতি জাতির রক্তও মিশেছে। এদিক থেকে বাঙালি একটি সংকর জাতি। বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষিকাজ ও কৃষকজীবনের ক্ষেত্রেই মিশ্রণ বেশি হয়েছে। ধর্ম, মত ও পথ নির্বিশেষে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার মানুষের একত্র বসবাস ও পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে গ্রামীণ জীবনে বিরোধ অপেক্ষা ঐক্যের সুরই বেশি ধ্বনিত হয়েছে। এজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির মতো বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এর মধ্যেই বাঙালির জাতিগত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

তথ্যসুত্রঃ Wikipedia and
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF

৫.৪.১১.৩ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য

সুলতানি যুগে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু, বাংলা ও মারাঠি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে অষ্টম শতক বা তার কাছাকাছি সময়ে। তামিল সাহিত্য ছিল এদের চেয়ে পুরনো। বৌদ্ধ, জৈন ও নাথপন্থী সিদ্ধরা অপভ্রংশ ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে আমীর খসরু ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রদেশগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা ছিল—সিন্ধি, লাহোরি, কাশ্মীরী, কুরারি। (ডোগরি), ধুর সমুন্দারি (কানাড়া), তিলাগি (তেলেগু), গুজর (গুজরাতি), মাবারি (তামিল), গৌড়ি (উত্তরবঙ্গ), বাংলা, অযোধ্যা, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল হিন্দাবি ভাষা। জীবনের সব দৈনন্দিন কাজের জন্য এইসব ভাষার ব্যবহার হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। আমীর খসরু অসমিয়া, ওড়িয়া ও মালয়ালম ভাষার উল্লেখ করেননি। সুলতানি যুগে এসব ভাষার স্বাধীন অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আমীর খসরুর লেখা থেকে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির আবির্ভাবের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। মধ্যযুগে এই ভাষাগুলি পরিণত রূপ লাভ করে এবং সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে এগুলির ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

মধ্যযুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তির নানা কারণ আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রাধান্য হারিয়েছিল, সেজন্য সংস্কৃত ভাষা তার গৌরবের আসন হারিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রচারকরা স্থানীয় ভাষায় তাদের ধর্মমত প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ওড়িশায় বৈষ্ণবরা ওড়িয়া ভাষায়, আসামে শংকরদের অসমিয়া ভাষায় এবং মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব ও নামদের মারাঠি ভাষায় তাঁদের ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তাঁরা শুধু ধর্মমত প্রচার করেননি, দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন, গান ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তুর্কি আগমনের আগে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনে সংস্কৃতের সঙ্গে স্থানীয় ভাষা তামিল,

কানাড়া, মারাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। তুর্কি শাসকরা এই রীতি বজায় রাখেন, সংস্কৃতের স্থান নিয়েছিল ফার্সি ভাষা। সুলতানি যুগে হিন্দি জানা হিসেবরক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সুলতানি রাজ্যে ভাঙন দেখা দিলে আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে, এরা ফার্সির সঙ্গে স্থানীয় ভাষাকে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করত। বিজয়নগরের রাজারা তেলেগু ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেন। বাহমনি ও পরে বিজাপুর রাজ্যে মারাঠি ভাষা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হতো। এই ভাষাগুলি উন্নত হলে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়। স্থানীয় শাসকরা এইসব ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতেন। বাংলার শাসক নসরত শাহ রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করান। মালাধর বসু ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। এসেনশাহী বংশের শাসকরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। সুফি সাধকরা তাদের সঙ্গীত সম্মিলনীতে হিন্দি কবিতা পাঠ করতেন। সুফি দরবেশ মুল্লা দাউদ চন্দায়ন এবং মালিক মুহম্মদ জায়সি হিন্দিতে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। জনগণের বোধগম্য ভাষায় তাদের উপদেশমূলক গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

এই পর্বে যেসব প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো কবিতা বেশি, গদ্য খুবই কম (fundamentally the literature of poetry, and prose was very rarely cultivated) |কবিতার নিতে বারমাস্যা ও চৌতিশা পাওয়া যায়। অপভ্রংশ থেকে হিন্দির উৎপত্তি হয়েছিল। আমার সরু হলেন প্রথম দিককার হিন্দি লেখকদের মধ্যে অন্যতম, কবীর হনেল হিন্দি সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। বীজকও বাণীতে কবীরের দোঁহাগুলি পাওয়া যায়, শিখদের আদিগ্রন্থে কবীরের দোঁহা স্থান পেয়েছে। কবীর ভোজপুরি ভাষায় কিছু মৌহা রচনা করেছিলেন। বল্লভাচার্য ও তাঁর শিষ্যরা ব্রজ ভাষায় তাঁদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ও কাব্য রচনা করেন, সুরদাস এই ভাষাতে লিখেছিলেন। মীরাবাঈ রাজস্থানী ভাষায় তাঁর গান লেখেন। গুরু নানকের জীবনী জননসখি-তে গুরুমুখি ভাষার উৎপত্তি লক্ষ করা যায়। সিদ্ধি সাহিত্যে লেখা হয়েছে অনেকগুলি গাথা। আরাতি ভাষায় প্রচুর লেখা হয়েছে, তবে এই ভাষা বিশুদ্ধ গুজরাতি নয়, অপভ্রংশের মিশ্রণ আছে। জৈন লেখকরা গুজরাতি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়েছেন, হেমচন্দ্র হলেন এই ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। গুজরাট, মাড়োয়ার ও মালবের লোককথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। গীতগোবিন্দের সমপর্যায়ের গুজরাতি কাব্য বসন্তবিলাস লেখা হয়েছে। পদো লেখা হয় রণমল্ল ছন্দ, ঊষাহরণ, সীতাহরণ, প্রবোধ চিন্তামণি ও গদ্যে পৃথ্বীচন্দ্র চরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ।

নরসিংহ মেহতা (১৪১৫-৮১) ছিলেন গুজরাতি সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি ছিলেন একজন ভক্ত-সাধক, জাতিপ্রথার বিরোধী। বেদান্তে বিশ্বাসী নরসিংহ ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চদশ শতকে ভালনা গুজরাতি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। জ্ঞানদেব ও নামদের, একনাথ ও তুকারাম মারাঠি সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। এরা বারাকরী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধি ও ভোজপুরি

হলো পূর্ব ভারতের ভাষা। এর মধ্যে বাংলার অবদান হলো সবচেয়ে অধিক, বেশি লোক এই ভাষায় কথা বলত, বেশি সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছিল। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে লোককথাকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন (১৪১৮)। গুণরাজ খান মালাধর বসু লেখেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য (১৪৭৩), বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হলেন চণ্ডীদাস। পঞ্চদশ শতকের বাংলায় সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ করা যায়। হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরত খান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হুসেন শাহের চট্টগ্রামের প্রাদেশিক গভর্নর পরাগল খান ও ছুটি খান কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতক থেকে বাঙালি রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত শুনতে ভালোবাসত, সাহিত্যরস পান করে বাঙালি মানস উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে পদ লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, চৈতন্যের জীবনী সাহিত্য হলো বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

মৈথিলী ভাষার প্রথম কবি হলেন উমাপতি ধর। জ্যোতিরিশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্নাকর হলো মৈথিলী ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। বিদ্যাপতি ঠাকুর হলেন মৈথিলী ভাষার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো রাধাকৃষ্ণ প্রেম: নিয়ে রচিত গীতিকবিতাগুলি। বাঙালি হৃদয় জয় করে নিয়েছে এই কবিতাগুলি, বাঙালি কবিরা এগুলির অনুকরণ করেছেন (These Radha Krishna poems of Vidyapati took by storm the heart of Bengal) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষ অসমিয়া ভাষার কথা বলে, অসমিয়া ভাষা অনেকটা বাংলার মতো। চর্যাপদগুলি পুরনো অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছে বলে অসমিয়াদের পক্ষে দাবি করা হয়েছে। কামতাপুর রাজ্যের রাজার সভাকবি, অসমিয়া ভাষার প্রথম দিককার লেখক হেম সরস্বতী, লেখেন প্রহ্লাদচরিত্র। হরিহর বিপ্র ও কবিরত্ন সরস্বতী মহাভারতের অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। কবিরাজ মাধব বাঙালি হলেও অসমিয়া ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। অন্যান্য কবিরা হলেন দুর্গাবর, পীতাম্বর ও মানকর। অসমিয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন শংকরদেব।

শংকরদেবের আগে আসামে শক্তিধর্মের প্রাধান্য ছিল, শংকরদের 'একশরণ ধর্ম' প্রবর্তন করেন। এই ধর্মমত হলো ভক্তিবাদ (Religion of seeking refuge in one)। অসমিয়া ভাষায় তিনি ও তাঁর শিষ্যরা ভক্তিধর্ম প্রচার করেন, প্রত্যেক অসমিয়ার ঘরে (নামঘর) তাঁর গান গাওয়া হতো। তিনি নাটক লিখে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অসমিয়া ভাষায় তিনি 'বরগীত' রচনা করেন, এগুলি হলো ভক্তিমূলক কবিতা, এগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। শংকরদেবের শিষ্য মাধবদাসও গুরুর মতো সাহিত্য সৃষ্টি করে অসমিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। আসামের ঐতিহাসিক সাহিত্য বুরঞ্জি লেখা হয়।

পূর্ব ভারতের আর একটি প্রধান ভাষা হলো ওড়িয়া। ওড়িয়া ভাষায় লেখা বিভিন্ন পাওয়া গেছে। ওড়িয়া পণ্ডিতরা চর্যাপদকে ওড়িয়া ভাষায় লেখা বলে দাবি করেছেন। দ্বাদশ শতক থেকে ওড়িয়া

ভাষায় প্রভু জগন্নাথের ইতিহাস দেখা শুরু হয়েছে, এর নাম হলো মাদলাপঞ্জি। চতুর্দশ শতকে বৎসদাস কলস-চৌতিশা লিখেছেন পদ্যে। নারায়ণদাস অবধূত 'রুদ্র-শুদ্ধ-নিধি' নামে যোগ-বেদান্ত-তন্ত্র নিয়ে দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছেন সারলা দাস হলেন ওড়িশার একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

৫.৪.১১.৫ উপসংহার

অতএব আমরা উক্ত পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষা সাহিত্যের বিকাশ প্রত্যক্ষ করলাম। বিভিন্ন ভাবে তাদের বিকাশ হয়েছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি গভীর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৫.৪.১১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) **Discuss different regional cultures of India with special reference to Bengal.**

২) **Discuss the rise of regional languages in Medieval India.**

৫.৪.১১.৭ সহায়ক গ্রন্থ

১) **Medieval India-Satish Chandra.**

2) **লোক সংস্কৃতির ত্রিবলয়- সুজয় কুমার মণ্ডল।**

3) **লোকসংস্কৃতি পাঠের ভুমিকা- তুষার চট্টোপাধ্যাও।**

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৫

Unit-12 : Decline of Indigenous Education
(দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন)

Unit-13 : Western Education, National Council of Education
(পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ)

Unit-14 : University Education and the Educated Bengalis
(বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়)

বিন্যাস ক্রম

৫.৫.১২.১ : উদ্দেশ্য
৫.৫.১২.২ : পুরাতন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভাঙন
৫.৫.১২.৩ : দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন
৫.৫.১৩.৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬)
৫.৫.১৪.৫ : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা
৫.৫.১৪.৬ : শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়
৫.৫.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
৫.৫.১৪.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৫.১২.১ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে জানা যাবে :

(১) বাংলায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল।

(২) দেশীয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্বরূপ কেমন ছিল।

(৩) দেশীয় শিক্ষার ভাঙন কিভাবে ও কেন হয়।

(৪) বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার কিভাবে হয়েছিল।

(৫) কারা কারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

(৬) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিভাবে ও কখন গঠিত হয়।

(৭) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যাবলী কি ছিল।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাংলাদেশে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল এবং তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কতটা সমৃদ্ধ করেছিল।

কোন দেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করে ইংরেজরা ভারতীয় জনগণকে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্যের ব্যাপক ও গভীর সাফল্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে কোম্পানির সরকারের হস্তক্ষেপের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা এবং বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন।

৫.৫.১২.২ : পুরাতন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভাঙন (Decline of Indigenous Education)

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলায় এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। F.W. Thornas তাঁর ‘History and Prospects of British Education in India’ গ্রন্থে লিখেছন যে “ভারতের ইংরেজরা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন।” ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে উইলিয়াম এ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করেন তা থেকে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) দেশীয় শিক্ষা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—‘পাঠশালা’ ও ‘মক্তব’। এইসব গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি চেহারা সারা ভারতে প্রায় একইরকম ছিল। সাধারণত পাঠশালায় হিন্দু ছাত্ররা পড়াশুনা করত। আর মক্তবে পড়ত মুসলমান ছাত্ররা। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন বিচার বিভাগে বিশেষ সুবিধা পাবার জন্য কিছু হিন্দু ছাত্র মক্তবে পড়াশুনা করতে যেত। সাধারণভাবে ফারসী ভাষার বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত মক্তব। আর ভারতীয় আধুনিক ভাষার বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত পাঠশালা। মুসলিম মৌলবীরাই ছিলেন মক্তব্যের শিক্ষক। আর হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হত ‘পাঠশালা’গুলি। গ্রাম ও শহর সর্বত্রই মক্তব ও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল ব্যাপক। মসজিদগুলি ছিল মক্তবী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। সেখানে নামাজের মন্ত্রপাঠ ও কোরাণ পাঠ শেখানো হত। এছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির জন্য ফারসী ভাষা শেখানো হত। দরবারী ভাষ্য হিসাবে ফারসী ও উর্দু সকলকেই শিখতে হত। যেখানে এসব ভাষা শেখানোর গুরুত্ব দেওয়া হত। পাঠশালাগুলি গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানা বা আলাদা ঘরে আসতো। এইসব পাঠশালায় সাহিত্য, ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পড়ানো হত। তাছাড়া হিসাবশাস্ত্র, জমি জরীপ, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতিও শেখানো হত। পাঠশালাগুলির খরচ বহন করতেন গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা। অনেকক্ষেত্রে গ্রামের মানুষেরা সবাই মিলে খরচ বহন

করতেন। পাঠশালার শিক্ষকদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল। গ্রামের মানুষেরা তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন।

(খ) দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ :

(১) দেশীয় পাঠশালাগুলি ছিল জন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা পরিচিতি ইত্যাদি শেখানো হত।

(২) যাঁরা এইসব পাঠশালায় পড়াতেন তাঁদের সাধারণ জ্ঞানের বেশি বিদ্যা ছিল না। শিক্ষকরা শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য কোন বৃত্তিব্যবসা গ্রহণ করতেন।

(৩) বিদ্যালয়গুলির সাজসরঞ্জাম ছিল খুবই সাধারণ মানের। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। অনেক সময় ঠাকুর মন্দিরে বা গাছতলায় পড়ানো হত।

(৪) ছাপা বই ছিল না। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ছিল না, ছাত্ররা শ্লেট-পেন্সিল ব্যবহার করত। সাধারণত শ্রুতলিপি, অংক ইত্যাদি শেখানো হত।

(৫) শিক্ষাদানের সময় ও দিন স্থানীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর নির্ভর করত। বিদ্যালয় ভর্তির কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না।

(গ) দেশীয় উচ্চশিক্ষা :

দেশীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি দুভাগে বিভক্ত ছিল : (১) হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত 'টোল' বা চতুষ্পাঠী (২) আর মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ছিল 'মাদ্রাসা'। সমগ্র ভারতে এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছড়িয়ে ছিল। এ্যাডামের হিসাব অনুযায়ী সে সময়ে বাংলা ও বিহারে টোলের সংখ্যা ছিল ১৮০০। শিক্ষকরা নিজেদের ঘরে টোল বা চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন। ঘর ছিল মাটির। অনেক ক্ষেত্রে টোলগুলি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকত। টোল ছিল আবাসিক। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্ররা ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহ করত। টোলের পণ্ডিতরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। অব্রাহ্মণ ছাত্ররা টোলে পড়ার সুযোগ পেত না। মেয়েরা টোলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। টোল সাধারণত তিন ধরনের ছিল : (১) প্রথম ধরনের প্রতিষ্ঠানে শেখানো হত ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য (২) দ্বিতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে ন্যায়শাস্ত্র ও প্রাচীন কাব্য শেখানো হত (৩) আর তৃতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রধানতঃ তর্কশাস্ত্র পড়ানো হত। তবে তন্ত্রবিদ্যা ও জ্যোতিষ চর্চাও শেখানো হত। শিক্ষকদের পণ্ডিত্য ছিল প্রশংসনীয়। তাঁরা সমাজ সম্মানের পাত্র ছিলেন।

টোলের তুলনায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল অনেক কম। তবে শিক্ষার মান ছিল অনেক উন্নত। উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মৌলবীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলি এখানে শেখানো হত। সাধারণ আরবী ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। মাদ্রাসাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা টোলের তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। বাদশাহী ও নবাবী দরবারে উচ্চপদ লাভের জন্য অনেকেই মাদ্রাসায়

উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যেত। এই উদ্দেশ্যে হিন্দু ছাত্ররাও মাদ্রাসায় ভর্তি হত। মৌলবীরা ধর্মীয় ও নৈতিক মান বজায় রাখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। শুধুমাত্র অর্থের জন্য তাঁরা শিক্ষকতা করতেন না। তাঁরা শিক্ষাকর্তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে টোলগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক গড়ে উঠত। মাদ্রাসায় তা লক্ষ্য করা যেত না।

(ঘ) দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ :

(১) অধ্যাপক এ. আর. দেশাই সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকতার দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ব্রাহ্মণদেরই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ছিল। হিন্দুরাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী অন্য জাতের লোকদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ ছিল।

(২) মেয়েরা, নিচু জাতের লোকেরা ও কৃষকরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত না। তবে ব্যবসায়ীর ছেলেদের সুযোগ ছিল।

(৩) হিন্দু-সমাজের জাতিভিত্তিক কাঠামোর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করা হত। যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, পিতামাতা, শিক্ষক ও রাজার প্রতি নিঃশর্ত বাধ্যতা শেখানো হত। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে প্রচলিত সামাজিক কাঠামো গ্রহণ ও স্বীকার করানো হত।

(৪) হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা কোন গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে ছিল না। ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্য যে-কোন মুসলমানই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতে পারত।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা যুক্তিভঙ্গী গড়ে উঠত না। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমানে পরিণত করা নিজ নিজ ধর্ম ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের আনুগত্যপরায়ণ করে তোলা হত।

৫.৫.১২.৩ : দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন

আশ্চর্যের বিষয় হল, যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বিচার ও সংস্কার করেছিল, ভারতের দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডের মত ভারতের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তারা প্রাণসঞ্চার করার কোন চেষ্টাই করেনি। বরং তাকে অবহেলা ও সমালোচনা করে তার অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তারা বর্তমান শিক্ষার সোপান তৈরি করেছিল।

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের অনেকগুলি কারণ ছিল—

প্রথমতঃ, দেশীয় শিক্ষার ভেতরেই অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। যেমন সেই শিক্ষাব্যবস্থায় নারী, হরিজন, শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের প্রবেশধিকার ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত শিক্ষা ছিল না। শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন এনেছিল। শিক্ষকদের পারিশ্রমিকও ছিল খুবই স্বল্প।

তৃতীয়তঃ, পাঠ্যক্রম ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। উপরন্তু ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল খুবই কঠোর।

চতুর্থতঃ, ব্রিটিশরা আসার পর সরকারী ক্ষেত্রে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চালু হবার ফলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হয়।

পঞ্চমতঃ, আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে দেশীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ী, বিত্তশালী ব্যক্তি ও দেশীয় রাজাদের আর্থিক আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতিকেও দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। বহু রাজনৈতিক আবর্তেও সেই ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়নি। ভারতে আধুনিক শিক্ষার কাঠামো এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারত এবং তা হওয়া সম্ভব ও উচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের মনে অন্য ভাবনা ছিল। তাই দেখা যায় জনগণের সঙ্গে সহজ সম্পর্কযুক্ত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটিয়ে ব্রিটিশরা নতুন শিক্ষা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনগণের সঙ্গে শিক্ষার স্বাভাবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এর ফলে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবহেলিত হতে থাকে ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা :

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী, মিশনারী ও সরকারী প্রচেষ্টার যৌথভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে যখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজ শাসকরা উদাসীন ছিলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন প্রাচ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁদের অন্যতম। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিক্ষাজগতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল।

(ক) বেসরকারী উদ্যোগ : বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হয় বেসরকারী উদ্যোগে। রামনারায়ণ মিশ্র এর সূচনা করেন কলকাতায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। কলকাতার ইউরোপীয়রা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শেরবোর্ন জোড়াসাঁকোয় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে দ্বারাকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরাজী শেখেন। মার্টিন বোল ছিলেন বিখ্যাত শীল পরিবারের ইংরাজী শিক্ষক। তিনি শীল পরিবারের উৎসাহে স্কুল খুলেছিলেন। ড্রামন্ড-এর 'ধর্মতলা একাডেমী'তে প্রথম পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১৭ সালে বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলার ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ডেভিড হেয়ারও কলকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকরা।

ডেভিড হেয়ার বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি ছিলেন 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। সোসাইটির কিছু সদস্য পরে প্রতিষ্ঠা করেন 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'। এর কার্যকলাপ মূলতঃ ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রসারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন হেয়ার স্কুল। বেথুন প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'। মাদাম লস্‌ন্‌ প্রতিষ্ঠা করেন 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। শিক্ষক তারাচাঁদ চক্রবর্তী রচনা করেন বাংলা-ইংরাজী অভিধান।

(খ) মিশনারী প্রচেষ্টা : পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্য উইলিয়াম কেরী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের ধর্ম প্রচারক। ১৮১৮ সালে তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চুঁচুড়ায় লন্ডন মিশনারী সোস্যাইটির উদ্যোগে রবার্ট মে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন। দু-বছরের মধ্যে ঐ স্কুলের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫০ জন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠা করেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউশন'। ইউনিয়ন স্কুল ও গৌরমোহন আঢ্যর ওরিয়েন্টাল সেমিনারীও ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। মফঃস্বলে টাকী ও বীরভূম জেলাতে স্থানীয় জমিদাররা ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সরকারের দিক থেকে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে আগ্রহ না থাকলেও মিশনারী ও স্থানীয় শিক্ষাপ্রেমী মানুষ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

(গ) সরকারী উদ্যোগ : ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথমদিকে সরকার নির্লিপ্ত থাকলেও ধীরে ধীরে তারা আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। এর পিছনে অবশ্য ইংল্যান্ডের চার্লস গ্রান্ট ও উইলবার ফোর্স-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানির কাছে সুপারিশ করেন। ফলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা বলা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংসের উদ্যোগে জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি সংস্কৃত কলেজের জন্য অর্থ বরাদ্দ রামমোহন রায় তাতে আপত্তি জানিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ঐ অর্থ ব্যয় করতে দাবী জানান। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। প্রিন্সেপ কোলব্রুক প্রমুখ ইউরোপীয় প্রাচ্যপন্থীগণ এদেশে প্রাচ্যশিক্ষা প্রসারের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করার দাবি জানান। কিন্তু রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্টকে এক পত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করতে অনুরোধ জানান। জনশিক্ষা কমিটির কিছু সদস্য রামমোহনের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন।

জনশিক্ষা কমিটির সভাপতিরূপে যোগ দেন লর্ড মেক্‌লে। তিনি ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্যবাদী। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। এই সুপারিশ তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারী অনুদান ব্যয় করার কথা বলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে ঘোষণা করেন যে, এরপর থেকে সরকারী

অনুদান ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিং-এর এডুকেশনাল ডেসপ্যাচ্ ছিল এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই ডেসপ্যাচে বলা হয় সরকারী চাকরী করতে হলে ইংরাজী ভাষায় যারা লিখতে পড়তে জানে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই নীতি ঘোষণা করার পর ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারী উদ্যোগে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে যুক্তি ছিল এই যে, শিক্ষার স্রোত উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নতর শ্রেণীতে প্রবাহিত হবে। তবে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উড ভারতে শিক্ষা বিষয়ক যে নির্দেশনামা পাঠান, তা সরকারী নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এই নির্দেশনামায় ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ভারত সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এইসব বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তার গতি তেমন দ্রুত ছিল না। ভারতীয়দের অনাগ্রহ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পুরানো শিক্ষার মাধ্যম ভার্নাকুলার বা ভারতীয় ভাষা অবহেলিত হতে থাকে। সরকারী চাকরীতে ইংরাজীতে জ্ঞান আবশ্যিক করার ফলে একদিকে ইংরাজী শিক্ষার জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি সমাধি রচিত হল ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার।

৫.৫.১৩.৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬) (National Council of Education 1906)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার পরিবেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। এর আগে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করে তাঁর শিক্ষা-সংকোচন নীতি ঘোষণা করেন। এতে শিক্ষিত ভারতীয়রা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এরপরই কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে স্বদেশী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডন সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সোসাইটির পক্ষে স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনে'র অফিসে ১৯৫০ সালের ১৬ই নভেম্বর একটি বৈঠক করেন। সেখানে একটি প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারকনাথ পালিত। সুবোধ মল্লিক, ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, ভুপেন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার প্রমুখ মনীষীরা। প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৬ সালের ১৬ই মার্চ সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' রূপান্তরিত হল। ১লা জুন পরিষদকে রেজেস্ট্রি করা হয়। তৈরী করা হল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল : (১) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। তবে ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখা হয় (২) বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কলা, সংস্কৃতি ও মানবিক বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয় (৩) নীতি, ধর্ম ও শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় (৪) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়।

১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে কলকাতার 'টাউন হলে' এক বিরাট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অনুমোদিত 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুল' স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত জনগণের সামনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, "প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সেজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জাতীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে "স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের পরাস্ত করেছে। আমরা বিদেশী শিক্ষার তলায় চাপা পড়ে গেছি।" তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষার নাগপাশ ছিন্ন করে শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হবার আশা প্রকাশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ হলেন বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র হলেন অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ। কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা-এই তিনটি শাখায় কলেজের পাঠক্রমকে ভাগ করা হয়। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, সতীশ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রমাধব মল্লিক, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন। এছাড়া বাইরে থেকে যাঁরা নিয়মিত বক্তৃতা দিতে আসতেন তাঁরা হলেন—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অর্থনীতিতে পিয়ারীমোহন মুখার্জী, উপনিষদে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গণিতে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থ বিদ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৯০৭ সালে এই বিদ্যায়তনের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৭ জন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। যেমন—(১) প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পাঠশালা থেকেই হাতের কাজকে আবশ্যিক করা হয়। (২) মাধ্যমিক স্তর থেকে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য সংস্কৃত, পালি, মারাঠী ও হিন্দি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। (৪) কলেজ স্তরে উচ্চতর বিজ্ঞানের পাঠক্রম রাখা হয়। (৫) কলেজের কারিগরি বিভাগে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) প্রয়োগমূলক শিক্ষা হিসাবে কাঠের কাজ, লোহার কাজ ঢালাইরে কাজ, যন্ত্রপাতি চালনা ইত্যাদির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বহু ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠায়।

জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষদের নেতাদের মতভেদ ছিল। তারকনাথ পালিত ও নীলরতন সরকার মনে করতেন ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর। তাঁদের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে "কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি" (Society for the promotion of Technical Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ এই সমিতির সভাপতি হন। ঐ বছরই সমিতি কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (Bengal Technical Insutitue) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানে কারিগরী ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হত। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য ১৯১০ সালে সমিতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে মিশে যায়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন কেবলমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় পরিষদ অনুমোদিত জাতীয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার দশটি শহরে পরিষদের আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরিষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশটি। এইসব বিদ্যালয় স্থাপনে স্থানীয় জনগণের উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা ছিল লক্ষ্যণীয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। তিলকের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজেও কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলার পরিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯০৬৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা আধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে পরিষদের আদর্শে দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ক্রমশঃ সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইটি। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতারা যাদবপুরে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি স্থাপন করেছিলেন তা আজও সগৌরবে টিকে আছে। ১৯৫৬ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক পর্বের এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অবলুপ্তির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ, যেহেতু এই শিক্ষা আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সেজন্য সেই রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্থ-সামাজিক চাপে মানুষ শিক্ষা আন্দোলন থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, আন্দোলনের নেতাদের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা ছিল অনেকটাই বিক্ষিপ্ত, জাতীয় শিক্ষার পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করতে তাঁরা পারেননি। কোন বিকল্প *স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা কাঠামো তাঁরা উপস্থিত করতে পারেননি।*

চতুর্থতঃ, আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আদর্শগত মতবিরোধ ছিল তবে ব্যর্থ হলেও এই শিক্ষা আন্দোলন জনগণের মনে এক জাতীয় শিক্ষার চেতনা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাধারণ মানুষ, দেশের নেতা ও কংগ্রেসের মধ্যে যে উৎসাহের সাঞ্চার হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে নতুন পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন চলতে থাকে। সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী উঠতে থাকে। দেশের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয় উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৫.৫.১৪.৫ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা :

১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের নির্দেশনামা অনুসারে ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই নির্দেশনামায় যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল নিম্নতম অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চতম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে সংগতি স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশনামায় প্রত্যেক জেলায় সরকারী বিদ্যালয়, কলেজ ও সমস্ত উচ্চশিক্ষাকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল ৭১টি কলেজ। কিন্তু লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে ভারতে এসে দেখেন শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। তিনি সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিশন যেসব সুপারিশ করেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ (ক) কলেজগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন করা।

র‍্যালে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কার্জন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সিনেট ও সিন্ডিকেটের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সিনেটে পাশ হওয়া আইনকে বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হল সরকারকে। আসলে কার্জন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিণত হয় সরকারী বিভাগে। এজন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আইনের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছিলেন। তথাপি একথা স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা এনেছিল, উচ্চশিক্ষার মানকে উন্নত করেছিল, মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তন ঘটিয়েছিল।

উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও তার সমস্যাগুলি পর্যালোচনার জন্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার আর একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাডলার। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ ছিলেন এই কমিশনের অন্যতম ভারতীয় সদস্য। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন। অর্থের অভাবে কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তবে এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।

উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সর্বজনবিদিত। এর রূপকার ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। লর্ড কার্জন যখন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালে স্যার আশুতোষ সেই পদ গ্রহণ করেন। আশুতোষ তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতায় ও দৃঢ়তায় বিদেশী শাসকদের দূরভিসন্ধি ব্যর্থ করে কার্জন প্রবর্তিত আইনকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন, তার গুরুত্ব পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছিলেন তা হল :

(১) সারা দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের একত্রিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব দেন। (২) বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার প্রভূত উন্নতি করেন। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের সাহায্যে তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করেন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি. ভি. রমণ, পি. সি. মিত্র প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন (৩) বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। (৫) গবেষণাপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। (৬) কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন কলেজ স্থাপন করেন। (৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৩ সালের মধ্যে এগারোটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়।

৫.৫.১৪.৬ : শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়

উনিশ শতকের প্রথমে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষিত মানুষদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বিশাল শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ও ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রধান কারণ ছিল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার জন্য মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে গড়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের উত্থান ও জাতীয় আন্দোলনে এই সম্প্রদায়ের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৮৮০-এর দশকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা ৫,০৫,০০০-তে পৌঁছায়।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে অনেক বৃত্তি লাভের সুযোগ আসে যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক্-উপনিবেশিক আমলে ছিল না। তাঁরা আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রমুখ হবার সুযোগ পান। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবস্থা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ বেশিরভাগ নিয়েছিলেন হিন্দুরা এবং বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। বাংলার কলেজ ছাত্রদের অধিকাংশই আসতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা নতুন ধরনের বৃত্তি ও চাকুরীতে প্রবেশ করার ফলে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। তবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশজ শিকড় ছিল সুদৃঢ়। দেশের ঐতিহ্যকে তারা ভোলেননি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি, আদর্শ মতাদর্শের সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁর উপলব্ধি করতে পারেন যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি এবং সাম্য ও আইনের শাসনের মিল খুব কমই আছে। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে যা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমালোচনা শুরু করে। সংগঠিত জাতীয়তাবাদ এদের মাধ্যমেই বিকশিত হতে থাকে। এই শিক্ষিত বাঙালীরা ভারতীয়রাই প্রথম জাতীয় সচেতনতা অর্জন করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরাই অনেকাংশে ভারতীয় জনগণকে আধুনিক জাতিতে সংহত করেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, সংগঠক ও নেতা। শিক্ষামুলক ও প্রচারমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁরাই জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে স্বদেশিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা এনে দিয়েছিলেন। তাঁরাই সৃষ্টি করেছিলেন সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার মধ্যে দিয়েই তাঁরা ভারতে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বীজ বুনতে চেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী আন্দোলনে এঁরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ বাঙালী ও ভারতীয় সংগ্রামশীল নেতৃবৃন্দ সবাই ইংরাজী জানা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন গণভিত্তি পায়, তখন এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবিরাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৫.৫.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। N. L. Basak–History of Vernacular Education in Bengal.

২। সুখময় সেনগুপ্ত—বাঙালী মনীষীর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনা।

৩। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি।

৪। সমর কুমার মল্লিক—আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর।

৫। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান।

৫.৫.১৪.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলায় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনা কর।

(২) দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন কিভাবে হয়েছিল? এর কারণ কি কি?

(৩) বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা কিভাবে প্রসারলাভ করে? কারা এর উদ্যোক্তা ছিলেন?

(৪) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের পটভূমি আলোচনা কর। এর উদ্দেশ্য কি ছিল? এর কার্যাবলী আলোচনা কর।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যা জান লিখ।

(৬) শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা কর।

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ্-৬

Evolution of different forms of music and dance as performing arts.

বিন্যাস ক্রম

৫.৬.১৫.০ : উদ্দেশ্য

৫.৬.১৫.১ : ভারতের সঙ্গীত

৫.৬.১৫.২ : উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

৫.৬.১৫.৩ : লোকসঙ্গীত

৫.৬.১৫.৪ : জনপ্রিয় সঙ্গীত

৫.৬.১৫.৫ : পশ্চিমী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

৫.৬.১৬.৬ : ভারতে নৃত্য

৫.৬.১৬.৫.১ ওড়িশি

৫.৬.১৬.৫.২ কথক

৫.৬.১৬.৫.৩ মণিপুরি নৃত্য

৫.৬.১৬.৬ : উপসংহার

৫.৬.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৬.১৬.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৬.১৫.০ : উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল ভারতের বিভিন্ন নৃত্য সঙ্গীতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এগুলির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে পারবে।

৫.৬.১৫.১ : ভারতের সঙ্গীত

বলতে বোঝায় বহুমুখি বৈচিত্র্যের উচ্চাঙ্গ সংগীত, লোক সংগীত, চলচ্চিত্র সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, ভারতীয় রক সংগীত এবং ভারতীয় পপ সংগীত। ভারত রাষ্ট্রের উচ্চাঙ্গ সংগীত ঐতিহ্যের মধ্যে আছে হিন্দুস্থানি এবং কর্ণাটক সংগীত, যার ইতিহাস সহস্রাব্দ জুড়ে নিহিত এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে এক উন্নত রূপ নিয়েছে। ভারতে সংগীত সামাজিক-ধার্মিক জীবনের সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় শুরু হয়েছিল।

ইতিহাস

মধ্য প্রদেশের ইউনেস্কো বিশ্ব উত্তরাধিকার স্থানে ভীমবেতকা পাথর আশ্রয়স্থিত ৩০,০০০ বছর আগেকার পুরোনো প্রস্তরযুগীয় এবং নতুন প্রস্তরযুগীয় গুহা চিত্রে সাংগীতিক যন্ত্রানুষঙ্গগুলো এবং নৃত্যভঙ্গিমা দেখা যায়।

নৃত্যরত নারীমূর্তি (আনুঃ ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) সিন্ধু সভ্যতা থেকে দেখা যায়। সেখানে সিন্ধু সভ্যতা যুগের মাটির পাত্রের ওপর চিত্রে দেখা যায় পুরুষের কাঁধে ঝোলানো ঢোল এবং মহিলাদের বাঁহাতের নিচে একটা ড্রাম ধরা অবস্থায় আছে।

বেদসমূহ (C. ১৫০০-C. ৮০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বৈদিক যুগ), আচারআচরণের দলিলে প্রদর্শিত শিল্প এবং নাটক। উদাহরণস্বরূপ, শতপথ ব্রাহ্মণ (C. ৮০০-৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) অধ্যায় ১৩.২ অনুযায়ী দুজন অভিনেতার মধ্যে নাটকে প্রতিযোগিতা ছিল। তাল হল একটা সাংগীতিক ধারণা, যেটা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়, যেমন সামবেদ এবং বৈদিক স্তোত্র গাওয়ার পদ্ধতি। স্মৃতিশাস্ত্র (৫০০ থেকে ১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) একটি বৈদিক-পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যার মধ্যে আছে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ (৫০০ থেকে ১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ), যাতে বিবৃত আছে নৃত্য ও সংগীত (উর্বষী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা পঞ্চাপ্সরা, এরকম অপ্সরাগণ দ্বারা নৃত্য, এবং রাবণ-এর মহত্তম ভঙ্গিমা, *নৃত্যগীত* অথবা 'গান গাওয়া এবং নৃত্য' এবং *নৃত্যবাদিত্রা* অথবা 'সাংগীতিক বাদ্যযন্ত্র বাজানো'), গন্ধর্বদের দ্বারা সংগীত এবং গায়কী, নানা রকম তারের বাদ্যযন্ত্র (বীণা, তন্ত্রী, বিপানসি এবং বীণার সমতুল্য ভাল্লাকি), সুষির যন্ত্র (শঙ্খ, বেণু এবং *বেণুগান*-কয়েকটা বাঁশিকে একসঙ্গে বেঁধে একটা মাউথ অর্গানের মতো), রাগা, স্বর প্রতিষ্ঠিত (সাত স্বর অথবা সুর, অনা অথবা *একশ্রুতি* স্বরলিপি, মন্ত্রতে স্বরের নিয়মিত ওঠা ও নামা হল *মূর্ছনা* এবং ত্রিপ্রমাণ ত্রি-স্তর *তিন তাল লয়* যেমন দ্রুত অথবা তাড়াতাড়ি, মধ্য অথবা মাঝামাঝি, বিলম্বিত অথবা ধীর), রামায়ণের বালকাণ্ডতে কবিতা আবৃত্তি এবং উত্তরকাণ্ডেও লব ও কুশ দ্বারা মার্গ ধারায়।

চোদ্দো শতকের অসমিয়া কবি মাধব কান্দালি লিখেছিলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, তিনি তাঁর লেখা 'রামায়ণে' কিছু বাদ্যযন্ত্র তালিকাভুক্ত করেন, যেমন, মার্দালা, খুমুচি, ভেমাচি, দাগার, গ্রাতাল, রামতাল, তবল, ঝাঁঝর, জিঞ্জিরি, ভেরি মহরি, তোকারি, দোসারি, কেন্দারা, দোতারা, বীণা, রুদ্র-বিপঞ্চি, ইত্যাদি (যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর সময় অর্থাৎ চোদ্দো শতক থেকে এসব বাদ্যযন্ত্র চালু ছিল।

৫.৬.১৫.২ : উচ্চাঙ্গ সংগীত

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের দুটো প্রধান ঐতিহ্যের মধ্যে এটা হল কর্ণাটকি সংগীত, যা প্রধানত উপদ্বীপ অঞ্চলে দেখা যায়; এবং হিন্দুস্থানি সংগীত, যার প্রাধান্য আছে ভারতের উত্তর, পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলগুলোতে। এই সংগীতের মূল ধারণার মধ্যে আছে : *শ্রুতি (সূক্ষ্ম আওয়া),* স্বর লিপি), অলংকার (আলংকারিক), রাগ (সংগীতের সাধারণ নিয়ম থেকে তান সম্পাদন), এবং তাল (আঘাত বাদ্য দিয়ে ছান্দিক ধরনকে ব্যবহার)। এই সংগীতের সুরের পদ্ধতি অষ্টক ২২টা ভাগে বিভক্ত, যাকে বলে শ্রুতি, সবটা একই না-হলেও, পশ্চিমি সংগীতের সার্বিক সুরের এক-চতুর্থাংশের সঙ্গে মোটামুটি সমান।

হিন্দুস্থানি সংগীত

হিন্দুস্থানি সংগীতের ঐতিহ্য অনেক পুরোনো, সেই বৈদিক কাল থেকে, যেখানে একটা ধর্ম শাস্ত্র, সাম বেদের স্তোত্র থেকে সাম গান আবৃত্তি নয়, গাওয়া হোত। প্রাথমিকভাবে ইসলামের প্রভাবের ফলে তেরো-চোদ্দো খ্রিস্ট শতকের আশপাশ সময়ে এটা কর্ণাটকি সংগীত থেকে আলাদা ছিল। অনেক শতক জুড়ে একটা মজবুত এবং আলাদা ঐতিহ্য উন্নতিলাভ করেছিল প্রাথমিকভাবে ভারতে, কিন্তু অধুনা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও। দক্ষিণ থেকে উদ্ভূত অন্য এক ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ঐতিহ্য, কর্ণাটকি সংগীতের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে, হিন্দুস্থানি সংগীত যে শুধুমাত্র অতীত হিন্দু সাংগীতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক বৈদিক দর্শন এবং দেশি ভারতীয় আওয়াজ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল তা-ই নয়, বরং মুঘলদের পারসিক প্রদর্শন অনুশীলন দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধরনগুলো হল : ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা ও সাদ্রা, এবং এছাড়াও কতগুলো প্রায়-উচ্চাঙ্গ ধরনের সংগীতও আছে।

কর্নাটকি সংগীত

কর্ণাটকি সংগীতের খোঁজ পাওয়া যায় চোদ্দো-পনেরো খ্রিস্ট শতক এবং তার পর থেকে। বিজয়নগর সাম্রাজ্য শাসনের সময়কালে দক্ষিণ ভারতে এই সংগীতের উন্মেষ ঘটে। হিন্দুস্থানি সংগীতের মতো এটা হল সুরসমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পাদনের সঙ্গে, কিন্তু অনেক স্থায়ী সমন্বয়ের দিকে ঝোঁক আছে। এর মধ্যে আছে সমন্বয়ের সঙ্গে অলংকরণ সম্পাদ রাগ আল্পনা, কল্পনাস্বরম, নিরাভাল ধরনের সঙ্গে যোগ করা, এবং আরো অগ্রগামী ছাত্রদের ক্ষেত্রে রাগ, তাল, পল্লবী। যে লিখিত সমন্বয়গুলো গাওয়া হবে গায়কী নামে পরিচিত, প্রদর্শন করার সময় গাইবার ধরন, এমনকি যখন যন্ত্রানুষঙ্গে বাজানো হয়, আসলে স্বরক্ষেপণের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রায় ৩০০ রাগম বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। আন্নামায়া হলেন কর্ণাটকি সংগীতের প্রথম পরিচিত সংগীতজ্ঞ। তিনি অন্ধ্র পদ কবিতার পিতামহ হিসেবে ভীষণভাবে বিখ্যাত (তেলুগু সংগীত-রচনার ধর্মপিতা)। পুরন্দরা দাসা হলেন কর্ণাটকি সংগীতের জনক। ত্যাগরাজা, শ্যামা শাস্ত্রী এবং মুথুস্বামী দিক্ষিতার প্রমুখ পরবর্তী সংগীতজ্ঞদের কর্ণাটকি সংগীতের একের ভিতর তিন বলা হয়।

বিশিষ্ট কর্ণাটকি সংগীতের শিল্পীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন : আর্যকুদি রামানুজা আয়েঙ্গার (সাম্প্রতিক ঐকতান ধারার জনক), সেম্মানগুডি শ্রীনিবাসা আয়ার, পালাঘাট কে ভি নারায়ণাস্বামী, অলাথুর ভাইগণ, এমএস সুব্বুলক্ষ্মী, লালগুডি জয়ারামন; এবং অতি সাম্প্রতিক বালামুরলিকৃষ্ণা, টিএন শেষাগোপালন, কে জে জেসুদাস, এন রামানি, উমায়ালপুরম কে শিবারামন, সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়ান, মণিপল্লবম কে সরঙ্গন, বালাজি শঙ্কর, টিএম কৃষ্ণা, বোম্বে জয়শ্রী, টি এস নন্দকুমার, অরুণা সাইরাম মাইশোর মঞ্জুনাথ প্রমুখ।

প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে চেন্নাই শহরে একটা দীর্ঘ আট সপ্তাহব্যাপী সংগীত ঋতু, বলা ভালো সংগীতের অধিবেশন চলে, যেটাকে বিশ্বের দীর্ঘতম সংগীত মেলা বলা যায়।

কর্ণাটকি সংগীতকে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মূল ভিত্তি হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে; এর সঙ্গে যুক্ত আছে লোক সংগীত, বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসবের সংগীত এবং অবশ্যই এই বিস্মৃতি সামাজিকভাবে চলচ্চিত্র সংগীতকেও গত ১০০-১৫০ বছর কিংবা তার আশপাশ প্রভাবান্বিত করেছে।

হালকা উচ্চাঙ্গ সংগীত

মানব জীবনের প্রয়োজনে সমাজের মধ্যে অনেক ধরনের সংগীতের উন্মেষ ঘটে; যেগুলো হালকা উচ্চাঙ্গের অথবা প্রায়-উচ্চাঙ্গের। যেমন এই ধারার মধ্যে আছে; ঠুংরি, দাদরা, গজল, চৈতি, কাজরি, টপ্পা, নাট্য সংগীত অথবা নৃত-গীতিনাট্য এবং অবশ্যই কাওয়ালি। এই ধারাগুলো খুব স্পষ্টভাবেই শ্রোতাদের তরফ থেকে আবেগের ওপর জোর দেয়, যেখানে এগুলো আদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিপরীত ধরন।

৫.৬.১৫.৩ : লোক সংগীত

রবীন্দ্র সংগীত (বাংলার সংগীত)

রবীন্দ্র সংগীত বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে; *রবীন্দ্র সংগীত,* সারা বিশ্বে রবীন্দ্র সংগীতকে **টেগোর সঙ্গস্‌** বলা হয়, এই গান এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত এবং সুরারোপিত। এই গানের অভিনব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে বাংলার সংগীত, যেটা ভারত, বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। সংগীত অর্থে গান, 'রবীন্দ্র সংগীত' অর্থাৎ (অথবা যথাযথভাবে গান) রবীন্দ্রনাথের গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় প্রায় ২,২৩০ সংখ্যক গান লিখেছিলেন, যেগুলোকে এখন *রবীন্দ্র সংগীত* বলা হয়, উৎস হিসেবে উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং লোক সংগীত ব্যবহার করা হয়েছিল।

অসমের বিহু সংগীত

বিহু (অসমীয়া : বিহু) হল মাঝ-এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হওয়া অসম রাজ্যের নববর্ষ উৎসব। এই উৎসব হল প্রকৃতি এবং পৃথিবী মাকে উৎসর্গিত, যে উৎসবের প্রথম দিনটা গোরু এবং মহিষদের জন্যে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় দিনের উৎসব হল মানুষের জন্যে। বিহু উৎসবের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে বিহু নাচ এবং গানগুলো ঐতিহ্যপূর্ণ ড্রাম এবং বাঁশিজাতীয় যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার। বিহু গানগুলো ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ এবং ছন্দের সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানানো হয়ে থাকে। বিহুতে অসমীয়া ডাম (ঢোল), শিঙা (সাধারণত মহিষের শিং দিয়ে বানানো), গোগোনা এবং বেশির ভাগ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ডান্ডিয়া

ডান্ডিয়া অথবা রাস হল দুহাতে দুটো কাঠি নিয়ে প্রদর্শিত একটা গুজরাতি সাংস্কৃতিক নৃত্য। বর্তমান সাংগীতিক ধারাটা ঐতিহ্যপূর্ণ লোকনৃত্যের সঙ্গত থেকে অনুগৃহীত। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রধানত গুজারাট রাজ্যে দেখা গেলেও সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছে। ডান্ডিয়া/রাসের সঙ্গে আরো একটা ধারার নৃত্য এবং সংগীত সংযুক্ত, যাকে বলা হয় গরবা।

উত্তরাখণ্ডী সংগীত

আঞ্চলিক পার্বত্য ভূখণ্ডের প্রকৃতি মায়ের কোল থেকে মূল উৎসারিত হয়ে উত্তরাখণ্ডী লোক সংগীত সমাজে প্রতিষ্ঠিত। উত্তরাখণ্ডের লোক সংগীতের সাধারণ বিষয়গুলো হচ্ছে : প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিভিন্ন ঋতুবৈচিত্র্য, উৎসবগুলো, ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো, সাংস্কৃতিক কাজকর্মগুলো, লোক গাথাগুলো, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো, এবং পূর্বসূরিদের সাহসিকতার কাহিনি। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের লোকগীতিগুলো হল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং হিমালয়ের কোলে বসবাসকারী জনগণের জীবন যাপনের প্রতিফলন। উত্তরাখণ্ড সংগীত পরিচালনায় যেসব যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার হয় সেগুলো হল : ঢোল, দামৌন, তুরি, রণসিংহ, ঢোলকি, দাউর, থালি, ভাঙ্কোরা মসকভজা। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশেষ করে নথিভুক্ত করা লোক সংগীতের ক্ষেত্রে কখনো কখনো তবলা এবং হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আধুনিক জনপ্রিয় লোক সংগীতশিল্পী নরেন্দ্র সিং নেগি, মোহন উপ্রেতি, গোপাল বাবু গোস্বামী এবং চন্দ্র সিং রাহী প্রমুখ দ্বারা লোক সংগীতের ক্ষেত্রে ভারত বর্গীয় এবং বৈশ্বিক যন্ত্রসংগীতগুলোর অবতারণা করা হয়েছিল।

লাবনি

লাবনি নামটা এসেছে ‘লাবণ্য’ শব্দ থেকে, যার অর্থ হল সুন্দর। এটা ভীষণভাবে জনপ্রিয় নৃত্য এবং সংগীতের একটা ধারা, যেটা সারা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে এটা মহারাষ্ট্রীয় জনতার লোক সংগীত প্রদর্শনগুলোর একটা অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ঐতিহ্যগতভাবে এই গানগুলো মহিলা শিল্পীরাই গেয়ে থাকে, কিন্তু কখনো বা পুরুষ শিল্পীরাও লাবনি গান গায়। লাবনি গানের সঙ্গে যে নাচের ধারা সংযুক্ত তাকে বলা হয় তামাশা। লাবনি হল একটা ঐতিহ্যপূর্ণ গান ও নাচের সমাহার, যেটা বিশেষত ড্রামের মতো এক যন্ত্র, ‘ঢোলকি’র মোহিত করা বাজনা দিয়ে প্রদর্শিত হয়। ন-গজ শাড়ি পরে আকর্ষণীয় মহিলারা নাচ প্রদর্শন করে। তারা একটা ঝটিতি উত্তেজক গান গায়। মহারাষ্ট্রে এবং মধ্য প্রদেশের শুকনো অঞ্চল থেকে লাবনির উদ্ভব হয়েছে।

রাজস্থান

রাজস্থান রাজ্যের এক বিচিত্র ধরনের সাংস্কৃতিক সংগ্রহের সংগীতজ্ঞের জাতিগোষ্ঠী আছে, যেমন : লঙ্গস, সপেরা, ভোপা, যোগী এবং মঙ্গনিয়ার (ভাষাগতভাবে, ‘একজন, যে চায়/ভিক্ষে করে’)। *‘রাজস্থান ডায়েরি’ বয়ান* দিয়েছে যে, এটা একটা ঐকতানের বৈচিত্র্য নিয়ে হৃদয়োৎসারিত, পূর্ণস্বরীয় সংগীত। রাজস্থানের তান বিচিত্র সব যন্ত্রসংগীত থেকে আসে। তারের বাজনার বহুমুখিতার মধ্যে আছে সারেঙ্গি, রাবণাহাতা, কামায়াচা, মরসিং এবং একতারা। পার্কাসান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সবরকম আকার ও সাইজের প্রচুর নাগারা এবং ঢোল থেকে ছোটো ডাম ছিল। ডাফ এবং চ্যাং হল হোলি খেলার (রঙের উৎসবের) জনপ্রিয় যন্ত্রবাদ্য। বাঁশি এবং ব্যাগপাইপারগুলো এসেছে স্থানীয় উদ্যম থেকে; যেমন সানাই, পুঙ্গি, আলগোজা, তার্পি, বীণ এবং বাঙ্গিয়া।

রাজস্থানি সংগীত তন্ত্রবাদ্যা, পার্কাসন বাদ্য এবং হাওয়া বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণে এবং সহযোগে উদ্ভূত যেটা লোক সংগীতশিল্পীদের দ্বারা পেশ করা এক সম্মিলিত উদ্যোগ। এটা বলিউডে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রমোদ সংগীত হিসেবে মান্যতা পেয়েছে।

৬.১৫.৩ : জনপ্রিয় সংগীত

চলচ্চিত্র সংগীত

সবচেয়ে বড়ো আকারের ভারতীয় জনপ্রিয় সংগীত হল চলচ্চিত্র সংগীত, অথবা ভারতীয় সিনেমার গান, এটা ভারতের সংগীত বিপননের ৭২ শতাংশ সম্পূর্ণ করে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প একদিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওপর শ্রদ্ধা রেখে সমর্থনযোগ্য সংগীত এবং যখন অন্যদিকে পশ্চিমি অর্কেস্ট্রার সংমিশ্রণে ভারতীয় তানের একটা সমর্থনের সংগীত বেরিয়ে আসছে। সংগীত স্রষ্টাগণ: শচীন দেব বর্মন, শংকর জয়কিষান, রাহুল দেব বর্মন, মদন মোহন, নৌসাদি আলি, ওপি নায়ার, হেমন্ত কুমার সি রামচন্দ্র, সলিল চৌধুরী, কল্যাণজি আনন্দজি, ইলাইয়ারাজা, এআর রহমান, যতীন ললিত, অনু মালিক, নাদিম-শ্রবণ, হরিশ জয়রাজ, হিমেশ রেশম্মাইয়া, বিদ্যাসাগর, শংকর এহসান লয়, সেলিম-সুলেমান, প্রীতম, এমএস বিশ্বনাথন, কেভি মহাদেবন, ঘন্টাসালা এবং এসডি বাতিশ একতার নীতিকে কার্যকর করেন যখন উচ্চাঙ্গ এবং লোক সংগীতের সুরভিকে জাগ্রত রাখেন। রবি শংকর, বিলায়েৎ খান, আলি আকবর খান এবং রাম নারায়ণ প্রমুখ উচ্চাঙ্গ সংগীতের কিংবদন্তীরাও চলচ্চিত্রের জন্যে সংগীত রচনা করেছেন। ঐতিহ্যগতভাবে, গোড়ার যুগে সিনেমার নায়ক-নায়িকারা কাহিনির মধ্যে নিজেদের গলায় গান গাইতেন; যেমন কিশোর কুমার এবং কানন দেবী প্রমুখ। কিন্তু বর্তমান যুগের ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গানের স্বর দেননা, তার বদলে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীরা তাঁদের গান গেয়ে দেন, শব্দকে আরো উন্নত, তানযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী করতে, যখন অভিনেতারা পর্দায় গানের গলা মিলিয়ে ঠোঁট নাড়েন। অতীতে অল্প কয়েকজন সংগীত শিল্পী হিন্দি চলচ্চিত্রে স্বর দিতেন। তাঁদের মধ্যে আছেন : কেজে জেসুদাস, মহম্মদ রফি, মুকেশ, এসপি বালাসুব্রহ্মনিয়াম, টিএম সুন্দরারাজন, হেমন্ত কুমার, মান্না দে, পি সুশীলা, লতা মঙ্গেশরকর, আশা ভোঁসলে, কেএস চিত্রা, গীতা দত্ত, এস জানকী, শমসাদ বেগম, সুরাইয়া, নূরজাহান এবং সুমন কল্যাণপুর। সাম্প্রতিক নেপথ্য সংগীত শিল্পীরা হলেন : উদিত নারায়ণ, কুমার শানু, কৈলাশ খের, আলিশা চিনাই, কেকে, শান, মধুশ্রী, শ্রেয়া ঘোষাল, নিহিরা যোশী, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, হরিহরণ (গায়ক), ইলাইয়ারাজা, এআর রহমান, সোনু নিগম, সুখবিন্দর সিং, কুণাল গাঁজাওয়ালা, অণু মালিক, সুনিধি চৌহান, অণুষ্কা মানচন্দা, রাজা হাসান, অরিজিৎ সিং এবং অলকা যাজ্ঞিক। রক ব্যান্ডগুলো হল : ইন্দাস ক্রীড, ইন্ডিয়ান ওসেন, সিল্ক রুট এবং ইউফোরিয়া। কেবল্ টেলিভিশন সংগীতের উন্নতির ফলে এগুলো বর্তমানে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

অ-ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া

গত শতকের সাত এবং আটের দশকে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে রক অ্যান্ড রোল মিশ্রণের যে প্রকাশ হয়েছিল সেটা সারা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা জুড়ে সুপরিচিত হয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আলি আকবর খান যে প্রদর্শন করেছিলেন সেটাই সম্ভবত এই প্রবণতার শুরুয়াত ছিল।

জ্যাজ অগ্রগামী যেমন জন কোল্ট্রান—যিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের সময়কাল নাগাদ 'ইন্ডিয়া' নামে একটা রচনা তাঁর লিভ অ্যাট দ্য ভিলেজ ভ্যানগার্ড অ্যালবামের জন্যে রেকর্ড করেন (এই কাজটা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোল্ট্রন-এর অ্যালবাম ইম্প্রেশন্স প্রকাশ না-হওয়া পর্যন্ত)—এই মিশ্রণটা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। জর্জ হ্যারিসন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে (দ্য বিটলস-এর) 'নরওয়েজীয় উড (দিস বার্ড হ্যাজ ফ্লোন)' এই গানে সেতার

বাজিয়েছিলেন, যার ঝলকের আগ্রহ পেয়েছিলেন রবি শংকর থেকে, যিনি পরবর্তীকালে তাঁকে তাঁর শিক্ষাণবিশ হিসাবে নিয়েছিলেন। জ্যাজ প্রবর্তক মাইলস ডেভিস—খলিল বালাকৃষ্ণা, বিহারি শর্মা এবং বাদল রায় প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে তাঁর বৈদ্যুতিক ঐকতান বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ড এবং প্রদর্শন করেছিলেন। ভির্তুয়োসো জ্যাজ গিটারবাদক জন ম্যাকলগলিন মাদুরাইতে কর্ণাটকি সংগীত শিক্ষার জন্যে অনেক বছর কাটিয়েছেন এবং এই সংগীত তাঁর শক্তিসহ অনেক কাজের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন যেখানে বিশিষ্ট ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের অবদান আছে। অন্যান্য পশ্চিমি শিল্পী যেমন গ্রেটফুল ডেড, ইনক্রেডিবল্ স্ট্রিং ব্যান্ড, দ্য রোলিং স্টোন্স, দ্য মুভ এবং ট্র্যাফিক এরা সেই সময়ই ভারতীয় প্রভাবে বাদ্যযন্ত্রগুলো এবং ভারতীয় প্রদর্শকদের প্রয়োগ করেছিলেন। কিংবদন্তি গ্রেটফুল ডেড প্রমুখ জেরি গার্সিয়া তাঁর উচ্চাঙ্গের সিডি 'ব্লু ইনক্যান্টেশন' (১৯৯৫)-তে গিটারবাদক সঞ্জয় মিশ্রকে যুক্ত করেছিলেন। মিশ্রজি ফরাসি চিত্র পরিচালক এরিক হিউম্যানকে তাঁর *পোর্ট জেমা* (১৯৯৬) ছবির জন্যে এক আসল স্বরলিপি রচনা করে দিয়েছিলেন, যেটা হ্যাম্পটন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ রচনা বিবেচিত হয় এবং বার্লিনে স্বর্ণ ভালুক লাভ করে। তিনি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ড্রামার ডেনিস চেম্বার্স (কার্লোস সান্তানা, জন ম্যাকলগলিন প্রমুখ)-এর সঙ্গে রেসকিউ রেকর্ড হলেন এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চাতেয়ু বেনারস ডিজে লজিক এবং কেলার উইলিয়ামস (গিটার এবং উদারা)-এর সঙ্গে কাজ করেন।

যদিও ভারতীয় সংগীতের উত্তেজনা দর্শক-শ্রোতারা মূল স্রোত থেকে প্রশমিত হয়েছিল, গোঁড়া অনুগামী এবং অভিবাসীরা মিশ্র প্রবাহ জারি রেখেছিল। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে একটা বিট-প্রভাবিত রাগ রক শংকর, যাকে সেতার শক্তি বলা হয়, অশ্বিন বাতিশ সেতারকে পশ্চিমি জাতিগুলোর কাছে পুনরায় পরিচয় করিয়েছিলেন। সেতার শক্তি রেকর্ড প্রমাণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং নিউ জার্সির শানাচি রেকর্ডস দ্বারা তীব্র আকর্ষণ করায় তাদের ওয়ার্ল্ড বিট এখনো পপ বিভাগে প্রধান হওয়ার জন্যে ডাকে।

গত শতকের আটের দশকের শেষ দিকে ভারতীয়-ব্রিটিশ শিল্পীরা ভারতীয় এবং পশ্চিমি ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে তৈরি করেন এশিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড। গত শতকের নয়ের দশক থেকে কানাডীয় বংশোদ্ভূত সংগীতজ্ঞ নাদাকা, যিনি তাঁর জীবনের অনেকটা সময় ভারতে কাটিয়েছেন, পশ্চিমি ধারায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংমিশ্রণে শ্রুতিমধুর এক সংগীতের সৃষ্টি করেন। এরকমই একজন সংগীতশিল্পী যিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের ভক্তিগীতিকে পশ্চিমি অ-ভারতীয় সংগীতের মিলিয়েছিলেন, তিনি হলেন কৃষ্ণ দাস এবং তিনি তাঁর সংগীত, সাংগীতিক সাধনা করেছিলেন। আরেকটা উদাহরণ হল, ইন্দো-কানাডীয় সংগীতজ্ঞবন্দনা বিশ্বাস যিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *মোনোলগস* অ্যালবামে পশ্চিমি সংগীতের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

নতুন সহস্রাব্দে আমেরিকান হিপ-হপ ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং ভাঙড়া সংগীতকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছিল। মূলস্রোতের হিপ-হপ শিল্পীরা নমুনা হিসেবে বলিউড সিনেমা থেকে গানগুলো নিত এবং ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করত। উদাহরণ হিসেবে তিম্বালন্দ-এর 'ইন্ডিয়ান ফ্লুট', এরিক সারমন এবং রেডম্যান-এর 'রিঅ্যাক্ট', স্লাম ভিলেজ-এর 'ডিস্কো' টুথ হান্টস-এর জনপ্রিয় গান 'অ্যাডিক্টিভ', যেটা নমুনা হিসেবে নেওয়া হয় একটা লতা মঙ্গেশকর গান এবং দ্য ব্ল্যাক আইড পিজ নমুনা হিসেবে আশা ভোঁসলেজির গান 'ইয়ে মেরা দিল' তাদের জনপ্রিয় গানটা 'ডোন্ট ফুঙ্ক উইথ মাই হার্ট' নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ব্যান্ড কর্নারশপ আশা ভোঁসলেকে তাদে গান *ব্রিমফুল অফ আশা* দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল, যেটা আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয়

হয়েছিল। ব্রিটিশ-জাত ভারতীয় শিল্পী পাঞ্জাবি এমসি-এরও আমেরিকায় একটা জনপ্রিয় ভাঙড়া 'মুন্দিয়ান তো বচ কে' ছিল, যা তীব্রভাবে জয়-জেডবিশিষ্টতা দিয়েছিল। এশিয়ান ডাব ফাউন্ডেশন সেরকম প্রচুর মূলস্রোতের শিল্পী নয়, তবুও তাদের রাজনৈতিকভাবে সমর্থিত র যাপ এবং পুঙ্ক রক নিজেদের দেশ যুক্তরাজে বহু-গোষ্ঠীযুক্ত দর্শকশ্রোতাদের প্রভাবে আওয়াজ উঠেছিল। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক শিল্পী স্নুপ ডগ সিং ইজ কিং ছবিতে একটা গানে আবির্ভূত হয়েছিল। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে হিপ-হপ প্রস্তুতকর্তা মদলিব প্রকাশ করেছিলেন বিট কন্ডাক্টা খণ্ড ৩-৪ : বিট কন্ডাক্টা ইন ইন্ডিয়া; এই অ্যালবামটা প্রচণ্ডভাবে নমুনায়িত হয়েছিল এবং ভারতের সংগীত দ্বারা উৎসাহিত হয়েছি।

কখনো কখনো ভারতের সংগীত অন্যান্য দেশগুলোর সংগীতের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি 2 ডাবলিন, একটা কানাডা ভিত্তিক ব্যান্ড, ভারত এবং আইরিশ সংগীতের সংমিশ্রণ, এবং ভাঙড়াটন হল ভাঙড়া এবং রেগ্গাটন সংগীতের একটা সংমিশ্রণ, যেটা নিজেই হিপ-হপের একটা সংমিশ্রণ, রেগ্গা, এবং ঐতিহ্যপূর্ণ লাতিন আমেরিকান সংগীত।

সাম্প্রতিকতম উদাহরণের মধ্যে আছে ভারতীয়-বিটিশ সংমিশ্রণ, লরা মার্লিন এবং পাশাপাশি মামফোর্ড অ্যান্ড সন্স সহযোগপূর্ণভাবে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ধরোহার প্রোজেক্ট-এর সঙ্গে ফোর-সং ইপি-তে। বিটিশ ব্যান্ড বোম্বে বাইসাইকল ক্লাবও 'মন দোলে মেরা তন দোলে' গানটাকে তাদের একক 'ফীল' সংগীতের নমুনা হিসেবে নিয়েছিল।

ভারতীয় পপ সংগীত

ভারতীয় লোক সংগীত এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আধুনিক বিট নিয়ে ভারতীয় পপ সংগীতের ভিত্তি গড়া হয়েছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে নেপথ্য সংগীতশিল্পী আহমদ রুশদির গান 'কো কো কোরিনা' দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে পপ সংগীতের শুরুয়াত হয়েছিল, যেটা গত শতকের ছয়ের দশকে মহম্মদ রফি এবং সাতের দশকে কিশোর কুমার অনুসরণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, বেশির ভাগ ভারতীয় পপ সংগীত এসেছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প থেকে, বিগতশতকের নয়ের দশক পর্যন্ত অল্প কয়েকজন সংগীতশিল্পী, ঊষা উত্থুপ, শারন প্রভাকর এবং পীনাজ মাসানি প্রমুখ ভারতের বাইরে একে জনপ্রিয় করেছেন। তখন পর্যন্ত ভারতীয় পপ সংগীতশিল্পীরা হলেন : দালের মেহেন্দি, বাবা সাইগল, আলিশা চিনাই, কেকে, শান্তনু মুখার্জি, একে এ শান, সাগরিকা, কলোনিয়াল কাজিন্স (হরিহরণ, লেসলি লুইস), লাকি আলি, এবং শোনু নিগম, এবং সংগীতকাররা হলেন : জিলা খান অথবা জওহর ওয়াত্তাল, যিনি উচ্চ বিপননের অ্যালবাম প্রস্তুত করেছেন দালের মেহেন্দি, শুভা মুদগল, বাবা সাইগল, শ্বেতা শেট্টি এবং হংস রাজ হংস প্রমুখকে নিয়ে।

সাম্প্রতিককালে, ভারতীয় পপ 'রিমিক্সিং' অথবা পুনর্মিশ্রণের সঙ্গে একটা চমকদার মোড় নিয়েছে, যা নেওয়া হয়েছে অতীত চলচ্চিত্র সংগীত থেকে, যেখানে নতুন নতুন বিট লাগিয়ে ভারতীয় পপ সংগীতকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

রক এবং মেটাল সংগীত

রাগা রক

রাগা রক হল রক অথবা একটা ভীষণ ভারতীয় প্রভাবযুক্ত পপ সংগীত, হয় এটার গঠন, এর ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, অথবা এর যন্ত্রানুষঙ্গ, যেমন সেতার ও তবলা। রাগা এবং অন্যান্য ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধরন গত শতকের ছয়ের দশক ধরে অনেক রক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল : এর মধ্যে বিখ্যাত হল দ্য বীটলস। প্রথম খোঁজ পাওয়া 'রাগা রক' শুনতে পাওয়া যায়, যেমন দ্য কিঙ্কস দ্বারা 'সী মাই ফ্রেন্ডস' এবং দ্য ইয়ার্ডবার্ডস দ্বারা 'হার্ট ফুল অফ সোল', গিটারবাদক জেফ বেক দ্বারা সেতারের মতো ঝলকের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আগের মাস প্রকাশ করেছিল। বীটলসদের গান 'নরওয়েজিয়ান উড (দ্য বার্ড হ্যাজ ফ্লোন)', যেটা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যান্ডের প্রথম প্রকাশিত রাবার সোলঅ্যালবামে আবির্ভূত হয়েছিল, এটা ছিল প্রথম পশ্চিমি পপ গান যাতে প্রকৃতপক্ষে সেতার সহযোগ ছিল (প্রখ্যাত গিটারবাদক জর্জ হ্যারিসন প্রদর্শিত মার্চ ১৯৬৬, দ্য ব্যর্ডস কৃত একক 'এইট মাইলস হাই' এবং এর পাশে 'হোয়াই' সমেত প্রভাবান্বিত হয়ে একট উপধরনের সংগীত সৃষ্টি করেছিল। যদিও 'রাগা রক' শব্দটা উদ্ভাবিত হয়েছিল এভাবে-দ্য ব্যর্ডসের এই এককের প্রচারে সংবাদ প্রকাশের ছাপানো সমীক্ষা 'এইট মাইলস হাই' দ্য ভিলেজ ভইস-এর জন্যে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন সাংবাদিক সেলি কেম্পটন। জর্জ হ্যারিসনের ভারতীয় সংগীতে আগ্রহে বিগত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি যে গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলো হল : 'লাভ ইউ টু', 'টুমরো নেভার নোজ' (লেনন-ম্যাককার্টনিকে কৃতজ্ঞতা), 'উইদিন ইউ উইদাউট ইউ' এবং 'দ্য ইনার লাইট'। বিগত শতকের ছয়ের দশকের রক কার্যকলাপ ব্রিটিশ ও আমেরিকা উভয় দেশের গোষ্ঠীগুলো এবং ভারতীয় রকের অবস্থান সব মিলিয়ে এক সাম্প্রতিক ধারায় এল ভারতীয় রক।

ভারতীয় রক

ভারত রক সংগীত 'দৃশ্য' চলচ্চিত্র অথবা মিশ্র সাংগীতিকার 'দৃশ্যগুলো' কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের অবস্থানে গভীর ভক্তি অর্জন করে এর নিজের মতো আবির্ভূত হয়েছে। বিগত শতকের ছয়ের দশকে ভারতে রক সংগীত আসল রূপ পেয়েছিল, যখন দ্য বিটলস প্রমুখ আন্তর্জাতিক শিল্পীরা ভারত সফর করেন এবং এখানে তাঁরা তাঁদের সংগীত উপস্থাপন করেন। এই শিল্পীদের ভারতীয় সংগীতজ্ঞ, যেমন রবি শংকর এবং জাকির হুসেন প্রমুখের সঙ্গে সহযোগিতা রাগা রক সংগীতের উন্নয়নে ছাপ ফেলেছি। আন্তর্জাতিক সফ্টওয়্যার রেডিয়ো স্টেশন, যেমন ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি, এবং রেডিয়ো শ্রীলংকা জনগণের মধ্যে পশ্চিমি পপ, লোক সংগীত, এবং রক সংগীত স্প্রচারের ব্যাপারে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল।

ভারতীয় রক ব্যান্ডগুলো চেহারা পেতে আরম্ভ করে একমাত্র খানিকটা পরে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া দশকের শেষদিক নাগাদ।

এটা ছিল এই সময়কাল নাগাদ যে, রক ব্যান্ড ইন্দাস ক্রীড, আগে বলা হোত দ্য রক মেশিন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই ব্যান্ড রক-এন-রোল রেনেগাদের সঙ্গে নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছিল। অন্যান্য ব্যান্ড তাড়াতাড়ি এটা অনুসরণ করে। নতুনকে সাদরে গ্রহণ করায় ভারতীয় রক সংগীত দিনকে দিন আরও সমর্থন পেতে থাকে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে শুরু দশকের গোড়ায় এমটিভি আবির্ভাবের সঙ্গে, ভারতীয়রাও বিভিন্ন ধারার রক, যেমন গ্রুঞ্জে এবং

স্পিড মেটাল হাজির করতে থাকে। এই প্রভাব আজও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যান্ডের মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহরগুলো, প্রধানত কলকাতা, গুয়াহাটি, শিলং, দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরু হয়ে ওঠে রক এবং মেটাল সংগীত উন্মাদনার আঁতুড়ঘর! বেঙ্গালুরু হয়ে ওঠে ভারতে রক এবং মেটাল আন্দোলনের পীঠস্থান। অনেক স্বনামধন্য ব্যান্ডের মধ্যে আছে : দোরিয়ান প্লেটোনিক, নিকোটিন, ক্যানিবলস, ফিনিক্স, জাস্ট, ভুদু চাইল্ড, রুবেলা, ক্রিস্টাল অ্যান, মগুঁই, ইন্ডিয়ান ওসেন, ক্রিপ্টোস, পেন্টাগ্রাম, থার্মাল অ্যান্ড এ কোয়ার্টার, অ্যাবান্ডন্ড অ্যাগনি, নো আইডিয়া, জিরো, হাফ স্টেপ ডাউন, স্ক্রাইব, ইস্টার্ন ফেয়ার, ডেমোনিক রেসারেকশন, জিগনেমা, মাদারজানে, সোলমাতে, অ্যাভিয়াল এবং পরিক্রমা। ভবিষ্যৎ আরো উদ্যমপূর্ণ অবস্থাননকে ধন্যবাদ, যেমন গ্রিন ওজোন, ডগমা টোন রেকর্ডস, ইস্টার্ন ফেয়ার মিউডিক ফাউন্ডেশন, যারা ভারতীয় রককে সমর্থন এবং বিপণনে উৎসর্গিত। মধ্য ভারত থেকে নিকোটিন, একটা ইন্দোর-ভিত্তিক মেটাল ব্যান্ড, যাদের ওই অঞ্চলে অগ্রগামী মেটাল সংগীত স্রষ্টা হিসেবে বিস্তৃতভাবে সম্মান প্রাপ্য।

৫.৬.১৫.৫ : পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীত

ভারতে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃতি এবং অনুসরণ প্রায় নেই বললেই চলে। এটা প্রধানত জরথুস্ট্রবাদী সম্প্রদায় এবং অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী দ্বারা পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঐতিহাসিক প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। অন্য অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী হল চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরুর প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। পশ্চিমি সংগীত ভারতে খুবই মারাত্মকভাবে অবহেলিত ছিল এবং যৎসামান্য অস্তিত্ব বজায় ছিল। পশ্চিমি কিবোর্ড, ড্রাম এবং গিটার নির্দেশনা এক ব্যতিক্রম হিসেবে কিছুটা আগ্রহ দেখা যেত প্রধানত সমসাময়িক জনপ্রিয় ভারতীয় সংগীতের সেবায় সংগীতজ্ঞ তৈরির ক্ষেত্রে। ভারতে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের অস্পষ্টতা বিষয়ে অনেক কারণ উল্লেখ করা যায়, একটা দেশ তার নিজস্ব সাংগীতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ হওয়া তার অধিকার, যাই হোক, দুটো প্রধান কারণ হল, চূড়ান্ত প্রকাশে অনীহা এবং অসাড় অনাগ্রহ যাতে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী প্রধানত যুক্ত। এছাড়াও, পশ্চিমি সাংগীতিক বাদ্যযন্ত্রগুলো এদেশে আমদানি করার অসুবিধে এবং তাদের অসাধারণত্ব পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের দুর্বোধ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়।

এদেশে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রকট হওয়ার পর এক শতকের বেশি সময় পার হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রায় দু-শতক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনেও উচ্চাঙ্গ সংগীত কখনোই আনুষ্ঠানিক বা 'সাজানো' এর বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অতীতে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতকে জনপ্রিয় করার অনেক চেষ্টা ভারতে হয়েছে, কিন্তু সেগুলো আগ্রহ না-থাকা এবং উঁচুতে ধরে রাখার অবদানের অভাবে সফল হয়নি। বর্তমানে ভারতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীাত শিক্ষার হাল উন্নত হয়েছে। এধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে : কেএম মিউজিক কনজারভেটরি (অস্কার-বিজয়ী সংগীতকার এআর রহমান প্রতিষ্ঠিত), ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক, ব্যাঙ্গালোর স্কুল অফ মিউজিক, ইস্টার্ন ফেয়ার মিউজিক ফাউন্ডেশন, দিল্লি স্কুল অফ মিউজিক, উস্তাদগড় ফাউন্ডেশন, দিল্লি মিউজিক অ্যাকাডেমি, গিটারমঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতে উৎসর্গিত হয়ে প্রগতি অথবা উন্নতি এবং সমর্থনে অবদান রাখছে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত মেহলি মেহতা বোম্বে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা তৈরি করেন। দার্জিলিঙে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া দশকের গোড়ায় মিস্টার

জীবন প্রধান প্রতিষ্ঠা করেন 'মেলোডি অ্যাকাডেমি'; যিনি নিজে একক চেষ্টায় দার্জিলিং পাহাড়ে পশ্চিমি সংগীত এনেছিলেন, যেটা খুব উন্নত একটা সাংগীতক উত্তরাধিকাররূপে রয়ে গিয়েছে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দ্য বোম্বে চেম্বার অর্কেস্ট্রা (বিসিও) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বইতে এনসিপিএ অঞ্চলে স্থাপিত এবং আশ্রিয় হয় সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে এটাই ভারতের একমাত্র পেশাদার সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা এবং যারা প্রতি বছর দুটো কন্সার্ট ঋতু দর্শক-শ্রোতাদের উপহার দেয়, যেখানে বিশ্ববিখ্যাত সংগীত পরিচালক এবং একক সংগীতজ্ঞরা প্রদর্শন করে থাকেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়, পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতবেত্তা হলেন :

আন্দ্রে দে কোয়াদ্রস, পরিচালক এবং সংগীত শিক্ষক।

জুবিন মেহতা, পরিচালক।

মেহলি মেহতা, জুবিনের পিতা, বেহালাবাদক এবং বোম্বে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার পরিচালক।

অনিল শ্রীনিবাসন, পিয়ানোবাদক।

ইলাইয়ারাজা, প্রথম ভারতীয়, যিনি রয়াল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা দ্বারা লন্ডনের ওয়ালথামস্টও টাউন হলে প্রদর্শিত পুরো সিম্ফনি প্রস্তুত করেছিলেন।

নরেশ সোহেল, ব্রিটিশ ভারতীয়-জাত সংগীতকার।

পরম বীর, ব্রিটিশ ভারতীয়-জাত সংগীতকার।

করিশ্মেহ ফেলফেলি, ভারতীয়-জাত ইরানি পিয়ানোবাদক এবং বেতার সঞ্চালক।

দেশপ্রেম এবং সংগীত

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল। দেশব্যাপী ঐক্যের অভিন্ন সুরে সংগীতের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত জাতীয় জয়গাথা জনগণমনভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এটি এবং ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরম্ জাতীয় সংগীত হিসেবে মর্যাদা পায়। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর যে গানগুলো বৈশিষ্ট্য লাভ করে: অ্যয়ে মেরে ওয়াতন কে লোগো, মিলে সুর মেরা তুমহারা, তব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, এ আর রহমান কৃত মা তুঝে সালাম-এই গানগুলো দেশভক্তিকে মিলিত করা, জাতীয় সংহতি এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনে।

৫.৬.১৬.৫ : ভারতে নৃত্য

অনেক ধরনের নৃত্য নিয়ে গঠিত, যা সাধারণত ধ্রুপদী বা লোক নৃত্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি অন্যান্য দিকের মত, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে, যা স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী উন্নত হয়েছে এবং দেশের অন্যান্য অংশ থেকে উপাদান আত্মভূত করেছে।

সংগীত নাটক একাডেমী, নাট্যশালার জন্য ভারতের জাতীয় একাডেমী, ৮ প্রকারের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকে ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে অন্যান্য পণ্ডিত ও সুত্রসমূহ আরও নাচকে ধ্রুপদী নৃত্যতে অন্তর্ভুক্ত করে। এইসব নাচের উৎস সংস্কৃতি গ্রন্থ নাট্য শাস্ত্র, এবং হিন্দুধর্মের ধর্মীয় শিল্প কলায় পাওয়া যায়।

অনেক সংখ্যায় এবং শৈলীর লোকনৃত্য পাওয়া যায় নিজ নিজ রাজ্য, জাতিগত বা ভৌগলিক অঞ্চলের স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিবর্তিত। সমসাময়িক নাচের মধ্যে বিভিন্ন ধ্রুপদী, লোক ও পাশ্চাত্য ধরনের পরিমার্জিত ও পরীক্ষামূলক মিশ্রন অন্তর্ভুক্ত। ভারতের নাট্য ঐতিহ্য শুধু পুরো দক্ষিণ এশিয়ার নাট্য ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেনি, বরং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাট্য ঐতিহ্যকেও প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় সিনেমায় নাচ প্রায়ই তাদের মেজাজের বৈশিষ্ট্যর জন্য প্রসংশিত হয়, এবং ভারতীয় উপমহাদেশের জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে থাকে।

নামকরণ

ভারতীয় নৃত্য সাধারণত ধ্রুপদী এবং লোক নৃত্যের, পাশাপাশি মাঝেমধ্যে আধাধ্রুপদী ও উপজাতীয় নৃত্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

একটি ধ্রুপদী নাচ হচ্ছে সেই যার তত্ত্ব, প্রশিক্ষণ, অর্থ এবং ভাবপূর্ণ অনুশীলনের জন্য যুক্তি প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, যেমন নাট্য শাস্ত্র, নথিভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য ঐতিহাসিকভাবে একটি বিদ্যালয় বা গুরু-শিষ্য পরম্পরা (শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক) ঘিরে আবর্তিত হয় এবং থিয়েটার নৃত্যে মঞ্চস্থ করার জন্য নাচের সাথে তার অন্তর্নিহিত খেলা বা রচনা, গায়ক এবং অর্কেস্ট্রার ধারাবাহিকভাবে সুসংগত রাখার জন্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অধ্যয়ন, শারীরিক চর্চা এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

লোক নৃত্য হচ্ছে মূলত একটি মৌখিক প্রথা, যার ঐতিহ্য ঐতিহাসিকভাবে শিখানো হয়েছে এবং বেশীরভাগ সময় মুখে মুখে ও অনিয়মিত যৌথ অনুশীলনের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে গেছে। আধা ধ্রুপদী নাচ হচ্ছে সেই নাচ যার একটি শাস্ত্রীয় ছাপ রয়েছে কিন্তু একটি লোকনৃত্যে পরিণত হয়েছে এবং তার গ্রন্থ বা বিদ্যালয় হারিয়েছে। একটি উপজাতীয় নাচ হচ্ছে লোকনৃত্যের একটি স্থানীয় রূপ, সাধারণত যা একটি নির্দিষ্ট উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়; সাধারণত সময়ের সাথে উপজাতি নাচ লোকনৃত্যে পরিণত হয়।

ভারতে নৃত্যের উৎপত্তি

ভারতে নাচের উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন কালে। বেদে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে অনেক শিল্পকলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে যেমন নাটকে, যেখানে দেবতাদের প্রশংসা কেবল শুধু আবৃত্তি করা বা গাওয়া হয় না বরং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয় নাটকীয় উপস্থাপনায় সংলাপ আকারে বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের (আনুঃ ৮০০-৭০০ খ্রিস্টপূর্ব) সাংস্কৃতিক শ্লোক ১৩.২ টি দুই অভিনেতার মধ্যে একটি নাটক আকারে লেখা হয়েছে।

"বৈদিক উৎসর্গের অনুষ্ঠানকে (যজ্ঞ) এক ধরনের যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে এর অভিনেত, এর সংলাপ, এর অংশকে এর গর্ভাভিনয় ও চরম মুহূর্ত অনুসারে নির্ধারণ করা হয়।

—লুইস, রেনূউ, বৈদিক ভারত (Vedic India)

আদিতম নৃত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ হচ্ছে নটসূত্র, যার উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনির লেখায়, একজন ঋষি যিনি শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছিলেন এবং যার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালে মনে করা হয়। এইরকম শিল্পকলা সম্পর্কিত সূত্রের কথা অন্যান্য প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমনটি শৈলালিন এবং কৃষসভ (Krsasva) নামক দুইজন পণ্ডিতকে প্রাচীন নাটক, গান গাওয়া, নাচ ও এই শিল্প কলার সংস্কৃত রচনার ওপর গবেষণার অগ্রদূত হিসেবে কৃতিত্ব দেয়া হয়। রিচমন্ড এই অ্যালের অনুমান যে নটসূত্র ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচনা করা হয়েছিল যার পাণ্ডুলিপি আধুনিক যুগে এসে হারিয়ে গিয়েছে।

নৃত্য ও শিল্প কলার যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থটিকে টিকে থাকতে পেরেছে সেটি হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্র নাট্য শাস্ত্র, যার রচয়িতা হিসেবে ধরা হয় ঋষি ভরতকে। তিনি তার লেখায় বলেছেন এই কলা তার সময়ের আগে সৃষ্টি হয়েছে, যার স্বীকৃতি তিনি ব্রহ্মাকে দিয়েছেন যিনি ঋগ্বেদ থেকে শব্দ, সামবেদ থেকে সুর, যজুর্বেদ থেকে মূকাভিনয়, অথর্ববেদ থেকে আবেগ নিয়ে নাট্য বেদ সৃষ্টি করেছেন। নাট্য শাস্ত্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং ২০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে সংকলিত হয়, কিন্তু ধারণা করা হয় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং ৫০০ খ্রিষ্টাব্দর মধ্যে। নাট্য শাস্ত্রের বহুল চর্চিত সংস্করণ ৬০০০ শ্লোক যা ৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূল নাট্য শাস্ত্র বলে ধরা হয়।

ভারতের অনেক প্রকারের ধ্রুপদী নৃত্য আছে, যা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য, মহাকাব্য ও পুরাণ থেকেও ধ্রুপদী ও লোক নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে।

ধ্রুপদী নৃত্য

ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য একপ্রকারে নৃত্য-নাট্যের সৃষ্টি করেছে যা নিজে একটি পরিপূর্ণ থিয়েটার। নর্তকীরা শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গি দ্বারা একটি গল্প উপস্থাপন করে। ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যের অধিকাংশই হিন্দু পুরাণের গল্প উপস্থাপন করে। প্রতিটি নৃত্যই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের তত্ত্ব ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে।

ধ্রুপদী হিসেবে বিবেচিত হবার প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে নাট্য শাস্ত্রে উল্লেখিত নির্দেশিকা মেনে চলা, যা ভারতীয় অভিনয় শিল্প ব্যাখ্যা করে। সংগীত নাটক একাডেমী ৮ প্রকারের ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যকে ধ্রুপদী নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় : ভরতনাট্যম (তামিল নাড়ু), কত্থক (উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারত), কথাকলি (কেরল), কুচিপুড়ি (অন্ধ্র প্রদেশ), ওড়িশি (ওড়িশা), মণিপুরি (মণিপুর), মোহিনীঅট্টম (কেরল), এবং সত্রীয়া (আসাম)। ভারতের সকল ধ্রুপদী নৃত্যের মূলে হিন্দু ধর্মীয় আচার ও শিল্পকলা রয়েছে।

নৃত্যের ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং একটি নাচ সম্পন্ন হয়েছে বলে তখনই ধরা হবে যখন একটি নির্দিষ্ট ভাব (অঙ্গভঙ্গি বা মুখভঙ্গি) এর মাধ্যমে নর্তকী দর্শকদের মাঝে একটি রস (আবেগ) তৈরি করতে পারে। ধ্রুপদী নৃত্য লোকনৃত্য থেকে আলাদা করা হয় কারণ একটি নাট্য শাস্ত্রে নিয়মানুযায়ী পরিচালনা করা হয় এবং শুধুমাত্র এর অনুসারে সঞ্চালন করা হয়।

ভরতনাট্যম

১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পুরানো, ভরতনাট্যম দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য তামিলনাড়ুর একটি ধ্রুপদী নৃত্য, যা আধুনিক সময় প্রধানত নারীদের দ্বারা চর্চা করা হয়। এই নাচ সাধারণত শাস্ত্রীয় কর্ণাট সঙ্গীতের সাথে চর্চা করা হয়।

ভারতনাট্যম ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের এক প্রধান ধারা যা তামিল নাডু এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু মন্দির হতে উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, ভরতনাট্যম একটি একক নাচ যা কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা সঞ্চালন করা হয়, এবং হিন্দু ধর্মীয় বিষয় ও আধ্যাত্মিক ধারণা, বিশেষত শৈবধর্ম, কিন্তু বৈষ্ণব এবং শাক্তধর্মও, প্রকাশ করে।

ভরতনাট্যম এবং ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদী নাচ ব্রিটিশ রাজের ঔপনিবেশিক আমলে অবহেলিত এবং দমন করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগের পরে, এটা ভারতে এবং বিদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের শৈলীতে পরিণত হয়েছ, এবং অনেক ভারতীয় সংস্কৃতির নাচ এবং শিল্পকলার বৈচিত্র্য সম্পর্কে অজ্ঞ বিদেশিদের দ্বারা এটিই ভারতীয় নাচের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কথাকলি

কথাকলি (কথা মনে ''গল্প''; কালি মানে ''অভিনয়'') একটি অত্যন্ত শৈল্পিক ধ্রুপদী নৃত্য-নাট্য যা ১৭ শতকের মধ্যে কেবল থেকে উদ্ভব হয়েছে। এই ধ্রুপদী নাচের ধরন আরেক প্রকারের ''গল্প অভিনয়'' শিল্পের ধারা, এটিকে সাধারণত আলাদা করা হয় রঙিন-মেক আপ, পরিধানসমূহ এবং মুখের মুখোশ দ্বারা যা অভিনেতা-নর্তকীরা পরে থাকে, যারা ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ হয়ে থাকে।

হিন্দু কলা হিসেবে কথাকলির উৎপন্ন হয়েছিল, যাতে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কিংবদন্তি ও নাটক অভিনয় করা হত। যদিও এর উৎপত্তি আরো সাম্প্রতিক কালে হয়েছিল, এর উৎস সাধারনত মন্দির এবং লোকশিল্পে যেমন কুটিয়াত্তম এবং ধর্মীয় নাটক যার উৎস ১ম সহস্রাব্দে। একটি কথাকলি সঞ্চালনে প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় মার্শাল আর্ট এবং খেলাধুলার উপাদান সংযুক্ত থাকে। যদিও প্রাচীন মন্দির নাট্য ঐতিহ্য যেমন কৃষ্ণনাট্যম, কুটিয়াত্তম, এবং অন্যান্যের সাথে তাকে সংযুক্ত করা হয়, কথাকলি এদের থেকে আলাদা কারণ প্রাচীন কাল যেখানে অভিনেতা-নর্তকী-গায়ক একজন ব্যক্তি হয়ে থাকে সেখানে তাদের মত না করে, কথকলি এই ত্রয়ী ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে অভিনেতা নর্তকীকে নৃত্যপরিকল্পনা উপর মনোযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তার নাচের সঞ্চালনের ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে গায়ককে তার গায়কীর উপর মনোযোগের মাধ্যমে ভালো গান গাইতে সাহায্য করে।

কত্থক

কত্থক ঐতিহ্যগতভাবে সংযুক্ত করা হয় প্রাচীন উত্তর ভারতের ভ্রাম্যমান গায়ক-কবিদের সংগে যারা কথাকার বা গল্পকার নামে পরিচিত। কত্থক শব্দটি এসেছে বৈদিক সংস্কৃত শব্দ কথা থেকে যার অর্থ ''গল্প'', এবং সংস্কৃততে কথাকার শব্দটির অর্থ হচ্ছে ''যিনি গল্পে বলেন'' যা ''গল্পের সাথে কাজ করা''। ভক্তি আন্দোলনের সময় কত্থক প্রসূত হয়েছিল, বিশেষ করে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের শৈশব কালের প্রণয় কাহিনীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত

করার দ্বারা, পাশাপাশি স্বাধীনভাবে উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলোর রাজদরবারে। এটি ১৬ ও ১৭ শতকের মোঘল রাজদরবার দ্বারা প্রভাবিত রুচি ও ফার্সি কলাকে রুপান্তর, উপযোগী করে এবং অংশভুক্ত করেছিল, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে এর অবহেলা ও হ্রাস ঘটেছিল, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এর নবজন্ম ঘটে।

কত্থকের তিনটি স্বতন্ত্র রূপ খুঁজে পাওয়া যায়, নামকরণ করা হচ্ছে শহরগুলোর নামের সাথে মিল রেখে যেখানে কত্থক নাচের ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছিল—জয়পুর, বারাণসী ও লখনউ। শৈলীগতভাবে, কত্থক নাচ ছোট ঘন্টাধ্বনির (ঘুঙরু) সাথে নাচুনে পায়ের ছন্দময় নড়নের উপর জোর দেয়, সেই নড়ানোকে সংগীতের সাথে একতকান করানো হয়, পা এবং ধড় সাধারণত সোজা হয়, এবং গল্প এক উন্নত শব্দভাণ্ডারের মাধ্যমে যার ভিত্তি হচ্ছে বাহুর অঙ্গভঙ্গি ও শরীরের উপরের অংশের চালনা, মুখের অভিব্যক্তি, মঞ্চে অবস্থান পরিবর্তন, বাঁকের ও পালাবদন দ্বারা।

কুচিপুডি

কুচিপুচি ধ্রুপদী নাচের উৎপত্তি হয়েছে বর্তমান ভারতীয় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার একটি গ্রামে। এর শিকড় প্রোথিত আছে প্রাচীন যুগে এবং ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদী নৃত্যের মত এটি ভ্রাম্যমান গায়ক-কবি, মন্দির ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সম্পর্কিত ধর্মীয় কলা হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এর ইতিহাসে কুচিপুচি নর্তকীরা ছিল সব পুরুষ, সাধারণত ব্রাহ্মণ যারা উপযুক্তভাবে অনুযায়ী পোশাক পরে গল্পের নারী ও পুরুষের ভূমিকা পালন করত।

আধুনিক কুচিপুডি ঐতিহ্য বিশ্বাস করে যে তীর্থ নারায়ণ জাতী ও তাঁর শিষ্য সিদ্ধেন্দ্র যোগী নামক একজন ব্যক্তি ১৭ম শতকে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা ও নিয়মাবদ্ধ করেন। কুচিপুডি মূলত হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ ভিত্তিক একটি বৈষ্ণব ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল, এবং এটা সবচেয়ে জনপ্রিয়ভাবে তামিলনাড়ুতে পাওয়া যায় ভাগবত মেলা নামক শিল্পকলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কুচিপুডি সঞ্চালনে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ নাচ (নৃত্য), এবং সঞ্চালনের ভাবপূর্ণ অংশ (ব্যাখ্যামূলক নাচ ‘‘নৃত্য’’), যেখানে ছন্দময় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একটি চিহ্ন ভাষা দ্বারা মূকাভিনয় করা হয়। গায়ক এবং সঙ্গীতশিল্পীরা শিল্পীর সঙ্গে থাকে, এবং তাল ও রাগ কর্ণাট সঙ্গীতের নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক যুগে, কুচিপুডি নর্তকী নারী ও পুরুষ উভয়ই হয়।

ওড়িশি

ওড়িশি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় রাষ্ট্র উড়িষ্যার হিন্দু মন্দির হতে উৎপত্তি হয়েছে। ওড়িশি, তার ইতিহাসে, প্রধানত নারী দ্বারা সঞ্চালিত হত, এবং ধর্মীয় গল্প এবং আধ্যাত্মিক ধারণা বিশেষ করে বৈষ্ণব (জগন্নাথ যেমন বিষ্ণু) কিন্তু এর পাশাপাশি অন্যান্য যেমন হিন্দু দেবতা শিব ও সূর্য এবং হিন্দু দেবী (শাক্তধর্ম) সম্পর্কিত ঐতিহ্য প্রকাশ করতো। ওড়িশি ঐতিহ্যগতভাবে নাট্যকলার একটি নাচ-নাটক রীতি, যেখানে শিল্পী এবং সঙ্গীতশিল্পীরা একটি পৌরাণিক কাহিনী যেমন একটি আধ্যাত্মিক বার্তা বা হিন্দু গ্রন্থে থেকে ভক্তিমুলক কবিতা, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী প্রতীকী পরিচ্ছদ, অভিনয় (অভিব্যক্তি) এবং মুদ্রার (অঙ্গভঙ্গি এবং চিহ্ন ভাষা) মাধ্যমে অভিনয় করে বলতে থাকেন।

সত্রীয়া

সত্রীয়া একটি ধ্রুপদী নৃত্য-নাট্য নাট্যকলা যা আসামের কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক বৈষ্ণব আশ্রম থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং ভক্তি আন্দোলন এর পণ্ডিত এবং সন্ত শ্রীমন্ত শংকরদেব ১৫ শতকে এর প্রচলন করেন। সত্রীয়ার একটি একাঙ্ক নাট্য হচ্ছে *অংকীয়া নাট* যা চারণকাব্য, নাচ ও নাটকের মাধ্যমে নান্দনিকতার ও ধর্মের মিশ্রন বলা যেতে পারে। এই নাচ সাধারণত আশ্রম মন্দিরের (সত্র) কমিউনিটি হলে (নামঘর) নৃত্য করা হয়। এর প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে কৃষ্ণ ও রাধা কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতারসমূহ যেমন রাম ও সীতার কথাও বলা হয়।

মণিপুরি

মণিপুরি যা জাগই নামেও পরিচিত, মায়ানমারের (বার্মা) সীমান্তে ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্য মণিপুরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে আসামের সিলেট অঞ্চলে এ নাচের উৎপত্তি। এটা বিশেষ করে তার হিন্দ বৈষ্ণব বিষয়াবলী, এবং রাস যাত্রা নামক রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-অনুপ্রাণিত নৃত্যনাট্যের সঞ্চালনের জন্য পরিচিত। তবে এই নাচ এইছারাও শৈবধর্ম, শাক্তধর্মও অন্যান্য স্থানীয় দেবতা যেমন *লাই হারাউবার* সময় *উমাং লাই* এর বিষয়ের উপরও নাচা হয়। মণিপুরি নাচ হচ্ছে দলগত নাচ, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তার নিজস্ব অনন্য পরিধানসমূহ (একটি পিপা আকৃতির, সূচারুভাবে সজ্জিত স্কার্ট), এর নান্দনিকতা, নিয়মাবলী এবং নাট্যসংঘের কর্তৃক নিয়মিত নাচ মঞ্চস্থ করা। মণিপুরী নৃত্যনাট্য, বেশীরভাগ ভাগ সময়ে শোভাময়, চপল, সর্পিল হাত ও দেহের উপরের অংশের অঙ্গভঙ্গি সহ সঞ্চালনের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়।

মোহিনীঅট্টম

মোহিনীঅট্টম কেরল রাজ্য থেকে বিকশিত হয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে বিষ্ণুর সম্মোহিনী অবতার মোহিনী থেকে, যিনি হিন্দু পুরাণ মতে তার সম্মোহিনী শক্তি ব্যবহার করে ভালো এবং মন্দের মধ্যে যুদ্ধে দেবতাদের জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন। মোহিনীঅট্টম *নাট্য শাস্ত্রে* বর্ণিত লাস্য শৈলী অনুসরণ করে, একটি নাচ যা নাজুক, নমনীয় প্রচলন এবং মেয়েলী ভাবে নাচা হয়। এটা ঐতিহ্যগতভাবে একটি একক নাচ যা ব্যাপক প্রশিক্ষণের পরে নারীদের দ্বারা নাচা হয়। মোহিনীঅট্টম সাধারণত আবৃত্তি সহ সোপান (ধীর সুর) শৈলীর গানের সাথে বিশুদ্ধ এবং ভাবপূর্ণ নৃত্য-নাচ্য হিসেবে মঞ্চস্থ করা হয়। গীতিকাগুলি সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত মণিপ্রভালম-এর রচিত।

লোক এবং উপজাতী নৃত্য

ভারতের লোকনৃত্য ও নাটক গ্রামাঞ্চল সমূহে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এইগুলো গ্রাম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কাজের অভিব্যক্তি এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রকাশ করে।

মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্য বিভিন্ন প্রকারের দলনৃত্যের বর্ণনা করে যেমন *হাল্লিসাকা, রাসকা, দান্ড রাসকা এবং চরাচরি।* নাত্যশাস্ত্রে নাটক শুরু হবার পূর্বে মহিলাদের দলগত নাচও অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে অনেক লোকনৃত্য রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের তার নিজস্ব লোকনৃত্য আছে যেমন কর্ণাটকের *বেদারা ভেশা, দল্লুকুনিঠা নাচ, কেরলের থিরায়াত্তম এবং থাইয়াম নাচ, গুজরাটের গার্বা, গাগারী, গোধাখুন্ড এবং*

ডান্ডিয়া নাচ, রাজস্থানের কালবেলিয়া, ঘুম রং এবং রাসিয়া নাচ, জম্মু ও কাশ্মীরের নেইয়োপা, এবং বাচানুাগমা নাচ, পাঞ্জাবের ভাংরা ও গিদ্ধা নাচ, উত্তরাখণ্ডের ছুলিয়া নাচ, আসামের বিহু এবং বাগুরুম্বা নাচ, পশ্চিম উড়িষ্যার সাম্বালিপুরী নৃত্য এবং একইভাবে প্রতিটি রাজ্য এবং এর ছোট অঞ্চল সমূহের বিভিন্ন নাচ। লাভালি ও কলি নাচ মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাচের মধ্যে অন্যতম।

সমসাময়িক নাচ

ভারতে বর্তমানে সমসাময়িক নাচ হিসেবে ব্যাপক পরিধির নাচ মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য নৃত্যপরিকল্পনা, আধুনিক ভারতীয় ব্যালে এবং বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা বিদ্যমান ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

উদয় শংকর ও শাবানা জয়সিংহকে আধুনিক ভারতীয় ব্যালের নেতৃত্বস্থানীয় হিসেবে ধরা হয় কারণ তারা ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য ও গানের সাথে পশ্চিমা মঞ্চ কৌশলকে সংমিশ্রিত করেছেন। তাদের প্রযোজনার বিষয়বস্তু ছিল শিব-পার্বতী, লঙ্কা দহন, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ ও অন্যান্য।

চলচ্চিত্রে নৃত্য

চলচ্চিত্রে ভারতীয় নাচ শৈলীর উপস্থাপনা, বিশেষ করে হিন্দি সিনেমায়, বিশ্বব্যাপী ভারতীয় নৃত্যের পরিসীমাকে তুলে ধরেছে। সারা ভারতব্যাপী নাচ ও গানের দৃশ্য চলচ্চিত্রের একটি অবিচ্ছেদ অংশ। ১৯৩১ সালে আলম আরা চলচ্চিত্রের দ্বারা চলচিত্রে শব্দ প্রবর্তনের সঙ্গে, নৃত্য পরিকল্পনার সহিত নাচ ক্রমে হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্রে সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকের হিন্দি চলচ্চিত্রে নৃত্য প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য শৈলী হিসেবে যেমন কথক বা লোক নৃত্য অনুসারে পরিচালিত হত। আধুনিক ছায়াছবিতে প্রায়ই পশ্চিমী নৃত্য শৈলীর (এমটিভি বা ব্রডওয়ে থিয়েটারের মধ্যে) সঙ্গে এই পুরনো শৈলীর মিশ্রন ঘটানো হয়, যদিও একই চলচ্চিত্রে পশ্চিমা নৃত্যের সাথে পরিবর্তিত ধ্রুপদী নাচ পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাধারণ, নায়ক বা নায়িকারা একদল পার্শ্ব নর্তকীদের সাথে নেচে থাকেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে অনেক গান ও নাচ দৃশ্যের মধ্যে গানের কলির সাথে পোশাক বা জায়গায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। নায়ক ও নায়িকাদের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বা স্থাপত্যে দিয়ে তৈরি বিশাল মঞ্চে বা দৃশ্যে, যাকে ‘‘পিকচারাইজেশন’’ বলে, একটি পাস ডি ডিউক্স (একটি ফরাসি ব্যালে শব্দটি, যার অর্থ ‘‘দুই এর নাচ’’) গাওয়া ও নাচা খুবই জনপ্রিয় ব্যাপার। বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রায় একটি ‘‘আইটেম নম্বর’’ থাকে যেখানে একজন নায়িকা অতিথি চরিত্র হিসেবে একটি গানের দৃশ্য নৃত্যে অংশ নেন।

বেশীরভাগ সময় চলচ্চিত্রে, অভিনেতারা যে গানের উপর নেচে থাকেন তা তারা গান করেন না, কিন্তু অন্য শিল্পীরা পটভূমিতে গেয়ে থাকেন। একজন অভিনেতার গানটির গাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু বিরল নয়। বলিউডের নাচ ধীর নাচ থেকে শুরু করে দ্রুত হিপ হপ শৈলীর নাচ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। নাচটি সকল নাচের সংমিশ্রণ হতে পারে। এটা হতে পারে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য, ভারতীয় লোকনৃত্য, ব্যালী ড্যান্সিং, জ্যাজ, হিপ হপ এবং অন্য সব কিছু যা আপনি কল্পনা করতে পারেন।

নৃত্য শিক্ষা

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার পর, উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিকতা বা শুধুমাত্র ব্যায়াম এবং সুস্থতার একটি উপায় হিসেবে নৃত্য শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।

ভারতের প্রধান শহরগুলোতে এখন অনেক বিদ্যালয় আছে যারা নাচের যেমন ভরতনাট্যম নৃত্যের শিক্ষা দেয়, এবং এই শহরগুলো সারা বছর জুড়ে অনেক নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নৃত্য সমূহ যা শুধুমাত্র এক লিঙ্গের লোকের একচেটিয়া ছিল, এখন নারী ও পুরুষ উভয়ই অংশগ্রহণ করে। অ্যানি-ম্যারি গেস্টন এর মতে, ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের আধুনিক প্রশিক্ষণের অনেক উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একটি আধা ধর্মীয় ধরনের হয়ে থাকে।

ভৌগোলিক বিস্তার

ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য কিছু ঐতিহ্য পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে চর্চা করা হয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ, যারা ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অংশীদার। ভারতীয় পুরাণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর নাচ শৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, একটি উদাহরণ হচ্ছে জাভার নাচ যা রামায়ণ উপর ভিত্তি করে মঞ্চস্থ হয়।

৫.৬.১৬.৫.১ : ওড়িশি

ওড়িশি পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যের একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী। এটি ভারতের আটটি ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীরও অন্যতম। ভারতীয় নৃত্যের আদিগ্রস্থ নাট্যশাস্ত্র এই নৃত্যশৈলীটিকে ওড্র-মাগধী নামে অভিহিত করেছে। ভুবনেশ্বরের নিটকস্থ উদয়গিরি পর্বতে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে নির্মিত একটি খোদাইচিত্র থেকে এই নৃত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। অনুমিত হয়, ব্রিটিশ আমলে এই নৃত্যশৈলীটি কিছুটা অবদমিত হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতার পর আবার এক পুনরুজ্জীবন ঘটে। ওড়িশি নৃত্যে ত্রিভঙ্গি (মাথা, বুক ও শ্রোণীর স্বতন্ত্র সঞ্চালনা) এবং চৌকা (মৌলিক চতুষ্কৌণিক ভঙ্গিমা)—এই দুয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ ওড়িশিকে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী থেকে পৃথক করেছে।

ওড়িশি সংস্কৃতিতে তিনটি ঘরানার উপস্থিতি লক্ষিত হয় : মহারি, নর্তকী ও গোতিপুয়া। ওড়িশার মন্দিরগুলিতে দেবদাসীদের মহারি নামে অভিহিত করা হত। শব্দটির উৎস মহা ও নারী শব্দদ্বয়; দুয়ে মিলে মহারি বা নির্বাচিত কথাটি এসেছে। এই দেবদাসীরা মূলত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নর্তকী ছিলেন। প্রাচীন মহারিগণ মন্ত্র ও শ্লোকের ভিত্তিতে নৃত্য (বিশুদ্ধ নৃত্য) ও অভিনয় (কাব্যপাঠ) উপস্থাপনা করতেন। পরবর্তীকালে মহারিগণ জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যের গীতিকবিতাগুলির সঙ্গতে নৃত্য উপস্থাপনা শুরু করেন। ভিতরি গৌণী মহারি-র মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকেন। কিন্তু বাহার গৌণী মহারি-রা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেও গর্ভগৃহে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই।

গোতিপুয়া ঘরানার উদ্ভব হয় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই ঘরানার উদ্ভবের অন্যতম কারণ ছিল বৈষ্ণবধর্মে নারীর নৃত্য স্বীকৃত ছিল না। গোতিপুয়ারা ছিল ছোটো ছোটো ছেলে; যাদের মেয়ে সাজিয়ে দেবদাসীদের

দ্বারা নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হত। এই সময় বৈষ্ণব কবিরা ওড়িয়া ভাষায় অনেক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেন। গোতিপুয়ারা এই সকল পদের সঙ্গতে মন্দিরের বাহিরে প্রাঙ্গনে নৃত্য করত।

নর্তকী নৃত্যশৈলীটির উদ্ভব প্রাক-ব্রিটিশ যুগে। ওড়িশার রাজপ্রাসাদে এই নৃত্য উপস্থাপিত হত। এই সময় দেবদাসীপ্রথার অবমূল্যায়ণ ভীষণভাবে সমালোচিত হয়। এই কারণে মন্দির থেকে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ করা হয় এবং রাজসভাতেও এই প্রথা প্রচলিত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র গোতিপুয়া ঘরানার কিছু উদাহরণ টিকে যায়। এই নৃত্যর পুনরুজ্জীবনের সময় প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার ফলে বর্তমানে এই নৃত্যশৈলীতে শুদ্ধতাবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সনাতন ওড়িশি নৃত্য নিম্নলিখিত অঙ্গ ও শৈলীগুলির সমন্বয়ে গঠিত :

মঙ্গলাচরণ : একটি সম্ভাষক নৃত্যাঙ্গ। জগন্নাথ প্রণামের পর দেবদেবীর স্তবগানবাচক একটি শ্লোক গাওয়া হয়, যার অর্থ উপস্থাপনা করা হয় সমগ্র নৃত্যের মাধ্যমে। মঙ্গলাচরণে ভূমিপ্রণাম করা হয়, মাতা বসুমতীর কাছে তাঁকে পদদলিত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এছাড়া করা হয় ত্রিখণ্ডী প্রণাম বা তিন অঙ্গের প্রণাম। এই প্রণামে মস্তক দ্বারা ঈশ্বরকে, মুখাগ্র দ্বারা গুরুদের এবং বক্ষাগ্র দ্বারা দর্শকদের প্রণাম করা হয়।

বাট্টু নৃত্য : এটি ওড়িশির একটি বিশেষ নৃত্যশৈলী যা নটরাজ শিবের বটুকভৈরব রূপটিকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করা হয়।

পল্লবী : এটি একটি বিশুদ্ধ নৃত্যশৈলী যা কোনো একটি রাগকে চক্ষুসঞ্চালন, দেহভঙ্গিমা ও জটিল পদচালনা দ্বারা ফুটিয়ে তোলে।

অভিনয় : এই শৈলীটিতে কবিতার মাধ্যমে কোনো একটি কাহিনি দর্শকের সামনে উপস্থাপনা করা হয় এবং নৃত্যশিল্পী মুদ্রা বা হস্তভঙ্গিমা, মুখাভিব্যক্তি ও দেহচালনা দ্বারা সেই কাহিনিটির নৃত্যায়ন ঘটান।

দশাবতার : এটি একটি নৃত্যশৈলী যার মাধ্যমে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যের বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনাটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়।

মোক্ষ : এটিকে মুক্তির নৃত্য বলে অভিহিত করা হয়। এটি একটি বিশুদ্ধ নৃত্যশৈলী যা মাদল ও পাখোয়াজের সঙ্গতে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

৫.৬.১৬.৫.২ : কথক

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের আট ধরনের মধ্যে একটি। এই নৃত্যের রূপ প্রাচীন উত্তর ভারতের যাযাবর সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান চারটি ধারার বাকি তিনটি হচ্ছে ভরতনট্যম, কথাকলি, মণিপুরী। কথক শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ধারা। সব রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে কথক সবচাইতে জনপ্রিয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেবদেবীর মহাত্ম বর্ণনায় কয়েকটি সম্প্রদায় ছিলো যারা নৃত্য ও গীত দিয়ে দেবদেবীর মহাত্মাবলী পরিবেশন করতেন। এসব সম্প্রদায়গুলো কথক, গ্রন্থিক, পাঠক ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকটির মধ্যে কথক একটি বিশেষ স্থান আজও অধিকার করে রয়েছে। কথক নৃত্যে প্রধানত রাধা কৃষ্ণের লীলা

কাহিনীই রূপায়িত হত। দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় উৎসব ও মন্দির কেন্দ্রিক পরিবেশনা হওয়ায় কত্থক নৃত্যের কোনো সুসংহত রূপ গড়ে ওঠেনি। মোঘল আমলে দরবারী সংগীত ও নৃত্যের যুগ সূচিত হলে কত্থক নৃত্যের একটি সুসংহত রুপ গড়ে ওঠে। কথক নৃত্যের সবচেয়ে বেশী বিকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোখনৌ এর আসাফুদ্দৌলা ও ওয়াজীদ আলী শাহ এর দরবারকে কেন্দ্র করে। কথকের দ্বিতীয় ধারার বিকাশ ঘটে জয়পুর রাজ দরবারে। পরবর্তীতে বারাণসীতেও কথক নৃত্যের বিস্তার ঘটে। নৃত্যই কথকের প্রাণ তবে সহযোগী সঙ্গীত এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। কথক নৃত্যে মোট বারোটি পর্যায়। তবলা বা পাখোয়াজের লহরায় তাল নির্ভর নৃত্য পদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বারোটি পর্যায়ে রয়েছে গণেশ বন্দনা, আমদ, থাট, নটবরী, পরমেলু, পরণ, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া ও টুকরা, সংগীত ও প্রাধান। প্রান্তিক পর্যায়ে থাকে গনেশ বন্দনা ও আমদ। নটবরী অংশে তাল সহযোগে নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরমেলু অংশে বাদ্যধ্বনীর সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরণ অংশে বাদক বোল উচ্চারণ করে ও নৃত্যশিল্পী পায়ের তালে তার জবাব দেয়। এরপর তবলা বা পাখোয়াজের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। ক্রমানবয়ে বিলম্বিত ও পরে দ্রুত তালের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। করতালি দিয়ে তাল নির্দেশ করাকে বলে প্রাধান। কতক নৃত্যের প্রধান পোশাক লম্বা গোড়ালী পর্যন্ত পেশোয়াজ নামক এক ধরণের সিল্কের জামা ও চুড়িদার পাজামা। উজ্জল প্রসাধন ও অলংকার ব্যবহৃত হয়।

৫.৬.১৬.৫.৩ : মণিপুরি নৃত্য

নৃত্যশৈলীর একটি প্রাচীন ধারা। মণিপুরের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই নৃত্যকে মণিপুরের সুপ্রাচীন নৃত্যধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি মূলত একটি নৃত্য-উৎসব হিসেবে মণিপুরে পালিত হয়।

মণিপুরি লাই শব্দের অর্থ হলো—দেবতা, হারাউবা, শব্দের অর্থ হলো—আনন্দ-নৃত্য। মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রাধান্যলাভের আগে, শৈবমতের ব্যাপক প্রভাব ছিল। দেবতা শিবের প্রতীক হিসেবে ‘লাই’ ছিল শিবলিঙ্গের প্রতীক। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মণিপুর শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সহাবস্থানে একটি শান্তির জনপদে পরিণত হয়েছিল।

১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পামহৈবা মণিপুরের রাজত্ব লাভের পর বৈষ্ণবদের আধিপত্য প্রবলতর হয়ে মণিপুরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কারণ, রামানন্দীর ভাবদর্শের বিশ্বাসী বৈষ্ণব সাধক শান্তি দাস অধিকারীর অনুপ্রেরমায় রাজ পামহৈবা বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তাঁর মতকে একরকম জোর করেই মণিপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই অঞ্চলে শৈবমতাদর্শের লোকের এরকম কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই সময় রাজা পামহৈবা অন্যান্য মতের গ্রন্থাদি ও নিদর্শন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মণিপুরের ইতিহাসও ধ্বংস হয়ে যায়।

মণিপুরের বৈষ্ণবরাও দেবতা হিসাবে শিবকে শ্রদ্ধা এবং পূজা করতো। ফলে প্রবল বৈষ্ণব আধিপত্যের যুগেও শিব-পার্বতীর লীলা ভিত্তিক গীত ও নৃত্য বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ফলে ‘লাইহারাউবা’-নৃত্য মর্যাদা হারাতে হারাতে প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায়। রাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহাসনে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসার পর তিনি এই নাচকে আবার প্রচলন করেন।

বর্তমানে লাইহারাউবা নৃত্য দুই ভাবধারায় পরিবেশিত হয়। এই ভাবধারা দুটি হলো মৈরাঙ লাইহারাউবা ও উমঙ লাইহারাউবা। এই দুটি ধারাতেই পরিবেশিত হয় নানা ধরনের কাহিনি নির্ভর নৃত্যগীত। এর ভিতরে

খাম্বাথৈবী, নঙ্পক্নিঙ্থুপানথেবী, থনজিঙ লাইরেম্বী উল্লেখযোগ্য। এই নাচে তাণ্ডব ও লাস্য উভয় ধারাই ব্যবহৃত হয়। এই নৃত্য শৈব নৃত্যধারার হলেও, এতে পরবর্তী সময়ে রাসনৃত্যের ভঙ্গীপারেঙ-এর প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে।

এই নৃত্যধারার সাথে জড়িত আছে, মণিপুরের সনাতন ধর্মে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব। মণিপুরের লোক পুরাণ মতে-নয়জন লাইবুঙথ (দেবতা) এবং সাতজন লাইনুরা (দেবী) পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, আর সেই জলের উপর সাতজন লাইনুরা নৃত্য করছিলেন। এই দৃশ্য দেখে নয়জন লাইবুঙথ স্বর্গ থেকে লাইনুরাদের লক্ষ্য করে মাটি নিক্ষেপ করতে থাকেন। নৃত্যরতা সাতজন লাইনুরা সেই ছুঁড়ে দেওয়া মাটির উপর নেচে নেচে পৃথিবীর স্থলভাগ তৈরি করেন। এই ভাবনা থেকে লাইহারাউবা নৃত্যের সূচনা হয় 'লাইএকাউবা'। এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন কিছু দেবদাস এবং দেবদাসী। উল্লেখ্য, মণিপুরে দেবতাদের সেবায় যে পুরুষরা সারাজীবন নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাদের বলা হয় মৈবা (দেবদাস)। একইভাবে যে নারীরা দেবতাদের সেবায় সারাজীবন নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাদের বলা হয় মৈবী (দেবদাসী)।

৫.৬.১৬.৫.৪ : উপসংহার

এই ভাবে দেখা যায় ভারতে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত ও নৃত্য ভারতের সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রতিটি সঙ্গীত ও নৃত্যের নির্দিষ্ট ইতিহাস ও রূপরেখা আছে। এগুলি সাংস্কৃতিক চর্চার উল্লেখযোগ্য মাধ্যমে।

৫.৬.১৬.৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ML Varadpande (1990), History of Indian Theatre, Volume 1.

(২) William Alves (২০১৩)। *Music oif the Peoples of the World*। Cengage Learning

(৩) McFee, Graham (১৯৯৪)। *The concept of dance education*

(৪) Sunil Kothari : Avinash Pasricha (১৯৯০)। *Odissi, Indian classical dance art*

(৫) Gupta, Shobhna (২০০৫)। *Dances of India*

৫.৬.১৬.৫.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) বিভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা কর।

(২) ওডিশি নৃত্য সম্পর্কে কি জান।

(৩) ভারতীয় নৃত্য কিভাবে একটি উচ্চমানের সংস্কৃতি চর্চা গড়ে তুলেছিল?

(৪) যেকোন তিনটি ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে লেখ।

তথ্যসূত্র ঃ Wikipedia

ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ **–8**

Life and Thought of Bengal in the 19th century

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

COR-208

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

বর্তমান গ্রন্থটি গঠনে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,

শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২২ ।
- গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ লেখকদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-208: Life and Thought of Bengal in the 19th century- (Credit-4)

BLOCK 1 : Life and Society in 19th century Bengal

Unit-1: Indigenous set up- nature of changes in the 19th century.

Unit-2: Debate on Bengal Renaissance.

BLOCK 2: Foreign agencies in action

Unit-3: Social and cultural reactions in the indigenous society..

Unit-4: Christian Missionaries and their activities in Bengal.

BLOCK 3: Role of intelligentsia in 19th century Bengal

Unit-5: Political, economic and cultural rationalism-Ideological debates.

Unit-6: Orthodox reactions.

Unit-7: Young Bengal movement.

Unit-8: Revival of Hinduism.

BLOCK 4: Development of Literature

Unit-9: Development of Literature.

Unit-10: Painting in 19th century Bengal.

Unit-11: Performing art in 19th century Bengal.

BLOCK 5: Spread of Western education in Bengal

Unit-12: Initiative of the colonial government.

Unit-13: Private philanthropic enterprises.

Unit-14: Introduction of Western Science.

BLOCK 6: Women in 19th century Bengal

Unit-15: Status and condition of Women.

Unit-16: Development of Women.

ACKNOWLEDGEMENT

BLOCK 1 : Life and Society in 19th century Bengal Unit-1: Indigenous set up- nature of changes in the 19th century. Unit-2: Debate on Bengal Renaissance.	**Dr.Susmita Mondal Biswas** **Kanchrapara College**	
BLOCK 2: Foreign agencies in action Unit-3: Social and cultural reactions in the indigenous society.. Unit-4: Christian Missionaries and their activities in Bengal.	**Dr.Sukanta Pramanik** **Kalyani Mahavidyalaya**	
BLOCK 3: Role of intelligentsia in 19th century Bengal Unit-5: Political, economic and cultural rationalism-Ideological debates. Unit-6: Orthodox reactions. Unit-7: Young Bengal movement. Unit-8: Revival of Hinduism.	**Dr.Debraj Chakraborty** **Berhampur Girls College**	
BLOCK 4: Development of Literature Unit-9: Development of Literature. Unit-10: Painting in 19th century Bengal. Unit-11: Performing art in 19th century Bengal.	**Dr.Nilakshi Bagchi** **Jalangi Mahavidyalaya**	
BLOCK 5: Spread of Western education in Bengal Unit-12: Initiative of the colonial government. Unit-13: Private philanthropic enterprises. Unit-14: Introduction of Western Science.	**Papia Biswas** **Murshidabaad Adarsha Mahavidyalaya**	
BLOCK 6: Women in 19th century Bengal Unit-15: Status and condition of Women. Unit-16: Development of Women.	**Kaberi Indra** **Krishnanagar Women's College**	

Life and Society in Eighteenth Century Bengal

Unit 1: Indigenous Set up – Nature of changes in the Nineteenth Century

Unit 2: Debate on Bengal Renaissance

অষ্টাদশ শতকে বাংলার সমাজ ও তার পরিবর্তন

ভূমিকাঃ

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক 'যুগিসন্ধি'র যুগ।পরিবর্তনের একাধিক ধারা এসময় একই সাথে বহমান থেকেছে, শাসক ও শাসিত যুগপতের মধ্যেই। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব আর এই দুইয়ের মুধ্যবর্তী পর্বে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে স্বাধীন নবাবী বাংলার প্রাধান্য -এই বিপুল পটপরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই গোটা শতকটিকেই নানাভাবে আন্দোলিত করেছে। যে জমিদার, মহাজন বা ব্যবসায়ী জাতীয় ধনী মধ্যস্তরীয় বর্গকে মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোয় "ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানোর প্রধান শক্তি" হিসাবে গণ্য করা হয়, ফিলিপ কালকিনস তদেরকেই বাংলার নবাবীর অন্যতম প্রধান সহযোগী শক্তি হিসাবে দেখিয়েছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই বর্গই নবাবী শাসনে নিজেদের বিপদ ঘনিয়ে আসার সম্ভবনা লক্ষ্য করে এবং ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে যোগসাযোশ ঘটায়। কোম্পানি সেই সুযোগে বাংলায় নিজেদের জায়গা করে নেয়- কোম্পানির ক্ষমতারোহন সম্পর্কে পি জে মার্শাল সহ অনেকেই এই মতকে অন্যতম বলেছেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও এপ্রসঙ্গে মনে করেন, উত্তরোত্তর দাবী আদায়ের মাধ্যমে নবাবীকে(দেশীয় রাজ্যগুলিকে) ইংরেজরাই ক্রমশ দুর্বল করে দিয়ে এসুযোগ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল। যাইহোক, আঠেরো শতকের চরিত্র সম্পর্কে যে স্থবিরতার কথা একদিক থেকে বলা হয়, বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থিনৈতিক ক্ষেত্রের চিত্র কার্যক্ষেত্রে তার চেয়ে যথেষ্টই স্বতন্ত্র ছিল। এবং সার্বিক ভাবেই সামাজের ওপর এই রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্রিয়াশীলতা ছিল আরো বেশি গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

শাসকশ্রেণির মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রকৃতিঃ

অষ্টাদশ শতকের সমাজ বহমান ছিল একাধিক প্রবণতা, বিভিন্ন ধরনের আদর্শ ও মূল্যবোধের সমন্নয় ও সংঘাতের ধারার মধ্যদিয়ে। শাসক এবং শাসিত উভয় পক্ষের মধ্যেহে একধরনের অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক টানাপোড়েন ছিল এসময়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অধীকৃত ভারতবর্ষের জন্য যে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শ' অনুসৃত হয়েছিল, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও সেখানে আদর্শগত টানাপোড়েনের জের ছিল। প্রশাসক বর্গের অভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই সক্রিয় থেকেছে বিশেষ ভাবাদর্শের প্রভাব। কোম্পানি-শাসনের প্রথমদিকে অনুসৃত 'কম-হস্তক্ষেপ' নীতি যেমন প্রভাবিত ছিল অনেকাংশেই 'প্রাচ্যবাদের' দ্বারা। ভারতের গৌরবময় অতীতকে মান্যতা দিয়ে সেই ধ্রুপদী ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদেরা। মূলত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রচর্চাকেই এঁরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বহু ঔপনিবেশিক ইংরেজ আধিকারিক, ভারতীয় শাস্ত্রবিশারদ এবং দেশজ উদ্যোগের মননশীল চর্চা প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এই আগ্রহের পরিণামেই স্থাপিত হয় কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রিঃ)এবং এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রিঃ), বাংলার বাইরে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯৪ খ্রিঃ)। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। যেখানে ব্রিটিশ শাসনকেই প্রচলিত ভারতীয় রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠার ভাবনা গুরুত্ব পায়।-এক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন ছিল তেমনি আবার এইভাবে ভারতীয়দের সাথে ঔপনিবেশিক শাসনের আত্মিক

যোগ স্থাপনের মাধ্যমে নীতিগত দিক দিয়ে তাকে বৈধতা দেবার প্রচেষ্টা হিসাবেও বিষয়টি ইতিহাস আলোচনায় এসেছে। সেই সঙ্গে দেশজ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ঝামেলা এড়াবার বাস্তবিক প্রয়োজনের খাতিরেও কোম্পানি বাংলার প্রশাসনে কম হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করে গোড়ার দিকে।

কর্নওয়ালিস ও ওয়েলেসলির আমল থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'ইংরেজিকরণে'র ঝোঁক বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে মতাদর্শের দিক থেকে খ্রিস্টিয় ইভানজেলিকাল এবং ইউটেলিটেরিয়ান ভাবধারা অনেকাংশেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। একধরণের কর্তৃত্ব পরায়ণ হিতচিন্তা নিহিত ছিল এইসব মতাদর্শগত ভাবধারায়। ইভানজেলিকাল ভাববাদীরা ভারতীয়দের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।ব্রিটেনে এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন চার্লস গ্রান্ট। তাঁর মতে খ্রিষ্টান ধর্মের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমেই ভারতীয়দের এই ধর্মচিন্তা জনিত অজ্ঞতাকে দূর করা সম্ভব। আর তারজন্য দরকার এদেশে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ীকরণের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন। কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থানরত মিশনারিদের প্রচারও ছিল এই মতের স্বপক্ষে। সর্বোতভাবে এঁরা কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, এতে ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা নেই। অবাধ বানিজ্যে বিশ্বাসী বনিকগোষ্ঠীও বানিজ্যিক স্বার্থে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, কোম্পানি যদি এদেশে প্রশাসকের ভূমিকা নেয় তাহলে ভারত হয়ে উঠবে ব্রিটিশ পণ্য চলাচলের এক বিরাট বাজার এবং ফলস্বরূপ সুফল ভোগ করবে কৃষকেরা। ব্রিটিশ উদার নীতির বাতাবরণ দ্বারা সম্পৃক্ত হওয়া ইউটেলিটেরিয়ান তত্বও ছিল প্রশাসনিক পরিবর্তনের পক্ষে।এই তত্বে অত্যন্ত প্রভাবশালী অবদান ছিল জেরেমি বেন্থামের। উন্নয়নের পূর্বশর্তই হল আইনের অনুশাসন; যথোচিত আইন, দক্ষ ও জ্ঞানদীপ্ত শাসনই উন্নয়নমুখী পরিবর্তন ঘটাবার সর্বাধিক কার্যকর উপায়,- বেন্থামের এই বক্তব্যের অনুসরণে ইউটেলিটেরিয়ান তাত্বিক নেতা জেম্‌স মিল বলেন, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য প্রয়োজন এক শিক্ষক সুলভ সরকারের যা সাধারণের উন্নয়নকল্পে যথোচিত আইন প্রণয়নে হবে বিচক্ষণ। স্বভাবতই সমকালের এই ভাবধারা এবং সেই সঙ্গে বানিজ্যিক স্বার্থচিন্তা-এসবের সামগ্রিক ক্রিয়াশীলতায় ভারতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপে দোটানার জের চলে। মানসিকতায় পরিবর্তন অনেকটাই স্পষ্ট হতে থাকে ইংরেজদের বণিকের আসন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে শাসকের আসনে পোক্ত হবার সাথে সাথে। স্বজাতীয় বিশেষত্ব এবং কর্তৃত্বপূর্ণ মানসিকতাই প্রতিষ্ঠা পায় এই পর্বে। 'নাটিভ'দের সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবনতা আরও জমাট বাঁধে। এমনকি এক্ষেত্রে কলকাতার বাঙালি 'নব্য অভিজাত' শ্রেণিকেও এবিষয়ে রেয়াত দেওয়া হয় নি। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে যে বেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা পায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও তার সদস্য পদ দেওয়া হয় নি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নাতি প্রসন্নকুমার ঠাকুরকেও না। মহাবিদ্রোহের পর থেকে মানসিক এই বিভেদ ক্রমপ্রসারমান হয়।

সামাজিক প্রভাবঃ

ভারতীয় সমাজেও ঔপনিবেশিক শাসনের এই প্রভাব একমাত্রিক ছিল না। প্রায় একশ বছর ধরে এদেশে কোম্পানির সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। বাংলা থেকেই যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কাজেই তার উপজাত হিসাবে ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। উনিশ শতকের বাংলায় সামাজ-পরিবর্তনের যে ধারা লক্ষ্য করা যায় তার প্রকৃতি বুঝতে হলে এই সামগ্রিক উপাদান গুলির ক্রিয়াশীলতা নিরীক্ষণ করা জরুরি।

কেন্দ্রীয়বৃত্তে পরিবির্তনের প্রকৃতিঃ

বাংলার মানুষের একাংশ অবশ্যই সংস্কার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছিলেন। পরিনতির দিকে খেয়াল রাখলে একথা সহজেই বোঝা যায়। এই একাংশ ছিল মূলত ইংরাজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে উঠে আসা। আঠেরো শতক থেকেই ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার চল ছিল। কোম্পানি নানাভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে সাহায্য করতো। ১৮১৩-র সনদ আইনের মাধ্যমে দেশীয় সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও

উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতিসাধনের কথা বলা হলেও মেকলে মিনিটের(১৮৩৫ খ্রিঃ) সুপারিশ অনুসারে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপিয় সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি সরকারি ভাবে গৃহীত হয়। কর্তৃত্ব সুলভ উদার মানসিকতার সাথে সাথে এই শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে সব্যসাচী ভট্টাচার্য, গৌরী বিশ্বনাথন অনেকেই ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতি উদ্দেশ্যগত ঝোঁক রয়েছে বলেও অভিযোগ এনেছেন। কে.এন. পানিক্কর মনে করেন, এর ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরণের মতাদর্শগত একাত্মতা; যার হাওয়ায় পাল খাটিয়ে এদেশীয় সমাজে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়। শাসকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এসব অভিযোগের যাথার্থতা অস্বীকার করা কঠিন। তবে একইসাথে দেশজ সমাজে তার প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা দরকার। পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভের ফলেই বাঙালির মনজগতে পরিবর্তন ঘটেছে। উপলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করেই তারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজবলি'তে যে ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায় সেখানে লেখক সিরাজ ও কোম্পানির বিবাদে সিরাজের প্রতি ঘৃণা এবং কোম্পানির প্রতিষ্ঠা লাভে আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এন্ট্রাস পরীক্ষার পাঠ্যসূচি অনুসারে বাংলায় যে ইতিহাস বই প্রকাশ করা হয়, সেখানে মার্শম্যানের ইতিহাস বইয়ের অনুবাদের একাংশ করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। এই অনুবাদ বইয়ের শেষ অংশে লেখক ইংরেজদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে সিরাজের বিরুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাকেই ইংরেজ সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মত দেন। ১৮৭২ এ প্রকাশিত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস' বইয়ে নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে অপরাধীর কাঠগরায় দাঁড় করানো হয়েছে।

উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের পিছনে ক্রিয়াশীল উপাদান প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্বও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সোসাইটি ফর ট্রান্সলেটিং ইউরোপিয়ান সায়েন্সেস গঠিত হয়। এর কাজ ছিল ইউরোপিয় বিজ্ঞানের বইগুলিকে এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা। এই ধরণের পদক্ষেপের ফলে জাতীর উন্নয়ন কল্পে বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ ঘটে। ১৮৭৬ এ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। স্বল্প সময়েই এই উদ্যোগ বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বেনারস ডিবেটিং ক্লাব, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমেদ খান প্রতিষ্ঠিত আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিহার সায়িন্টিফিক সোসাইটি। এইসব সংস্থাগুলি আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের শক্তির বিষয়টিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসে। বিজ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সাহিত্য ও ধর্মীয় ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। জ্ঞান প্রকাশ তাই যেমন মনে করেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান' চর্চাই হয়ে উঠেছিল নির্ভরযোগ্য 'সংস্কারের ভাষা'।

যুক্তি, উপযোগিতা, অগ্রগতি এবং ন্যায়বিচার ইত্যাদি পাশ্চাত্য ধারণাসমৃদ্ধ মতাদর্শের আলোকে সংস্কারকেরা নিজেদের সমাজকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই নতুন চিন্তাভাবনাই উনিশ শতকের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যদিয়ে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিল।এর একদিকে ছিল ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের জাগরণ। এই প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু ধর্মকে ঘিরে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ এই ভাবধারাতে বিশেষ অবদান রাখেন।শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণবিহারী সেন ও তাঁদের অনুগামীরা যে পুনরুত্থানবাদ প্রচার করেন, তা আবার পাশ্চাত্যের তুলনায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। স্বামী বিবেকানন্দর প্রচার ভারতবাসীকে নিজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মহত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের উচ্চমান স্মরণের মাধ্যমে জাতির হীনমন্যতা কাটিয়ে দেবার উদ্যোগ দেখা যায় এঁদের মধ্যে। আবার রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সমর্থকদের মত অনেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও মনে করতেন পশ্চিমী ধাঁচে তার সংস্কার প্রয়োজন। ডিরোজিয়ান পন্থী বাঙালি যুবকেরা সেক্ষেত্রে ছিলেন উগ্র সংস্কারের পক্ষে। আসলে ঔপনিবেশিক মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতিগত উপেক্ষা প্রচলিত সমস্ত সামাজিক লোকাচার এবং ধর্মীয় ধ্যানধারণাকেই অধঃপতিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ বলে মনে হয়েছে

অনেকের কাছেই এবং সেকারণে ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে নিজেদের সত্তাকে চিহ্নিত করার উপায় স্বরূপ সংস্কার প্রচেষ্টা এসেছে মূলগত ভাবেই। তবে এই প্রচেষ্টা কোন একমাত্রিক ধারা ছিল না; বরং সুশোভন সরকার যেমন যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিরোধী স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত।-যেমন, বিদেশি সংস্কৃতির দৌলতে পাওয়া কু অভ্যাসের জালে আটকে গিয়েছিলেন মধুসূদন আর ভারতীয় জীবনধারাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর, যদিও মনগতদিক থেকে উভয়েই ছিলেন আধুনিকপন্থী। আবার রামমোহনের মতো সংস্কারকেরা অনেকেই সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার সংস্কার সাধন প্রসঙ্গে যুক্তিবাদের পরিবর্তে শাস্ত্রীয় বিধানের আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। সংস্কারকদের এই অন্তর্নিহিত দ্বৈততারও একাধিক পরত ছিল। কখনো ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর সহায়তা ও সমর্থনলাভের আশায় মতাদর্শগত অবস্থনে দোলাচল বজায় থেকেছে। রামমোহন রায় সম্পর্কে যা প্রায়শই বলা হয়ে থকে। অবার ঐতিহ্যের প্রতি একাত্মতাবোধ থেকেও প্রায়শই আধুনিকতাকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তার ফলেও পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রতি এক ধরণের দোদুল্যমান মানসিকতার জন্ম হয়েছে। এই টানাপোড়েনের মধ্য থেকেই উনিশ শতকের শেষ দিকে ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে ঐতিহ্যপন্থী হিন্দু সত্তার আরও বেশি আগ্রাসী ধারা।

বৃহত্তর সমাজে পরিবর্তনঃ

উনিশ শতকের সামাজিক পরিবর্তনের এই গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রাথমিক ভাবে তা সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যারা প্রায়শই ঔপনিবেশিক শাসনের দৌলতে কিছু আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল। বাংলায় নবাবি আমল থেকেই যে ‘নব্য অভিজাত’ বর্গের গতিশীলতার কথা বলা হয়েছে, ইংরেজ ঘনিষ্ঠতার কারণে তারাই ছিল মূলত এর শরিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছত্রছায়ায় এরা ছোট জমিদার হিসাবে নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে সংহত করেছিল। এবং পরবর্তীকালে নানা রকম নতুন পেশায় এবং অধস্তন প্রশাসনিক পদে প্রবেশ করার উদ্দ্যেশ্যে ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। সামাজিক দিক দিয়ে তারা অধিকাংশই ছিল হিন্দু ও উচ্চবর্ণ জাত। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন কলকাতা ছেড়ে বিভিন্ন জেলা শহরে এমনকি বিভিন্ন অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, তাসত্ত্বেও উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক পরিবর্তনের এই মূল ধারাটির ক্রিয়াশীলতা ছিল মূলত কলকাতা। বাংলার বিপুল জনসাধারণের থেকে তা দূরেই থেকে গিয়েছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উনিশ শতকের ‘পরম্পরার পুনরাবিষ্কার’ পর্ব সম্পর্কে বসুধা ডালমিয়া যেমন বলেছেন, উদ্যোক্তারা “ দীর্ঘকালীন মুসলমান শাসনকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল”। এর ফলে এমন এক আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে যা মুসলমান সহ সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

মুসলমান মানসে পরিবর্তনের প্রকৃতিঃ

উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ বৃত্তের বাইরে থাকা এই দুই শ্রেণির সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতিগত ধারার প্রতিও নজর দেওয়া দরকার। বাংলার সমাজে যতোদিন হিন্দু মুসলমান এই দুটি পক্ষের প্রাধান্য ছিল, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে ভিন্নতর অবস্থান এবং ধর্মের মূলনীতিতে পার্থক্য থাকা সত্বেও ততোদিন দু’পক্ষ সরাসরি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়ে বাঙালি সমাজে নিজেদের থাপ খাইয়ে নেয়। উপনিবেশ পূর্বকালের বাংলার সীমারেখা সম্পর্কে এদেশের সাধারণ মানুষের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। একারণে তারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রতি যতটা আগ্রহী ছিল, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল ধর্মের প্রতি। ইহলৌকিয় প্রসঙ্গে আগ্রহ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ফলে ইহলৌকিক জীবনযাত্রায় ধর্মকে কেন্দ্রকরে বিরোধের অবকাশও ছিল কম। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে হিন্দু-মুসলমান প্রাক্তন ধর্মীয় বৈষম্য শুধু প্রকটই হয়নি, নতুন আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চাপে সেই বৈষম্য ক্রমশ স্ফীত ও বিরোধমূলক হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল মুসলমান সমাজে এই বিরোধ মূলক বিচ্ছিন্নতাবাদেরও বিকাশকাল।

ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর মধ্যেই যে 'হিন্দু জাগরণ'বাদী মানসিকতা শতাব্দীর গোড়া থেকেই ঘনীভূত হচ্ছিল, মুসলমান সমাজে তার লক্ষণ প্রকাশ পায় অন্তত তার চেয়ে পঞ্চাশ বছর পরে। মানসিকতার এই অসমান বিকাশের পরিসরেই বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণগুলি পরিপুষ্ট হতে থেকেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির যে তুলনায় বিলম্বিত প্রচেষ্টা মুসলমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মধ্যেও দেখা গিয়েছিল, তাতে ঐস্লামিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন ও আধুনিকতার পথে অগ্রগমন এই দুই বিপরীত মতাদর্শের টানাপোড়েনতো ছিলই। আবার সেই সঙ্গে হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজনীয়তাবোধও উপলব্ধ হয়েছিল মুসলিম মানসিকতায়। সমসাময়িক সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা বা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র থেকে এরুপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইসমাইল হোসেন সিরাজী যেমন একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর অন্তত চারটে উপন্যাস ছিল এই প্রতিক্রিয়াজাত। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, হিন্দু লেখকদের প্রতিবাদে তাঁর লেখনী ধারন। এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই আবার অত্যন্ত উগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীন টানাপোড়েনের অরেকটি দিক ছিল উর্দু-বাংলা দ্বন্দ। এই দ্বন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জুড়ে ছিল 'আশরফ' এবং 'আতরাফ' শ্রেণি চেতনা। যার অন্ততঃ বিলম্বিত পরিনাম হিসাবেও বাঙালি মুসলমান সচেতন হয়ে ওঠে, মুসলিম পরিচয়ের আবরনের অভ্যন্তরে তারা একটি গভীর সাংস্কৃতিক সংকটের শিকার। যদিও তার প্রকাশকাল ছিল আরও কিছুটা পরে।

বাংলার গ্রামসমাজে পরিবর্তনের স্বরুপঃ

সামগ্রিকভাবে কলকাতা বা ঢাকার জাগরনবৃত্তের বাইরে, বৃহত্তর বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রও স্থবির অপরিবর্তনীয় ছিল না। রজত কান্ত রায় এপ্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরিয়ে দেবার জন্য গ্রামসমাজের আমূল সংস্কার প্রয়োজন ছিল না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের 'এস্টেট' পুলিশ, আইন, আদালত রাজস্ব সংগ্রহকে ধারাবাহিক করতে পেরেছিল। তবে উদ্বৃত্ত সংগ্রহকে ভিত্তি করে গ্রামীণ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটে। রাষ্ট্র ও গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী রাজন্যদের দিন শেষ হয়ে যায়, পরিবর্তে মহাজন, ব্যবসায়ী জোতদারদের মত আর্থ-রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে আধুনিক 'গতিশীলতার' বিরুদ্ধে একটা পাল্টা পদ্ধতি গড়ে ওঠে। উৎপাদক শ্রেণির নিরিখে অবশিষ্ট গ্রামসমাজ তাই ছিল আপাত স্থির। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা নিরুপনের ক্ষেত্রে হিতেশরঞ্জন সান্যাল যেমন, মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্রকরে বাংলায় সামাজিক গতিশীলতাকে দেখিয়েছেন।১৭০০-১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে ১০৭টি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তারমধ্যে ২৭.১ শতাংশ তথাকথিত 'নিম্নবর্ণের' মানুষের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ১৭৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঐ একই বর্ণেরা নির্মাণ করেছিল ৪৭.৭ শতাংশ। মন্দিরনির্মাণের মতো বিষয়কে সামাজিক প্রভাব বিস্তার করার এবং সামাজিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলাভের অন্যতম উপায়স্বরুপ মনে করা হয়। অনেক সময় তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ নিজেদের নিম্নসামাজিক মর্যাদা মুছে ফেলার বা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ধরণের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বংলায়, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ যেমন, নবশাখ, অজলচল, অন্ত্যজ ইত্যাদিরা উদ্যোক্তা, বণিক, বা বড়জমির মালিক হিসাবে যখনই আত্মপ্রকাশ করেছিল তখনই তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এইসব দৃষ্টান্ত সে সময়কার সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষেই ইঙ্গিত দেয়। বাংলার গ্রামসমাজে সংস্কার প্রকৃয়ার একটি চিরাচরিত ধারার বহমানতার কথা এপ্রসঙ্গে বলেছেন অমলেন্দু দে; ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকরুপে রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় গ্রুপ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে, জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন। এরকমই কয়েকটি গ্রুপের নাম,-কর্তাভজা, বলরামী, খুশি বিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী প্রভৃতি। হিন্দুসমাজের নীচু তলার অব্রাহ্মণ সংস্কারকেরাই কলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলে মূলত সক্রিয় ছিল। এদের গণভিত্তিও ছিল অনেক গভীর। উনিশ শতকের গ্রামবাংলার অভ্যুত্থান গুলির অন্যতম চরিত্র হিসাবে যে স্বতঃস্ফুর্ততার কথা বলা হয়ে থাকে তার নির্মিতি

পর্বে এইসব উদ্যোগগুলির যথেষ্টই অবদান রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা কোনরকম সহযোগিতার হাত এদের জন্য বাড়িয়ে দেয়নি বরং নিরুপদ্রব কর নির্ধারনের ধারা বজায় রেখে অনেক ক্ষেত্রেই এই শ্রেণির পরিচিতির বিনির্মাণ ঘটিয়ে তাদেরকে দস্যু, তস্কর হিসাবে চিহ্নিত করেছে ও সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলার সন্ন্যাসী বা ফকিরদের প্রসঙ্গে যার প্রমাণ মেলে।

উপসংহারঃ

আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আলোচ্য সময়কাল সামগ্রিক ভাবে গতিহীন তমসাচ্ছন্ন ছিল না, যেমনটা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক বা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন। বরং আধুনিক ঐতিহাসিক আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় একধরণের ধারাবাহিকতার প্রতি; যার মধ্যেকার সক্রিয় কিছু উপাদানের সামাজিক ক্রিয়াশীলতা আধুনিক যুগের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচিত হয়। যদিও সেই ‘আধুনিকতা’ ছিল ব্যপ্তির দিক থেকে সংকীর্ণ, ঔপনিবেশিকজাত ধ্যানধারণা পুষ্ট। তবুও ঐতিহাসিকেরা অন্তত এবিষয়ে একমত যে, এই আধুনিকতার হাত ধরেই বাঙলাকে কেন্দ্র করে সূচনা হয়েছিল এক ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন, গড়ে উঠেছিল ‘জাতি-বোধ’।

পাঠ সহায়কঃ

নরহরি কবিরাজঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

অমলেন্দু দেঃ বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পলাশি থেকে পার্টিশান, আধুনিক ভারতের ইতিহাস

সিরাজুল ইসলামঃ বাংলাদেশের ইতিহাস(সাংস্কৃতিক পর্ব)

নিখিল সুরঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পটভূমি

ডঃ সিদ্ধার্থ গুহ রায়, ডঃ সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ

১। এখানকার সমাজ সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা দাও।

২। এদেশে নীতি নির্ধারনে ঔপনিবেশিক প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ক্রিয়াশীল মতাদর্শগত উপাদানগুলি পরীক্ষা করো

৩। উনবিংশ শতকে বাংলার সমাজ পরিবর্তনের ধারাগুলি কী ছিল?

৪। উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের উপর ক্রিয়াশীল উপাদান সমূহের আলোকে পরিবর্তনের প্রকৃতি বিচার করো।

Life and Society in Eighteenth Century Bengal

Unit 1: Indigenous Set up – Nature of changes in the Nineteenth Century

Unit 2: Debate on Bengal Renaissance

'বাংলার রেনেসাঁস'

বাংলার সমাজ -অগ্রগতির ধারা অনুসারে যে প্রবণতাগুলি উনিশ শতকে ঘনিষ্ঠ আকার পেয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় ছিল বৌদ্ধিক জগতে পরিবর্তণের বিষয়টি। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলার কিছু ইংরাজি শিক্ষিত যুবক একটি নতুন শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়, যারা পাশ্চাত্য ভাবধারার আলোকে প্রভাবিত হয়ে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, সংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ সচেতনতার পক্ষে বাণী শোনান, ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ঐতিহ্যের নামে বহুকাল ধরে চলে আসা সামাজিক কু-প্রথার অবসান ঘটাতে মনঃস্থ করেন। পরিবর্তনের ধারায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করা উনিশ শতকের এই প্রয়াস 'বাংলার রেনেসাঁস' বা বাংলার নবজাগরণ নামে উল্লিখিত। ইংরাজি রেনেসাঁস কথার অর্থ হল পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণ। পনেরো-ষোল শতকের ইউরোপে ধ্রুপদী সাহিত্য, দর্শণ, স্থাপত্য ও চিত্রকলায় যে জাগরণ দেখা গিয়েছিল তাকে আখ্যায়িত করা হয় রেনেসাঁস নামে। ইতালির নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল এর পুরোভাগে। এদেশে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতি জগতের পরিবর্তণের গুরুত্ব ও ব্যপকতা বোঝাতেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাথে এই ধরণের তুলনা টানা হয় এবং ইতালির ভূমিকায় ভাবা হয় বাংলার মনীষাকে। স্বভাবতই পৃথক সময়কালে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিমণ্ডলে পরিপুষ্ট হওয়া বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁসকে আদৌ রেনেসাঁস বলা যায় কিনা, তার প্রকৃতি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। 'বাংলার রেনেসাঁস বিতর্ক' হিসাবে যা ইতিহাস পাঠ্য।

সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যাঃ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যায় উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ পর্বকে বিষেশ গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রাচ্যবাদীদের প্রচেষ্টা এবং পশ্চিমী আধুনিক ভাবধারার অবদানের সোচ্চার ঘোষণার মাধ্যমে। জাগরণের শীর্ষে থাকা ব্যক্তিরা সেই মহান শাসনের সুফল ভোগ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যাতেও প্রায় একই ভঙ্গিতে বাংলার জাগরণকে দেখা হয়েছে। তাঁদের মতে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতে জাগরণের আলো জ্বেলেছিল ইংরেজ শাসন। এর মূলে রয়েছে তাদের জাতি হিসাবে সভ্যতার বিকিরণকারী ভুমিকা। যার আলোক-বিচ্ছুরণই ছিল আসলে বাংলার রেনেসাঁস। এই মতগোষ্ঠীর অন্যতম ডেভিড কফ(David Kopf) যেমন ভারতে ইংরেজ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন, ইংরাজ শাসনের ইতিহাস শুধুমাত্র ভারত শোষণের ইতিহাস নয়, বরং ভারতে সভ্যতার আলো বিকিরণের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের সহযোগী ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা। সেই মহান কাজের বিচারে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 'এশিয়ার মুক্তিদাতা' তথা 'ভারতের জনক' হিসাবে, লর্ড ওয়েলেসলি হলেন সেখানে ভারতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্গাতা। তিনি মনে করেন, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও তাঁদের ভারতীয় সহযোগী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরাই বাংলার জাগরণের পথপ্রদর্শক।

অধ্যাপক জে.এইচ.ব্রুমফিল্ড(J.H. Broomfield) ছিলেন এই ঘরানারই অপর ব্যাখ্যাতা। তিনি বলতে চেয়েছেন, বাংলায় যে জাগরণ পর্ব দেখা গিয়ছিল তা আসলে ছিল ইংরাজি শিক্ষিত কিছু অলোকিত ব্যক্তির সুবিধা আদায়ের প্রয়াস। বাংলায় প্রথম ইংরেজ শাসন শুরু হয়েছিল। তার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু মানুষ আলোকিত হয়। এদের তিনি বর্গিকরণ করেছেন 'ভদ্রলোক' হিসাবে। তাঁর মতে, এই ভদ্রলোক শ্রেণিভূক্তরা কায়িক পরিশ্রম করে না, তার বদলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা জমির খাজনা ভোগী বা চাকুরিজীবী। সামাজিক ভাবে উচ্চবর্গের সুবিধাভোগী অংশের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার কৌলিন্যেই হোক বা জাতিগত উচ্চতার গরিমায় এরা সাধারণের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলত। এদের আন্দোলনও ছিল যতটা ইংরেজ বিরোধী, তার চেয়েও বেশি জন-বিরোধী। সমাজের দুর্বল শ্রেণিও এদের কার্যকলাপকে সন্দেহের চোখে দেখত। তাদের চোখে এই ভদ্রলোকেরা ছিল 'উপরতলার শোষক জাতিগুলির প্রতিনিধি মাত্র।'

অধ্যাপক অনিল শীলের বক্তব্যও প্রায় একই সুরের। তাঁর মতে, ভারতীয়দের সাথে সহযোগিতাই ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি। প্রথম দিকে ইংরেজ শাসনের সহযোগী ছিল ভারতীয় রাজা, জমিদার, জোতদারেরা। পরে ইংরেজ শাসনের আওতায় একটি ইংরাজি শিক্ষিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এরা নতুন অবস্থায় নতুনভাবে ইংরেজদের সহযোগী হয়ে ওঠে। বাংলায় এরাই 'ভদ্রলোক' হিসাবে পরিচিত। এই ভদ্রলোকেরা ছিল হিন্দু, সামাজিক মর্যাদার দিকথেকে উচ্চস্তরীয়। এদের লক্ষ্যই ছিল প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থে বেশি সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়া। বৃহত্তর জনগণের সাথে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না।

ইতিহাসে এই ব্যাখ্যা 'নিও ট্রেডিশনালিস্ট' বা 'নিও ইম্পেরিয়ালিস্ট' ব্যাখ্যা নামে পরিচিত। বলাই বাহুল্য, এইসব ব্যাখ্যার সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যার মতই একদেশদর্শী। এখানেও ইতিহাসকে দেখা হয়েছে এলিট(elite) বা বড় নেতাদের (great leaders) দিক থেকে। তাছাড়া একথা আজ প্রমানিত যে, 'ভদ্রলোক' বলতে কোন অখণ্ড শ্রেণির অস্তিত্ব উনিশ শতকের বাংলায় ছিল না।

এদের স্বার্থও ছিল অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিভিন্ন মুখী। যেমন, মেধাজীবী ‘ভদ্রলোকে’রা প্রায়শই ঔপনিবেশিক কাজকর্মের জন্য ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও বড় জমিদার বা বড় ব্যবসায়ী গোত্রের ‘ভদ্রলোকে’রা সেক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করাই শ্রেয় মনে করত। কাজেই এরা সকলে কী করে একত্রিত ভাবে সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যেদিয়ে স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করতে পারে নয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যায় তা অস্পষ্ট। তাছাড়া, উনিশ শতকের মনীষায় যে আন্তরিকতা, বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে জন্ম নেওয়া নেতৃবর্গের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি একাগ্রতা ইত্যাদির কোনো ব্যাখ্যা এই গোষ্ঠীর বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না।

জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাঃ

উনবিংশ শতকের বাংলার জাগরণ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাতেও পশ্চিমী আধুনিকতার অবদানের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে দৃষ্টি ফেরান হয়েছে পশ্চিমী শিক্ষায় উদ্ভাসিত সে সময়কার বাংলার কিছু জাগ্রত মনীষার প্রতি। যাদের মহান অবদানের সফল পরিণাম রূপ পেয়েছিল বাংলার রেনেসাঁস হিসাবে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এর পথিকৃৎ এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ঘটেছিল তার সার্থক পরিণতি। ১৯৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে আয়োজিত এক আলোচনায় ‘নব যুগের উদ্‌গাতা’ হিসাবে রামমোহনের ভূমিকার কথা বলা হয়। এই আলোচনায় বক্তব্য রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমূখ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মের আলোকে বিচার করে রামমোহনের মধ্যে পেলেন আধুনিকতার উৎসের সন্ধান। এই ধরণের এক ‘প্রথাগত জাতীয়তাবাদী’ ব্যাখ্যা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। সব মিলিয়ে যে ব্যাখ্যায় উনিশ শতকের জাগরণের একটি উচ্ছ্বসিত রূপ বেরিয়ে আসে। কখনো সখনো তা আবার প্রায় ব্যক্তি পূজার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যার কেন্দ্রে ছিলেন প্রায়শই রামমোহনের মত সে সময়কার মহান সংস্কারকেরা। উদাহরণ হিসাবে নরহরি কবিরাজ যেমন উল্লেখ করেছেন রামমোহন সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তিঃ ‘Rammohun was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the modern age.’এই ধরণের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যায় কালক্রমে নেতৃত্বের অবদান সম্পর্কে ধারণায় কিছুটা বদল দেখা যায়। রামমোহন থেকে সরে গিয়ে মূল আকর্ষণ বিন্দুর প্রতিসরণ ঘটে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত ‘পুনরুজ্জীবন’ আন্দোলনের প্রতি। বঙ্কিম-বিবেকানন্দর নেতৃত্বে যার বিকাশ ঘটেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মতাবলম্বীরা রামমোহনের অবদানকে খাটো করারও চেষ্টা করেন। স্বভাবতই তার প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করেন অন্য পক্ষ। ক্রমে এই বিতর্ক ব্রাহ্ম গোষ্ঠী বনাম হিন্দু গোষ্ঠীর বিবাদে পরিণত হয় বলে নরহরি কবিরাজের মত অনেকেই যেমন যথার্থই মনে করছেন।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরাও বাংলার রেনেসাঁস বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রায় একই অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে একযোগে স্বীকার করেছন, এই নবজাগরণের মাধ্যমে উনিশ শতকে ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ, প্রায় একই সুরে যেমন বলেছেন, অষ্টাদশ শতক ছিল ভারতের ইতিহাসে “অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ”। ইউরোপে সে সময় উদারপন্থা, উপযোগিতাবাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তাধারার যে বিকাশ ঘটেছিল, তা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে আসে। সে দিক থেকে ইংরেজ শাসকেরাই ভারতীয় সমাজের একটি প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটিয়ে নবজাগরণের সূচনা করে। বলাই বাহুল্য, নবজাগরণের এই জাতীয় ব্যাখ্যার মধ্যেও এক ধরণের হিন্দুত্ববাদের প্রভাব এবং মুসলিম বিদ্বেষের বীজ স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়, যা আবার রেনেসাঁসের প্রকৃতিরও অন্যতম এক দুর্বল জায়গা। উপাদানগত দিক থেকেও এই ধরণের ব্যাখ্যায় প্রাধান্য পাচ্ছে নেতৃত্বের দিকটি, নবজাগরণের প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে নেতৃবর্গের ব্যাক্তি-নির্ভর কার্যকলাপের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাছাড়া শাসক পরিবর্তনের সাথে সামগ্রিকভাবে কোন যুগের পরিবর্তন কতখানি সম্পর্কিত তা নিয়েও কোন সুস্থির মতামতে পৌঁছানো কঠিন। বলাই বাহুল্য, আজকের দিনের বিচারে এটি অত্যন্ত সরল একটি ব্যাখ্যা।

মার্কসবাদী ব্যাখ্যাঃ

মোটামুটিভাবে বিশ শতকের চারের দশক থেকে বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট মহলে বেশ প্রত্যয় জাগায়। উনিশ শতকের জাগরণ ও তার পৃষ্ঠপোষক উভয়তই প্রশংসিত হয় অন্যতম মার্কসবাদী লেখক রজনী পাম দত্তর লেখায়। এই সময়ের একটি বিখ্যাত উদ্যোগ ছিল সুশোভন সরকারে ‘নোটস্ অন বেঙ্গল রেনেসাঁস’(১৯৪৬)। এখানেও প্রাধান্য পায়, জাগরণ পর্বের মধ্যেই এক ধরণের দেশীয় ঐতিহ্যের সন্ধান। তবে মার্কসবাদী মতাদর্শ অনুসারে ব্যক্তি-চর্চার পরিবর্তে শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে দেখবার প্রচেষ্টা ছিল এই ব্যাখ্যার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এঁদের কাছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ ছিল আসলে এদেশে শ্রেণিগত ভাবে বুর্জোয়া জাগরণ পর্ব। ব্রিটেনের তুলনাহীন ভারত শোষণের কথা স্মরণে রেখেও তার এক পুনরুজ্জীবনকারী ভূমিকার কথা মার্কস নিজেও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠস্থান হিসাবে ইংরেজ শাসন এক উন্নততর সভ্যতার নতুন উপকরণের সঙ্গে ভারতবাসীকে পরিচিত করিয়েছে। মার্কসবাদীদের মতে, যার যথোপযুক্ত আত্তীকরণের মাধ্যমে বাংলাতেই প্রথম সূচিত হয় এই বুর্জোয়া জাগরণ পর্ব।

সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান বিজ্ঞান-সচেতনতার বিষয়টিকে সাবেকি মার্কসবাদীরা যেমন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিরীক্ষণ করেছেন জাগরণ পর্বে উদ্যোগীদের মধ্যে । তাঁরা যথার্থভাবে দেখাতেও পেরেছেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেরই এবিষয়ে ছিলেন অপার কৌতূহল। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এক চিঠিতে (১৮২৩) রামমোহন স্পষ্টতই অন্যান্য বিষয়ের সাথে গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান,

রসায়নতত্ত্ব,শরীরবিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে সওয়াল করেন। বিজ্ঞান সচেতনতা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতে স্টিম ইঞ্জিনের প্রবর্তন, কয়লা খনি আবিষ্কার ইত্যাদিকে যেমন তারা স্বাগত জানায় বুর্জোয়া উদ্যমশীলতার বার্তা বাহক হিসাবে। এমনকি দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাও এ প্রসঙ্গে তারা উত্থাপন করেন। শরীরবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ও প্রচারের জন্য পত্রিকা প্রকাশ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের প্রবল আগ্রহের কথাই প্রকাশ করে। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিজ্ঞান সচেতনতার প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রেরও এক বিশেষ গুণ ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ। 'হিন্দু মেলা' বা 'জাতীয় মেলা'র উদ্যোক্তারা সামাজিক কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটিতে বিশেষ নজর দেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' ছিল শিক্ষিত বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার এক সার্থক প্রকাশ। বিজ্ঞান সাধনার প্রসার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র('বঙ্গদেশের কৃষক') বা রবীন্দ্রনাথও('পল্লীপ্রকৃতি') নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাঁদের বহু লেখায়। একই ভাবে মার্কসবাদীরা দেখাতে চেয়েছেন, সেই সময়কালের সর্বাধুনিক পাশ্চাত্য সমাজচিন্তার মধ্যেই তথাকথিত নবজাগ্রত শ্রেণি খুঁজে পান বুর্জোয়া গতিশীলতার আরেক বিশিষ্ট উপাদান আধুনিকতাকে; সে যুগের অগ্রদূতেরা যাকে প্রায়শই উল্লেখ করেছেন যুগধর্ম হিসাবে। সামন্ততন্ত্রের পতন, ধনতন্ত্রের উদ্ভব, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্যমী অবস্থান ইত্যাদি সমসাময়িক ইউরোপের গতিশীলতার মূল উপাদান সমৃদ্ধ এই আধুনিকতার আত্তীকরনের মধ্যেই জাতির মুক্তির উপায় কল্পনা করা হয়েছিল। মার্কসবাদীদের মতে, কালক্রমে ঘটেওছিল তাই, এই উপাদান সামগ্রীর যথাসম্ভব আত্তীকরণের মাধ্যমে একদল ইংরাজি শিক্ষিত যুবকের আবির্ভাব ঘটে। যারা অনুভব করেছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসন ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতবাসীর ভবিষ্যত অগ্রগতির বিষয়গত বিরোধ রয়েছে। বিদেশী শাসন দেশের উন্নয়নের পথে বড় বাধা পক্ষান্তরে দেশের সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন দেশের অবনতির মূল কারনগত উপাদান। সেকারণে তারা ইউরোপীয় রেনেসাঁস, রিফর্মেশন,এনলাইটেন্মেন্ট, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব প্রভৃতি ভাবধারা সংগ্রহ করে দেশবাসীকে বুর্জোয়া জাগরণের আলোয় উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন। ইউরোপে বুর্জোয়া জাগরনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলার জাগরণের প্রথম যুগের নেতাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই দিক থেকে বাংলার জাগরণ ছিল ইউরোপের বুর্জোয়া জাগরণের সাথে তুলনীয় এবং 'বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ'।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার সেদিক থেকে বিচার করে উনিশ শতকের জাগরণকে প্রথম বাংলার রেনেসাঁস নামে অভিহিত করেছেন। যদিও এই তুলনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি নিজেই ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। পরবর্তী কালে তিনি স্বীকারও করেছেন, 'সাদৃশ্য সাদৃশ্যই, প্রতিরূপ নয়।' তাছাড়া ঐতিহাসিকেরা এখন খোদ ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরও বহু সীমাবদ্ধতার কথা বলে থাকেন। সেখানেও রেনেসাঁস মূলত সম্পর্কিত ছিল মননশীল এলিটদের সঙ্গেই। কাজেই বাংলার রেনেসাঁসের আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্কে তিনি আস্থাবান বরং তাঁর মতে দ্বন্দ রয়েছে এর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে। বাংলার রেনেসাঁসের অগ্রগতিকে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করে এই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতাকে বোঝার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি। বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাস চর্চায় এই প্রচেষ্টাকেও মার্কসবাদী সংযোজন বলে ধরা হয়। সুশোভন সরকার দেখিয়েছেন, বাংলার জাগরণের দুটি ধারা ছিল। পাশ্চাত্যবাদী ধারা এবং পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা। তিনি নিজে এক্ষেত্রে প্রথমটির অবদান অধিক ছিল বলে মনে করলেও অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠির মত অনেকেই আবার দ্বিতীয় ধারাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যাইহোক, এই মতাদর্শগত ভিন্নতা আবার সুস্পষ্ট কোন পরস্পরবিরোধী মতবাদ ছিল না বা কোন ব্যক্তিই বিশেষ কোন মতবাদের নিখুঁত প্রতিনিধিও ছিল না। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, নবজাগরণের প্রথম পর্বে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্যবাদ বা আধুনিকতাকে গ্রহণ করার প্রতি অধিক আগ্রহ। পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ঐতিহ্য পন্থীরা। যাঁরা মনে করতেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সৃজনশীলতার মূল উপাদান গুলি নিহিত। বিশ্বাস বা ভক্তির পুনরুজ্জীবনকেই তুলে ধরা হয় মুক্তির উপায় হিসাবে। এই দুই ধারার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি ক্ষীণ ধারার কথাও বলা হয়, যদিও ঐ তৃতীয় সত্তাটি উচ্চতর স্তর হিসাবে সমাজ অগ্রগতির প্রকৃত সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত রাখতে পারে না বরং সুশোভন সরকারের মতে দুটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে। বস্তুতঃ পরস্পরবিরোধী ধ্যান ধারনার সহাবস্থান, মানিয়ে চলা, বিভিন্ন আদর্শের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব- এসব ছিল তাই নবজাগরণের প্রধান চরিত্রবর্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন, রামমোহন জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু স্বকালের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতেন না। এমনকি পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মদের নারীমুক্তি আন্দোলনও থমকে গিয়েছিল মাঝপথেই। তবে তাঁর মতে, বাংলার রেনেসাঁসের মধ্যেকার দুটি প্রবণতাই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে এবং সাহায্য করেছে অগ্রগতির পথে।

মার্কসবাদীদের অনেকে আবার সমন্বয়বাদী তৃতীয় ধারার সার্থকতা বিষয়েও বেশ প্রত্যয়ী। নরহরি কবিরাজ যেমন মনে করিয়ে দেন, নবজাগরণের উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই বুঝেছিলেন, আধুনিকীকরণের সাথে পরিচয় ছাড়া দেশবাসীর পক্ষে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হওয়া ও দেশের জাগরণের পথ প্রশস্ত করার আর কোনো উপায় নেই। আবার দেশের ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করতে না পারলে, এই প্রক্রিয়াটি দেশবাসীর চেতনায় প্রবেশ করবে না, তা বন্ধ্যা হয়ে থাকবে। রামমোহন ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে এ কাজ সুসম্পন্ন করতে চেয়েছেন, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী হলেও সাধারণ ভাবে আধুনিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেননি। এমনকি ইয়াং বেঙ্গলেরা পাশ্চাত্যকরণকেই আধুনিকীকরণের নামান্তর মনে করলেও ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, ইউরোপীয় চিন্তাকে গ্রহণ করা হলেও তাকে প্রকাশ করতে হবে ভারতীয় ভঙ্গীতে। তাঁর মতে, এই সমন্বয়ী ধারার শ্রেষ্ঠ নির্মাণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাজেই, এঁরা সকলেই নিজের মত করে সমন্বয়ের কথা ভেবেছেন, কে কতোখানি সফল হয়েছেন তা অবশ্য অন্য প্রশ্ন।

র‍্যাডিকাল মার্কসবাদী ব্যাখ্যাঃ

সুশোভন সরকার যদিও মনে করেন, উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের প্রধান উদ্যোক্তাদের মননে এতো বেশি সমন্বয়ের হদিশ পাওয়াটা আবার বেশ সন্দেহজনক। বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে আরও বেশি করে অতিশয়োক্তির অভিযোগ আসে এক ধরণের 'র‍্যাডিকাল' দৃষ্টিভঙ্গির তরফ থেকে। ১৯৭২ সালে রামমোহনের দ্বিশত জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নেওয়া ইতিহাস চর্চার উদ্যোগগুলিতে এইধরণের বিশ্লেষণ বিশেষ করে প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোগত বিশ্লেষণের ধারণা অনুসারে বাংলার রেনেসাঁসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার এবং স্ববিরোধীতার কথা এখানে তুলে ধরা হয়। প্রধানত দু'দিক থেকে বাংলার রেনেসাঁস ধারনার প্রতি চ্যালেঞ্জ আসে। প্রথমত, রেনেসাঁস সংস্কৃতির পদ্ধতিগত দিকটিকে বলা হয় যথেষ্ট মলিন ছিল। এ প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠীর মত অনেকেই যেমন বলে থাকেন, ইতালির রেনেসাঁস পৃষ্ঠপোষকদের শিকড় গ্রথিত ছিল শিল্পে, বানিজ্যে ও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্থায়। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে 'It is idle to seek for a Lorenzo Medici among the banians or a Frederigo of Urbino among the Zamindars.' আসলে যে আর্থ সামাজিক পরিবেশে ইউরোপে রেনেসাঁস সংঘটিত হয় বাংলার রেনেসাঁস তেমন পরিবেশ পায়নি। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠা এই রেনেসাঁস সংস্কৃতিতে তাই পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে গতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণি বা উৎপাদনশীল উদ্যোক্তাদের আত্মপ্রকাশ অনুপস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার অবশ্য উনিশ শতকের বাংলার 'কালচারাল হেরিটেজ' সম্পর্কে এই ধরণের 'হুইগ'বাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে মেনে নিতে চেয়েছেন, প্রাক আধুনিক ইউরোপীয় রূপান্তরের সাথে এর মূলগত পার্থক্য(Fundamentally different) ছিল। দ্বিতীয় অভিযোগের সার কথা হল, চিন্তাগত এবং কার্যক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা। বাংলার রেনেসাঁস সংস্কৃতিতে যে প্রগতিশীলতার কথা বলা হয় তা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোর অধীনে কর্মরত বা সুফলভোগী আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকেদের মধ্যে। যারা প্রায় সর্বাংশেই ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক, হিন্দুত্ববাদী প্রবণতা ছিল একান্তই স্পষ্ট, সেই সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল জ্ঞান প্রচারের সেই উদ্যোগ যা সীমিত সংস্কার কার্যাবলীকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সহায়ক হবে। ডঃ বরুণ দে এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেন, চরিত্রগত ভাবে এই প্রবনতা ফরাসী রেভল্যুশনারি প্রপাগন্ডা এবং পরবর্তীতে ইংলন্ডের প্রাক রিফর্ম অ্যাক্ট- এর সময়কার হুইগ মানসিকতার সমতুল্য।

স্বভাবতই উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা গড়ে তোলার উদ্যোগ হিসাবে এসেছিল র‍্যাডিকাল ব্যাখ্যাতারা। এঁদের ব্যাখ্যায় আবার উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে ব্রিটিশ আমলের কৃষক অভ্যুত্থান গুলিকে গৌরবান্বিত করার সাথে সাথে প্রায়শই রেনেসাঁস ইনটেলেক্চুয়াল দের প্রতি আক্রমণ শানাতে দেখা যায়। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্র গুপ্তর সময় থেকেই এই ধরনের প্রচেষ্টা বেশ প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্র গুপ্ত যেমন কলকাতা বৃত্তের বাইরে চোখ রেখে তার বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেছেন,বাংলার নবজাগরণ ছিল আসলে একটি 'অতিকথা'। ১৯৫১সালে প্রকাশিত 'সেন্সাস রিপোর্টে'র সম্পাদক অশোক মিত্র বলেছেন 'তথাকথিত নবজাগরন'। সুমিত সরকার যদিও ইতিহাস ব্যাখ্যানের আঙ্গিকে এই প্রাথমিক পর্বের উদ্যোগগুলিকে মূলত 'agitational' বা 'journalistic' গোত্রের মনে করেন। ১৯৭০ এর দশকের রেনেসাঁস সম্পর্কিত আলোচনার 'র‍্যাডিকাল' বিশ্লেষণ সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রণিধান যোগ্য। এখানে সুমিত সরকার, অশোক সেন, রজত কান্ত রায়, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, বরুণ দে প্রমুখ উপাদানগত ব্যাপকতার সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস চর্চাকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তোলেন। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য যেমন ভাষার ব্যবহারগত দিক থেকে বিচার করে দেখিয়েছেন, বাংলার জাগরণের উদ্যোক্তারা ছিলেন ভাষার ব্যবহারেও একান্তই এলিট গোষ্ঠির; যেখানে লুথার অনেক বেশি কৃষক সমাজের নিকটস্থ। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, বাংলায় নবযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল দুর্বল চেহারা নিয়ে জাগরণের নেতাদের মধ্যে ডিসেমব্রিষ্টদের বা নারোদনিকদের বলিষ্ঠতা ছিল না।

উপসংহারঃ

সাবেকি মার্কসবাদীরা যদিও দেখাবার চেষ্টা করেন, বাংলার রেনেসাঁসের প্রথম পর্বে নেতাদের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ, তবে তাদের মননে জনসাধারণ একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের দাবি উচ্চারিত হয়নি ঠিকই তবে তাঁরা চেয়েছিলেন এমন কিছু কৃষি-সংস্কার, যাতে জমিতে কৃষকের স্বত্ব আরও দৃঢ় হতে পারে এবং জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধির মাত্রাটি নির্দিষ্ট হতে পারে। তাছাড়া জাগরণের উদ্যোক্তারা ছিল মূলত হিন্দু তাই হিন্দু মানসিকতাই বিষেশভাবে প্রতিফলিত হয়, ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে হিন্দু ঐতিহ্যই প্রাধান্য লাভ করে কিন্তু ইংরেজ শাসন ও ভারতীয়দের মধ্যে মূল বিরোধ সম্পর্কে চেতনা যতই গভীর হতে থাকে ততই জাগরণের নেতারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সুশোভন সরকার বা অম্লান দত্তের মত অনেকেই মনে করেন, উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বিভিন্ন সীমাবিদ্ধতা সত্তেও তার "মূল্যাশ্রয়িতা ও অসামান্যতা" ছিল। সেদিক থেকে পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনের চেতনার উন্মেষে বাংলার রেনেসাঁস অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল বলা চলে।

পাঠ সহায়কঃ

নরহরি কবিরাজ(সম্পা), উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তর্ক ও বিতর্ক

সুশোভন সরকার, বাংলার রেনেসাঁস

রবীন্দ্র গুপ্ত, বাংলার নব জাগৃতি

ডঃ সিদ্ধার্থ গুহ রায়, ডঃ সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস

Sumit Sarkar, A Critique of Colonial India

V.C. Joshi, Rammohun Roy and the Process of Modernization in India

A. F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ

বাংলার রেনেসাঁস বিতর্ক বলতে কী বোঝায়?

বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে সমলোচনা মূলক প্রবন্ধ লেখ।

উপাদানগত বিভিন্নতার নিরিখে বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাস চর্চার বিবরণ দাও।

Block-2: Foreign Agencies in Action
(বিদেশী প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ)
Dr. Sukanta Pramanik

একক – ৩: দেশীয় সমাজে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া

বিন্যাস ক্রম

২.৩.০ উদ্দেশ্য (Objective)

২.৩.১ ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমি ভাবধারা ও কার্যকলাপের আগমন

২.৩.২. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.৩.৩সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৩.০ উদ্দেশ্য (**Objective**)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেনঃ

১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতে কি ধরনের বৈদেশিক তথা পশ্চিমি ভাবধারা ও কার্যকলাপের সম্প্রসারন ঘটেছিল।

২) এ দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি।

৩) বিভিন্ন বৈদেশিক আদর্শ, ভাবধারা ও কার্যকলাপের প্রতি এ দেশীয় শিক্ষিত ও সংস্কারপন্থী সমাজের প্রতিক্রিয়া।

২.৩.১ ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমি ভাবধারা ও কার্যকলাপের আগমন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী ধ্যান-ধারনা যেমন স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী ইত্যাদি গৃহীত হয়েছিল এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা। সুদৃঢ় হয়েছিল ভারতের সাথে পশ্চিমের যোগাযোগ। পশ্চিমী উদারতন্ত্রবাদ বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল। উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া বাংলা তথা ভারতের সংস্কার আন্দোলনের চরিত্র একমুখী

ছিল না। বিভিন্ন আদর্শ এবং পরিবর্তনসমূহ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সংস্কার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কু-প্রথা, কুসংস্কার এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন বর্বর প্রথার অবসান ঘটানো। উল্লেখ্য এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং নতুন চিন্তাভাবনার উদ্রেক ঘটিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক তথা বৈদেশিক হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র বাজারজাত অর্থনীতি অথবা রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তৎকালীন সময়ের সমাজ এবং সংস্কৃতিকেও এটি প্রভাবিত করেছিল। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের এই প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতীয় সংস্কারকগণ ইতিমধ্যেই অবহিত ছিলেন। কারণ ইতিপূর্বেই তারা পশ্চিম ধ্যান ধারনা এবং নৈতিক গুণাবলীকে গ্রহণ করেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভারতীয় সংস্কারকগণ যারা ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ এবং ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তারা একদিকে যেমন পশ্চিমের যুক্তিবাদ এবং সভ্য সমাজ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে তারা ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের প্রতিরোধ করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রক্রিয়াকে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক K.N Panikkar ‘Cultural Defence’ বলে অভিহিত করেছেন

এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা একটি আপাতবিরোধী পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। নতুন ইউরোপীয় ধারণা যেমন যুক্তিবাদ এবং ‘progress’-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশীয় সংস্কারকগণ চেষ্টা করেছিলেন নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে--যা হবে একেবারেই আধুনিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা ভারতীয় সমাজকে নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নতুন চিন্তাভাবনাকে জাগরিত করা। একই সাথে সামাজিক কু-প্রথা গুলি যেমন বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা ইত্যাদি কে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার অনেক আগেই ঔপনিবেশিক তথা পশ্চিমি গবেষকরা ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিকে তাদের তুলনায় হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক সমাজ তাদের দৃষ্টিতে ছিল ‘effiminate’(নারী সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য)-যা ছিল সম্পূর্ণভাবে ‘colonial masculinity’ (ঔপনিবেশিক পৌরুষত্ব)-র বিপরীত। জেমস মিল তাঁর‘civilizational critique of India’ যখন রচনা করেন তখন তিনি এই মত ব্যক্ত করেন।

প্রারম্ভিক পর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি ছিল ভারতীয়দের সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি নীতি গুলিকে ধারাবাহিকভাবে চলাকেই তারা স্বীকৃতি দিয়েছিল। সর্বোপরি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাদের একটি শ্রদ্ধাও ছিল-যা ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাচ্যবাদ নীতি থেকে জানা যায়। সংস্কৃত ও পার্সিয়ান ভাষায় রচিত বিভিন্ন লিপি চর্চার মাধ্যমে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি কে জানতে চেয়েছিল। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সরকারি পরিচালনায় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই বাংলায় এশিয়াটিক সোসাইটি(১৭৮৪), ক্যালকাটা মাদ্রাসা (১৭৮১) এবং বেনারস সংস্কৃত কলেজ(১৭৯২) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধারণা পোষণ করা হয়েছিল যে, ‘knowledge about the subject population, their social customs, manners and codes were regarded as a necessary prerequisite for developing permanent institutions of rule.”

কিন্তু হেস্টিংসের শাসনকালের শেষ দিক থেকেই ভারতীয়দের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গুলিতে ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপ করা শুরু হয়. এক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিভিন্ন আদর্শবাদী প্রভাব গুলি যেমন Evangelicalism বা ধর্মপ্রচারবাদ, Utilitarianism বা উপযোগিতাবাদ এবং free trade বা মুক্ত বাণিজ্য চিন্তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদীরাভারতে সামাজিক ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংস্কার এবং কর্তৃত্ববাদী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। অন্যদিকে Evangelicalistরা ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে ভারতীয়দের মুক্ত করার জন্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। মুক্ত বাণিজ্য চিন্তার যারা সমর্থক ছিলেন তারাও দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে মুক্ত করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন-যাতে অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য গড়ে তোলা যায়। যদিও ভারতীয়দের কাছ থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তখনো পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি সরকার এই হস্তক্ষেপ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিল।হস্তক্ষেপ ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব ছিল না যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের একটি গোষ্ঠী ইংরেজ কোম্পানির সংস্কারগুলি কে সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়। উল্লেখ্য, এই ধরনের একটি গোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্কার কে সমর্থন করবে। কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয়দের এই বিশেষ গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য ইংরেজি শিক্ষাই ছিল ভারতে কোম্পানি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র।

ভারতে ইংরেজি শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে প্রধানত কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে charity বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপিয়ান এবং ইঙ্গ-ভারতীয় পরিবারগুলির শিশুদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। ইংরেজ কোম্পানি এই বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্নভাবে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ১৮১৩র আগে পর্যন্ত এদেশীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে কোম্পানি সরাসরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ইতিপূর্বেই চার্লস গ্রান্ট ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। যদিও তার প্রধান চিন্তা ভাবনা ছিল ভারতে কোম্পানির আধিকারিকদের অপশাসন। তার মতে ভারতে ব্রিটিশদের প্রকৃত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে উন্নত নৈতিক এবং উৎকর্ষ সম্পন্ন গুনাগুন প্রদর্শনের মাধ্যমে- যা প্রধানত খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'Christian instruction was the best guarantee against rebellion, as it would rescue the natives from their polytheistic Hinduism and make them parts of the assimilative project of colonialism.'তা সত্ত্বেও পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত মিশনারীদের ভারতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মিশনারীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে এদেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করে এবং পশ্চিমে শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ নেয়। তাদের কাছে পশ্চিমি শিক্ষা ছিল ধর্মান্তরকরণের প্রধান মাধ্যম। এইভাবে যখন প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীরা মাদ্রাজে অবস্থিত Danish কেন্দ্র থেকে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্ব থেকে। অন্যদিকে কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরের Danishকেন্দ্র থেকে মিশনারীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ সময় থেকে। এক্ষেত্রে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের অন্যতম উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং জোশুয়া মার্শম্যান এর নাম উল্লেখযোগ্য। মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ চালানোর পাশাপাশি তারা বাইবেলকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিল। সর্বোপরি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই তারা বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা স্থানীয় জনগণের ধর্মীয় বিষয়গুলিকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানির আধিকারিকরা তাদের কার্যকলাপকে মেনে নিয়েছিল।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকৃত সূচনা সেই কারণে হয়েছিল ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে -যা শুধুমাত্র যে ভারতে মিশনারীদের আগমনকে অনুমোদন দিয়েছিল তাই নয়, বরং দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমতঃ এদেশীয় শিক্ষিত মানুষদের উৎসাহদান এবং সাহিত্যের উন্নতি ও পুনরুজ্জীবন। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানো। কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮১৩ সালের চার্টার আইন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ তখনো পর্যন্ত প্রাচ্যবাদীদেরচিন্তাভাবনা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। নতুন জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন প্রভাবিত ছিল প্রাচ্যবাদীদের দ্বারা-যারা এদেশীয় শিক্ষার বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য সরকারি অর্থ ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা, আগ্রা এবং দিল্লিতে ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এদেশীয় জ্ঞান চর্চার বিকাশ ঘটানোর জন্য টোল ও মাদ্রাসাগুলিকে তাঁরা উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।যদিও রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্ট কে লেখা চিঠিতে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সর্বোপরি ১৮৩০র দশকে Orientalist এবং Anglicistদের মধ্যে বিতর্ক শেষ পর্যন্ত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল।১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর আইন সচিব টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায়(minute on Indian Education) ভারতে ইংরেজি শিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ লর্ড বেন্টিঙ্ক একটি সরকারি আদেশ দ্বারা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় করার আদেশ জারি করেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন যে, ‘a new education system was introduced in India, in which the task of producing knowledge was assigned to the metropolitan country, while its reproduction, replication and dissemination were left for the colonised people.’ এরপর ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের নির্দেশনামারদ্বারা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ জনগণের জন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্যআনতে ব্যর্থ হয়েছিল। উল্লেখ্য ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। মিশনারীদের কাছে এটি ছিল ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণের একটি প্রধান রাস্তা। উপযোগিতাবাদীদের কাছে এটি ছিল ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণ করার একটি অন্যতম উপায়। এরস্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৮১৫ সালে Lord Moira বলেছিলেন যে, ‘imparting education to natives is our moral duty.’ অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতীয়করণের মাধ্যমে

ভারতে শাসন সংক্রান্ত ব্যয় কমানোর উপায় খুঁজেছিল বিশেষ করে বিচার সংক্রান্ত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত পদগুলিতে।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ এর ফলে ভারতে একটি নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল- যারা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী। আধুনিকতার ধারণা তাদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য তারা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু একই সাথে ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ভারতীয় ঐতিহ্যে কিছু সামাজিক এবং ধর্মীয় ও রীতিনীতির সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ এই সমস্ত রীতিনীতি সামন্ত সমাজের প্রতীক বহন করে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার যেমন জাতপাতের কঠোরতা, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার আড়ালে বহুবিবাহ ইত্যাদির মধ্যে সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।১৮৩০ সালের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। যদিও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এই সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা গুলিকে বিভিন্ন আইন এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল।

ভারতীয়দের চিরাচরিত সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপের অন্যতম উদাহরণ হল ১৮২৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সতীদাহ প্রথা কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। উল্লেখ্য,মুঘল ভারত থেকেই এই প্রথা ভারতের সামাজিক রীতিনীতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে এর ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাচীন হিন্দু আইনের দায়ভাগ প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে সতীদাহ প্রথা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। সাধারণত এই আইন মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপর তার বিধবা স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত করে। সে কারণেই ধর্মীয় মোড়কে সতীদাহ প্রথা গড়ে তোলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ভারতে আগত খ্রিষ্টান মিশনারীরা সর্বপ্রথম এই প্রথা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছিল। তবে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে।

সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের' আরো একটি উদাহরণ ছিল বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার১৮৫৬ সালে‘The Hindu Widows Remarriage Act’ পাশ করে-যা বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যদিও গবেষক Lucy Carol এই আইনের সমালোচনা করে বলেছেন যে, ‘the legislation was intrinsically conservative in character, as on remarriage it disinherited the widow of her deceased husband’s

property, and thus endorsed the Brahmanical norm of rewarding only “the chaste, prayerful widow”. বিধবা বিবাহ আন্দোলন শেষ হয়েছিল বিদ্যাসাগরের জীবনী কার অশোক সেন এর ভাষায় অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর বহুসংখ্যক বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে জাগরণ-যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারা কখনোই করা সম্ভব নয়। এর ফলে শুধুমাত্র বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ ক্রমশ যে হ্রাস পেয়েছিল তাই-ই নয়, বরং বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমী বলে বিবেচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তামিল ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন সেভাবে সার্বিক সাফল্য লাভ করেনি।

আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার তথা ভারতীয়দের সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়াটি অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে যেখানে এটি কোন সুনির্দিষ্ট অথবা সংঘটিত ধর্মীয় এবং সামাজিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছিল। মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের শুরু থেকেই ওই অঞ্চলে অপরাধ কমানোর দাবি জানিয়েছিল। উল্লেখ্য, বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা ‘ঠগ’নামে পরিচিত ছিল, ঔপনিবেশিক ভারতে এইরকম একটি অপরাধী বলে অভিহিত হতো যারা প্রাচীনকাল থেকেই দস্যুবৃত্তি অথবা ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল।১৮৩০ এর দশক থেকেই ব্রিটিশরা এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। এ প্রসঙ্গে গবেষক রাধিকা সিংহ মন্তব্য করেছেন যে, ঠগ বিরোধী অভিযানের উদ্দেশ্য এটাকে শিক্ষা এবং প্রাচীন সমাজকে নতুনভাবে জাগরিত করার মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করা ছিল না, বরং ‘Thuggee Act (XXX), 1836’-এর উদ্দেশ্য ছিল, এই কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।ঠগ প্রথা বিরোধী অভিযানের অন্যতম কৃতিত্বের দাবিদার স্যার উইলিয়াম স্লিম্যান দাবি করেছিলেন যে, সংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে এটিকে দমন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই ঠগ হিসাবেঅভিযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী কে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সূত্রপাত ঘটেছে।

আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছিল তুলনামূলকভাবে দৃশ্যত কম বা অসংগঠিত স্তরে সামাজিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যা কয়েক শতক ধরে জনগণের প্রাত্যহিক

সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে সর্বাধিক আদর্শ উদাহরণটি হল ১৮৪৩ সালে দাস প্রথার অবসান। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে দাস প্রথার অবসান হয়েছিল ১৮২০ সালে। ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা বিভিন্ন ধারায় এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে থাকেন।ভারতে কৃষিজাত সম্পর্কগুলি অনেক বেশি জটিল ছিল যেখানে শ্রমিক নির্ভরতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।১৮৩৩ সালের চার্টার আইন ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল দাস প্রথার অবসান ঘটাতে এবং আইনগতভাবে এটি নিষিদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রমাগত বাধ্য করেছিল। মনে রাখতে হবে যে দাসত্বের ভিন্ন ভিন্ন ধারা বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত থাকার জন্য আইনগত প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে এই প্রথার অবসান এর ফলাফল সীমাবদ্ধ ছিল। জাতপাত, সামাজিক রীতিনীতি এবং ঋণ কৃষি শ্রমিকদের বাধ্য করেছিল তাদের মালিকের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে।

সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের এই হস্তক্ষেপ বা তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন গুলির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। উনবিংশ শতকে এই ধরনের সংস্কার আন্দোলন গুলি শুধুমাত্র একটি সামাজিক পেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ সংস্কারের এই ঐতিহ্য শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করেছিল যারা প্রাথমিকভাবে উপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ফলাফল উপভোগ করেছিল। বাংলায় সংস্কার আন্দোলন গুলি একটি ক্ষুদ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ পরিভাষায় যারা‘ভদ্রলোক’ নামে অভিহিত। প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিল ‘উদীয়মান মানুষ’ যারা অর্থ কে ব্রিটিশ আধিকারিকদের আনুকূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল। একইভাবে ইংরেজি শিক্ষার সুবিধা নিয়েছিল সরকারের বিভিন্ন পেশাগত এবং প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। সামাজিকভাবে তারা ছিল বেশিরভাগই হিন্দু। যদিও জাতপাত মুখ্য বিষয় ছিল না তবুও তারা প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য সম্প্রদায় থেকে এসেছিল। ব্রিটিশরা কখনোই চেষ্টা করেনি এই সংস্কারগুলি কে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে কারণ সংস্কারের এই ভাষাগুলি নিরক্ষর কৃষক এবং কারিগরের কাছে বোধগম্য হয়নি। একইভাবে পশ্চিম ভারতে প্রার্থনা সমাজের সদস্যরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত চিৎপাবন এবং সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিল।

ভারতীয় সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় যখন সমাজ পরিবর্তনের তাগিদে ব্রিটিশদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের রূপায়ন

ঘটাতে সচেষ্ট ছিল, সেই সময় ভারতীয় গ্রামীন সমাজ চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক শাসন এবং সমাজ ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল ভিন্নভাবে। শহুরে বুদ্ধিজীবীদের (যারা প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান সুবিধাভোগী ছিলেন)তুলনায় চিরাচরিত উচ্চবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষকদের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রধানত প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা। এর ফলেই একাধিক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে মোগল ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা অপরিচিত ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকদের ওপর রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ মোগল ভারতের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

একক – ৪ :

বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ

উপনিবেশিক ভারতে শিক্ষার সম্প্রসারণ এর বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ছিল প্রধানত অসম্প্রদায়গত- বিশেষ করে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে। কারণ শাসকের ধর্ম বিস্তার করা হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরদ্বারা। প্রধানত জনসংখ্যা গঠন এবং আইনের গঠনের ন্যায় শিক্ষার সম্প্রসারণ এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু এবং ইসলাম সামাজিক ধর্মীয় স্তর গুলি কে চিহ্নিত করা। আধুনিকতার স্বার্থে অথবাধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে এটি করা হয়নি। যদিও ব্রিটিশ ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ এবং ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি এটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সরকারি উদ্যোগের বাইরে ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীরা। কোম্পানির কর্মকর্তারা এ দেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের কাজকর্মের বিরোধী ছিলেন। কারণ মিশনারীদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের বাণী প্রচার করা এবং ধর্মান্তরিত করার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা। এই লক্ষ্য পূরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তারা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহন করেন। কিন্তু সরকার মনে করত যে, মিশনারিদের কাজ ভারতবাসীর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করবে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। ইংরেজ কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও মিশনারিরা শিক্ষা প্রসারে কাজ চালিয়ে যান। সম্ভবত এই কারণে উইলিয়াম কেরি নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে ভারতে প্রবেশ করেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। উল্লেখ্য, প্রাচ্যবাদী ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ১৮০০

খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল ভারতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করে অধিক সংখযক ভারতীয়কে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হল ভারতে শিক্ষা বিস্তার।Marquis of Hastings গভর্নর জেনারেল হিসেবে আসার আগে পর্যন্ত কোম্পানির সরকার মিশনারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছিল।কারণ ইংরেজ শাসকদের মনে হয়েছিল যে তাদের কার্যকলাপ এদেশের ধর্মীয় ভারসাম্য নষ্ট করবে এবং সামাজিক অসন্তোষের জন্ম দেবে। কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিরা শাসকের সুনজরে আসার জন্য তাদের সব রকম ভাবে তোষণ করত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোরট উইলিয়াম কলেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রাচ্যবাদী কর্মসূচিতে অংশ নিতে শুরু করেছিল। শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরা নিজেদের মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং বাংলাভাষায় বিভিন্ন লেখা ছাপাতে আরম্ভ করেছিল। লর্ড ওয়েলেসলি প্রাচ্যবাদী ভাবধারা প্রচারের জন্য শ্রীরামপুর মিশনারীদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কে নানাভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে।

মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের পরামর্শেডাচ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০খ্রিস্টাব্দে।এদের উদ্যোগে শ্রীরামপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। শিক্ষানুরাগী খ্রিস্টান মিশনারীদের বলা হত ইভাঞ্জেলিস্ট। চার্লস গ্রান্টের মত ব্যাক্তিদের নেতৃত্বেভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের অবাধ কার্যপরিচালনার স্বপক্ষে প্রচার শুরু হয়। তারা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে ভারতে কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার অবসানের জন্য ইংরেজি শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা প্রয়োজন। সরকার শেষ পর্যন্ত মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের দাবি মেনে নেয়। ইভ্যাঞ্জেলিস্টদের বক্তব্যে হিন্দু ধর্ম, ভারতীয় সংস্কৃতি, এমনকি এ দেশে প্রচলিত সমস্ত কিছুকে নগ্ন ভাবে আক্রমণ করা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পূর্ণটাই বর্জনীয়-এই মত অবশ্যই গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে এদের উদ্যোগে ভারতের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছিল।

কেরি ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষার শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেন। তিনি রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ করেন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর উদ্যোগে

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদিত হয়। বাংলা ব্যাকরণের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। তিনি বাংলা ভাষার ভিত্তি হিসেবে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাপ্টিস্ট মিশনের উদ্যোগেই শ্রীরামপুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। এটিই বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজ।

কলকাতার প্রথম বিশপ মিডলটন শিবপুরে বিশপস কলেজ স্থাপন করেন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে।জেনারেল ডাফ উচ্চবর্গীয় ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের বাণী ও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-ভারতীয় কমল বসুর গৃহে প্রথম স্থাপিত হয় জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন-যা বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত।১৮৩৫ সালে জেসুইট মিশনারিরা ‘সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার বাইরে গড়ে ওঠা কতকগুলো বিদ্যালয় হল বোম্বাইয়ের ইউলসন কলেজ, মাদ্রাজের খ্রিষ্টান কলেজ (১৮৩৭), মসুলিপত্তনমের নোবল কলেজ(১৮৪১), আগ্রার সেন্ট জর্জ কলেজ (১৮৫৩)।

দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের ‘ভাস্কোডাগামা যুগে’র একটি সাধারণ নিরীক্ষা সম্পর্কিত গবেষণায় কে.এম. পানিক্কর ১৯৫৯ সালে খ্রিস্টান ধর্মান্তরকরণ কে সামরিক এবং আধ্যাত্মিক অভিযানের একটি লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরনের প্রেক্ষাপট এই মতামত ব্যক্ত করে যে, খ্রিস্টান ধর্ম প্রধানত একটি বিদেশী এবং সংস্কৃতিগতভাবে একটি আলাদা বিশ্বাস। উল্লেখ্য, পশ্চিমের অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষা ভারতে খ্রিস্টান ধর্ম আগে এসেছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় খ্রিস্টান মিশনারি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে ঔপনিবেশিক যুগের আলোকে বিশ্লেষণ করা একটি জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ধরনের সম্পর্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল প্রতীকি।

উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে মিশনারীদের সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সময় এবং স্থান অনুযায়ী এর প্রকারভেদ আলাদা হত। সামগ্রিকভাবে মিশনারী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক সমঝোতাপূর্ণ ছিল না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ মূলক ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ ভারতে রাষ্ট্রের দ্বারা ক্যাথলিক মতবাদকে সমর্থন করা কার্যত একটি অসম্ভব বিষয় ছিল।১৮২৯ সালে ‘Catholic Emancipation Act’ পাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডে রাষ্ট্র এবং মিশনারিদের মধ্যে সম্পর্ক অস্পষ্ট ছিল।অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের দশকগুলিতে যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে

তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করল তখন ব্রিটিশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এই ব্রিটিশ উচ্চবিত্ত শ্রেণি সাধারণত জ্ঞানদীপ্তযুগের ধ্যান ধারনারদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল--যা মূলত গির্জার দুর্নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। এই পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যা প্রধানত বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফরাসি বিপ্লবের আলোকে দেখা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক আধিকারিকদের অনেকেই ধর্মান্তরকরণকে অপ্রয়োজনীয় প্ররোচনা হিসেবে গণ্য করতো।কেরি, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি দল প্রাথমিকভাবে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত কলকাতা অঞ্চলের মধ্যে মিশন প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি পায়নি। ফলে দানেশ নিয়ন্ত্রিত শ্রীরামপুর এলাকায় তাদের মিশন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার তাঁর‘Modern Times’ গ্রন্থে বলেছেন যে, ‘There was a strong element, moreover, of class suspicion or snobbishness among colonial officials which closed off the possibility of social relations with missionaries.’

১৮১৩ সালের পর থেকে মিশনারীরা শুধুমাত্র ব্রিটিশ ভারতে একটি লাইসেন্স ব্যবস্থার অধীনে বসবাসের অনুমতি পেয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ছিল। যদিও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র এবং মিশনারীদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান এবং ঘনিষ্ঠতার ফলে কিছু কিছু বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে ব্রিটিশ সম্প্রসারিত এলাকায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনে চার্চের দ্বারা অনুমোদিত Anglican মিশনারিরা এখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত ‘ভদ্রলোকোচিত’ নিয়োগ শুরু করতে তৎপর হয়। প্রশাসক এবং সেনা আধিকারিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা ‘পাঞ্জাব গোষ্ঠী’কে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে।

যেহেতু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে মিশনারীদের সম্পর্ক বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তাই খ্রিস্টান মিশন এবং সম্প্রদায় গুলিকে কখনোই একই সারিতে ফেলা যায় না। কৌশলগত পার্থক্যগুলি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলেছিল। কিছু কিছু মিশনারি বিশেষ করে বাংলায় আলেকজান্ডার ডাফ শহুরে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় কে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। অন্যরা সামগ্রিকভাবে প্রধানত গ্রামীন অঞ্চলের কৃষক, অবহেলিত মানুষ এবং উপজাতিদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। খ্রিষ্টান মিশনকে ভারতের আপামর খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে একই সরলরেখায় রাখা যাবে না। বহু সংখ্যক ভারতীয়ের সফল ধর্মান্তরকরন খ্রিষ্টানদের মধ্যে জাতিগত উত্তেজনার বাতাবরন তৈরি করেছিল। উল্লেখ্য, প্রাক্তন

ডিরোজিওপন্থী কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী ছিলেন ডাফের সুপরিচিত একজন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। পরবর্তীকালে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী একজন যাজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য তা হল খ্রিষ্টান মিশনের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয়দের মর্যাদা ও তাদের বেতন প্রদানের প্রশ্নে তিনি তাঁর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ করেছিলেন।

খ্রিষ্টান মিশনের সামগ্রিক প্রভাব তাঁদের দ্বারা ধর্মান্তরিতদের উপর ছাড়াও অন্যান্য বিবিধ সামাজিক ক্ষেত্রের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষাক্ষেত্র। নব্য প্রতিষ্ঠিত মিশনারি স্কুল ও কলেজগুলি ভারতের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি অংশকে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করেছিল। এই বুর্জোয়া শ্রেণীর খুব সামান্যই ছিল ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। এছাড়া মিশন হসপিটালগুলি ভারতীয়দের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল-যাদের অনেকেই ধর্মান্তরিত ছিল না। একইসাথে মিশন সেই সমস্ত পিছিয়ে পড়া ভারতীয় জনগণের (নারী, দলিত, আদিবাসী ইত্যাদি) সামনে সাহায্যের দরজা উন্মুক্ত রেখেছিল যারা অনেকেই চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, মিশন স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার কেন্দ্রগুলি কার্যত বঞ্চিত ভারতীয়দের একাংশকে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দক্ষিন ভারতে খ্রিষ্টান ধর্মান্তরকরন প্রক্রিয়াকে মিশন ইতিহাসে ‘গণ-আন্দোলনের যুগ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে-যা অসংখ্য ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই দুর্ভিক্ষ ত্রানের সাথে যুক্ত মিশনারিদের সম্পর্কে ‘rice christians’ শব্দটি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, ‘Missionaries themselves deplored the fact that many poor famine victims converted in order to procure subsistence.’ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, দুর্ভিক্ষ ত্রানের সুবিধা যারা গ্রহন করেছিলেন তাদের বেশীরভাগই ধর্মান্তরিত ছিল না।

খ্রিষ্টান মিশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল দেশীয় ভাষা ও মুদ্রন শিল্পের বিকাশ। সাধারন মানুষের কাছে এগুলি সস্তা এবং সহজলভ্য হওয়ায় ব্যাপক হারে ধর্মান্তরনের ক্ষেত্রে মিশনারিরা এই দুটি মাধ্যমের সাহায্য নিয়েছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে ‘The Serampore Baptist Mission Press’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই অন্যতম প্রাচীন বাংলা সংবাদপত্র ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রেস থেকে

খ্রিষ্টান ধর্ম বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়গুলিও প্রকাশিত হতে শুরু করে-যার তালিকায় অন্যান্য ধর্মের পবিত্র গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উল্লেখ্য, মিশনারি স্কলারদের অন্যতম Robert Caldwell (১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'A Comparative Grammer of the Dravidian Language' গ্রন্থে লেখক) আধুনিক তামিল সংস্কৃতি এবং পরিচিতির বিকাশ ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বেশিরভাগ মিশনারিরা যারা দরিদ্র মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন তারা প্রাথমিকভাবে ধর্মান্তরকরণ এর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতে জাতপাত নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকমের ছিল। এমনকি যারা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতো তারাও অনেক ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য মেনে চলত। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনের একটি চর্চা আনুগত্য স্বীকারকারী লোকজনের ওপর চার্চের বিভিন্ন নীতিগত কার্যাবলীর প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষে মিশনারি কার্যকলাপ শুধুমাত্র ভারতীয় আধিপত্যকারীদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় নি। ১৮৫০র দশকে বাংলায় বিদেশী মিশনারিদের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই মিশনারিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রেভারেন্ড জেমস লং-যিনি ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের পর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ কোড়াড় কারণে জেমস লং কে বন্দীদশা কাটাতে হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. From Plassey to Partition- Sekhar Bandyopadhya

2. Modern Times- Sumit Sarkar

3. A History of Modern India- Ishita Banerjee-Dube

<u>* সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী</u>

১। ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের উপর একটি প্রবন্ধ লেখ।

২। তুমি কি মনে কর, ঔপনিবেশিক বাংলায়, মিশনারিদের কার্যাবলী ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল?

৩। ঔপনিবেশিক বাংলায় মিশনারিদের কার্যাবলী সম্পর্কে যা জান লেখ?

Block III

Role of Intelligentsia in 19th Century Bengal

বিষয় কাঠামো:

প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার দিক

গোঁড়াপন্থীদের প্রতিক্রিয়া ও রাধাকান্তদের

নব্যবঙ্গ আন্দোলন ও ডিরোজিওর ভূমিকা

হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নাবলী

সয়াহক গ্রন্থ তালিকা

উদ্দেশ্য:

এই এককটি পড়লে যে বিষয়গুলি জানতে পারা যাবে

উনবিংশ শতকে বাংলার ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সম্পর্কিত ধারণা

আধুনিকতা ও রক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন ও তাদের ভূমিকা

হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন ও তার প্রভাব

Unit 5

Political, Economic and Cultural Rationalism-Ideological Debates:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শতকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তন জগতে পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত বাংলা থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে তা প্রভাবিত করে। নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্প্রসারণের সুবাদে বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং যে সমস্ত ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ।

উনিশ শতকের সূচনায় ভারতের পূর্বপ্রান্ত অর্থাৎ বাংলাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী মুঘল শাসনের রীতিনীতি থেকে কিছুটা সরে এসে নিজেদের মতন করে ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক- সামাজিক পরিকাঠামোতে এক পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটান। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ভারতীয় জনজীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়কে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের সুবাদে ভারতীয় জনমানষে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং তা রাজনৈতিক, আর্থ -সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রভাব ভারতের প্রশাসনিক অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। ইউরোপীয় শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক -সামাজিক- ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা যুক্ত হয়। বিষয় ইংল্যান্ডের অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শিল্প বিপ্লবের সুবাদে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ইংল্যান্ড জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্বল করে বিভিন্ন দেশের উপর তাদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইংরেজ প্রশাসক এবং ঐতিহাসিকরা প্রথম দিকে ভারতবর্ষের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার ১৮৫৩ সালে ভারতে ইংরেজ শাসনের চরিত্র সম্পর্কে কার্ল মার্কস তাঁর "The British Rule in India "শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন যে,"ইংরেজরা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ কথা ঠিক যে হিন্দুস্তানে ইংরেজরা এক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে এবং তা তারা নিজেরাই জঘন্যতম স্বার্থসিদ্ধির জন্যই মূঢ়ের মত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়, প্রশ্ন হল এই যে এশিয়ার সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া কি মানবজাতি তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে? যদি তা না পারে, ইংরেজদের অপরাধ যতই হোক না কেন, তারাই অজান্তে ইতিহাসে যন্ত্র হিসেবে সেই বিপ্লব সাধন করেছে।"

অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্বে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে সেখানে বৃহদ কলকারখানা সমূহের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষকে নিশ্চিত জায়গা হিসেবে স্থির করা হয়। ভারতীয় উপনিবেশিক শাসনের সুবাদে এদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ক্ষেত্র এবং সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ভারতকে ইংল্যান্ড কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে যেমন ব্যবহার করতে শুরু করে, এদেশে যানবাহন তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়, ফলে প্রথাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়। ভারতবর্ষ তথা ভারতীয়দের জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়, বরং ব্রিটিশ শাসনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বানানোর লক্ষ্যেই অফিস-আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল,কলেজ, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করা হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা যুক্তিবাদ এবং শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার এক সমন্বয় ঘটে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম কেন্দ্রিক স্থবির রীতিনীতির জায়গায় আধুনিক যুক্তিবাদী মননশীলতা, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সার্বিক পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটায়।

মূলত ব্রিটিশ শাসনের সুবাদেই বাংলায় চিন্তা করার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের কয়েকটি প্রেক্ষাপট ছিল। প্রথাগত ধ্যানধারণার সঙ্গে যুক্তিবাদী ও মননশীল চিন্তার ক্রমিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। উনবিংশ শতকে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও কেন্দ্র করে তীব্র বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। একদিকে গোঁড়াপন্থী প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সমর্থকগণ এবং অপরদিকে আধুনিক যুক্তিবাদী মানসিকতা সম্পন্ন সংস্কারবাদীগণ। রাজা রামমোহন রায় ও তার অনুগামীরা যখন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংস্কারের ধারাকে এদেশীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী, এই সময় আবার ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা হিন্দু সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। এসবের পাশাপাশি যখন ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন হিন্দু ধর্মের মূল অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, সেক্ষেত্রে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাকে রক্ষা করেছেন।

সংস্কারের প্রশ্নেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক সমাজের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমিক সম্প্রসারণশীল মানসিকতা এবং অপরদিকে ভারতীয় সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখা,মধ্যে ক্রমিক বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকাশের সুবাদে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় এবং এর ফলে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সমাজে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়,যেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত এই ধরনের বিভেদ সৃষ্টি হয়।কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শিক্ষিতদের মধ্যে কাজ না পাওয়ার জন্য হতাশা সৃষ্টি হয়।

চাকরির ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল, সাদা চামড়ার লোকেরা যেখানে চাকরি লাভ করতেন সেক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি ভারতীয়রা সহজে লাভ করতেন না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ বয়সসীমা এমনভাবে বেঁধে যাওয়া হয়েছিল যা কার্যত ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব বিষয় ছিল। আবার লক্ষ্যনীয় বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার হওয়ায়, তারা স্বদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য অধিক আগ্রহী হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যারা নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ইংরেজ বিরোধিতা ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রটি পাল্টে যায়। এই সময় হতাশাগ্রস্থ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে দীক্ষিত উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী বিদেশী শাসনের অবসান না চাইলেও, তারা তাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং বিদেশি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় ১৮৭০ এর দশকে যখন রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেই সময় থেকেই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তীব্র মানসিকতা পোষণ করতে থাকেন শিক্ষিত সমাজ। উনবিংশ শতকে সংস্কারের এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই একাধিক হাত প্রতিঘাত পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় ধর্ম এবং সামাজিক সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা তর্ক বিতর্কের মাধ্যম হিসেবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়, বাঙালি সত্তাকে এক নতুন পথের সন্ধান প্রদান করেছিল। বাঙালির সংস্কৃতিক সত্তা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং তার বহুমাত্রিকতা এই পর্বে পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের জীবনে সাহিত্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই পর্বে অনেক সময় দেবদেবী মাহাত্মক কীর্তনের মাধ্যমেও বর্ণনা করা হয়েছে, চার সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। নাটক, উপন্যাস কিংবা ছোট গল্প তখনো অনেকাংশ অজ্ঞাত কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সার্বিক বিকাশ এই পর্বে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে উপস্থিত করলেন। অম্লান দত্ত বলেছেন যে, এই সময় বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের সাথে যুক্ত হল।\

Unit: 6

Orthodox Reactions

উনিশ শতকের বাংলায় যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার বিরোধিতার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ছিল। অনেকেই মনে করেন যে বাংলার এই নবজাগরণ অতিমাত্রিক উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু আবার স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, "The greatest gift of the English... is the Renaissance which marked our 19th century. Modern India owes everything to it,...It was truly a renaissance,wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople."

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনে নবজাগরণের প্রভাব সার্বিক অর্থেই পরিলক্ষিত হয়। যেখানে নবজাগরণের প্রবাদপুরুষ হিসেবে রাজা রামমোহন রায় বাংলা তথা ভারতে জাগ্রত কণ্ঠস্বর, এখানে আপাত দৃষ্টিতে এই প্রগতির বহমানতার বিপরীতে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। রাধাকান্ত দেব আধুনিকতা ও রক্ষণশীলতার এক সংমিশ্রণ। তিনি কলকাতার হিন্দু সমাজের অবিসংবাদী নেতা। সংস্কৃত সাহিত্যে তার প্রভাব ও পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। এর সুবাদে তিনি হিন্দু সমাজের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তবে তার চরিত্রে কিছু বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, তিনি ইউরোপীয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এর পাশাপাশি স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারেও তার সমান আগ্রহ ছিল। হিন্দু কলেজ, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, হর্টিকালচারাল সোসাইটি, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন তিনি। এমনকি রামমোহনের সহযোগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সঙ্গে তিনি একযোগে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে "জমিদার সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারি স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে ১৮৫১ সালে হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষিতদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে "British Indian Association"প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রিশ্চান মিশনারীরা যেভাবে ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেছিলেন তার সুবাদে হিন্দু ধর্মের উপর ক্রমাগত আঘাত আসতে থাকে। ধর্মের মৌলিক স্বার্থ ও চিন্তাকে রক্ষা করার জন্য অনেকেই তাকে রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে তিনি ছিলেন হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পুরোধা। হিন্দু ধর্মের সনাতন আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইউরোপীয় যুক্তিবাদের বিরোধিতার পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার রোধ, সহমরণ সমর্থন, আপত্তি প্রভৃতি একাধিক এদেশীয় আচারকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে তিনি রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দেন। তিনি হিন্দু ধর্মের বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের জন্য “পতিতোদ্ধার সভাতে” সভাপতিত্ব করেন।

Unit 7

Young Bengal Movement:
ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট:

রাজা রামমোহন রায় যখন এক দিকে রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার এবং অপরদিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের আক্রমণ থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য তার যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময়ই ডিরোজিওর নেতৃত্বে কিছু আদর্শবাদী যুবক হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উপর পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে এক ধরনের চরমপন্থী মতাদর্শ ও চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে, যা, দারুণ্যের দীপ্ত তেজ এবং ভাবাবেগে প্রথাগত, গোঁড়া হিন্দু ধর্মের ভিত্তির উপর আঘাত সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন ১৯ শতকের বাংলায় বিকাশ লাভ করেছিল এবং তা নব্য বঙ্গ আন্দোলন বা ইয়ং বেঙ্গল

মুভমেন্ট নামে পরিচিত। এই আন্দোলন স্বাধীন মুক্ত চিন্তা এবং যুক্তিবাদী মানসিকতার উপর নির্ভর করে বিকাশ লাভ করেছিল। তবে নব্য বঙ্গ আন্দোলনে যুক্তি অপেক্ষা ভাবের প্রাবল্য এবং আবেগের আধিক্য ছিল। গঠনমূলক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে আন্দোলনকারীরা আগ্রহী হলেও তাঁরা তাঁদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হননি। আন্দোলনকারীদের চিন্তা, আদর্শ ও তাকে বাস্তবায়িত করার মধ্যে যে বিস্তর তফাৎ ছিল, তা আন্দোলনকে সফলতা প্রদান করেনি। অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে তারা জনমানসে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। এঁদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব না থাকলেও, তা যথার্থ পথে পরিচালিত হয়নি, যার ফলে আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। জনগণের সঙ্গে আন্দোলনকারীরা তেমন কোন যোগাযোগ স্থাপন করেনি বরং বিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ এবং কলকাতা কেন্দ্রিক আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই তার আবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অধ্যায় নব্য বঙ্গ আন্দোলন বা ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

নব্যবঙ্গ আন্দোলন বা ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন হেনরি ডিরোজিও(1809-1831)। তিনি 1809 সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 1817 সালে মাত্র 17 বছর বয়সে হিন্দু কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি "To India my Native Land"-নামক একটি কবিতা রচনা করেন। কেবলমাত্র তার জন্মভূমি ভারতবর্ষ সম্পর্কেই নয়, বরং তার মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের সঞ্চার ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বলেছিলেন,"Derozio was not only passionately loved India, also the whole wide world." তাঁর মধ্যে মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটেছিল, বৃহত্তম জনগণকে স্পর্শ করেছিল। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। দাস প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং ১৮২৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তার রচিত "Freedom to the Slave" কবিতার মধ্য দিয়ে তার এই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে ডিরোজিও ও তার অনুগামীদের নব্য বঙ্গ আন্দোলনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা, এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি রেডিক্যাল ছিল। রামমোহন যেখানে একই ঈশ্বরবাদের কথা বলেছেন, সেখানে এরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন।

ডিরোজিও বাল্যকাল থেকেই যুক্তির প্রবল মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন| ড্রামণ্ড নামক এক কোটি শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন| খুব অল্প বয়সেই তিনি কবি ,দার্শনিক চিন্তাশীল যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার দিশারী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পেরেছিলেন| তিনি Kant এর দর্শন সমালোচনা করেন এবং সেক্ষেত্রেও মৌলিকত্বের পরিচয় দেন| অতি অল্প বয়সেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন| ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের প্রগতিশীল চিন্তার দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন| রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছাত্র যুব সম্প্রদায় কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি অচিরেই একজন জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন| হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন| শাস্ত্রী তার "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন-ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু চুম্বকের যেমন লৌহ কে আকর্ষণ করে তেমনি তিনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকর্ষণ করিলেন| এক অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রী এরূপ সম্বন্ধ কেহ কখনো দেখে নাই|"একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিও তার ছাত্রদের মধ্যে উদারনৈতিক চিন্তা, ও যুক্তিবাদের প্রসারের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন| যা শাস্ত্রে লেখা রয়েছে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ না করে বরং বিচারবিশ্লেষণ এর মধ্য দিয়ে তা গ্রহণ করার শিক্ষা তিনি তার ছাত্রদের দিয়েছিলেন| টম পেনের "Age of Reason"তার ছাত্রদের কাছে বাইবেল স্বরূপ ছিল| তোর এন্টালির বাসভবনে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত| ডিরোজিও ও তার অনুগামীদের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায় ও তার অনুগামীদের মত ও পথের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্য থাকলেও তারা রামমোহনের সংস্কারপন্থী পদক্ষেপের সমর্থক ছিলেন| বিশেষ করে রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেছিলেন| ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও তার গৃহে একটি সংগঠন তৈরি করেন, যা একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত| এই সংগঠনে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা হত| সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হত| তাদের প্রধান দাবি ছিল ধর্মীয় গোড়ামী কে আঘাত করা| সুশোভন সরকার বলেছেন, "Academic Association what's the first Student organisation of India, which followed Derozio's dictam that his twin gods where the reason and liberty."

১৮২৯ সালে ডিরোজিওর অনুগামী ছাত্ররা "পার্থেনন" নামক একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন| তবে পরবর্তীকালে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক ওপর একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে| এই সমস্ত পত্রিকাতে নারী

শিক্ষার বিকাশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিচার ক্ষেত্রে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করার কথা তুলে ধরা হয়| তবে সমকালীন রক্ষণশীল সংবাদপত্র যেমন "সমাচার চন্দ্রিকা", "সংবাদ প্রভাকর" প্রভৃতি পত্রিকায় এদের লেখনি ধারার প্রতি বিরূপ মন্তব্য জ্ঞাপন করা হয়| গোঁড়াপন্থীরা এদের চিন্তাকে আক্রমণ করে| অপরদিকে হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী এবং একদল অভিভাবক এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কিন্তু হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও "পার্থেনন" পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়| মাত্র দু বছরের মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ চাপে ডিরোজিও অধ্যাপনার কাছ থেকে অবসর গ্রহণ করেন(1831)| এর কিছুদিন পরই মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি মারা যান| তিনি ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন| গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, "...yet this short period(1826-1831)he lit a flame of quest from truth in the mind of his young students and friends."তাদের এ ধরনের আদর্শবাদী এবং অগ্রণী মানসিকতা বাংলার নবজাগরণের মধ্যে আলাদা মাত্রা সঞ্চার করে| তিনি "ইস্ট ইন্ডিয়া" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং যেখানে তার চিন্তা এবং আদর্শের অভিব্যক্তি ঘটে| শেষ দিন পর্যন্ত ডিরোজিও আপোষ করেন নি| যখন রামমোহনের অনুগামী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তার বাড়িতে দুর্গাপূজা করার আয়োজন করেন তখন তিনি তাঁকে সমালোচনা করেন| তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সামরিক শাসন বলে মনে করতেন| 2 সেপ্টেম্বর 1829 সালে প্রকাশিত তার একটি রচনা থেকে এই ধরনের তথ্য লাভ করা যায়| ডিরোজিওর মধ্যে মানবতাবাদী আদর্শে প্রকৃত জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং তিনি অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আর যুক্তি বদলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন| অরবিন্দ পোদ্দার মনে করেন যে, ডিরোজিওর চিন্তার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের শাশ্বত স্বত্বার যথার্থ বিকাশ হয়েছিল| হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, যিনি সমকালীন হিন্দু কলেজের কর্মচারী ছিলেন, তার লেখা থেকে জানা যায় যে, ডিরোজিও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও কবিতা, সাহিত্য ও নৈতিক দর্শনের যথার্থ বিকাশ ঘটিয়েছিলেন|

ডিরোজিও তার ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদ,নৈতিকতা, নৈতিক আদর্শবোধ, সংস্কারী আর যুক্তিপ্রবণ মানসিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন| তাদের চুল চেনা বিশ্লেষণ আর হিন্দু ধর্মের গোড়া আদর্শের উপর আঘাত অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করেছিল| মাধব চন্দ্র মল্লিক তার কলেজ পত্রিকায় বলেন যে, "যদি আমরা হৃদয় থেকে কোন কিছুকে ঘৃণা করি, তাহলে তা হিন্দু ধর্ম|"আবার রসিক কৃষ্ণ

মল্লিক স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে,"I do not believe in the sacredness of the Ganges."তারা নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র মানসিকতা পোষণ করেন। তাদের আচার আচরণ অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা রেডিক্যাল হয়ে পড়ে। তারা অনেক সময় প্রকাশ্যে পড়িতে ছিঁড়ে ফেলা কিংবা হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে। তবে কেবল সমালোচনা নয়, তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মতবাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে দ্বারা প্রয়াসী হয়েছিলেন। বেন্থাম ও টম পেনের আদর্শ চিন্তা ধারা তাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারা উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী আদর্শের ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অন্যতম অ্যাডাম স্মিথ ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বেকন, হেগেল, হিউম, স্টুয়ার্ট কিংবা ব্রাউনের আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালে রসিক কৃষ্ণ মল্লিক পুলিশের দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক কলের অবস্থার যে অবলম্বন হয়েছিল সে বিষয়ে তারা লেখালেখি শুরু করেন। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের বিরোধিতা করে রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ সালে যে বক্তৃতা প্রদান করেন সেখানে স্বাধীনতাকামী চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। আবার ১৮৪২ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ফ্রান্সের মতো ভারতীয় কারিগরি শিক্ষার সুপারিশ করেন। রাম গোপাল ঘোষ, এই পর্বের একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তিনি 1849 সালে ভারতীয় আইন সংস্কার প্রসঙ্গে জোড়ালো বক্তব্য প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইংরেজদের বিচার বিভাগীয় সংস্কারের দাবি করেন। 1846 খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র রায়দের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা সমালোচনা করে এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা থেকে প্রেরণা লাভ করলেও তারা অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেন। 1833 সালের চাটার আইনের সমালোচনা করে রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ৫ জানুয়ারি ১৮৩৫ জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় বলেন যে,"This Act has been passed not for the good of India, but for the benifit of the bosses of the East India Company."এর সূত্র ধরে ইংল্যান্ড বাসী বিশেষভাবে উপকৃত হবে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৬ বছর বয়সে কৈলাস চন্দ্র দত্ত হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে এ

বিষয়ে তার বক্তব্য প্রকাশ করেন। তার রচনার বিষয় ছিল "India of my dream - 100 years later"। এখানে তিনি 1945 সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাস দিয়েছিলেন। তরুণ ভগৎ সিং পরবর্তী সময়ে এদের আদর্শ এবং চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামতনু লাহিড়ী ও রামগোপাল ঘোষের প্রচেষ্টায় একটি সংগঠন বিকাশ লাভ করে, যা "Society for the Acquisition of General knowledge" নামে পরিচিত। প্রতি বুধবার এবং মাসে একবার সংস্কৃত কলেজে এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। সংগঠন বাংলাকে একটি নতুন সংবাদপত্র উপহার দেয়। রেভারেন্ট কৃষ্ণমোহন মিত্রের সম্পাদনায় "Enquirer"নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণমোহন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রবন্ধে নারীজগতের অধিকার রক্ষার কথা বলেন। ১৮৪১ এর অক্টোবর মাসে কলকাতায় এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশহিতৈষী সভা গঠিত হয়। সরদপ্রসাদ ঘোষ, যিনি ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন, সবাই বক্তৃতা প্রদান করেন এবং যেখানে তিনি রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলার পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনের সুবাদে কিভাবে মানুষ তাদের অধিকার হারিয়েছে সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ১৮৪২ সালে বেঙ্গল নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ হয় এবং ইতিপূর্বে ১৮৪৯ সালে হেয়ারের প্রচেষ্টায় একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

ডিরোজিওপন্থীরা একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীল মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের নীতির বিরুদ্ধেও তীব্র মানসিকতা জ্ঞাপন করে। ১৮৪১ সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি হিন্দু কলেজে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে এবং প্রিন্সিপাল ডি.এল. রিচার্ডসনের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

অপরদিকে রাধানাথ শিকদার ভারতের সমব্যবস্থার উপর একটি গবেষণা চালান এবং তিনি সেখানে দেখান যে ভারতীয় শ্রমিকরা ব্রিটিশ অফিসারদের দ্বারা দৈহিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তিনি এর বিরোধিতা করেন। ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারী শিক্ষার বিকাশ, সমান অধিকার এবং সমাজে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

ডিরোজিও পন্থীরা সংস্কালের বিষয়ে আপসহীন ছিলেন| তাঁরা উদারনৈতিক পথে সংস্কারের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন| রাজা রামমোহনের সংস্কারপন্থী কাজকর্মকে সমর্থন করলেও তাঁরা তাঁকে আধা উদার পন্থী বলে মনে করতেন| কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের মতাদর্শকে কিছুটা বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন| ও ইয়ং বেঙ্গল এর আদর্শগত বেশ কিছু পার্থক্য ছিল| যেখানে রামমোহন হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকেই হিন্দু ধর্মের গোড়ামী দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেখানে পাশ্চাত্যের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত হানাই ছিল ইয়ংবেঙ্গলের প্রধান লক্ষ্য| যদিও লক্ষ্য নিয়ে বিষয় ইয়ং বেঙ্গলের অনেক সদস্যই রামমোহনকে সমালোচনা করলেও তাঁকে তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন| পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের অনেক সদস্যই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন| ইয়ং বেঙ্গল এর সদস্যরা বয়সে তুলুন হওয়ার সুবাদে তাদের মধ্যে রোমান্টিকতা ও কল্পনা আর আবেগের দ্বারা তারা অনেকাংশেই পরিচালিত হয়েছিলেন| তাঁরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন| রাধানাথ শিকদার এ সম্পর্কে বলেছেন যে,"ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হঠাৎ যুবকদের চক্ষু ফুটিয়া ছিল| সুতরাং তাহারা কি করিবেন কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই| ইহা ভিন্ন এত বাড়াবাড়ির প্রকৃত কারণ আর কিছুই নহে|"যুক্তিবাদের দ্বারা নিজেরা পরিচালিত হতে হলে দাবি করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হত| ইয়ং বেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বর্তমান ছিল| যেখানে সমকালীন সমাজের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার সম্প্রদায় রামমোহনের অনুগামী ছিলেন, সেখানে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ডিরোজিওর অনুগামীরা এসেছিলেন| আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের প্রচার করতে গিয়ে সামাজিক বঞ্চনা তাদের সহ্য করতে হলেও অনেক ক্ষেত্রে তারা গৃহ থেকে নিষ্কাশিত হলেও তারা তাদের আন্দোলনে তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেননি|

সুশোভন সরকার বলেছেন যে,"ডিরোজিও পন্থীদের কাজকর্মে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তৎকালীন সমাজ| কিন্তু সুদৃঢ় বুনিয়াদ ও ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন বিশিষ্ট কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি ডিরোজিওপন্থীরা| প্রকৃতপক্ষে তোমরা ছিলেন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন

একটি গোষ্ঠী মাত্র|"বাংলার বুকে ডিরজিয়ানদের এই আন্দোলন তেমনভাবে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি| তাঁদের রেডিক্যাল চিন্তা ধারা বৃহত্তর সমাজের মধ্যে কোন আবেদন রাখতে পারেনি| প্রথম দিকে হিন্দু বিদ্বেষী কথা বললেও পরবর্তীকাল অনেকেই আপোষমুখী হয়ে পড়েন| ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণদাস পাল এঁদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ডিরোজিওপন্থীদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল ছিল না| তিনি আরোও বলেছেন যে, "Young Bengal has done little for his country. He professes to do,but he seldom does anything."১৮০৭ এর দশকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একজন সৎ হিন্দু মতন জীবন যাপন শুরু করেন| প্যারীচাঁদ মিত্রর মতন রেডিক্যাল নেতাও হিন্দু ধর্ম পড়াশোনা শুরু করেন| আবার শিব চন্দ্র দেব জীবনের শেষ দিকে ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হয়েছিলেন| তাঁরা নারী মুক্তি, স্ত্রী শিক্ষা, স্বাধীনতা, শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব রেখেছিলেন| তবে, তাঁরা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত এনে পাশ্চাত্যের বন্ধু অনুকরণ করার ফলে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তুলতে পারেননি| ব্রিটিশ শাসনের ও বিচার ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা| ১৮৩৩ সালের চাটা লাইনের সমালোচনাও তারা করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি দেশীয় ভাষায় শিক্ষা ও দেশীয় ভাষা সাহিত্যের বিকাশের বিষয়ে তারা আগ্রহী ছিলেন| ব্রিটিশ শাসনের অবসান তাঁরা চাননি, কিন্তু সংস্কারের বিষয়ে যথেষ্টই আশাবাদী ছিলেন| বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটিতে রামগোপাল ঘোষ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের কথা বলেছিলেন|

ইয়ং বেঙ্গলের ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাদের পরিকল্পনা ও গঠনমূলক কাজের মানসিকতার অভাব| তাঁরা অনেক সময় ভারতীয় ও হিন্দু ধর্মের নিন্দা করত আবার অনেক সময় ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে অক্ষম হতেন| অমলেশ ত্রিপাঠি মনে করেন যে,"The Young Bengal tried to dethrone the cult of the East to enthrone the cult of the West, without knowing much of the either."জনগণের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন|তাঁদের আদর্শ ও চিন্তাধারা সাধারণ কে

তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। এই আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই কলকাতা কেন্দ্র ছিল। বৃহত্তর বাংলা তথা ভারতীয় মানসিকতার সঙ্গে আন্দোলনকারীরা নিজেদের যুক্ত করতে পারেন নি। এদের মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা আবেগ ও ভাবের প্রাধান্য বেশি ছিল। পরবর্তী সময়ে বয়স বৃদ্ধির ফলে আন্দোলনকারীদের অনেকেই সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতে সচেষ্ট হয়, অনেকেই সরকারি উচ্চ পথ গ্রহণ করেন। হরচন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়া জেলার সদর আমিন পদে নিযুক্ত হন, আবার রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও গোবিন্দ চন্দ্র বসাক দুজনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। রাধানাথ শিকদার সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে নিযুক্ত হন এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাম গোপাল ঘোষ ব্যবসায় যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছিলেন।

ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শ চিন্তা ধারা এবং সমকালীন বাংলায় এর প্রভাব কে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে।। কৃষ্ণদাস পাল একদিকে যেমন এর প্রশংসা করেছেন, তেমনি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দিকেও দৃষ্টি প্রদান করেছেন। সুশোভন সরকার এঁদের উদারনৈতিক পদক্ষেপের প্রশংসা করলেও তাঁদের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেছেন। অধ্যাপক সরকার মনে করেন যে, বাংলার বুকে ডিরোজিওপন্থীরা যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য। নিজের গোষ্ঠীর বাইরে তারা আন্দোলন ও চিন্তার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে অক্ষম হয়েছিলেন। অধ্যাপক সরকার আরো বলেছেন যে, ইয়ং বেঙ্গলের অধিকাংশ সদস্য এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ফলে পরবর্তীতে জীবিকার প্রশ্ন তাদের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। 100 বছর আগে বাংলার মাটিতে পাশ্চাত্য ধাঁচের রেডিকেল রাজনীতির অভ্যুত্থান ঘটানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল এবং ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেকার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা কখনোই সুদৃঢ় বুনিয়াদ খুঁজে পাইনি। অরবিন্দ পোদ্দার মনে করেন যে এঁরা আর্থিক রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী ইয়ং বেঙ্গল এর মধ্যে কোন আদর্শ দেখতে পাননি। সুমিত সরকার মনে করেন এটি প্রগতিশীলতার স্থলে হঠকারিতা সৃষ্টি করেছিল। ডিরোজিও ছাড়াও হিউমের প্রভাব আন্দোলনকারীদের মধ্যে যথেষ্ট যে ছিল, সুমিত সরকার সে বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করেছেন।

সামগ্রিক দিক থেকে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন বাংলার বুকে কোন বিপ্লব নিয়ে আসতে পারেনি। তারা বুদবুদ এর মত উদিত হয় এবং আবার বিনষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে উৎসাহ, সাহস, উদ্দীপনা ও সততার কোন অভাব ছিল না। তারা অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মোহাবিষ্ট ছিল। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর একদল তরুণ যুবকের প্রচেষ্টায় আন্দোলন পরিচালিত হয় কিন্তু অতিমাত্রিক ভাবাবেগ থাকার ফলে আন্দোলন কোন নির্দিষ্ট দিশার লাভ করতে পারেনি। সুমিত সরকার মনে করেন মুসলিম মানুষের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর কোন সার্বজনীন রূপ ছিল না

যাইহোক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলিকে অস্বীকার করা চলে না। গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে আপাত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের এই আন্দোলন প্রগতিশীলতা, সাম্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক ছিল। ডিরোজিওর সময় হিন্দু কলেজ নবজাগরণের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। তিনি আরো মনে করেছেন যে উনিশ শতকের পরিমণ্ডলে সাহসী পদক্ষে গ্রহণ করে আন্দোলনকারীরা সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেই নিরিখে তাঁদের সাহসী পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে।তাঁদের চিন্তা পরবর্তী দূরদর্শক ভারতে আধুনিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। নব্য বঙ্গ আন্দোলন বাংলার তরুণ-যুব সমাজের আত্মশক্তির বিকাশের দিকে প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দু, মুসলি,ম বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সমন্বয়ে যে সম্মিলিত ভারত গঠনের স্বপ্ন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তার প্রেরণা হয়তো তিনি এদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। আপাতত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের বিকাশ ও মধ্যযুগীয় মানসিকতার ফলে আধুনিকতার সঞ্চারণের ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের ভূমিকা অনবদ্য।

Unit 8

Revival of Hinduism:

বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন

বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনের দুটি ধারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রথমটি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বর ূপ ও কিছুটা পাশ্চাত্য প্রভাব ও চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কয়েকজন মহাপুরুষ জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও মহান আদর্শ তুলে ধরা এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা। এঁদের উল্লেখযোগ্য ছিলেন কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন শশধর তর্কচূড়ামণির মতো গোঁড়া ও রক্ষণশীল তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী আবার অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মতন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ ও আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকও ছিলেন। আর অপর ধারা কি প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উদার ,সর্বধর্ম সমন্বয় ও মানবতাবাদী চিন্তাধারার মধ্যে।

বাংলায় হিন্দু নবজাগরণের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন পন্ডিত শশীধর তর্ক চূড়ামণি (১৮৪০-১৯২৩)। তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পক্ষে বক্তব্য রেখে জলমত গঠনে সচেষ্ট হন। হিন্দু ধর্মের প্রথা ও রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনেও তিনি ব্রতী ছিলেন। বক্তা হিসেবে তিনি খুব দক্ষ না হলেও অনেকেই তার বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন, আচার্য যদুনাথ সরকার এমনকি বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির অভিজ্ঞতায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে। জনপ্রিয় বক্তাদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯৩৯) অত্যন্ত কৃতি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার বক্তব্যের সহজ সরল বিশ্লেষণ অনেক সময়ই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের মনও জয় করে নিত। আবার পন্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যাবিদ্যার্ণবের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গভীর স্বাস্থ্য জ্ঞান ও মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটতো।

হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের অবদান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বারবার ভাঙ্গনের একটা কারণ হল হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এর মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও উপনিষদের প্রতি ভক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় আবার তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ রাজনারায়ণ বসু (১৮৪০-৯৬) ও নবগোপাল মিত্র হিন্দু (১৮৪০-৯৬) পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। অনেকেই রাজনারায়ণ বসুকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পথিকৃৎ রূপে চিহ্নিত

করেছেন| তিনি ভারতবর্ষ ও হিন্দু ধর্মের সুমহান ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন| ১৮৭২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন, যা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে|তিনি তাঁর বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের মৌলিক আদর্শকে তুলে ধরেন| হিন্দু ধর্মের সহনশীলতার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দুদের বরংবার আক্রমণ করলেও, হিন্দুরা আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি| "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের উদারতা ও আদর্শকে নিয়ে আলোচনা করেছেন| হিন্দুদের ধর্মের বিষয়ে সত্য এবং অধিকার রক্ষা করা তাদের জাতীয় ভাব ও আদর্শের দ্বারা উদ্ধৃত করা এবং সাধারন হিন্দু জাতির উন্নতি সাধন করা- এই তিনটি আদর্শের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন|

রাজনারায়ণ বসু প্রগতিশীল চিন্তা ও সংস্কারের সমর্থক ছিলেন| তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সফল করার জন্য নিজের ভাই মদনমোহন বসু ও তাঁর আর একজন নিকট আত্মীয়ের বিধবা বিবাহে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন| প্রসার ও জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে তার সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল| তিনি শাশ্বত হিন্দু ধর্মের প্রথা ও রীতিনীতি প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সংস্কারের কথা বলেছিলেন|

নবগোপাল মিত্র হিন্দু ধর্মের পুনরুজীবনে আগ্রহী ছিলেন| ১৮৬৭ সালে তিনি জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৭০ সালে হিন্দু মেলায় রূপান্তরিত হয়| রাজনারায়ণ বসু এই মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন| এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন হিন্দু ধর্মের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং হিন্দু ধর্মের মৌলিক আদর্শকে রক্ষা করা, সকলকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মধ্যে উজ্জীবিত করা| হিন্দু মেলার মাধ্যমে তাঁরা হিন্দুদের এক ছত্রছায়ায় সমবেশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন| ১৮৮১ সালে হিন্দু মেলার অবলুপ্তি ঘটে

হিন্দুধর্মকে স্ব মহিমায় ও সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত এবং প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী লেখক ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়(১৮২৭-৯৪)| হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেবচন্দ্র কিন্তু আজীবন রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন| তিনি পৌরাণিক ধর্মাদর্শে

বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দু সামাজিক প্রথা ও আদর্শ রক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ"ও অন্যান্য তিনি হিন্দু সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আদর্শকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন।

উচ্চশিক্ষিত হয়েও ভূদেবচন্দ্র কিন্তু রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রয়াসকে তাঁর উন্নত চরিত্রের সঙ্গে বেমানান ও "চাঁদের কলঙ্ক" বলে নিন্দা করেছিলেন। তিনি অবশ্য বহুবিবাহ সমর্থন করেননি। তার স্ত্রীর মৃত্যু হলেও তিনি পুনরায় বিয়ে করেননি। তিনি তার ধর্ম জ্ঞানের জন্য ইংরেজদের কাছেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । স্যার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আলফ্রেড ক্রফট তাঁকে "A Hindu of Hindus" বোলে তাঁকে অভিহিত করেছেন।

হিন্দু নবজাগরণের আরেকজন কান্ডারী হলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন(১৮৪৬-১৯০৯)। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক কবি নবীনচন্দ্র উচ্চ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি পশ্চিমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং উদারনৈতিক মানসিকতার আলোকে পূরণের পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি গীতা ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রগুলি তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং কৃষ্ণকে অবলম্বন করে তিনি "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" নামে তিনটি কাব্য রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা নবীনচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে সুকুমার সেন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নবীনচন্দ্র নিচে বঙ্কিম এর কাছে তার ঋণের কথা স্বীকার করেননি।

হিন্দু নবজাগরণে বাংলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব হলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।(১৮৩৮-৯৪)। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে যথেষ্ট ভুল ধারণা রয়েছে। তাঁকে অনেকেই অত্যন্ত ঘোড়া এবং হিন্দু ধর্মের অন্ধ সমর্থক বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী,স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদার মানসিকতার ব্যক্তিত্ব। পাশ্চাত্য শিক্ষার

আলোকেই তিনি হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তার লেখার মধ্য দিয়ে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের যে ধ্বনি বেজেছিল তা, তার বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচায়ক।

তপন রায়চৌধুরীর দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী বহুবিধ আদর্শ ও চিন্তার সমন্বয় ঘটেছিল। একদিকে সংস্কৃত চর্চা, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং হিন্দু ধর্মের মহান আদর্শ নিষ্কাম কর্ম এবং তার পাশাপাশি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।তাঁর বিগত জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিফলন ঘটেছিল। তাঁর কলকাতার বাড়িতে গৃহসজ্জার চিত্রেও পাশ্চাত্যের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি পাশ্চাত্যের অনুকরণের থেকে সরে আসেন এবং তার লেখনীর মধ্য দিয়ে স্বদেশিয়ানা ও হিন্দু ঐতিহ্যের বিষয় প্রস্ফুটিত হতে থাকে। জগৎ সমীক্ষা এবং নতুন নতুন ভাবধারায় যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালি চিন্তাধারাকে নতুন রূপ প্রদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম।তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রগতিশীল সংস্কার সম্পর্কে একাধিক বিষয় পরিস্ফুটিত হতে থাকে। তবে যুক্তিবাদী মন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীধারাকে সর্বদাই প্রভাবিত করেছে। তিনি পাশ্চাত্যের নিরিখে হিন্দু ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেও, হিন্দু ধর্মের মৌলিক সত্তাকে কখনোই পরিত্যাগ করতে পারেননি।

উনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি মানসিকতার পরিস্ফুটন ঘটেছিল। কিন্তু সকলেই তার অনুকরণ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ঐতিহ্য ও সুমহান সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অভিযোগ তোলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোনভাবেই মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না। বরং ভারতের মুসলিম শাসনব্যবস্থার বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়ন তিনি করেছেন। তুই তোর "আনন্দমঠ" উপন্যাসে এক সর্বত্যাগী সন্তান দলের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদের বিবর্তন বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা যায় তার প্রত্যক্ষবাদী বন্ধু যোগেন ঘোষকে লেখা ইংরেজিতে লেখা একগুচ্ছ পত্রের মধ্য দিয়ে। ১৮৮৩ সালে "নবজীবন"পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ শুরু হয় এবং পরের বছর তাঁর সব প্রতিষ্ঠিত নতুন পত্রিকা "প্রচার" - এ "কৃষ্ণ চরিত্র" প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধক উপন্যাস "আনন্দমঠ"পাখি গৃহীত

হয়েছিল পাঠক সমাজের মধ্যে "দেবী চৌধুরানী" -তে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।"Letters on Hinduism"- প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সর্বপেক্ষা ব্যাপ্ত এবং উচিত অর্থে ধর্মই ঐতিহ্য"।তাঁর "মানববৃত্তির উৎকর্ষণের ধর্ম"। তিনি বলেছেন " কালচার" হিন্দু ধর্মের সারাংশ হিন্দুরা ধর্ম শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন।

ধর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যেই ধর্মের মূল তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে। মানুষের উন্নয়ন ও বহুজনহিতায় অবশ্য হিন্দু ধর্মের মৌলিক সত্তা ও মানবতাবাদকে তুলে ধরে। তিনি হিন্দুরীতি অনুযায়ী ভক্তির কথা বলেছেন, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সার্বিক অর্থেই সঁপে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে পুনরুজ্জীবিত করতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াসী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে একমত ছিলেন। ১৮৭২ সালে রাজনারায়ণ বসু "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব" নামক একটি ভাষণ প্রদান করে হিন্দু ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠ, তা তুলে ধরেছিলেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন- "ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর ঈশ্বর, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ-সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম আর কি আছে।"হিন্দু ধর্মের প্রতি বঙ্কিমের এই বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর শেষ দিকের উপন্যাস সীতারামের মধ্যে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু পুনর্জীবনের যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তার প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহনের চিন্তাধারা যেমন সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি, এমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা সমাজের একটি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মের জটিল ও তত্ত্বগত ব্যাখ্যা কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এক্ষেত্রে যিনি ধর্মের জটিল তত্ত্বগুলো সহজ সরল ভাষায় সাধারণের সামনে তুলে ধরলেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।রামকৃষ্ণ এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।। প্রথাগত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা তার ছিল না। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দর্শনের সংস্পর্শে তিনি কোনদিন আসেননি। বুনু স্বতন্ত্র ধর্মমত বা সম্প্রদায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নি বা করতে চান নি। তিনি যা করেছেন তা অতি সাধারণভাবে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন, যা সাধারনকে আকৃষ্ট করেছে। অতি সাধারণভাবেই তিনি হিন্দু ধর্মকে যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনভাবেই খ্রিস্টান কিংবা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের সারবস্তুকে এক অর্থাৎ সকলেই পরমেশ্বরকে লাভ করতে চায়, সে বিষয়টি তিনি তার "যত মত তত পথ"-এর মধ্য দিয়ে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। গান্ধীজী ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন ও তার শিক্ষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ছিলেন, ধর্মীয় গোড়ামী তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মানবতাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই মহান আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

বিভিন্ন মত ও পথের সংঘর্ষে যখন হিন্দু সমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট ও দিশাহারা সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ হিন্দু ধর্মের মধ্যে নতুন প্রাণীর সঞ্চার করেছিল। হিন্দু ধর্মের সমন্বয়বাদী আদর্শ এবং তার সুমহান ঐতিহ্য ও চেতনাকে তিনি যথার্থ অর্থেই তুলে ধরেছিলেন। তার আদর্শ ও চিন্তা তার অনুগামী ও মন্ত্র শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ,স্বামী শিবানন্দ পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত হয়। যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি ব্যতি রেখে এক আদর্শ সমাজ ও দেশ গঠনের দিক নির্দেশ করেছিলেন তিনি।

ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মতাদর্শ ও চিন্তাধারাকে যিনি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন তিনি হলেন তার সুযোগ্য শিষ্য এবং ভারতআত্মা স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২)।পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিতি অর্জন করেন। প্রথমদিকে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং পরবর্তীতে তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল, হিউম,হার্বার্ট স্পেন্সার পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনে যখন যুবক নরেন্দ্রনাথ ক্লান্ত,ঠিক সময়ে

দক্ষিণেশ্বরের মাতৃ মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। উচ্চশিক্ষিত এবং আদর্শবাদী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাবপ্রবন ও সহজ সরল পুরোহিত রামকৃষ্ণের মনের মিল হয়নি। কিন্তু কোন এক জাদুস্পর্শে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। সর্ব ধর্মের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল শ্রী রামকৃষ্ণের হৃদয় ও সত্তা নরেন্দ্রনাথ কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আদর্শকে বিবেকানন্দ নিজের যুক্তি মন দিয়ে বিশ্লেষণ করে জগত সভায় উপস্থিত করলেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে আহত বিশ্বধর্ম মহাসমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সত্তার স্বরূপ তুলে ধরলেন। ভারতের সহনশীল ধর্মীয় সত্তা যা যেকোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির বিরোধী তা মানবিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা এবং আদর্শের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ,সংস্কৃতি ও প্রাব্যতা তেমনি মধ্যযুগীয় ভক্তি মর্গের সাধকদের সমন্বয়বাদী আদর্শবোধ আধুনিক যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। জীব প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেবার বাণী এক নতুন আদর্শবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা পরোক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ, জাতপাতহীন এক আধুনিক ভারত গঠনের প্রয়াসকে সুনির্দিষ্ট গতি প্রদান করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদকেই হিন্দু ধর্মের প্রামাণ্যগ্রন্থ বলে মনে করতেন। বেদান্তের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিভূমিকে আবার উপনিষদের তত্ত্ব তিনি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করেছেন। ভারতের সামাজিক দুরবস্থা, নারী জাতির দুরবস্থা ও শিক্ষার সম্প্রসারণ এর দিকে তিনি দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল তাত্ত্বিক দর্শন এর কথা বলেননি, বরং তিনি তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দিকেও সমান দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। স্বামীজি তার আদর্শ ও চিন্তাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, লক্ষ্য ছিল দেশে-বিদেশে বৈদান্তিক আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদের পাঁচিল ভেঙে ঐক্যের এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবতার সেবা করা। ১৯৯৯ সালে তিনি বেলুড় মঠ স্থাপন করেন।

বিবেকানন্দ তার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীল মানসিকতার মধ্য দিয়ে আমি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। অনেকেই বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপকে ভালো চোখে দেখতেন না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মন্ত্রগুরু শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মানবতাবাদী আদর্শ ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও ধর্মকে এক নতুন পথের সন্ধান প্রদান করেছিল।

উনিশ শতকে ভারতে হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছিল। এই আন্দোলনের স্বরূপকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই একে "Neo-Hinduism" বা "নব্য হিন্দু আন্দোলন" বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার "হিন্দু পুনরুত্থান" কথাটি নিয়ে অনেকের আপত্তি রয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার বিষয়টিকে আগ্রাসী হিন্দু ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন আবার নিশিত রঞ্জন রায় একে নব্য হিন্দু আন্দোলন বলে মেনে নিতে নারাজ। যদিও জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এই আন্দোলনকে "পুনরুত্থানবাদী" ও "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রজনীপান দত্তের দৃষ্টিতে এই আন্দোলন ছিল পিছিয়ে পড়া একটি আন্দোলন।

উনিশ ভারতে হিন্দু ধর্ম যখন চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল, তখন বিভিন্ন বিদগ্ধ মহাপুরুষ হিন্দু ধর্মে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। সেখানে তারা নতুন কোন কথাই বলেননি হয়তো, কিন্তু হিন্দু ধর্মের মহিমা ও তার সর্বজনীন আদর্শবোধ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রয়াস তাঁরা করেছিলেন, তা সমকালীন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে হিন্দু ধর্মের নবজন্ম ঘটে। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি সে বিষয়কে কেন্দ্র করে যথেষ্টই মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক সম্পর্ক এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে আদর্শ বোধ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কোন ভাবেই উনবিংশ শতকের এই আন্দোলন ইসলাম বিরোধী ছিল না, বরং ধর্মীয় সমন্বয়তার মহান আদর্শকে সামনে রেখে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংহতি রক্ষা করে সমাজ ও জনজীবনের

সামগ্রিক উন্নয়ন এর উদ্দেশ্য ছিল। সামগ্রিক বিচারে উনবিংশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী এই আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন:

১) উনিশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

২) নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩) বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে রক্ষণপন্থী নেতা হিসেবে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪) নব্য বঙ্গ আন্দোলন বলতে কী বোঝো? এদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫) হিন্দু উত্থানবাদী আন্দোলনে প্রেক্ষাপট আলোচনা কর এবং এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা কত দূর পর্যন্ত ছিল সে বিষয়ে লেখো।

৬) হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মঠের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*

তপন রায়চৌধুরী, *Europe Reconsidered*

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর*

সুশোভন সরকার, *বাংলার নবজাগরণ*

অমিতাভ ও মুখোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি*

সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ*

নরহরি কবিরাজ, *উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ-তর্ক ও বিতর্ক*

Arabinda Poddar, *Renaissant Bengal Search for Identity*

A.C. Gupta (ed.), *Studies in Bengal Renaissance*

B.B. Majumdar, *History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayanand*

COR-208 : LIFE AND THOUGHT OF BENGAL IN THE 19TH CENTURY

BLOCK 4: DEVELOPMENT OF LITERATURE

UNIT 9: Development of Literature

সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যে কোন সমাজের অগ্রগতির প্রক্রিয়া – তার ঐতিহ্য, সামাজিক আচারের ধারণা করা যায়। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটেন তার ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার করে। যার প্রভাব শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় না বরং সামাজিক বিশেষত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরেছিল। উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের ফলে সামাজিক সংস্কৃতির সাথেই সাহিত্যগত সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। বাংলা ভাষা ও সেই ভাষায় সাহিত্য চর্চার ইতিহাস চর্চাপদের সময়ে থেকেই চিহ্নিত করা যায়। অষ্টাদশ-উনিশ শতকে ভাষাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক সরকার তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক ভাষাকে আত্মস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশীয় চিন্তাবিদরা এই ভাষার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে স্বচেষ্ট হয়েছিল। যার ফলে বাংলা ভাষায় সাহিত্যে চর্চায় বৈচিত্রতা দেখা যায় এই সময় থেকেই। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যই হোক বা মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা উনিশ-বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক অনন্য সময়।

বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ছাপাখানার গুরুত্ব

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রথম আঞ্চলিক ভাষায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এই ছাপাখানার উদ্দেশ ছিল ধর্মপ্রচার। কিন্তু এই ছাপাখানা প্রবর্তনের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাণিজ্যিক কাজেও ছাপাখানাকে ব্যবহার করার প্রবনতা দেখা যায়। যার ফলে পুস্তক বা বই বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ছাপাখানার আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বাংলায় কথকতার জনপ্রিয়তা ছিল। ছাপাখানার

ফলে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে যৌথ ভাবে সাহিত্য পাঠের রীতি খানিক পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তা প্রচলিত ছিল। ছাপাখানা সাহিত্য চর্চার ধারায় এবং বাংলা সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ছাপাখানার পূর্বে কথকতার বা গল্প পাঠের প্রচলন ছিল যেখানে একজন পাঠক তাঁর শ্রোতাদের কোন কাব্য, মহাকাব্য, পুরাণ বা পৌরাণিক কাহিনী পাঠ করে শোনাতেন। কিন্তু ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে ছাপা অক্ষরে বই বা পুস্তকের প্রচলন সমাজের নানাবিধ পরিবর্তন নিয়ে আসে। উনিশ শতকের সাহিত্য পাঠ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে একক ভাবে সাহিত্য উপভোগ করাতে শেখায়। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের অভ্যন্তরেই এক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়ে যারা জমির উপর মালিকানা বা ইউরোপীয় সংস্থার সাথে বাণিজ্যের বা উচ্চপদস্থ চাকরীর ফলেই সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। তাদের কতদূর বুর্জোয়া বলা যায় তাই নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। ছাপাখানা আবির্ভাবের ফলে বইয়ের বাণিজ্যিকরণের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর প্রভাব ছিল। ক্রমেই কথকারদের (যারা কাহিনী পাঠ করে মানুষদের শোনাতেন) পরিবর্তে পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি হতে থাকে। একদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন সাহিত্য চর্চার রীতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তেমনই উত্তর কলকাতার বটতলা সাহিত্যও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যদিও ভদ্রলোক সম্প্রদায় এই ধরনের সাহিত্যের বিরোধিতা করেছিলেন তা সত্ত্বেও বটতলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন ছিল।

বাংলা সাহিত্যের বিষয়ের বৈচিত্রতা

ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা এক জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। শহর কলকাতায় ভিন্নধর্মীয় মানুষের আগমন হয়েছিল উনিশ শতকে, তার ফলে এই শহর সামাজিক ভাবে গতিশীল ও বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছিল তা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র বর্ণনাতে পাওয়া যায়। সাহিত্য চর্চা ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনীর বাইরে গিয়ে সামাজিক ব্যবস্থাকে বিষয় বস্তু করে লেখা হচ্ছিল। উনিশ শতক জুড়ে বাংলা সাহিত্য চর্চা বৈচিত্রতার বৃদ্ধি হয়েছিল। লিটনের কঠোর শাসনের (Vernacular Press Act, 1878) পরেও সাহিত্য চর্চার ধারায় বিস্তার হয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায় । বাংলায় প্রথম চলতি ভাষায় সাহিত্য এটাই ছিল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মূলত

স্থানীয় বা দেশীয় বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ছিল। অনেক সময় ঐতিহাসিক চরিত্রও সাহিত্যের বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছিল, যেমন রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। রাজা প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজা ছিলেন। রামরাম বসুর রচনা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়ে স্থানীয় বা দেশীয় বীর চরিত্রগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনার উদাহরণ এই সময় পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক যুগে বিশেষত উনিশ শতকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে যাদের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল এবং এরা মূলত চাকরীজীবি ও শহর কেন্দ্রিক ছিলেন। উনিশ শতকে শহরে বিশেষত কলকাতায় ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ও সংস্কৃতির মানুষের উপস্থিতির জন্যই সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও বৈচিত্রতা দেখা যায়। সাহিত্যের ভাষাতেও রকমফের ছিল যেমন 'মেয়েলি ভাষা',কথ্য ভাষা বা চলতি ভাষার প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের উপাদানে বহুমাত্রিকতা ছিল। একদিকে যেমন সাহিত্যের ভাষায় পরিবর্তণ দেখা গিয়েছিল তেমনই বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্রতা এসেছিল। উনিশ শতকের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় অলঙ্করণে ঐতিহ্যের ছাপ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে ঔপনিবেশিক শহরের সাধারণ জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে মাইকেল মধুসুধন দত্তের রচনাতে যেমন ছন্দ অলঙ্কারের বৈচিত্রতা দেখা যায় তেমনই বিষয়বস্তুরও। বিশেষত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র প্রধান চরিত্র মেঘনাদ, রাম বা লক্ষ্ণণ নয়। সংস্কৃত কাব্য ধারার থেকে স্বাধীন এক ধারার রচনা সূচনা করেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে ঔপনিবেশিক যুগের প্রেক্ষাপটেই বিবর্তন হয়েছিল। যার ফলে সেই সময়ের সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের – অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঘটনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শহর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রণীর উপস্থিতি ও নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে নারী অবস্থান

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য স্বতন্ত্র ও আধুনিক হয়ে উঠেছিল। এই সাহিত্য চর্চার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিছবি পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ'-এ পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আবার রমেশচন্দ্র দত্তের রচিত 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সময়' (১৮৯৪) গ্রন্থে বিধবা বিবাহ ও

দারিদ্রের জন্য গ্রামের জমি বিক্রি করে শহরে আশ্রয় খোঁজার মত সামাজিক বিষয়ের প্রেক্ষাপটে রচনা করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজের কাঠামোতে যে নতুনত্ব এসেছিল তা তৎকালীন লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। একদিকে চিরাচরিত গ্রামীণ ব্যবস্থার রূপান্তর হচ্ছিল এবং মানুষের শহরমূখী হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে সমাজের নারীর অবস্থা নিয়ে বা নারীর চরিত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য রচনা করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখায় শুধু ঔপনিবেশিক শাসনই নয় বরং সমাজের নারীর চিরন্তন অবস্থার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ১৮৯২ সালে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কঙ্কাবতিতে' গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে শহরকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন এক জায়গা হিসেবে যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে বা রোজগারের সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, পঠনপাঠনের সুব্যবস্থা বা বলা যায় শহুরে সংস্কৃতিকে অনেক বেশি আরামদায়ক বলা হয়েছে। শহরের জীবনযাত্রা সেখানকার আদবকায়দা সবটাই গ্রামীণ সংস্কৃতির থেকে পৃথক ছিল। যদিও অনেক সাহিত্যে শহরের আদব কায়েদাকে নিয়ে ব্যঙ্গও করা হয়েছে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের এবং সামাজিক সংস্কারকদের প্রভাবের ফলে প্রথাগত ভারতীয় সমাজে নানবিধ পরিবর্তণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় নারীদের সামজিক অবস্থান ও শিক্ষার উন্নতি হয়েছিল। এর ফলে সনাতন ভারতীয় সমাজে খানিক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রতিফলন সেই সময়ের সাহিত্যেও দেখা যায়। সত্যচরণ মিত্র তাঁর 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশে' একজন আদর্শ মহিলার রান্নার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু গৃহস্তের বাইরেও যে নারীদেরে উপস্থিতি সেই সময় ছিল তাও সমসাময়িক সাহিত্যের বর্ণনাতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণভবানি দাস একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলা তাঁর স্বামীর সাথে ইংল্যান্ড যান এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা 'ইংল্যান্ডে বঙ্গ মহিলা'–তে ব্যক্ত করেন। তাঁর বর্ণনাতেও নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' বা 'দেবী চৌধুরাণী' বর্ণণাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বা প্রচলিত রীতির বাইরেও নারীর অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় নারীর বিশেষত নিম্নবর্ণের মহিলাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া হলেও সেই মহিলারা স্বাধীন, যুক্তিবাদী ও দৃঢ়চেতা। উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারগুলির ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক অবস্থার

উন্নতি অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ফলে সমসাময়িক কালের সাহিত্যের উপর তার প্রভাব পড়াটা অস্বাভাবিক না।

শিশু সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকে আধুনিক ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্ষাপটেই সাহিত্য চর্চাও পরিণত হয়েছিল। সাহিত্য গুলিতে তৎকালীন শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ভিন্ন শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি উঠে আসে। ঔপনিবেশিক শাসকদের চরিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তুলে ধরা হয়েছিল সাহিত্যের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক যুগে শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে যে রূপকথার বর্ণণা দেওয়া হত তার মাধ্যমেই শিশু মনে উপনিবেশের প্রতি ধারনা তৈরী করার চেষ্টা করা হত। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রভাব সমাজের সমস্ত বয়সের মানুষের উপরই পরেছিল। শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় Maculay Minutes- এর প্রভাব ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা করেছিল। ফলে শিশুদের সাহিত্য বা বলা যায় রূপকথা বা শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি খানিক সচেতন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটি যদিও শিশু সাহিত্যের উদ্যোগ প্রথমে নিয়েছিল। তবে রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদির অবদানও অনুস্বীকার্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 'নীতিকথা' প্রকাশ করেছিল রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকোমল সেনের সহযোগিতায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন 'বালকবন্ধু' নামের পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রমোদচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'শখা' ১৮৮৩ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বালক' পত্রিকা জোড়াসাঁকো থেকে প্রকাশিত হয়ে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বা অক্ষয় কুমার দত্তর 'চারুপথ' শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য' গ্রন্থে ঔপনিবেশিক যুগে ভালো-মন্দ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তৎকালীন শিশু সাহিত্যে উঠে আসে সেই বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। গোপাল-রাখালের চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর ভালো ও মন্দের চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সহজ পাঠ'-এ যে বাল্যকালের সৃষ্টি করেছেন তাতে কোথাও মুক্তির কথা বোঝাতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক যুগে শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের দ্বন্দগুলির কিছু বর্ণণা পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যেই শিশুদের মন, চরিত্র ও মানসিকতা গঠনের প্রচেষ্টা

করা হয়েছিল শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে। যদিও শিশু সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ ঔপনিবেশিক বাংলায় বিংশ শতকেই হয়েছিল বিশেষত্ব উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ও সুকুমার রায়ের রচনার মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির 'টুনটুনির বই' রচনা করেছিলেন তাছাড়াও তাঁর অন্যতম সৃষ্টি ছিল 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'। সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' বা 'আবোলতাবোল'ও জাতীয়াতাবাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই রচনা করা হয়েছিল।রূপকথার মাধ্যমে শিশু মনে সচেতন ভাবেই কিছু ধারণা যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি চেতনা তৈরীর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সমাজের একাংশের মানুষ বিনোদন উপভোগ করতে পারছিলেন আবার অন্যদিকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। শুধু ঔপনিবেশিক শাসনই নয় বরং প্রচলিত যে সামাজিক আচার বিশেষত সমাজের নারীর অবস্থানের ও উন্নতির প্রয়োজনীয়তাও সেই সময়ের সাহিত্যের বর্ণনাতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক বিষয়কে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য রচনা করা হয়েছিল। প্রাক-আধুনিক কালের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা পাশাপাশি ইউরোপীয় সাহিত্যের ও নবজাগরণের প্রভাবের ফলে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য পরিনত হয়ে উঠছিল।

UNIT 10 : Painting in 19th Century Bengal

ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পের পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। উপমাদেশের প্রথম নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশের আগে থেকেই শিল্পে বিশেষত চিত্র শিল্পের উদাহরণ পাওয়া যায়। সময়ের সাথেই চিত্র শিল্পেরও ধারার বিকাশ ঘটেছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে পর্যন্ত উপমহাদেশের বিভিন্ন ধারার চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল-মৃৎপাত্রের উপর চিত্র থেকে গুহা চিত্র, মুঘলদের সময়ে miniature painting বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগেও চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর অভ্যন্তরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই চিত্র শিল্পের উপরও ইউরোপীয় প্রভাব পড়েছিল। উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকে যখন উপমহাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করা হচ্ছিল তখনই চিত্র শিল্পের নানা ধারার ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলো সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়। এই ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে Ananda K. Coomaraswamy , Stella Kramrisch- দের

গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যাওয়ার পর ঔপনিবেশিক যুগের চিত্র শিল্পীদের উপর তার একটা প্রভাব পরেছিল। ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন দেশীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা করা হয়েছিল তেমনই ইউরোপীয় আদোলে প্রতিষ্ঠিত চিত্র শিল্পের স্কুল গুলিও, Government College of Arts and Crafts (১৮৫৪ তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) প্রথাগত চিত্র শিল্পের ধারাকে অবহেলা করেছিল। ১৮৯৬ -১৯০৫ পর্যন্ত Ernest Binfield Havel Government College of Arts and Crafts –এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ থাকাকালীন শিল্প ও কলা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেনে এবং দেশীয় চিত্র শিল্পের ধরাগুলির উপর গুরুত্ব দেন। পরবর্তীতে Percy Brown এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন (১৯০৯-২৭) এবং তিনিও প্রাচীন শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণার মধ্যে ছিল 'Indian architecture (Volume I : Buddhist and Hindu Periods and Volume II : Islamic Period)', 'Indian Painting'। ভারতে বৌদ্ধ স্থাপত্যের বিষয়ও তাঁর গবেষণা প্রসিদ্ধ। Government College of Arts and Crafts –এ Havel-ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে উনিশ শতকের চিত্র শিল্পের এক নতুন অধ্যায় – Bengal School of Art। তবে এই সময়ে বাংলায় যে শুধুই এক ধরনের চিত্র শিল্পের বিকাশ হয়েছিল তা নয়। বাংলার প্রথাগত অন্যান্য অনেক ধারার শিল্পই প্রচলিত ছিল যার মধ্যে পট শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক যুগে এই গ্রামীন শিল্পের সংস্কৃতি বিস্তার ঘটে এবং কলকাতার জনজীবন ও সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়াও উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ছাপাখানার প্রভাবের ফলে বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকার পরিচয় পাওয়া যায় । অনেক সময়েই এই পত্রিকাগুলির প্রচ্ছদে বা উপন্যাসের, গল্পের সাথেও ছবি বা আঁকা ছবি প্রকাশ করা হত। কিছু ক্ষেত্রে কার্টুনের বিশেষত রাজনৈতিক কার্টুনেরও পরিচয় পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা পত্র-পত্রিকায়। উনিশ ও বিংশ শতকে বাংলায় শিল্প বিশেষত চিত্র শিল্পের বিভিন্ন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল শিল্পীর পৃষ্ঠপষোকদের অবদানেরও। শিল্প কলা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নয় যে তার একটা চাহিদা বাজারে সব সময়ে থাকবে। সমাজের কিছু মানুষ কিছু শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলায় ভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষের নান্দনিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধারার চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই বাংলার সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের

ফলে সাংস্কৃতিক জীবনেও খানিক পরিবর্তন এসেছিল। ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই দেশীয় সাহিত্যের যেমন বৈচিত্রতার নজির পাওয়া যায় তেমই চিত্র শিল্পেরও। উনিশ শতকের শেষ দিক এবং বিংশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদের ও স্বদেশী ধারাণা প্রভাবও চিত্র শিল্পে ও শিল্পীদের উপরও পড়েছিল।

Bengal School of Art:

ঔপনিবেশিক যুগে বাংলায় যে চিত্র শিল্পের অধ্যায় শুরু হয়েছিল বিশেষত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা তা ইউরোপীয় চিত্র শিল্পের বিকল্পে দেশীয় চিত্র শিল্পের দর্শন তুলে ধরার জন্য। তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিকরা বিশেষত Coomraswamy মতে ভারতীয় চিত্র শিল্প ও ইউরোপীয় চিত্র শিল্পের মধ্যে মূল পার্থক্য ছিল আধুনিকতা ও বস্তুবাদী ধারণার। ভারতীয় শিল্পের সৃষ্টির সাথে আধ্যাত্মিক যোগ রয়েছে তা প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান বলে এই সময় অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেছেন। ফলে ইউরোপীয় চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে যে চিত্র শিল্পের ধারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছিল তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ধারণার প্রতিফলন থাকাটাই স্বাভাবিক। এই ধারার চিত্র শিল্পের বিকাশ এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন স্বদেশী ও জাতীয়তাবাদের ধারণা সূত্রপাত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই নান্দনিক শিল্পের মাধ্যমে জাতির পরিচিতি গড়ে তোলার একটা প্রবনতা দেখা গিয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বাংলায় প্রথম ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে নয় বরং সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রভাব ফলেছিল। তাই বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইতিহাসকে জেনেছিল তারা নান্দনিক শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমেই নিজেদের জাতির পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। ইউরোপের নবজাগরণের ক্ষেত্রেও শিল্প-কলা ও বিশেষত চিত্র শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের পরবর্তীতে ও বিংশ শতকের গোড়া থেকেই স্বদেশী ভাব ধারার বিকাশের সাথেই চিত্র শিল্পের উপর একটা প্রভাব পরেছিল। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের নির্মান ও পুণঃনির্মান করা হয়েছিল। ভারতীয় উপমাহাদেশের চিত্র শিল্পের যে ঐতিহ্য তা তুলে ধরার প্রয়োজনিয়তা সেই সময় ছিল। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সময় বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের সংস্কৃতি পুনঃনির্মাণ করার চেষ্টা করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে যে চিত্র শিল্পের

ধারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ভারতীয় চিত্র শিল্পের কিছু ধারাকে বা ঘরানাকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিলেও বেশ কিছু ধরণের চিত্র শিল্পের ধারাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের দরবারী শিল্পী থেকে যামিনী রায়ের আধুনিক শিল্প নিয়ে গবেষণা করেছেন। দরবারী ও বাজারের চিত্র শিল্পীরাও প্রন্তিক হয়ে গিয়েছে ক্রমেই এই সময়ে। তার পরিবর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শকদের চাহিদা ও মানসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন ধরনের চিত্র শিল্পের আবির্ভাব হয়ে। এই নতুন ধরনের শিল্পে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাবও দেখা যায়। পৃষ্ঠপোষকতা ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পের বিকাশ হয়ে এসেছে। ঔপনিবেশিক যুগে শহুরে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শন ও জীবন ধারার প্রেক্ষাপটে ও আর্থ-রাজনৈতিক (স্বদেশী) সময়ের চাহিদাতে চিত্র শিল্পের ধারায় পরিবর্তন এসেছিল। প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া চিত্র শিল্পের ধারাকে তুলে ধরারা মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য নির্মাণ ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। উনিশ শতকের ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়ে জাতির পরিচিতি গড়ে তোলাটা আবশ্যিক ছিল। জাতির পরিচিতির ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব রয়েছে। তাই ঐতিহ্য নির্মাণ ও তার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরাটাও প্রয়োজনীয় ছিল। যে কোন সময়ের চিত্র শিল্প সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার চিত্র শিল্পের ধারা তার ব্যতিক্রম না।

বাংলার পটচিত্র

প্রাচীন কাল থেকে শিল্পের বৈচিত্রতা বাংলায় বিদ্যমান। যে সমস্ত চিত্রকলাকে লোকসংস্কৃতি হিসেবে আজ পরিচিত তার মধ্যে অনেক শিল্প কলাই প্রাক্-আধুনিক যুগে প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল পটচিত্র। পটচিত্র দুই ধরনের হয়ে - জোড়ানো পট ও চৌক পট। চিত্রকররা মহাকাব্য বা কোন পৌরাণিক কাহিনীকে বিষয়বস্তু করে পটচিত্র গুলি সৃষ্টি করতেন এবং তা কথা ও গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের দেখাতেন। সাধারণত পটুয়রা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে নিজেদের শিল্পের মাধ্যমে মানুষদের মনোরঞ্জন করতেন। পটুয়াদের মূল উদ্দেশ্য শুধু নিজেদের শিল্পের মাধ্যমে রোজগার করা নয় বরং দর্শকদের আনন্দপ্রদানও করাও ছিল। সাধারণত পটুয়ারা বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করতেন। এই রঙ গুলি তারা নিজেরা তৈরী করতেন - বিভিন্ন গাছের পাতা, ছাল এবং হলুদ বা নীল দিয়ে। পটচিত্রের এই সংস্কৃতি গ্রামীন অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে গ্রামীন শিল্প পটচিত্রের

কিছু পরিবর্তন হয়। উপনিবেশ শুরুর প্রথম পর্যায় থেকেই ইংরেজরা কলকাতাকে তাদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে ছিলেন। যার ফলে কলকাতা এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয় যেখানে বিভিন্ন সমষ্টির মানুষেরা – ইংরেজ, ফরাসি বা দেশীয় অভিজাত ও বণিকদের বসতি গড়ে ওঠে। একদিকে কলকাতা প্রথম ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের জাতীয় পরিচিতি গড়ে তুলতেও চেষ্টা করে। কিন্তু কলকাতা বহুমাত্রিক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষের বসতি গড়ে ওঠার ফলে সেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রতা ছিল। সুমন্ত ব্যানার্জী তাঁর ‘The Parlour and the Streets’ – গ্রন্থে আলোচনা করেছেন কি ভাবে প্রান্তিক ও গ্রামীণ মানুষরা উপার্জন করার জন্য শহর কলকাতায় বসতি গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের সাথেই গ্রামীন সংস্কৃতিরও কলকাতায় আগমন ঘটেছিল। এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদের উপর ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানের যে নেতিবাচক প্রভাব পরেছিল এবং তার সাথেই দেশীয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের যে ভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ করতে থাকেন তাকে বিদ্রুপ করে, ব্যঙ্গ করে ছড়া ও গান রচনা করার প্রচলন ছিল। এই গ্রামীন সমাজের মানুষেরা বৃহত্তর কলকাতায় তাদের নিজেদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। উনিশ শতকের পট শিল্পীরাও কলকাতার কালীঘাটে নিজেদের শিল্পের কেন্দ্র করে নেয়। যেহেতু তাদের শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তুই ছিল পৌরাণিক কাহিনী কেন্দ্রিক তাই কালীঘাট অঞ্চলে পটুয়াদের এক অন্য পরিচিতি প্রদান করেছিল। অনেক সময়ই মন্দিরের দর্শনার্থীরা এই পটচিত্র গুলো স্মারক হিসেবে নিয়ে যেতেন। উনিশ শতকে কালীঘাট পটুয়াদের পেশা ও শিল্পের চরিত্র পরিবর্তণ এসেছিল। পটুয়াদের আর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হত না। তাদের কাজ আর দর্শকদের মনোরঞ্জন করা ছিল না বরং তাদের কাজ ছিল বস্তুগত পটচিত্রকে বিক্রি করা। যার ফলে পটুয়ারা নিজেদের শিল্পে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। তারা পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্র চৌক পটে এঁকে তা বিক্রি করতো। এছাড়াও কলকাতায় পটুয়াদের অনেক সময়ই কাগজের উপর কৃতিম জল রঙ দিয়েও চিত্র করতেন। এতে তাদের পরিশ্রম কম হত। ফলে কম সময়ে অনেক বেশি পটচিত্র প্রস্তুত করতে পারতেন। চিত্র শৈলীর দিক থেকেই পটচিত্রের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শৈলীর প্রভাব পড়েছিল। এছাড়াও পটচিত্রের বিষয় বস্তুতেও কিছু পরিবর্তন আসে। পটুয়ারা অনেক সময়েই প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনা এবং বিদ্রুপ করেও চিত্র তৈরী করতেন। তাঁদের চিত্রের মাধ্যমে শহরের প্রান্তিয় মানুষদের জীবন ও ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা তাদের চিত্রে বাবু

সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যঙ্গ চিত্রের এই ধারা তৎকালীন শহুরে সংস্কৃতির একটা অংশ হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক যুগে যে ভাবে সমাজে মহিলাদের শিক্ষা বিস্তার ও ক্ষমতায়ণ হয়েছিল অনেক সময় তাকেও ব্যঙ্গ করে চিত্র প্রস্তুত করেছে পটুয়ারা। উনিশ শতকে কালীঘাট পটচিত্রের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রতা দেখা গিয়েছিল। পটুয়ারা নিজেদের স্থানকাল অনুসারে শিল্প শৈলী ও ভাবনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। পটুয়ারা অনেক সময় পটচিত্রের মাধ্যমে সামাজিক নৈতিকতাকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকতেন। বলা যেতে পারে শহুরে সংস্কৃতির বিকল্প গ্রামীন সংস্কৃতি ও শিল্পের একটা ধারা ছিল পটচিত্র। উনিশ শতকে কালীঘাটকে কেন্দ্র করে এই শিল্পের ভিন্ন ধরনের বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই কিছু প্রতিকুল পরিস্থিতির সমূখীন হয়েছিল এই শিল্প। যার অন্যতম কারণ ছিল সমাজে বিনোদনের মাধ্যমের পরিবর্তন। ফলে কালীঘাট কেন্দ্রিক পটশিল্পীরা অন্যত্র চলে যান বা পেশার পরিবর্তন করে।

কার্টুন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রকলার একটা ধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল– কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। কার্টুন অত্যন্ত উচ্চমানের চিত্র ধারা যার মাধ্যমে অনির্বচনীয় আনন্দ থাকলেও তার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি অনায়াসে তুলে ধরা যায়। ভারতে কার্টুন চর্চার উপর ইউরোপীয় প্রভাব ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার ও শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরার ক্ষেত্রে কার্টুন চিত্রের বড় ভূমিকা আছে। শুধু যে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়েই কার্টুন তৈরী হয়েছিল তা নয়। তৎকালীন ভারতীয় সমাজেরও নানা ত্রুটি নিয়েও ব্যঙ্গচিত্র সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় । বসন্তক পত্রিকাতেও কার্টুনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরোধিতা করা হত। উনিশ – বিংশ শতকে বাংলায় যে সকল কার্টুনিস্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাছাড়াও সতীশ সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, শঙ্করেরও কার্টুনের জগতে অবদান ছিল অতুলনীয়। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরোধিতা করে কার্টুন সৃষ্টি করেছিলেন তেমনই ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও সমালোচনা করেছেন তাঁর কার্টুনের মাধ্যমে। সাহিত্যের মতই চিত্রকলার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার একটা প্রভাব থাকে। উনিশ শতকের শেষ থেকেই বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরী হতে শুরু করে। বিংশ শতকের শুরুর দিকেই বঙ্গ–

ভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশীর ধারনা তৈরী হয়েছিল বাংলায় তা সেই সময়ের সাহিত্য, চিত্র শিল্পে ও চিত্রকলার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু তার সাথেই বয়কট আন্দোলনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা সৃস্টি হয়েছিল তা নিয়েও গগেনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্টুন সৃস্টি করেছিলেন। রাজনৈতিক কার্টুন ছাড়াও সেই সময়ের সাধারণ মানুষদের সততা-অসততা, যন্ত্রনা দুঃখের বিষয়কে কেন্দ্র করেও কার্টুন সৃস্টি করা হত। বিশেষত সমাজের তথাকথিত প্রভাবশালী মানুষদের ভণ্ডামির ছবিও এঁকেছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমাজের নানাবিধ ঘটনা সম্পর্কে মানুষকে অবগত ও স্বচেতন করার ক্ষেত্রে কার্টুন চিত্রে অবদান আছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। চিত্র শিল্পের বিকাশ সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। ঔপনিবেশিক যুগে চিত্র শিল্পের বৈচিত্রতা বৃদ্ধি হয়েছিল। জাতীয় ঐতিহ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে ও পরিচিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের নজির ছিল। উনিশ শতকে বাংলায় ভিন্ন ধারার চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

UNIT III : Performing Art in 19th Century Bengal

ভারতীয় উপমাহাদেশে শিল্প কলার প্রদর্শনের রীতির সাক্ষ্য প্রচীন যুগ থেকেই পাওয়া যায়। নৃত্য, গান, নাটক, যাত্রা-পালার মত শিল্প যা সাধারণত প্রদর্শন করা হয় তার মাধ্যমে মানুষ যেমন আনন্দ উপভোগ করেন তেমনই সামাজিক আচার রীতিও পরিচয় বহন করে। যে কোন সময়ের সমাজেই ভিন্ন রীতির ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করেন। যাদের বিনোদনের রীতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। অনেক সময়েই এই ভিন্ন সমাজের মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি ফলে সাংস্কৃতিক জগতে সংমিশ্রণ হয়। তার ফলে প্রদর্শনী শিল্পে নাচ, গান ইত্যাদির খানিক পরিবর্তন আসে এবং অনেক সময়ে প্রদর্শনী শিল্পে নতুন ধারারও সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজরা নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের সাথেই উপমহাদেশের সংস্কৃতি উপর তার প্রভাব পড়েছিল। যেহেতু বাংলায় উপমহাদেশে প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই এখানেই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব প্রথম অনুভূত হয়েছিল। যার ফলে এর প্রতিক্রিয়াও বাংলায় শুরু হয়েছিল। উনিশ শতকে নবজাগরনের সময় থেকেই নিজেদের জাতির পরিচিয় নির্মাণ ও পুণঃনির্মানের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। সাহিত্য, চিত্র কলার মতই প্রদর্শনী শিল্পেও বেশ কিছু নতুনত্ব দেখা গিয়েছিল। তবে প্রদর্শনী শিল্পের মধ্যেও কিছু বিভাজন ছিল।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে বিনোনের মাধ্যম। উনিশ শতকের শেষে থেকেই প্রদর্শনী শিল্পের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা হলেও ঔপনিবেশিক সরকার মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহুরে শিল্প যেমন নাটকের উপরই নিরীক্ষণ শুরু করেছিল। কিন্তু ক্রমেই সমস্ত ধরনের প্রদর্শনী শিল্পের উপরই নানা বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে এই প্রদর্শনী শিল্পের মাধ্যমে যে সব সময় ঔপনিবেশিক শাসনেরই বিরোধিতা করা হত তা নয়। অনেক সময় দেশীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুও প্রদর্শীত হত এই শিল্পগুলোর মাধ্যমে। তাছাড়াও যাত্রা হোক বা নাটক ও সঙ্গীত পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয়বস্তু সবসময়েই তাতে প্রধান্য পেয়েছে প্রাক্-আধুনিক কাল থেকেই। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ এবং জাতির পরিচিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের শিল্প কলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু নবজাগরণ মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই অনেক সময়ই গ্রামীণ প্রদর্শনী কলার উপর সে অর্থে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে উনিশ শতকের শেষে বাংলা নাটক বা থিয়েটার অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়াও বিংশ শতকের শুরু থেকে সঙ্গীতও অন্যতম শিল্প মাধ্যম হয়ে ওঠে।

নাটক

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই নাটকের চর্চার ইতিহাস উপমহাদেশে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে নাটকের চর্চার উপর তার প্রভাব পরেছিল। ইউরোপের কিছু ধারা ও শৈলীও দেশীয় নাটকে আত্মস্ত করা হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে উনিশ শতকের বাংলা নাটক পরিনত হয়েছিল। প্রথমিক পর্যায় বাংলায় ভদ্রলোক সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক শাসকদের থেকে সামাজিক স্বীকৃতি বা বৈধতা পাওয়ার জন্য তাদের সংস্কৃতি কিছু ধরণ আত্মস্ত করেছিল। নাটক চর্চা তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বাংলা ভাষার নাটক চর্চা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও বৈচিত্রের পরিচয় দেয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগেও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করা হত। মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক নাটকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন উনিশ শতকে বেশ কিছু নাটক রচনা করেন। তার মধ্যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ‘কুলীন-কুল-সর্বস্ব’ নাটকে তৎকালীন কুলীন সম্প্রদায়ের বহুবিবাহ রীতির বিরুদ্ধে রচনা করেন। ১৮৬০-এ দীনবন্ধু মিত্রের তাঁর বিখ্যাত ‘নাটক নীলদর্পণ’, নীল চাষীদের শোষনের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বিদ্রোহের যে ধারনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্পণাতে ছিল

তা এই নাটকের মাধ্যমে উঠে আসে। মীর মশারাফ হোসেনে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জমিদার দর্পণ' লেখেন যেখানে সাধারণ কৃষকদের জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রহের কথা বলা হয়েছে। ঔপনিবেশিক কালে যে সাধারণ কৃষকরা শুধু ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারাই অত্যাচারিত হতেন তা শুধু নয় স্বদেশীয় জমিদার-জোতদারাও তাদের শোষণ করতো। উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় মৌলিক নাটকের বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। অমৃতলাল বসু তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকের জন্য রসরাজ উপাধি পান। জ্ঞানদানন্দন ও যুবরাজ নাটকটা ইংল্যাণ্ডের যুবরাজকে ব্যারিস্টার জ্ঞনদানন্দনের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর প্রেক্ষিতে লেখা। স্বাভাবিক ভাবেই এই নাটকে সরকারের বন্ধ করে দেয়। ১৮৭৬ সালে সরকার মঞ্চাভিনয়ের জন্য আইনও কার্যকর করে। এই আইনের ফলে রাজনৈতিক নাটক সরাসরি প্রদর্শনের উপর নিষিদ্ধ করা হয়ে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাংলা নাটকের চর্চা থমকে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অন্যমাত্র যুক্ত করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে নাটকের একটা বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে। তাঁর সময় তাই বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নাটক করা হয়েছিল যেমন 'সীতাহরণ' (১৮৮২) 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬) 'নিমাই সন্ন্যাসী' (১৮৯২) 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'অশোক' (১৯১১)। এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও নাট্য জগতে অবদান রয়েছে। বিশেষত তাঁর রচিত নাটক 'রাজা প্রতাপ সিংহের' জন্য। উনিশ শতকে নাটকের এই ধারা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত হয়েছিল। ইউরোপীয় শৈলীর প্রভাব এবং দেশীয় উপাদানের ও ঐতিহ্যর উপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা নাটক আধুনিক ও পরিণত হয়েছিল। শহুরে মধ্যবিত্তের সম্প্রদায়ের কাছে নাটক একটা জনপ্রিয় সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল এই সময় থেকেই।

যাত্র-পালা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই যাত্রাপালা বাংলার গ্রামীন সংস্কৃতি ও বিনোদনের একটা জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। উনিশ শতকে যখন শহরমুখী প্রবনতা দেখা গিয়েছিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জন্য তখন গ্রামীন অনেক সংস্কৃতির মতই যাত্রাপালাও শহর কলকাতায় অন্যতম জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। গ্রামীন সমাজের কোন আচার বা পার্বনের সময় নাচ ও গানের যে ধারা প্রচলিত ছিল তার থেকেই যাত্রাপালা শুরু হয়। যাত্রাপালা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মঞ্চের সব দিকেই দর্শকরা উপস্থিত থাকতে পারেন। নাটকের মতো কোন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে

যাত্রাপালা আয়োজিত হয় না। যাত্রার অভিনয় খানিকটা নাটকিয়তা থাকে। যাত্রাপালায় সঙ্গীত খুবই জনপ্রিয় ও আকর্ষনীয় অঙ্গ। উনিশ শতকে এই শৈলীর শিল্প শহর কলকাতাতেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গোপাল উদয় কলকাতায় যাত্রাপালার সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। উনিশ শতকে সাধারণত রাধা ও কৃষ্ণ, পার্বতী ইত্যাদি ছাড়াও লৌকিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেও যাত্রাপালা প্রদর্শন করা হত। বিংশ শতকের শুরুর দিক থেকে যাত্রাপালার মাধ্যমে স্বদেশী চেতনারও বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যেহেতু যাত্রাপালা খুবই জনপ্রিয় ছিল তাই এর মাধ্যমে তাদের সমসাময়িক কালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্ক সজাগ করার প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়। বলা যেতে পারে যাত্রা একটা বিকল্প শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে। মুকুন্দ দাস, ভূসণ চন্দ্র দাস, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে যাত্রাপালা করেছেন। উনিশ শতকের শেষে বিশেষত বিংশ শতকের শুরু থেকেই পৌরাণিক কাহিনী থেকে পরিবর্তিত হয়ে যাত্রা সমসাময়িক বিষয়কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

সঙ্গীত

বাংলায় সঙ্গীত চর্চার রীতি প্রাক-আধুনিক যুগ থেকেই ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। চর্যাগীতি, কীর্তনের রীতি ঔপনিবেশিক যুগের বহু আগে থকেই বাংলার সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্যান্য শিল্প-কলার মতই সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রেও পৃষ্ঠপোষকতারর প্রয়োজন আছে। ঔপনিবেশিক যুগের আগে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা মূলত করতেন নবাবরা বা জমিদাররা। এছাড়াও সাধারণ মানুষদের মধ্যে জনপ্রিয় সঙ্গীত চর্চার ধারা ছিল-কীর্তন। অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নানবিধ পরিবর্তনের সাথেই সাংস্কৃতিক জগতেও বেশ কিছু নতুনত্ব আসে। মুঘল দরবারে সঙ্গীত চর্চাকে উৎসাহিত করা হত। কিন্তু মুঘলদের ক্ষমতার অবক্ষয়ের সময় থেকেই যখন সেই পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন সাভাবিক ভাবেই সেই সময়ের সঙ্গীতজ্ঞরা অন্যত্র চলে যায়। অষ্টাদশ শতকে বাংলার নবাবরা উৎসাহ প্রদান করেন সেই সময় সঙ্গীত চর্চাকে। ফলে বাংলায় সঙ্গীত চর্চার ঐতিহ্য উনিশ শতকের আগে থেকেই ছিল। ইউরোপীয়দের আগমন ও তাদের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার পর বিশেষ করে বাংলার নবজাগরণের সময় থেকেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে দেশীয় সংস্কৃতির পরিচিতি তৈরীর রীতি শুরু হয়েছিল তা উনিশ শতকে সঙ্গীতের ধারাকে উৎসাহিত করেছিল। এই সময়ে যেহেতু কলকাতায় নতুন একটা

শহর হিসেবে গড়ে উঠছিল এবং ভিন্ন সমাজের মানুষেরা এখানে একভূত হচ্ছিল ফলে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সাক্ষ্য এখানে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী খেয়াল বা টপ্পা গানের জনপ্রিয়তা এই সময় দেখা যায়। নিধুবাবুর টপ্পা সেই সময়ে জনপ্রিয় একটা সঙ্গীতের ধারায় পরিনত হয়ে কলকাতায়। নিধুবাবু ছাড়াও কালী মির্জা, দশরথ রায়, শ্রীধর কাহা, গোপাল উড়ে, মধু কাহা ধ্রুপদী সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধ্রুপদী সঙ্গীত ছাড়াও কবিগান, যাত্রা, নাটক, খেউর, কীর্তন গানও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেহেতু কলকাতা নগরীতে তখন বহুমাত্রিক সমাজ ও শ্রেণীর মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। তাই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীতের ধারার বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। শুধু যে গানের ধারার বৈচিত্রতা এসেছিল উনিশ শতকে বাংলায় তা নয় বরং বাদ্যযন্ত্রেরও নতুনত্ব দেখা যায় যেমন সেতার, সরদ, সারঙ্গী, সানাই। সঙ্গীত চর্চা সেই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এতটাই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে সঙ্গীত চর্চা শিক্ষার একটা অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করা হতো। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজেরাই সঙ্গীত চর্চা করতেন। রামমোহন রায় কালীমির্জার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। উস্তাদ রহিম খানের কাছে বিষ্ণু চক্রবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেখান। উনিশ শতকে বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ প্রভাব পরেছিল। ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত সঙ্গীতের মাধ্যমে আরাধনা করা হত। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায় উভয়ের উপরই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধারার প্রভাব ছিল। বিশেষত ইংলিশ থিয়েটারের ও চার্চের সঙ্গীতের। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের একটা প্রভাব পরেছিল ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রেও। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর একজন পারদর্শী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর উৎসাহে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সঙ্গীত সার' প্রকাশ করেন ১৮৬৯, যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম স্বরলিপি। উনিশ শতকে বাংলায় সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে যেমন নতুনত্ব এসেছিল তেমনই বৈচিত্রতাও। তবে কলকাতা এবং বাংলার সমাজে শুধু ধ্রুপদী সঙ্গীতেরই প্রভাব ছিলনা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাইরেও সাধারণ মানুষেরও তাদের দৈনন্দিন জীবনকে ও সামাজিক ঘটনাগুলোকে কেন্দ্রকরে গান রচনা করতেন। যেমন উনিশ শতকে বাংলায় কবি গানের প্রচলন ছিল। অনেক সময়েই সমসাময়িক অনেক ঘটনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেও গান রচনা করা হত। সাধারণ মানুষরা তাদের সংস্কৃতির ধারা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পথচলতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে এক ধরণের গানের প্রচলন উনিশ শতকে ছিল – খেউর গান। এই গান তাৎখনিক ভাবে রচনা করা হত এবং সেই গানের ভাষাও অনেক সময়ে অপমানজনক হত। তাই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের অনেক সময়েই

এই জাতিয় গানের বিরোধিতা করতেন। তবে কবিগানের ধারা সমাজিক পরিচিতির সাথেও যুক্ত ছিল। অনেক সময়েই কবিগানের গায়করা নিজেদের পেশা ও জাতি বর্ণের পরিচয় সচেতন ভাবেই ব্যবহার করতেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত কবিগানের গায়করা ছিলেন ভোলা ময়েরা, কেষ্ট মুচি, ভবানী বেনে। এই সময়ের সঙ্গীত চর্চা তাই নিত্যান্ত বিনোদনের মাধ্যম ছিল না। প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়াও ছিল।

উনিশ শতকে বাংলায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নতুনত্ব দেখা গিয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে সেই সময়ের সাংস্কৃতিক জগত গড়ে উঠেছিল। নানবিধ রীতির প্রদর্শনী শিল্প, চিত্র শিল্প এবং সাহিত্যের সম্ভার বৃদ্ধি হয়েছিল। এই সমস্ত ধরণের শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কিছু প্রভাব থাকলেও দেশীয় উপাদানের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা তা হল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাইরেও যে সাধারণ মানুষ ছিলেন তারাও নিজেদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী-

সুমিত ঘোষ, ভারতে রাজনৈতিক কার্টুন চর্চা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪।

অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী, সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাংলা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রাখাল দ্বন্দসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, কারিগর, কলকাতা, ২০১৩।

Sudipta Kaviraji, ‘The Two Histories of literary Culture in Bengal’, in Sheldon Pollock, edited, Literary Cultures in History Reconstructions from South Asia, University of California Press, London, 2003.

Block -5

বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার

ইউনিট -১২ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্যোগ

উনবিংশ শতকে ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে যে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার পরিচয় পেয়ে থাকি ,তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা । প্রাক ব্রিটিশ পর্বে বাংলার শিক্ষার অন্যতম স্তম্ভ ছিল গ্রামীণ পাঠশালা, টোল, মক্তব, মাদ্রাসা। ভারতের সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রাথমিক পর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের কোনরকম আগ্রহ দেখায়নি বরং একপ্রকার নিরাপত্তাহীনতা থেকে এ দেশের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কোম্পানি গ্রহণ করেছিল। এর সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও মিশ্রিত ছিল । যার প্রকাশ আমরা পাই ওয়ারেন হেস্টিংস এর প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক নীতির ক্ষেত্রে। এই কারণেই ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা মাদ্রাসা,১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ এবং প্রাচ্য বিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি।। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রকৃতই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং ভারতে নব ভাবধারা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে কোম্পানি আগ্রহী না হলেও ভারতীয় জনগণ কিছুটা বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে আর কিছুটা পশ্চিমী শিক্ষার উদারনৈতিক ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু কোম্পানি কেবলমাত্র ভারতীয়দের আগ্রহের কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা করেনি। তৎকালীন সময়ে এদেশে কোম্পানির কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় , প্রশাসনিক স্বার্থে স্বল্প বেতনে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারী তৈরি করাও ছিল কোম্পানির উদ্দেশ্য। তবে কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তিদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহের বিষয়টি কোনও মতে অগ্রাহ্য করা যায় না।

তবে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার কোন দায়িত্ব কোম্পানি সরাসরি গ্রহণ করে নি। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের কথা প্রথম অনুধাবন করেন চার্লস গ্রান্ট। চার্লস গ্রান্ট ভারতের আধুনিক শিক্ষা ধারার জনক হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন । ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়। এই সনদ আইনে ভারতীয় শিক্ষা খাতে কোম্পানিকে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা খরচ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, এটাই ছিল ভারতে সরকারি ভাবে শিক্ষা বিস্তারে প্রথম পদক্ষেপ। এই প্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহন করে। মূলত ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ দের উৎসাহ দেওয়া দেশীয় সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং ভারত বাসীর মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এই টাকা মঞ্জুর করা হয় । ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় General Committee of Public Instruction । ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । যদিও তৎকালীন সরকার প্রাচ্যবিদ্যার উপর গুরুত্ব হ্রাস করেনি।

পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গভর্নর জেনারেল হিসাবে ভারতের যোগ দিলে। বেন্টিন্ক এর আমলেই টমাস বেবিংটন মেকলে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাক্টসন' র সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন । এই সময় ভারতে প্রাচ্য না প্রতীচ্য কোন রীতিতে শিক্ষাদান করা উচিত সেই বিষয়ে বিতর্ক ও বিবাদ দেখা দেয়। কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন এর সদস্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ১) প্রাচ্যবাদী বা orientalist, যারা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী ছিলেন। এই সকল প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এইচ টি প্রিন্সেপ, কোলব্রুক ,উইলসন প্রমূখ । ২) প্রতীচ্যবাদী বা anglicist, তারা পাশ্চাত্য রীতিতে আগ্রহী ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মেকলে স্বয়ং ,এছাড়া আলেকজান্ডার ডাফ, কেলভিন প্রমুখ।১৯৩৫ সালের ২'রা ফেব্রুয়ারি মেকলে তার বিখ্যাত কার্যবিবরণী বা মিনিট প্রকাশ করেন । এই প্রস্তাবে তিনি গভর্নর জেনারেল বেন্টিং এর কাছে সরাসরি পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। বেন্টিং ১৯৩৫ সালের ৭ই মার্চ একটি সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে মেকলের প্রস্তাবগুলিকে অনুমোদন করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মার্চের শিক্ষা নীতিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয় এখন থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্যই সরকারি অর্থ ব্যয় করা হবে । মেকলে-র উদ্দেশ্য ছিল সেই রকম ভারতবাসী তৈরি করা যারা কেবলমাত্র রক্ত ও গাত্রবর্ণ ছাড়া রুচি ,আদর্শ,নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে হবে খাঁটি ইউরোপীয়। প্রাচ্যবাদীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নেকলে তার অবস্থান থেকে এক বিন্দুও সরে আসেননি। নতুন এই ইংরেজি শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষাকে উপর থেকে চুইয়ে নিচের দিকে বয়ে যেতে দেওয়া। ইংরেজি শিক্ষা ভারতের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত হলে তা ক্রমশ সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এই ছিল মেকলের বিশ্বাস।ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের দায়িত্বেই অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষার বিকাশ ঘটাবে।   মেকলের পরিকল্পিত এই নীতি downward filtration theory বা ক্রমোনিম্ন পরিশ্রুত নীতি নামে পরিচিত। তবে মাতৃ ভাষা স্থানে বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠায় সর্ব সাধারণের কাছে শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে গেল । এবং ভারতীয় ভাষা সমূহ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর হয়ে পড়লো । তবে মেকলে মিনিটের ফল স্বরূপ ১৯৩৫ সালে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ , ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮৩৫ সালেই সরকারী উদ্যোগে মোট ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় ।

১৯৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এর এডুকেশনাল ডেসপ্যাচে বলা হল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । এই সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় কাউন্সিল অফ এডুকেশনের হাতে। ফলে ইংরেজি স্কুল এবং স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরনের   সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একটি এডুকেশনাল ডেসপ্যাচ বা শিক্ষার দলিল প্রকাশিত   হয় । কোম্পানির পরিচালন সমিতির সভাপতি চার্লস উডের পরামর্শ অনুযায়ী এই শিক্ষার দলিল টি প্রকাশিত হয়েছিল বলে একে উডের ডেসপ্যাচ বলা হয়ে থাকে যা Educational Despatch of 1854 নামেও পরিচিত। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে উডের ডেসপ্যাচ কে ম্যাগনাকার্টা র সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। মুলত এই নির্দেশ নামা অনুসারে আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। উডের ডেসপ্যাচে   মেকলের মতো প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি

বিরূপ মনোভাব পোষণ না করলেও পাশ্চাত্য জ্ঞানের দিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা কে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়। লর্ড মেকলের ফিল্ট্রেসন থিয়োরি পরিত্যক্ত হয় । শিক্ষাকে সরকারের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য রুপে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই ডেসপ্যাচ অনুসারে বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ , উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এই পাঁচটি স্থানে একটি করে পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয় , যার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন জনশিক্ষা আধিকারিক বা ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন (ডি পি আই) । তার অধীনে থাকবে যথেষ্ট স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক। অন্নান্য নির্দেশাবলীর মধ্যে ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা , শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা , বৃত্তিমূলক শিক্ষা , মুসলিম শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটানো , 'গ্রান্ট ইন এইড' প্রথা চালু করে বেসরকারি স্কুল গুলিকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া , কোলকাতা ,বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রভুতি । এই নীতির উপর ভিত্তি করে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা , বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯ সালে ১১ জন ছাত্রীকে নিয়ে গড়ে ওঠে ক্যাল কাটা ফিমেল স্কুল । ১৮৫৫ সালের মধ্যে মাত্র চারটি জেলায় ২০ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ সালের মধ্যে অনেক ইংরেজি ও দেশীয় স্কুল সরকারী অনুমোদন লাভ করে। শিক্ষক – শিক্ষন , বৃত্তি মূলক শিক্ষন ও নারী শিক্ষার সুপারিশের মাধ্যমে এই নির্দেশ নামা যুগের দাবিকে মর্যাদা দেয় যা ছিল উডের ডেসপ্যাচ এর অন্যতম সাফল্য ।

ঔপনিবেশিক সরকারের ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার নীতি এক নবযুগের সূচনা করলেও সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই শিক্ষার সুযোগ সুবিধা নিতে পেরেছিল। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল । ফিল্ট্রেশন থিওরি বাস্তবে সফল হয়নি । মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহ দেখায় নি। নারী শিক্ষা বিস্তারেও কোম্পানির শিক্ষা নীতি খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি । তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত একদল মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল শিক্ষিত প্রজন্ম সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতীয়তাবাদ , গণতন্ত্র , স্বাধীনতা , মানবতাবাদ প্রভৃতি ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়। যুক্তিবাদের প্রসার ঘটে। কোম্পানি আমলে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ভারতবর্ষে যে এক নবযুগের সূচনা করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং তৎকালীন ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক , প্রশাসনিক , শিক্ষা – সংস্কৃতি সব কিছুই ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে এলেও ভারত বর্ষের শিক্ষা নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি । শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়। পরবর্তী শিক্ষা নীতি ব্রিটিশ রাজের হাত ধরেই পরিচালিত হয়।

ইউনিট -১৩: বেসরকারি জনহিতকর উদ্যোগ

বেসরকারি শিক্ষা প্রচেষ্টা শুরু হয় মূলত তিন ধরনের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে। (ক) প্রাথমিক পর্বে খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে কাজ শুরু করেন (খ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্যোগী হন (গ) কতিপয় দেশীয় ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষা প্রসারের ব্রতী হন।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারীদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শুরু হয় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের আদি পর্ব । ইংরেজ মিশনারীরা মূলত: ইউরোপীয় শিক্ষা ধর্মাচরণ ও ধর্মান্তরিতকরণের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে মিশনারিরা ভারতের নানা অঞ্চলে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন।

বাংলায় ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কারণ এই সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি অফিস, বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকরি লাভের আশায় এবং জ্ঞানান্বেষণের প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। এই চাহিদা পূরণ করার জন্য শোরবার্ন, মার্টিন, বাউল, আরর্টুন পিত্রাস , ডেভিড ড্রামন্ড' এর ন্যায় কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষাব্রতী কোলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার স্কুল খোলেন।

বাংলার মিশনারীদের অগ্রপথিক ছিলেন দিনেমার মিশনারি পাদ্রী কিয়ারন্যান্ডার। উইলিয়াম কেরি ছিলেন তার অনুগামী। উইলিয়াম কেরি মালদায় প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরির সাথে যোগ দেন মার্শ ম্যান,ওয়ার্ড ও কয়েকজন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অসহযোগিতার কারণে কোলকাতার বদলে শ্রীরামপুরের দিনেমার উপনিবেশে গড়ে তোলেন ব্যাপ্টিস্ট মিশন (১৮০০)। ভারতে শিক্ষা বিস্তারের কাজে উইলিয়াম কেরি ,মার্শ ম্যান ও ওয়ার্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য ।এই তিন মিশনারী একত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে পরিচিত। তাদের উদ্যোগে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে যশোরে চারটি, দিনাজপুরে একটি এবং কাটোয়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্য লর্ড ওয়েলেসলি শ্রীরামপুর মিশনারীদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটি কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ব্যাপটিস্ট মিশনই প্রথম এদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া তারা ছাপাখানাও খুলেছিলেন। তাদের উদ্যোগেই বাংলা বই এবং বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে । এদের মধ্যে অন্যতম ‘সমাচার দর্পণ’ ও ‘দিগদর্শন’ পত্রিকা। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর উদ্যোগে কোলকাতার চারপাশে কুড়িটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় একশোর বেশি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হলেও অচিরেই তা পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় ।

অন্যান্য যে মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ও চার্চ মিশনারি সোসাইটি। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির মিশন প্রথম গড়ে তোলেন ‘রেভারেন্ট নাথানিয়েল ফর সাইথ’। এটি চুঁচুড়ায় গড়ে তোলা হয় । কোলকাতার ভবানীপুর, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেও গড়ে তোলা হয় তাদের মিশন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটি মোট ৩৬ টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বাংলায় চার্চ সোসাইটির কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় ১৮০৭ সালে। তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল কোলকাতার মির্জাপুরে। বর্ধমান, নদীয়া, খুলনা জেলায় তাদের উদ্যোগে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বাইরেও তারা

অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। স্কটল্যান্ডের মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফের উদ্যোগে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন', বর্তমানে তা স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত। বেলজিয়াম থেকে আগত জেসুইট মিশনারিরা গড়ে তোলেন 'সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ' এবং 'লোরেটো হাউজ কলেজ'।

ভারতের শিক্ষা বিস্তারে মিশনারিরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এতে সন্দেহ নেই, তবে প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু জনহিতৈষী ব্যক্তিগত স্তরেও শিক্ষার বিকাশে উদ্যোগী হন। তৎকালীন চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু স্কুল খোলা হয়। জোড়াসাঁকোতে শেরবার্ন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। ডেভিড ড্রামন্ড গড়ে তোলেন ধর্মতলা একাডেমি ।তবে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ডেভিড হেয়ার। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার গড়ে তোলেন পটলডাঙ্গা একাডেমি যা পরবর্তীকালে হেয়ার স্কুল নামে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ডেভিড হেয়ার। বর্তমানে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য ১৮১৭ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'স্কুলবুক সোসাইটি' ।১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির' সম্পাদক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্কুল স্থাপন করা। ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজেরও সম্পাদকও ছিলেন তিনি। নারী শিক্ষা বিস্তারেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তবে আধুনিক নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন বেথুন সাহেব। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন বেথুন স্কুল। বেথুন স্কুল গড়ে ওঠার পিছনে তিনজন বাঙালি ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার ।দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্কুলবাড়ীর উপযুক্ত জায়গা সহ দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। রামগোপাল ঘোষ বেথুন সাহেব কে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি ছাত্রী সংগ্রহের কাজ করেন। এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার যিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর পাশাপাশি নিজের দুই কন্যাকেও বেথুন স্কুলে ভর্তি করেন ।

ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে যে সকল বাঙালি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা অনস্বীকার্য । রামমোহন বুঝেছিলেন আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারায় ভারতবাসী প্রকৃত উন্নতি সম্ভব । এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অনেকে স্বীকার করে থাকেন । স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে রামমোহন হিন্দু শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন স্ত্রী শিক্ষা ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির বাইরে নয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এর পরিচালনায় হাই ইংলিশ স্কুল নামে একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন নবভারতের অগ্রদূত।

রাধাকান্ত দেব ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে রক্ষণশীল মানসিকতার হলেও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না । স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন । ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেব নিজের বাড়িতেই মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের

কৃতিত্ব রাধাকান্ত দেবের। তিনি ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ , ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’ , ‘এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া’ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি বহু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। বর্ণপরিচয় তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া তিনিই মোট ১৭ টি সংস্কৃত বই, ৪ টি ইংরেজি বই ও ৩২ টি বাংলা বই লেখেন। বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী জোগাড় করেন। মূলত তার উদ্যোগেই বেথুন স্কুল নারী শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডের উৎসাহে বিদ্যাসাগর হুগলি জেলায় ২৩ টি, বর্ধমান ১১ টি, মেদিনীপুরে ৩ টি এবং নদীয়া জেলায় ১ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তার উদ্যোগে এই সকল জেলাতে একটি করে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৫ সালে শিক্ষক - শিক্ষণের জন্য স্থাপিত হয় একটি নর্মাল স্কুল। তার অপর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ‘মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত ।

এছাড়াও অক্ষয় কুমার দত্ত ,দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার , ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমূখ মহান ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় গতি আসে। এইভাবে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি হয় । যাদের অনেকেই নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেন।

ইউনিট -১৪ঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন

রেনেসাঁ পরবর্তী ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছিল, তার প্রভাব ভারতবর্ষে আসে মূলতঃ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে । যদিও ভারতবর্ষে সনাতন পদ্ধতিতে বিজ্ঞান চর্চা ব্রিটিশ শাসনের আগেও ছিল । তবে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলেই। ঔপনিবেশিক আমলে কোম্পানি ভূতাত্ত্বিক বিদ্যা ,উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তা আর্থিক ও সামরিক সমৃদ্ধির আশায়। এবং মুলত ব্রিটিশদের লাভের উদ্দেশ্যে।

প্রাক ব্রিটিশ আমলে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বলে কিছু ছিল না। উইলিয়াম জোনস বিষয়টি প্রথম উপলব্ধি করেন এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন করেন। তৎকালীন সময়ে এটি বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এবং ১৮২৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ‘ফিজিক্যাল ক্লাস’ নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির ধারাবাহিক বক্তৃতা শুরু হয়। যদিও তা বেশিদিন চলেনি।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ অনুসারে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্মেষের বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয় ,যদিও বিষয়টি ফলপ্রসু হয়নি। ১৮৩৫ সালের মেকলে মিনিটেও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি, কেবলমাত্র মেকলের বিজ্ঞানের প্রতি ব্যক্তিগত অনীহা থাকায়। কোম্পানির রাজত্বে বিজ্ঞান শিক্ষা তখনও সেভাবে স্থান পায়নি । এরই মধ্যে উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ,বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি গড়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' । ভারতের আধুনিক জরিপের জনক ছিলেন জেমস রেনেল। দীর্ঘ সমীক্ষার পর ১৭৮১ তে প্রকাশিত হয় তার 'বেঙ্গল এটলাস' এবং ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে 'ম্যাপ অফ হিন্দুস্তান'।

ভূগোলবিদ উইলিয়াম ল্যাম্পটন এর নেতৃত্বে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' । এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি কাজ ছিল হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ গুলির উচ্চতা নির্ণয় করা। এই সংস্থায় যুক্ত থেকেই মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা মাপেন রাধানাথ শিকদার।
ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যার উপর প্রথম কাজ শুরু করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রবার্ট ফিডের উদ্যোগে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ার শিবপুরে গড়ে ওঠে 'ক্যালকাটা বোটানিক্যাল গার্ডেন'। কেবলমাত্র উদ্ভিদবিদ্যা চর্চা কে জনপ্রিয় করা নয়, উদ্ভিদ ব্যবসা থেকে আর্থিক লাভ করা, কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ানো সর্বোপরি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ভিনদেশী উদ্ভিদকে ভারতের মাটিতে প্রতিস্থাপন করে আর্থিক উন্নতির দিকটিও নিশ্চিত করা ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য । তবে উদ্ভিদবিদ্যাচর্চা শুধু কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনেই হয়নি ,১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সাহারানপুরের সিভিল সার্জন ডক্টর জর্জ গোভান সাহারানপুরেই একটি উদ্ভিদ উদ্যান গড়ে তোলেন। ১৮৭৮ সালে ডি ব্র্যান্ডিস দেরাদুনে একটি সেন্ট্রাল ফরেস্ট স্কুল স্থাপন করেন । ১৯০৬ সালে স্কুলটিকে কলেজে পরিবর্তন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট ইনস্টিটিউট'।

১৮৭৬ সালে সৈদাপেটে বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই একই বছর বিহারের পাটনা কলেজের অনুষঙ্গ হিসাবে আরো একটি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার কলেজ স্থাপিত হয় । তবে তা প্রয়োজনের থেকে খুবই কম । বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগিক কৃষিবিদ্যায় উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা নিয়োগ করা হয়নি। তাই ভারতীয়দের কৃষিবিদ্যার গুনমান একই রকম পর্যায়ে থেকে গিয়েছিল।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ নাথানিয়েল ওয়ালেচ এশিয়াটিক সোসাইটি তে একটি জাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তারই প্রস্তাব অনুসারে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির মধ্যে জাদুঘর স্থাপন করা হয়। নাথানিয়েল ওয়ালেচ ছিলেন তাঁর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। ১৮৬৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আলাদা করে ভারতীয় জাদুঘর গড়ে তোলা হয়।

কোম্পানির কর্মচারীদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় প্রথম হসপিটাল তৈরি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়' দ্য স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস' যা সমগ্র ভারতে সরকার কর্তৃক স্থাপিত প্রথম চিকিৎসা স্কুল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য স্কুল অফ নেটিভ ডক্টরস' কে অবলুপ্তি ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ ভূপ্রকৃতি গবেষণা ও তার প্রসারের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ডঃ ভয়সি র উদ্যোগে গঠিত হয় 'ফিজিক্যাল কমিটি অফ দ্য এশিয়াটিক কমিটি'। তিনি ভারতীয় ভূতত্ত্বের জনক হিসেবে পরিচিত। তৎকালীন সময়ে ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব ঘটে যাওয়ার ফলে কয়লার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। কয়লা ছাড়া রেল ইঞ্জিন ও স্টিমারসহ বাষ্পচালিত কোন যন্ত্রই এক মুহূর্ত সচল রাখা সম্ভব ছিল না। তাই কয়লা খনি অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দিয়ে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি গঠন করে 'কমিটি ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন অব দ্য কোল এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস অফ ইন্ডিয়া' । ১৮৫১

খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ১৮৫২ সালে ওল্ড হ্যাম ভারতে ভূতত্ত্ব জরিপ অধিদপ্তরে প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন এবং সংস্থাটিকে সুদূর ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ হল কলকাতায় সংস্থার সদর দপ্তর স্থাপন ,একটি জাদুঘর ও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। ওল্ড হ্যামের নেতৃত্বে বহু বিজ্ঞানী ভারতের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সমূহের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন। ১৮৬১ সালে গড়ে ওঠে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সুশিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গঠনে উৎসাহ দেয়া হবে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূবিদ্যার অধ্যাপকের পদ তৈরি হয় । শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে খনিবিদ্যারও একটি বিভাগ খোলা হয়।

পশু চিকিৎসা ভারতবর্ষে শুরু করার দুটি কারণ ছিল । প্রথমত কৃষি নির্ভর অর্থনীতির অন্যতম অঙ্গ ছিল গবাদি পশু। দ্বিতীয়ত সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় ছিল ঘোড়ার । এই দুই কারণে ১৮৮০ র দশকে পুনার বিজ্ঞান কলেজে পশু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বোম্বাই শহরে ইংরেজি মাধ্যমে এবং ইউরোপীয় প্রথায় পশু চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। একইভাবে কলকাতাতেও একটি পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

এছাড়া ভারতবর্ষের প্রথম মান মন্দির গড়ে তোলা হয় কলকাতায় ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রাণিবিদ্যার চর্চার জন্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ১৯৪৫ সালে নৃতত্ত্ববিদ্যা চর্চার জন্য গড়ে তোলা হয় 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ভারতে প্লেগ কলেরা সহ অন্যান্য ক্রান্তীয় রোগব্যাধির সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন'।

বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কার্জনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল অনস্বীকার্য । তিনি ১৯০২ সালে 'বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক এডভাইস' প্রতিষ্ঠা করেন, যার কাজ ছিল ভারতের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন আসে। 'বোর্ড অফ সাইন্টিফিক এডভাইস' র অবলুপ্তি ঘটানো হয়। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস' (১৯১৪),'ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স'(১৯৩৪) ,'কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' (১৯৪২)।

এই সকল সংস্থার মাধ্যমে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং ভারতীয় গবেষক ও বিজ্ঞানীরাও যুক্ত হয়ে পড়েন। যদিও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে এটি সহজ কাজ ছিল না। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বো প্রমথনাথ বসু, মেঘনাথ সাহ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, রামানুজম সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা।

মহেন্দ্রলাল সরকার ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তার হলেও তার একান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালে গড়ে ওঠে একটি দেশীয় বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'। নোবেল জয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী সি ভি রমন গবেষণা করেছিলেন এখানে ।

রসায়নবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠে বেঙ্গল কেমিকাল যা ১৯০১ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক লিমিটেড' কোম্পানিতে পরিণত হয়। এছাড়া তিনি ছিলেন মারকিউরাস নাইট্রাইট এর আবিষ্কর্তা। বাণিজ্যের সাথে বিজ্ঞানের সফল যোগ সূত্র ঘটিয়েছিলেন তিনি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কালাজ্বরের প্রতিষেধক বানিয়ে বিশেষভাবে পরিচিত হন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

'বসু বিজ্ঞান মন্দির' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু। তাকে কর্মক্ষেত্রে বারবার জাতি বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু একমাত্র অধ্যাবসায় তাকে বিজয়ী করেছে। তিনি আবিষ্কার করেন crescograph, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় গাছের প্রাণ আছে। এছাড়া তার অন্যতম আবিষ্কার বেতারে সংবাদ পাঠানোর যন্ত্র। যদিও সেই স্বীকৃতি সেই মুহূর্তেই মার্কনী কে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বাঙালি হিসেবে 'রয়াল সোসাইটি'র ফেলো নির্বাচিত হন।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকেও প্রভাবিত করেন। বোস সংখ্যায়ন পদ্ধতি যা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কার তা আইনস্টাইন তার গবেষণায় প্রকাশ করেন। গড়ে ওঠে বোস আইনস্টাইন সংখ্যায়ন। বাংলা মাধ্যমে যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তা দেখিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু । ১৯৪৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'।

সি ভি রমন কলকাতার 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কালটিভেসন অফ সায়েন্স' এর গবেষণাগারে গবেষণা করে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন 'রমন এফেক্ট'। যার ফলে তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পান। যা কেবল ভারতবর্ষে নয় এশিয়ার দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন।

মেঘনাথ সাহা কেবল নিরলস বিজ্ঞান সাধনায় করেননি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেন। ১৯৩৫ সালে গড়ে তোলেন 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন' , ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্স' , ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি', ১৯৪৭ সালে গড়ে তোলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মীদের সংগঠন 'এসোসিয়েশন অফ সাইন্টিফিক ওয়ার্কার'।

ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান চর্চার যে ধারার সূচনা হয়েছিল বিদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে, ভারতীয়দের উদ্যম ও নিরলস প্রচেষ্টায় তা বিশ্বজনীন চরিত্র লাভ করে। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের এই বিকাশ পরিপূর্ণ হয়।

শিক্ষার্থী দের সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

1.সুমিত সরকার/ আধুনিক ভারত ১৮৮৫ – ১৯৪৭/ কে.পি বাগচি এন্ড কোম্পানি /কলকাতা
2. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় /পলাশী থেকে পার্টিশন/ ওরিয়েন্টাল লংম্যান
3.ভক্তি ভুষণ ভক্তা ও চন্দন ভক্তা /ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা/ অ-আ-ক-খ প্রকাশনী
4.দীপক কুমার/ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞান/সুজন পাবলিকাশনস
5.সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত রাজবংশী/ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান:সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/সেতু প্রকাশনী
6.অরুণ ঘোষ/আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস/এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স
7.বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত ,দেবিকা গুহ/ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস /প্রগতিশীল প্রকাশক
8.শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ /আধুনিক ভারত: রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

Block 6 : Women in 19th Century Bengal

Unit 15 : Status and Condition of Women

এই অধ্যায় পাঠ করে জানা যাবে উনিশ শতকের বাংলার সমাজে মহিলাদের স্থান

সতীদাহ প্রথা

বৈধব্য জীবন

কৌলীন্য প্রথা

বাল্য বিবাহ

বাবুদের ব্যভিচার

<u>উনিশ শতকের বাংলায় মহিলাদের স্থান</u>

উনিশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশের সমাজে, অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ শক্তির অভিঘাত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারত সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করত তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জনজীবনে নিজেদের কর্তৃত্বকে স্থায়ী করা। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই তারা ব্রিটিশ আদলে ভারতীয় সমাজের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হয়। অন্যদিকে এই নতুন চিন্তাধারা ভারতীয় বিশেষত বাংলার শিক্ষিত, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্য দার্শনিক ভাবনার আলোকে তাঁরা তাঁদের শিক্ষা, পারিবারিক কাঠামো, জীবনচর্যা, সামাজিক অনুভূতিকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ সভ্যতা এক আদর্শ প্রগতিশীল ব্যবস্থা রূপে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে যে পশ্চিমি আদলের সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাতে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একাংশ সামিল হয়ে পড়ে।

বাঙালী সমাজে পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল মেয়েরা। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে বাংলাদেশের অনেকেই তৎকালীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। বাঙালি সমাজের প্রতি দৃষ্টি পড়ার পর থেকেই যা নজরে এসেছিল, তা হল সমাজে মেয়েদের অবহেলিত স্থান। ঊনবিংশ শতকের সূচনাতেই যে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার অবনমন ঘটেছিল এমন নয়। বহুদিন ধরেই সমাজের মেয়েদের স্থান বিশেষ সম্মানের ছিল না।

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকেই দেখিয়েছেন যে বেদ উপনিষদের যুগে মহিলাদের কতখানি শ্রদ্ধা করা হত, কিন্তু বাস্তব জীবনের মেয়েদের অবস্থার যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় না যে প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশের প্রতি সমাজ খুব শ্রদ্ধাশীল ছিল, আদর্শ গৃহ জীবনের ব্যাখ্যায় মনুসংহতিায় এমন কথাও ব্যক্ত হয়েছিল যে, যে পরিবারে মহিলারা সম্মানিত হন, সেখানে দেবতা প্রসন্ন থাকেন আর যেখানে মহিলাদের সম্মান নেই সেখানে যাগাদি ক্রিয়াকর্ম সমস্তই ব্যর্থ হয়। অথচ মনু নারী জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে ‘বিবাহিতা নারীর নিত্যধর্ম’

বিষয়ে আলোচনার সময়ে মনু স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মেয়েদের দিন-রাত্রির মধ্যে কখনই স্বাধীন থাকতে দেওয়া যায় না। জীবনে পরমার্থ লাভের পথে যে দুটি প্রধান বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য হত, তার একটি কাঞ্চন (যা পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তির প্রতীক) ও অপরটি হল কামিনী (ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতীক)। পুরুষের ব্রহ্মচর্য, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জন ও মোক্ষ লাভের পথে নারী সংসর্গকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা হত। এটা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও, সাধারণ মানুষের জীবনের লক্ষ্য হিসেবেও কাম শূন্যতার আদর্শের ওপর জোর দেওয়া হত। এমনকি তন্ত্রেও নারীর প্রয়োজন পুরুষের মুক্তির জন্য। পুরুষরা ধর্মের আড়ালে যুগ যুগ ধরে নারীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে।

মধ্যযুগের সমাজে বাংলাদেশে স্থায়ী মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর হিন্দুরা মেয়েদের অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দী করে রেখে তাদের শুচিতা রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিল। এছাড়া বাল্যবিবাহ, সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক নিয়ম-নীতির ফলে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা খুব একটা ঈর্ষণীয় ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙালি সমাজে মেয়েদের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছিল। একদিকে বহুবিবাহ, আচার অনুষ্ঠানের যেরকম বৃদ্ধি হচ্ছিল, সেরকম অবহেলিত হচ্ছিল নারীর মর্যাদা। মধ্যযুগে মেয়েদের অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দী করে রাখার যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল তা উনবিংশ শতাব্দীতেও বজায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথাকে বলা হত 'অবরোধ প্রথা'। অভিজাত ও বিত্তশালী ঘরের মেয়েদের প্রায় অসূর্যম্পশ্যা হয়ে জীবন কাটাতে হত। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই 'অবরোধ প্রথা' এত বহুল প্রচলিত ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল যে কেউ এই প্রথা না মানলে তার চূড়ান্ত অসম্মান হত।

পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি পরিবারে পুরুষের কথাই ছিল শেষ কথা। মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য সমাজে ছিল না। স্ত্রীর মর্যাদা ছিল স্বামীর অনেক নিচে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে লেখা চার্লস গ্রান্টের রচনায় পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল তা ফুটে উঠেছে। গ্রান্টের মতে বাঙালি সমাজে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল প্রভু ভৃত্যের মতো। স্ত্রী ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বামী ও তার পরিবারের অধীন। পাশ্চাত্যের ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা বিদেশিদের কাছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর এই সর্বময় কর্তৃত্ব খুবই বিসদৃশ বোধ হয়েছিল।

বিদেশি ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে যে সব বাঙালি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকে বুঝতে উৎসাহী হয়েছিলেন তাদের অনেকের মধ্যেও মেয়েদের পরাধীনতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতনতার উন্মেষ হচ্ছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যে মেয়েরা প্রধানতঃ হল রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা। রামমোহন বলেছিলেন যে বিবাহের সময় পুরুষরা স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বললেও, ব্যবহারের সময় পশুর চেয়েও অধম ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বামীর ঘরে প্রত্যেক স্ত্রীকে দাস্যবৃত্তি করতে হয়।

সতীদাহ প্রথা

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় সামাজিক কুপ্রথাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সতীদাহ বা মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর সহমরণের প্রথা। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল এটি। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যেও সহমরণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্য সহ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সতীদাহ প্রথা নিয়ে বিশদ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজদের ভারতবর্ষে আসার পর। ক্রফোর্ড উল্লেখ করেছেন যে সতীদাহ ভারতের সব প্রদেশেই প্রচিলত ছিল। ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের লোকদের এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করা হলেও এর সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাঁর মনে হয়েছিল সহমরণ হিন্দুদের মধ্যে এক সার্বজনীন প্রথায় পরিণত হয়েছে। এই প্রথা প্রথমে উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে তা ছড়িয়ে পড়ে নিম্নশ্রেণির মধ্যে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও শহরের ম্যাজিস্ট্রেটরা যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, শুঁড়ি, গোয়ালা, মালি, মুচি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সতীদাহের প্রচলন ছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভের আশায় বিধবাদের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা তাদের 'সতী' হওয়ার জন্য প্ররোচিত করত। বিধবাকে বাড়ির অন্যান্য লোকেরা বোঝা মনে করত। দরকার হলে গোটা গ্রামসুদ্ধ সবাই বিধবাকে জোর করে নদীর ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে মৃত স্বামীর চিতায় তুলে দিত। তাদের বাধা দিয়ে কোন লাভ হত না। অনেক সময় বাধা পেলে তারা লুকিয়ে এক জায়গা থেকে চলে গিয়ে আরেক জায়গায় সতীদাহের ঘটনা ঘটাত।

সতীদাহের ঘটনা ঘটাতে আত্মীয় পরিজনদের যেমন উৎসাহ ছিল তেমনি উৎসাহ ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের। উভয়ের স্বার্থই ছিল একসূত্রে বাঁধা - সেটি হল আর্থিক সুবিধা। অর্থপ্রাপ্তির লোভেই তারা বিধবাদের সহমরণের মাধ্যমে পূণ্যার্জনের জন্য উৎসাহিত করতেন। বহু ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রাও বিধবাকে 'সতী' হতে উৎসাহিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের উৎকোচ দিত। ইংরেজ কর্মচারী ওয়াল্টার ইউয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে মেয়েদের মধ্যে স্বেচ্ছায় 'সতী'

হওয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম। ঐ তীব্র মানসিক বিপর্যয়ের পর অর্থলোভী আত্মীয় ও ব্রাহ্মণদের চাপের মধ্যেও তারা অনেক সময় সহমরণে মত দিতে বাধ্য হত।

অষ্টাদশ শতকের বা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সহমরণের কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব আমাদের কাছে নেই। কারণ, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের আগে সতীদাহের কোন নিয়মিত পরিসংখ্যান রাখা হত না। যা হয়েছিল তা প্রক্ষিপ্ত কিছু সমীক্ষা। যেমন ১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল যে কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে ছয় মাসে সতীদাহের সংখ্যা ছিল ২৭৫। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮১৫, ১৮১৬ ও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিভাগে সহমরণের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫৩, ২৮৯ ও ৪৪১। পরের বছর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৪৪। কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে সমস্যাটির গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝা যায় না। যে বিধবারা সহমৃতা হত, তাদের মধ্যে বৃদ্ধার সংখ্যা ছিল কম, মধযবয়সী বিধবারাই সতী হত বেশি।

সতীদাহের আরও একটি বৃহত্তর সামাজিক দিক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার ফলে একজন কুলীন বা বহুবিবাহকারী পুরুষের মৃত্যু হলে প্রায়শই অনেক স্ত্রী একসঙ্গে বিধবা হত। তাই যে সব পরিবারে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেখানে একটি মাত্র পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী 'সতী' হত। উইলিয়াম ওয়ার্ডের লেখা থেকে জানা যায় যে একশোটিরও বেশি বিবাহকারী পুরুষ অনন্তরামের চিতা তিনদিন ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল – প্রথমদিন তিনজন, পরের দিন পনেরো জন ও শেষদিন উনিশজন স্ত্রী 'সতী' হয়েছিলেন। এই প্রথা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত থাকলেও কলিকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সতীদাহ ঘটত বেশি। সতীদাহ প্রসঙ্গে মার্শম্যানের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মার্শম্যান লক্ষ করেছিলেন যে তিনি বাংলাদেশে যখন প্রথম এসেছিলেন (১৭৯৯), তার তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সতীদাহের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্শম্যানের মতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলি বিলাসিতা ও ইউরোপীয় আদবকায়দা অনুসরণ করতে গিয়ে অপরিমিত অর্থব্যয়ের ফলে দরিদ্র হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ব্যয় সংকোচের জন্য তারা মা বা অন্যান্য বিধবা আত্মীয়দের ভরণপোষণের দায় থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়ে বিধবাদের 'সতী' হতে উৎসাহিত করত। তাঁর মতে সতীদাহের অপর একটি প্রধান কারণ ছিল স্ত্রীর ওপর স্বামীর স্বত্ত্ব বজায় রাখার বাসনা।

গোটা সমস্যাটির একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রামমোহনের বক্তব্যে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়েছিলেন যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ বা পরকালে অক্ষয় সুখশান্তির প্রতিশ্রুতি, এ দুটোর কোনোটাই মেয়েদের সহমৃতা হতে চাওয়ার পুরো কারণ নয়। তাঁর মতে, বিধবাদের দুঃখ কষ্ট ও প্রাত্যহিক অপমান দেখে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের নিজেদের জীবনের ওপর আসক্তি হারিয়ে ফেলত। পার্থিব জীবনের প্রতি ওই ঔদাসীন্য এবং 'সতী' হলে ভবিষ্যৎ জীবনের শান্তির সম্ভাবনা, এই দুইয়ের সম্মেলনেই মেয়েরা সহমৃতা হতে চাইত। তার ওপর মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। ক্রফোর্ড বলেছিলেন যে যদি কোন বিবাহিত পুরুষ অপুত্রক অবস্থায় মারা যেত, তাহলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার দত্তক পুত্র, আর যদি কোন দত্তক পুত্র না থাকত তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পেত তার নিকটতম আত্মীয় এবং সেই আত্মীয়কে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের পোলন করতে হত। ক্রফোর্ডের এই মত অবশ্য সর্বাংশে ঠিক নয়। বলা যায়, মেয়েদের উত্তরাধিকারের ওপর অনেক বিধিনিষেধ ছিল। রামমোহন রায়ের মতে এই বিধিনিষেধগুলি পুরুষদের বহুবিবাহ করতে উৎসাহ দিত। এর ফলে বহুবিবাহকারী পুরুষের স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য তাদের নিজেদের আত্মীয়দের ওপর নির্ভর করতে হত (কারণ, বহুবিবাহকারী পুরুষের স্ত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পৈত্রিক বাড়িতেই থাকত)। রামমোহন রায় দেখিয়েছিলেন যে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর মৃত্যুর পর সাধারণতঃ বিধবা স্ত্রীর কাছে তিনটি পথ খোলা থাকত : ১) আত্মীয়দের বাড়িতে থেকে দাসীর মত জীবনযাপন করা, ২) আত্মনির্ভর ও স্বাধীন হওয়ার বাসনায় ধর্মচ্যুত হওয়া, কিংবা ৩) প্রতিবেশীদের প্রশংসা ও সম্মান মাথায় নিয়ে স্বামীর চিতায় 'সতী' হওয়া।

বৈধব্য জীবন

সতী না হলে বৈধব্য জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। এর প্রধান কারণ ছিল হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস বলা ভালো কুসংস্কার। চার্লস গ্রান্টের লেখা (১৭৯২) থেকে জানা যায় যে হিন্দুরা মনে করত মেয়েরা বিধবা হয় তাদের গত জন্মের পাপের ফলে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মেয়েদের দিয়ে বর্তমান জন্মে কঠোর কৃচ্ছসাধন করানো হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষের এই বিশ্বাস বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে উনবিংশ শতকেও প্রচলিত ছিল। পূর্বজন্মের পাপের দায়ভাগ বহনের হাত থেকে মেয়েদের কখনই নিস্তার নেই। সেই বিধবাদের বিয়ে দিলেও তারা আবার বিধবা হবে মাঝখান থেকে নিরপরাধ কয়েকটি

পুরুষের প্রাণ যাবে। এই কারণেই মূলত হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রতি বিরোধিতা ছিল প্রবল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের ওপর একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ত্রিশজন পণ্ডিত বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। যদিও বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটি সংখ্যায় প্রচুর বিক্রি হত কিন্তু পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ নিয়ে বাঙালি সমাজে বিরোধিতার প্রচণ্ডতা দেখে মনে হয় যে এই বিপুল সংখ্যক ক্রেতারা বিধবাবিবাহের সমর্থক হিসেবে নয় বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের কারণেই বিদ্যাসাগরের বইটি কিনেছিলেন। বিধবাবিবাহের বিরোধী রচনাগুলির মধ্যে এই বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার প্রয়াস যেমন পাওয়া যায়, সেরকম বিধবাদের চরিত্র বিষয়েও সন্দিগ্ধ মন্তব্য করা হত। এই মন্তব্যগুলিতে প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনই পাওয়া যায়। বেথুন সোসাইটি আয়োজিত এক সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে বিধবাদের অবস্থা বর্ণনা করে হরচন্দ্র দত্ত মন্তব্য করেছিলেন যে বৈধব্যদশা সহানুভূতি বা অনুকম্পার বদলে মেয়েদের জীবনে ডেকে আনে অবহেলা, তিরস্কার, নিন্দামন্দ ও অসম্মান।

বৈধব্যজীবনের কঠোরতার কিছু ছবি পাওয়া যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত **'Reformer'** পত্রিকার কিছু লেখা থেকে৷ স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের পুনর্বিবাহের বয়স থাকলেও তাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত৷ তাদের জীবনযাপনও ছিল অত্যন্ত কঠোর৷ মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন তাদের অনাহারে থাকতে হত৷ সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে তারা মাত্র একবার ভাত পেত৷ বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরেও যে ছবিটা খুব একটা পাল্টায় নি তার প্রমাণ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে লেখা খ্রিস্টধর্ম প্রচারক জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলীর লেখা৷ হিন্দুদের সামাজিক জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে বিধবাদের অপরিসীম কষ্টের কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি৷ তিনি লিখেছেন 'তেরো চোদ্দ বছরের বিধবাদের কষ্ট হতাশা কে দেখতে পারে – গ্রীষ্মকালে যখন পুকুরের জল শুকিয়ে যায়, গাছের লতা ঝলসে যায় তখন কুসংস্কারের বলে এই মেয়েরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হাঁফাতে থাকে, অজ্ঞান হয়ে যায়৷' সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এক বিধবা কন্যার মাতা ছন্দোবদ্ধভাবে এই একই বর্ণনা দিয়েছিলেন :

কেমনে হেরিব আমি এ চাঁদ বদন৷

শুকায়ে হয়েছে যেন কালীর বরণ৷৷

অবলা বধিতে হেন সংহার তামসী৷

কে সৃজিল বল পাপ একাদশী৷৷

....

না গেল গলের অর্দ্ধে বিন্দুমাত্র বারি৷

এ সব যাতনা আর দেখিতে না পারি৷

চলিবার শক্তি নাই মুখে নাই রব৷

জিয়ন্তে হয়েছে বাছা শ্মশানের শব৷৷

মেয়ের এই সহ্যাতীত দুঃখ দেখলে অসহায় মায়ের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল শাস্ত্রকর্তা ও শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া পুরুষ জাতির ওপর৷এর ওপর ছিল বিধবাদের প্রতি পারিবারিক অবহেলা৷ রেভারেন্ড কে. এম. ব্যানার্জি মন্তব্য করেছিলেন যে অল্পবয়সী বিধবাদের যদি সম্পত্তি না থাকে তাহলে বাড়িতে তাকে দাসীর মত থাকতে হয়৷ বিধবাদের প্রতি মনোভাব উনিশ শতকেও খুব একটা পাল্টায় নি৷ বিধবাদের পারিবারিক মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন 'স্বামীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা ভার্য্যা নিরাশ হইয়া পড়ে৷ ভর্তার ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি যাহারা চিরকালই

তাহার বিদ্বেষিণী, তাহারা তখন অবসর পাইয়া মনোভিলাষ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাকে সাতিশয় শ্রমসাধ্য কঠিন কঠিন গৃহকর্মে নিযুক্ত করে, এবং সামান্য সামান্য বিবাদসূত্র উপলক্ষ করিয়া নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন কে বা তাহার বাষ্পাকুল লোচনের অশ্রুবারি মোচন করিবার চেষ্টা পাইবে? ….কোন বিধবা স্ত্রী আপন গৃহে এইরূপ অশেষ বিধি, ক্লেশ স্বীকার করিয়া দাসীভাবে জীবন নিঃশেষিত করে'

বিধবাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করারও ফন্দি বের করেছিল সমাজ। তাকে অসতী বলে প্রমাণ করতে আত্মীয় স্বজনেরা আইন আদালত পর্যন্ত যেত। পণ্ডিতরা অনেক সময়ই লোকাচারকে শাস্ত্রীয় বিধান বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল। উনিশ শতকের রক্ষণশীলরা সমাজে পুরুষতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে কখনও শাস্ত্র আবার কখনও লোকাচারাকে আশ্রয় করেছেন। বিধবা বিবাহের পক্ষে সমর্থন রাখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যখন শাস্ত্রের বচন তুলে ধরেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন লোকাচারের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রকে পাশে ঠেলে দেন।

কৌলীন্য প্রথা

উনিশ শতকে বাংলার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের এক ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত কৌলীন্য প্রথা, যা পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার উৎস। মনুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণি নির্দেশক কোনো উপাধির উল্লেখ চোখে পড়ে না। তবে, কিছু ব্রাহ্মণ তাদের মার্জিত আচরণ ও অর্জিত গুণাবলীর জন্য সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমীহ লাভ করতেন। বাকিরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন নিকৃষ্ট রুচি ও পল্লবগ্রাহিতার জন্য। এই পৃথকীকরণ সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণিকরণের পথ প্রশস্ত করেছিল। যার পরিণামে কৌলীন্য প্রথা।

কুলীন ব্রাহ্মণদের কুল রক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তাদের নির্মম করে তুলেছিল কন্যা সন্তানদের প্রতি। জনাই-এর রাধারচরণ মুখোপাধ্যায় নিচু ঘরে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার সংকল্প করেন। তিনটি মেয়ে বয়স ১৫, ১৭ এবং ২০। কুলীনের মেয়ে অকুলীন পাত্রে পাত্রস্থ করা যায় না। হঠাৎ খবর পেলেন, বকসা গ্রামের কুলীন বৃদ্ধ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় গঙ্গাতীরের মুমূর্ষু অবস্থায় তিনদিন ধরে পড়ে আছেন গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায়। তখনও প্রাণ আছে। রাধাচরণের স্ত্রীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মেয়ে তিনটিকেই সেই মরণমুখী বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করলেন। দুদিন পরে বৃদ্ধের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটলে রাধাচরণ তিনটি মেয়ের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে সাদা থান পরিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। সগর্বে ঘোষণা করলেন, 'ফাঁকি দিয়ে এক ঢিলে তিন পাখি মেরেছেন।' গল্পটি উনিশ শতকের মেয়েদের সামাজিক অবস্থার একটি জ্বলন্ত সাক্ষী।

কখনও কখনও কুলীন পাত্রের অভাবে কুলীন ঘরের মেয়েদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যেত। কখনও অবিবাহিতা থাকত সারাজীবন। এমন ঘটনারও উল্লেখ আছে – কোনো এক কুলীন কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর আত্মীয়রা অনেক চেষ্টা করে এক বৃদ্ধ কুলীন পাত্র জোগাড় করেন। কন্যার বয়স ত্রিশ। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই বৃদ্ধ পাত্রকে বিয়ে করতে সম্মত হল না। আত্মীয়রা চাপ সৃষ্টি করলে সে তাদের বলল, 'তোমরা বলপূর্বক আমাকে একাদশী ব্রত গ্রহণ করাইও না, আমি এই অবস্থাতেই থাকিব, আর তোমরা নিতান্তই যদ্যাপি আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা কর, তবে উহার পুত্রের সহিত বিবাহ দাও।' সেই পুত্রের বয়স মাত্র বারো বছর। আত্মীয়রা সেই বালকের সঙ্গে ত্রিশ বছরের কুলীন কন্যার বিয়ে দিয়েছিল। হিন্দু বিয়েতে বর কন্যার পাণিগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিপরীতটা ঘটল। **O' Malley** যশোর **District Gazetter** –এ এমন ঘটনার সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন, 'Little boys sometimes marry aged women'. 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদককে এক যুবতী চিঠি লেখেন শেরপুরের এক ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়েছে। 'পাত্রটি দুগ্ধপোষ্য, বিবাহ হইলে তাহার মতন ২/১টি পুত্র প্রসব করিতাম। যাহা হ্উক ক্রোড়ে লইয়া নাচাইতে পারিব।' সমাজের প্রতি কী ভীষণ রকম ক্ষোভ মিশ্রিত শ্লেষ প্রকাশ পেয়েছে যুবতীটির। কুলীন ঘরের এই প্রথাই বহুবিবাহের উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কুলীনদের মধ্যে নৈকষ্য কুলীনের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। কুলীনরা তাদের চেয়ে নিচুস্তরে বিয়ে করতে পারত কিন্তু কন্যার বিয়ে দিতে পারত না। তাতে কুলভঙ্গ হত। নিজেদের কুলে কন্যার বিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় এবং কুলীন পাত্রের অভাবে কুলীন পুরুষের বহুবিবাহ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এখানেই ছিল কৌলীন্য প্রথার গলদ এবং বহুবিবাহের উৎপত্তির জমিও তৈরি হয়েছিল এই প্রথার কঠোর নিয়মে।

উনিশ শতকের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক সংকটও বহুবিবাহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল কুলীনদের। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্তদের সামনে জীবিকা অর্জনের দুটি পথ খোলা ছিল, চাকরি অথবা জমি বন্দোবস্ত থেকে আয়। চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেত ইংরেজি শিক্ষিতরা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গোঁড়ামির কারণে, সুযোগের অভাবে এবং অনীহার জন্য শিক্ষার বিস্তার তেমন ঘটেনি। ওদিকে জমি থেকে আয় হ্রাস পেয়েছিল, কারণ পরিবার যত বড়ো হচ্ছিল জমি ততই খণ্ড

খণ্ড হচ্ছিল। এই অবস্থায় অশিক্ষিত কুলীনরা সমাজে বহু বিবাহের স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা অর্জনের একটি পথ খুঁজে পেয়েছিল। আঠারো শতকে ইউরোপের অভিজাতদের মতো কুলীন ব্রাহ্মণদের সংস্কার ছিল, কোনো রকম অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত থাকা ছিল তাদের পক্ষে অসম্মানজনক ব্যাপার। সুতরাং কৌলীন্যকে মুলধন করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিবাহ ব্যবসায়। ১৮৭৬-এ অভয়চরণ ঢাকা ইনস্টিটিউটে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতে বলেন, 'আমি এমন দুজন কুলীনের কথা জানি যাদের একজনের বিবাহের সংখ্যা ছিল ষাট, অপর জনের একশ।' প্রত্যেকের কাছে একটা খাতা ছিল। তাতে শ্বশুরদের নাম-ধাম লেখা থাকত। শীত আসন্ন হলেই সেই খাতা বগলে করে বেরিয়ে পড়ত বৈবাহিক ভ্রমণে। প্রত্যেক শ্বশুরবাড়িতে আবির্ভূত হয়ে ভিজিট সংগ্রহ করার পর গ্রীষ্মের শুরুতে ফিরে আসত নিজের গ্রামে। শ্বশুরবাড়ি থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে বছরের বাকি কটা মাস চলে যেত আয়েস করে।

বহুপত্নীক কুলীন কোনো কারণে অথর্ব হয়ে পড়লে সমস্যা দেখা দিত। এমনও হত বিয়ের পর জামাতা কখনও শ্বশুরবাড়ি যায়নি। শ্বশুরবাড়ির লোক এমনকি নিজের স্ত্রীও তাকে ভুলে গেছে। এখন সে অথর্ব অথচ পঙ্গু কুলীন অর্থের জন্য নিজের প্রতিভূ করে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতেন তাঁর কোনো শূদ্র ভৃত্য। এতে প্রভু ভৃত্য উভয়েরই লাভ। প্রভুর ভিজিটের কমিশন পেত ভৃত্য। পরনারী ভোগ বাড়তি পাওনা। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে এইভাবেই প্রিয়নাথ মুখুজ্জে নাপিত সন্তান। মুকুন্দ মুখুজ্জের নির্দেশে হিরু নাপিত গিয়েছিল প্রিয়নাথের মায়ের কাছে। তার ঔরসে প্রিয়নাথের জন্ম। শুধু গল্প উপন্যাসেই নয় সংবাদপত্রে এরকম অনেক চিঠি প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। বহুপত্নীকরা একটি বা দুটি পত্নী ছাড়া একাধিক পত্নী বাড়িতে রাখতেন না। বাকিরা সারাজীবন কাটাত বাবা বা ভাইয়ের সংসারে বিনা বেতন রাঁধুনি বা দাসী রূপে। বহুবিবাহের ফলে সপত্নীর অশান্তি থেকে মুক্ত ছিল না মুসলমান নারীও। তার ছবি ফুটে উঠেছে ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর রচনায়। ফয়জুন্নেসার জন্ম হয় ১৮৩৪-এ কুমিল্লার এক জমিদার পরিবারে। তিনি জমিদার পুত্র গাজী চৌধুরীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হতে বাধ্য হন। ফয়জুন্নেসা লিখেছেন, 'স্বচক্ষে সপত্নী দেখিয়াও জননী আমাকে সলিলে ভাসাইলেন। পরিণয়ের কয়েক বৎসর সুখেই গত হইল। ...আমার প্রতি পতির ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়া সতিনীর অন্তঃকরণে বিষম হিংসা জ্বলিয়া উঠিল। ...গোপনে বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া অনেক তান্ত্রিক দ্বারা....আমাকে তাঁহার চক্ষুশূল করিয়া তুলিল। ...যাহার ক্ষণ অদর্শনে দেশ জীবন শূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাহারই চিরবিচ্ছেদ অভিলাষ জন্মে।'

বহুবিবাহ সম্পর্কিত অবিশ্বাস্য ঘটনায় উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস পরিকীর্ণ। সন্দেহ জাগে এক-একজন কুলীনের বিবাহের সংখ্যা জেনে। তবুও সেগুলি বাস্তব কল্পিত সংখ্যা নয়। বিদ্যাসাগর হুগলি জেলার বহুপত্নীক কয়েকজন কুলীনের যে বয়স ও বিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায় ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পঞ্চান্ন বছরের জনৈক কুলীন বিয়ে করেছিলেন ৮০টি। ১৮৩৬-এর ২৩শে এপ্রিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা এক তথ্যে ২৭ জন কুলীনের ৮১৬টি বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এ তথ্য অবাস্তব মনে হলেও 'পরিচারিকা' পত্রিকার একটা তথ্য সমস্ত সন্দেহ দূর করে। ১২৯৭-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পত্রিকাটি জানাচ্ছে বর্ধমানের একজন ৬০ বছরের বৃদ্ধ কুলীন একদিনে বিয়ে করেন ১৪টি কুমারীকে। বিয়ে করেছিলেন ফরিদপুর জেলার আমগ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে। কুমারীদের বয়স ৪/৫ থেকে ২২/২৪। একদিনে একাধিক স্থানে বিয়ে করা ছিল অতি সাধারণ ঘটনা।

পণ প্রথা

কৌলীন্য বা বহুবিবাহ প্রথার সঙ্গে উদ্ভব হয় পণপ্রথারও। প্রাচীন ভারতে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। বরপণের প্রসঙ্গ শাস্ত্রগুলিতে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তবে ১৮৩১-এর ৫ ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণ'-এ একটা চিঠি প্রকাশিত হয় সেই চিঠি থেকে জানা যায়, কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে কলকাতার জনৈক ধনী নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ উনিশ শতকে বরপণ ভালরকমই চালু হয়ে যায়। বহুপত্নীক কুলীনরা ছিল শাইলকের থেকেও নিষ্ঠুর। কুলীন পিতা সাধ্যাতীত বরপণ দিয়ে কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলেও তাঁর পরিত্রাণ ছিল না। একদিকে কুলীন পাত্রের প্রবল চাহিদা অন্যদিকে জোগানের মন্দা কুলীন পাত্রকে প্রায় সুদেখোর মহাজনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। যদি কুলীন জামাতা কখনো সখনো শ্বশুর বাড়ি যেত, সেটা পত্নীর সান্নিধ্য লাভের জন্য নয়। শ্বশুরের কাছ থেকে মোটা টাকা লাভের আশায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে, কুলীন জামাতা তার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট না হয়ে পত্নীর সঙ্গে রাত্রিবাস করে নিদ্রিত পত্নীর গায়ের গয়না, এমনকী পরনের কাপড়খানা পর্যন্ত খুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে চোরের মতো, অন্ধকার থাকতে।' কুলীন জামাতারা মূলত অর্থের প্রয়োজনে শ্বশুর বাড়িতে পদধূলি দিতেন। 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থে প্রমোদার স্বামী ষোলো বছর পরে স্ত্রীর কাছে এসেছিল টাকার জন্য। শ্বশুরের কাছ থেকে কিছু না পেয়ে স্ত্রীর হাতের বালা খুলে নিতে গেলে প্রমোদা বাধা দেয়। তাঁর স্বামী তখন জোর করে বালা খুলে নিয়ে স্ত্রীকে একটা লাথি মেরে চলে যায় শ্বশুরবাড়ি থেকে।

বাল্য বিবাহ

বাল্যবিবাহ ছিল উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের আর একটি ব্যাধি। বাল্যবিবাহের সূচনা হয়েছিল আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। তবে প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে বিতর্ক আছে। ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি এবং মহাভারত বাল্য বিবাহের বিধান দিলেও, বিশেষ করে মহাভারতে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ের ঘটনার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। একটা সময়ে কন্যার বিয়ের জন্য রাজা-রাজড়ারা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতেন। দ্রৌপদী যখন স্বয়ম্বরা হন, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী। মুসলমানেরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে। তাঁরা এদেশে এসে হিন্দু কন্যা বিবাহ করতে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ করে। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখার দরকার যে, অভিজাত মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণির হিন্দু পরিবার অপেক্ষা অভিজাত উচ্চবর্ণের পরিবারের মেয়েদের বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। সম্ভবত এই কারণে বর্ণহিন্দু মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য তাদের বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের মধ্যেই বাল্যবিবাহ ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করে। ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন বাল্যবিবাহের বিধানকে আরও কঠোর করেন। সাধারণ মানুষ রঘুনন্দনের নির্দেশ মতো আট বছর বয়সেই কন্যার বিয়ে দিয়ে দিত। উনিশ শতকের আগে বাল্যবিবাহ নিয়ে তেমন শোরগোল হয়েছিল বলে জানা যায় না। উনিশ শতকে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান এবং ঔচিত্য নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক। এর মূলে ছিল পাশ্চত্য ধ্যানধারণার প্রভাব। বাঙালি মুসলমান সমাজে এ বিষয়ে তেমন বিতর্কের অবকাশ ছিল না। কারণ, হাদিসে বলা আছে, কুমারীর মত না নিয়ে কখনও বিবাহ দিবে না। ঋতুমতী হওয়ার আগেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এমন কোনো বিধান ইসলামি শাস্ত্রে নেই। তবে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণির মুসলমান সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। এইসব মুসলমান ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলরা দাবি করত, বাল্যবিবাহ হিন্দু সমাজকে ইউরোপীয় সমাজের শিথিল নৈতিকতা থেকে মুক্ত রেখেছে। বাংলা পত্র পত্রিকাগুলির মনে হয়েছিল, ইংরেজ ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎকৃষ্টতার জন্য ঈর্ষাকাতর এবং এজন্য তারা ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে ভারতীয়দের ইউরোপীয়দের স্তরে নামিয়ে আনতে চায়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার যে এলিটদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করতে পারেনি, তার বড়ো দৃষ্টান্ত সেকালের অন্যতম বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবিবাহের প্রতি অনুরাগ ও সমর্থন। 'কুসংস্কার' এবং 'সমাজনিয়ম'কে তিনি বাঙালির আত্মগৌরব এবং 'স্বাতন্ত্রিকতা'র বস্তু বলে মনে করতেন। সেগুলো বিসর্জন দিতে পারেন নি। বাল্যবিবাহ সমর্থন তার এই মানসিকতার প্রকাশ। ভূদেবের পৌত্রী অনুরূপা দেবীও পিতামহের আদর্শকে অনুসরণ করেন। বাল্যবিবাহকে তিনি মহিমান্বিত করেছিলেন এক ভিন্ন যুক্তিতে। তাঁর কথায়, 'আমাদের একঘেয়ে বাঙালী জীবনের মধ্যের ওই সময়টুকু সবথেকে কবিত্বপূর্ণ ও আনন্দময় ছিল। তিনি বাল্যবিবাহের মধ্যে এক আশ্চর্যরকম রোমান্টিকতার স্বাদ উপলব্ধি করেছিলেন, যার স্মৃতি পরিণত বয়সে তাকে এক মুগ্ধতার আবেশে ঘিরে আসে। অনুরূপা দেবীর জীবনের অভিজ্ঞতা উনিশ শতকের বাল্যবিবাহের এক বিরল ব্যতিক্রম। কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই বালক বালিকার বিয়ে হত। পতি-পত্নীর বয়সের ব্যবধান প্রায় সব ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ১৮ বছর। রাসসুন্দরী দেবীর বিয়ে হয় ১২ বছর বয়সে। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন ৮৮ বছর বয়সে তিনি লিখেছেন, 'আমার মা আমাকে কোলে লইয়া অনেক মতে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, ''....সকলে শ্বশুরবাড়ীতে যায়, কেহ তো তোমার মত কাঁদে না, তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলে কেন?...'' তখন আমার এত ভয় হইয়াছে যে, মুখে বলিতে পারি না। ....আমাকে যে কোলে লইতে লাগিল, আমি তাহাকেই দুই হাতে ধরিয়া থাকিতে লাগিলাম, আর কাঁদিতে লাগিলাম। ...যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, তখন আমার মনে ভাবও ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।'

রাস সুন্দরীর অভিজ্ঞতাই বেশিরভাগ মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। শুধু রাসসুন্দরী কেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিয়ের সময় পত্নীদের বয়স ছিল ছয়। ওই বয়সে মেয়েদের মন রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে কিনা তা গবেষণার বিষয়। কৌলীন্য প্রথার কবলে পড়ে যে মেয়েদের বিয়ে হত, তাদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের রোমান্টিকতার লেশমাত্র থাকত না পরিবর্তে তারা পতিকে দেখত ভীতির চোখে।

কুসুমকামিনী দেবীর বিয়ে হয়েছিল ৬১ বছরের এক বৃদ্ধের সঙ্গে, যখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। এমন বিয়ে সেকালে বিরল ছিল না। কুসুমকামিনী দেবী ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমার পতির প্রতি আমার যে প্রণয়ের উদ্রেক হয় নাই এজন্য কি দোষভাগিনী হইব?' আমোদিনী দাশগুপ্তের ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ৪৩ বছরের একজন পুরুষের সঙ্গে। ১৮৬০-এর দশক থেকে হিন্দু মহিলারা যখন নিজেদের হাতে কলম ধরলেন তখন থেকে তাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হল। সেই সুর ছিল বাল্যবিবাহের রোমান্টিকতার পরিবর্তে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ।

সব মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের অবস্থা আদৌ ঈর্ষণীয় ছিল না। বাল্যবিবাহ, দীর্ঘ বৈধব্য জীবন, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথা জর্জরিত বাঙালি সমাজে মেয়েদের দুঃসময় অস্তিত্বের অপর একটি বড়ো কারণ ছিল তাদের শিক্ষার অভাব। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উনবিংশ শতাব্দীর আগে অনুভূত হয়নি। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে অনেকগুলি কুসংস্কার কাজ করত। তার মধ্যে প্রধান ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার সান্নিধ্য লাভের ফলে কয়েকজন ব্যক্তিমাত্র স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিলেন। সমাচার দর্পণ মন্তব্য করেছিল, 'স্ত্রীলোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতি শীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালককালে বিদ্যাশিক্ষা করান উচিত।' এটি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের রচনা। তার বহুদিন পরেও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙালি সমাজের অনীহা ও সন্দিগ্ধতা দূর হয়নি। বিধবা বিবাহের মত স্ত্রীশিক্ষাকেও বাঙালিরা খুব সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। মেয়েদের শিক্ষার অভাবের পরিণাম আরও বেশি অনুভূত হয়েছিল পুরুষদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলে। অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বহুলাংশে পিছিয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বা আরও আগে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে এতটা পার্থক্য চোখে পড়ত না।

বাবুদের ব্যভিচার

উনিশ শতকের বাংলায় আর একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক নতুন 'বাবু শ্রেণী'। বিদ্যার প্রতি এদের কোন অনুরাগ ছিল না কিন্তু বিলাসবহুল জীবন যাপনে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাবু সম্প্রদায়ের অনেকেই উপপত্নী রাখতেন, বাগানবাড়িতে যেতেন। গণিকা সংসর্গ করা এত বেড়েছিল যে কেউ এটাকে দুর্নীতি বলে মনে করত না। এই সার্বিক অনৈতিকতা, পুরুষ সমাজের একাংশের চারিত্রিক অধঃপতন, মেয়েদের মর্যাদাকে আরও নামিয়ে দিয়েছিল।

ভবানীচরণ 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে নববাবুরা কখনও নিজাগারে কখনও বেশ্যামন্দিরে মজা করে বেড়ান। নীরদচন্দ্র চৌধুরীও মন্তব্য করেছিলেন যে কূলবধূদের কেউ চিনত না, যাদের সবাই চিনত তার হল বকনা পিয়ারী, কোঁকড়া পিয়ারী, দামড়া গোপী, ছাড়ুখাগী, ওমদা খানুম, পেয়ারা খানুম, নান্নিজান, মুন্নিজান, স্বপনজান প্রমুখ। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থ থেকে এই সব গণিকাদের নাম সংগ্রহ করেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তৎকালীন সমাজে এদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল।

উনিশ শতকের সূচনায় মেয়েরা ছিল বাঙালি সমাজে সর্বাধিক অনাদৃত ও অবহেলিত শ্রেণি। মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করাই ছিল দুর্ভাগ্যের সূচক। জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলী লিখেছিলেন যে ছেলের জন্ম হলে ছেলের মাকে বলা হত 'হীরা বিউনি' রত্নগর্ভা অর্থে, বাড়ীতে শুরু হত আনন্দ উৎসব। কিন্তু মেয়ে জন্মালে ঠিক এর বিপরীত ছবি চোখে পড়ত। এমনকি মেয়ে হয়েছে শুনলে প্রসূতিও মুষড়ে পড়ত। কন্যার আগমনকে স্বগত জানানোর জন্য শাঁখ বাজত না, শাঁখ বাজত শুধু ছেলে জন্মালে। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেমস কার লিখেছিলেন যে ছেলে জন্মালে ধাই পেত পুরো এক টাকা, আর মেয়ে জন্মালে তাকে দেওয়া হত আট আনা।

বাঙালি বাড়িতে স্ত্রীর কাজ ছিল পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া ; কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে সেই স্ত্রীর সংসারে কোন মর্যাদা থাকত না। অন্য সময়ে তার গুণাগুণ নির্ধারিত হত কর্মক্ষমতার ওপর। উনিশ শতকের একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে বাঙালি পরিবারে বধূকে দেখা হত সর্ব্বগুণান্বিতা দাসীরূপে। রাসসুন্দরী দেবী লিখেছিলেন যে বাড়ির বউদের সংসারের সমস্ত কাজই শুধু এককভাবে করতে হত না, খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দেবার পর যে সময় থাকত, তখনও বাড়ির কর্তার সামনে অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে বৌ হইবে, সে হাত খানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড়ো ভালো বৌ হইল। ... যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত।' কলুর বলদ যেমন পুরোপুরি পরের ইচ্ছায় ও নির্দেশে চালিত হয়, বাঙালি পরিবারের বউদের অবস্থাও ছিল সেরকম। তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ যেমন ছিল না, তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দেখান চরম ঔদাসীন্য। অনেক সময় এই মনোভাব ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রদর্শন করা হত না – এটি বাঙালির ঐতিহ্যের মধ্যেই এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তারা এ বিষয়ে সচেতনই ছিল না। লর্ড হেস্টিংস একবার লক্ষ্য করেছিলেন যে বৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের মাথায় একটা করে ছাতা ছিল, কিন্তু কোলে শিশু থাকা সত্ত্বেও কোন মেয়ের মাথায় ছাতা ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে বেড়ে ওঠা লর্ড হেস্টিংসের কাছে মেয়েদের প্রতি এই বৈষম্য অসঙ্গত মনে হলেও চিরন্তন বাঙালি সমাজের কাছে এই আচরণ এতটুকু বিসদৃশ মনে হত না। এক মার্কিন পর্যবেক্ষক বলেছিলেন যে তাঁর স্বদেশবাসীরা বিশ্বাসই করতে চাইত না যে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ ছিল প্রধান সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন – বিধবাবিবাহ যে কোন সমাজে প্রচলিত নেই, এবং তা প্রবর্তন করতে হলে যে আন্দোলন করতে হবে, এটা পশ্চিমের লোকেদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হত।' ক্রফোর্ড লিখেছিলেন যে মানসিকতায় এই পার্থক্যের প্রধান কারণ ছিল স্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর মতে, হিন্দুরা স্ত্রীর আমোদ-প্রমোদ বা অন্য কোন চিত্ত বিনোদনের কথা

ভাবতেই পারত না। তারা মনে করত এর ফলে স্বামী সেবা বা সন্তান পালনের মত ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজের প্রতি তাদের মনোযোগ কমে যাবে। ফলে বাঙালি পরিবারে স্ত্রীর চাওয়ার কিছু ছিল না। তার ভূমিকা ছিল শুধু দেওয়ার।

<u>সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী</u>

১) নারী, সম্পাদনা তাহা ইয়াসমিন ও অনুপ শাদি

২) নারীবিশ্ব, সম্পাদনা পুলক চন্দ

৩) **Women and Social Reform in Modern India, Vol. I, II**

Edited By Sumit Sarkar and Tanika Sarkar

<u>সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী</u>

১) উনিশ শতকের বাংলায় নারীর অবস্থান নির্ণয় কর।

২) টীকা লেখ – ক) সতীদাহ প্রথা, খ) কৌলীন্য প্রথা

Block 6 : Women in 19th Century Bengal

Unit 16 : Development of Women

এই অধ্যায় পাঠ করে জানা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়ন প্রয়াস

সতীপ্রথার উচ্ছেদ

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রচেষ্টা

কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহ উচ্ছেদ প্রয়াস

বাল্য বিবাহ নিবারণ প্রয়াস

স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন ও পেশাপ্রবেশ

উনবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়নের প্রয়াস বিষয়টি কয়েকটি উপধারায় বিভক্ত ছিল। বস্তুত নারীর সামাজিক দুর্গতির পিছনে যে কারণগুলি বর্তমান ছিল তা নিবারণের জন্য প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন হয়।

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় রাজনৈতিক বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গদেশে রাষ্ট্রিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কোনো তারতম্য ঘটেনি। অবরোধ প্রথা, শিক্ষাহীনতা, সতীপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ ও উপপত্নী পালন, স্বামী ও পিতার নিরঙ্কুশ আধিপত্য, সম্পত্তিতে অনধিকার, বিধবার আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন এই সবই বঙ্গনারীর জীবনকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিকভাবে পঙ্গু রেখেছিল। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজ পুরুষকে দিয়েছিল অবাধ অধিকার এবং নারীকে বঞ্চিত রেখেছিল প্রায় সব অধিকার থেকে। কন্যা জন্ম ছিল অবাঞ্ছিত। সুতরাং জন্ম থেকেই একটি মেয়ের জীবন অবহেলা, অপমান ও লাঞ্ছনা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে নারীর সামাজিক অবস্থার অবমূল্যায়ণ চরম সীমায় পৌঁছায়। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে সরব কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকে। নারীর দুরবস্থার প্রতিকার সাধনে কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

<u>সতীপ্রথার উচ্ছেদ</u>

ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থে জীবনের লক্ষ্য উচ্চারিত হয়েছে বাঁচবার মন্ত্রে, মরবার জন্য নয়, তবুও অদ্ভুত ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রে এখানেই স্মৃতি শাস্ত্রে মৃত পতির সঙ্গে তার বিধবাপত্নীর চিতারোহনের প্রশংসা করা হয়েছে। কালক্রমে এই প্রথা সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথা হয়ে ওঠে বংশানুক্রমিক। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরবর্তী কতকগুলি স্মৃতিশাস্ত্রে সহমৃতা স্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ও অনন্ত পূণ্যের আশায় বহু নারী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতে থাকেন। এছাড়া বিধবাজীবনের সম্ভাব্য দুঃখ লাঞ্ছনাও অনেক সদ্যবিধবাকে সহমরণে প্রবৃত্ত করত। স্বামীর মৃত্যুকালে দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী স্ত্রী কিংবা স্ত্রীগণ স্বামীর ব্যবহৃত যে কোন জিনিস – পাদুকা, লাঠি, চাদর ইত্যাদিসহ চিতারোহন করতেন। একে বলা হত অণুমরণ। অণুরমণকারী

নারীও সহমরণকারীর মতোই 'সতী' বিবেচিত হতেন। অর্থাৎ অণুমরণ ছিল সহমরণেরই একটি প্রকার মাত্র। সহমরণকালে এলাকার অসংখ্য অন্য সধবা মহিলা শ্মশানে উপস্থিত সতীর পদধূলি গ্রহণ করতেন এবং পায়ের আলতার ছাপ সযত্নে রক্ষা করতেন। সতীর কীর্তি চিরস্থায়ী করবার জন্য স্তম্ভ বা মন্দির নির্মিত হত। সাধারণ হিন্দু নারীর চোখে সতীর এই মহিমার নিদর্শনও অনেককে সহমরণে প্রবৃত্ত করত। হিন্দু দায়ভাগের বিধান অনুযায়ী অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুর পরে যৌথ পরিবারে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার স্ত্রীর প্রাপ্য ছিল। সম্পত্তির অন্য শরিকেরা বিধবার সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সহমরণে উৎসাহিত করত। বিধবাকে চিতায় বেঁধে রাখা হত বা বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখ হত যাতে সে পালাতে না পারে। বিধবা মেয়ে পরিবার ত্যাগ করলে পারিবারিক সম্মান বিধ্বস্ত হত। সেইরকম ঘটনা যাতে আদৌ না ঘটে সেই কারণে সতীপ্রথার নাম করে সমাজে নারী হত্যার ঘটনা অবাধে ঘটে যেত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সরকারি আদেশে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিজের নিজের এলাকার সতীর একটা হিসাব ও তালিকা প্রতি বছর সরকারকে জমা দিতে বলা হয়। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহের ওপর আরো কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাংলার অন্যতম পুলিশ সুপার ওয়াল্টার ইউয়ার সরকারের বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারিকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এক চিঠিতে এই বর্বর প্রথাটির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে জানান যে প্রথাটি উচ্ছেদ করলে হিন্দুদের মধ্যে থেকে তেমন কোন বাধা আসবে না। সদর নিজামত আদালতের দ্বিতীয় বিচারপতি কোর্টনি স্মিথ ১৮১৯-২০ খ্রিস্টাব্দের সতীর তালিকা সরকারের কাছে পেশ করবার সময় বলেন এই প্রথা সহ্য করা সরকারের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ এবং একে নিষিদ্ধ করলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই। কিন্তু সদর নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি লেসেস্টার সাবধানী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বলেন, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি যেসব অঞ্চলে সতীপ্রথার প্রচলন তেমন নেই সেখানে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। অন্যান্য বিচারপতিরা বলেন যে মানবতার দিক দিয়ে প্রথাটি সমর্থনযোগ্য না হলেও এটি নিষিদ্ধ করলে দেশীয়দের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তবে পরীক্ষামূলক ভাবে কোনো জায়গায় এটি নিষিদ্ধ করে তার ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা আংশিক নিষিদ্ধকরণ, কোনো প্রস্তাবই সমর্থন করেন না এবং বলেন (১৮২১ খ্রি. ১৭ জুলাই) ক্রমশ শিক্ষিত হয়ে দেশীয়রা নিজেরাই প্রথাটি প্রত্যাখান করবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সতীপ্রথা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতি পরিচালকেরা ভারত সরকারকে এই বিষয়ে কোনো নির্দেশ দানে ইতস্তত করেন। বরং দেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই প্রথা নিবারণে এগিয়ে আসুক এটিই তাদের মনোভাব ছিল। হেস্টিংস পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টও সতীপ্রথা একেবারে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে ইতস্তত করেন। তাঁর মত ছিল যে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে কালক্রমে এ প্রথাও বিলুপ্ত হবে। অন্যদিকে বলপূর্বক প্রথাটি বিলুপ্ত করলে দেশীয় জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সৌভাগ্যবশত এই সময় জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চিন্তা ভাবনা ও সংস্কার চেতনা জাগরণের সূচনা দেখা দেয়। ১৮১৫ খ্রি. স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। এই সভায় সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় বহু সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা শুরু করেন। সতী প্রথাটি সেখানে প্রায়ই আলোচিত হত এবং প্রথাটির নিষ্ঠুরতা বিষয়ে মত ব্যক্ত হয়।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন প্রবর্তক ও নিবর্তকের আলোচনা সূত্রে সতীপ্রথার অমানবিকতার দিকগুলি দেখিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং সতীপ্রথা যেসব অঞ্চলে বেশি চালু সেইসব অঞ্চলে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। বইটির ইংরেজি অনুবাদও তিনি করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল পুস্তিকাটি পাঠ করে ইংরেজ কর্মচারীরা সতীপ্রথা সম্পর্কে তাদের পূর্বের ধারণা পাল্টাবে। তিনি এখানে দেখান সতীপ্রথা হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। বরং মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারদের উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করেন যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে সংযম ও শুচিতাপূর্ণ জীবনই বিধবার পক্ষে শ্রেয়।

রামমোহনের পুস্তিকা কলকাতার হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে এবং তারা সতীপ্রথার স্বপক্ষে কাশীনাথ তর্কবাগীশের সাহায্যে বিধায়ক নিষেধক সংবাদ প্রকাশ করেন। এর উত্তরে রামমোহন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে সতীদাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ করে গভর্নর জেনারেল পত্নী লেডি হেস্টিংসকে উৎসর্গ করেন। এই পুস্তিকায় সামগ্রিকভাবে স্ত্রী জাতির সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ওপর রামমোহন জোর দেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকার পাতায় তিনি সতীবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। দেশবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন শুরু করেন এবং সতীদাহ বিরোধী জনমত গড়ে তুলবার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রয়াসী হন।

বিষয়টির সমাধান হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে। উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী বেন্টিঙ্ক এই অমানবিক প্রথা দমন করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক বর্গও তাকে সতী প্রথার আশু সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজে সতীপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে বাস্তব অবস্থাও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল ছিল। একদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে সতী বিরোধী

মনোভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে, অন্যদিকে ইতিপূর্বেই লর্ড হেস্টিংসের সময় ভারতে ব্রিটিশ শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ হয়। বড় বড় দেশীয় শক্তিগুলি যেমন মারাঠা শক্তি, রাজপুত শক্তিগুলি ইংরেজের অধীনতা মেনে নেয়। সুতরাং সতীপ্রথা উচ্ছেদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার আর কোনো কারণ ছিল না।

বস্তুত সমস্ত ঘটনাবলী বিচার করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে জনগণের আন্দোলনের চাপে সতীপ্রথার অবসান ঘটেনি, কারণ চাপ সৃষ্টি করার মতো জনমত তখনও গড়ে ওঠেনি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জনমতের চাপে কোনো আইন প্রণয়ন করার মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যে রামমোহনের হাত ধরে তিনিও আইন করে সতীপ্রথা বন্ধ করতে চাননি। আইন করে সতীপ্রথা বন্ধ করার আগে লর্ড বেন্টিঙ্ক সৈন্যবাহিনী বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া জানবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সেই অনুসার ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের কাছে গোপন বার্তা প্রেরণ করা হয়। এখান থেকে সদর্থক উত্তর পাওয়ার পর বেন্টিঙ্ক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসনের এবং রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ করেন। এরা উভয়েই আইন করে সতীপ্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্য ছিল এর ফলে প্রজাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে সরকারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজাদের বলপূর্বক স্বধর্মত্যাগ করে শাসক সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য করা।

কিন্তু উইলসন এবং রামমোহনের যুক্তি বেন্টিঙ্কের মনে ধরেনি। সরকারি ও বেসরকারি অফিসারদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সতীপ্রথা উচ্ছেদ কোম্পানীর শাসনের পক্ষে কোন বিপজ্জনক পদক্ষেপ হবে না। তাছাড়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মতো যেসব জায়গায় সতীপ্রথা ছিল খুব প্রচলিত সেইসব জায়গার জনগণ ছিল শান্তিপ্রিয়। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ অনুগত যে জমিদার শ্রেণী গ্রাম শাসন করত তারাই শন্তিবিঘ্নকারী কোন ঘটনা বরদাস্ত করত না। ফলে সতী বিরোধী আইন পাশ হলেও তার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না।

গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যরাও বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সুতরাং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের এক আইন বলে সতীদাহ বে আইনি ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। বেন্টিঙ্কের আইন বিলাতের কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক সমিতি বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানায়।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তিনশত জন মিলে কলকাতা টাউন হলে এক সভা করে বেন্টিঙ্ককে সতীদাহ নিবারণের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। রামমোহন প্রমুখ সংস্কার পন্থী হিন্দুরা প্রথমে সরকারি আইনের সাহায্যে সংস্কারের পক্ষে ছিলেন না কিন্তু আইনটি পাশ হওয়ার পর তারা সবরকম ভাবে আইনটিকে সমর্থন করেন। তবে রক্ষণশীল হিন্দুরা আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। দীর্ঘ শুনানির পর প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুলাই রক্ষণশীল দলের আবেদন নাকচ করেন। শুনানির সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনের প্রচেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করে। রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন প্রধানত মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন হলেও এর ফলে সাধারণ জনগণ উপকৃত হন।। কারণ বীভৎস সতীপ্রথা তখন সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ১৮২৯ সালের সতীদাহ বিরোধী আইন পাশের পরেই সতীদাহ একেবারে সমাজের বুক থেকে মুছে যায়নি। মাঝে মাঝে দু একটি সতীর ঘটনা জানা গেলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রচেষ্টা

বিধবাবিবাহ সমাজে মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বীকার করে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে জড়িত। তবে এমন নয় যে সমস্যাটি তিনিই প্রথম উপলব্ধি করে আন্দোলন শুরু করেন।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে বিধবার সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিধবা বিবাহের পক্ষে বিপক্ষে নানা আলোচনা চলতে থাকে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ ''সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'' বা ''সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'' নামে একটি আলোচনা সভা গঠন করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই সভায় মহেশচন্দ্র দেব হিন্দু নারী জীবনের নানা দূরবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বিধবা প্রসঙ্গে তীব্র মন্তব্য করেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি ছিল ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপাত্র। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের সাহায্যে পত্রিকাটি প্রথম থেকেই বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিল। এই পত্রিকাতেই এক ব্যক্তি চিঠি লেখেন, সেখানে তিনি যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খলিখিত, হারীত প্রভৃতি স্মৃতিকারের রচনা বিচার করে দেখানো হয় যে বিধবার পুনর্বিবাহ শুধু যুক্তিসঙ্গত নয় শাস্ত্রসম্মতও। বেঙ্গল স্পেক্টেটরের পত্রটি বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করে। এই সম্বন্ধে আলোচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এ নতুন যুক্তি রক্ষণশীল সমাজকে উত্তেজিত করে তোলে। সংবাদ প্রভাকরে একটি প্রতিবাদ ছাপা হয়। চিঠিতে বলা হয় ''বিধবার পুনর্বিবাহ হইলে সম্প্রদান কর্তা কোন ব্যক্তি হইবেক? প্রথম বিবাহকালীন দান দ্বারা ঐ স্ত্রীতে তাহার পিতা ও মাতার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে।'' বেঙ্গল স্পেক্টেটর এর উত্তরে পরাশরের বিখ্যাত শ্লোক ''নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে.... এই প্রথম বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যবহার করেন। এইভাবে দেখা যায় দীর্ঘ প্রায় দুই-তিন দশক ধরে বিধবা সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনার প্রয়াস চলে। ইয়ং বেঙ্গল দল ও অন্যান্য সমাজ সচেতন ব্যক্তির চেষ্টায় সমগ্র বিষয়টি ক্রমে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এইসব বিশৃঙ্খল প্রচেষ্টাকে একটি রীতিমতো আন্দোলনের রূপ দান করবার জন্য প্রয়োজন ছিল কর্মতৎপরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ একটি সমাজ বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রস্তাব ১৮৫৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বহু ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে পরাশর সংহিতার 'নষ্টে মৃতে' ইত্যাদি শ্লোক অনুসারে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত তবে বিধবা বিবাহ আইন যাতে পাশ হতে না পারে সেজন্য রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত এক প্রতিবাদ পত্র সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। এছাড়া নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া ও বাঁশবেড়িয়ার পণ্ডিতদের কাছ থেকেও বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন পৌঁছায়। বিরোধী পক্ষের প্রধান যুক্তি ছিল যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র ও দেশাচার বিরুদ্ধ। তাছাড়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের ফলে বংশলোপের সম্ভাবনা ও পারিবারিক বিপর্যয় ঘটবে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রেরিত প্রায় এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্রটি এবং সেইসঙ্গে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধাকান্ত সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল দল প্রস্তাবিত আইনকে সমর্থন করে একটি সংশোধনী প্রস্তাব দেন। তাঁরা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কথাও বলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর আইন পরিষদের সদস্য গ্র্যান্ট সাহেব বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের খসড়াটি আইন পরিষদে পেশ করলে কিছু কিছু উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিলটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বহু তর্কবিতর্ক আবেদন নিবেদন ইত্যাদির পর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। ঐ বছরই ৭ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে প্রথম আইনসিদ্ধ বিধবাবিবাহ হয়।

বিদ্যাসাগরের শত চেষ্টাতেও বিধবা বিবাহ জনপ্রিয় হয়নি বরং কার্যত আইনটি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে যায়। এমনকি পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যেও এই আইনের সাফল্য নৈরাশ্যজনক। তবে উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ব্রাহ্মগণ এবং নারী উন্নয়নের কয়েকটি বিষয় যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বিরোধী এবং বিধবা সম্বন্ধীয় ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও অবরোধ বিলোপ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রথম ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ করেন গুরুচরণ মহলানবিশ, কন্যা রুক্মিণী দেবী। দ্বিতীয় ব্রাহ্মবিবাহ করেন পার্বতীচরণ দাস, এটি প্রথম ব্রাহ্ম অসবর্ণ বিধবা বিবাহও বটে (কন্যা ব্রাহ্মণ)। তৃতীয় ব্রাহ্ম বিধবাবিবাহ করেন চণ্ডীচরণ সিংহ, চতুর্থ অঘোরনাথ গুপ্ত। এরপরে অগণিত বিধবাবিবাহ ব্রাহ্ম পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মরা ছিল সমাজের এক ক্ষুদ্র ভদ্রলোক গোষ্ঠী। ব্রাহ্মদের বাইরে যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিল তাদের মধ্যে বিধবার সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। বিধবাদের সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেছিল।

কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহ উচ্ছেদ প্রয়াস

কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহ উনবিংশ শতকেও বাংলার সমাজ জীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। সম্ভবত রামমোহনের যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক সরকারের কাছে বহু বিবাহ বিরোধী এক আবেদনপত্র প্রেরণের পরিকল্পনা করেন। ১৮৩০-এর দশকে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী কুলীন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করতে থাকে। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানাণ্বেষণ পত্রিকা বহুবিবাহ কারী কুলীনদের একটি তালিকা প্রকাশ করে প্রথাটির বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা করে। ডিরোজিয়ানদের আলোচনাসভা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতি'র বিভিন্ন অধিবেশনেও প্রথাটির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক আলোচনা হয়। ঐ সভাতে মহেশচন্দ্র দেব ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে **A sketch of the condition of the Hindu Woman** নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে কুলীন বহুবিবাহকে ধিক্কার জানানো হয়। এরপর ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিদ্যাদর্শন পত্রিকাটি এই প্রথাটির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে উদ্যোগী হয়। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনপত্র প্রেরিত হয় 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র পক্ষ থেকে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় কিশোরীচাঁদ মিত্র সমিতির মুখপত্র হিসাবে এই আবেদন প্রেরণ করেন। ঐ বছরই ২৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরও ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন। পরে প্রায় একশ সাতাশ খানি আবেদনপত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সরকারের কাছে পৌঁছায়। এই সব আবেদনপত্রে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজারে পৌঁছায়।

সরকারও এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি জানান যে শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করা হবে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এরপর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবার বেশ কিছু ব্যক্তি ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের আবেদন জানায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর ভারত সরকারকে বহু বিবাহ নিবারণ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে চিঠি দেন। কিন্তু ভারত সরকার আইন প্রণয়ন বিষয়ে উৎসাহ দেখায়নি। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পর বৎসর প্রকাশিত হয় এ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তিকা। পুস্তিকা দুটির মাধ্যমে বিদ্যাসাগর কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি, বিকাশের ইতিহাস ও কুফল সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রথম পুস্তিকাটিতেই তিনি বলেন, ''রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইলে কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না।'' উপরন্তু প্রথম পুস্তিকার মুখবন্ধেও তিনি জানান ''রাজশাসন ব্যতিরেকে ইদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই''। দুটি পুস্তিকাতেই বিদ্যাসাগরের রচনারীতি তীব্র শ্লেষাত্মক। পুস্তিকা দুটিতে তিনি প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। কিন্তু বহুবিবাহ নিবারণপন্থীদের অনেকের মত ছিল শিক্ষার প্রসার ও সর্বদ্বারী বিবাহের পুনঃ প্রচলন হলে বহুবিবাহ ধীরে ধীরে লোপ পাবে, সরকারি আইন প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। বহুবিবাহের সমর্থকরা মনে করতেন এটি একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা, সুতরাং সরকারি হস্তক্ষেপ একেবারেই অবাঞ্ছিত। কিন্তু বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন ঢাকা, বিক্রমপুর অঞ্চলে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। বিশেষ করে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। রাসবিহারী স্বয়ং কুলীন সন্তান, দারিদ্র্যহেতু তাকে বহুবিবাহ করতে হয়। কিন্তু ক্রমে তিনি বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে সচেতন হয়ে যথাশক্তি এর উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। ঢাকার গোঁড়া হিন্দুরাও অনেকে রাসবিহারীকে সমর্থন করেন। এছাড়াও কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ বিরোধী অনেকগুলি পুস্তিকাও জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কুলীন স্ত্রী ও তাঁদের অভিভাবকগণও ক্রমশঃ কুলীন স্ত্রীদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিতে থাকেন। কৃষ্ণমণি নামে এক কুলীন স্ত্রী স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা করে জয়লাভ করেন। আদালতের রায় অনুযায়ী স্বামী দারিদ্র্যবশত পনেরো টাকা দিতে অক্ষম হলে তার কারাদণ্ড হয়। কয়েকবছর পরে কুলীন স্ত্রী হৈমবতী দেবী স্বামীর বিরুদ্ধে একই ধরনের মামলা করে হাইকোর্ট থেকে মাসিক দশ টাকা খোরপোষের ডিক্রি পান। ললিতমোহিনী নামে কুলীন মহিলাও অনুরূপ মামলায় জয়লাভ করেন। ধনী স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি বহু টাকার ডিক্রি পান এবং বাল্যবিবাহ বিরোধী গ্রন্থ রচনার জন্য তিনশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ভাগ্যকুলের জমিদার ঘোষণা করেন যে কোনো কুলীন স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা করলে তাঁকে তিনি দুইশত টাকা পুরস্কার দেবেন।

পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকদল বিপন্ন কুলীন কন্যাদের বহুবিবাহ থেকে উদ্ধার, সৎপাত্রে অর্পণ ইত্যাদি কাজে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সহায় এই যুবকদল ব্রাহ্ম আন্দোলনের, বিশেষত নারী উন্নয়নের কাজে অতি উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষ তিন দশকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রাহ্ম আন্দোলন বা শিক্ষার প্রসার, সচেতনতার বিকাশ ইত্যাদি নানা কারণে বহুবিবাহ প্রথা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙন ধরে স্বামী-স্ত্রী সন্তানের পারিবারিক বিন্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুলীন কন্যার অভিভাবকরাও ভরণপোষণে ইচ্ছুক ও সক্ষম পাত্রের হাতেই কন্যা সম্প্রদান সঠিক বলে মনে করতে থাকেন।

তা সত্ত্বেও কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের প্রতি আনুগত্য সমাজের একাংশে প্রচলিত ছিল। সমসাময়িক উপন্যাসে বহুবিবাহ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখেও অনুমান করা যায় সমস্যাটি একেবারে নির্মূল হয়নি। 'সংসার'(১৮৮৬) ও 'সমাজ' উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্ত, 'একটি চিত্র' (১৮৮৬) উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ বসু, 'স্নেহলতা' (১৮৯০) উপন্যাসে কুসুমকুমারী দেবী এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

ইসলাম ধর্ম যদিও সাম্যপন্থী ও শ্রেণীহীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু কালক্রমে কৌলীন্যপ্রথার মতো মুসলিম সমাজেও অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বহুবিবাহ প্রথা মুসলিম সমাজে অভিজাত অনভিজাত উভয় অংশেই বিদ্যমান থাকলেও সেখানে মেয়েরা স্বামীর গৃহেই বসবাস করত। স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য দাম্পত্য অধিকার গ্রাসাচ্ছাদনের থেকে মুসলিম নারী কুলীন কন্যার মতো সাধারণতঃ বঞ্চিত হত না। উনবিংশ শতকের শেষভাগ মুসলিম চিন্তাবিদগণ সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে থাকেন। অবশ্য কিছু প্রগতিবাদী ব্যক্তির প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ বিরোধী কোনো আন্দোলন বা ব্যাপক সচেতনতা উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায় না।

বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রয়াস

উনিশ শতকে বাল্যবিবাহের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে সমাজে সচেতনতার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সাধারণভাবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় প্রবন্ধে মহেশচন্দ্র দেব নারীর অবরোধ, বহুবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহের ওপর মত ব্যক্ত করেন। বাল্যবিবাহ যে বহু সামাজিক অকল্যাণের হেতু এই ধারণা কিছু সংখ্যক মানুষের মনে সচেতন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হলে সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করেন।

পরবর্তী দশকে বাল্যবিবাহ বিরোধী আলোচনা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। বিবাহকেন্দ্রিক সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজে এই সময়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ উচ্ছেদের জন্য যেমন একদিকে প্রচেষ্টা তীব্রতর হয়, তেমনি বাল্যবিবাহ নিবারণের প্রয়োজনীয়তা আরো অনুভূত হয়। বস্তুত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহের সমর্থনে প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ শতাধিক প্রগতিপন্থী ব্যক্তি সরকারের কাছে যে একটি সাধারণ বিবাহবিধি প্রবর্তনের দাবি জানান তাতে তেমনি বাল্যবিবাহ নিবারণের দাবিও জানানো হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র **Social Reform Association** নামে এক সভা স্থাপন করেন এবং এই সভার সভাপতি হিসাবে নারীর সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স নির্ধারণের জন্য খ্যাতনামা চিকিৎসকদের কাছ থেকে মত নেন। চিকিৎসকরা শারীরিক কারণেই বল্যবিবাহ বিরোধী ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মন্তব্য করেন যে, ''বাল্যবিহ আমাদের দেশের সর্বাধিক অনিষ্টকর কু প্রথা। এই প্রথা জাতির স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে।''

কিন্তু চিকিৎসকদের মত যতই বাল্যবিবাহ বিরোধী হোক না কেন জনমত তখনও ব্যাপকভাবে বাল্যবিবাহের অনুকূল ছিল। লোকবাধা যাতে বেশি না হয় সে জন্য চিকিৎসকদের প্রদত্ত বয়সের মধ্যে থেকে নিম্নতম বয়স ১৪টিকে গ্রহণ করে কেশবচন্দ্র আইন প্রবর্তনে উদ্‌যোগী হন। কয়েক বছর ধরেই তিনি আইনের মারফৎ বিবাহ সংস্কারের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে অনেক বিতর্ক ও সংশোধনীর পর ভারত সরকার ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ বিবাহ বা তিন আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে বিবাহে কন্যার নিম্নতম বয়স চোদ্দ ও পাত্রের আঠারো নির্দিষ্ট হয়। এই তিন আইন বা বিশেষ বিবাহ বিধি বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনটি সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশে প্রযোজ্য ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বিশেষ বিধবা বিধি অনুযায়ী শুধু বাল্য বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষিত হয় না, এই আইনের দ্বারা বহুবিবাহকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিবাহ অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে মুক্ত হয়।

মুসলিম সমাজেও বাল্যবিবাহ বিরোধী মত প্রকাশ করে সমাজ সচেতনতা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়। তবে হিন্দু সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে বাংলার অমুসলমান শ্রেণীর মধ্যে নারী উন্নয়ন বিষয়ে যে অপেক্ষাকৃত অধিক সচেতনতা দেখা যায়, নানা কারণে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে তার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন

বিধবা সমস্যা কিংবা বহুবিবাহ সমস্যা – এইগুলি ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের নারীর সমস্যা। নিম্নবর্গীয় সাধারণ মেয়েদের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে হলেও এই সমস্যাগুলি ছিল না। কিন্তু শিক্ষাহীনতার সমস্যা ছিল সমাজের সর্বশ্রেণীর নারীর। এদেশে বাল্য বিবাহশাসিত এবং অন্তঃপুরবদ্ধ নারীর জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি তাছাড়া সুযোগও তেমন ছিল না। যদিও ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার কথা আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে এদেশের নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমশঃ হরণ করা হয় ও বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হয়। বাল্য বিবাহের ফলে স্বভাবতই শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়। কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারে নারীর উচ্চশিক্ষা অল্প পরিমানে প্রচলিত থাকলেও সাধারণ ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া প্রাথমিক স্তরেই রয়ে যায়। অবরোধ প্রথা, বাল্য বিবাহের চাপে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে হিন্দুদের মধ্যে এমন সংস্কারের জন্ম হয় যে মনে করা হতে থাকে কোনো মেয়ে লেখাপড়া জানলে সে বিধবা হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক কুসংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সমাজে ও সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং ব্যভিচারের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এই রকম বদ্ধমূল ধারণা নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে রেখে ছিল। বস্তুত শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত ও বাল্যবিবাহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সময়ের মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতই পুরুষদের প্রতি দাসত্বের মনোভাবের জন্ম দেয়।

মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সমাজ অনুভব করেনি এবং ক্রমে বিশ্বাস করেছে যে নারীজাতি বুদ্ধিহীন, সুতরাং তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ করেন রামমোহন রায়। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, ''স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয়

করেন?'' তিনি কঠোর ভাষায় বলেন একজন নারী একাধারে রাঁধুনী, শয্যাসঙ্গিনী ও বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী মাত্র। ''সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে''। কিন্তু নারীশিক্ষায় প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন মিশনারিগণ। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনসাধারণের ধর্মান্তরিতকরণ এবং খ্রিস্টধর্মের প্রচার করার জন্য শিক্ষাকেই এরা প্রধান মাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছিলেন। মিশনারিরা নানা জায়গায় মেয়েদের পড়ার জন্য বিদ্যালয় গড়েছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষায় মিশনারিদের অবদান, ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা ও বেসরকারি উদ্যোগ

স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হেজেস গার্লস স্কুল'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত সেটিই প্রথম মেয়েদের স্কুল। তবে মনে হয় স্কুলটি স্থায়ী হয়নি। লন্ডন সোসাইটির রেভারেন্ড মে ১৮১৮ সালে চুঁচুড়াতে একটি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে নারীশিক্ষার পথ দেখানো শুরু করেছিলেন। ১৮১৯ সালে উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরের একটি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২০ সালে ''ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'' ১৮টি স্কুল স্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে মিস কুক ১৮২১ সালে ৮টি এবং ১৮২২ সালে আরো ৪টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে লেখা, পড়া, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল এবং সেলাই শেখানো হতো। ১৮২৪ সালে ''লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' স্থাপিত হয়, ১৮২৬ সালে মিস কুক রাজা বৈদ্যনাথের দেওয়া ২০ হাজার টাকা দিয়ে 'সেন্ট্রাল স্কুল' স্থাপন করেন। সেখানে মহিলা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণও আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ সাল নাগাদ তখনকার অবিভক্ত বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা ও বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে যেমন বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া, বারাসাত, হাওড়া, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায়ও নারী শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। পর্দ প্রথার বিলোপ হয়, মেয়েদের শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশ নিতে আগ্রহ দেখা যায়। ভারতীয় শিক্ষাব্রতী রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতিরা এগিয়ে আসেন। রাধাকান্ত দেব কলকাতার শোভাবাজারে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ সিকদার স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষাবিদ বাঙালির চেষ্টায় ''হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। স্কটিশ মিশনের রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ বেশ কিছু মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন – যেমন সেন্ট মার্গারেট স্কুল, ডাফ স্কুল, হোলি চাইল্ড স্কুল, ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল ইত্যাদি। মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত বেশিরভাগ শিক্ষাকেন্দ্রই ধর্মীয় শিক্ষা দান করত। যদিও এইসব স্কুলে মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হত, এখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাও দেওয়া হত। তবে যে সব বিদ্যালয়গুলি ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত সেগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা হত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট ভারতীয় শিক্ষার একটা নতুন গতিধারা এনে দেয়। তার আগে অবধি ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে সরকার কোনও রকম দায় নেয়নি। সবটাই বেসরকারি উদ্যোগে ছিল, বিশেষ করে মিশনারিদের দ্বারা। ১৮১৩-এর অ্যাক্টে বলা হল যে, কোম্পানি শিক্ষার দায়িত্ব নেবে না, তবে শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দিতে এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রতি বছর দেবে। এর ফলে প্রচুর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এর মধ্যে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার চরিত্র নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা হয়নি। তবে রাজা রামমোহন রায় ও উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের যে সূচনা করেছিলেন, তাতে নারীশিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল বলা যায়।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি নারীশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। নারীশিক্ষার মাধ্যমে এ দেশের মানুষের মধ্যে কার্যকরী পরিবর্তন আনা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৮৫৪ সালের উড ডেসপ্যাচে। এই উড ডেসপ্যাচে প্রথম আর্থিক সাহায্য দিয়ে (যাকে বলা হয় গ্রান্ট ইন এড) নারীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়েছিল। তবে এর পরবর্তী সময় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হওয়ার দরুণ সরকার সামাজিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর ফলে সরকারি প্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়েছিল। ১৮৭০-৮২ সালের মধ্যে বেশ কিছু নারীশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর বেশিরভাগ টাকাটাই এসেছিল প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য দেওয়া আর্থিক অনুদানগুলি থেকে।

ইংরেজ সমাজ সংস্কারক মিস মেরী কার্পেন্টার চার বার ভারতে আসেন। তাঁর সরকারি মহলে ভাল যোগাযোগ ছিল। মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার সময় সেই যোগাযোগগুলিকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। ১৮৭০ সালে প্রথম মহিলা প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২২ সালের মধ্যে মেয়েদের জন্য ২৬০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৫টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দুই ভারতীয় মহিলা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পেয়েছিলেন তাঁরা তৎকালীন বেথুন স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন। ১৮৮২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি.এ পাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে উপাচার্য হার্বার্ট জন রেনল্ডস কৃতী ছাত্রী দুজনকে অভিনন্দিত করেন। তিনি

বলেন ভারতের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনা শিক্ষায় নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা পুরুষের কর্তব্য হিসাবে নির্দেশিত করবে।

১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং পাঠ শেষে সমস্ত বিষয়ে পাশ নম্বর পেলেও নারীশিক্ষা বিরোধী জনৈক অধ্যাপক তাকে প্র্যাকটিকাল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর না দেওয়াতে তিনি ডিগ্রি লাভ করতে পারেন না। কিন্তু অধ্যক্ষ কাদম্বিনীর দক্ষতা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই কাদম্বিনীকে তিনি চিকিৎসা করার জন্য বৈধ সনদ পত্র দেন এবং ইডেন হাসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন।

চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভে অনেক মেয়েই এগিয়ে আসেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কামিনী সেন ও সুবর্ণপ্রভা বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন কলেজে ভর্তি হন, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে অবলা দাস, কুমুদিনী খাস্তগির, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, নির্মলা মুখোপাধ্যায়, বিধুমুখী বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তবে যারা বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন পিতা, স্বামী অথবা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে যেমন রাসসুন্দরী দেবী – প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা, প্রথম গ্রন্থ রচয়িতা কৈলাসবাসিনী দেবী। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কৃষ্ণভাবিনী দাসের নাম করা যায় যারা মনের সকল জড়তা কাটিয়ে বিদেশযাত্রা করেছিলেন। এদেরকে প্রথম আধুনিকা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

হিন্দু সমাজের মত মুসলিম সমাজের মেয়েদেরও শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটে তবে তা শুরু হয় কিছুটা দেরিতে। এই সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। স্যার সৈয়দ আহমেদ, নবাব আবদুল লতিফ, হাজি মহম্মদ মহসিন প্রমুখের চেষ্টায় মুসলিম সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু এই সাংগঠনিক শিক্ষায় মেয়েদের কোন স্থান ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সেই প্রাথমিক যুগে মিশনারিদের স্কুলগুলিতে নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে এগিয়ে এসেছিল। উচ্চবর্ণ বা শরীফ ভদ্র সমাজের মেয়েরা নয়।

তবে এরই মধ্যে কয়েকজন মহিলার আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন তোলেন। এবং কঠোর পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। যেমন, তাহেরননেসা, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, করিমুন্নেসা খানম ইত্যাদি। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় তাহেরননেসার যে চিঠি প্রকাশিত হয় তাতে মেয়েদের বিদ্যাহীনতার দুঃখ ও বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত হয়েছে। মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ ঘটে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের উদ্যোগে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এর আগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু মুসলিম মেয়ে লেখাপড়া শিখলেও তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। রোকেয়া শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয় নারী জাগরণ বিষয়ে অবিরাম লেখনী চালনা এবং বিভিন্ন সভা সংগঠনের মাধ্যমে মত প্রচার ইত্যাদির সাহায্যে মুসলিম নারী জাগরণকে বহুদূর অগ্রসর করেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলিম নারী সমাজ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অধিক সংখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।

অর্থনৈতিক জীবন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মেয়েদের অন্তঃপুরের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করায় এবং পরিশেষে অনেক মেয়ে অন্তঃপুরের গতানুগতিক জীবনের বাঁধাধরা ছকে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক হয়ে ওঠেন। সুতরাং অন্তঃপুর বহির্ভূত একটি অন্য জীবনের স্বাদ বজায় রাখতে তাঁরা কোনো পেশা গ্রহণে উৎসাহী হন।

স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা প্রথম জীবিকা গ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগে। ১৮৬০-এর দশকে মেয়েরা বিভিন্ন নর্মাল স্কুল অথবা বিভিন্ন স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক সভা পরিচালিত স্কুলে কর্মগ্রহণ করেন। এরা নিজেরা অন্তঃপুরে স্বামী বা অন্য আত্মীয়দের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এদের কয়েকজনের নাম বামাসুন্দরী দেবী, মনোরমা মজুমদার, কৃষ্ণকামিনী দেবী ইত্যাদি। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়েও ক্রমে মেয়েরা কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৮০-এর পর থেকে বেথুন স্কুল ও কলেজে কাজে নিযুক্ত হতে থাকেন। রাধারাণী লাহিড়ী, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগির ইত্যাদি প্রথমদিকে এবং অল্প পরে হেমপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ ইত্যাদি বেথুন স্কুল ও কলেজে কর্ম গ্রহণ করেন। কোনো কোনো শিক্ষিত মহিলা বেশি বেতনের চাকরিতে যোগদানের জন্য দূরবর্তী প্রদেশেও গমন করেন। নয়ের দশকের শুরুতে শরৎ চক্রবর্তী অমৃতসরে, পরে কুমুদিনী খাস্তগির মহীশূরে এবং একবছর পরে সরলা ঘোষাল (পরে সরলা দেবী চৌধুরাণী) মহীশূরে চাকরি যোগদান করেন। ইতিমধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নারীশিক্ষা উৎসাহী সদস্যদের চেষ্টায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সমাজ পাড়ায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও তৎ সংলগ্ন মেয়েদের বোর্ডিং স্থাপিত হলে শিক্ষিত মেয়েরা নানাভাবে বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত হন।

মেয়েদের আর একটি পেশার পথ উন্মুক্ত হয় যখন ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবিদ্যা পাঠক্রম শুরু হয়। হিন্দু বিধবাদের মধ্যে এই পেশা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধাত্রীবিদ্যা ছাড়াও ডাক্তারি পড়তেও মেয়েরা এগিয়ে আসেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। এদের আগেই কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল পড়েন কিন্তু জনৈক শিক্ষকের নারী বিদ্বেষের কারণে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়। যদিও পরে তিনি ডাফরিন হাসপাতালে যোগদান করেন এবং চিকিৎসা করার লাইসেন্স প্রাপ্ত হন।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কোনো কোনো মহিলা ফোটোগ্রাফি চর্চায় উৎসাহিত হন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয় মহিষী মনোমোহিনী প্রথম ফোটোগ্রাফিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইন্দিরা দেবীর লেখা চিঠি থেকে জানা যায় জ্ঞানদানন্দিনীও ছবি তুলতে শিখেছিলেন এবং ঠাকুর বাড়ির এমন অনেক মহিলার ছবি তুলেছিলেন যাদের ছবি আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে প্রথম গ্রহণ করেন সরোজিনী ঘোষ। ১৮৯৮-এর জানুয়ারির মধ্যেই তিনি ৩২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে 'মহিলা আর্ট স্টুডিও' মারফৎ তাঁর পেশা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালাতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে অন্নপূর্ণা দত্ত, চঞ্চলাবালা দাসী প্রভৃতি মহিলাগণ ফোটোগ্রাফিকে পেশ হিসেবে গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন।

এইভাবে নানা দিকে ভদ্র বাঙালি মেয়েরা উপার্জনের পথ খুঁজে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ পরিবারই মেয়েদের চাকুরী করার বিরোধী ছিলেন। এমনকী অনেক ব্রাহ্মও এর মধ্যে ছিলেন। কামিনী সেন-এর পিতা চণ্ডীচরণ, কামিনীর বেথুনে চাকুরি গ্রহণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। পরে অনেকের পরামর্শে মত পরিবর্তন করেন। তা সত্ত্বেও মেয়েরা বিভিন্ন পেশায় যোগ দিতে থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মেয়েরা এইভাবে বহুবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমশঃ জড়িত হন এবং নিজস্ব উপার্জনের সাহায্যে অনেকে খানিকটা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেন। আর্থ সামাজিক স্তর বিন্যাসের সূত্রে যারা সমাজের নীচুতলায় তারাও বিভিন্ন ধরনের পেশা অবলম্বন করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। অবরোধবাসী মেয়েদের তুলনায় এরা অবশ্য অনেকটাই স্বাধীন ছিলেন। দাসী, নাপতেনী, মেথরানী, সব্জি বা মাছ দোকানী, পথ গায়িকা বা নর্তকী ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত মেয়েরা ছাড়াও ছিলেন সরিষা তিসি ইত্যাদি বীজ পেষাইয়ের কারখানায় নিযুক্ত নারী শ্রমিক। এছাড়া ধোপানী, কুমোরনী, দুধ-ঘি-মাখন উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী গয়লানীদের জাতিগত পেশা তো ছিলই। উপরন্তু ধান ভানা, মুড়ি ভাজা, ঝাঁটা, মাদুর তৈরির মতো গ্রামীণ পেশাগুলিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। সমাজের নিম্নস্তরবাসী মহিলারা বড়ো মানুষের বাড়িতে আয়ার কাজ, রাঁধুনির কাজ করেও উপার্জন করতেন। এছাড়া মেয়ে কবিওয়ালার দল, যাত্রার দল, ঝুমুরওয়ালীর নাচের দল ইত্যাদি উনবিংশ শতকের কলকাতা ও গ্রামাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ধারার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকেও বিখ্যাত মহিলা কীর্তনীয়াদের সম্ভ্রান্ত পরিবারে কীর্তন পরিবেশন করতে দেখা যেত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১) অন্দরে অন্তরে, উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী

২) নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, গোলাম মুরশিদ

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়নের পটভূমি বর্ণনা কর। ২) বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ নিরোধের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা কর। ৩) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মিশনারিদের ভূমিকা আলোচনা কর। ৪) শিক্ষা কিভাবে নারী প্রগতির সহায়ক হয় ব্যাখ্যা কর।